জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

১৯৬৭

বিংশতি বর্ষ : জানুয়ারী—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

(ফেডারেশন হল)

কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৭

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৭

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৭

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক-সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৭

চিত্রসূচী

বিবিধ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ জানুয়ারী, ১৯৬৭ প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

১৯৬৭ সাল—জানুয়ারী হইতে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নূতন বৎসরে যাত্রা সুরু করিল। বিগত উনিশ বৎসর যাবৎ পত্রিকাটি মাতৃভাষার মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি পরিবেশন করিয়া আজ বিংশতি বর্ষে উপনীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে আমরা পত্রিকাটির সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ী প্রত্যেককেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের দেশে বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে প্রত্যেকেই অবহিত আছেন। শীর্ষস্থানীয় উন্নত দেশগুলিতে বিষয়বস্তুর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝাইবার জন্য প্রচুর আকর্ষণীয় চিত্রাদি সমন্বিত বিজ্ঞানের পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে। অধিকন্তু এই সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সক্রিয় মডেল প্রভৃতির স্থায়ী প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলে—জনসাধারণকে বিজ্ঞানানুরাগী করিতে হইলে এই সকল ব্যবস্থা যে অপরিহার্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই সকল বিষয়ের যৌক্তিকতা অনুধাবন করিয়া অনেক কাল পূর্ব হইতেই এই ধরণের বিবিধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রধানতঃ আর্থিক সমস্যাই এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয়ে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে পত্রিকাটির উৎকর্ষ সাধনের পথ সুগম হইবে এবং পরিষদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু এই সকল পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ সময়-সাপেক্ষ হইলেও পত্রিকাটিকে অধিকতর আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবার প্রচেষ্টাই অগ্রাধিকারের দাবী রাখে।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র লেখক-লেখিকাদের প্রতি পূর্বেও যেরূপ আবেদন করিয়াছি, এখনও সেরূপ আবেদন জানাইতেছি যে, বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য বা তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কিত প্রবন্ধাদি এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি, শিল্প ও কারিগরী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির পরিদর্শনলব্ধ বিবরণ আকর্ষণীয় চিত্র ও নক্সা প্রভৃতির সাহায্যে পরিবেশনে যদি তাঁহারা অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে পত্রিকাটির গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে এবং অধিকতর সংখ্যক পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ সৃষ্টিতে সক্ষম হইবে। নববর্ষের সূচনায় আমাদের এই নিবেদন ফলপ্রসূ হইবে বলিয়াই আশা করি।

ক্যান্সার-সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি

বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়

ক্যান্সার কি?

ইংরেজি ক্যান্সার কথাটি কাঁকড়ার গ্রীক শব্দ Karkinos থেকে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। এটি শুধু একটি মাত্র ব্যাধি নয়, পরন্তু ক্যান্সার শব্দে এক ব্যাপক ব্যাধি-গোষ্ঠীকে বোঝায়। মানুষ ও প্রাণীদের শরীরে দূষিত অর্বুদ বা আবের (Malignant tumours) উপস্থিতিজনিত সব রকম ব্যাধিকে ব্যাপক অর্থে ক্যান্সারের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়। এই সব দূষিত অর্বুদ সাধারণ দেহকোষগত পরিব্যক্তির (Somatic mutation) ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ক্যান্সারাক্রান্ত এই রকমের অস্বাভাবিক কোষসমূহের অবাধ বৃদ্ধির ক্ষমতা দেখা যায় এবং এরা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আক্রমণ করে' সেগুলিকে ধ্বংস করে ফেলে। রোগটি যখন অগ্রগতির পর্যায়ে বেশ কিছু দূর এসে পড়ে, তখন প্রাথমিক ছোট ছোট বর্ধিত অংশ থেকে রক্ত বা কোষসমষ্টি ভেঙে গিয়ে লিম্ফের (Lymph) সহায়তায় দেহের দূরবর্তী অংশে পরিবাহিত হয় এবং সেখানে অনুরূপ অর্বুদের (Metastasis) সৃষ্টি করে। যতদিন পর্যন্ত শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পর্যুদস্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু না ঘটে, ততদিন পর্যন্ত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ধনশীল কোষসমূহ ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে থাকে

জীবনের অস্তিত্ব যত প্রাচীন, ক্যান্সারও তত প্রাচীন। মানুষের ভিতর কম-বেশী ৩০০ বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সার দেখা দিতে পারে, যদিও মানবদেহের ক্যান্সার ৩০টি সাধারণ শ্রেণীতে পড়ে। এদের কতকগুলি খুব ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করে এবং সীমিত বিস্তারের দ্বারা পার্শ্ববর্তী তন্তুগুলিকে বিনষ্ট করে। অপরগুলি শরীরের দূরবর্তী অংশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর মূলীভূত প্রকৃতি সর্বদাই এক ধরণের--কোষগুলির যথেচ্ছ অনিয়মিত পরিবর্ধন দেহের স্বাভাবিক অনচ্ (Immunological) অথবা প্রাণরসায়নগত (Biochemical) নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে। সুস্থ মানবদেহে হর্মোন, জারক রস (Enzymes) এবং সম্ভবতঃ আরও কতকগুলি অজ্ঞাত ও অপরিচিত পদার্থ সমানু-পাতিক ও সূক্ষ্মভাবে একযোগে কাজ করে' কোষ-গুলির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার সাধন করে। কিন্তু দেহযন্ত্র যদি একবার বিকল হয়ে পড়ে, তবে সমগ্র ক্রিয়া-পদ্ধতিই কোষের ক্রমবিবর্ধনে অরাজকতার সৃষ্টি করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য

ক্যান্সারের ইতিহাস

ক্যান্সারের প্রাথমিক সূত্রপাতের বিবরণ ইতিহাসের কুহেলিকায় আবৃত। হাজার হাজার বছর ধরে এই ব্যাধির কথা জানা ছিল। খৃষ্টজন্মের প্রায় ১০০০ বছর পূর্বের ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে এমন এক রোগের উল্লেখ রয়েছে, যার লক্ষণ ক্যান্সারের অনুরূপ। খৃঃ পূঃ ৫০০ শতাব্দীর মধ্যে মিশরের ফ্যারাওদের মমির হাড়ে সারকোমার (Sarcoma) অস্তিত্ব ধরা পড়েছিল। ভেষজবিদ্যার জনক হিপোক্রেটিস (আনুমানিক ৪৩০ থেকে ৩৭৭ খৃঃ পূঃ) তাঁর রোগীদের মধ্যে ক্যান্সার রোগের অস্তিত্ব ধরতে পেরে উত্তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা তা পুড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন। প্রাচীন গ্রীসে ক্যান্সারযুক্ত

অর্বুদ অপসারণের নিমিত্ত চিকিৎসকেরা জটিল শল্যচিকিৎসারও আশ্রয় গ্রহণ করতেন বলে জানা যায়। আলেকজেণ্ড্রীয় চিকিৎসক লিওনিডেস (২০০ খৃষ্টশতক) যা সুপারিশ করেছিলেন, শল্যচিকিৎসক কর্তৃক আজও তা অনুসৃত হয়। সেটি হলো, দেহের সুস্থ অংশের ভিতর পর্যন্ত গভীরভাবে অস্ত্রোপচার করে ক্যান্সারযুক্ত তন্তুগুলিকে অপসারিত করা। আশ্চর্যের বিষয়, তাঁদের রোগীদের কেউ কেউ যথার্থই রোগমুক্ত হয়েছিল বলে জানা যায়।

তারপর এই রহস্যময় ব্যাধি সম্বন্ধে দীর্ঘ কাল নীরবতা চলে। রক্ত-চলাচল পদ্ধতি, লাল রক্তকোষ এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার তার সূত্রপাত হয়। মানুষের ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে যৎটুকু জানা ছিল, তার উপর ধাপে ধাপে আরও মোটামুটি জ্ঞান সঞ্চিত হতে থাকে। ক্যান্সারের বিবিধ লক্ষণ ধরা পড়তে লাগলো এবং এও জানা গেল যে, একবার ক্যান্সারে আক্রান্ত হলে রোগীর আর বাঁচবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ চিকিৎসকেরা দেখলেন যে, যে সব চিম্নির ঝাড়ুদার আলকাত্‌রার সামনে অনবরত কাজকর্ম করে, অন্যান্যের চেয়ে তাদেরই অধিকতর মাত্রায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের মোটামুটি বিবরণ সংগ্রহ করে ফেলেছিলেন। কিছুকাল পরেই ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানীরা ক্যান্সারের তন্তুগত আণুবীক্ষণিক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ জানতে পেরেছিলেন।

কোষ সম্পর্কিত প্যাথোলজির (Cellular Pathology) প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত জার্মান চিকিৎসক Rudolf Virchow বললেন—ক্যান্সারের উৎপত্তি হয় সেখানেই, যেখানে যান্ত্রিক, রাসায়নিক অথবা ভৌতিক ধরণের পৌনঃপুনিক উত্তেজনায় আহত তন্তুর পরিবর্তন সাধিত হয়। সম্ভবতঃ উত্তেজিত তন্তুগুলির মধ্যে প্রাণরাসায়নিক (Biochemical) অসঙ্গতি ঘটে থাকে এবং তাদের অক্সিজেন গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টির ফলে পচন (Fermentation) ঘটে থাকে। তন্তুর স্বাভাবিক গঠনে পরিবর্তন ঘটে এবং তাদের বিভাজন-প্রক্রিয়া অতিক্রুত হারে সুরু হয়ে যায়। প্রতি ১০০ দিনে গড়ে তন্তুর সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়ে থাকে।

ক্যান্সার রোগের সমতুল্য কোন রোগের কথা জানা নেই এই হিসেবে যে, বাইরের জীবাণুর দ্বারা যেমন অন্যান্য ব্যাধি সংঘটিত হয়ে থাকে, ক্যান্সার কিন্তু সে রকমের নয়—ক্যান্সার একজনের নিজস্ব তন্তু থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (বীজকোষ নয়, দেহকোষের পরিব্যক্তির মাধ্যমে) এবং যদি রোগীর চিকিৎসা না হয়, তবে এই তন্তুসমূহের দ্বারা রোগী নিধন প্রাপ্ত হতে পারে; কারণ এই উশৃঙ্খল তন্তুগুলি বাইরে থেকে প্রযুক্ত কোন উত্তেজনা বা প্রতিরোধ মেনে চলে না।

ভারতে ক্যান্সার

হৃদ্‌তন্ত্রী (Cardiovascular) রোগ সমেত আমাদের জনসংখ্যার ভিতর সম্ভবতঃ বেশ কিছু মৃত্যু ঘটে ক্যান্সারে, বিশেষ করে বয়স্কদের। ৪৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে প্রধানতঃ এই ব্যাধি আক্রমণ করে, তবে কম মাত্রায় অল্পবয়স্কদেরও আক্রমণ করতে পারে। আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনাও বেশী হয়ে থাকে।

ভারতের বৃহত্তর ক্যান্সার হাসপাতালগুলির সংখ্যাভিত্তিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, সচরাচর যে রকম মনে করা হয়, ভারতে তার চেয়েও বেশী ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব রয়েছে এবং এই রোগের ব্যাপ্তি ক্রমবর্ধনোন্মুখ।

বোম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হস্‌পিটালে ১২৫,০০০-এরও বেশী ক্যান্সার রোগীর পর্যালোচনায় প্রকাশ যে, দেহের বিভিন্ন অংশ এই রোগে

আক্রান্ত হয় এবং সেখানে রোগ ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালে ১৯৫৭-৬৫ সালের মধ্যে মোট ১৮,৫৩০ জন রোগীকে পরীক্ষা করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে অবগত হওয়া যায় যে, বোম্বাইয়ের রোগীদের মুখবিবর ও গলার ক্যান্সারগ্রস্ত রোগীর সংখ্যা (পুরুষ ৭০%, স্ত্রীলোক ২৩%) কলকাতার রোগীদের চেয়ে বেশী (পুরুষ ৫৭.৮% স্ত্রীলোক ১১.১%)। বোম্বাইয়ের রোগীদের মধ্যে কণ্ঠনালী (Oesophagus) ও স্তনের ক্যান্সার কলকাতার রোগীদের চেয়ে বেশী। কলকাতায় পুরুষ রোগীদের ফুসফুসের ক্যান্সার ও স্ত্রী রোগীদের জননেন্দ্রিয়ের ক্যান্সারের সংখ্যা বোম্বাই হাসপাতালের রোগীর অপেক্ষা অধিক (যথাক্রমে ১.৫% ও ৪২%)। উপযুক্ত পুষ্টি ও সংক্রামক ব্যাধি থেকে মুক্তির দরুণ ভারতবাসীদের আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, বর্তমানে আমাদের জনসংখ্যার প্রতি ১,০০০,০০০ জনের ভিতর বছরে প্রায় ৮৫ জন নতুন লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। মনে হয় এই হার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে এবং জনসাধারণ ও

ভারত ও অন্যান্য দেশে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব

স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের হিসেব থেকে জানা যায় যে, সমগ্র পৃথিবীতে বছরে প্রায় ২০ লক্ষ লোক ক্যান্সারে মারা যায়। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে ও সোভিয়েট ইউনিয়নে বিগত ৩০ বছরে পুরুষের শ্বাসযন্ত্রে যন্ত্রণাদায়ক অর্বুদের দরুণ মৃত্যুহার তিন গুণেরও বেশী হয়েছে, আর নারীদের মধ্যে জরায়ু সংক্রান্ত ক্যান্সার দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেহের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সারের আক্রমণ

(চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতালের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত)

পুরুষ

57.8% MOUTH & THROAT 11.1%
6.4% GULLET OR OESOPHAGUS 3.2%
— BREAST 12%
4.9% LUNG 0.4%
6.3% GENITALS 57%
24.4% OTHER SITES 16.3%
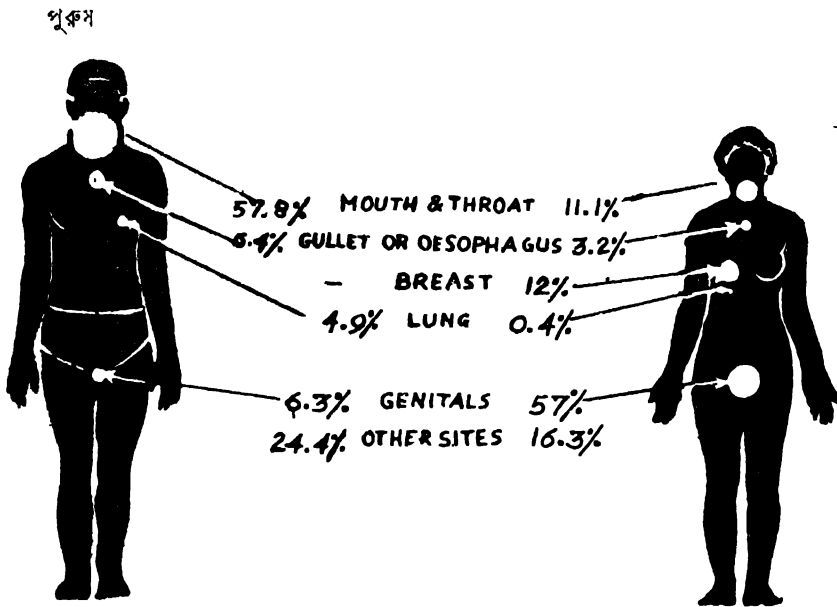
(প্রায় ২,০০০ রোগীর ক্যান্সারের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এই তথ্য পাওয়া গেছে)

ক্যান্সার উৎপাদনকারী প্রভাবশালী কারণসমূহ

সব রকম আবহাওয়া এবং সব রকম জাতির মধ্যেই ক্যান্সার হতে দেখা যায়—যদিও এক দেশ থেকে অন্য দেশে এবং দেশের অভ্যন্তর ভাগে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে মানবদেহে এই ব্যাধির বিস্তার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এই প্রভেদের জন্যে বহুলাংশে দায়ী হলো পারিপার্শ্বিক অবস্থা, অভ্যাস ও সামাজিক রীতিনীতি; কিন্তু সম্ভবতঃ অপরাপর কয়েকটি অজ্ঞাত কারণও আছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলিতে ক্যান্সারজনিত মৃত্যুহারে বেশ তারতম্য দৃষ্ট হয়। অপেক্ষাকৃত দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি হলো:—

(১) স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার দেশসমূহ, আইসল্যাণ্ড এবং জাপানে পাকস্থলীর ক্যান্সারের উচ্চতর হার; (২) দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকায় প্রাথমিক যকৃৎ ক্যান্সারের উচ্চতর হার; (৩) চীনে নাসিকা ও কণ্ঠনালী-দেশে (Naso-pharyngeal region) ক্যান্সারের বর্ধিত হার; (৪) মিশরে মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের বর্ধিত

হার ; (৫) যুক্তরাজ্যে অধিকতর হারে স্তনের ক্যান্সার ; (৬) ভারতে Oropharyngeal অংশে বর্ধিত হারে ক্যান্সার ; (৭) জাপান ও ভারতে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ে উচ্চতর হারে ক্যান্সার ; (৮) কৃষ্ণকায় জাতি অপেক্ষা শ্বেতকায় জাতির মধ্যে অধিকতর মাত্রায় চর্মের ক্যান্সার। দেখা গেছে যে, বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের বিস্তার কয়েকটি কারণের উপর নির্ভরশীল, যার মধ্যে রয়েছে বয়স, স্ত্রী বা পুরুষ ভেদ, জাতি, বাসস্থল, অভ্যাসাদি, পেশা এবং সামাজিক রীতিনীতি।

(১) বয়সের প্রভাব—২০ বছরের নীচে ক্যান্সারে মৃত্যুহার অপেক্ষাকৃত কম, ৫০-৬০ বছরে এটা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় (নারীদের মধ্যে গোড়ার দিকে) এবং তারপর আক্রমণ কিছুটা কম হয়। কিন্তু ক্যান্সারের আরও রকমফের আছে, যা অতি শৈশবে ও অতি বার্ধক্যে সর্বাধিক মাত্রায় ঘটে থাকে। কঠিন লিউকেমিয়া (রক্তের এক রকমের ক্যান্সার), মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর অর্বুদ এবং অস্থি-র ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটি সত্য।

(২) স্ত্রী ও পুরুষের প্রভাব—২৫-৫৫ বছর বয়সের নারীদের মধ্যে ক্যান্সারের হার পুরুষদের অপেক্ষা বেশী। নারীদের প্রজনন যন্ত্রাদিতে (জরায়ু ও স্তন) অল্প বয়সে ক্যান্সার সংঘটিত হওয়াই এর কারণ। পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্যান্সার দেখা যায় ত্বক, ফুসফুস, প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ড, পায়ুনালী এবং পাকস্থলীতে। নারীদের মধ্যে স্তন, জরায়ু, ত্বক, অন্ত্র, যকৃৎ, পিত্তনালী এবং থাইরয়েডে প্রায়ই ক্যান্সার হয়ে থাকে।

(৩) বাসস্থলের প্রভাব—কয়েকটি রাজ্যের অবস্থা পর্যালোচনায় জানা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের চেয়ে শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ১৫%-৪০% ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুহার বেশী। শহরাঞ্চলের পুরুষদের মধ্যে শ্বাসযন্ত্রে ঐ বর্ধিত হার বেশী প্রকট। শহরের বাতাস কলুষিত হবার ফলে বাতাসে কার্শিনোজেন (Carcinogen) সমন্বিত পদার্থসমূহ বেশী সঞ্চিত হবার দরুণ এটা হতে পারে।

(৪) সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রভাব—বোম্বাইয়ের টাটা ক্যান্সার হাসপাতালের বিবরণে প্রকাশ যে, মহীশূর রাজ্যের ব্যাঙ্গালোরে পাকস্থলীর ক্যান্সারের সংখ্যা বেশী। কিন্তু গুজরাট রাজ্যের অধিবাসীরা সচরাচর নিরামিষভোজী ও যথেষ্ট মাত্রায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করে। সেখানে পাকস্থলীর ক্যান্সার কম। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সমাজ অপেক্ষা সর্বনিম্ন সমাজে এই হার প্রায় দ্বিগুণ বেশী। আধুনিক গবেষণায় অবশ্য জানা গেছে যে, লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সার নিম্ন সম্প্রদায় অপেক্ষা উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশী।

(৫) অভ্যাসের প্রভাব—ফুস্ফুসের ক্যান্সারের অন্যতম কারণ যে ধূমপান, তা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হলেও একথা ঠিক যে, অধূমপায়ীদের চেয়ে ধূমপায়ীদের মধ্যেই ফুস্ফুস ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সারের শতকরা হার বেশী। খৈনি-খাওয়া, চুট্টার ধূমপান করা, চুনসহ পান খাওয়ার অভ্যাসই ভারতে ঠোঁট ও গালের ক্যান্সারের নিশ্চিত কারণ। কাশ্মীরে পেটের চামড়ায় যে ক্যান্সার হয়, তার নাম কাংগরি ক্যান্সার। এটা হবার কারণ—শীতের সময় ঐসব স্থানীয় লোকেরা কোমরের নীচে পেটের কাছে নিজেদের গরম রাখবার জন্যে ঝুড়িতে জ্বলন্ত কাঠকয়লা রেখে থাকে। কণ্ঠনালী, পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যান্সার অধিক মাত্রায় মদ্যপানের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রোটিন ও ভিটামিনশূন্য (বিশেষ করে "বি" শ্রেণীর ভিটামিন) খাদ্য মুখগহ্বর, গলদেশ, কণ্ঠনালী, পাকস্থলী ও যকৃতের ক্যান্সারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকতে পারে।

পূর্বোক্ত টাটা হাসপাতালে ১২৫,০০০ জন

রোগীর পরীক্ষায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে মুখ ও কণ্ঠনালীর ক্যান্সারে স্থানীয় অভ্যাস নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করে।

(৬) পেশার প্রভাব—ভারতসহ পৃথিবীর বহু অংশে শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ভয়াবহ মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। হাজার হাজার রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ রয়েছে, যেগুলি ক্যান্সার উৎপত্তির কারণ বলে সঠিক-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ভৌতিক কারণসমূহ, যেমন—অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স রশ্মি ও তেজস্ক্রিয় দ্রব্যাদিও খুব জোরালো ক্যান্সার উৎপাদন-কারী পদার্থ। এক্স রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি এবং তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের পরীক্ষামূলক চিকিৎসা এবং ব্যবসায়গত প্রয়োগের ফলে লিউকেমিয়া, অষ্টিয়োসারকোমা এবং ফুস্ফুসের ক্যান্সারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল চিকিৎসক তেজস্ক্রিয় চিকিৎসায় (Radiology) লিপ্ত নন, তাঁদের চেয়ে নয় গুণ বেশী মাত্রায় এক্স রশ্মি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে লিউকেমিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। দেখা গেছে, লুমিনাস পেন্টের সাহায্যে ঘড়ির ডায়েল রং করবার কাজে নিযুক্ত মহিলা কর্মীদের মধ্যে অস্থি-ক্যান্সারের প্রবণতা বেশী। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ঐ সকল কর্মীরা তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমন্বিত দ্রবণে তুলি ডুবিয়ে অধর ও ওষ্ঠের মধ্যে চেপে তুলির মুখ সূক্ষ্ম করে নিত। অতি অল্প মাত্রায় হলেও এভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে অস্থিতে জমা হয়ে অস্থি-ক্যান্সারের সূত্রপাত করতো। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমন্বিত ভূতাত্ত্বিক স্তরে কার্যরত খনির শ্রমিকদের প্রায়ই ফুস্ফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। অ্যাজো-ডাই, বিশেষ করে বিটা-ন্যাপথাইলামিন (Betanaphthylamine) শ্রেণীর রঞ্জক পদার্থ উৎপাদনে ব্যাপৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মিবৃন্দ মূত্রাশয়ের (Urinary bladder) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। উৎপাদনের এক বিশেষ পর্যায়ে ৬ মাস ক্রমাগত কার্যরত থাকলেও মূত্রাশয়ের ক্যান্সারে বেশী শতাংশে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। আর্সেনিক, বেনজিডিন (Benzidine), ভুসা, আলকাত্রা, ক্রিওজোট তেল, অশোধিত প্যারাফিন তেল, অ্যাসবেস্টস, ক্রোমেট যৌগসমূহ, প্লাস্টিক, নিকেল কার্বনিল (Nickel Carbonyl) প্রভৃতি সম্পর্কিত অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ক্যান্সার আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। সুতরাং প্রশ্ন উঠছে যে, অনুন্নত বা উন্নতিশীল দেশে শিল্পায়ন, বিশেষ করে অহিতকর শিল্পসমূহের অগ্রগতি জনগণের মধ্যে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধির পর্যায় পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া উচিত কি না? মূলতঃ শিল্পে অগ্রগতির পথে ক্যান্সার অভি-শাপস্বরূপ নয়। যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিল্পে এর বিপত্তি এড়িয়ে যাওয়া চলে।

(৭) সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব—দেখা গেছে যে, ইহুদি ও মুসলমানেরা সচরাচর পুং-জননেন্দ্রিয় এবং জরায়ুমুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় না। এই দুই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে লিঙ্গচ্ছদ কর্তন (Circumcision) বাধ্যতামূলক হওয়ায় এই দুই ধরণের ক্যান্সার খুব কমই ঘটতে দেখা যায়। ইহুদিদের মধ্যে জন্মের ৮ম দিনে এই প্রথা অনুযায়ী কাজ করা হয় এবং তারা এই দুই ধরণের ক্যান্সারে ভোগে না। মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে এই প্রথা অনুযায়ী কাজ করে। তারা এই দুই ধরণের ক্যান্সারে ভোগে বটে, তবে যে সকল লোকের ভিতর এই প্রথা প্রচলিত নেই, তাদের মত ঘন ঘন নয়। পুং-জননেন্দ্রিয়ের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, বিশেষ করে ঢিলা লিঙ্গচ্ছদ বা Frenum-এর নীচে জীবাণুঘটিত ময়লা জমা হয়ে এই সব অংশে ক্যান্সার উৎপত্তির উপযুক্ত

অবস্থার সৃষ্টি করে। হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত নেই, সেটাই হয়তো ভারতে জরায়ু-মুখের ক্যান্সারাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হবার কারণ বলা যেতে পারে। বহুসংখ্যক শিশুর জন্ম জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের অপর কারণ বলা হয়। লক্ষ্য করা গেছে—অপুত্রক নারী অথবা দুই-একটি সন্তানের জননী অপেক্ষাকৃত অধিক মাত্রায় জরায়ু-মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে সক্ষম। উপযুক্ত পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সাহায্যে আমরা এই ধরণের ক্যান্সার উৎপত্তির সংখ্যা হ্রাস করতে পারি। বৃটিশ মহিলা ও ভারতের পার্শি সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে স্তনের ক্যান্সার (প্রায় ১৭%-১৮%) হতে দেখা যায়, শিশুকে স্তন্যদানে বিরত থাকাই এর কারণ। জাপানী মায়েরা তাঁদের শিশুদের দীর্ঘকাল স্তন্যপান করিয়ে থাকেন বলে তাঁদের মধ্যে এই ব্যাধির প্রকোপ অনেক কম (৫.৩%) এবং এই থেকেই স্তন্যদান এবং স্তনের ক্যান্সারের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে।

(৮) পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব –মহামারী সংক্রান্ত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে যে, কয়েক ধরণের ক্যান্সার পৃথিবীর কয়েক অংশে ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। সাইলেসিয়া ও আর্জেন্টিনার কয়েকটি প্রদেশে ত্বকের ক্যান্সার প্রায়ই দেখা যায়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ঐসব অঞ্চলের জলে আর্সেনিক রয়েছে। এই জল গ্রহণের ফলে ত্বকে আর্সেনিক জমে ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবেই দেখা গেছে যে, সুইজারল্যাণ্ডে এক রকমের গলগ্রন্থি (Thyroid gland)-ক্যান্সার প্রায়ই হয়ে থাকে। পানীয় জলে কম অথবা পূর্ণমাত্রায় আয়োডিনের অভাবই এর কারণ বলে ধরা হয়। খাদ্যের সঙ্গে নিয়মিতভাবে আয়োডিনঘটিত লবণ ও জল ব্যবহার করে এই পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। মিশরে মূত্রাশয়ের ক্যান্সার খুব বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে। প্রমাণিত হয়েছে যে, Schistosoma haematobium নামে এক জাতীয় পরজীবি-সংক্রমণই এই ধরণের ক্যান্সার উৎপত্তির অন্যতম মুখ্য কারণ।

(৯) জাতির প্রভাব—যে সকল শ্বেতকায় মানব জাতির ত্বকে রঞ্জক পদার্থ (Pigment) নেই, তাঁরা যদি দীর্ঘকাল গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রখর রৌদ্রে অবস্থান করেন, তবে প্রায়ই তাঁরা ক্যান্সারে ভুগে থাকেন। সুপরিচিত Sailor's cancer ও Farmer's cancer এর উদাহরণ।

(১০) বংশগতির প্রভাব—ক্যান্সার কি বংশানুক্রমিক? এই প্রশ্ন প্রায়ই জিজ্ঞাসা করা হয়—কারণ জনসাধারণ, বিশেষতঃ যাঁরা ক্যান্সারের দরুণ এক বা একাধিক আত্মীয়-স্বজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের মনে এসম্বন্ধে একটা সাধারণ ভীতি রয়েছে। এক রকমের ক্যান্সার Retinoblastoma (অক্ষিপটের এক রকম বিরল ক্যান্সার), দুটি প্রাক-ক্যান্সারের অবস্থা, যেমন Scleroderma pigmentosum, Multiple polyposis of the rectum এবং Neurofibromatosis—এগুলি লক্ষণীয়ভাবে বংশ-পরম্পরায় পরিচালিত হয়। স্তন, জরায়ু-মুখ, বৃহদন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারে কিছুটা বংশানুক্রমিকতা পরিলক্ষিত হয়। উল্লিখিত কয়েকটি ধরণের বিরল ক্যান্সার ও প্রাক-ক্যান্সারের অবস্থা ছাড়া কোনও একজন লোকের পক্ষে, এমন কি একজনের মাতা, পিতা অথবা উভয়েরই যদি ক্যান্সারের ফলে মৃত্যু ঘটে থাকে, তার পক্ষেও ক্যান্সারের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ৭০% সম্ভাবনা রয়েছে। ক্যান্সার রোগীর উদ্বিগ্ন আত্মীয়স্বজন অনেক সময়েই ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেন—ক্যান্সার ছোঁয়াচে রোগ কি না? এর উত্তর হলো—না। মানবদেহের ক্যান্সার ছোঁয়াচে অথবা কোন রকম

স্পর্শজনিত কারণে বিস্তারলাভ করে, এটা প্রমাণিত হয় নি। ইঁদুর, খরগোস, মুরগী এবং ব্যাঙের মধ্যে দৃষ্ট কয়েক রকমের ক্যান্সার তন্তুসমূহের তন্তুমুক্ত ফিলট্রেট (Cell-free filtrate) অথবা কোন ভাইরাসের মাধ্যমে এক প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে পরিচালন করা যেতে পারে, কিন্তু মানবদেহে এভাবে পরিচালন করা সম্ভব নয়।

প্রাক-ক্যান্সার অবস্থাসমূহ

তন্তুসমূহের মধ্যে কিছু কিছু প্যাথোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা যায়, যেগুলি নিজেরা নির্দোষ হলেও অচিকিৎসা বা ভুল চিকিৎসায় গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। শরীরের বিভিন্ন অংশে এই প্রাক-ক্যান্সার অবস্থাগুলি গড়ে ওঠে। এই সব আহত স্থান (Lesions) থেকে রীতিমত ক্যান্সার গড়ে ওঠা বন্ধ করবার জন্যে অচিরাৎ যত্ন লওয়া প্রয়োজন। ভাবী বিপত্তির সম্ভাবনা থাকায় নিম্নোক্ত অবস্থাগুলিতে সঠিক সতর্কতা অবলম্বন করা বিধেয়।

(১) ঠোঁটের খোলা অংশে, জিহ্বায়, গালের ভিতরে, গলদেশে, কণ্ঠনালীতে এবং লিঙ্গ, পায়ু, জরায়ু ও যোনিমুখে শাদা খণ্ড খণ্ড দাগ (Leukoplakia) ক্যান্সারাত্মক অবস্থার প্রাগাভাস বলে জ্ঞাত। এদের সবই যে ক্যান্সারে পরিণত হবে তার কোন মানে নেই, তবে এদের বেশ কিছু সংখ্যক এই পরিণতির দিকে মোড় নেয়।

(২) পাকস্থলী, জরায়ু, কলোন, মলদ্বার এবং মূত্রাশয়ে এক বা একাধিক পলিপ (Polyp) দেখা যায়। যেখানে সম্ভব এগুলি শীঘ্র অপসারণ করা উচিত।

(৩) পুরাতন স্তন-স্ফীতি (Mastitis) এবং স্তনে মাংসপিণ্ড।

(৪) বৃদ্ধবয়সে ত্বকের বিকৃতি (Hyperkeratosis)।

(৫) ক্ষয়রোগাক্রান্ত ত্বক এবং অন্যান্য পুরাতন সংক্রমণ ও ত্বকের স্থায়ী ক্ষত, যেমন—অসম্পূর্ণ পোড়া দাগ প্রভৃতি।

(৬) সিফিলিস এবং ক্ষয়রোগাক্রান্ত জিহ্বা।

(৭) মূত্রাশয়ের Bilharziasis।

(৮) পাকস্থলীর ঘা (Peptic ulcer)—বলা হয় যে, ৫%—১৫% পেপ্‌টিক আলসার ক্যান্সারে পরিণত হয়। সুতরাং যে সব পেপ্‌টিক আলসারে ঔষধ ক্রিয়া করে না, সে সব ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সতর্কতার সঙ্গে শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার।

(৯) জড়ুল বা আঁচিল (Mole)—রঞ্জিত জন্মদাগ বা জড়ুল খুব কম ক্ষেত্রেই দূষিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তবে এই জড়ুল থেকেই মেলানোমা (Melanoma) নামক এক ভয়াবহ প্রকৃতির ক্যান্সারের উদ্ভব হয়। সুতরাং এর উপর পুনঃ পুনঃ চাপ প্রয়োগ বা অন্য ধরণের উত্তেজনা সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা উচিত।

ক্যান্সার ধরবার উপায়

ক্যান্সার সুরু হয় অজ্ঞাতসারে এবং প্রথম অবস্থায় সাধারণতঃ কোন রকম সুনির্দিষ্ট লক্ষণাদিও দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্যান্সার বহু প্রকারের, কিন্তু এপর্যন্ত নির্ভরযোগ্য এমন একটি পরীক্ষাও উদ্ভাবিত হয় নি, যার সাহায্যে তাদের ধরা যায়। প্রগতিশীল দেশগুলিতে (যার মধ্যে ভারতও পড়ে) সচরাচর ক্যান্সার নির্ণয় করা হয় তখন, রোগটি যখন বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে যায়। সুতরাং রোগী ও ডাক্তার উভয়েরই সর্বদা সচেতন থাকা প্রয়োজন। ক্যান্সার যদি গোড়ার দিকে ধরা পড়ে, তবে অনেক কিছুই করতে পারা যায়। জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধিজীবি স্ত্রী ও পুরুষেরা যদি নিম্নোক্ত লক্ষণগুলির যে কোন একটি লক্ষণ

(সতর্কতামূলক সঙ্কেত) দেখা দিলে ব্যাপক পরীক্ষার জন্যে ক্যান্সার নির্ণায়ক কেন্দ্রে উপস্থিত হন, তবেই এটা সম্ভব হতে পারে। আন্তর্জাতিক ক্যান্সার বিরোধী সঙ্ঘ সকলের পক্ষে প্রযোজ্য নিম্নোক্ত ৯টি লক্ষণকে ক্যান্সারের পূর্বাভাস বলে স্মরণ রাখতে বলেছেন।

১। বক্ষে একটি পিণ্ড বা শক্ত অংশ (এটা পুরুষের পক্ষেও প্রযোজ্য, যারা অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যায় হলেও স্তন-ক্যান্সারে ভুগে থাকে)।

২। তিল, আঁচিল বা জন্মদাগের বর্ণ বা আকারের ক্রমাগত পরিবর্তন।

৩। পরিপাক এবং মলত্যাগের অভ্যাসের অনবরত পরিবর্তন, বিশেষ করে ৪০ বছরের উর্ধ্বে।

৪। একঘেঁয়ে কাশি বা স্বরভঙ্গ (Sore throat)।

৫। (স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রযোজ্য) অত্যধিক রক্তস্রাব।

৬। কোন স্বাভাবিক ছিদ্রপথে রক্তপাত।

৭। স্ফীতি বা ঘা, যা ভাল হয় না, বিশেষ করে ঠোঁটে, জিহ্বায়, কানে, চোখের পাতায় অথবা জননেন্দ্রিয়ে।

৮। অব্যাখ্যাত ওজন-হ্রাস, দীর্ঘকালীন জ্বর, যার কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা একটা দুর্বলতার অনুভূতি।

৯। ক্রমাগত মাথাধরা, সাইনিউসাইটিস (Sinusitis) অথবা দৃষ্টিশক্তির অসুবিধা।

এই সব বা অন্য কোন লক্ষণ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক অনেক সময় ধরে দেহের সকল অংশে নিয়মিত পরীক্ষা সুরু করেন এবং দেহের যে সব অংশে ক্যান্সার আক্রমণের সম্ভাবনা বেশী, সে সব অংশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তাঁর অনুসন্ধানের ফলে একটা মাংসপিণ্ড অথবা ঘা বের হয়ে পড়া সম্ভব। বিশেষ বিশেষ ক্যান্সারের জন্যে পরীক্ষণাগারের বহু প্রক্রিয়া রোগ নির্ণয়ে সহায়ক।

সর্বাধিক পরিচিত হলো—কোষ-পরীক্ষা। এই প্রক্রিয়ায় জরায়ুর মুখ থেকে সংগৃহীত কোষ-সমূহের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা চালানো হয়। প্রক্রিয়াটি দেহের অন্যান্য অংশজাত রসেও প্রযুক্ত হয়ে থাকে; যেমন—মূত্র, থুথু, নাকের সর্দি, মুখের লালা এবং পাকস্থলী ধৌতকরণে প্রাপ্ত জলীয় অংশ প্রভৃতি। বায়োপ্‌সি (Biopsy) নামক একটি শল্য-পদ্ধতির দ্বারা সঠিকভাবে ক্যান্সার নির্ণয় করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে সন্দেহজনক তন্তুর একটি ক্ষুদ্র অংশ অপসারিত করবার পর রঞ্জিত করে সুশিক্ষিত চিকিৎসক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেন। দেহের আভ্যন্তরীণ অংশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা কঠিন। সুতরাং সেখানে এক্স রশ্মি ও সঠিক এণ্ডোস্কোপিক (Endoscopic) পরীক্ষা রোগ নির্ণয়ে সহায়ক হয়ে থাকে।

ক্যান্সারের যথার্থ কারণ কি? গবেষণালব্ধ জ্ঞান

একথা প্রায় সর্বজনস্বীকৃত যে, আধুনিক কালের জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সর্বাধিক সমস্যা হলো —লিউকেমিয়া সমেত ক্যান্সারের মূল কারণ কি, তার সঠিক উত্তর পাওয়া। ছড়িয়ে পড়া এবং সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় বিগত ৩০ বছরে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক চেষ্টা সত্ত্বেও ক্যান্সারের মুখ্য কারণ আজও বিজ্ঞান আবিষ্কারে সক্ষম হয় নি।

ক) রাসায়নিক যৌগসমূহ (Chemical carcinogenic compounds) — উনবিংশ শতাব্দীতে একজন বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী বলেছিলেন — পৌনঃপুনিক ঘর্ষণ ক্যান্সার উৎপত্তির একটি কারণ। কোন কোন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে সংঘটিত ক্যান্সারের এটাই সাধারণ

ব্যাপার বলে মনে করা হতো। কিন্তু সন্দেহজনক রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে জীবদেহে কৃত্রিম উপায়ে ক্যান্সার উৎপাদন করা সম্ভব হয় নি। তবে ১৯১৫ সালে দু-জন জাপানী গবেষক অনেক মাস ধরে খরগোসের কানে আলকাত্‌রা লাগিয়ে তাদের কানে ত্বকের ক্যান্সারের স্থচনা হতে দেখেন। পরে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা আলকাত্‌রা থেকে ৩, ৪-বেঞ্জোপাইরিন (3, 4-Benzpyrene) নামে একটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ পৃথকীকরণে সক্ষম হন। এই পদার্থটি ইঁদুরের যে অংশে লাগানো হয়েছিল, সেখানে ক্যান্সারের স্থত্রপাত দেখা দিয়েছিল।

শীঘ্রই উদ্ঘাটিত হলো যে, পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য (৩, ৪-বেঞ্জোপাইরিন যার অন্তর্গত) পাওয়া যায় অনেক প্রকারের আলকাত্‌রা, তেল এবং অসম্পূর্ণরূপে দগ্ধ উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে উপজাত পদার্থের মধ্যে কার্সিনোজেনস ও কো-কার্সিনোজেনস (Carcinogens and Co-carcinogens)। রসায়ন বিজ্ঞানীরা অতঃপর অনেক বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করেছেন, যা জীবদেহে ক্যান্সার স্থষ্টি করে এবং তাঁরা আরো এগিয়ে এগুলির রাসায়নিক সংগঠন ও ক্যান্সার স্থষ্টিকারী কর্মক্ষমতার মধ্যে কিছু সাধারণ সম্পর্ক দেখিয়ে দিয়েছেন। এই সব কার্সিনোজেনের আচরণের মাধ্যমে ক্যান্সার উৎপাদন-সহায়ক প্রক্রিয়া বোঝবার চেষ্টা হয়েছে। এটা এখন স্থস্পষ্টভাবে জানা গেছে যে, অল্প মাত্রায় অনেক খাঁটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে প্রাথমিক প্রদাহজনক পরিবর্তনাদি ছাড়াই ক্যান্সার উৎপাদনের অবস্থা স্থষ্টি করতে পারে। প্রদাহ স্থষ্টিকারী অনেক রাসায়নিক পদার্থ তন্তুগুলিকে ধ্বংস করলেও ক্যান্সার স্থষ্টি করে না। এথেকেই দেখা যায়, কার্সিনোজেনেসিস (Carcinogenesis) প্রদাহ থেকে পৃথক।

(খ) পারিপার্শ্বিক বিপদ (Environmental hazards)—অধিকাংশ লোকের পক্ষে আলকাত্‌রা, দূষিত বাতাস, তামাকের ধোঁয়া ও অশোধিত দ্রব্যাদি সমন্বিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্মুখীন হওয়া বিপজ্জনক ব্যাপার। শিল্পে নিযুক্ত মনুষ্যদেহে নিম্নোক্ত ক্যান্সারগুলি হতে দেখা যায়; যথা—ডাই-এর কর্মীদের মধ্যে যারা বিটা-ন্যাপথিলামিন (Beta-naphthylamine) নিয়ে কাজ করে, তাদের মূত্রস্থলীর ক্যান্সার; রেডিয়াম গলাধঃকরণের ফলে অস্থি-ক্যান্সার; ক্রোমেট, তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ, অ্যাসবেস্টস, লৌহ প্রভৃতির ঘ্রাণ নেবার ফলে ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার; নিকেল খনির কর্মীদের নাসারন্ধ্র এবং ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার; কয়লা, তেল, অয়েল সেল, লিগ্‌নাইট এবং পেট্রোলিয়ামের কয়েকটি উপজাত পদার্থ ব্যবহারের ফলে চর্মের ক্যান্সার প্রভৃতি।

শিল্পের পরিত্যক্ত পদার্থের দ্বারা দূষিত বাতাস কার্সিনোজেনের কার্যকরী উৎসরূপে পরিগণিত। বাতাসে দূষিত পদার্থ থাকলে আমাদের ফুস্‌ফুস সাধারণতঃ কাশির সাহায্যে বা অন্য জটিল উপায়ে ব্রঙ্কিয়েল নল (Bronchial tubes) বা ফুস্‌ফুস তন্তুর দ্বারা তাদের হাত থেকে নিস্কৃতি পায়। কিন্তু অতিমাত্রায় অথবা অনবরত এই সব দূষিত পদার্থের শ্বাসগ্রহণে ফুস্‌ফুস ও ব্রঙ্কিয়েল লাইনিং-এ পরিবর্তন সাধিত হয়, যার পরিণতি ঘটে অসুস্থতা ও অক্ষমতায়। এই সব দূষিত পদার্থের মধ্যে ক্যান্সার উৎপাদক কোন কিছু থাকলে তার সঙ্গে দীর্ঘ সান্নিধ্যের ফলে ক্যান্সার স্থষ্টি হতে পারে।

(গ) বিকিরণ—সূর্যরশ্মির অতিবেগুনী রশ্মি ক্যান্সার উৎপত্তির অপর এক কারণ। যে সব লোক প্রখর সূর্যরশ্মি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে, তাদের চেয়ে খোলা জায়গায় কর্মরত নাবিক

ও কৃষকদের মধ্যে ত্বকের ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশী।

১৯১০ সালে ত্বকে রেডিয়াম প্রয়োগ করে জনৈক ফরাসী গবেষক কতকগুলি ইঁদুরের ত্বকে ক্যান্সারের সৃষ্টি করেছিলেন। আয়ননকারী-বিকিরণ (Ionising radiation) মানুষ ও জীবদেহে কয়েক ধরণের ক্যান্সারের সৃষ্টি করে। অতিমাত্রায় বিকিরণের সম্মুখীন হবার ফলে রেডিওলজিষ্ট ও অন্যান্যের মধ্যে লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

(ঘ) ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস—১৯৩০ সালের কাছাকাছি দুটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্সার-ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছিল। প্রথমে বৈজ্ঞানিকেরা বুনো খরগোসের অর্বুদ (Papilloma) বা তিল (Wart) থেকে নেওয়া কোষমুক্ত ফিলট্রেট গৃহপালিত খরগোসের দেহে প্রবেশ করিয়ে দিতে সক্ষম হন। অধিকন্তু, গৃহপালিত খরগোসে এই সমস্ত তিল আর মৃদু স্বভাবাপন্ন থাকে না, হয়ে ওঠে উগ্রভাবাপন্ন। মুরগীর ছানার Rous sarcoma পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ভাইরাস বলে অনুমিত পরিস্রাবণোপযোগী বস্তুটি ঐ অর্বুদ থেকে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

আজ বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর মধ্যে অন্ততঃ বারো রকমের ভাইরাস-উদ্ভূত ক্যান্সার দেখা গেছে। এই সব ভাইরাসের গঠন ও রাসায়নিক সংযুতি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা সম্ভব হয়েছে। কোষগুলিতে ভাইরাস আক্রমণের সময় কি অবস্থা ঘটে, জীবকোষের গঠনপ্রণালী বিষয়ক গবেষণার ফলে তার রহস্যোদ্ঘাটন সুরু হয়েছে। উৎকট লিউকেমিয়া, মলদ্বারের পলিপ এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের তন্তুজাত রক্তে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণের সাহায্যে জান্তব ক্যান্সার-ভাইরাসের মত কণিকা দেখা গেছে। কিন্তু এরকমের নিদর্শন খুবই কম। শুধুমাত্র ভাইরাসের উপস্থিতিতেই প্রমাণিত হয় না যে, সেগুলি রোগোৎপত্তির কারণ। এই রকমের কণিকাগুলি ক্যান্সার-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভেজালও হয়ে থাকতে পারে।

ভাইরাস কর্তৃক মানবদেহে কোন কোন রকমের ক্যান্সার উৎপত্তির ঘটনার দেখা মিলতে পারে এবং এই রকমের আবিষ্কার রক্ষাকবচরূপে ভ্যাক্সিন (Vaccine) প্রস্তুতে সহায়ক হবে। যাহোক, এমন কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই, যা থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, মানবদেহের ক্যান্সার ছোঁয়াচে এবং ক্যান্সার রোগীর সংস্পর্শে এলে অপরেরও ক্যান্সার হবে।

(ঙ) হর্মোন (Hormone)—ক্যান্সার গবেষণায় আগ্রহের প্রাথমিক ক্ষেত্র ছিল ক্যান্সারের অগ্রগতির সঙ্গে হর্মোনসমূহের সম্পর্ক। ১৯১৮ সালে দেখানো হলো যে, স্ত্রী ইঁদুরের ডিম্বাশয় (Ovary) অপসারণের ফলে স্তনের ক্যান্সার রোধ করা যায়। উপরন্তু পুরুষ ইঁদুরের জননেন্দ্রিয়গুলি অপসারিত করে ত্বকের নীচে ডিম্বাশয় স্থাপিত করে তাদের স্তনের ক্যান্সার ঘটাতে পারা গেছে। পরে দেখা গেছে যে, ইঁদুরের ভিতর স্তনের ক্যান্সার তিনটি কারণের উপর নির্ভর করে: জিনঘটিত প্রবণতা—Genetic susceptibility (এক রকম পারিবারিক দুর্বলতা), অস্বাভাবিক ষ্ট্যাটাস (Abnormal status) এবং দুগ্ধ-পরিচালিত ভাইরাসের সান্নিধ্য।

স্ত্রী-হর্মোন (Estrogen) দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত হলে লিউকেমিয়া এবং অণ্ডকোষ, জরায়ু এবং কোন কোন ইঁদুরের পিটুইটারীতে (Pituitary) অর্বুদের সৃষ্টি করে। কিন্তু চিকিৎসার উদ্দেশ্যে মানবদেহের বিভিন্ন অবস্থায় ক্রমবর্ধিত মাত্রায় হর্মোন প্রয়োগে স্ত্রী অথবা পুরুষের মধ্যে বেশী মাত্রায় কোন বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের সূচনা হয় বলে মনে হয় না। মানুষ এবং পরীক্ষাগারে রক্ষিত

প্রাণীদের মধ্যে পুরাতন অর্বুদ বিভিন্ন মাত্রায় হর্মোনের উপর নির্ভরশীল বলে দেখা গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বেশ পরিণত স্তন-ক্যান্সার-যুক্ত কয়েকটি নারীর ডিম্বাশয় (Ovary) অপসারণ করে অথবা যে সব পুরুষের প্রোস্টেটিক ক্যান্সার (Prostatic cancer) আছে, তাদের অণ্ডকোষ অপসারণ করে দেখা যায়, প্রায়ই অর্বুদগুলি সাময়িকভাবে কমে আসে।

(চ) পুষ্টি—পুষ্টি ক্যান্সারের অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। শিকাগোর জনৈক গবেষক দেখিয়েছেন যে, ইঁদুরের খাদ্যের এক তৃতীয়াংশ বাতিল করে (যে পর্যায়ে এরা তেমন স্থূলকায় না হলেও বেশ স্বাস্থ্যবান থাকে) স্তনের ক্যান্সার শতকরা ৫০ ভাগ কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছিল। যাহোক, বিভিন্ন রকম খাদ্যাবস্থায় এমন কি, উপবাসেও ক্যান্সার অগ্রগতি প্রাপ্ত হয়।

ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং লবণসমূহের দ্বারা প্রাণীদেহের কয়েকটি বিশেষ রকমের ক্যান্সারের বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কিন্তু ইঁদুরের দেহে অন্য কয়েক প্রকারের পরীক্ষামূলক অর্বুদের বিরুদ্ধে ভিটামিন যে রক্ষাকবচের কাজ করে, সেটা প্রদর্শিত হয় নি।

কতকগুলি ক্ষেত্রে ভিটামিন, খনিজদ্রব্য ও লবণসমূহ ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে, কিন্তু সর্ব-জাতীয় রোগে এগুলি যে রক্ষাকবচরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে, তার কোন প্রমাণ নেই।

কোষ বিষয়ক গবেষণা

উচ্চতর পর্যায়ের প্রাণী, যারা যৌনসংযোগের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে, পুরুষ ও স্ত্রী প্রজনন কোষের মিলনে তার সূত্রপাত হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই মিলনের ফলে এক পূর্ণাঙ্গ অবয়বের সৃষ্টি হয়, যাতে থাকে কোটি কোটি কোষ। প্রত্যেকটি কোষ, সেই ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয়তা বজায় রেখে চললেও সেগুলি মস্তিষ্ক, যকৃৎ এবং ত্বক-উৎপাদনকারী তন্তুসমূহের মত পৃথক হতে পারে।

আঘাতের ফলে কিছু কোষ বিনষ্ট হলে উদ্বৃত্ত কোষগুলি সংযোজনের জন্যে বিভাজিত হয়ে সেই ক্ষতি পূরণ করে। যদি ক্ষতির পরিমাণ খুব বেশী হয় অথবা এমন সব কোষ উদ্বৃত্ত থাকে, যেগুলি বিভাজনে অক্ষম, তাহলে বিশেষ ধরণের সংযোগ রক্ষাকারী তন্তু-কোষগুলি তাদের মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে। একটি নিষিক্ত ডিম থেকে উদ্ভূত জীবের ক্রমবিকাশ এবং ক্ষত নিরাময়ের প্রক্রিয়া—এই উভয় ক্ষেত্রেই অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোষগুলি "জানে"—কখন তাদের বিভাজন-ক্রিয়া থামিয়ে ফেলতে হবে। এই নিয়মানুগ প্রকৃতির বৃদ্ধির ব্যাপারেই স্বাভাবিক কোষ ও ক্যান্সার কোষের পার্থক্য বোঝা যায়।

দীর্ঘ সময়ের প্রাথমিক অনুশীলনের ফলে জীবন্ত কোষের গঠন, সংশ্লেষণ (Synthesis) ও ক্রিয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এরূপ কিছু অনুশীলনলব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে জানা গেছে যে, কোষের কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত নিরেট নিউ-ক্লিয়াসের চতুর্দিক ঘিরে রয়েছে বহু কণিকা সমন্বিত তরল সাইটোপ্লাজম (Cytoplasm)। এই ক্ষুদ্র কণিকাগুলিকে বলা হয়, রাইবোসোম (Ribosome)। সম্পূর্ণ সাইটোপ্লাজম জিনিষটি

কোষের সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে ঘেরা। নিউক্লিয়াসে রয়েছে ক্রোমোসোম (Chromosome), ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিডের (Deoxyribonucleic acid) শক্তভাবে জড়ানো দুই স্তর অণুর সূত্র—সংক্ষেপে যাদের ডি. এন. এ. বলা হয়।

কোষসমূহের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচালক হিসেবে ক্রোমোসোমের ডি. এন. এ. অপর অ্যামিনো অ্যাসিড সমাবেশ করে' এনজাইমের মত ক্রিয়াশীল প্রোটিনে পরিণত করে।

ক্যান্সার প্রতিষেধক

এপর্যন্ত ক্যান্সারের প্রাথমিক বা পূর্ববর্তী অবস্থার অনুসন্ধানই প্রধান কাজ ছিল। কিন্তু পেশাগত আপৎ, অভ্যাসাদি, খাদ্য এবং বহুবিধ
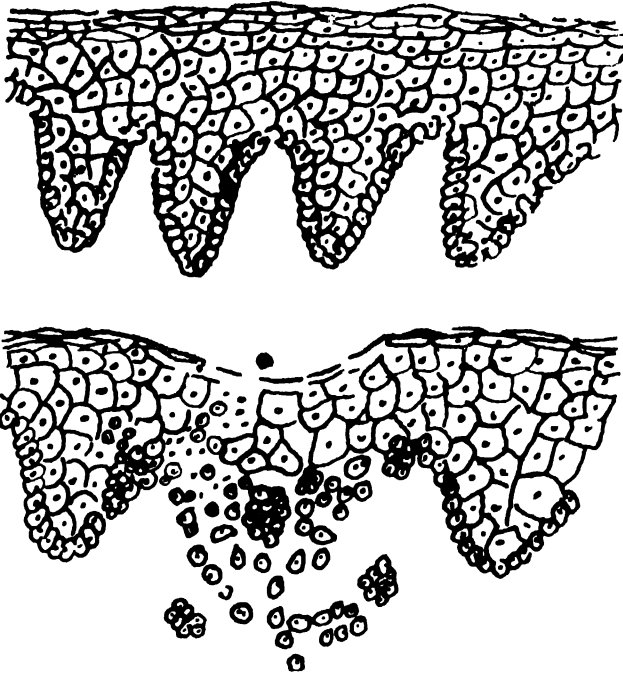
উপরের ছবি: সাধারণ তন্তু নিয়মানুবর্তী—কোথাও বিভাজন-প্রথার গোলমাল দেখা যায় না
নীচের ছবি: ক্যান্সার তন্তু—এলোমেলোভাবে তন্তুর বিভাজন দেখা যাচ্ছে।
(Dr. J. C. Paymaster-এর পুস্তিকা থেকে ছবিটি গৃহীত)

দুটি মূল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে: এগুলি আর. এন. এ—নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের এক সূত্র বিশিষ্ট ভিন্ন প্রকৃতির অণু। নিউক্লিয়াসে ডি. এন. এ-র প্রতিচ্ছবির মত আর. এন. এ. অণুগুলির মধ্যে গঠিত হয়। এগুলি তারপর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য আর. এন. এ. অণুর সহায়তায় কোষ গঠনোপযোগী

পারিপার্শ্বিক ব্যাপার—যার ফলে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পায়, তৎসংক্রান্ত নতুন জ্ঞান ক্যান্সার নিয়ন্ত্রণে আশাপূর্ণ যুগের উন্মেষ করেছে। অনেক ক্ষেত্রেই এই সব কারণগুলি কিরূপভাবে অংশগ্রহণ করে, মহামারী বিষয়ক অনুশীলনের ফলে তা জানা যাচ্ছে। ভারত, সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং পাকিস্থানের যে সব এলাকায় পান ও তামাক

চিবানোর অভ্যাসের মাত্রাধিক্য রয়েছে, সেখানেই মুখবিবর ও কণ্ঠনালীতে ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার গণতন্ত্রে নাস (Nass) চিবানোর অভ্যাস প্রবল, নাস রক্ষণস্থলে প্রায়ই ক্যান্সার উৎপন্ন হয়ে থাকে। অন্ধ্রের "চুট্ট ক্যান্সার", কাশ্মীরের "কাংগরি ক্যান্সার" এবং মহারাষ্ট্রের "ধুতি ক্যান্সারে"র জন্যে সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত অভ্যাসই দায়ী।

ইদানীং খাদ্যে ক্যান্সার-সঞ্চারকারী উপাদানের উপর দৃষ্টি রাখবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। খাদ্য ও ক্যান্সারের সম্পর্ক জানা যাচ্ছে; যেমন—যে সব এলাকায় খাদ্যে আয়োডিনের মাত্রা কম, সেখানে থাইরয়েড ক্যান্সারের আধিক্য দেখা যায়, পরিণতি হয় গলগণ্ডে (Nodular goitre) অতিরিক্ত মাত্রায় লঙ্কা খেলে নাকি মুখগহ্বরে এক প্রাক-ক্যান্সার অবস্থার সৃষ্টি হয় (Submucous fibrosis)। ইদানীং দেখানো হয়েছে যে, Cycad nut-এর খাদ্যের দরুণ ইঁদুরের যকৃতে অর্বুদ গড়ে ওঠে। গুয়াম এবং অন্যান্য অঞ্চলে এই জাতীয় বাদাম প্রধান খাদ্য। খাদ্য সামগ্রীর উপরে আপনা থেকে গড়ে ওঠা ছত্রাক ও জীবাণু পারিপার্শ্বিক কার্সিনোজেনের অন্যতম উৎস হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাম্প্রতিক গবেষণার প্রকাশ যে, ভিজা শস্য ও বাদামের উপর জাত সাধারণ ছত্রাক Aflatoxin নামে এক প্রকার যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। হাঁস, মুরগী—বিশেষ করে তাদের বাচ্চা বা টার্কির ছানার যকৃতের পক্ষে এই যৌগিক পদার্থটি অতিমাত্রায় ক্ষতিকর। ইঁদুরকে খাওয়ালে এই পদার্থটি তাদের যকৃতে ক্যান্সার উৎপন্ন করে। অবশ্য কোন্‌টা ক্যান্সার উৎপাদন করবে বা কোন্‌টা করবে না, তা স্থিরীকৃত হয় প্রাণীদেহে পরীক্ষার ভিত্তিতে। লেবরেটরীতে প্রাণীদের উপর পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞানীরা মানুষের উপর প্রয়োগের ক্ষেত্রে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন।

ক্যানাডার ক্যান্সার সমিতির তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, ৭০% ক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। ক্যান্সারের প্রকৃত কারণ জানা না থাকলে প্রাথমিক লক্ষণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানই হলো সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ পন্থা। প্রতিরোধ তিন উপায়ে কার্যকরী করা যায়—(১) নয়টি সতর্কতা-মূলক লক্ষণের যে কোন একটির আবির্ভাবের উপর সর্বদা নজর রাখা; (২) স্ক্রিনিং টেষ্ট—যেমন জরায়ুর মুখ থেকে সংগৃহীত পদার্থ, যা স্ত্রীলোকের জরায়ু-মুখের ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশ পাবার আগেই ধরে দিতে পারে। তাছাড়া, (৩) ক্যান্সার উৎপত্তির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে, এমন সব পারিপার্শ্বিক বিকিরণ, খনিজ দ্রব্যের গুঁড়া, কতিপয় পেশাগত আপৎ ও সিগারেটের ধূমপান পরিহার করা।

ক্যান্সার চিকিৎসা

প্রাচীন কালে ক্যান্সার আক্রান্ত অংশগুলিকে উত্তপ্ত লৌহশলাকার দ্বারা বা গরম তেল ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হতো। উনবিংশ শতক পর্যন্ত সাধারণভাবে এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে, ক্যান্সার কখনও সারে না। ষাট বছর আগেও কোন ক্যান্সার রোগীর প্রাণ বাঁচাবার সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। বিগত ২৫ বছরে প্রতি চার জনের মধ্যে ১ জন রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হচ্ছে। এমন কি, ভারতে আধুনিক চিকিৎসার বিশেষ অভাব থাকা সত্ত্বেও প্রতি ৩ জন রোগীর মধ্যে এক জনকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের অনেকের বিশ্বাস, যদি সব রকমের ক্যান্সার পূর্বাহ্নে ধরা পড়ে, তবে প্রতি ২জন রোগীর মধ্যে এক-জনকে বাঁচিয়ে তুলে এই হারের উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

ক্যান্সারের সাফল্যজনক চিকিৎসায় দুটি প্রামাণ্য পদ্ধতি রয়েছে—অস্ত্রোপচার (Surgery)

ও বিকিরণ (Radiation)। অস্ত্রোপচারে শল্য-চিকিৎসকের ছুরি দিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত ও সম্ভাব্য আক্রমণের স্থলগুলিকে কেটে বের করে দেওয়া। প্রায় ১৮০০ বছর আগে মিশরীয় চিকিৎসক লিউনিডেস নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ক্যান্সারাত্মক সমস্ত অংশকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করে দিতে হবে। সেই বহু পুরাতন প্রথা শল্যচিকিৎসায় আজও অনুসরণ করা হচ্ছে। আধুনিক শল্যবিজ্ঞানের পদ্ধতিসমূহের মধ্যে Anaesthesiology, Prosthesis, Blood-transfusion এবং Antibiotics প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফুস্‌ফুস, মস্তক ও গলদেশের ক্যান্সারের অস্ত্রোপচারে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস পাম্প, কৃত্রিম কিড্‌নি, অস্থি-সংস্থাপন প্রভৃতি নতুন পদ্ধতি অদূর ভবিষ্যতে ভারতেও শল্যচিকিৎসায় অগ্রগতি এনে দেবে। আভ্যন্তরীণ ক্যান্সারাক্রান্ত কয়েক শত রোগীকে আজকাল প্রতি বছরে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে, কয়েক বছর পূর্বেও যেখানে কোন আশাই দেওয়া যেতো না।

এক্স রশ্মি, রেডিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যথা—কোবাল্ট, সিজিয়াম প্রভৃতি থেকে উদ্ভূত রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সারাত্মক কোষসমূহের বিনাশসাধনই বিকিরণ চিকিৎসা। পৃথিবীর সর্বত্র আধুনিক বিকিরণ-যন্ত্রপাতি কর্মরত থেকে শরীরের কয়েকটি অংশের ক্যান্সার দূরীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করছে।

অতি আধুনিক কাল থেকে ঔষধ ও হর্মোনের সাহায্যে ক্যান্সার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছে। যে সব রোগীর দেহের দূরবর্তী অংশে ক্যান্সার বিস্তার লাভ করেছে অথবা যারা লিউকেমিয়া জাতীয় সাধারণ আকারের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার বা বিকিরণ চিকিৎসা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য লাভ করে না। সমস্যার সমাধান হলো, রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের প্রয়োগ—বিশেষ বিশেষ ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করে অথবা দেহে এমন শক্তির সঞ্চার করে, যাতে এই রকমের কোষগুলি আর ক্ষতিকারক থাকে না। যদিও এই পদ্ধতিতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি, তবুও ২০ বছরের অপেক্ষাকৃত নতুন এই পদ্ধতি অনেক রোগীর আয়ু বৃদ্ধি করেছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে যাতনার উপশম ও ক্যান্সার-অর্বুদের বৃদ্ধিজনিত অস্বস্তির লাঘব করেছে।

ক্যান্সারের চিকিৎসায় নবযুগের প্রবর্তন—অ্যান্টিক্যান্সার ঔষধাদির সন্ধান

ঔষধের সাহায্যে ক্যান্সারের চিকিৎসায় দুটি আবিষ্কার অভিনব আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঘটনাচক্রে দেখা গেল, Sulfur mustard নামে একটা শক্তিশালী বিষাক্ত গ্যাস লিম্ফ্যাটিক সিষ্টেম ও হাড়ের মজ্জার ক্ষতিসাধন করেছে। ভেষজ-বিজ্ঞানীরা সাবধানে লিম্ফ্যাটিক সিষ্টেমের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের Nitrogen mustard নামে অনুরূপ একটি পদার্থ প্রয়োগ করতে লাগলেন। লিউকেমিয়া, লিম্ফোসারকোমা (Leukemia, Lymphosarcoma) এবং হজ্‌কিন্‌স্ ডিজিজে (Hodgkin's disease) অনেক রোগীর মধ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে সাময়িক উপশম দেখা দিল। Antimetabolites শ্রেণীর ক্রিয়াবিহীন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কোষসমূহের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানের ফলে অপর আবিষ্ক্রিয়াটি সম্ভব হয়েছিল। এই ধরণের প্রথম যৌগিক পদার্থগুলি, যাদের নাম Antifolic acids তীব্র লিউকেমিকায় আক্রান্ত শিশুদের পক্ষে উপকারী বলে দেখা গেল। মনে হয়, ক্রিয়াবিহীন ফোলিক অ্যাসিডের গোষ্ঠীবর্গ স্বাভাবিক কোষ অপেক্ষা লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত কোষগুলির উপর অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।

ক্যান্সার প্রতিষেধক অভিনব ও অমোঘ শক্তিশালী ঔষধসমূহ উদ্ভাবনে এই সকল প্রচেষ্টা এই ভাবে প্রেরণা জুগিয়েছে। ১৯৫৫ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ক্যান্সার সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় সরকার সমর্থিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি সহযোগে ক্যান্সার বিতাড়ন ও চিকিৎসার একটি জাতীয় কর্মসূচীর বন্দোবস্ত করা হয়। বৃটিশ কর্মীরা একই সময়ে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন এবং বর্তমানে জার্মেনি, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও জাপান সহ বহু দেশে রাসায়নিক ঔষধাদির দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা ও গবেষণার বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ক্যান্সার নিবারণের গবেষণায় বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত জটিল পরীক্ষা জড়িত রয়েছে। এগুলিকে চারটি প্রধান ধাপে বিভক্ত করা যায়—(১) পরীক্ষণোপযোগী রাসায়নিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নির্বাচন, (২) জীবদেহের অর্বুদে ঐ সব জিনিষ দিয়ে পরীক্ষা চালানো, (৩) ঔষধের মাত্রা নির্ধারণ, কোন দুর্লক্ষণের প্রকাশ নিরীক্ষণ এবং (৪) ঔষধগুলির রোগ-নিবারণাত্মক মূল্য নির্ধারণ। এই রকমের জিনিষ শুধু রাসায়নিক দ্রব্যের ভিতরই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক্সও কিছুটা ক্যান্সার-বিরোধী হতে দেখা গেছে। Vinca rosea, Podophyllum emodi প্রভৃতি কয়েকটি উদ্ভিজ্জাত দ্রব্যে ক্যান্সার-বিরোধী গুণ আরোপিত হয়। ভারত, চীন, দক্ষিণ আমেরিকা, মিশর, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলির লৌকিক কাহিনীতে ক্যান্সার প্রতিরোধক তথাকথিত অনেকগুলি প্রখ্যাত ভেষজের উল্লেখ রয়েছে।

নিম্নোক্ত চার শ্রেণীর রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সারের চিকিৎসার উপযোগী:

(১) অ্যান্টিমেটাবোলাইট—অর্বুদের কোষগুলির বৈশিষ্ট্য হলো কোষ বিভাজনের (Mitosis) তৎপরতা এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো এই রকমের বৃদ্ধি রোধ করা। এই কাজের এক রকম উপায় হলো, মধ্যবর্তী মেটাবলিজমের পরিবর্তন সাধন করা, যা কোষগুলির বৃদ্ধি ও বিভাজনের জন্যে দায়ী। প্রাণরসায়নের দৌলতে বিভাজন সম্পর্কিত কিছু কিছু জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকাংশ অ্যান্টিমেটাবোলাইটের প্রধান লক্ষ্য হলো ডি এন.এ. (ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড)। অনেক অ্যান্টিমেটাবোলাইটের ক্ষেত্রে ডি. এন. এ. ও আর. এন. এ. (রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড) উভয়েরই পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।

(২) অ্যালকাইলেটিং দ্রব্যাদি (Alkylating Agents): এক্স রশ্মির বিকিরণের মতই লিউকেমিয়া বিরোধী নাইট্রোজেন মাস্টার্ড দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিকারী কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্যান্যের মধ্যে প্রখ্যাত বৃটিশ অর্বুদ-বিশেষজ্ঞ হ্যাডো (Haddow) দেখিয়েছেন যে, অ্যালকাইলেটিং দ্রব্যাদি অনেকাংশে এক্স রশ্মির অনুরূপ ক্রিয়া করে থাকে। ললি ও ওয়ালিক বলেছেন—গুয়ানাইলিক অ্যাসিডের এক বিশেষ বিন্দুতে অ্যালকাইলেশন ঘটে এবং প্রতিক্রিয়াজনিত পদার্থগুলিও তাঁরা সনাক্ত করেছেন। হেম্ গুয়ানাইলিক অ্যাসিডের গঠনভঙ্গীর উপর এক্স-বিকিরণের ফলে অনুরূপ দ্রব্যাদির যে বর্ণনা দিয়েছেন, হ্যাডো তাঁর (হেম্-এর) নিজস্ব পরীক্ষালব্ধ ফলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

(৩) অ্যাক্টিনোমাইসিন (Actinomycins): এই জাতীয় ঔষধগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিকাশ লাভ করেছে। অ্যাক্টিনোমাইসিন-ডি (যার প্রাথমিক পরীক্ষা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে) নিরেট অর্বুদে কিছুটা সাড়া দেয়, পক্ষান্তরে অ্যাক্টিনোমাইসিন-সি লিম্ফোমার (Lymphomas) বিরুদ্ধে কাজ করে। এদের ক্রিয়া-পদ্ধতি

পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি, তবে মনে হয় প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের (Pantothenic acid) বিরুদ্ধাচরণ করে। লিউকেমিয়া এবং লিম্ফোমা পর্যায়ের ব্যাধির বিরুদ্ধে এদের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আরো গবেষণা না চলা পর্যন্ত কিছু বলা যায় না।

(৪) উদ্ভিজ্জ পদার্থ: ক্যান্সার নিরোধক ভেষজের জন্যে আমেরিকান ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে এপর্যন্ত প্রায় ১৫০০০ উদ্ভিজ্জ পদার্থ বা উদ্ভিদনির্যাস পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত: ৪৫টি ভেষজের মধ্যে ক্যান্সারের নাশক ক্ষমতা দেখা গেছে। পডোফাইলাম, কলচিকাম, পেরিউইঙ্কল প্রভৃতি ভেষজগুলি বিভিন্ন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে কার্যকরী। ভেলবান (Velban)নামক পদার্থটি কোন কোন ক্যান্সার নিরাময়ে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(৫) অ্যাড্রিন্যাল স্টেরয়েড (Adrenal steroids): Neoplasia শ্রেণীর ব্যাধিতে প্রভাববিস্তারকারী দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রথম হলো স্টেরয়েড হর্মোন। এই জাতীয় ঔষধের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে ক্যান্সার চিকিৎসার বর্ণনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। গুরুতর লিম্ফেটিক লিউকেমিয়া শ্রেণীর ব্যাধিতে একক অথবা যুক্তভাবে স্টেরয়েডগুলি এখনও কার্যক্ষম বলে পরিগণিত হয়। এই পদার্থটি শিশু রোগী সমেত Lymphosarcoma রোগে আক্রান্ত অন্যান্য রোগীদের এবং যে সব রোগী Reticulum cell sarcoma রোগে ভুগছে, তাদের পক্ষে হিতকর।

ক্যান্সার নিবারণে রাসায়নিক ঔষধাদির ভবিষ্যৎ

কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সার, যেমন—Myelomatosis, Lymphatic leukaemia প্রভৃতিতে এই পদ্ধতিতে রোগীর আয়ু পাঁচ বছর বা আরও বেশী হতে পারে। অন্যান্য ক্যান্সারে, যথা—Leukemia, Polycythemia rubra vera, Multiple myeloma এবং Chorionepithelioma-তে ঔষধই একমাত্র চিকিৎসার উপায়। লিম্ফোমা, হজ্‌কিন্‌স্‌ ডিজিজ, রেটিনোব্লাষ্টোমা প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর ক্যান্সারে এই ঔষধগুলি অন্যান্য চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সারের অগ্রগতির সময় যখন অন্য কোন চিকিৎসা-পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় না অথবা যে সব ক্ষেত্রে অন্য চিকিৎসা-পদ্ধতি চালিয়ে সুফল পাওয়া যায় নি, তখন ঔষধই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

সুফল লাভের আশায় ক্যান্সার-বিরোধী বিভিন্ন ঔষধ সচরাচর যুক্তভাবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা হচ্ছে—সম্প্রতি Freireich আমেরিকায় কঠিন লিউকেমিয়া রোগীকে যে ঔষধ দিচ্ছেন, তা হলো Vincristine, Aminopterin, 6-Mercaptopurine ও Prednisone—এই চারটি ঔষধের সমন্বয়কে সংক্ষেপে VAMP বলা হয়েছে। উক্ত ঔষধ কয়টি পৃথক পৃথকভাবে দেবার চেয়ে এইভাবে এক সঙ্গে দিলে অধিকতর কার্যকরী হয়। আমেরিকার Cancer Chemotherapy National Service Centre-এর Leukemia Chemotherapy Co-operative Study Group সম্প্রতি ৬০ জন রোগীকে ত্রিধা চিকিৎসার বিবরণ দিয়েছেন—তাদের Chlorambucil এবং Methotrexate খাওয়াবার সঙ্গে সঙ্গে Actinomycin-D শিরায় ইনজেকসন দেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি ক্ষেত্রে রোগী ২২ মাসের বেশী সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সেরে উঠে। কঠিন Granulocytic Leukemia-6-Mercaptopurine ও Methylgyoxal bis (Guanylhydrazone) যুক্তভাবে প্রয়োগ করে খুব ভাল ফল পাওয়া গেছে এবং অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে আংশিক সুফলও দেখা গিয়েছিল।

আবার অন্য রকম যুক্তভাবেও চিকিৎসা চলছে—চিকিৎসার সঙ্গে বিকিরণ, সঙ্গে শল্য-চিকিৎসা অথবা রাসায়নিক চিকিৎসার সঙ্গে বিকিরণ চিকিৎসা। এথেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, একক চিকিৎসার চেয়ে যুক্তভাবে চিকিৎসায় অধিক সংখ্যক রোগী সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। আধুনিক কালে আরও কয়েকটি পদ্ধতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এদের নাম Intrapleural ও Intraperitoneal infusion, Regional perfusion এবং Intra-arterial infusion ইত্যাদি। এই পদ্ধতির দ্বারা ক্যান্সার দমনকারী ঔষধাদি যেখানে অর্বুদ বর্তমান, তারই নিকটে শিরার ভিতর ঔষধ প্রবেশ করানো। এই ভাবে সাধারণ শরীরের ক্ষতিসাধিত হয় না—অথচ অর্বুদের নাশ শীঘ্র সম্পন্ন করা যায়। বিশেষ দ্রষ্টব্যের বিষয় এই যে, ভাল রকমে অক্সিজেনযুক্ত হলে অথবা শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা অপেক্ষা বেশী তাপমাত্রায় ক্যান্সার তন্তু অধিকতর সংবেদনশীল। এই জন্যে এক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ক্যান্সার তন্তুতে অতিমাত্রায় অক্সিজেন চালিয়ে দেখা হচ্ছে। অপর পক্ষে কৃত্রিম উপায়ে উচ্চ তাপ প্রয়োগ অথবা নিউট্রন রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার চিকিৎসার চেষ্টা চলছে। এছাড়া রাসায়নিক ও বিকিরণ-পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে এখন আল্ট্রাসোনিক (Ultrasonic) ও লেসারের (Laser) গবেষণাও চলেছে।

উপসংহার

ক্যান্সার গবেষণায় দ্বিমুখী অভিযান চালিত হয়—রোগ প্রতিরোধের চেষ্টা এবং তার ঔষধ নির্ধারণ করা। ক্যান্সার সূচনাকারী হিসেবে ভাইরাসের সম্ভাব্য ভূমিকার বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অর্বুদের ভাইরাস, প্রাণী-দের ভাইরাস ও সাধারণ ভাইরাসের কৃত্রিম সীমা এখন অতীতের অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। এই ভাইরাসগুলিই হয়তো মানুষের দেহকোষগুলিকে দূষিত করে অথবা কোষগুলিতে পরিবর্তন এনে দেয়। কেউ কেউ হয়তো ক্যান্সার ও ভাইরাসের মধ্যে সোজা সম্পর্কের শেষ ধাপ দেখাতে পারবে বলে মনে হয়। যদি শীঘ্রই মানুষের ক্যান্সারে ভাইরাসের প্রাধান্য দেখানো যায়, তাহলে গুরুতর লিউকেমিয়া শ্রেণীর ক্যান্সারে ঔষধ প্রয়োগে সাফল্য প্রথমে দেখা দিতে পারে। মানুষের ক্যান্সারের জন্যে দায়ী ভাইরাসগুলি চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্সার প্রতিষেধক ভ্যাক্সিন (Vaccine) তৈরির পথ যে উন্মুক্ত হতে পারে, সেটা এখন আর স্বপ্ন নয়, বাস্তব সম্ভাবনার সমীপবর্তী।

ক্যান্সারের গবেষণা ঠিক বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে না—মানব, ভেষজ, বৈজ্ঞানিক ও বস্তুতঃ বৌদ্ধিক সমস্যার নানা বিকাশ এর মধ্যে দেখা যায়। দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্যে ব্যয়বরাদ্দের অর্থে ভেষজবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণরসায়ন এবং আনুসঙ্গিক বিজ্ঞানের অনুশীলন হওয়া প্রয়োজন; আর Chemical pathology, Pharmacology, Immunology, Virology, Cytogenetics, নিউক্লিক অ্যাসিডের কাঠামো এবং সেই সঙ্গে প্রোটিন ও হিস্টোন সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালিত হওয়া উচিত। সম্ভবতঃ এতেই ক্যান্সার সমস্যার সমাধান হবে।

চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার, কলিকাতা। 'Science and the Cancer Problem' প্রবন্ধ থেকে অনূদিত। (Medical Science and Service, July 1966, Vol. II, No. 1.)

আমার স্বপ্ন-দর্শন

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

পদার্থ-বিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছি। আমাদের অধ্যাপক ডাঃ বোস রোজই পদার্থের অণু-পরমাণু সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য এবং তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন, আর আমরা সব মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছি। অধ্যাপক এত সহজ করে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, ছাত্রদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ সঞ্চারিত হয়েছে।

সেদিন কি একটা কাজে অফিসে একটু দেরী হয়ে গেল। ক্লাসে গিয়ে দেখি, সামনের দিকে একটুও জায়গা নেই। ভাল শুনতে পারবো না ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কি করি, বাধ্য হয়ে একেবারে পিছনের বেঞ্চে গিয়ে কোন রকমে একপাশে একটু জায়গা করে নিয়ে বসলাম।

একটু পরেই অধ্যাপক ক্লাসে এসে পড়াতে সুরু করলেন। আমরা তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলাম।

আমার হাতে একটা রূপার আংটি ছিল। অন্যমনস্ক হয়ে কখন যেন সেই আংটিটা খুলে নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি, সেই সঙ্গে অধ্যাপক অণু-পরমাণু সম্পর্কে যা বলছেন, তার মর্ম উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ মনে হলো, এক মন্ত্রবলে আমার আশেপাশে সব কিছু যেন অসম্ভব রকম বড় হয়ে যাচ্ছে! দেখতে দেখতে আংটির তারটা মোটা হয়ে একটা বটগাছের গুঁড়ির মত হয়ে গেল। তারপর আরও বড় হয়ে একেবারে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেললো। উপরে, নীচে, আশেপাশে যেদিকে তাকাই, একটা সীমাহীন রূপার দেয়াল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই না।

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই বোঝলাম, আমার দেহটা অত্যন্ত হাল্কা হয়ে গেছে, আর আমি যেন শূন্যে ভেসে চলেছি। থেকে থেকে আমার গা ঘেঁসে যেন টেনিস বলের আকৃতির, কিন্তু কুয়াশার মত ধোঁয়াটে এক একটা গোলা ভীমবেগে ছুটে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, এই বুঝি একটা গোলার আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পড়লাম। কিন্তু জানি না, কি এক অদ্ভুত কায়দায় এদের আক্রমণ এড়িয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলাম।

একটু এগিয়ে যেতেই মনে হলো, রূপার দেয়ালটা যেন কেমন সজীব হয়ে উঠেছে, একটু একটু নড়ছে! আরও কাছে গিয়ে দেখলাম, রূপার দেয়ালটা নিরবচ্ছিন্ন নয়। এর মাঝে অসংখ্য মার্বেলের গুলির মত জিনিষ যেন থরে থরে সাজানো রয়েছে, আর তাদের প্রত্যেকটি নিজের নিজের জায়গায় নিরন্তর কেঁপে চলেছে। শূন্যে যেসব গোলা ছুটাছুটি করছে, এগুলিও অনেকটা তাদেরই মত।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এসবের অর্থ কি?

কি ভাবছ?

চমকে পিছন ফিরে দেখি, প্রশ্নকর্তা একজন সুসজ্জিত এবং সুদর্শন বিদেশী ভদ্রলোক। বেশ লম্বা তাই একটু রোগা দেখাচ্ছে। গায়ের রং বেশ ফর্সা। বড় বড় টানা টানা চোখ দুটি থেকে যেন এক অদ্ভুত দ্যুতি বেরুচ্ছে। আরে এঁকে তো চেনা চেনা মনে হচ্ছে! আমার বইয়ে যেন এঁর ছবি দেখেছি!

আচ্ছা, আপনি কি ইটালীয় বিজ্ঞানী অ্যাভোগ্যাড্রো?

ঠিক বলেছ। তুমি যে সমস্তায় পড়েছ, তার সমাধান করতেই আমার আবির্ভাব। আমিই সর্বপ্রথম অণুর কল্পনা করি এবং অণু ও পরমাণুর মধ্যে সম্পর্ক স্থির করি। অবশ্য এর সবটা কৃতিত্ব আমার একার নয়। ইতিপূর্বে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডাল্টন তাঁর পরমাণুবাদের সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগ সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁর পরমাণুবাদের সাহায্যে গ্যাস-আয়তন সূত্রের সঠিক ব্যাখা দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আমারই।

তুমি যে মার্বেলের মত জিনিষগুলি দেখছ, সেগুলি প্রকৃত পক্ষে রূপার এক-একটি অণু। এই অণুগুলি অনেক বেশী ঘন সন্নিবিষ্ট, অনেক বেশী স্থির, অনেক বেশী শান্ত। অপর দিকে শূন্যে টেনিস-বলের মত যে জিনিষগুলি ইতস্ততঃ ছুটে বেড়াচ্ছে, এদের কোনটি অক্সিজেনের অণু, আবার কোনটি নাইট্রোজেনের অণু। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, বায়ু একটি মিশ্রিত পদার্থ এবং তার প্রধান দুটি উপাদান হলো অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন। গ্যাসের অণু অনেক বেশী চঞ্চল। এরা ইতস্ততঃ ছুটে বেড়ায়, পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়, এবং তারই ফলে এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে।

আমি প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা, উত্তাপ দিলে যে কঠিন পদার্থ গলে তরল হয় এবং আরও উত্তাপ দিলে গ্যাসে পরিণত হয়, এর কারণ কি?

বাঃ, বেশ চমৎকার প্রশ্ন করেছ। তবে এখন যা বলবো, তা আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, নতুবা ভাল লাগবে না।

ধর, কতকগুলি খেলার মার্বেল যদি একেবারে গায়ে গায়ে সাজিয়ে রাখা যায়, তাহলে দেখবে, তাদের মধ্যে খানিকটা ফাঁক থেকে যায়। যে কোন কঠিন পদার্থের মধ্যে অণুগুলি এভাবে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায় সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো থাকে। এই অবস্থায় অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে বেশ আকর্ষণ থাকে, এর নাম আন্তরাণবিক আকর্ষণী শক্তি (Intermolecular force of attraction)। আর অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে ফাঁকটুকু থেকে যায়, তার নাম আন্তরাণবিক স্থান (Intermolecular space)। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে এই ফাঁকের মাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। তাপের প্রভাবে এই অণুগুলি কাঁপতে থাকে, কিন্তু নিজেদের মধ্যে আকর্ষণ প্রবল থাকায় এরা স্থানচ্যুত হয় না। সাধারণ অবস্থায় অণুগুলির এই শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না। কাজেই তখন কঠিন পদার্থের আকৃতি বা আয়তনে খুব বেশী পরিবর্তন হয় না।

তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে এই ফাঁকের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। তার ফলে তাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। তাই তখন অণুগুলি ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে এবং ভেসে বেড়ায়, তাদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে না। এর অণুগুলি অনেক বেশী চঞ্চল, সর্বদা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে এবং পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খায়। অণুগুলি এত ছোট যে, সাধারণভাবে তাদের গতিবিধি প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার যে ঘটতে পারে, ব্রাউন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেন। তিনি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে জলে ভাসমান ফুলের রেণু পরীক্ষা করে দেখেন, সেগুলি জলের বিভিন্ন অণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। এর নাম ব্রাউনীয় সঞ্চরণশীলতা (Browniän movement)। আর একটা কথা, তরল পদার্থে অণুগুলির মধ্যে বাঁধন খুব জোরালো নয়, কাজেই তাদের আকার ঠিক থাকে না। আর কখনও কখনও দু-চারটি অণু ছুটে গিয়ে বায়ুর সঙ্গে মিশে যায়, এর নাম বাষ্পায়ন (Vaporization)। তবে তখনও তাদের মধ্যে কিছুটা আকর্ষণ থাকে বলে অভ্যন্তর ভাগের অণুগুলির আকর্ষণে তরলের উপরিভাগ সমতল থাকে।

পাত্রের ঢাকা খুলে রাখলেও এক সঙ্গে সবগুলি অণু ছুটে পালিয়ে যেতে পারে না। এজন্যেই তরল পদার্থের আয়তন মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে, তবে তাপের প্রভাবে তা বদ্‌লে যেতে পারে। কিন্তু কঠিন পদার্থের তুলনায় তরল পদার্থের অণুগুলির মধ্যে বাঁধন অনেকটা আল্‌গা বলে এটা প্রবাহিত হতে পারে, আর পাত্রে কোন ছিদ্র থাকলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সেখান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

গ্যাসীয় পদার্থের বেলায় অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ একরূপ থাকে না বললেই চলে। কাজেই তারা প্রচণ্ডবেগে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করতে থাকে। এজন্যে তাদের কোন আকার ঠিক থাকে না এবং তাদের খোলা পাত্রে ধরে রাখাও যায় না। একটু ফাঁক পেলেই গ্যাসের অণুগুলি সেখান দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। আর একটা কথা, গ্যাসের অণুগুলির মধ্যে ফাঁক অনেক বেশী, তাই সামান্য চাপ দিলেই এই ফাঁকের মাত্রা কমে যায়, এবং তার ফলে গ্যাসের আয়তনও যায় কমে। আবার উত্তাপ দিলে অণুগুলি আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং আরও জোরে ছুটাছুটি করতে থাকে। তাই তখন হয় আয়তন বেড়ে যায়, নয়তো আয়তন ঠিক রাখলে গ্যাসের চাপ বৃদ্ধি পায়।

একটানা এতক্ষণ বক্তৃতা করবার পর অ্যাভো-গ্যাড্রো থামলেন, আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। একটু ধাতস্থ হলে বললাম—বেশ, এভাবে পদার্থের গঠন এবং অবস্থাগত পরিবর্তন সম্পর্কে যাহোক একটা ধারণা হলো। তবে অণু ও পরমাণুর মধ্যে সঠিক সম্পর্কটা যে কি, তা কিন্তু এখনও আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। তাহলে এখন এবিষয়েও একটু আলোচনা করা দরকার।

পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণা পৃথকভাবে অবস্থান করে ঐ পদার্থের নিজস্ব ধর্মগুলি প্রকাশ করতে পারে, তারই নাম অণু (Molecule)। কিন্তু অণু যদিও পদার্থের প্রতিরূপ, তবুও তা আরও ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণার সংযোগে গঠিত হয়ে থাকে। সুতরাং পদার্থের অণু থেকে প্রাপ্ত যে সব ক্ষুদ্রতম এবং অবিভাজ্য কণা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, তাদেরই পরমাণু (Atom) বলা হয়; অর্থাৎ, বস্তু হলো অণুর সমষ্টি আর প্রতিটি অণু হলো এক বা একাধিক পরমাণুর সমষ্টি।

এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, মৌলিক পদার্থের অণু একই জাতীয় পরমাণুর সংযোগে গঠিত হয়। তবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুতে পরমাণুর সংখ্যা একই রকম থাকে না। কঠিন ধাতব মৌলিক পদার্থ সোনা, রূপা, তামা, লোহা প্রভৃতি, তরল ধাতব মৌলিক পদার্থ মারকারি কিংবা গ্যাসীয় মৌলিক পদর্থ আর্গন, নিয়ন প্রভৃতি প্রকৃতিতে স্বাধীন পরমাণুরূপেই বিরাজ করে। এসব ক্ষেত্রে পরমাণুই এদের অণুও বটে। কিন্তু হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থের অণুতে দুটি করে পরমাণু থাকে। আবার ওজোনের অণুতে তিনটি এবং ফস্‌ফরাসের অণুতে চারটি পরমাণু থাকে।

অপর দিকে যৌগিক পদার্থের অণু গঠিত হয় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকার পরমাণুর সমবায়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি জলের অণুতে আছে দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু এবং একটি অক্সিজেনের পরমাণু। আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের অণুতে আছে একটি কার্বনের পরমাণু এবং দুটি অক্সিজেনের পরমাণু।

এতক্ষণ তন্ময় হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, অ্যাভোগ্যাড্রো কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানীর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনে আমার জ্ঞানস্পৃহা আরও বেড়ে গেল। আরও কাছে থেকে অণু-পরমাণুগুলির স্বরূপ

উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে অসীম কৌতূহল নিয়ে রূপার পাহাড়টার দিকে এগিয়ে চললাম।

এমন সময় হঠাৎ মাটিতে ছড়ি ঠোকবার শব্দ শুনে পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম সৌম্যদর্শন কেতাদুরস্ত এক ইংরেজ ভদ্রলোক। মুখে বড় বড় গোঁফ, অনেকটা বাংলাদেশের সার আশুতোষের মত। বোঝলাম, ইনি হলেন আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের পথিকৃৎ লর্ড রাদারফোর্ড।

গোঁফের ফাঁক দিয়ে মৃদু হেসে রাদারফোর্ড বললেন—বৎস, তোমার জ্ঞানস্পৃহা লক্ষ্য করে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি জানতে চাও, আমি বুঝতে পেরেছি। বলাবাহুল্য, পরমাণুর গঠন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা আমার জন্যেই হয়েছে। এস বৎস, আমরা পরমাণুর ভিতরটা একবার দেখে আসি। এই বলে তিনি ছড়িটি নিয়ে আমাকে একবার ছুঁয়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক মায়াবলে আমার দেহটা যেন আরও ছোট হয়ে গেল। তখন রূপার পরমাণু আমার কাছে বিশাল এক সৌরজগৎরূপে প্রতিভাত হতে লাগলো।

বৎস, তুমি যে নতুন সৌরজগৎ দেখছ তা আর কিছু নয়, একটা রূপার পরমাণুর ভিতরটা তুমি দেখতে পাচ্ছ।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ভিতরের দিকে একেবারে মাঝখানে রয়েছে খানিকটা জমাট-বাঁধা অংশ, আর তাকে কেন্দ্র করে বাইরে অনেক দূর দিয়ে বিভিন্ন বৃত্তাকার অথবা উপবৃত্তাকার পথে ক্ষুদ্রাকার কতকগুলি কণা অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে সে এক বিচিত্র ব্যাপার।

রাদারফোর্ড সম্ভবতঃ আমার বিস্ময়মুগ্ধ মনের কথা বুঝতে পারলেন। তাই বললেন—রূপার পরমাণুর গঠন বেশ জটিল, তাই না? তাহলে এসো, আমরা আগে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভিতরটা দেখে আসি। তাহলে রূপার পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারবে।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে রাদারফোর্ড বললেন—বৎস, এই দেখ হাইড্রোজেন পরমাণু। এর কেন্দ্রে আছে একটি মাত্র ধনাত্মক কণা বা প্রোটন, আর তাকে ঘিরে একটি ঋণাত্মক কণা বা ইলেকট্রন ঘুরছে অবিশ্রান্তভাবে —ঠিক যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলি নিয়ত ঘুরে বেড়ায়। এর ফলে বৈদ্যুতিক সাম্য বজায় থাকে—সাধারণভাবে সব পরমাণুই নিস্তড়িৎ।

মনে রেখো, একটি ইলেকট্রনের তুলনায় একটি প্রোটন প্রায় ১৮৩৬ গুণ ভারী। আর পরমাণুর অভ্যন্তরে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন এবং তার কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটন পরস্পরের কাছ থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে অবস্থান করে। এই দূরত্ব কতটা, তা নীচের উদাহরণ থেকে আন্দাজ করতে পারবে।

ধর, একটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রে যে প্রোটন আছে, তার আয়তন একটি মটর-বীজের আয়তনের সমান। তাহলে সেই অনুপাতে একটি ইলেকট্রনের ব্যাস হবে ত্রিশ ফুট এবং তা প্রোটন থেকে তিন শত মাইল দূরে থাকবে এবং তাকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে ঘুরবে।

অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কেন্দ্রে অবশ্য প্রোটন ছাড়াও আছে নিউট্রন কণা। এটা নিস্তড়িৎ এবং এর ওজন প্রোটনের সমান বলা যায়। এর কাজ হলো শুধু পরমাণুর ভর বাড়ানো।

অক্সিজেন পরমাণুর কথা চিন্তা কর। এর পারমাণবিক ভার ষোল, আর পারমাণবিক সংখ্যা (পর্যায়সারণী অনুযায়ী ক্রমিক সংখ্যা) আট। কাজেই এর কেন্দ্রকে আছে আটটি প্রোটন ও আটটি নিউট্রন। আর বৈদ্যুতিক সাম্য বজায় রাখবার

জন্যে এই কেন্দ্রক ঘিরে আছে আটটি ইলেকট্রন; কারণ সাধারণভাবে পরমাণু নিস্তড়িৎ অবস্থায় থাকে। মনে রেখো, পারমাণবিক সংখ্যা থেকেই কেন্দ্রকের মোট প্রোটন সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে বহির্ভাগের ইলেট্রন সংখ্যার নির্দেশ পাওয়া যায়।

এবারে রূপার পরমাণুর কথা চিন্তা কর। এর পারমাণবিক ভার ১০৮, আর পারমাণবিক সংখ্যা ৪৭। কাজেই এর কেন্দ্রে আছে ৪৭টি প্রোটন, আর ১০৮-৪৭ অর্থাৎ ৬১টি নিউট্রন, আর সেই কেন্দ্রককে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে বিচরণ করছে মোট ৪৭টি ইলেক্‌ট্রন।

আমাদের জানা সকল পরমাণুই এই নিয়মে গঠিত।

বাঃ, ভারি চমৎকার নিয়ম। আপনার কথায় পরমাণুর গঠন সম্পর্কে বেশ কিছু জানতে পারলাম—আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা প্রকৃতির নিয়মে ধনাত্মকের প্রতি ঋণাত্মক তড়িতের একটা টান রয়েছে, যার ফলে একে অন্যের মধ্যে বিলীন হতে চায়। যতটুকু অঙ্ক শিখেছি তাতে মনে হয়, একটি ইলেকট্রন যদি কেন্দ্রকের চারদিকে এভাবে ঘুরতে থাকে, তবে তার শক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকবে। আর তা যদি হয়, তবে চক্রপথের আকারও ক্রমশঃ ছোট হতে থাকবে। কাজেই একটি কুণ্ডলীর (Spiral) মত পথে অগ্রসর হয়ে শেষে তা একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনের সঙ্গে মিলিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে সেরকম হচ্ছে না কেন?

এই সমস্যার সমাধান করেছেন ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীল্‌স বোর! এই বিষয়ে তিনি কি বলেছেন, তাই এখন শোন। একথা বলতে বলতেই রাদারফোর্ড অদৃশ্য হয়ে গেলেন, আর সেখানে আবির্ভূত হলেন বোর।

তিনি বললেন—বৎস, মেকানিক্সের চিরাচরিত সূত্র এক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই ভুল হয়েছে। পরমাণু-জগতের কণাগুলি নতুন আর এক ধরণের নিয়ম মেনে চলে, যার নাম কোয়ান্টাম-সূত্র। তারই ফলে ইলেকট্রন যে কোন কক্ষপথে চলতে পারে না—বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কক্ষপথেই শুধু বিচরণ করতে পারে। কেন্দ্র থেকে এদের দূরত্ব নির্দিষ্ট। যে কোন একটি কক্ষপথে বিচরণ করবার সময় ইলেকট্রনের শক্তি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু বিভিন্ন কক্ষপথে এর শক্তির পরিমাপ বিভিন্ন। কাজেই পরমাণু যখন তেজ শোষণ করে তখন ইলেকট্রন ভিতর থেকে বাইরের কক্ষে চলে আসে, আবার যখন তেজ বিকিরণ করে তখন বাইরে থেকে ভিতরের কক্ষে চলে যায়। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে এই সঞ্চরণের মাত্রা নির্ভর করে শোষিত অথবা বিকিরিত তেজের মাত্রার উপর। অবস্থাবিশেষে এইভাবে বিকিরিত তেজই প্রকাশ পায় রঞ্জেন রশ্মিরূপে।

আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বোরের মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি একটু মৃদু হেসে বললেন—বৎস, এতেই অবাক হচ্ছো? পরমাণুর অন্তর্লোক সম্পর্কে যে আরও কত কিছু জানবার আছে, তার হিসেব নেই। অবশ্য এসম্পর্কে আজ অবধি যা কিছু জানা গেছে, তার সবটুকু কৃতিত্ব আমার একার নয়। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সমারফেল্ড এবং উইলসন আমারই প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে এই বিষয়ে আরও অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আমি একে একে সব বলছি, আরও একটু মনোযোগ দিয়ে শোন।

আগেই বলেছি, কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা তার পারমাণবিক সংখ্যার সমান। সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি ঘুরছে, তেমনি ধনাত্মক কেন্দ্রের চারদিকে এই ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণাগুলিও অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রহগুলি যেমন বিভিন্ন কক্ষে বিন্যস্ত রয়েছে, ইলেকট্রনগুলিও তেমনি বিভিন্ন খোসায় বা স্তরে (Shell) বিন্যস্ত

রয়েছে। এই স্তরগুলি K, L, M, N, O এবং P এই অক্ষরগুলির দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

আর একটা কথা। প্রত্যেকটি ইলেকট্রনের 'স্পিন' আছে—বুঝলে? আচ্ছা একটা উপমা দিচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ যে, একটি লাট্টু নিজের পেরেকের উপর পাক খায়, আর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়েও যায়। ধরা যাক, একটা ইলেকট্রন তেমনি ক্রমাগত পাক খাচ্ছে আর সেই সঙ্গে নিজের কক্ষপথে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে মনে রেখো, এক-একটি স্তরে কতগুলি করে ইলেকট্রন থাকতে পারে, তার সংখ্যা একেবারে নির্দিষ্ট। যেমন ধর, কোন স্তরের ক্রমিক সংখ্যা এক, তাহলে সেই স্তরে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে দুই ($2 \times n^2$, অর্থাৎ $2 \times 1^2 = 2$)। তেমনি ক্রমিক সংখ্যা দুই হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে আট, আবার ক্রমিক সংখ্যা তিন হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে আঠারো—ইত্যাদি।

কি বিচিত্র এই পরমাণু-জগৎ! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম। কিন্তু সমস্যার তো শেষ নেই! মনে হলো, এতগুলি ইলেকট্রন বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কক্ষপথে বিচরণ করছে, কিন্তু কই, তাদের মধ্যে তো ঠোকাঠুকি হয় না! সবগুলি ইলেকট্রন তো কখনও একই স্তরে এসে ভিড় করে না! কি ভাবে তারা এত নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলছে? কি করে তারা এমন শান্তি বজায় রেখে চলেছে?

এসব কথা ভাবছিলাম—কতক্ষণ, তা খেয়াল ছিল না। হঠাৎ চেয়ে দেখি সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আলখাল্লাধারী ভারিক্কি চেহারার এক সন্ন্যাসী। চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—মহাশয়, আপনি কে?

আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ফাদার পাওলি। পরমাণু-জগতে যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখা যায়, সেটা দেখাই হলো আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। এজন্যে আমি নিয়ম করে দিয়েছি যে, কোন একটি কক্ষে দুটির বেশী ইলেকট্রন থাকতে পারবে না। আর দুটি ইলেকট্রন থাকলেও তাদের একটি হবে পুরুষ, অন্যটি প্রকৃতি; অর্থাৎ একটির 'স্পিন' যেদিকে হবে, অন্যটির 'স্পিন' হবে ঠিক তার উল্টো দিকে। এখানে তৃতীয় কারও স্থান নেই। তুমি নিশ্চয়ই জান, মানুষের সংসারেও এই নিয়ম মানতে হয়, তবেই শান্তি বজায় থাকে। সেখানেও তৃতীয় কারও আবির্ভাব হলেই বিপর্যয় ঘটে।

বাঃ, এই নিয়মটা তো ভারি মজার—বিস্ময়ে আনন্দে চীৎকার করে ওঠলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, আমি যেন শূন্যে ছুটে চলেছি তীরবেগে। আরে, ব্যাপার কি? আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, এই শূন্য-অভিযানে আমি একলা নই। ধোঁয়াটে অস্পষ্ট চেহারার আরও অনেকেই ছুটে চলেছে। আসলে আমরা সকলেই কেন্দ্রে অবস্থিত গোলাকার একটা ভারী বস্তুর চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছি। আরে, একি? মহাকাশচারীরা রকেটে করে মহাশূন্যে উঠে যে রকম পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, আমরাও সেই রকম মহাকাশচারী হয়ে গেলাম নাকি?

বিস্ময়ের ঘোর কাটলে লক্ষ্য করে দেখি, বিভিন্ন কক্ষপথে ওরা সব জোড়ায় জোড়ায় চক্রাকারে ঘুরছে, আমি শুধু একলা। মনে হচ্ছে, ওরা সবাই যেন নাগরদোলায় পরস্পরকে ধরবার জন্যে মরণ-বাঁচন পণ করে একে অপরকে অনুসরণ করে ছুটছে, কিন্তু কেউ কাউকে ছুঁতে পারছে না। কি মজার খেলা! কিন্তু আমার কোন সাথী না থাকায় আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। একজন সাথী পাবার উদগ্র কামনায় আমার মনটা আঁকুপাঁকু করে

উঠলো। মনে হলো, এখন এখানে মিনতি থাকলে বেশ হতো।

এখানে বলে রাখা দরকার, আমাদের ক্লাসের মিনতির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। মিনতিরও যে আমার প্রতি টান না আছে, তা নয়। তবে সে একটু ভীরু প্রকৃতির। কতদিন একসঙ্গে সিনেমায় যেতে চেয়েছি, কিন্তু বাবা-মার ভয়ে ও সব সময় এড়িয়ে গেছে।

হঠাৎ চোখ মেলে দেখি, কে একজন খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছে। ডেকে বললাম—তোমরা সবাই তো বেশ জোড়ায় জোড়ায় ঘুরছ—একমাত্র আমারই কোন সাথী নেই কেন?

সে উত্তর দিল—জান না বুঝি, তুমিও যেমন আমরাও তেমনি এক-একটি ইলেকট্রন বনে গেছি, আর সোডিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা বিজোড়, আর তুমি রয়েছ সবচেয়ে বাইরের কক্ষে। তাইতো তোমার কোন সাথী নেই। তবে আমাদের মধ্যে তুমিই হলে সবচেয়ে কুলীন। কারণ, আমাদের এই পরমাণু যে যোজ্যতা (Valency) প্রকাশ করে, সে তো তোমার জন্যেই সম্ভব হয়।

কথাটা শুনে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠলো। এই নিরানন্দ অবস্থার মাঝে তবুও যা হোক একটু সান্ত্বনা পেলাম।

এই সময় ফাদার পাওলি আবার সেখানে আবির্ভূত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হে, কেমন লাগছে?

এমন শূন্যপথে ভেসে বেড়াতে বেশ ভালই লাগছে। কিন্তু ওদের সবারই সাথী আছে, কেবল আমারই নেই—একথা ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

তোমার জন্যে আমি দুঃখিত। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। যতক্ষণ তুমি সোডিয়াম কেন্দ্রককে আশ্রয় করে থাকবে, ততক্ষণ তোমাকে এমন একলাই কাটাতে হবে। আচ্ছা দেখি, তোমার জন্যে কোন সাথী জোটাতে পারি কিনা।

আমি আশায় বুক বেঁধে আবার ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু এমন নিঃসঙ্গ জীবন কারই বা ভাল লাগে? আমার এই কক্ষ-পরিক্রমা নিরানন্দ খাটুনির মত মনে হতে লাগলো।

ফাদার পাওলি এতক্ষণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই ভেসে চলছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন—তোমার বরাত ভাল, এখনি হয়তো তোমাকে একটি সাথী জুটিয়ে দিতে পারবো। ঐ দেখ, আর একটা সৌরজগতের মত কি যেন এদিকে ভেসে আসছে। মনে হচ্ছে, ওটা একটা ক্লোরিনের পরমাণু। আশা করি এখানেই তুমি তোমার মনের মত সাথী খুঁজে পাবে।

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো! ওখানেও আমাদের মতই অনেকগুলি অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে! ক্লোরিনের পরমাণুটি যত এগিয়ে আসতে লাগলো, ছায়া-মূর্তিগুলি ততই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে লাগলো!

আরে—কি আশ্চর্য! এ যে মিনতি! সবচেয়ে বাইরের কক্ষে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে দেখেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে মরণ-বাঁচন পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ক্লোরিনের দিকে।

সাঁই সাঁই করে ছুটে গিয়ে বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে লাগলাম। মিনতি যে কক্ষে রয়েছে, ঠিক সেই কক্ষপথে। কিন্তু আমি যতই মিনতির কাছে যাবার চেষ্টা করি, ও ততই দূরে সরে যায়। সে যে কেবলই দৃষ্টি এড়ায়, পালিয়ে বেড়ায়! এ এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তবুও যা হোক, এতক্ষণে আমার একক নিঃসঙ্গ

জীবনের অবসান হলো। মনের আনন্দে মিনতিকে অনুসরণ করবার এই মজার খেলায় মেতে গেলাম।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেল, জানি না। হঠাৎ চেয়ে দেখি, সোডিয়ামের পরমাণুটা ক্লোরিনের সঙ্গে যেন আঠার মত লেগে রয়েছে। আরে, আমাকে কি আমার পুরনো কক্ষপথে ফিরে যেতে হবে নাকি? রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম।

সম্ভবতঃ আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই ফাদার পাওলি বললেন—না, বৎস! তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তোমাকে আর ফিরে যেতে হবে না। তবে কি হয়েছে জান? তুমি ওখান থেকে এখানে চলে আসাতে ক্লোরিনের সবগুলি কক্ষ এখন পূর্ণতা লাভ করেছে, অপর দিকে তোমাকে হারাবার ফলে তোমাকে নিয়ে এতক্ষণ যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তারও সমাধান হয়েছে; অর্থাৎ এখন প্রত্যেকেরই ইলেকট্রন-অষ্টক পূর্ণ হয়েছে। কারও কোন ইলেকট্রনই এখন আর একলা নেই। এটাই নিয়ম।

কিন্তু এর ফলে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। দুটিরই বিদ্যুৎসাম্য বিনষ্ট হয়েছে। তোমাকে হারিয়ে সোডিয়াম ধন-তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়েছে, আর তোমাকে পেয়ে ক্লোরিন হয়েছে ঋণ-তড়িতাবিষ্ট। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, ধন-তড়িতের প্রতি ঋণ-তড়িতের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তাই এই দুটি পরমাণু এখন জোড় বেঁধে ভেসে চলেছে—পরস্পর মিলিত হয়ে তৈরি করেছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, যাকে আমরা নুন বলি।

একথা শুনে ভারি মজা লাগলো। মনের আনন্দে নতুন উদ্যমে আবার সাঁই সাঁই করে ঘুরতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হলো, মিনতি আমাকে দেখেছে, আর আমাকে ডেকে যেন কি বলছে। কান পেতে শোনলাম, ও বলছে—আরে শঙ্কর যে! তুমি এখানে এলে কি করে? ওঃ তোমাকে দেখে যেন ধরে প্রাণ এলো। ইস, একটু আগেই আমি এখন যে ক্লোরিন পরমাণু আশ্রয় করে রয়েছি, তার কাছেই আর একটা ক্লোরিন পরমাণু এসে ভিড়ে পড়েছিল। দুটিতে জোড় বেঁধে গঠন করেছিল ক্লোরিনের অণু। কিন্তু এর ফলে আমার অবস্থা কাহিল। কারণ ঐ পরমাণুটির বাইরের কক্ষে ছিল এক বকাটে ছোকরা। দেখেই মনে হলো সে আমাকে ফলো করছে। হঠাৎ সে লাফ দিয়ে একেবারে আমার কক্ষে চলে এলো। তখন কি করি? আমিও লাফ দিয়ে ওরই পরিত্যক্ত কক্ষে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু ও কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ে না! ও আবার লাফ দিয়ে এদিকে ফিরে এলো, অগত্যা আমাকেও আবার আমার পুরনো কক্ষেই ফিরে যেতে হলো। ও আমাকে ক্রমাগত বিরক্ত করতে লাগলো। কাজে কাজেই আমরা দু-জনে যেন দু-নৌকায় পা দিয়ে ক্রমাগত এদিক-ওদিক লাফালাফি করতে লাগলাম। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। ভাবছিলাম ক্লোরিন পরমাণুটা একটু দূরে সরে গেলে বাঁচা যেত। কিন্তু ওটা যেন একেবারে আঠার মত লেগে রয়েছে, কিছুতেই সরে না। ভগবানকে ডাকছি, আর মনে মনে ভাবছি- কি করে ওর হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?

এমন সময় দেখি, কোন এক মন্ত্রবলে ঐ বকাটে ছোকরাকে নিয়েই ওদের ঐ পরমাণুটা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেল। মনে কর, দুটা নৌকা পাশাপাশি চলছে। এখন কেউ যদি একটাকে জোরে ধাক্কা দেয়, তাহলে নিশ্চয়ই দূরে সরে যাবে। আমাদের এখানেও কি যেন প্রবল শক্তি ঐ পরমাণুটিকে হঠাৎ দূরে ঠেলে দিল। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আরও মজার কথা এই যে, আমাকে

বেশীক্ষণ একলা থাকতে হলো না। এখানে এসেই মনের মত সাথী পেয়ে গেলাম।

মিনতির কথা শুনে আমার খুব আনন্দ হলো, তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলাম—কি মজা, কি মজা।

এমন সময় সেখানে হঠাৎ মূর্তিমান গুরু-মশায়ের মত ফাদার পাওলি আবার আবির্ভূত হলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন, কি হে ছোকরা, খুব যে স্ফূর্তি দেখছি। ব্যাপার কি? সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি করো না। যেমন ঘুরছ, তেমনি ঘুরতে থাক। ওকে বেশী জ্বালাতন করলে ফল ভাল হবে না, তা আমি আগেই বলে রাখছি। মনে রেখো, খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদের মত (Nun) একটা মহান ব্রত উদযাপনের উদ্দেশ্যে ওর জীবনটাও উৎসর্গীকৃত হয়েছে।

এসব শুনে আমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলাম। কিন্তু আমার এমন করুণ অবস্থা দেখেও ফাদার পাওলি নিরস্ত হলেন না। শাসনের সুরে বলতে লাগলেন—তুমি নিশ্চয়ই জান, একটু আগেই যে দুটি ক্লোরিন পরমাণু পরস্পরের কাছা-কাছি থেকে ক্লোরিনের অণু গঠন করতে পেরেছিল, সে তো ওর জন্যেই সম্ভব হয়েছিল। অবশ্য ও তখন মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, আর এই প্রাণান্তকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সতত কামনা করেছে। তাইতো তাকে এখন আর একটি মহান ব্রত উদযাপনের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। ওরই সহায়তায় গঠিত হয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু। অবশ্য স্বীকার করছি যে, একাজে তুমিও ওকে সহায়তা করছো বলে ও এখন একাজে বেশ উৎসাহ পাচ্ছে—একটা নিরানন্দ কর্তব্য সম্পাদনের মধ্যেও বেশ আনন্দ খুঁজে পেয়েছে। তবে তুমিও তোমার কর্তব্য করে যাও। তোমার জ্বালায় অস্থির হয়ে ও যদি এই দেশ ছেড়ে পালাতে চায়, তাহলে খুবই মুস্কিল হবে। ও যাতে একলা থাকতে পারে, তারই ব্যবস্থা তখন করতে হবে। বিদ্যুতের চাবুক মেরে তোমাকে আবার ফেরৎ পাঠানো হবে, তোমার পুরাতন কক্ষপথে। অতএব সাবধান।

* * *

হঠাৎ একটা ঠেলা খেয়ে চমকে জেগে ওঠলাম। জানি না কখন, পিছনের বেঞ্চে হেলান দিয়ে একেবারে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অধ্যাপক চলে গেছেন, ক্লাসও একেবারে ফাঁকা, আমিই শুধু একলা ঘুমিয়ে রয়েছি। বেয়ারা এসে ঠেলছে, আর বলছে—ও শঙ্করবাবু, উঠুন। বাড়ী যাবেন না? সন্ধ্যা যে হয়ে এলো!

চোখ রগড়ে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। তারপর আমার এই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

সঞ্চয়ন

অতল জলের আহ্বান

মনে করুন সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট বা তারও বেশী নীচে একটি গ্রাম, আর সেই গ্রামের একটি কুটিরে আপনি গিয়েছেন সপ্তাহান্তিক ছুটিটা কাটিয়ে আসবার জন্যে। খুবই অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাই না? কিন্তু সে দিনের আর খুব বেশী দেরী নেই, যখন আমরা এই নতুন দেশে অবসর যাপন করতে যেতে পারবো।

জাপানের অদূরে স্বল্প গভীর এক জলাশয়ে ইতিমধ্যেই জলতলে একটি হোটেল নির্মিত হচ্ছে। হোটেলটির পরিকল্পনা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে হোটেলের বাসিন্দারা সেখান থেকে মাছ প্রভৃতির খেলাধূলা উপভোগ করতে পারে। সমুদ্রের তলদেশে অবসর নিবাস নির্মিত হতে আর খুব বেশী দেরী নেই। এই অবসর নিবাসের চারদিক পরিবেষ্টিত থাকবে প্রবালের উদ্যানে, আর থাকবে বর্ণাঢ্য সামুদ্রিক প্রাণী-জীবনের এক বিচিত্র পরিবেশ। কেমন করে এই অবসর নিবাসে যাবেন? সেটাও কোন সমস্যা হবে না। হয়তো কোন বেসরকারী কোম্পানী এজন্যে ডুবোজাহাজ চালু করবেন।

যাঁরা অতি উৎসাহী, দুঃসাহসিক অভিযানে যাঁদের রুচি আছে, তাঁরা এই অবসর নিবাস থেকে বেরিয়ে পড়তে পারবেন সমুদ্র-সন্ধানে। আর যাঁরা অত উৎসাহী নন, তাঁরা জলতলের বালুকাবেলায় বা পাহাড়ের উপত্যকায় ঘুরে আসতে পারবেন গাইডের সাহায্য নিয়ে।

জলতলে এই ধরণের গৃহনির্মাণ আজ আর কোন সমস্যাই নয়। জলের নীচে ভিত্তি তৈরি করে তাতে এই ধরণের গৃহ নোঙর করে রাখা হবে। এই গৃহ এমনভাবে স্থাপিত হবে যে, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়া এর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাছাড়া প্রবালের শিখরগুলি একে সুরক্ষিত ভাবে রাখবে।

সমুদ্র মানুষের কাছে একটা রহস্য হয়েই রয়েছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তিন-চতুর্থাংশে যে ৩৩ কোটি ঘন মাইল জল রয়েছে, তার তমসাবৃত তলদেশে যে অনাবিষ্কৃত সম্পদের অজস্র সঞ্চয় রয়েছে, তার সন্ধানের উপযুক্ত সময় এসেছে।

সমুদ্রের অতলতলে যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে, তা আধুনিক অর্থনীতিকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলতে পারে। সোনা, তামা, লোহা, তেল প্রভৃতি খনিজ পদার্থে সমুদ্রের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। এছাড়া আছে গাছ-গাছড়া ও প্রাণীসম্পদ। আরও মজার কথা, সমুদ্রের তলদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের এক নিরাপদ গুদাম বলা যেতে পারে। বাতাসের সংস্পর্শে এলে কয়লায় ক্রমাগত অক্সিজেন মিশতে থাকে এবং ক্রমে এমন একটা বিপদজনক অবস্থায় এসে পৌঁছায় যে, যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন না করলে তা আপনা থেকেই প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু জলের নীচে কয়লার এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

মানুষের আহার্যের সংস্থানে সমুদ্রের অবদান বিস্ময়কর হতে পারে। শামুক, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি বহু রকম জলজ প্রাণী বিরাজ করছে সমুদ্রের জলতলে। চাষ করলে এই সম্পদ বহুগুণে বৃদ্ধি পারে। প্রাকৃতিক শত্রুর হাত থেকে এই সব প্রাণীদের রক্ষা করতে হবে এবং এদের খাবারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে একদিন এরা মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবে।

সামুদ্রিক আগাছাও মানুষের খাদ্য তালিকায় স্থান পেতে পারে। বস্তুতঃ, জাপানীরা এবং আরও কেউ কেউ সামুদ্রিক আগাছা খাদ্যরূপে ব্যবহার করছে। এত সম্ভাবনা সত্ত্বেও সমুদ্রতলের সম্পদ উদ্ধারে মানুষ এখনও তেমন যত্নবান হয় নি।

মাত্র এই সেদিন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্টন আবিষ্কার করলেন বেনথোস্কোপ—বেথিস্ফিয়ারের একটি নতুন সংস্করণ এটি। এই দুটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, বেনথোস্কোপ সমুদ্রের অনেক বেশী নীচে নামতে পারে এবং এর তলদেশে একটি বৃহৎ জানালা থাকায় আরও বেশী স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। প্রায় এই সময়েই অগাষ্ট পিকার্ড আবিষ্কার করেন বেথিস্কাফি। এটি মূলতঃ একটি গ্যাসের থলি সমন্বিত বেলুন। জলের চেয়ে অনেক হাল্কা বলে এটি সহজেই জলের মধ্যে ভেসে থাকে এবং 'গণ্ডোলা' গবেষণা জাহাজ এর সঙ্গে ঝুলে থেকে জলের নীচে অবস্থান করতে পারে।

যাহোক, এই সবই হলো অগভীর জলে গবেষণার ব্যাপার। অগাষ্ট পিকার্ড ও জ্যাক্স পিকার্ড কর্তৃক 'বেথিস্কাফি ট্রিয়েষ্ট' আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত গভীর জলে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানীর কাছে কোন সমুদ্রই গভীর নয়—পিকার্ড একথা প্রমাণ করবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রায় ডজনখানেক গভীর সমুদ্রযান নির্মিত হয়েছে। পিকার্ড নিজে তৈরি করলেন 'মেসোস্কাফি'। এই যান বহুসংখ্যক বিজ্ঞানী ও প্রচুর যন্ত্রপাতি নিয়ে দীর্ঘ সময় জলতলে অবস্থান করতে পারে।

এর পরে এল অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ডুবোজাহাজ 'অ্যালুমিনট'। এটি জলের ১৫ হাজার ফুট নীচে নামতে পারে।

১৯৬৩ সালে ক্যাপ্টেন কাষ্টো পাঁচজন সঙ্গীকে নিয়ে লোহিত সাগরের ৩৬ ফুট নীচে একটি ইস্পাত গৃহে এক মাস কাল বাস করেন। বর্তমানে তিনি ওয়েস্টিংহাউস ইলেকট্রিক কর্পোরেশনের পক্ষে ডীপষ্টার ডুবোজাহাজ নিয়ে কাজ করছেন। এই জাহাজটি তিনজন লোক নিয়ে জলের ১৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যাবে। ওয়েস্টিংহাউস বর্তমানে নানা ধরণের ডীপষ্টার নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছেন। গবেষক বিজ্ঞানীসহ জলের ২০ হাজার ফুট নীচে নামিয়ে দেবার জন্যেও গবেষণা চলছে।

'ডীপষ্টার ৪০০০' সমুদ্রের ৪ হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়ে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করতে পারে।

এতদিন ধারণা ছিল, ডুবুরীরা জলের ২৫০ ফুটের বেশি নীচে যেতে পারে না। কিন্তু বাতাসের নাইট্রোজেনের স্থলে হিলিয়াম ব্যবহার করে ডুবুরীদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অনেক সহজ হয়েছে এবং ডুবুরীদের পক্ষে জলের অনেক নীচে নামা সম্ভব হয়েছে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ও যন্ত্রপাতি নিখুঁত করবার জন্যে গবেষণা করে চলেছে ওয়েষ্টিংহাউস প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ কেন্দ্রের সমুদ্র গবেষণা বিভাগ।

ওয়েস্টিংহাউসের ইঞ্জিনীয়াররা হিলিয়াম অক্সিজেনের আবহাওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর নিয়েও গবেষণা করছেন। জলের তলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নতুন ধরণের যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। শুধুমাত্র এই যন্ত্রটির সাহায্যেই মানুষ একদিন জলের ৩ হাজার ফুট নীচে নেমে যেতে পারবে।

জেনারেল ইলেকট্রিক সিলিকেন রবারের একটি মেমব্রেন আবিষ্কার করেছেন, যা জলের মধ্যে থেকে শুধু অক্সিজেন টেনে বের করে নিতে পারে। ফলে জলের নীচে জল থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে।

এসব থেকেই উপলব্ধি করা যায়, মানুষ

বিনা বিপদে জলের নীচে বসবাস করতে পারে। হয়তো একদিন জলের নীচে একটা রাজ্য গড়ে উঠতে পারে, আর সে রাজ্যে মানুষ গড়ে তুলবে নানা পল্লী। বস্তুতঃ সমুদ্র সন্ধানের কাজে এই রকম উপনিবেশ গড়ে তোলবারই প্রয়োজন হবে।

এজন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন হলো জলতলে বিদ্যুৎ সরবরাহ। ওয়েস্টিংহাউস সে অভাবও মেটাতে চলেছেন। জলের নীচে ব্যবহারোপযোগী একটি অভিনব পারমাণবিক চুল্লী এঁরা নির্মাণ করেছেন। এই চুল্লীটি ৬ হাজার জনের উপযোগী বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করতে পারে। মানুষের সাহায্য ছাড়াই এই চুল্লী ১৮ মাস পূর্ণ শক্তিতে কাজ করতে পারে।

ওয়েস্টিংহাউসের ডিরেক্টর ডাঃ ডব্লিউ ইজনসন সঙ্গত কারণেই এই আশা প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ অচিরেই সমুদ্রতলে স্থায়ী বসতি স্থাপন করতে পারবে। অতল জলের আহ্বানে সাড়া দেবার সময় সত্যিই মানুষের সামনে এসেছে।

কলেরা রোগ দূরীকরণে বিজ্ঞানীদের ভূমিকা

পাঁচ গাঁয়ের মধ্যে সবচেয়ে বলিষ্ঠ মানুষটির মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যে এরকম পরিণতি ঘটবে, তা কি কেউ জানতো? পরিষ্কার রান্নাঘর। রান্না হয়েছিল শাকসব্জী, ডাল, ভাত। ভরপেট খেয়েই সে ঘুমিয়েছিল। খাওয়ার সময়ে মাটির কলসীতে রাখা পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল সে খেয়েছিল। কাকচক্ষুর মত সে জল। সে দিনের সন্ধ্যায়ই আরও দশজন মেয়ের সঙ্গে তার স্ত্রীও ছোট্ট নদী থেকে কলসী করে সেই জল নিয়ে এসেছিল। ভোর থেকেই পেটে ব্যাথা কেবল ঐ ঘরের মানুষদেরই নয়, প্রায় ঘরে ঘরেই দাস্ত, তারপরে সব শেষ। একের পর এক লোক মরতে লাগলো, লোক পালাতে লাগলো। সারা গাঁ উজাড় হয়ে গেল।

এই ঘটনা কেবল আজকের নয়, কেবল বাংলা দেশেরই নয়, এই ঘটনা পৃথিবীর বহু দেশের। আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এরকম ঘটনা ঘটেছে, কোন কোন অঞ্চলে এখনও ঘটছে। ইউরোপও এই মহামারীর কবল থেকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুক্ত ছিল না। তবে পৃথিবীর আর্দ্র ও উষ্ণ অঞ্চলেই এই রোগের প্রকোপ সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। কলেরা বা ওলাওঠার জীবাণুর বৃদ্ধি ও বিকাশের পক্ষে ঐ পরিবেশই সবচেয়ে অনুকূল। ৪৪ বছর আগে এই রোগ সমগ্র পৃথিবীতে মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। তখন ভারতের গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকাবাসীরা এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এ হলো ১৮৯৯ সালের কথা। ১৯২২ সালের মধ্যে সেই মহামারীর প্রকোপের উপশম ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলেও ঐ সময়ে এই রোগের ছোঁয়া লেগেছিল।

আজ আবার এই রোগের সমগ্র বিশ্বেই মহামারীরূপে প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই মারাত্মক শত্রুর বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস যতটুকু জানা আছে, তাতে মনে হয় এ হবে ওলা দেবীর সপ্তম আবির্ভাব।

এই রোগটি যে আবার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তা তো কল্পনাও করা যায় না। আর এই যুগে একটি মাত্র ভ্রাম্যমান পথিক সমগ্র পৃথিবীতে যে কত দ্রুত গতিতে এই রোগটি ছড়িয়ে দিতে পারে, তা একটি বিশেষ ভীতিপ্রদ ব্যাপার।

পল্লী অঞ্চলের কোন ব্যক্তি যখন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তখন এই রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা তার প্রতিবেশী অথবা পল্লীর মধ্যেই

সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বড় বড় সহরে এই রোগ ছড়িয়ে পড়লে বিমানযাত্রীদের মাধ্যমে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিশ্বের নানা স্থানে এই রোগ সংক্রামিত হবার আশঙ্কা থাকে।

১৮৯৯-১৯২২ সালের পরে নানা ধরণের কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলেও তা মহামারী রূপে দেখা দেয় নি—বেশীর ভাগ স্থলেই আক্রান্ত এলাকায়ই তা সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি, সাম্প্রতিক কালে নিউগিনি থেকে মধ্যপ্রাচ্য এলাকায় এই মহামারী ছড়িয়ে পড়তে ত্রিশ বছর লেগেছে। শাসকবর্গের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণাধীনে এসেছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে তুরস্কের কথা বলা যেতে পারে। ঐ দেশের সরকার গত মে মাসে ৭০ লক্ষ তুর্কী নাগরিকের কলেরা রোগের টিকা দেবার ব্যবস্থা করে। কেবল তাই নয়, পূর্ববর্তী মাসের ভূমিকম্পের পর সেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ এবং এই রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে চিকিৎসকবর্গের জন্যে বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে দু-জন মার্কিন বিশেষজ্ঞ তাদের এই উদ্যোগে সাহায্য করেন। সাম্প্রতিক কালে অন্যান্য দেশেও, যেমন—ফিলিপাইন্সে ১৯৬২ সালে, জর্ডনে ১৯৬৩ সালে এবং ইরানে ১৯৬৫ সালে সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবার জন্যে মার্কিন বিশেষজ্ঞদের প্রেরণ করা হয়েছিল।

কলেরা রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঠিক ম্যালেরিয়া রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মতই প্রাত্যহিক ব্যাপার। এই রোগ দুরীকরণে, যে সব দেশে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কেবলমাত্র সেই সব দেশের সরকারই নয়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহও এজন্যে উদ্যোগী হয়ে থাকেন এবং এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকেন।

কিছুদিন হয় এই রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করবার জন্যে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকা সহরের উপকণ্ঠে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে ৪০০ বিজ্ঞানী এই রোগ নিয়ে গবেগণা করছেন।

তবে একটা কথা, কলেরা রোগ সম্পর্কে আজ যেটুকু আমাদের জানা আছে, হাজার হাজার বছর আগেকার মানুষদের ততটুকুই প্রায় জানা ছিল। যেমন—এই রোগের নিদানসমূহ ভারতে ২৩০০ বছর আগে একটি পাথরের উপর উৎকীর্ণ হয়েছিল। আর এই ভারতেই ৪০০ বছর আগে এই রোগের প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এটি করেছিলেন একজন পর্তুগীজ চিকিৎসক।

কলেরা রোগে রোগীর দেহে যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, তা পূরণ না করা হলে রোগীর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটে। খাদ্য-পানীয়ের মাধ্যমে মানুষের দ্বারা আন্ত্রিক সংক্রমণের ফলেই এই রোগ দেখা দেয়।

সুতরাং এই রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে প্রথমেই খাদ্য ও পানীয়ের বিশুদ্ধতা রক্ষার দিকে এবং নদীনালা ও জলসরবরাহের ব্যবস্থা যাতে ওই রোগ-জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হতে না পারে, তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া যে অঞ্চলে ঐ রোগের আশঙ্কা দেখা দেয়, সেখানে সকলেই যাতে কলেরার টিকা নিতে পারে, তারও ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই সব খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। তাহলেও বিশ্বের বিজ্ঞানীমহল এই বিষয়ে মোটেই হতোদ্যম হন নি, তাঁরা এপথে এগিয়ে চলেছেন। কলেরা রোগের টিকা নিলে ছয় মাসের জন্যে এই রোগে আক্রান্ত হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। এমন দিন হয়তো আসবে, যখন এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার হবে, যা একবার খেলে সারা জীবনেও আর এই রোগের কোন ভয় থাকবে না।

দূরে বহু দূরে

দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

রাতের আকাশের চেহারা খালি চোখে দেখতে সর্বদা প্রায় একই রকম মনে হয়—নক্ষত্রগুলির অবস্থান ও গতিবিধির মধ্যে খুব একটা পরিবর্তন দেখা যায় না। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—আকাশের চেহারা কি চিরকাল এই রকমই ছিল? বৈজ্ঞানিকেরা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন—আমরা আকাশের যে চেহারা দেখছি, চিরকাল এই রকম ছিল না। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এখনও হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে।

দূরের আকাশের তারকা সম্বন্ধে কোন গবেষণা করতে হলে তারকার আলোর বর্ণালীর অনুশীলন করতে হয়। অবশ্য সূর্য বা তারকা থেকে শুধু আলোই আসে না, আরও অনেক কিছু আসে।

সবাই জানেন, সূর্যের আলো কোন প্রিজমের মধ্য দিয়ে গেলে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়। ঐ সাতটি রঙের গুচ্ছকে বর্ণালী বলা হয়। সূর্য বা তারকা থেকে বিকিরণের সাহায্যে অন্য আরও অনেক অদৃশ্য আলোক আসে। ঐ সব আলোর সম্মিলিত নাম বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। এগুলি ইথার তরঙ্গ-রূপে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিচালিত হয়।

যদি কোন উৎস প্রতি সেকেণ্ডে n-টি তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন বলা হয়—ঐ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি n। একটি তরঙ্গের শীর্ষ থেকে পরবর্তী তরঙ্গের শীর্ষের দূরত্বকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বলা হয়। সুতরাং কোন উৎস থেকে প্রতি সেকেণ্ডে যদি n-টি তরঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি x হয়—তাহলে এক সেকেণ্ডে ঐ তরঙ্গের সঞ্চার কত দূর হবে? নিশ্চয়ই nx হবে। nx-কে বলা হয় তরঙ্গের গতি।

সব রকমের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের গতিবেগ সমান এবং ১,৮৬০০০ মাইল বা ৩×১০^১০ সেন্টিমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। এই গতিকে বিজ্ঞানের বইয়ে c-এর দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেহেতু c একটি স্থির রাশি (Constant) এবং c অবশ্যই nx-এর সমান, সেহেতু যখন n কমবে তখন x বাড়বে, আর যখন n বাড়বে তখন x কমবে।

যত বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ আছে, তাদের আলাদা আলাদা গুণ ও ধর্ম-বিশিষ্ট হবার একমাত্র কারণ তাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তফাৎ। যে আলো আমরা দেখতে পাই, সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গগোষ্ঠীর তা একটি সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র।

বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সম্পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল

১নং তালিকা

নাম	ফ্রিকোয়েন্সি প্রতি সেকেণ্ডে	তরঙ্গের দৈর্ঘ্য
কস্‌মিক রশ্মি	10^{23}-এর চেয়ে কম	10^{-11} cm-এর চেয়ে বেশী
গামা রশ্মি	6×10^{20} to 6×10^{18}	10^{-10} to 10^{-8} cm
রঞ্জেন রশ্মি	6×10^{19} to 6×10^{15}	10^{-9} to 10^{-5} cm
আল্ট্রাভায়োলেট	2×10^{16} to $7{\cdot}5\times10^{14}$	$1{\cdot}4\times10^{-6}$ to 4×10^{-5} cm
দৃশ্য-রশ্মি (আলো)	$7{\cdot}5\times10^{14}$ to 4×10^{14}	4×10^{-5} to 8×10^{-5} cm
ইন্‌ফ্রা রেড	4×10^{14} to 3×10^{11}	8×10^{-5} to ·04 cm
বেতার তরঙ্গ	10^{13} to 10^{3}	·01 cm to 100 Km

মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরীর জ্যোতির্বিদ ই. হাবল (E. Hubble) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন যে, দূরবর্তী নক্ষত্রমণ্ডলীর (Galaxies) আলোর বর্ণালী সাধারণ আলোর বর্ণালীর চেয়ে একটু থাকে, সেখান থেকে সামান্য উপরের দিকে ওঠানো। একে বলা হয় রেড সিফ্‌ট্‌ (Red Shift) (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

এর কারণ কি? এটিকে ব্যাখ্যা করবার
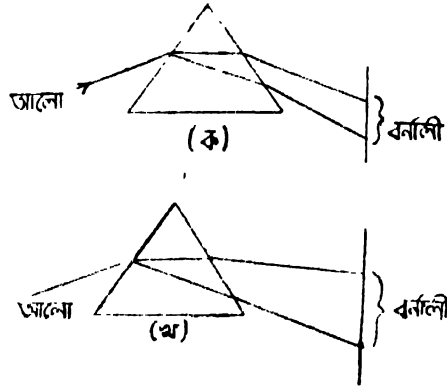
১নং চিত্র

(ক) সাধারণ আলোর বর্ণালী, (খ) দূরের নক্ষত্রমণ্ডলীর আলোর বর্ণালী

অন্য প্রকার। সাধারণ আলোর বর্ণালী যেখানে থাকে, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীর বর্ণালী একটু উপরের দিকে ওঠানো; অর্থাৎ যেখানে লাল আলো একমাত্র উপায়—আমাদের ধরে নিতে হবে যে, দূরের নক্ষত্রগুলি আমাদের পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, কিন্তু এরূপ ধারণা করবার কারণ কি?

২নং তালিকা (আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য)

আলোর রং	তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য, সেণ্টিমিটারে	ফ্রীকোয়েন্সি
লাল	7.5×10^{-5} to 6.3×10^{-5}	4×10^{14} to 4.8×10^{14}
কমলা	6.3×10^{-5} to 6×10^{-5}	4.8×10^{14} to 5×10^{14}
হলদে	6×10^{-5} to 5.8×10^{-5}	5×10^{14} to 5.2×10^{14}
সবুজ	5.8×10^{-5} to 5.1×10^{-5}	5.2×10^{14} to 5.9×10^{14}
নীল	5.1×10^{-5} to 4.6×10^{-5}	5.9×10^{14} to 6.5×10^{14}
ইণ্ডিগো	4.6×10^{-5} to 4.2×10^{-5}	6.5×10^{14} to 7.1×10^{14}
বেগুনী	4.2×10^{-5} to 4.0×10^{-5}	7.1×10^{14} to 7.5×10^{14}

ব্যাপারটা পুরাপুরি বুঝতে হলে ডপ্‌লার এফেক্ট কি, সেটা বুঝতে হবে। ধরা যাক—একটি জায়গা থেকে চোখে লাল আলো এসে পড়ছে। তখন ইথার তরঙ্গ চোখকে ৪,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ থেকে ৪৮০০,০০০,০০০,০০০,০০ বার আঘাত করছে। এখন ধরা যাক—কেউ ঐ আলোর উৎসের দিকে ছুটে চলেছে। যদি তার ছোটবার গতি যথেষ্ট বেশী হয়, তাহলে আলোর তরঙ্গ তার চোখকে আরও তাড়াতাড়ি আঘাত করতে সুরু করবে। এই আঘাত করবার রেট যদি ৪৮০০,০০০,০০০,০০০,০০ বারের চেয়ে বেশী হয়—তখন সে আর লাল

আলো দেখবে না, দেখবে কমলা রং। তার গতিবেগ যদি আরও বেড়ে যায়, অর্থাৎ ইথার তরঙ্গ যদি তার চোখকে ৫,০০০,০০০,০০০,০০০,০০ বারেরও বেশী বার আঘাত করতে সুরু করে, তাহলে লাল আলো-কে তার হল্‌দে হয়ে যেতে পারে। প্রথম অবস্থায় আল্‌ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে বেগুনী রঙের মনে হবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় ইনফ্রা রেডকে লাল বলে মনে হবে

হাবল যখন দেখলেন যে, দূরের তারকার আলোর বর্ণালীর লাল রং উপরের দিকে ওঠানো—
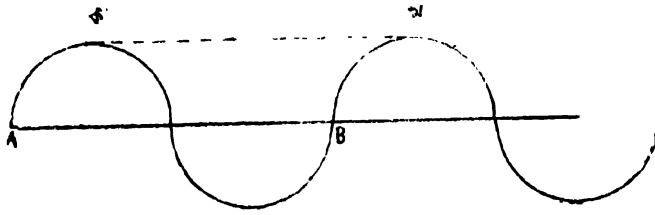
২নং চিত্র
A B একটি পূর্ণ তরঙ্গ। ক খ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য

আলো বলে মনে হবে। একে বলে ডপ্‌লার এফেক্ট।

অর্থাৎ ডপ্‌লার এফেক্টের মূল বক্তব্য হলো এই যে, যদি কেউ কোন আলোর উৎসের দিকে ছুটে যায়, তাহলে আলোর রং বদ্‌লাবে। অবশ্যই এজন্যে গতিবেগ যথেষ্ট বেশী হওয়া দরকার।

শুধু তাই নয়, সমস্ত বর্ণালীটাই একটু উপরের দিকে উঠে গেছে, তখন এথেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোর উৎস দূরে সরে যাচ্ছে; অর্থাৎ দূরের নক্ষত্রমণ্ডলী আমাদের নক্ষত্রমণ্ডলী (ছায়াপথ বা Milky way) থেকে ক্রমাগত দূরে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন?

ভাল ভাবে পরীক্ষা করবার পর বোঝা গেছে
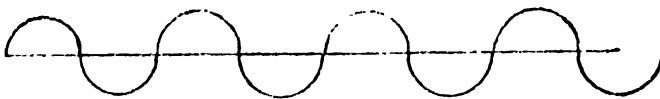
৩নং চিত্র
যদি ২নং চিত্রটি লাল আলোর তরঙ্গ ধরা হয়, তাহলে এটি বেগুনী আলোর তরঙ্গ।
বেগুনী আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গের প্রায় অর্ধেক

এর উল্টোটাও হতে পারে; অর্থাৎ উৎসের কাছ থেকে সে যদি দূরে সরে যেতে থাকে, তাহলেও রং বদ্‌লাবে উল্টোদিক থেকে। অর্থাৎ তখন ছোট তরঙ্গের আলোকে বড় তরঙ্গের আলো বলে মনে হবে। তখন হল্‌দে রঙের জায়গায় হয়তো সে কমলা কি লাল রং দেখবে। শুধু তাই নয়—এরকম অবস্থায় অনেক অদৃশ্য তরঙ্গও দৃশ্য-রশ্মির তরঙ্গে পরিণত

যে, আসলে সমস্ত নক্ষত্রমণ্ডলীই একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি একটা সাধারণ বেলুনকে ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায় এবং বেলুনের উপরে যদি কোন নক্সা আঁকা থাকে—তাহলে দেখা যাবে, বেলুনটি ফোলবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ নক্সার প্রত্যেকটি অংশই পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই বেলুনের মত ক্রমাগত ফুলে

চলেছে, আর নক্ষত্রগুলি ঐ নক্সার ভিন্ন ভিন্ন অংশের মত একে অন্যের কাছ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছে।

নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির গতি এবং যে ভাবে তাদের দূরত্ব বাড়ছে—তাথেকে হিসেব করা গেছে যে, নক্ষত্রগুলির এই দৌড় সুরু হয়েছে মাত্র ২০০ থেকে ৩০০ কোটি বছর পূর্বে।*

এই কাহিনীর সূত্রপাত সেই ২০০ থেকে ৩০০ কোটি বছর আগে সুরু হয়েছিল, যখন কোন অজ্ঞাত কারণে মহাজাগতিক যাবতীয় পদার্থ (অর্থাৎ এখন যা কিছু আকাশে দেখা যায়—সূর্য চন্দ্র, তারকা, ধূমকেতু প্রভৃতি) সবাই এক স্থানে মিলিত হয়ে একটা বিরাট সূর্য তৈরি করেছিল। তখন যে পরিমাণ তাপ ও চাপ উৎপন্ন হয়েছিল, তাতে আমাদের জানা কোন পদার্থের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব ছিল না। সেটার মধ্যে ছিল শুধু পদার্থের নিউক্লিয়াসগুলি—বাস্তবিক কোন পদার্থ নয়। বৈজ্ঞানিকদের হিসাব অনুসারে সেই নিউক্লিয়াস গ্যাসের গড় ঘনত্ব ছিল প্রায় ১০০০০০০০০০০০০০০ গ্র্যাম প্রতি ঘন সেণ্টি-মিটার অর্থাৎ প্রায় একশত কোটি কুইন্টাল—প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার। আর সেই গ্যাস-পিণ্ডের আয়তন ছিল প্রায় আটটি সূর্যের আয়তনের সমান; অর্থাৎ ঐ গোলকের ব্যাস ছিল প্রায় ২ কোটি কিলোমিটার।

* হাবলের মূল গণনা অনুসারে:—যে কোন দুটি Galaxi-র গড় দূরত্ব—১৭ লক্ষ আলোক-বর্ষ, অর্থাৎ $১\cdot৬\times১০^{১৯}$ কিলোমিটার। তাদের আপেক্ষিক গতি—৩০০ কি. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। সুতরাং এই দূরত্ব যেতে সময় লেগেছে

$$\frac{১\cdot৬\times১০^{১৯}}{৩০০} \text{ সেকেণ্ড}$$

$$=৫\times১০^{১৬} \text{ সেকেণ্ড}$$

$$=১৮০ \text{ কোটি বছর}$$

আধুনিক গণনা অনুযায়ী সময় অনেক বেশী।

অবশ্য এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কেন না, ঐ গ্যাসের দ্রুত প্রসারণের জন্যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার ঘনত্ব জলের সমান হয়ে গিয়েছিল।

প্রায় এই সময়েই ঐ বিরাট গ্যাসের গোলকটি কয়েকটি ভাগে ভেঙ্গে যায়। ঐ ভাগগুলিই পরে ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রমণ্ডলীর সৃষ্টি করেছে। সেই সময়ে ঐ গ্যাসীয় মেঘ যে গতিতে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আজও প্রায় সেই গতিতেই তারা মহাশূন্যের অজ্ঞাত পথে ছুটে চলেছে।

মহাজাগতিক বিবর্তনের এই কাহিনী জানবার পর স্বভাবতঃই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নক্ষত্রমণ্ডলীগুলির এই যে দৌড়, তা কি কখনও থামবে? কিংবা নক্ষত্রগুলি সেই ৩০০ কোটি বছর আগে যেমন এক জায়গায় মিলিত হয়েছিল, সেভাবে মিলিত হবার জন্যে আবার কি ফিরে আসবে আর আমাদের ছায়াপথ, সূর্য, পৃথিবী ও মানব জাতি সকলকে আবার কি সেই রকম নিউক্লিয়ার ঘনত্বের চাপে একটা বিরাট মহাজাগতিক গ্যাস-পিণ্ডে রূপান্তরিত করবে?

যতদূর জানা গেছে, তাতে এই বিষয় আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। বৈজ্ঞানিকদের মতে, নক্ষত্রমণ্ডলী শুধু ক্রমাগত দূরে বহু দূরে চলে যাবে, তাদের কখনও আর ফিরে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। কেন না, তাদের গতিবেগজনিত যে শক্তি (Kinetic energy), তাদের পারস্পরিক গুরুত্বাকর্ষণ শক্তির (Gravitational potential energy) চেয়ে কয়েক শত গুণ বেশী।

অবশ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাপজোক খুব বেশী নির্ভুল হয় না। যেমন ১৭ লক্ষ আলোক-বছর দূরের তারকার দূরত্বে ২-৪ কোটি মাইলের ভুল থাকা খুবই সম্ভব। এই অবস্থায় কিছু কাল পরের গণনা ও গবেষণার দ্বারা যদি প্রমাণিত হয় যে, যাবতীয়

মহাজাগতিক পদার্থ আবার এক স্থানে মিলিত হবে এবং সমস্ত সৃষ্টি এক প্রচণ্ড চাপে ও তাপে ধ্বংস হয়ে যাবে—তবুও আমাদের চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কেন না, সেদিন আসতে অন্ততঃ দু'শ কোটি বছর লাগবেই; অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের আজকের রূপ তৈরি হতে যত সময় লেগেছে, ধ্বংসের দিন আসতেও অন্ততঃ তত সময় লাগবেই।

সোনা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

সোনা সূর্যের মত উজ্জ্বল ও পীতাভ এবং সাধারণ অবস্থায় অমলিন ধাতু। সম্ভবতঃ আদিম মানব ধাতুর মধ্যে সর্বপ্রথম সোনার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে। বোধ হয় নদীর বালিতে হলুদ রঙের উজ্জ্বল স্বর্ণকণিকার প্রতি প্রথম তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আট হাজার বৎসর আগেকার নবোপলীয় যুগের পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে কিছু কিছু সোনার জিনিষও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগের যে সকল প্রত্নদ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সোনার জিনিষও আছে। মিশরে চকমকি পাথরের তৈয়ারী যে ছোরা পাওয়া গিয়াছে, তাহার হাতল সোনা দিয়া মোড়া। খৃষ্টের জন্মের ১৩৫০ বৎসর পূর্বেকার মিশরের রাজা তুতানখামেনের যে শবাধার পাওয়া যায়, তাহা সুবর্ণ নির্মিত। প্রাচীন মিশরে প্রায় চার হাজার বৎসর আগে যে ভাবে সোনা ধোয়া, গলানো ও ওজন করা হইত, তাহার সুন্দর উৎকীর্ণ চিত্র এখনও দেখা যায়। ক্রীট দ্বীপ হইতে একটি সোনার পেয়ালা পাওয়া গিয়াছে, যাহা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। প্রাচীন সুমেরীয় জাতির শিল্পকলার নিদর্শনস্বরূপ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার একটি সোনার তৈয়ারী গরুর শিং ও একটি স্বর্ণমণ্ডিত শিরস্ত্রাণ পাওয়া গিয়াছে। গ্রীস দেশে লিডিয়ার রাজা ক্রিসাসের (খৃঃ পূঃ ৫৬০—৫৪৬) একটি স্বর্ণমুদ্রা ও মাইসিনি হইতে একটি সোনার মুখোস সংগ্রহ করা হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত ইউক্রেনের এক জায়গা খনন করিয়া আড়াই হাজার বৎসর আগেকার একটি সুদৃশ্য সোনার চিরুণী বাহির করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদাড়ো ও হারাপ্পা হইতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার সোনার পুঁতির মালা আবিষ্কার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারের মধ্যে হার, কঙ্কন, কুণ্ডল ও মলের উল্লেখ পাওয়া যায়। চম্পারন জেলায় লৌরিয়া নন্দনগড় হইতে একটি সমাধি স্থান খনন করিয়া বৈদিক কালের এক ইঞ্চি লম্বা একটি স্বর্ণপত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার গায়ে একটি উপবিষ্ট নারীমূর্তি খোদিত আছে। মেগাস্থিনিসের ভারত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, রাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খৃঃ পূঃ ৩২৩—২৯৯) যাতায়াতের জন্য সুবর্ণনির্মিত পাল্কী ব্যবহার করিতেন। সেই সময়কার সাধারণ বিপণীতেও স্বর্ণপাত্র বিক্রয় করা হইত। মৌর্য যুগের একাধিক স্বর্ণমুদ্রা পাটনা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত হইয়াছে। আফগানিস্থানের বিমারণ হইতে একটি তিন ইঞ্চি উচ্চ স্বর্ণাধার আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার গায়ে বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যবর্গের মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। তক্ষশীলায়

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লাল পাথর বসানো একটি সোনার হার পাওয়া গিয়াছে।

সিরিয়া দেশে প্রাপ্ত একটি স্বর্ণকলস খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অনুমান করেন। সাইপ্রাস দ্বীপে যে স্বর্ণদণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। চীনদেশ হইতে আড়াই হাজার বৎসর আগেকার চৌ রাজবংশের আমলের একটি চার ইঞ্চি লম্বা সুবর্ণনির্মিত ছোরার হাতল সংগৃহীত হইয়াছে। মেক্সিকো হইতে প্রাচীন বসন্ত দেবতার একটি স্বর্ণ মূর্তি সংগ্রহ করা হইয়াছে। পেরু দেশ হইতে স্প্যানিয়ার্ডগণ সুবর্ণনির্মিত বহু অলঙ্কার, আধার, মুকুট ও স্বর্ণ মূর্তি বলপূর্বক সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করে। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময় হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এই ভাবে ৮০০০০০০ আউন্স সোনা ইউরোপে রপ্তানী হয়। সোনার লোভে কত যে অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অমৃতসরে শিখদের স্বর্ণমন্দির অনেকেই দেখিয়াছেন। পাঞ্জাব কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিং যে পালঙ্কে শয়ন করিতেন, তাহা নিরেট সোনায় তৈয়ারী হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহী (১৫৪৬-১৬০১) এক দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহত হইবার পর নিজের নাক সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছিলেন। রোমান ক্যাথলিকদের সর্বাধিনায়ক ইটালীর পোপ ঈষ্টারের পূর্বে কখনও কখনও কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা চার্চকে একটি সুন্দর সোনার গোলাপ ফুল উপহার দিয়া আশীর্বাদ করিয়া থাকেন।

সোনাই সমস্ত ধাতুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই জন্য বাইবেলে প্রথমেই সোনার উল্লেখ আছে। অথর্ববেদে একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—সূর্য প্রদত্ত স্বর্ণ উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট—যাহারা ইহা ব্যবহার করে, তাহারাও দীর্ঘায়ু হয়। ঋষি বাৎস্যায়ন দেড় হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহার লিখিত গ্রন্থে অবশ্য-শিক্ষণীয় চৌষট্টি কলার মধ্যে সুবর্ণরত্ন পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সোনার ল্যাটিন নাম 'অরাম', মানে উজ্জ্বল ঊষা। সংস্কৃত সাহিত্যেও সোনার অনেকগুলি নাম আছে, যথা—কণক, কাঞ্চন, চামীকর, জাম্বুনদ, তপনীয়, রুক্ম, শাতকুম্ভ, সুবর্ণ, স্বর্ণ, হিরণ্য, হেম ইত্যাদি।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সিসিলির সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ করেন। তৎকালীন সোনার তৈয়ারী একটি রাজমুকুটে কতটা খাদ আছে, তাহা তিনি জলের সাহায্যে কিভাবে নির্ণয় করিয়াছিলেন, সে কথা অনেকেই জানেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্লিনি তাঁহার গ্রন্থে পারদের সহায়তায় খনিজ পদার্থ হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশনের পদ্ধতির কথা বিস্তারিতভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তিনি নায়ারদের দেশ মালাবারে যে বহু স্বর্ণখনি অবস্থিত, তাহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান লেখকদের মধ্যে হেরোডোটাস (খৃঃ পূঃ ৪৮৪—৪২৪), প্লিনি ও ষ্ট্রাবো (খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী) একটি বহু প্রচলিত ভারতীয় কাহিনীর বিবরণ দিয়া গিয়াছেন। সে যুগে কোন কোন পর্বতের সানুদেশে পিপীলিকারা পর্বত খুঁড়িয়া যে মৃত্তিকা উত্তোলন করিত, তাহার সহিত অনেক সময় স্বর্ণকণিকাও উঠিয়া আসিত। প্রাচীন যুগে কাশ্মীরের এক জাতি যে রাজস্ব হিসাবে স্বর্ণচূর্ণ প্রদান করিত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সমস্ত পৃথিবীতে গড়ে শতকরা প্রায় '০০০০০০০৫ ভাগ সোনার অস্তিত্ব রহিয়াছে। প্রতি টন সমুদ্র-জলে প্রায় '০৫ মিলিগ্র্যাম পরিমিত সোনা থাকে। সপ্ত সমুদ্রের জলে প্রায় ২১০ লক্ষ টন সোনা মজুদ আছে বলিয়া অনুমিত

হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের ভস্মেও অতি সামান্য পরিমাণ সোনা বর্তমান। কোন কোন কয়লার ছাইয়ে প্রতি টনে এক গ্র্যাম পরিমাণ সোনা থাকে। যে সকল নদীতে স্বাভাবিকভাবে ক্লোরিন বিদ্যমান, সে সকল নদীর জলে সহজেই কিয়ৎ পরিমাণ সোনা গলিয়া গিয়া মিশিয়া থাকে এবং এই স্বর্ণমিশ্রিত জল গাছপালা শিকড়ের সাহায্যে শোষণ করিয়া লয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে—ভুট্টার দানায় এইভাবে সামান্য পরিমাণ সোনা সঞ্চিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর উপরিভাগে সাধারণ মাটি-পাথরেও প্রতি টনে '০০৫ গ্র্যাম মাত্রায় সোনা আছে। সাধারণতঃ সোনা স্ফটিক প্রস্তরের সঙ্গে গ্রথিত বা মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। স্বর্ণযুক্ত স্ফটিকের রং হলুদে কিম্বা নীলাভ ধূসর হইয়া থাকে। এই রকম স্বর্ণযুক্ত স্ফটিক প্রস্তর যখন প্রাকৃতিক কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া জলস্রোতের সঙ্গে নদীপথে নিম্নভূমিতে ছড়াইয়া পড়ে, তখন নদীর তীরবর্তী বালি ও পলি হইতে কিয়ৎ পরিমাণ সোনা পাওয়া যায়। সচরাচর খনি হইতে যে সকল সোনা উত্তোলিত হয়, তাহার সহিত প্রায়ই স্বর্ণমাক্ষিক (Iron pyrites), গন্ধকঘটিত সীসা ও তামা থাকে। গোল্ড টেলুরাইড নামক খনিজে শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ সোনা থাকে। খনিজ সোনার সঙ্গে সাধারণতঃ শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ রৌপ্য থাকে। রূপার পরিমাণ সমান সমান হইলে রং সাদা হয়, তখন ইহাকে ইলেকট্রাম বলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় বিসমাথ মিশ্রিত একরকম কৃষ্ণবর্ণের সোনা পাওয়া যায়। সূক্ষ্ম স্বর্ণকণা এক মিলিমিটারের সহস্রাংশ পর্যন্ত ছোট হইতে পারে, আবার অন্য দিকে ক্যালিফোর্নিয়াতে এক ইঞ্চি পরিমিত সোনার কৃষ্ট্যালও পাওয়া গিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়ায় ১৮৫৮ সালে ১৮৪ পাউণ্ড ওজনের এক বিরাট স্বর্ণখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল এবং ১৮৬৯ সালে সেই দেশ হইতে ১৯০ পাউণ্ড ওজনের আর একটি সোনার চাঁইও সংগৃহীত হইয়াছিল। কালগুলির স্পঞ্জ সোনা ৯৯.৯% বিশুদ্ধ। পূর্বকালে মেষচর্ম কিম্বা কম্বলের মধ্যে স্বর্ণকণা মিশ্রিত বালুকা জলে ধুইয়া লোকে স্বর্ণ নিষ্কাশন করিত। এই প্রক্রিয়ার ফলে ভেড়ার লোমের ভিতর স্বর্ণরেণু আট্‌কাইয়া যাইত। কাঠের গামলার মধ্যে সোনা মিশ্রিত নদীর বালি জলে অনেকক্ষণ ধরিয়া বার বার ধৌত করিলে ভারী স্বর্ণকণা পাত্রের নীচে জমা হইয়া পড়ে এবং হাল্‌কা বালি জলস্রোতের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। আজকাল খাঁজকাটা সুদীর্ঘ নালীর মধ্যে স্বর্ণকণাযুক্ত বালি রাখিয়া তাহার উপর প্রবল জলধারা প্রয়োগ করা হয়। সোনার কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত গুরুভার হইবার ফলে তলায় গিয়া জমা হয় এবং লঘু বালুকা ও প্রস্তরকণা ধুইয়া জলপ্রবাহের সহিত বাহিরে চলিয়া আসে। পারা এবং পটাসিয়াম সায়ানাইডের জলে সোনা দ্রবণীয়। এই কারণে খনিজ পদার্থ হইতে স্বর্ণ নিষ্কাশন করিবার জন্য এই পদার্থ দুইটির সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে। প্রথমে স্বর্ণযুক্ত স্ফটিক প্রস্তর চূর্ণ করিয়া পারদের প্রলেপ দেওয়া বড় বড় তামার চাদরের উপর দিয়া জলের সাহায্যে স্রোতের মত প্রবাহিত করান হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে স্বর্ণকণিকা পারদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। সেই সমস্ত পারদ চাঁচিয়া লইয়া পাতন যন্ত্রে উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপ প্রয়োগের ফলে পারদ বাষ্পাকারে বাহির হইয়া গিয়া অন্য পাত্রে জমা হয় এবং পাতন যন্ত্রে শুধু সোনা পড়িয়া থাকে অথবা স্বর্ণযুক্ত খনিজ প্রস্তর চূর্ণ করিয়া শতকরা এক ভাগ পটাসিয়াম সায়ানাইডের জলে নিমজ্জিত করা হয়। ইহার ফলে সোনা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দ্রবীভূত হইয়া যায়। পরে এই জলে দস্তাচূর্ণ নিক্ষেপ করিলে সোনা পৃথক হইয়া আসে। অতঃপর এই সোনা বৈদ্যুতিক পদ্ধতির সাহায্যে আরও বিশুদ্ধ করা হয়।

সোনার পারমাণবিক ওজন ১৯৭'২ এবং ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৯'৩২। ১০৬৩° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সোনা গলিয়া যায়। তরল সোনার রং ঈষৎ সবুজ। ২৬০০° সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রায় সোনা ধীরে ধীরে ফুটিতে আরম্ভ করে ও বেগুনী বর্ণের বাষ্পে পরিণত হয়। সমস্ত স্বর্ণ-সংশোধনাগার ও সোনার কারখানার চিম্‌নি ঝাড়িয়া মধ্যে মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণ সোনা উদ্ধার করা হইয়া থাকে। সোনার গড় আপেক্ষিক তাপ '০৩১২, প্রতি এক ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ প্রয়োগের ফলে সোনা '০০০০১৪ ভাগ রেখাকারে প্রসারিত হয়। খাঁটি সোনার কাঠিন্য ২'৫ হইতে ৩ অবধি হইয়া থাকে। সেই জন্য ইহার উপর নখের আঁচড় কাটা অসম্ভব নয়। সোনার বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা '৭০০ সি-জি-এস মাত্রা। এই পরিমাপে রূপা ও তামার বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা যথাক্রমে '৯৭৪ ও '৯১৮। সোনা বিলক্ষণ ঘাতসহ, মাত্র এক গ্রেণ সোনা পিটাইয়া ছয় বর্গফুট বিস্তৃত সোনার পাত্‌ করা সম্ভব। দুইটি কোমল বৃষচর্মের মাঝখানে সামান্য সোনা রাখিয়া উত্তমরূপে পিটাইতে থাকিলে এক ইঞ্চির প্রায় তিন লক্ষ ভাগের এক ভাগ পাত্‌লা পাত্‌ প্রস্তুত করা যায়। এক আউন্স ওজনের সোনা হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল লম্বা তারা টানা সম্ভব। খুব পাত্‌লা সোনার পাতের মধ্য দিয়া সবুজ ও বেগুনী আলো অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।

সোনার রাসায়নিক গুণাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায়, বাতাসের অক্সিজেন কোন অবস্থাতেই সোনার উপর ক্রিয়াশীল হয় না। এক ভাগ নাইট্রিক অ্যাসিড ও তিন ভাগ হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডে সোনা সহজেই দ্রবীভূত হইয়া যায়। কাজেই এই অ্যাসিড মিশ্রণকে অ্যাকোয়া রিজিয়া বলা হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ক্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিন মিশ্রিত জলে সোনা দ্রবীভূত হয়। ফুটন্ত ফেরিক ক্লোরাইড সলিউশন ও উত্তপ্ত সেলেনিক অ্যাসিড সোনাকে ক্ষয় করিয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড ও পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট প্রভৃতি অক্সিজেনবহুল রাসায়নিক পদার্থসমূহ সোনাকে আক্রমণ করিতে পারে। পারদ ও পটাসিয়াম সায়ানাইড দ্রবে সোনা যে গলিয়া যায়, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শতকরা '০১ ভাগ গোল্ড ক্লোরাইড দ্রবণে যদি কয়েক ফোঁটা তার্পিন কিম্বা ফর্মালডিহাইড অথবা ফস্‌ফরাস যোগ করা যায়, তাহা হইলে এই দ্রবণ চুনীর মত রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং উহার মধ্যে সূক্ষ্ম স্বর্ণকণা ইতস্তত: ভাসিয়া বেড়ায়। ১৮৫৭ সালে ফ্যারাডে ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন এবং তখন হইতে ইহাকে ফ্যারাডের সোনা বলা হইয়া থাকে। দুই রকম টিন ক্লোরাইড সলিউশনের সঙ্গে যদি যৎসামান্য গোল্ড ক্লোরাইড মিশ্রিত করা হয়, তবে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে এই দ্রবণ রক্তাভ বেগুনী বর্ণ ধারণ করে আর জলযুক্ত টিন অক্সাইডের কণা পৃথক হইয়া গিয়া সূক্ষ্ম স্বর্ণাণু বহন করিয়া বেড়ায়। এই সুন্দর রাসায়নিক পদার্থকে ক্যাসিয়াসের বেগুনী রং বলা হয়, কারণ ১৮৮৫ সালে বৈজ্ঞানিক ক্যাসিয়াস ইহার প্রস্তুত প্রণালী প্রথম প্রকাশ করেন। যদি কোন স্বর্ণ-দ্রবণ বা গোল্ড অক্সাইডের উপর তীব্র অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে রাসায়নিক প্রতি-ক্রিয়ার ফলে এক প্রকার হরিৎ বর্ণের বিস্ফোরক পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেই ফুল্মিনেটিং গোল্ড বলা হয়। শুষ্ক হইলে এই পদার্থ সামান্য ঘর্ষণ, উত্তাপ বা আঘাত প্রয়োগেই প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরিত হয়।

স্বর্ণঘটিত অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে গোল্ড ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, অক্সাইড, হাইড্রক্সাইড, সালফাইড, সালফেট ও অ্যাসিডোনাইট্রেট উল্লেখযোগ্য।

সোনার বিশেষত্ব নির্দেশক গুণাবলীর মধ্যে

ইহার ঘাতসহনশীলতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি বর্গ ইঞ্চি সোনা প্রায় ৭ টন ওজনের টান সহ্য করিতে পারে। ইহা ছাড়া সোনা তীব্র অ্যাসিড প্রয়োগেও অমলিন ও উজ্জ্বল থাকে, কিন্তু পিতল বা স্বর্ণসদৃশ যে কোন মিশ্রধাতু তীক্ষ্ণ অম্লের সংস্পর্শে আসিলেই সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হইয়া গলিয়া যায়। আধুনিক রাসায়নিক ক্রিয়া-পদ্ধতি এতই সূক্ষ্ম যে, কোন পদার্থের ভিতর একশত কোটির মধ্যে এক ভাগ মাত্র সোনা থাকিলেও তাহা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। উত্তপ্ত ও প্রদীপ্ত স্বর্ণের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিলে নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষত্বব্যঞ্জক রেখার অস্তিত্ব পাওয়া যায়; যেমন—কমলা ও লাল রঙে ৬২৭৮ ও ৫৯৫৭ সংখ্যায়, হলুদে রঙে ৫৮৩৭ ও ৫৬৫৬ সংখ্যায়, সবুজ রঙে ৫০৬৫ সংখ্যায়, নীল রঙে ৪৭৯৩ ও ৪৪৩৭ সংখ্যায়, বেগুনী রঙে ৪০৬৫ ও ৩৮৯৮ সংখ্যায়। সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া উহার মধ্যে সোনার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

নিখাদ সোনাকে ২৪ ক্যারেট খাঁটি বলিয়া অভিহিত করা হয়, উহার সহিত তামা বা অন্যান্য ধাতু মিশ্রিত করিলে অলঙ্কারাদি গড়িবার উপযোগী কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। এখানে স্বর্ণযুক্ত মিশ্রধাতুর (Alloy) একটি তালিকা দেওয়া হইল।

সোনা		তামার পরিমাণ	আপেক্ষিক গুরুত্ব
২৪ ক্যারেট খাঁটি		০	১৯.৩
২২	,, গিনি	২	১৭.৭
১৮	,,	৬	১৫.৪
১৪	,,	১০	১৩.৯
৯	,,	১৫	১১.৪

সোনার সঙ্গে কখনও কখনও অন্য ধাতু যোগ করিয়া বিভিন্ন বর্ণের উজ্জ্বল মিশ্রধাতু প্রস্তুত করা হয়, যেমন—

বর্ণ	সোনার ভাগ	অন্য ধাতুর অংশ
সবুজ		১ রৌপ্য
লাল		১ তামা
নীল		১ ইস্পাত
সাদা		১ রৌপ্য

পারদের মধ্যে অন্য ধাতুর দ্রবণকে অ্যামাল-গাম বলা হয়। পূর্বকালে সোনার জল করিতে হইলে প্রথমে দুই ভাগ সোনার সঙ্গে এক ভাগ পারদ মিশাইয়া তামা, রূপা, ব্রোঞ্জ বা পিতলের উপর প্রলেপ দেওয়ার পর ঐ বস্তুকে আগুনের উপর উত্তমরূপে উত্তপ্ত করা হইত। ইহার ফলে পারদ আস্তে আস্তে বাষ্পাকারে উবিয়া যাইত আর বস্তুটির উপর সেনার একটা পাত্‌লা স্তর পড়িত। আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে সোনার প্রলেপ দেওয়া হয়। ১৮০৩ সালে ভল্টার শিষ্য ব্রাগনাটেলি এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং ডি লা রাইভ সর্বপ্রথম ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ করেন। প্রথমে একটি পাত্রে একশত ভাগ জলে এক ভাগ পটাসিয়াম সায়ানাইড ও এক ভাগ গোল্ড সায়ানাইড মিশাইয়া এক প্রকার রাসায়-নিক দ্রবণ প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর সেই জলের মধ্যে বিদ্যুতাধার হইতে বিদ্যুৎবাহী পজিটিভ তারের প্রান্ত বা অ্যানোডের সহিত একটি সোনার পাত সংলগ্ন করিয়া তাহার প্রায় অর্ধেকের বেশী অংশ ডুবাইয়া রাখিতে হয়। আর নেগেটিভ বা ক্যাথোড প্রান্তে তামা বা রূপার পাত্রাদি সংযুক্ত করিয়া ঐ দ্রবণে ডুবাইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালিত করিলেই ঈপ্সিত তাম্র বা রৌপ্য পাত্রের উপর সোনার একটা পাত্‌লা আস্তরণ পড়িয়া যায়।

অলঙ্কার, ঘড়ি ও মুদ্রা প্রস্তুতের কাজে প্রধানতঃ

সোনা ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া সোনার বাট তৈয়ার করিয়া ব্যাঙ্কে মজুত রাখা হইয়া থাকে। দাঁত বাঁধাইতে ও ফাউন্টেন পেনের নিব তৈয়ার করিতেও সোনার প্রয়োজন হয়। ফটোগ্রাফি, রেডিও এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ সোনার আবশ্যকতা আছে। ১৯৩০ সালে ডাক্তার ফরেষ্টিয়ার সন্ধিবাতের চিকিৎসায় স্বর্ণঘটিত ঔষধ অরোথায়োম্যালেটের ব্যবহার প্রচলন করেন। তদবধি এই ঔষধটি ঐ রোগে সাফল্যের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে। আয়ুর্বেদের মতে স্বর্ণ শীতল, বলকারক, রসায়ন, চক্ষুষ্মতা, কান্তি ও স্মৃতিপ্রদ, বয়ঃস্থাপক, আয়ু ও মেধা বর্ধক, শোষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ জ্বরনাশক।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত এই যে, সভ্যতার আদিকাল হইতে আধুনিক সময় পর্যন্ত দশ হাজার বৎসরের মধ্যে মানুষ ভূগর্ভ হইতে প্রায় ৫০,০০০ টন স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছে। ১৯৫৪ সালে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সম্মিলিত স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৫১০০০০০ আউন্স হইয়াছিল। এই পরিমাণ স্বর্ণ ১৩ ঘন ফুট স্থান পরিপূর্ণ করিতে সক্ষম। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালের অন্তর্গত জোহান্সবার্গের নিকট র‍্যাণ্ড স্বর্ণখনি ১৮৮৭ সালে আবিষ্কৃত হয়। বর্তমান কালে এই স্থান হইতে পৃথিবীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকে। এখানকার প্রতি টন স্বর্ণখনিজে আধ আউন্স আন্দাজ সোনা থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রেজিলের সোনার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাশিয়া, ক্যালিফোর্নিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয় এবং ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরেই আলাস্কার স্বর্ণখনি লোকের দৃষ্টিগোচর হয়। মিশরের নীল নদ ও লোহিত সাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের স্বর্ণখনি এবং এশিয়া-মাইনরের স্বর্ণখনি বহু প্রাচীন কালেই মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল। ইউরোপে ট্রানসিলভানিয়া, চেকোস্লোভেকিয়া ও বলকান রাষ্ট্রে স্বর্ণের অস্তিত্ব আছে। ইহা ছাড়া ইউরাল ও আল্পস্ পার্বত্য অঞ্চলে স্থানে স্থানে স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই তিন বৎসর গড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে কি পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়া ছিল, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

দেশ	স্বর্ণোৎপাদনের পরিমাণ
সোভিয়েট রাশিয়া	৫৩ লক্ষ আউন্স
ক্যানাডা	৪৬ ,, ,,
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৪৩ ,, ,,
মেক্সিকো	৮ ,, ,,
কলাম্বিয়া	৫ ,, ,,
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ	৯ ,, ,,
কোরিয়া	৮ ,, ,,
জাপান	৭ ,, ,,
দক্ষিণ আফ্রিকা	১২২ ,, ,,
দক্ষিণ রোডেসিয়া	৮ ,, ,,
গোল্ড কোষ্ট	৭ ,, ,,
কঙ্গো	৫ ,, ,,
অষ্ট্রেলিয়া	১৫ ,, ,,
ভারতবর্ষ	৩·৪ ,, ,,

এই সময়ের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে মোট স্বর্ণ উৎপাদনের পরিমাণ ৩৭৭ লক্ষ আউন্স।

১৯৫৩-৫৪ সালে সারা পৃথিবীতে স্বর্ণ উৎপাদনের হার এইরূপ ছিল—

দক্ষিণ আফ্রিকা	৫২%
ক্যানাডা	১৭%
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৭%
অষ্ট্রেলিয়া	৪%
ঘানা	৩%
দক্ষিণ রোডেসিয়া	২%

ফিলিপাইন	২%
মেক্সিকো	২%
কলাম্বিয়া	২%
অন্যান্য	৯%
	১০০%

১৯২৯ সালে সমস্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় ৪৩০০০০০০ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল।

দেশ	উৎপাদনের হার
দক্ষিণ আফ্রিকা	৫০%
সোভিয়েট রাশিয়া	২৫%
ক্যানাডা	১০%
আমেরিকার যুক্তরাজ্য	৪%
অষ্ট্রেলিয়া	২·৫%
ঘানা	২·৫%
অন্যান্য	৬%
	১০০%

যদি কোন দেশে সব সময় সেখানকার প্রচলিত মুদ্রার অনুপাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ইহাকে স্বর্ণমান বলা হয়; অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে কোন সময় নির্দিষ্ট মাত্রার সোনার পরিবর্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যাঙ্ক নোট বিনিময় করা সম্ভব। আন্ত-র্জাতিক অর্থের মানদণ্ড হিসাবে সোনার চাহিদা চিরকাল থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। বর্তমান কালে প্রায় অর্ধেক সোনা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয় ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। এখনও আন্তর্দেশীয় ঋণ পরিশোধ সোনার সাহায্যেই করা হইয়া থাকে।

ভারতে কোলার স্বর্ণখনি মহীশূর রাজ্যের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। এই স্থান মাদ্রাজ হইতে ১২৫ মাইল পশ্চিমে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। ১৮০২ সালে ওয়ারেন সর্বপ্রথম এই দেশের স্বর্ণ সংগ্রহ-পদ্ধতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এখানকার খনিজ পদার্থে স্বর্ণকণার পরিমাণ এত কম যে, খালি চোখে মোটেই দেখা যায় না। প্রতি টন স্বর্ণখনিজে প্রায় ১৬০ গ্রেণ পরিমাণ সোনা থাকে। ১৯৫৩ সালে উরগাঁও কোলার খনির গভীরতা এক স্থানে ৯৮৭৬ ফুট পর্যন্ত হইয়াছিল। সেই সময় ইহা পৃথিবীর মধ্যে নিম্নতম খনি ছিল। এখানকার স্বর্ণোৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল ১৯০৫ সালে। এই বৎসর এখান হইতে ৬১৬,৭৫৮ আউন্স স্বর্ণ উত্তো-লন করা হয়। ১৯৬৩ সালে কোলার খনি হইতে ৪:০৫ কিলোগ্র্যাম সোনা সংগ্রহ করা হয়। ইহা ছাড়া হায়দরাবাদ প্রদেশে হট্টি অঞ্চলে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারওয়ার জেলায় এবং ছোটনাগপুরে লওয়া নামক স্থান হইতে কিছু কিছু সোনা আহরণ করা হয়। ডাঃ ম্যাক্লারেন বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া ১৯০৩ সালে এই অভিমত প্রকাশ করিয়া যান যে, ভারতের বিভিন্ন নদীর পলিমাটি ও বালিতে সচরাচর যে পরিমাণ সোনা থাকে, সেই রকম পৃথিবীর খুব কম দেশেই দেখা যায়। ছোটনাগপুরে সুবর্ণরেখা ও অন্যান্য অনেক নদীর বালিতেই গড়ে প্রতি ঘনগজে এক হইতে দুই গ্রেণ হিসাবে সোনা আছে। এতদ্ব্যতীত হিমালয় প্রদেশের সিমলা, গাড়োয়াল, কাঙড়া ও কুমায়ুন অঞ্চলের অনেক নদনদী এবং আসামে ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর পলিমাটিতে সোনার রেণু আছে। এই সকল জায়গার শ্রমিক ও কৃষিজীবী অধিবাসীরা অতিরিক্ত আয়ের জন্য শীতকালে নদীর তীরবর্তী পলিমাটি ধুইয়া প্রতি বৎসর এখনও সামান্য পরিমাণ সোনা সংগ্রহ করিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার একাধিক নদীর বালিতে এই রকম স্বর্ণকণার অস্তিত্ব আছে। গাড়োয়ালের সোনা নদী ও খারসোয়ানের সোনা নদী এবং উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শোন নদীর প্রাচীন নাম হিরণ্যবাহ। খুব সম্ভব সে

যুগে ইহার বালুকা হইতে স্বর্ণ আহরণ করা হইত।

মধ্য যুগে অ্যালকেমিষ্টরা নিম্নশ্রেণীর ধাতু হইতে স্বর্ণ প্রস্তুতকরণের উপায় আবিষ্কার ও পরশ পাথরের অনুসন্ধানে অনেক পরিশ্রম, সময় ও অর্থব্যয় করিয়াছিল। তাহারা লৌহ-গন্ধক-ঘটিত খনিজ স্বর্ণমাক্ষিক ও সীসা একত্র করিয়া অস্থিভস্মের আধারে উত্তপ্ত করিত এবং উহার উপর দিয়া প্রবল বেগে বায়ুপ্রবাহ প্রয়োগ করিত। ইহার ফলে কিছুক্ষণ পরে ঐ লৌহ ও সীসা প্রচণ্ড অক্সিজেন প্রবাহে একযোগে বিদূরিত হইত আর পাত্রের তলায় শুধু ছোট্ট একটি সোনার দানা পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত। বলা বাহুল্য, স্বর্ণমাক্ষিকে সাধারণতঃ স্বাভাবিকভাবেই যৎ-সামান্য সোনা বিদ্যমান থাকে। অ্যালকেমিষ্টরা আর একটি উপায়ে সোনা তৈয়ার করিয়া দেখাইত। একটি ফাঁপা লোহার নলে পূর্ব হইতে গোপনে স্বর্ণচূর্ণ ভর্তি করিয়া রাখিত এবং তাহার মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া কোন উত্তপ্ত পাত্রের ভিতর তরল দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে নাড়াচাড়া করিত। অল্পক্ষণ পরেই নলের মোম গলিয়া যাইত আর সকলের অজ্ঞাতসারে সুবর্ণকণা পাত্রের অভ্যন্তরে স্থান লাভ করিত। তাহাদের অন্য আর একটি কৌশল ছিল এই যে, প্রথমে অর্ধেক লৌহ ও অর্ধেক স্বর্ণ দিয়া প্রস্তুত একটি পেরেক লইয়া তাহাতে উত্তমরূপে কালো বালির প্রলেপ লাগানো হইত। তাহার পর এই পেরেক লইয়া কোন পাত্রের ভিতর তরল বস্তুর মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া নাড়া হইত। তাহার ফলে বালি ধুইয়া গিয়া পূর্বের ব্যবস্থামত পেরেকের অর্ধেকটা সকলের কাছে যেন সোনায় পরিণত হইয়াছে, এরূপ মনে হইত। কখনও কখনও অর্ধেক সোনা ও অর্ধেক রূপা দিয়া তৈয়ারী সাদা রঙের মিশ্রধাতুর একটি মুদ্রা লইয়া সকলের সামনে নাইট্রিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবান হইত এবং কিছুক্ষণের মধ্যে রূপা গলিয়া গিয়া সর্বসমক্ষে মুদ্রার আধখানা যেন সোনায় পরিণত হইয়াছে, এই রকম মনে হইত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অ্যালকেমিষ্টরা কৃত্রিম উপায়ে স্বর্ণ প্রস্তুতে বিফল হইলেও আধুনিক কালে পদার্থবিদেরা এই কার্যে সফলতা অর্জন করিয়াছেন। ১৯৪১ সালে আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট পদার্থতত্ত্ববিদ্ কেনেথ বেনব্রিজ ৮০টি প্রোটন সমন্বিত পারদের পরমাণুর উপর নিউট্রনের সাহায্যে প্রচণ্ড সংঘাত হানিয়া উহাকে ৭৯টি প্রোটনযুক্ত স্বর্ণ-পরমাণুতে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হন।

তবে এই পরমাণু-সংঘর্ষের প্রক্রিয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কাজেই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ উৎপাদন সুদূরপরাহত বলিয়াই মনে হয়।

টাইটেনিয়াম

মোহাঃ আবু বাক্কার

আমরা জানি—কোন একটি ধাতু যেমন উত্তাপে কম-বেশী বর্ধিত হয়, অপর দিকে তেমনি আবার শৈত্যে কম বেশী সঙ্কুচিত হয়; অর্থাৎ উত্তাপে বৃদ্ধি এবং শৈত্যে সঙ্কোচন, যে কোন ধাতুর স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু এস্থলে আলোচ্য ধাতু টাইটেনিয়ামের ক্ষেত্রে ধাতুর এই স্বাভাবিক ধর্মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। টাইটেনিয়াম ধাতু উত্তাপে বর্ধিত না হয়ে ফেঁপে ওঠে এবং সঙ্কুচিত হয়। অপর দিকে এই ধাতুটিকে বাঁকালে কিংবা বাঁকিয়ে ছেড়ে দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে এটি সোজা হয়ে যায়। টাইটেনিয়াম ধাতুর এই সব ধর্ম, বিশেষ করে শেষোক্ত ধর্মটি আমাদের কাছে যেন ম্যাজিক বলে মনে হয়। সে জন্যে টাইটেনিয়াম ধাতুকে ম্যাজিক ধাতু বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না।

সাধারণভাবে টাইটেনিয়াম দিয়ে কোন জিনিষ নিখুঁতভাবে তৈরি করা যায় না; কারণ যখন এই ধাতুকে উত্তপ্ত করে গলানো হয়, তখন ধাতুটি বাতাস শুষে নেয়। এই শোষিত বাতাসই টাইটেনিয়ামকে ভঙ্গুর করে তোলে এবং এজন্যেই টাইটেনিয়াম দিয়ে জিনিষগুলি নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিংবা কিছু সময় পরে গুঁড়া হয়ে যায়।

খোলা বাতাসে এই ধাতুকে জোড়া দেওয়া অসম্ভব। কেন না, জোড়া দেবার সময় ধাতুটি ব্লটিং কাগজের কালি শোষণের মত বাতাস শুষে নেয়। এর ফলে এই ধাতু দিয়ে তৈরি জিনিষগুলি এত ভঙ্গুর হয়ে থাকে যে, জিনিষগুলিকে ভাঙবার জন্যে কেবলমাত্র একটা আঙুলের টোকা দেওয়াই যথেষ্ট।

টাইটেনিয়াম ধাতুর এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ধাতুর যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সুপারসোনিক এয়ার ক্র্যাফট (Supersonic aircraft) পরিকল্পনাকারীদের কাছে এর গুরুত্ব সোনার মতই। টাইটেনিয়াম ধাতু অ্যালুমিনিয়াম ধাতু অপেক্ষা কিছুটা ভারী হলেও এটি ইস্পাতের মতই শক্ত।

কেবলমাত্র কাঠিন্য এবং হাল্কা হবার জন্যেই নয়, এর ৭০০° ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপ সহনশীলতা এবং এই উষ্ণতায় ক্ষয়নিরোধক ধর্ম থাকবার জন্যে এই ধাতুটিকে অন্য যে কোন ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত করে বিভিন্ন প্রকার সঙ্কর ধাতুতে পরিণত করা যায়। এই কারণেই টাইটেনিয়াম ধাতু ব্যবহারের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সাধারণতঃ বিরল ধাতুগুলিই বেশী পরিমাণ তাপ সহ্য করতে পারে। এই দিক থেকে টাইটেনিয়াম যদিও বিরল ধাতুগুলির অন্তর্গত, তথাপি এই ধাতু প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। পৃথিবীপৃষ্ঠ যে সব ধাতু দিয়ে গঠিত, সেই সব ধাতুগুলির মধ্যে এটি চতুর্থ এবং সাধারণ ধাতুগুলির মধ্যে এর স্থান নবম।

টাইটেনিয়াম ধাতুর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য আকরিক হচ্ছে রুটাইল (Rutile) এবং ইল্‌মেনাইট (Ilmenite)। ফাউণ্ড্রিতে ব্যবহৃত এই আকরিকগুলি দেখতে কালো কালো বালুকার মত। আমাদের দেশে, আমেরিকায় এবং ব্রেজিলে ইল্‌মেনাইট প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, আধ ইঞ্চি পুরু

টাইটেনিয়ামের পাত্ দিয়ে তৈরি যে কোন প্রতিরোধক, আধ ইঞ্চি পুরু ইস্পাত দিয়ে তৈরি প্রতিরোধক অপেক্ষা অনেক বেশী দুর্ভেদ্য।

যদিও টাইটেনিয়াম আকরিক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তথাপি আকরিক থেকে এই ধাতুটি সহজে নিষ্কাশিত হয় না। কেন না, গলিত অবস্থায় টাইটেনিয়াম রাসায়নিকভাবে এত সক্রিয় থাকে যে, পারিপার্শ্বিক যে কোন পদার্থের সঙ্গে সেটা মিশে যায়। এমন কি, যে চুল্লীতে একে নিষ্কাশন করা হয়, সেই চুল্লীর ধাতু অর্থাৎ যে সব ধাতু দিয়ে সেই চুল্লীটি নির্মিত, সেগুলিও গলিত টাইটেনিয়ামে দ্রবীভূত হয়। তবে এই ধাতুকে তামার ফাঁপা দেয়ালবিশিষ্ট চুল্লীতে গলিয়ে নিষ্কাশন করা হয়। এই সব তাম্র-চুল্লীর বাইরের চারদিকে ঠাণ্ডা জল পরিচালনা করে চুল্লীগুলিকে যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা রাখা হয়। বাইরে থেকে জল পরিচালনা করে চুল্লীগুলিকে ঠাণ্ডা রাখবার ফলে চুল্লীর অভ্যন্তরে গলিত টাইটেনিয়ামেরই একটা শক্ত আবরণ পড়ে। এই আবরণই চুল্লীগুলিকে ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চুল্লীর মধ্যে টাইটেনিয়ামকে বৈদ্যুতিক উপায়ে গলিয়ে নিষ্কাশন করা হয়।

টাইটেনিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতু, যেমন—ভ্যানাডিয়াম, মলিবডিনাম প্রভৃতি মিশ্রিত হয়ে কার্যোপযোগী শক্ত সঙ্কর ধাতু তৈরি করে। কিন্তু যেহেতু টাইটেনিয়াম ধাতু বাতাস থেকে অক্সিজেন কিংবা নাইট্রোজেন শোষণ করে, যার ফলে তৈরি জিনিষসমূহ ভেঙ্গে যায়, সেহেতু সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতের কাজ বায়ুশূন্য চুল্লীতে করা হয়।

টাইটেনিয়াম ধাতুকে হয় আর্গন গ্যাসপূর্ণ প্লাষ্টিক আধারে কিংবা অতিরিক্ত সচ্ছিদ্র নল-যুক্ত ওয়েল্ডিং টর্চের সাহায্যে জোড়া লাগানো হয়। টর্চের আলোক শিখাকে বাতাসের সান্নিধ্য থেকে পৃথক রাখবার জন্যে অতিরিক্ত সচ্ছিদ্র নলের সাহায্যে টর্চের আলোক শিখার চতুর্দিকে আর্গন গ্যাস পরিচালনা করা হয়। এর ফলে জোড়া লাগাবার কাজ নির্বিঘ্নে করা যায়।

বর্তমানে টাইটেনিয়াম নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হচ্ছে। আজকের শিল্পে এটা দেখা গেছে যে, টাইটেনিয়াম ধাতুর ব্যবহার নির্মাণ-ব্যয় কমাতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে তৈরি জিনিষ-গুলিকে ক্ষয়-প্রতিরোধক, শক্ত এবং হাল্কা করবার প্রয়োজন হয়, সে সব ক্ষেত্রে টাইটেনিয়াম ব্যবহার করা যেতে পারে।

আজকের মহাকাশ-অভিযানের যুগে টাইটেনি-য়ামের মত ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অনেক বেড়ে গেছে। রকেট ইত্যাদি প্রস্তুতিতে টাইটেনিয়ামের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বর্তমানের রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে যতদূর সম্ভব হাল্কা শক্ত, ক্ষয়-প্রতিরোধক ও তাপ-রোধক করবার দিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন হওয়ায় টাইটেনিয়াম নিয়ে অনেক গবেষণা করা হচ্ছে। আমরা ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানের যুগে এই ধাতু সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবো।

বিজ্ঞান-সংবাদ

বাতাসের নাইট্রোজেনের সাহায্যে কৃষি-সার উৎপাদনের আয়োজন

নাইট্রোজেন কৃষিসারের অন্যতম প্রধান উপাদান। বাতাসে যে অফুরন্ত নাইট্রোজেন রয়েছে, তাকে কাজে লাগাবার একটি উপায় সম্প্রতি জনৈক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল ফাউণ্ডেশনের বৃত্তির সাহায্যে নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ জেম্‌স্ পি. কোলম্যান নতুন অজৈব যৌগিক পদার্থসমূহ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এই গবেষণা চালাতে গিয়েই আবহমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহের অভিনব পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়েছে। ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে এই আবিষ্ক্রিয়া খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মিঃ কোলম্যান দেখেছেন, দুটি যৌগিক পদার্থের সাহায্যে বাতাসের এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা যেতে পারে। বাতাসের শতকরা ৭৫ ভাগই নাইট্রোজেন এবং রাসায়নিক দিক থেকে এই মৌলিক পদার্থটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে বলে মানুষ এটিকে বাতাস থেকে সংগ্রহ করে এযাবৎ কাজে লাগাতে পারে নি। নিষ্ক্রিয় অর্থে অন্য পদার্থের সঙ্গে এটি সহজে যুক্ত হয় না, অর্থাৎ যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলে না।

তবে অতিরিক্ত চাপ ও অতি উচ্চ তাপের সাহায্যে নাইট্রোজেনকে অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্ত করে যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলা যায়; কিন্তু তা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। এপর্যন্ত এই ব্যয় বাহুল্যের জন্যেই বাতাসের নাইট্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে নাইট্রোজেনযুক্ত কৃষিসার তৈরি সম্ভব হয় নি।

ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ডাঃ কোলম্যান প্রত্যক্ষভাবে বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করেন নি। একটি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তিনি ইরিডিয়াম ও রেডিয়ামের সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেন সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছেন। এই নাইট্রোজেনকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে এই আবিষ্ক্রিয়া একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ডাঃ কোলম্যান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বাতাসের নাইট্রোজেন শুষে নিতে পারে, এরকম যৌগিক পদার্থের সন্ধানই হচ্ছে এই গবেষণার উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই পদার্থটি অনুঘটকের কাজ করবে। যৌগিক পদার্থটি বাতাসের নাইট্রোজেন আত্মসাৎ করবার পর ঐ নাইট্রোজেন যাতে বাতাসের হাইড্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। তারই ফলে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া। কৃষিসার উৎপাদনে অ্যামোনিয়া প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। অ্যামোনিয়ার উৎপাদনও খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। কারখানায় অ্যামোনিয়া উৎপাদনের জন্যে ৯০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ এবং প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ৬০০০ পাউণ্ড চাপের প্রয়োজন হয়।

বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করবার যে পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে সমগ্র বিশ্বই কৃষি উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ উপকৃত হবে।

ফাউণ্ডেশন এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, দু-জন বিদেশী গবেষকও বাতাসের নাইট্রোজেন শুষে নেবার মত যৌগিক পদার্থ উদ্ভাবন করেছেন বলে গত বছর জানিয়েছিলেন।

মোটর টায়ারের অবস্থা নিরূপণের অভিনব পদ্ধতি

মোটর গাড়ী বা এরোপ্লেনের চাকা অনেক সময় রাস্তাঘাটে চলবার কালে হঠাৎ ফেটে গিয়ে বিপদ ঘটিয়ে থাকে। চাকাটির অবস্থা কেমন, তা ফাটবার উপযোগী হয়ে আছে কি না, তা আগে থেকেই জানবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে।

মোটর গাড়ীর টায়ারের সঙ্গে একটি ছোট্ট রেডিও ট্র্যান্সমিটার বা বেতার বার্তা প্রেরণযন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়। গাড়ীর গতি যখনই কমে বা বাড়ে, তখনই চাকার মধ্যে বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। চলন্ত গাড়ীর চাকার বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রার যথাযথ খবর এই বেতার যন্ত্রটি সরবরাহ করে থাকে।

এই ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হবার পূর্বে গাড়ীর চলা বন্ধ হয়ে যাবার পর ইঞ্জিনিয়ারগণ প্রেসার গজ ও থার্মোইলেকট্রিক কাপল নামক যন্ত্রের সাহায্যে চাকার অবস্থা নিরূপণ করতেন। চলবার কালে চাকার অবস্থা জানতে না পারলে চাকার প্রকৃত অবস্থায় সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। কোন টায়ারের পরমায়ুর পরিমাপ করতে হলে ইঞ্জিনিয়াদের টায়ারের ভিতরের বায়ুর চাপ এবং টায়ারের তাপমাত্রার পরিমাণ জানা একান্ত আবশ্যক। আমেরিকার ওহিয়োর আকরনস্থিত বৃহত্তম রবার কারখানা গুড ইয়ার অ্যাণ্ড রাবার কোম্পানী কর্তৃক এই নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে—তাঁরাই এই ক্ষুদ্র বেতার যন্ত্রটি নির্মাণ করেছেন। মহাকাশযাত্রীদের শরীরের অবস্থার খবরাখবর এই বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতিতে মহাকাশচারীদের কব্জিতে ও বুকে ক্ষুদ্র যন্ত্রটি বেঁধে দেওয়া হয়। মহাকাশচারীর রক্তের চাপ, হৃৎপিণ্ডের কম্পনের মাত্রা, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও দেহের তাপমাত্রার খবর এই যন্ত্র সরবরাহ করে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ঐ সকল সংবাদ আবার ইলেকট্রনিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হয় এবং বেতারযোগে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়ে থাকে।

মোটর গাড়ীর চাকার মধ্যে যে বেতার যন্ত্রটি জুড়ে দেওয়া হয়, তাও ঠিক এইভাবেই কাজ করে। মোটর গাড়ীর টায়ারের ভাল্‌বের কাছে একটি ছোট্ট ইলেকট্রনিক প্রেসার গজ অথবা ট্রান্সডিউসার লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটি বায়ুর চাপ সম্পর্কে সকল খবর বেতার যন্ত্রে সরবরাহ করে, আর ঐ বেতার যন্ত্রে তাপমাত্রা সরবরাহ করে চারটি থার্মিস্টার। প্রত্যেকটি দেখতে একটি ছোট্ট পিনের মাথার মত। তবে তাপ ও চাপমাত্রার খবরসমূহ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সাঙ্কেতিক চিহ্নে রূপান্তরিত হয়। বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্রটি কর্তৃক প্রেরিত সকল খবর এতদসংক্রান্ত গবেষণাগারের বার্তাগ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত হয় এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অনুসারে এই সব সংবাদ গ্রাফের আকারে কাগজে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাথেকেই ইঞ্জিনিয়ারেরা টায়ারের অবস্থা নিরূপণ এবং নতুন ধরণের টায়ারের গুণাগুণ পরীক্ষা করতে পারেন।

RETINOBLASTOMA

ETHMOIDAL SARCOMA

SKIN CANCER

FUNGATED CANCER OF THE NECK

CANCER
A DISEASE OF ALL AGES, ALL SITES.

RECTICULAM CELL SARCOMA

BREAST CANCER

TONGUE CANCER

VULVAL CANCER

ORAL CANCER

CHITTARANJAN NATIONAL CANCER RESEARCH CENTRE, CALCUTTA-26.

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জেনে রাখ

আকস্মিক আবিষ্কার

প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ চিন্তা করে, গবেষণা করে অনেক কিছুই আবিষ্কার করেছে—কিন্তু কোন চিন্তা বা গবেষণা ব্যতিরেকেই আকস্মিকভাবে এমন বহু জিনিষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

তোমরা অনেকে হয়তো জান—স্যাকারিন নামে সাদা একটা দানাদার জিনিষ চিনির চেয়ে প্রায় পাঁচ-শ' পঞ্চাশ গুণ বেশী মিষ্টি। এক গ্লাস জলে সামান্য একটু স্যাকারিন ফেলে দিলেই জলটা মিষ্টি হয়ে যায়; কিন্তু পরিমাণে একটু বেশী হলেই জলটা তেতো লাগে। গুড়, চিনি প্রভৃতির পরিবর্তে স্যাকারিন ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু এর কোন খাদ্য বা পুষ্টিগুণ নেই। যাহোক, এই স্যাকারিন জিনিষটা আবিষ্কৃত হয়েছিল আকস্মিকভাবে। আবিষ্কারের পূর্বে কেউ ধারণাও করে নি যে, চিনির চেয়ে এরূপ অসম্ভব রকমের মিষ্টি কোন পদার্থ থাকতে পারে।

ফালবার্গ নামে এক তরুণ রসায়ন-বিজ্ঞানী জন হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে আলকাত্‌রা থেকে পাওয়া টলুইন নিয়ে একটা পরীক্ষা করছিলেন, কিন্তু বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও সাফল্য লাভ হচ্ছিল না। বিফলতার কারণ বুঝতে না পেরে ক্লান্তভাবে একদিন তিনি ঘরে ফিরে এসে গৃহকর্ত্রীকে কিছু খাবার দিতে বললেন। খাবার খেয়ে তক্ষুনি আবার লেবরেটরীতে যেতে হবে। খাবার আনা হলে তিনি সেই খালি হাতেই খাওয়া

সুরু করলেন। কিন্তু এ কি ব্যাপার! চা, রুটি যা মুখে দেন—প্রত্যেকটাই অসম্ভব রকম মিষ্টি। মিষ্টি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না—তাতে আবার এত বেশী মিষ্টি! গৃহকর্ত্রীকে রাগতস্বরে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন যে, তিনি তাতে মোটেই মিষ্টি দেন নি।

তবে কি তাঁর নিজের হাতেই কোন মিষ্টি জিনিষ লেগে রয়েছে?—এই ভেবে তিনি হাতের আঙুল মুখে দিয়ে দেখলেন—সত্যই তো আঙুল অসম্ভব মিষ্টি লাগছে! তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন লেবরেটরীতে। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট যে সব রাসায়নিক পদার্থ টেবিলের উপর ছিল, সেগুলিকে একে একে পরীক্ষা করে একটির মধ্যে মিষ্টি স্বাদ পাওয়া গেল। এর ফলেই আবিষ্কৃত হলো স্যাকারিন।

আর একটা আকস্মিক আবিষ্কারের কথা বলছি। আজকাল সেলুলয়েড বা ব্যাকেলাইটের জিনিষের মত অথচ সেগুলির চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও উজ্জ্বল নানা রঙের চায়ের পেয়ালা, গেলাস, বাটি, ফাউন্টেন পেন, ছাতার বাঁট, চিরুণী ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। এগুলি কি থেকে তৈরি হয়—জান? এগুলি তৈরি হয় দুধ থেকে। দুধ থেকে কেজিন বা ছানা তৈরি করে সেই ছানা দিয়েই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই জিনিষগুলি প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু দুধের ছানা থেকে যে এরূপ জিনিষ তৈরি হতে পারে, তা কেমন করে আবিষ্কৃত হলো—জান? এটাও একটা আকস্মিক আবিষ্কার।

একজন রসায়ন-বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে কাজ করছিলেন। টেবিলের উপর একটা পাত্রের মধ্যে বেশ খানিকটা চিজ (পণির) রাখা ছিল। পণির অর্থাৎ চিজ যে ছানা ছাড়া আর কিছু নয়, তা বোধ হয় তোমরা সবাই জান। হঠাৎ টেবিলের উপর একটা বিড়াল এসে পড়লো। বিজ্ঞানীও সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করলেন বিড়ালটাকে। তাড়া খেয়ে বিড়ালটা লাফিয়ে পালিয়ে যাবার সময় একটা বোতল উল্টে গিয়ে ভেঙে পড়লো ঐ চিজের পাত্রটার উপর। তখন কিছু বোঝা যায় নি। বোঝা গেল অনেকক্ষণ পরে, যখন দেখা গেল—পাত্রটার মধ্যে চিজের পরিবর্তে রয়েছে হাতীর দাঁতের মত শক্ত একটা সাদা জিনিষ।

কি হলো? দেখা গেল, ওই উল্টে-পড়া বোতলটার মধ্যে ছিল—ফর্ম্যালডিহাইড। ফর্ম্যালডিহাইড পাত্রের পণির অর্থাৎ কেজিনের সঙ্গে মিশে তাকে সাদা শক্ত জিনিষে পরিবর্তিত করেছে। এথেকেই গড়ে উঠেছে এই নতুন শিল্প।

বাংলার প্রাচীন ও বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিম বাংলায় এখন সর্বসমেত সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সেগুলি হচ্ছে—কলকাতা, যাদবপুর, বিশ্বভারতী, উত্তর বঙ্গ, বর্ধমান, কল্যাণী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের এক বিরাট ঐতিহ্যসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতের বহু খ্যাতনামা মনীষী, হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, গবেষক—নয়তো অধ্যাপক ছিলেন। কাজেই বাংলার একটি সর্বাঙ্গীন পরিচয় পেতে হলে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাও জানা দরকার।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব ওঠে ১৮৪৪ কি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তখন সে প্রস্তাব ইংরেজ সরকার অনুমোদন করেন নি। কিন্তু পরবর্তী দশ বছরের মধ্যেই ইংরেজদের মত বদ্‌লে যায়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জুলাই শিক্ষা সম্বন্ধে এক শতটি অনুচ্ছেদ সমন্বিত এক বিধান-পত্র এদেশে পাঠান। তাতেই কলকাতায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সারবত্তা স্বীকৃত হয়।

বিলাতী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রস্তাবিত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী রচনার জন্যে ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটিতে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আরও কয়েকজন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। কমিটি ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁদের কাজ শেষ করে রিপোর্ট পেশ করেন।

তারপর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি জন্মলাভ করে। এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে গঠিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সভা সেনেট নামে অভিহিত হয়। বড়লাট লর্ড ক্যানিং হন প্রথম চ্যান্সেলার, আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার জেমস্ উইলিয়াম কলভিল হন প্রথম ভাইস চ্যান্সেলার। প্রথম পরিচালক সভা বা সেনেটে চ্যান্সেলার ও ভাইস চ্যান্সেলার সমেত মোট একচল্লিশ জন সদস্য ছিলেন। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সভা বা সিণ্ডিকেট গঠিত হয় এবং সিণ্ডিকেটের প্রথম অধিবেশন বসে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২৪৪ জন। আর সে সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। প্রথম বছর বাংলা ও সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পরীক্ষকেরাই প্রশ্নপত্র তৈরি করতেন। প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজী বাদে গ্রীক, ল্যাটিন, আরবী, ফারসী, হিব্রু, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও উর্দুর যে কোন একটি এবং ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক ও বিজ্ঞান—এই

কয়টি বিষয়ে পরীক্ষা গৃহীত হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন অধ্যাপক উইলিয়াম গ্র্যানেল।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম এল. এম. এস. পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৮৫৭ সালের ২রা মার্চ তারিখে। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমা ছিল সুদূর বিস্তৃত—পশ্চিমে লাহোর থেকে পূর্বে রেঙ্গুন পর্যন্ত; অর্থাৎ গোটা উত্তর ভারত ও ব্রহ্মদেশ এর আওতার মধ্যে ছিল। একালে এতটা বিরাট এলাকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনের পর ষোল বছর ধরে এর কাজকর্ম ভাড়াটে বাড়ীতেই চলেছিল। তারপর ভারত সরকারের সাহায্যে ১৮৭৩ সালে সেনেট ভবন নির্মিত হয়। নির্মাণের জন্যে খরচ পড়ে ৪·৩৫ লক্ষ টাকা। সিনেট হল নির্মিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ এখানেই হতে থাকে। দীর্ঘকাল ধরে এই সিনেট হলই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকেন্দ্র ছিল।

এরপর ক্রমাগত বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারিত হতে থাকে। একে একে গড়ে ওঠে দ্বারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবন, আশুতোষ ভবন, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেল ও বিজ্ঞান কলেজ ভবন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার আড়াই লক্ষ টাকা দানে গড়ে ওঠে দ্বারভাঙ্গা ভবন। সার তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান কলেজ ভবন নির্মাণের জন্যে যে জমি ও অর্থ দান করেন, তার মোট মূল্য পনেরো লক্ষ টাকা। রাসবিহারী ঘোষ মোট ২১·৪৩ লক্ষ টাকা দান করেন—কারিগরী শিক্ষার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। বোম্বাই নিবাসী প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন দুই লক্ষ টাকা দান করেন। সেই টাকার সুদ থেকে প্রতি বছর উৎকৃষ্ট গবেষণা প্রবন্ধের জন্যে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি দেওয়া হয়। এই বৃত্তি প্রথম লাভ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—১৮৬৮ সালে। দানবীর প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের দানের আয় থেকে সৃষ্টি করা হয় 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদ। এই পদ প্রথম লাভ করেন হার্বার্ট কাওয়েল—১৮৭০ সালে। এছাড়া আরও অনেক দাতার দানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমৃদ্ধ হয়েছে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেশ কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষা-নিয়ামক কেন্দ্র রূপেই পরিচিত ছিল। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির বীজ ছড়াচ্ছিল। কিন্তু পরে এটি উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৭৫ সালে একটি আইন বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'অনারেরী ডক্টর অফ ল' ডিগ্রী দানের অধিকার অর্জন করেন। ঐ বছরের সমাবর্তন উৎসবে প্রথম এই ডিগ্রী দেওয়া হয় রাজা সপ্তম এডোয়ার্ডকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন ডক্টর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি উপাচার্য ছিলেন ১৮৯০ সালে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার জন্যে অনেকগুলি বিভাগ বা ফ্যাকালটি আছে। এই সব বিভাগের মধ্যে আছে কৃষি, কলা, বাণিজ্য, শিক্ষা, ইঞ্জিনীয়ারিং, ললিত কলা, সঙ্গীত, আইন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও পশু চিকিৎসা বিভাগ। প্রতিটি বিভাগ বা ফ্যাকালটির সভাপতিকে বলা হয় ডীন। ভারতবাসীদের মধ্যে কলা বিভাগের সর্বপ্রথম ডীন হন পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আইন শাস্ত্রে ডীন হন বিচারপতি রমেশচন্দ্র মিত্র, চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে—সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আর বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বাঙ্গালী ডীন হন—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ১৯১৭ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, পর্তুগীজ, চীনা এবং তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষার ক্লাস সুরু হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পাশ করে প্রথম মহিলা ডাক্তার হন কাদম্বিনী বসু।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্র বিভাগ স্থাপিত হয় ১৯১২ সালে। ১৯২১ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক ও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রামন ১৯১৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয়েই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানেই গবেষণা চালিয়ে তিনি আলো বিকিরণ তত্ত্ব 'রামন এফেক্ট' আবিষ্কার করেন এবং এই আবিষ্কারের জন্যেই ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামটি শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহাগার। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিও বিশাল। প্রায় তিন লক্ষ গ্রন্থ আছে এই গ্রন্থাগারে। ১৯০৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসটি স্থাপিত হয়। শত শত গবেষণা-পুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে এই প্রেসেই। এই প্রেস থেকেই শতাধিক বছরের পুরাতন ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু অমূল্য গ্রন্থরাজিও এই প্রেস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

বাংলা, তথা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান অপরিসীম।

অমরনাথ রায়

কীট-পতঙ্গের কারিগরী দক্ষতা

কীট-পতঙ্গ অতি সাধারণ স্তরের জীব—একথা আমরা প্রায় সবাই ভেবে থাকি। এদের সামাজিক জীবন, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও সাধারণতঃ কম। কিন্তু সব রকম কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে একথা সত্য নয়। কোন কোন কীট-পতঙ্গের জীবনে বৈচিত্র্যপূর্ণ এমন কিছু দেখা যায় না, যা সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। আবার এমন অনেক কীট-পতঙ্গ দেখা যায়—যাদের বিচিত্র চাল-চলন, বাসস্থান, আকৃতি-প্রকৃতি আমাদের কৌতূহল সৃষ্টি করে। তোমাদের পরিচিত কয়েকটি কীট-পতঙ্গের চাল-চলন একটু চেষ্টা করলেই নিজের চোখে দেখতে পাবে। এখন কয়েকটি কীট-পতঙ্গের বিচিত্র কারিগরী দক্ষতার কথা বলছি। প্রধানতঃ বাসা নির্মাণেই এদের বিচিত্র কারিগরী দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়।

ঝুঁড়ি-পোকা বা কাঁটা-পোকা তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে! এদের বাসা যদি দেখ, তবে অবাক না হয়ে পারবে না। কাঁটার মত আকৃতিবিশিষ্ট বাসা তৈরি করে এরা গাছের গায়ে লেগে থাকে। কাঁটাগুলির অগ্রভাগ সরু এবং গোড়ার দিক ক্রমশঃ মোটা হয়ে গেছে। রং সামান্য লালচে। কাঁটাগুলি মাঝে মাঝে না নড়লে বোঝবার উপায়ই নেই যে, সেগুলি প্রকৃতই গাছের কাঁটা নয়—এক রকম পোকার বাঁসা। কাঁটার মত বাসাটা অত্যন্ত হাল্কা এবং ফাঁপা এবং ভিতরেই বাসস্থানের অধিকারী বাস করে। এই সব পোকার মুখের অংশটা গাঢ় বাদামী রঙের এবং শরীরের বাদবাকী অংশের রং হাল্কা বাদামী।

এই সব পোকা তাদের মুখ দিয়ে খুব সরু সূতা বুনে কাঁটার মত আকৃতিবিশিষ্ট বাসা তৈরি করে। তারা অপূর্ব কৌশলে গাছের ছাল থেকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লাল্চে রঙের টুক্রা সংগ্রহ করে বাসার কাঠামোর সর্বত্র বসিয়ে দেয়। তখন আর আসল বা নকলের তফাৎ বুঝা যায় না সহজে—মনে হয় গাছের কাঁটা। কাঁটা-পোকা বা ঝুঁড়ি-পোকারা খুব সাবধানী। তারা বাসা সমেত খাদ্যের সন্ধানে ইতস্ততঃ চলাফেরা করে। তোমরা প্রশ্ন করতে পার, বাসা সমেত পোকাটা চলাফেরা করে কেমন করে? ওদের মুখের সামনের দিকে দুটি ধারালো দাঁত সাঁড়াশির মত বাঁকানো। এই বাঁকানো দাঁত দিয়ে গাছের ছালের এক স্থান কামড়ে ধরে আরেক স্থানে যায়। এরা গাছের ছালের সূক্ষ্ম অংশ ভক্ষণ করে। এক জায়গার খাবার ফুরিয়ে গেলেই আর এক জায়গায় খাদ্যের সন্ধানে যায়। খাবার সময় বাসাটাকে চটচটে সুতার মত পদার্থের সাহায্যে গাছের গায়ে কিছুক্ষণের জন্যে আটকে রাখে। যে গাছে

এরা বাস করে তার সঙ্গে এদের যেন বন্ধুত্ব আছে বলা চলে। কারণটা কি জান? কাঁটা-পোকা যেমন গাছের ছাল কুরে কুরে খায়—তেমনি অসংখ্য লালচে কাঁটা প্রতিদানে গাছের ক্ষতিকারক শত্রুর প্রতিরোধে সাহায্য করে, অর্থাৎ এদের গাছের গায়ে দেখবার পর শত্রুর আর এগুতে সাহস হয় না। খেতে খেতে পূর্ণবয়স্ক হবার পর এরা বাসার মধ্যে পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয় এবং বাসাটা তখন এক জায়গায় শক্তভাবে আটকানো থাকে। নিশ্চল অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত করবার পর পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গে পরিণত হয়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে। যাযাবর মানুষ যেমন ঘরবাড়ী সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেড়ায়, এরাও তেমনি বাড়ীঘর সঙ্গে নিয়ে চলে। নানা জাতের কাঁটা-পোকা বা ঝুঁড়ি-পোকা আমাদের দেশে দেখা যায়। বাচ্চা অবস্থায় এরা যে রকম কারিগরী দক্ষতার পরিচয় দেয়, পরিণত বয়সে সেরূপ দক্ষতা দেখা যায় না।

লতা-গুল্ম বা ঘাস-পাতার মধ্যে এক ইঞ্চির মত লম্বা এক জাতীয় ঝুঁড়ি-পোকা দেখা যায়। এরা তাদের বাসার উপরে দুর্বাঘাসের টুক্‌রা স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখে। মনে হয় বাসার উপর যেন নক্সা এঁকেছে। বাসাটাকে নিয়েই এরা হাঁটা-চলা করে। সূতার মত সরু লম্বাটে ধরণের এই ঝুঁড়ি-পোকা এভাবে শত্রুর চোখে ধূলা দেয়। সুপারী গাছের কাণ্ডে শ্যাওলার সাহায্যে অদ্ভুত বাসা তৈরি করে ঝুঁড়ি-পোকা শত্রুকে প্রতারিত করে। শ্যাওলার টুক্‌রাগুলি জমাট বেঁধে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু শ্যাওলার টুক্‌রাগুলি ইতস্ততঃ নড়াচড়া করায় বোঝা যায় ঐগুলি কোন পোকার বাসা।

জলে বিচরণকারী কয়েক জাতের ঝুঁড়ি-পোকা জলজ লতাপাতার সাহায্যে বাসা প্রস্তুত করে। এই সব ঝুঁড়ি-পোকার আকৃতি অনেকটা শোঁয়াপোকার মত। এরা দাঁতের সাহায্যে অর্ধচন্দ্রের আকারে পাতা কেটে নিয়ে—তা জলে ভাসিয়ে আর একটা পাতার উপর নিয়ে আসে এবং আঠালো পদার্থের সাহায্যে পাতা দুটা জুড়ে দিয়ে নীচের পাতাটিকে ঐ মাপে কেটে ফেলে। পোকাটা পাতার ভাঁজের মাঝখানে থাকে এবং পাতাটা ভেলার মত ভাসতে থাকে। দরকার হলে এরা পাতার ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে সাঁতার কেটে ভেসে বেড়ায় এবং বাসাটাকেও সঙ্গে নিয়ে চলে। কিছু দিন বাদে বাসার মধ্যে পুত্তলীর রূপ ধারণ করে যথাসময়ে গুটি কেটে পূর্ণবয়স্ক পতঙ্গরূপে বেরিয়ে আসে।

নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে মাকড়সার জাল বোনা উল্লেখযোগ্য। সব জাতের মাকড়সার জালই যে দেখতে সুন্দর হয় তা নয়। কিন্তু কয়েক জাতের মাকড়সা অতি সুন্দরভাবে ধৈর্য সহকারে জাল বুনে থাকে এবং এই জাল বোনায় যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেয়। কোন কোন মাকড়সা ইতস্ততঃ সূতা বিছিয়ে মাঝখানে গর্তের মত ফাঁদ পেতে রাখে।

বোলতা, মৌমাছির চাক তৈরির ব্যাপার তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। ভ্রমরের বাসা তৈরিও কৌশলও কম বিচিত্র নয়। বাসা তৈরির আগে এরা এমন পুরনো কাঠের খণ্ড নির্বাচন করে, যা ফাঁপা অথবা যাতে লম্বা গর্ত আছে। তারপর বাসা প্রস্তুতের মাল-মসলা সংগ্রহ করে আনে। সাধারণতঃ এরা গোলাপ বা ঐ জাতীয় কোন গাছের সবুজ পাতা ডিম্বাকৃতির মত করে কেটে নিয়ে আসে। তারপর পাতাগুলিকে চুরুটের মত জড়িয়ে বাসা বানায়। পাতার ভাঁজের মধ্যস্থলে ডিম পাড়ে এবং বাচ্চাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও করে রাখে। প্রতিটি গর্তের মধ্যে এরকম ৮।১০টা জড়ানো পাতার গুটি রেখে দেয় এবং প্রতিটি গুটির মধ্যেই একটা করে ডিম থাকে।

আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে থুথুপোকা নামে পরিচিত অতি ক্ষুদ্র এক জাতীয় পতঙ্গ দেখা যায়। এদের বাচ্চাগুলি নিজেদের দেহ থেকে ফেনার মত থুথু বের করে তার ভিতরে লুকিয়ে থাকে। ফেনার মত থুথুই এদের বাসা। গুব্‌রেপোকা জাতীয় এক প্রকার পতঙ্গের বাচ্চাগুলি অপূর্ব কৌশলে বাসা তৈরি করে তার মধ্যে নিশ্চিন্তে বাস করে। এরা ৫।৬ ইঞ্চি পাতাকে মুখ দিয়ে মুড়ে সুতার দ্বারা জুড়ে দেয়। দেখলে টুনটুনি পাখীর বাসার কথা মনে পড়ে। ক্যাডিস ফ্লাই নামে আমাদের দেশে কয়েক জাতের পতঙ্গ দেখা যায়। এরা আকারে খুব ছোট এবং ছোট নলের মত বাসা তৈরি করে। কারো কারো বাসা আবার দেখায় ক্ষুদ্রাকৃতির শামুকের মত কুণ্ডলী পাকানো।

এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার মথের বাচ্চা শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে। গোলাপ, করমচা প্রভৃতি গাছের ডালপালা বা পাতার নানা স্থানে কালো রঙের এক একটি বিচিত্র পদার্থ ঝুলে থাকতে দেখা যায়। বাড়ীঘরের দেয়ালে, আনাচে-কানাচে যেমন ঝুল থাকে, ঠিক সে রকম দেখতে। লম্বা গোলাকার এই অদ্ভুত পদার্থের চারদিকে এক ইঞ্চি বা দেড় ইঞ্চি লম্বা কতকগুলি শুক্‌নো কাঠি আঠা দিয়ে আটকানো থাকে। কাঠিগুলি জোরে টেনে তুলে নিলে খুব নরম একটি নলের মত পদার্থ বেরিয়ে পড়ে। নলটা ছিঁড়লে একটা ছোট মথের বাচ্চা দেখা যায়। এরা গাছের ছাল বা পাতা উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে। এরা দেহের আবরণের উপর ছোট ছোট ডালের টুক্‌রা দাঁত দিয়ে কেটে এনে চার দিকে বসিয়ে দেয়। বাসার পথটা থাকে উপরের দিকে। এই অবস্থায় এরা দাঁত দিয়ে ডালপালা কামড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। অবসর সময়ে এদের মুখের কাছে যে আল্‌গা সুতা সঞ্চিত থাকে, তার সাহায্যে বোঁটার মত করে শক্তভাবে বাসা ঝুলিয়ে রাখে। ঝুলন্ত বাসার মধ্যেই বাচ্চাটা পুত্তলীর আকার ধারণ করে এবং পরে পরিণত মথে রূপান্তরিত হয়ে গুটি কেটে বেরিয়ে আসে।

আমাদের বাড়ীঘরের দেয়ালে, বেড়ার গায়ে চিঁড়ে-পোকা নামে এক প্রকার পোকা দেখা যায়। এদের বাসা চিঁড়ের মত চ্যাপ্টা। এরা থেমে থেমে চলে।

বাসায় দুটা পথ আছে দু-দিকে। এক দিকের পথ চলবার সময় বাধা পেলে অপর দিকের পথটাকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগায়। একদিকের মুখ বন্ধ করে দিলে অন্য দিকের পথ দিয়ে মুখ বের করে কাজ করতে থাকে। নলখাগড়া বা বাঁশের বেড়ার গায়ে ছোলা-পোকা নামে এক প্রকার পোকা দেখা যায়। এদের বাসার আকৃতি ছোলার মত দেখতে। ছোলার মত একটা সরু থলের মধ্যে এরা বাস করে। বেড়ার গায়ের অতি ক্ষুদ্র শ্যাওলা জাতীয় পদার্থ এরা উদরসাৎ করে বেঁচে থাকে।

কোন কোন পতঙ্গ পালকের টুক্‌রা, ছোট আঁশ, ডিমের খোলা সংগ্রহ করে সেগুলিকে এলোমেলোভাবে আট্‌কে দিয়ে বাসা বানায়। ময়লার মত সেই বাসাটাকে সঙ্গে নিয়ে খাদ্যের সন্ধানে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত কেন হয়?
(খ) বজ্র-বিদ্যুতের উপকারিতা কি?

সেবাপ্রিয় দাস
ও
নীহারেন্দু দাস

প্রঃ ২। (ক) রেডার কি? (খ) কবে এবং কে আবিষ্কার করেন?
(গ) কিসে এর ব্যবহার হয়?

সৌমেন্দ্রনাথ সরকার
ও
সত্যশঙ্কর সুর

উঃ ১। (ক) মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত—এই সবগুলিরই কারণ হচ্ছে মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তির সঞ্চয়। মেঘ কি ভাবে তড়িতাবিষ্ট হয়, এসম্বন্ধে অবশ্য একাধিক মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রকৃত কারণ এখনও অজানা। অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন, বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টি হবার আগে একটা প্রচণ্ড গুমোট গরম অনুভব করা যায়। ফলে নীচের বাতাস উপরের দিকে উঠতে থাকে। মেঘের জলকণাগুলি নীচে নেমে আসবার সময় এই ঊর্ধ্বগামী বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণে ভেঙ্গে গিয়ে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে

যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তড়িতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। ছোট কণাগুলি নামতে নামতে ক্রমশঃ আরও ছোট হতে থাকে, ফলে তড়িতের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এক সময়ে অতি ক্ষুদ্র এই সব জলকণা উর্ধ্বগামী বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে আবার উপরে উঠে যায়। মেঘের বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণের ব্যাপারে সিম্পসন প্রবর্তিত এই মতবাদটিকে মোটামুটি মেনে নেওয়া হয়েছে।

এভাবে পাশাপাশি বা উপরে-নীচে দু-খণ্ড মেঘ বিপরীত-ধর্মীরূপে তড়িতাবিষ্ট হতে পারে—অর্থাৎ একটি পজিটিভ ও অপরটি নেগেটিভ হবে। ফলে একটি আরেকটিকে আকর্ষণ করবে। পজিটিভ থেকে বিদ্যুৎ যখন নেগেটিভের দিকে চলতে থাকে, তখন পথের বায়ুকণা অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে আলোকিত হয়ে ওঠে। আমরা বলি বিদ্যুৎ চমকালো। আবার একখণ্ড মেঘই অনেক সময় অত্যধিক বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়ে যায়। তার কাছে হয়তো বিপরীত বিদ্যুৎ-ধর্মী অন্য কোন মেঘ নাও থাকতে পারে। এরকম অবস্থায় বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন মেঘটি ভূপৃষ্ঠের উপর তার নিকটতম বস্তুকে বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতের দ্বারা আবিষ্ট করে; অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে যে বস্তুটি খুব উঁচু, যেমন—সুউচ্চ বাড়ী বা মন্দির ইত্যাদির চূড়া, তাল, নারকেল প্রভৃতি বৃক্ষ—সে বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুৎ-ভাবাপন্ন হয়ে যায়। আকাশের বিদ্যুৎ তখন ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে সারা পথকে আলোকিত করে। আমরা বলি বাজ পড়লো।

বিদ্যুৎই চমকাক বা বাজই পড়ুক—পথের বায়ু অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে ভয়ঙ্করভাবে হঠাৎ প্রসারিত হবার চেষ্টা করে। ফলে প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। অনেক সময় এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে প্রতিধ্বনিত হতে হতে এই শব্দ এসে আমাদের কানে পৌঁছায় গুরু গুরু ধ্বনিরূপে।

১। (খ) প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বজ্র-বিদ্যুৎ মানুষের উপকারে আসে। মানুষের জীবনধারণের ক্ষেত্রে বৃক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। অনেকেরই জানা আছে যে, গাছের একটি প্রধান খাদ্য হচ্ছে নাইট্রেট এবং তার কিছুটা অংশ সে গ্রহণ করে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন থেকে। বায়ুমণ্ডলের এই নাইট্রোজেনকে নাইট্রেটে পরিবর্তিত করতে সাহায্য করে আকাশের বিদ্যুৎ। প্রতিবার বিদ্যুৎ চমকালেই বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড গঠিত হয়। নাইট্রিক অক্সাইড বৃষ্টির জলের মাধ্যমে নাইট্রিক ও নাইট্রাস অ্যাসিডরূপে মাটিতে নেমে আসে। এরা মাটির নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সঙ্গে মিশে যথাক্রমে নাইট্রেট ও নাইট্রাইট প্রস্তুত করে। নাইট্রাইট আবার এক জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে নাইট্রেটে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই নাইট্রেটই গাছ গ্রহণ করে। হিসাব করে দেখা গেছে—গড়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টায় ২৫০,০০০ টন নাইট্রিক অ্যাসিড এই প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়ে থাকে।

উঃ ২। (ক) রেডার কথাটি আসলে কয়েকটি ইংরেজী শব্দের আদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত। মূল কথাটি হলো—Radio Detection and Ranging অর্থাৎ বেতারের সাহায্যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও অবস্থান নির্ণয়।

বেতার যন্ত্রের সাহায্যে শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ সন্ধানী আলো বা সার্চলাইটের মত ঝলকে ঝলকে আকাশে প্রেরণ করা হয়। সার্চলাইটের আলো যেমন কোন কিছুতে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে এবং অপেক্ষমান দর্শকের চোখে পড়ে, রেডার থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গও তেমনি কোন বাধার সম্মুখীন হলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ও যন্ত্রের মধ্যে ধরা পড়ে। এরূপ তরঙ্গ প্রেরণ এবং গ্রহণই রেডারের কাজ। এথেকেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিফলক বস্তুর (যেমন—বিমান, জাহাজ ইত্যাদি) দূরত্ব, গতিবেগ, কোন দিকে যাচ্ছে—ইত্যাদি সব কিছু নির্ণয় করা যায়।

২। (খ) রেডার আবিষ্কারের জন্যে কোন বিশেষ লোকের নাম বা কোন বিশেষ সময়ের কথা বলা যায় না। রেডার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবদান—বহুসংখ্যক বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। প্রধানতঃ বৃটিশ বিজ্ঞানীরাই এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন।

২। (গ) সামরিক প্রয়োজনের তাগিদেই রেডার যন্ত্রের উদ্ভব ও উন্নতি। রেডার আবিষ্কারের ফলে অতর্কিত আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারে দূর হয়েছে। শত্রুপক্ষের বিমান একটিই থাকুক বা এক ঝাঁকই থাকুক—অনেক দূর থেকেই তাকে রেডারের কাছে ধরা দিতেই হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হবে গোলন্দাজ বাহিনী। ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের উন্নতি হবার সঙ্গে সঙ্গে আজকাল বিমানধ্বংসী কামানগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডারের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। লক্ষ্যভেদ একেবারে নির্ভুল, এর জন্যে আলাদা কোন কামান-চালকের প্রয়োজন হয় না। আজকাল বিমানগুলিতেও রেডার বসানো হয়েছে। শত্রুপক্ষের বিমান ধরা পড়ে মিত্রপক্ষের বিমানবাহিত রেডারে। সুরু হয় গোলাগুলি বর্ষণ। এছাড়া টহলদার বিমানগুলি সহজেই শত্রুপক্ষের জাহাজ, ডুবোজাহাজ প্রভৃতি ধ্বংস করতে পারে। বোমা ফেলবার সুবিধার জন্যে রেডারের এত উন্নতি হয়েছে যে, নির্দিষ্ট শহর মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন যাই হোক না কেন, কোথায় কারখানা, সেতু বা বড় রাস্তা ইত্যাদি আছে, মানচিত্রের মতই বোমারু বিমানের রেডারে তা ধরা পড়ে। জলযুদ্ধেও রেডার সমপরিমাণ কার্যকরী। জাহাজ দৃষ্টিগোচর হবার আগেই রেডারের সাহায্যে তাকে ধ্বংস করা যায়।

শান্তিকামী মানুষ শীঘ্রই দেখলো, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া মানুষের কল্যাণকর কাজেও রেডারকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অসামরিক বিমান অবতরণের জন্যে

রেডার আজ অপরিহার্য। মেঘাচ্ছন্ন বা কুয়াশাচ্ছন্ন বিমান-বন্দরের কাছে এসে চালক নিজের অবস্থান ঠিক করতে পারে না। নীচে থেকে রেডারের সাহায্যে সেটা জেনে নিয়ে তাকে বেতারের মাধ্যমে জানানো হয়। তখন চালক বিমানটিকে নিরাপদে নামিয়ে নিয়ে আসে। আজকাল চালকের সাহায্য ছাড়া সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেডারের সাহায্যে বিমান নামিয়ে আনা সম্ভব। জলপথেও রেডার নাবিকদের প্রধান সহায়। জলকণাবাহী মেঘ থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় বলে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কাজেও রেডার অপরিহার্য। এছাড়া মহাকাশযান, উল্কা, উপগ্রহ প্রভৃতি সম্বন্ধে গবেষণার কাজেও রেডার ব্যবহার করা হচ্ছে।

দীপক বসু

শোক-সংবাদ

অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য গত ২৮শে ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে তাঁহার শ্যামবাজারস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

অধ্যাপক সুশীলকুমার আচার্য

অধ্যাপক আচার্য ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার রুদ্রপুর গ্রামে ১২৯৪ বঙ্গাব্দের ৭ই ভাদ্র (ইং ২৩শে অগাষ্ট, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালি আচার্য এবং মাতার নাম ভবতারিণী দেবী। তিনি পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। ইঁহাদের কৌলিক পদবী ছিল মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক আচার্যের শৈশবের শিক্ষার সূত্রপাত হয় রুদ্রপুরের চিন্তামণি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি কলিকাতার সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ দার্শনিক ক্ষুদিরাম বসুর সান্নিধ্য অধ্যাপক আচার্যের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অধ্যাপক আচার্যের চরিত্র, চাল-চলনে সরলতা এবং কর্মজীবনে সঠিক পথ নির্বাচন, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলী অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বসুর আদর্শের প্রভাবে গড়িয়া ওঠে।

১৯০৮ সালে জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পদার্থ ও রসায়নবিদ্যায় ডাফ-বৃত্তি ও সারদাপ্রসাদ পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১০ সালে স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে তিনি ডিষ্টিংশনসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কটিশচার্চ কলেজে তিনি খ্যাতনামা অধ্যাপকদের (জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, গৌরীশঙ্কর দে, বরুণকুমার দত্ত, মন্মথনাথ বসু) সংস্পর্শে আসেন। তাঁহাদের প্রভাবও অধ্যাপক আচার্যের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির একটি কারণ।

১৯১২ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং রৌপ্য পদক লাভ করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি আচার্য জগদীশ চন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডক্টর দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, ডক্টর সি. ডব্লিউ. পীক, ই. পি. হ্যারিসন, এইচ. আর. জেম্‌স্ প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন এবং শিক্ষাজগতে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য অনুপ্রাণিত হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পদ প্রত্যাখান করেন। ১৯১২ সালের জুলাই মাসে তিনি পদার্থবিদ্যায় পালিত রিসার্চ স্কলার হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আচার্য জগদীশচন্দ্রের অধীনে অনারেরী রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করেন।

১৯১২ সালের নভেম্বর হইতে ১৯১৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি পদার্থ-বিদ্যার লেক্‌চারার-ডেমনষ্ট্রেটর হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৬ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি কলিকাতার সিটি কলেজের লেক্‌চারার ছিলেন।

১৯১৬ সালে প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞানে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাস চালু করেন।

১৯১৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যার লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। ইহা ছাড়াও অধ্যাপক আচার্য ১৯১৬-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্যাবুলেটর, প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন। পদার্থবিদ্যার লেক্‌চারার থাকিবার সময় ১৯৩০-৩১ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের অস্থায়ী সেক্রেটারী ছিলেন।

১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডেপুটেড স্পেশাল অফিসার ছিলেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগ প্রভৃতির আর্থিক বিষয়সমূহ তদারক করিতেন। স্পেশাল অফিসার থাকিবার সময় তিনি ১৯৪৯-৫০ সাল পর্যন্ত পোষ্ট-গ্রাজুয়েট আর্টস্ অ্যাণ্ড বিজ্ঞান বিভাগের সেক্রেটারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে অধ্যাপক আচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আচার্য ১৯০৯ সালে 'শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষদ' স্থাপন করেন। তিনি রামমোহন লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েসন, অল বেঙ্গল কলেজ অ্যাণ্ড ইউনিভারসিটি সমূহের টিচার্স অ্যাসোসিয়ে-সন, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আজীবন সদস্য ছিলেন। কিছুকাল তিনি বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ও কোষাধ্যক্ষও ছিলেন। তিনি পার্ক ইনষ্টিটিউশনের সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬-১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাইমারী এডুকেশন কমিটির সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব দি সায়েন্স, অল ইণ্ডিয়া এডুকেশন্যাল সোসাইটি, সুনীতি শিক্ষালয় এইচ. ই. স্কুল (ফর গার্লস), কেশব অ্যাকাডেমি, সেন্ট্রাল কলেজ অ্যাণ্ড কলেজিয়েট স্কুল, আরবান ইনষ্টিটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

বিবিধ

রুশভাষায় আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক রচনাবলী ছুটি খণ্ডে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতায় আগত সোভিয়েট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. এম. সিন্যুখিন গত আচার্য জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী সেই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থমালায় অন্যান্য বিশ্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন নিউটন, ফ্যারাডে, আইনষ্টাইন প্রমুখ জগৎবরেণ্য বিজ্ঞানীগণ। আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী বিশিষ্ট সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের দ্বারা অনূদিত হয়েছে। এই অনু-

এস. এস. আর. বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে মস্কোর লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক এ. এম. সিন্যুখিন রুশ ভাষায় লিখিত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পুস্তকাবলী বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টর ডাঃ ডি. এম. বসুকে উপহার দিচ্ছেন।

৩০শে নভেম্বর বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ৪৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসুর হস্তে এই গ্রন্থ ছুটি আনুষ্ঠানিক-ভাবে অর্পণ করেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি বর্তমানে যে 'চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রন্থমালা প্রকাশ করছেন, বাদকমণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক সিন্যুখিনও রয়েছেন।

ডাঃ বসুর হস্তে আচার্য জগদীশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী অর্পণকালে অধ্যাপক সিন্যুখিন বলেন, 'বিখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-জগতে অবদানের বিষয়ে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত

সজাগ। বিজ্ঞান-জগতে এক নতুন দিকের দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন আচার্য জগদীশচন্দ্র। তাঁর আবিষ্কৃত পথে আজ বহু সোভিয়েট বিজ্ঞানী গবেষণার কাজ করে চলেছেন। অ্যাকাডেমিসিয়ান তিমিরিয়াজেফ, হোলোদনি, ভেদেনস্কি, তোপচিয়েফ, পোপোফ, লেবেদেফ ও হেক্কেল প্রমুখ খ্যাতনামা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের লিখিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্পর্কে এপর্যন্ত ৩০টি নিবন্ধ পুস্তক সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রকাশিত হয়েছে। 'চিরায়ত বিশ্ববিজ্ঞান' গ্রন্থমালায় এশিয়া। আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে একমাত্র আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর রচনাবলীই যে প্রকাশ করা হয়েছে, তা এই অসাধারণ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার প্রতিই সোভিয়েটের মহান শ্রদ্ধার্ঘ্য।'

রুশ ভাষায় জগদীশচন্দ্রের রচনাবলী কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে' বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডাঃ বসু বলেন—'এই গ্রন্থাবলী প্রকাশের দ্বারা বিজ্ঞানের প্রগতির পথে ভারত ও সোভিয়েট সহযোগিতা আরও বর্ধিত হবে বলে আমরা মনে করি। আমি আশা করি, জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণাধারার আর একটি পীঠস্থান হয়ে উঠবে মস্কো এবং সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই গবেষণার কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

এই অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সংস্থার অধিকর্তা ডাঃ আত্মারাম ২৮তম আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান-অধ্যাপক ও বিজ্ঞানানুরাগী উপস্থিত ছিলেন।

পারমাণবিক বিষঘ্ন বটিকা

তাইপে থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—নেপোলিয়নের চুল নিয়ে অন্যত্র যে গবেষণা চলছে, তারই সহায়তায় কুওমিন্টাং চীনের একজন বিজ্ঞানী পারমাণবিক বিকিরণের মুখে আত্মরক্ষার উপযোগী একটি ঔষধ উৎপাদনের সুলভ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন।

ঔষধটির নাম সিসটিন। মানুষের চুল থেকে এক পাউণ্ড এই ঔষধ বের করে আনতে খরচ পড়ে মাত্র আড়াই ডলার।

আবিষ্কারক কুওমিন্টাং চীনের রসায়নবিদ্যা অ্যাকাডেমির ডিরেক্টর ডাঃ ওয়েই বলেন, দু-এক গ্র্যাম সিসটিন খেয়ে ফেললে আধঘণ্টা পর্যন্ত পারমাণবিক বিকিরণ কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

পারমাণবিক বোমার আক্রমণকালে আশ্রয়-স্থলের দিকে ছুটে যাবার আগে সিসটিন সেবন বিধেয়।

মানুষের চুলে আর্সেনিকের পরিমাণ দেখে তার জ্ঞানেরও পরিমাপ করা সম্ভব বলে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব রয়েছে, তাথেকেই আমি মানুষের চুল নিয়ে গবেষণা সুরু করি।

বাস্তবিক, নেপোলিয়নের চুলে মাত্রাধিক আর্সেনিক ছিল বলে হালে প্রমাণিত হয়েছে। জ্ঞানী-গুণীদের চুলে যে আর্সেনিক একটু বেশী থাকে, সেটা আজ প্রমাণিত সত্য।

চুল নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে সিসটিনের সন্ধান পেলাম, যা পেটে থাকলে অন্ততঃ আধঘণ্টা পারমাণবিক বিকিরণ-বিষ দেহে ঢুকতে পারবে না।

সিসটিন খাদ্য হিসাবেও বলকারী হবে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন

৩রা জানুয়ারী হায়দ্রাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এই অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়
চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার রিসার্চ সেন্টার
৩৭, এস. পি. মুখার্জী রোড,
কলিকাতা

২। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
৭৭/১, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড,
কলিকাতা-৩৭

৩। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
গণিত বিভাগ,
লাহিড়ী কলেজ,
চিরিমিড়ি,
মধ্যপ্রদেশ

৪। মণীন্দ্রনাথ দাস
"সাধনালয়"
পুরুলিয়া রোড,
রাঁচী

৫। মোহাঃ আবু বাক্কার
পোঃ ও গ্রাম—কলিঠা
ভায়া—নলহাটি
জেলা—বীরভূম

৬। শ্রীঅমরনাথ রায়
NB/T-99
Unit—A
New Traffic Settlement
P. O. Kharagpur
Midnapur

৭। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ও ৭, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

৮। দীপক বসু
ইনস্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড
ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৭ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ফুয়েল সেল বা জ্বালানী-কোষ

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

ফুয়েল সেল জিনিষটা কি ?

ফুয়েল সেল বা জ্বালানী কোষ হলো বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক প্রকার নতুন উদ্ভাবিত কৌশল। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে সাধারণতঃ দুটি কৌশল ব্যবহার করা হয়; যথা—(১) ফুয়েল বা জ্বালানী পদার্থ (অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোল, গ্যাস ইত্যাদি) পুড়িয়ে তার তাপের শক্তিতে ডায়নামো বা জেনারেটর চালিয়ে। (২) ইলেকট্রিক সেল বা তড়িৎ-কোষের সাহায্যে (যেমন টর্চ লাইটের ড্রাই সেল, ষ্টোরেজ সেল প্রভৃতি) রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে। এই দুটি পদ্ধতির সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে আধুনিক ফুয়েল সেল। এর ফলে শক্তির অপচয় ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় উভয়ই হ্রাস পাবে। ব্যাপারটা বোঝবার জন্যে আমরা ধাপে ধাপে আলোচনা করবো। প্রথম দেখা যাক, ফুয়েল বা জ্বালানী পুড়িয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

জ্বালানী পুড়িয়ে বিদ্যুৎ

কোন জ্বালানী, যেমন—কয়লা পুড়িয়ে যে তাপ পাওয়া যায়, তার সাহায্যে প্রথমে বাষ্প উৎপন্ন করা হয়। এই বাষ্পের সাহায্যে বাষ্পচক্র ঘোরানো হয়। ঘূর্ণায়মান বাষ্পচক্রে জেনারেটর যুক্ত করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

জ্বালানী যখন পোড়ে, তখন তাও একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া। কয়লা যখন পোড়ে তখন কয়লার কার্বনের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেন যুক্ত হয়—রাসায়নিকের ভাষায় তাকে কার্বনের জারণ (Oxidation) বলা যায়। এই বিক্রিয়ার ফলে

কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয় এবং সেই সঙ্গে প্রচুর রাসায়নিক শক্তি ছাড়া পায়। এই শক্তিই তাপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

জ্বালানীর মধ্যেকার রাসায়নিক শক্তি প্রথমে তাপের আকারে প্রকাশ পায়, তারপর সেই তাপকে বাষ্পের চাপ-শক্তিতে পরিণত করা হয়। এরপর বাষ্পের চাপে যখন বাষ্পচক্র ঘোরে, তখন উৎপন্ন হয় যান্ত্রিক শক্তি এবং বাষ্পচক্রের সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটর ঘুরে ঐ যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয়। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইভাবে দেখানো যেতে পারে—

(১) জ্বালানী [রাসায়নিক পদার্থ] (= শুদ্ধ রাসায়নিক শক্তি) —— জ্বালানীর দহন অর্থাৎ জারণ (Oxidation) হলো (= রাসায়নিক বিক্রিয়া) ——→ (২) রাসায়নিক শক্তির মুক্তি (= তাপশক্তি)

(২) → তাপের সাহায্যে জল ফুটিয়ে বাষ্প উৎপন্ন করা হলো → (৩) বাষ্পের শক্তি (= চাপশক্তি)

(৩) → বাষ্পের চাপে বাষ্পচক্র ঘুরছে → (৪) ঘূর্ণন-শক্তি = (যান্ত্রিক শক্তি)

(৪) → বাষ্পচক্রে সংযুক্ত জেনারেটর ঘুরছে ও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে → (৫) বিদ্যুৎ-শক্তি

(১) → ফুয়েল সেল (বৈদ্যুতিক সেল) → (৫)
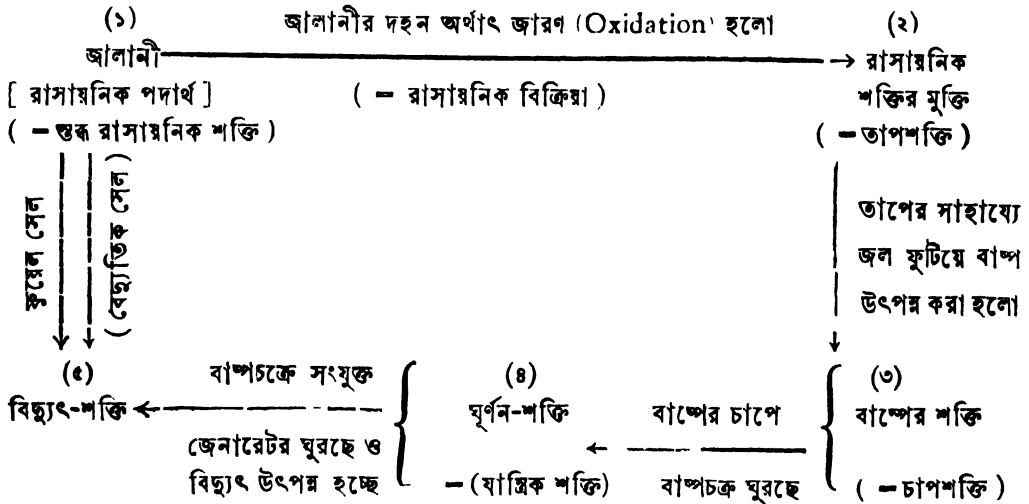
এই পদ্ধতিতে পাঁচটি পর্যায় আছে এবং তার পঞ্চম পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। মধ্যের তিনটি পর্যায়ে (অর্থাৎ ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে) শক্তির অপচয় হয়। ২য় পর্যায়ে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তার একটা বড় অংশ নানাভাবে নষ্ট হয়ে যায়; ৩য় পর্যায়ে উৎপন্ন বাষ্পের সবটুকু শক্তিকে বাষ্পচক্র ঘোরাবার কাজে ব্যবহার করা যায় না; চতুর্থ পর্যায়ে জেনারেটরের ভিতরকার নানারকম বাধা-বিঘ্নের ফলে বাষ্পচক্রের সবটুকু যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত হয় না। দেখা গেছে, এভাবে শক্তির অপচয় হবার ফলে শেষ পর্যন্ত জ্বালানীর মধ্যেকার মোট রাসায়নিক শক্তির তিন ভাগের দুভাগ বা তারও বেশী নষ্ট হয়ে যায়, মাত্র ⅓ ভাগ বা তারও কম অংশ বিদ্যুৎ-শক্তি হিসাবে পাওয়া যায়। বড় বড় তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে শতকরা ৩৫ ভাগ পর্যন্ত তাপ-শক্তিকে বিদ্যুৎ হিসাবে পাওয়া সম্ভব।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে—যদি মাঝের তিনটি পর্যায় বাদ দিয়ে কোন কৌশলে জ্বালানী থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যেত, তাহলে শক্তির এত অপচয় হতো না। জ্বালানী-কোষে ঠিক তাই করা হয়। ফলে জ্বালানীর মধ্যেকার মোট রাসায়নিক শক্তির শতকরা ৭০ ভাগ বা আরো বেশী বিদ্যুতে পরিণত হয়। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হয়? সেটা বুঝতে হলে তড়িৎ-কোষে কিভাবে কাজ হয়, তা আগে জানা দরকার। কেন না, তড়িৎ-কোষের মধ্যেও রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুতে পরিণত করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ একটা সাধারণ প্রাথমিক তড়িৎ-কোষের কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

তড়িৎ-কোষে বিদ্যুৎ উৎপাদন

একটি সাধারণ প্রাথমিক তড়িৎ-কোষ এভাবে তৈরি হয়:—একটি কাচের পাত্রে কিছুটা ঘুল

সালফিউরিক অ্যাসিড রেখে তামা এবং দস্তার দুটি পাত বা দণ্ড ঐ অ্যাসিডের মধ্যে পরস্পর থেকে কিছু দূরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখা হয়। এবার পাত দুটির শীর্ষদেশ দুটি তামার তার দিয়ে যোগ করে দিলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু কেন এই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়? এর কারণ তামা এবং দস্তার দণ্ড দুটি যখন অ্যাসিডে ডুবানো হয়, তখন উভয় দণ্ডের সঙ্গেই অ্যাসিডের এই উভয় দণ্ডের শীর্ষদেশ দুটি যোগ করে দিলে ঐ তারের মধ্য দিয়ে দস্তার দণ্ড থেকে তামার দণ্ডে ইলেকট্রনগুলি ছুটে চলতে থাকে। তারের মধ্য দিয়ে এই ইলেকট্রনের প্রবাহই বিদ্যুৎ-প্রবাহ। যতক্ষণ দণ্ড দুটির সঙ্গে অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে থাকে, ততক্ষণ বিদ্যুৎ-প্রবাহও চলতে থাকে।

দেখা গেল, প্রাথমিক তড়িৎ-কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়,
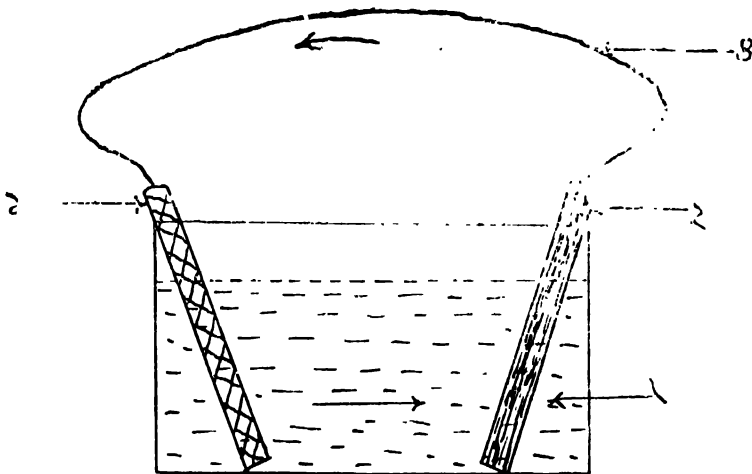
১নং চিত্র—প্রাথমিক তড়িৎ-কোষ
১—তামার দণ্ড, ২—দস্তার দণ্ড, ৩—লঘু সারফিউরিক অ্যাসিড,
৪—বিদ্যুৎবাহী তামার তার।

পৃথক রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। ফলে অ্যাসিড থেকে বহুসংখ্যক ইলেকট্রন এসে দস্তার দণ্ডটির উপর ছাড়া পায় অর্থাৎ দস্তার দণ্ডটির উপর ইলেকট্রনের পরিমাণ ও চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী হয়। তেমনি ওদিকে তামার দণ্ড থেকে বহু ইলেকট্রনকে অ্যাসিড নিয়ে নেয়, অর্থাৎ তামার দণ্ডে ইলেট্রনের উপস্থিতির পরিমাণ ও চাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হয়। এই অবস্থায় দস্তার দণ্ড ইলেকট্রন দিতে চায়, আর তামার দণ্ড ইলেকট্রন পেতে চায়। কাজেই একটি তার দিয়ে মাঝখানে তাপশক্তি বা যান্ত্রিক শক্তির মধ্য দিয়ে যেতে হয় না। কাজেই এই তড়িৎ-কোষে শক্তির অপচয় খুবই কম হয়। টর্চ লাইটে ব্যবহৃত ড্রাই সেল একশ্রেণীর প্রাথমিক তড়িৎ-কোষ।

এবার ষ্টোরেজ সেল বা তড়িৎ-সঞ্চয়ক কোষের কথা ধরা যাক। মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত এই ষ্টোরেজ সেলের অন্য নাম লেড-অ্যাসিড সেল; কারণ এর মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে লেড বা সীসার একটি পাত ডুবানো থাকে, অন্য পাতটি হয় সীসার পাতের

উপর সীসার পার-অক্সাইডের আস্তরণ মাখিয়ে। সহজে ধারণা দেবার জন্যে এভাবে বলা হলো; সঞ্চয়ক কোষের আসল গঠন আরো জটিল। এই অবস্থায় পাত দুটির শীর্ষদেশ একটি তামার তার দিয়ে যোগ করে দিলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। এই বিদ্যুৎকে তারের মাধ্যমে ইচ্ছামত কাজে লাগানো যায়। কোষ থেকে এই ভাবে বিদ্যুৎ নিতে থাকলে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অ্যাসিডে ডুবানো দুটি পাতই ক্রমে লেড-সালফেট ($PbSO_4$) হয়ে যায়। একে বলে কোষের মোক্ষণ বা ডিস্‌চার্জ হওয়া। মোক্ষণ হবার পর বাইরে থেকে উল্টো মুখে কোষের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে তড়িৎ-দণ্ড দুটির সঙ্গে অ্যাসিডের উল্টো রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় এবং এভাবে বিদ্যুৎ-শক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে কোষে সঞ্চিত হয়। এই হলো কোষকে চার্জ করা। এইভাবে একই কোষকে অনেক দিন পর্যন্ত বার বার চার্জ করে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

এখানেও দেখা যাচ্ছে সঞ্চয়ক কোষে রাসায়নিক শক্তিরূপে যে বিদ্যুৎ সঞ্চিত রাখা হয়, তাকে সরাসরিই আবার বিদ্যুৎরূপে ফেরৎ পাওয়া যায়, মাঝখানে তাপ বা অন্য কোন শক্তির মধ্য দিয়ে তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হয় না। কাজেই এক্ষেত্রে শক্তির অপচয় খুবই কম হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, একটি লেড-অ্যাসিড সঞ্চয়ক ব্যাটারীকে (একাধিক কোষকে পরপর সাজিয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগে যুক্ত করলে তাদের একত্রে বলে ব্যাটারী) চার্জ করবার সময় যতটা বিদ্যুৎ-শক্তি বাইরে থেকে ব্যাটারীর মধ্যে পাঠানো হয়, তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ আবার বিদ্যুৎ হিসাবে ব্যাটারীর কাছ থেকে ফেরৎ পাওয়া যায়। তাহলে বলা যায় – লেড-অ্যাসিড ব্যাটারীর কার্য-ক্ষমতা ৭৫%। একে বলে ব্যাটারীর শক্তি বিষয়ক কর্মক্ষমতা। ব্যাটারীর অন্য রকম দক্ষতার হিসাবও আছে।

ফুয়েল সেল অর্থাৎ জ্বালানী-কোষের সুবিধা কি?

তড়িৎ-কোষে রাসায়নিক শক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা হয় বলে তাতে শক্তির অপচয় কম। ফুয়েল সেলেও তাই করা হয়। তাহলে ফুয়েল সেলের সুবিধা কি? সুবিধা হলো —সাধারণ তড়িৎ-কোষে, যেখানে তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি ধাতু ব্যবহার করা হয় এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই ধাতুগুলি ক্ষয়িত হয়ে তবেই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়—সেখানে জ্বালানী-কোষে সস্তা জ্বালানী পদার্থ, যেমন—হাইড্রোজেন গ্যাস, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন গ্যাস (এখন আবার নানারকম কঠিন জ্বালানী ব্যবহারের চেষ্টাও হচ্ছে) প্রভৃতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য জ্বালানী-কোষেও ধাতব তড়িৎ-দণ্ড—সাধারণতঃ নিকেলের দণ্ড ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সেগুলির কোন ক্ষয় হয় না। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। চলিত পদ্ধতি অনুযায়ী এই সব সস্তা জ্বালানী পুড়িয়ে তার তাপের শক্তিতে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে গেলে শক্তির প্রভূত অপচয়ের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় বেশী পড়ে। আবার তড়িৎ-কোষে যেখানে শক্তির অপচয় কম, সেখানেও দামী ধাতু খরচের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় বেশী পড়ে। কাজেই সস্তা জ্বালানী ব্যবহার করে তড়িৎ-কোষের প্রক্রিয়ায় তা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলে দুদিক থেকেই সুবিধা হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়।

তাছাড়াও জ্বালানী-কোষের আরো কতকগুলি সুবিধা আছে। তড়িৎ-কোষে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নানারকম রাসায়নিক গ্যাস বা অ্যাসিড-

বাষ্প নির্গত হয়ে বায়ুকে দূষিত করে, জ্বালানী-কোষে তা হয় না। অন্যদিকে টার্বাইন বা ইঞ্জিনের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে যখন বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়, তখন ঐ সব ঘূর্ণায়মান যন্ত্র থেকে জোরালো শব্দ উত্থিত হয়ে গোলমালের সৃষ্টি করে, জ্বালানী-কোষে সে রকম কোন শব্দ থাকে না। তাছাড়া জ্বালানী-কোষের আরেকটা বড় সুবিধা হলো এই যে, এর জ্বালানী শেষ হওয়া মাত্র নতুন জ্বালানী সংযোগ করলেই তাথেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। সঞ্চয়ক কোষকে চার্জ করবার জন্যে যেমন সময় লাগে এবং বাইরে থেকে বিদ্যুৎকে কোষের মধ্যে ঢোকাতে হয়, জ্বালানী-কোষে তেমন কিছুর দরকার নেই, অথচ তা সঞ্চয়ক ব্যাটারীর মতই বহু সময় যাবৎ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। কাজেই অদূর ভবিষ্যতে মোটর গাড়ী প্রভৃতিতে সঞ্চয়ক ব্যাটারীর স্থানে জ্বালানী-কোষের ব্যবহার খুবই সম্ভব। জ্বালানী-কোষ কালক্রমে খুবই হাল্কা এবং ছোট হয়ে যাবে, তখন যে কোন কাজে যত্রতত্র তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়া যাবে। জ্বালানী-কোষের একটা বড় ব্যবহার হবে বিদ্যুৎ-শক্তির দ্বারা চালিত নানারকম যানবাহন চালাবার জন্যে। বৃটেন এবং ফ্রান্স এই কাজে খানিকটা অগ্রসর হয়েছে, আমেরিকা জ্বালানী-কোষকে মহাকাশযানে ব্যবহারের চেষ্টায় নিযুক্ত, সুইডেন ডুবোজাহাজ চালাবার শক্তির উৎস হিসাবে জ্বালানী-কোষকে ব্যবহার করতে সচেষ্ট। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্প-প্রধান দেশ জ্বালানী কোষকে আরো উন্নত ও কার্যকরী করে গড়ে তোলবার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছে।

জ্বালানী-কোষের উদ্ভাবক কে ?

১৮০১ সালে বৃটিশ বৈজ্ঞানিক সার হামফ্রে ডেভি একটা কার্বন-কোষ (Carbon cell) তৈরি করেছিলেন। সেটা সাধারণ গৃহতাপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতো। কেউ কেউ এটিকেই জ্বালানী-কোষের প্রাথমিক পর্ব বলে মনে করেন। কিন্তু বৃটিশ আইনজীবি ও বৈজ্ঞানিক সার উইলিয়াম গ্রোভ-কেই জ্বালানী-কোষের জনক হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৮৩৯ সালে তিনি একটি গ্যাস-সেল তৈরি করেছিলেন, যাতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়েছিল। একটি পাত্রে রাখা লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে প্ল্যাটিনামের দুটি পাতকে পরস্পর থেকে কিছু দূরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রেখে তাদের শীর্ষদেশ দুটিকে একটি তামার তার দিয়ে যুক্ত করে ঐ পাত দুটির একটির সংস্পর্শে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন এবং অপরের সংস্পর্শে গ্যাসীয় অক্সিজেন রেখে তিনি দেখলেন যে, ঐ সংযোগ-তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। কারণ উক্ত সংযোগ-তারের মাঝখানে একটা গ্যালভানোমিটার যন্ত্র যুক্ত করে দেখা গেল যে, তার কাঁটা একই দিকে ঘুরে যাচ্ছে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

গ্রোভের এই গবেষণা আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। তারপর বহু বছর পরে নানা দেশের বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আবার এদিকে পড়তে আরম্ভ করে। গ্রোভের ঠিক একশত বছর পরে, সম্ভবতঃ ১৯৩৮ সাল নাগাদ বৃটিশ বৈজ্ঞানিক এফ. টি বেকন জ্বালানী-কোষকে বাস্তব রূপ দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে তাঁর নেতৃত্বে কেম্ব্রিজের একদল বৈজ্ঞানিক এবিষয়ে গভীর মনঃসংযোগ করেন। প্রায় বারো বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় এঁদের গবেষণা সাফল্য লাভ করে এবং ১৯৫৯ সালে তাঁরা সর্বপ্রথম জনসমক্ষে তাঁদের তৈরি একটি জ্বালানী-কোষের (আসলে সেটি ছিল একটি জ্বালানী-কোষ ব্যাটারী) কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখান। এই কোষটির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল পাঁচ কিলোওয়াট এবং এতে ২৪ ভোল্টের বিদ্যুৎ-চাপ উৎপন্ন হয়েছিল। বেকন দেখালেন যে, এই কোষ থেকে শক্তি নিয়ে মালপত্র ওঠানো-নামানোর জন্যে ব্যবহৃত একরকম ট্রাক

(Fork Lift Truck) চালানো যায়। এই কোষে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে ধীরে ধীরে মিশিয়ে জল তৈরি হতো এবং তারই ফলে উৎপন্ন হতো বিদ্যুৎ।

বৃটেন ছাড়া অন্যান্য দেশেও জ্বালানী-কোষের উপর অনেক কাজ হয়েছে। আমেরিকায় জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী, ন্যাশন্যাল কার্বন কোষের মূল ক্রিয়াকৌশল আমরা যথাসম্ভব সহজভাবে বলবার চেষ্টা করবো।

একটি পাত্রে শতকরা ৩৭ ভাগ পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ নেওয়া হলো এবং তার মধ্যে সচ্ছিদ্র নিকেলের (Porous nickel) তৈরি দুটি পাতকে পরস্পর থেকে কিছুটা দূরে আংশিকভাবে ডুবিয়ে রাখা হলো ও তাদের শীর্ষ-
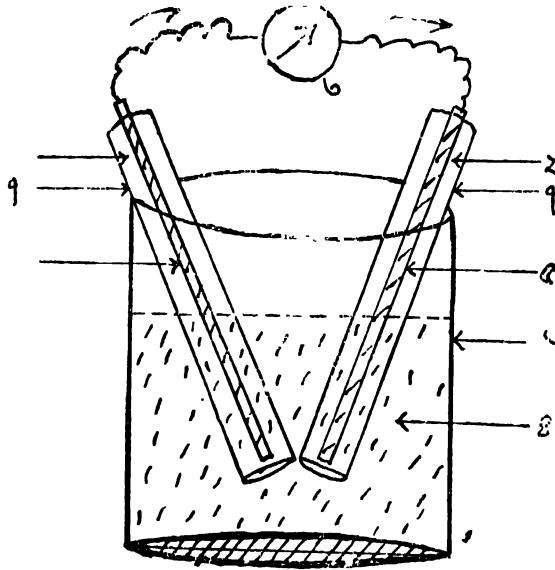
২নং চিত্র। গ্রোভের গ্যাস-সেল।
১—অক্সিজেন গ্যাস, ২—হাইড্রোজেন গ্যাস, ৩—গ্যালভানোমিটার,
৪—লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড, ৫—প্ল্যাটিনাম পাত, ৬—কাচ-
পাত্র, ৭—কাচ-নল।

কোম্পানী প্রভৃতি এবিষয়ে কাজ সুরু করেন। অন্যান্য দেশের প্রাথমিক গবেষকদের নাম দাভ্‌তিয়ান (রাশিয়া), ইউডি (জার্মেনী), মার্কো (অষ্ট্রিয়া) প্রভৃতি। ফ্রান্সের মারকুসি-তে অবস্থিত জেনারেল ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানিও অনেক দিন পূর্বেই এবিষয়ে কাজ সুরু করেন।

জ্বালানী-কোষ কিভাবে কাজ করে?

আসল জ্বালানী-কোষগুলির গঠন ও তাদের মধ্যেকার ক্রিয়া-ব্যবস্থা কিছু জটিল। এখানে ব্যাপারটা সহজে বোঝাবার জন্যে বেকনের তৈরী

দেশ দুটি একটি তামার তার দিয়ে যুক্ত করে দেওয়া হলো। এবার একটি দণ্ড বরাবর হাইড্রোজেন গ্যাস এবং অন্য দণ্ড বরাবর অক্সিজেন গ্যাস এমন সুকৌশলে ও ধীরগতিতে অবিরাম পাঠানো হতে থাকলো যে, গ্যাস দুটি নিজ নিজ পাতে প্রথমে পৃষ্ঠশোষিত হয় (Adsorption)। পাত দুটির শীর্ষদেশ তারের দ্বারা যুক্ত থাকলে একদিকে ঐ শোষিত গ্যাস দুটি পাত থেকে আয়নিত অবস্থায় দ্রবণে প্রবেশ করতে থাকবে, আর অন্য দিকে ঠিক তখনই ঐ সংযোগকারী

তারের পথে হাইড্রোজেনবাহী দণ্ড থেকে ইলেকট্রনগুলি অক্সিজেনবাহী দণ্ডের দিকে যেতে থাকবে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকবার অর্থ—ঐ সংযোগ তারের মধ্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হওয়া। এদিকে দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়ন (H^{+}) ও অক্সিজেন আয়ন (O^{-2}) প্রবেশের অর্থ সেখানে জল উৎপন্ন হওয়া। এই জলকে প্রয়োজনমত দ্রবণ থেকে বিশেষ কৌশলে আলাদা করে নেওয়া যায়। এখানে আরেকটা কোষ তৈরি হয়েছে। এমন কি, আজকাল কয়লাকেও (তাকে গ্যাসে পরিণত করে নিয়ে) জ্বালানী-কোষের জ্বালানীরূপে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

জ্বালানী-কোষের প্রকারভেদ

কোষে কি জ্বালানী ব্যবহার করা হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে জ্বালানী-কোষের শ্রেণী-বিভাগ করা যায়। কিন্তু সাধারণতঃ এগুলির
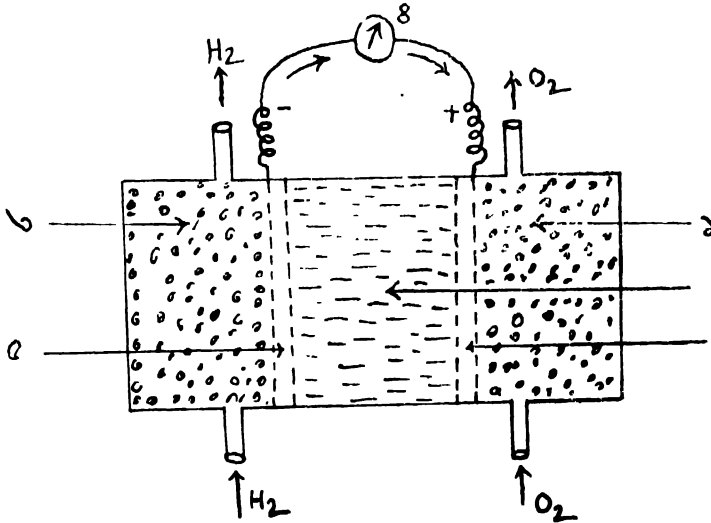
৩নং চিত্র। দাভ্‌তিয়ানের জ্বালানী-কোষ।
১—নিকেলের দ্বারা অনুবিদ্ধ ও সক্রিয়কৃত অঙ্গার তড়িৎ-দ্বার, ২—পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ, ৩—রৌপ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ ও সক্রিয়কৃত অঙ্গার তড়িৎ-দ্বার, ৪—গ্যালভানোমিটার, ৫—মোম মাখানো পর্দা, এর মধ্য দিয়ে জল যেতে পারে না, কিন্তু আয়নগুলি যেতে পারে।

কথা উল্লেখযোগ্য যে, জ্বালানী-কোষে যে নিকেল দণ্ডগুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির কোন ক্ষয় হয় না, কারণ সেগুলির সঙ্গে দ্রবণের বা গ্যাসের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না।

বেকনের তৈরি এই কোষে হাইড্রোজেন গ্যাসই জ্বালানী। কিন্তু হাইড্রোজেনের দাম নেহাৎ কম নয়। কাজেই কার্বন-মনোক্সাইড বা হাইড্রোকার্বন গ্যাস ব্যবহার করে এখন জ্বালানী-শ্রেণীবিভাগ হয় কোষ কি অবস্থায় কাজ করছে অর্থাৎ তার তাপ কত এবং তাতে ব্যবহৃত গ্যাসের চাপই বা কি, তার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে তিন শ্রেণীর জ্বালানী-কোষ দেখা যায় :

(১) নিম্নতাপ ও নিম্নচাপ কোষ, (২) মধ্যম-তাপ ও উচ্চচাপ কোষ, (৩) উচ্চতাপ কোষ। এগুলি সম্পর্কে দু-চারকথা বলা যেতে পারে :

(১) নিম্নতাপ ও নিম্নচাপ কোষ :

রাশিয়ার দাভ্তিয়ান এবং আমেরিকার ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানী এই শ্রেণীর কোষ প্রথম তৈরি করেন। উভয় ক্ষেত্রেই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। উভয়ে যথাক্রমে সাধারণ গৃহতাপে ও ২৫° সে. থেকে ৭০° সে. পর্যন্ত তাপ ব্যাপ্তির মধ্যে কাজ করে। পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রবণ এই শ্রেণীর কোষে তড়িৎ-বিশ্লেষক (Electrolyte) রূপে ব্যবহৃত হয়। দাভ্তিয়ানের তৈরি কোষের (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য) তড়িৎ-দ্বার (Electrode) মোম মাখানো পর্দা থাকে যার মধ্যে জল যেতে পারে না, কিন্তু আয়নগুলি যেতে পারে।

(২) মধ্যম তাপ ও উচ্চ চাপের কোষ:

এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বেকনের কোষ। এর ক্রিয়াকালীন তাপ ২০০° সে. এবং চাপ বর্গইঞ্চি প্রতি ৩০০ থেকে ৪০০ পাউণ্ড। তড়িৎ-বিশ্লেষক পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ (৩৭%)। এর তড়িৎ-দ্বার দুটি কণিকাভূত নিকেল থেকে পিণ্ডবন্ধন প্রক্রিয়ায় (Sintering) তৈরি ১/১৬ ইঞ্চি পুরু সছিদ্র ফলক, যার এক পিঠের (যে পিঠের
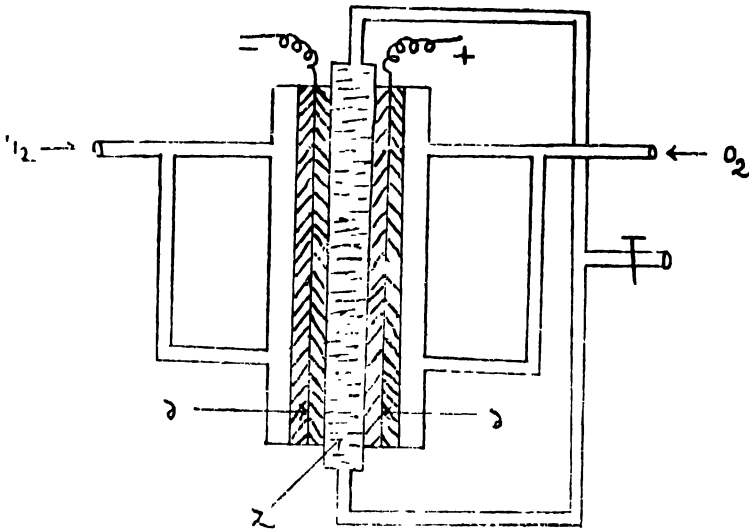
৪নং চিত্র। বেকনের জ্বালানী-কোষ।
১—রন্ধ্রময় নিকেল তড়িৎ-দ্বার। ২—পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইডের দ্রবণ।

দুটি যথাক্রমে বিজারিত রৌপ্য ও বিজারিত নিকেল কণিকাসমূহের দ্বারা অনুবিদ্ধ (Impregnated) এবং সক্রিয়কৃত অঙ্গার (Activated carbon) থেকে তৈরি দুটি সছিদ্র প্রশস্ত ফলক, যাদের মধ্য দিয়ে যথাক্রমে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসকে সহজেই প্রবাহিত করানো যায় এবং যাদের মধ্যবর্তী স্থান তড়িৎ-বিশ্লেষক দ্রবণের দ্বারা পূর্ণ থাকে। উভয় পার্শ্বে, দ্রবণ ও তড়িৎ-দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি

সংস্পর্শে গ্যাস থাকে) রন্ধ্রগুলির মাপ ৩০ মাইক্রন (এক মাইক্রন হলো এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগ, $১০^{-৩}$ মি. মি.), আর অন্য পিঠের (যার সংস্পর্শে তড়িৎ-বিশ্লেষক থাকে) রন্ধ্রগুলির মাপ ১৬ মাইক্রন। এরকম দুটি তড়িৎ-দ্বারের ফলক পাশাপাশি রেখে তাদের মধ্যবর্তী স্থান জুড়ে (অর্থাৎ ফলক দুটির সংস্পর্শে) রাখা হয় তরল তড়িৎ-বিশ্লেষক। আর তাদের বাইরের দিকের দুটি পিঠ বরাবর (অর্থাৎ তাদের সংস্পর্শে)

দুটি গ্যাস প্রবাহিত করানো হয় (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

(৩) উচ্চ তাপের কোষ

আজকাল এই শ্রেণীর নানারকম কোষ তৈরি হচ্ছে। এর একটি পুরনো উদাহরণ হলো চেম্বারের কোষ। এর ক্রিয়াকালীন তাপ ৫৫০°-৭০০° সে.। যে সব জ্বালানী নিম্ন বা মধ্যম তাপে যথেষ্ট সক্রিয় নয়, যেমন—কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি, তাদের এই উচ্চ তাপের কোষে ব্যবহার করা যায়। এই কোষের তড়িৎ-বিশ্লেষক সোডিয়াম ও লিথিয়াম কার্বনেটের ইউটেক্‌টিক মিশ্রণ – গলিত অবস্থায় এবং তড়িৎ-দ্বার হলো রৌপ্যের দ্বারা অনুবিদ্ধ জিঙ্ক-অক্সাইডের দুটি ছিদ্রময় ফলক। এই দুটি তড়িৎ-দ্বারের মধ্যবর্তী স্থানে (এবং উভয়ের সংস্পর্শে) পিণ্ডবদ্ধ ম্যাগ্‌নেশিয়া থেকে তৈরি অপর একটি রন্ধ্রময় (রন্ধ্রের মাপ ২৫ মাইক্রন) ফলক থাকে, যার রন্ধ্রগুলির মধ্যে উক্ত তড়িৎ-বিশ্লেষকটি গলিত অবস্থায় অবস্থান করে (৫নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

৫নং চিত্র। চেম্বারের জ্বালানী-কোষ।
১—রৌপ্যের দ্বারা অনুসিদ্ধ রন্ধ্রময় জিঙ্ক-অক্সাইড তড়িৎ-দ্বার, ২—তড়িৎ-বিশ্লেষক ধারক রন্ধ্রময় ম্যাগ্‌নেসিয়া ঝিল্লী, ৩—হাওয়া (অক্সিজেন), ৪—জ্বালানী গ্যাস।

জ্বালানী-কোষ সম্বন্ধে নানা খবর

১৯৬৩ সালে জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী এক উচ্চ তাপের (২০০০° ফা.) জ্বালানী-কোষ উদ্ভাবন করেন, যাতে জ্বালানী হিসাবে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) ব্যবহার করা হয়। এরকম প্রতিটি কোষে বিদ্যুৎ-চাপ উৎপন্ন হয় ০·৭ ভোল্ট এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের ঘনত্ব (Current density) হয় বর্গফুট প্রতি ১৫০ অ্যাম্পিয়ার।

নিউইয়র্কের জেনারেল ইলেকট্রিক রিসার্চ লেবরেটরী ১৯৬৩ সালে একটা মধ্যম তাপের (২৫০°-৪০০° ফা.) জ্বালানী-কোষ উদ্ভাবন করেন, যাতে জ্বালানী হিসাবে প্রোপেন গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এই কোষে বর্গফুট প্রতি ২৫ অ্যাম্পিয়ারের প্রবাহ-ঘনত্ব পাওয়া গেছে।

১৯৬৪ সালে শেল রিসার্চ লিমিটেডের 'থ্রনটন গবেষণা কেন্দ্র' একটি নিম্নচাপের (৬০° সে.) জ্বালানী-কোষ তৈরি করেন, যাতে জ্বালানী হিসেবে

মিথেনল ব্যবহার করা হয়। এই কোষে প্রায় ৫ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১৯৫৫ সালে আমেরিকার ওয়েষ্টিং হাউস রিসার্চ লেবরেটরী ৪০০টি জ্বালানী-কোষ নিয়ে গঠিত একটি উচ্চ তাপের (১৮০০° ফা.) ব্যাটারী তৈরি করেন, যা থেকে ১০০ ওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই ব্যাটারীর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, এতে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় কয়লা। উত্তপ্ত কয়লার উপর বাষ্প পাঠিয়ে হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাই আসলে এই কোষের জ্বালানী। এই পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে কয়লা থেকে সরাসরি বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে।

১৯৬৫ সালের ২১শে অগাষ্ট আমেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত জেমিনি-৫ নামক মহাকাশযানে (এতে দু-জন মহাকাশচারী কুপার ও কনরাড ছিলেন) দুটি হাইড্রোজেন-অক্সিজেন জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাটারী থেকে উৎপন্ন বিদ্যুতের দ্বারা মহাকাশযানের ভিতরের নানারকম যন্ত্রপাতি চালু রাখা হয়েছিল। এই দুটির একত্রে ওজন ছিল মাত্র ১৩৪ পাউণ্ড এবং এগুলি থেকে উৎপন্ন হতো ২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ। সাধারণ স্টোরেজ ব্যাটারী থেকে এই পরিমাণ বিদ্যুৎ আট দিন ধরে পেতে হলে (মহাকাশযানটি প্রায় আট দিন আকাশে ছিল) যতগুলি ব্যাটারী লাগতো, তাদের মোট ওজন দাঁড়াতো প্রায় এক-টন। ব্যবহৃত জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী দুটির প্রতিটির আয়তন ছিল এক ফুট ব্যাস ও দু ফুট উঁচু একটা ছোট ড্রামের মত। এগুলি থেকে প্রতিদিন ২ গ্যালনেরও বেশী বিশুদ্ধ জল উৎপন্ন হতো। দু-জন মহাকাশচারীর আট দিনের প্রয়োজনীয় সবটুকু পানীয় জল এই ব্যাটারী দুটি থেকেই নেওয়া হয়েছিল।

অদূর ভবিষ্যতে (১৯৭০ সালের আগেই) তিন জন মহাকাশচারীসমেত চাঁদে অভিযান চালাবার জন্যে আমেরিকা যে অ্যাপোলো নামক মহাকাশযান তৈরি করছে, তাতে বিদ্যুতের উৎস এবং মহাকাশচারীদের ১৪ দিনের মত প্রয়োজনীয় সমস্ত পানীয় জল সরবরাহের জন্যে জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী ব্যবহার করা হবে। ইষ্ট হার্ডফোর্ডে অবস্থিত প্র্যাট অ্যাণ্ড হুইট্‌নি এয়ার-ক্র্যাফট নামক প্রতিষ্ঠানের উপর এই ব্যাটারী তৈরির ভার পড়েছে। তাঁরা ইতিমধ্যেই যে ব্যাটারী তৈরি করেছেন, তাতে ২২ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে এবং ৪০০ ঘণ্টায় তাথেকে ৭৭ গ্যালন জল পাওয়া গেছে। নাসা (NASA National Aeronautics and Space Administration) উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই ব্যাটারীগুলি গ্রহণ করেছেন।

সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান (প্র্যাট এণ্ড হুইট্‌নি এয়ার ক্র্যাফট) এমন একটি জ্বালানী-কোষ তৈরি করেছেন, যাতে হাইড্রোজেনের বদলে প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) এবং অক্সিজেনের বদলে হাওয়া ব্যবহার করা যায়। এতে ৩২ ভোল্ট বিদ্যুৎ-চাপে ৫০০ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই কোষের আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এতে প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিবর্তে পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি নানা রকম তরল হাইড্রোকার্বন জ্বালানী ব্যবহার করা যায়।

নাসা-র সঙ্গে অপর এক কন্‌ট্রাক্ট অনুযায়ী আমেরিকার এলিস-চামার্‌স্ নামক প্রতিষ্ঠান ১৯৬৫ সালে একটি জ্বালানী-কোষের ব্যাটারী তৈরি করেন, যেটা একটি মহাকাশযানে ৬০ দিন ধরে ২ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ (চাপ ২৮ ভোল্ট) দিতে পারবে। এতে প্রতিদিন ২½ থেকে ৩ গ্যালন পরিমাণ জল উৎপন্ন হয়। এই কোষের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা মহাকাশের অত্যন্ত নিম্নতাপে (-৫০° সে.) সহজভাবেই কাজ করে।

ফ্রান্সে জ্বালানী-কোষ সম্পর্কে গবেষণা

সাম্প্রতিক এক খবরে প্রকাশ, ফ্রান্সের মারকুসিতে অবস্থিত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীর গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ জ্বালানী-কোষ সম্পর্কে বেশ কিছু কাজ করেছেন। তাঁরা তড়িৎ-দ্বার হিসেবে নিকেল-রৌপ্যের সচ্ছিদ্র পাত ব্যবহার করে খুব সুফল পেয়েছেন। এগুলি বহুদিন ধরে খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ দেয় এবং সহজে এদের উপর কোন বিষক্রিয়া হয় না। এদের তৈরি ১০ ভোল্টের একটি জ্বালানী-কোষ তিন বছর ধরে ক্রমাগত কাজ করবার পর এখনও একই রকম দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। মাঝে মাঝে এটাকে সর্ট-সার্কিট করা বা এর গ্যাস সরবরাহ হেরফের করা প্রভৃতি নানাভাবে একে ব্যতিব্যস্ত করা সত্ত্বেও এর দক্ষতা একটুও কমে নি।

কোষের মধ্যে অতি সহজেই হাইড্রোজেন গ্যাস যাতে সরবরাহ করা যায়, সে জন্যে তাঁরা ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড নামক রাসায়নিকটি ব্যবহার করছেন। ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডে জলসংযোগ করলেই তাথেকে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। কাজেই কোষের দ্রবণের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে যে জল উৎপন্ন হয়, দ্রবণ থেকে তাকে বিশেষ কৌশলে আলাদা করে নিয়ে সেই জলকেই আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডের উপর প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়া চক্রবৎ চলে।

মারকুসি গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ এখন অনেকগুলি করে ছোট আকারের জ্বালানী-কোষকে অল্প পরিসরের মধ্যে বিশেষ কৌশলে সাজিয়ে এবং তাদের বৈদ্যুতিক সংযোগে যুক্ত করে তাথেকে বিভিন্ন চাপ ও বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ আহরণের চেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। এভাবে ১১টি ক্ষুদ্রকার কোষকে পরস্পরের বৈদ্যুতিক সমান্তরালে সংযুক্ত করে তাথেকে ৪০ অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ শক্তির এবং ০·৭৫ ভোল্ট চাপের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁরা ১১টি করে কোষকে এভাবে একত্রিত করে একটি করে মডিউল (Module) তৈরি করেছেন। এরকম গোটাকতক মডিউলকে পাশাপাশি সাজিয়ে যুক্ত করলে তাথেকে যুগপৎ উচ্চ শক্তির ও উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এই ব্যাটারী থেকে অতি সহজেই প্রয়োজনমত নানা চাপের ও নানা শক্তির বিদ্যুৎ আহরণ করা যেতে পারে। ১৯৬৫ সালে এঁদের উদ্ভাবিত ২৪ ভোল্ট চাপের এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত শক্তি উৎপাদনক্ষম একটি জ্বালানী-কোষ প্যারিসের 'পালেস অব ডিস্‌কভারী'তে রক্ষিত আছে। এই কোষটির বাইরের চেহারা নিতান্তই একটা ছোটখাটো রেফ্রিজারেটরের মত।

জৈব জ্বালানী-কোষ

নর্দমার ময়লা ও গোবর থেকে বিদ্যুৎ: অতি আধুনিক কালে জৈব রাসায়নিক জ্বালানী-কোষের (Biochemical fuel cell) বা সংক্ষেপে জৈবকোষের (Biocell) উদ্ভব হয়েছে। নর্দমার ময়লা, পচনশীল গোবর প্রভৃতি এক্ষেত্রে জ্বালানী। এরকম কোষে কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া বা এনজাইমের প্রভাবে হাওয়ার অক্সিজেনের সঙ্গে জ্বালানীর সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া (Bacterial air oxidatian) থেকে উৎপন্ন শক্তি বিদ্যুতে পরিণত হয়। একদিকে যেমন বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি ময়লাগুলিও পরিষ্কৃত হয়ে যায়। মহানগরীর নর্দমার ময়লাকে এভাবে পরিষ্কৃত ও প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুতের উৎসে পরিণত করা যেতে পারে; আর পাড়াগাঁয়ে গোবর থেকে অতি সহজেই এবং বিনা খরচায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও চালানো বা অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করা যেতে পারে।

নারকেলের জল থেকে বিদ্যুৎ: ক্যালিফোর্নিয়ার এক বৃহৎ আমেরিকান প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি এক নতুন রকমের জৈব জ্বালানী-কোষ উদ্ভাবনে

সক্ষম হয়েছেন। এই কোষের জ্বালানী হলো অতি সাধারণ নারকেলের জল। নারকেলের জল মিষ্টি, কাজেই তার মধ্যে কোন কোন শর্করা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের সাহায্যে এই শর্করা দ্রবণকে জারিত করলে তাথেকে ফর্মিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয় ও রাসায়নিক শক্তি ছাড়া পায়। এরোমোনাস ফরমিকান (Aeromonas formican) নামক বাতাসে ভেসে-বেড়ানো এক রকম জীবাণুর প্রভাবে এই বিক্রিয়া সহজেই ঘটে। বিশেষভাবে তৈরি একটি প্লাগকে এরকম বিক্রিয়াশীল নারকেল জলে ডুবিয়ে দিয়ে ঐ ছাড়া-পাওয়া রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎরূপে আহরণ করা যায়। প্রতি পাউণ্ড নারকেলের জল থেকে এভাবে যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, তা দিয়ে একটা ট্র্যানজিষ্টর রেডিওকে পঞ্চাশ ঘণ্টা ধরে চালু রাখা যায় কিম্বা একটা বৈদ্যুতিক বাতিকে ঘণ্টাখানেক জ্বালিয়ে রাখা চলে। হাল্কা ও অতি সহজলভ্য এই ধরণের বিদ্যুৎ-উৎস যে কোন পাড়াগাঁয়ের অধিবাসীদের অথবা জংলা এলাকায় অবস্থানকারী জওয়ানদের খুবই প্রয়োজনে লাগবে।

বৈজ্ঞানিকেরা এখন আখের রস, ফলের রস, রাঙা আলু—এমন কি, ঘাস বা গাছের পাতার রস থেকে বিদ্যুৎ আহরণের কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে জ্বালানী-কোষ যে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়তো দেখবো, বহু যানবাহন পেট্রোল বা ডিজেলের পরিবর্তে জ্বালানী-কোষের বিদ্যুৎ-শক্তিতে চলছে। ট্রেন এবং জাহাজ চালাতেও কালক্রমে জ্বালানী-কোষের ব্যবহার হতে পারে। ভবিষ্যতে জ্বালানী-কোষের মাধ্যমে অতি অল্প খরচে যেখানে-সেখানে—এমন কি, যে কোন রকম গ্রাম্য এলাকাতেও বিদ্যুতের আশীর্বাদ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

রাবার-রসায়ন

শ্রীস্বপনকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাবার হইতেছে একরকম গাছের রস বা আঠা। এই গাছের নাম হিভিয়া ব্রাসিলিয়েন্‌সিস (Hevea Brasiliensis)। মালয়, ব্রেজিল, মেক্সিকো, বেলজিয়ান কঙ্গো, থাইল্যাণ্ড, বার্মা, বোর্ণিও, সিংহল ও দক্ষিণ ভারতে রাবারের চাষ হয়। রাবার গাছের বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ হইলেই ইহা হইতে রস সংগ্রহ করা হইতে থাকে এবং প্রায় ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহার উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। রাবার গাছ হইতে রস সংগ্রহের পদ্ধতি অনেকটা খেজুর গাছের রস সংগ্রহের মত। সাধারণতঃ একদিন অন্তর একদিন এই রস সংগ্রহ করা হয় এবং দৈনিক একটি গাছ হইতে প্রায় ১ আউন্স পরিমাণ রস পাওয়া যায়। এই রস দেখিতে কতকটা দুধের মত এবং ইহাতে রাবারের কণাগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ভাসিয়া বেড়ায়। রাবার গাছের রসকে ইংরেজীতে ল্যাটেক্স বলে। রাসায়নিক বিশ্লেষণে ইহাতে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি পাওয়া যায়—

রাবার হাইড্রোকার্বন =৩৫—৩৮%
জল =৬০%
প্রোটিন =১·৫—২%
অ্যাসিটোনে দ্রবণীয় পদার্থ=১·৫%
অজৈব লবণ =০·৫%

রাবার কণাগুলির ব্যাস মোটামুটি এক সেন্টিমিটারের দশহাজার ভাগের একভাগ এবং ওজন ৫ × ১০$^{-১৪}$ গ্র্যাম।

রাবার ল্যাটেক্সে অ্যাসিটিক অ্যাসিড বা ফরমিক অ্যাসিড দিলে রাবারের কণাগুলি অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপকে অতঃপর রোলারে চাপ দিয়া উহার জলীয় অংশ দুর করা হয়। পরে এই রাবারের পাত্‌গুলিকে বাতাসে শুকাইয়া লইলেই ক্রেপ রাবার পাওয়া যায়। ইহাতে ৯০ শতাংশেরও বেশী রাবার হাইড্রোকার্বন থাকে। তবে বাজারে যে রাবার বিক্রয় হয়, তাহার অধিকাংশই ধূম্রপক্ক (Smoked) রাবার। ইহা প্রস্তুত করিতে হইলে রাবারের পাত্‌গুলিকে কাঁচা কাঠের ধোঁয়াতে প্রায় এক সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয়। ধোঁয়াতে রাবারের রং বাদামী হয়ে যায় এবং রাবারকে ছত্রাকের (Mold) হাত হইতে রক্ষা করে।

প্রাকৃতিক রাবারের কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ ইহা খনিজ তৈল ও অজৈব অ্যাসিডে সহজেই দ্রবীভূত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা অক্সিজেন, ওজোন ও সূর্যালোকের দ্বারাও সহজেই আক্রান্ত হয়। ফলে উহার স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় এবং অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। এই কারণে রাবারকে শতকরা ৫-৮ ভাগ গন্ধকের সহিত মিশাইয়া ১৪০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪-৫ ঘণ্টা উত্তপ্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভাল্‌ক্যানাইজেশন। ইহা কতকটা আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করেন রাবার-রসায়নের জনক চার্লস্‌ গুড্‌ইয়ার ১৮৩৯ সালে। ইহার ফলে রাবারের ধর্মের নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি ঘটিয়া থাকে—

	ধর্ম	কাঁচা (Raw) রাবার	গন্ধকযুক্ত (Vulcanized) রাবার
(১)	স্থিতিস্থাপকতা (পাউণ্ড প্রতি বর্গইঞ্চিতে)	৩০০	৩০০০
(২)	সর্বোচ্চ প্রসারণ-ক্ষমতা	১২ গুণ	৮ গুণ
(৩)	জলশোষণ-ক্ষমতা	বেশী	কম
(৪)	বেঞ্জিনে দ্রবণীয়তা	দ্রবণীয়	কিঞ্চিৎ দ্রবণীয়
(৫)	আঠালোভাব (Tackiness)	খুব বেশী	একেবারেই নাই
(৬)	ব্যবহারোপযোগী তাপমাত্রার সীমা	১০-৬০°C	-৪০ হইতে ১০০°C

গুড্‌ইয়ার আবিষ্কৃত উপরিউক্ত পদ্ধতিটি প্রায় ১৮৩৯ হইতে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০ বৎসর চালু ছিল। এই পদ্ধতির দোষ হইল—ইহাতে সময় বেশী লাগে এবং তাপমাত্রাও অধিক। তাহা ছাড়া গন্ধকের পরিমাণ বেশী হইলে রাবারের বর্ণ ধূসর হয় এবং উহার শক্তি, স্থায়িত্ব প্রভৃতি সব কিছুই কমিয়া যায়। এই কারণে আজকাল Vulcanize করিবার পূর্বে রাবারের সহিত আরও কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়; যেমন—মার্‌ক্যাপটো-বেনজো-থায়াজোল (MBT), ডাইফিনাইল গুয়ানিডিন (DPG), টেট্রামিথাইল-থাওইউরান-ডাইসালফাইড প্রভৃতি। ইহাদের বলা হয় Accelerator। ইহার ফলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে, কম তাপমাত্রায় ও কম গন্ধক মিশাইয়া উত্তম গুণসম্পন্ন রাবার প্রস্তুত হয়। তাহা ছাড়া জিঙ্ক ষ্টিয়ারেট

(Activator) মিশাইলে রাবারের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

রাবার যাহাতে নরম ও প্লাষ্টিক হয় এবং অন্যান্য উপাদানের সহিত সহজে মিশিতে পারে, সেই জন্য উহাকে রোলারে পেষণ করা হয়—ইহাকে বলা হয় Mastication বা Milling। পেষণের পূর্বে অবশ্য ১-২% আলকাত্‌রা, রোজিন বা মোম মিশাইয়া লইলে কাজটি অনেক কম সময়ে ও কম শক্তিব্যয়ে সম্পন্ন হইতে পারে এবং রাবারের আণবিক ওজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কমিতে পারে না। এই পদার্থগুলিকে বলা হয় Plasticizer।

রাবারের সহিত কার্বন-ব্ল্যাকের গুঁড়া মিশাইলে উহার ছেদন (Tear), ঘর্ষণ (Abrasion) ও টানসহন শক্তি (Tensile strength) বৃদ্ধি পায়। মোটর গাড়ীর চাকায় এই কার্বন-ব্ল্যাকের ব্যবহার খুব বেশী। একটি অ্যামব্যাসেডর গাড়ীর মোট ওজন প্রায় ৩০০০ পাউণ্ড—ইহার মধ্যে কার্বন-ব্ল্যাক ২০০ পাউণ্ড। অবশ্য কার্বন-ব্ল্যাকের পরিমাণ খুব বেশী হইলে রাবারের গুণ হ্রাস পায় এবং ঘর্ষণজাত তাপ উৎপত্তির ফলে টায়ার দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। রাবারের সহিত শতকরা ১ ভাগ পরিমাণ ফিনাইল-বিটা-ন্যাপথাইল-অ্যামিন নামক পদার্থটি মিশাইলে উহা বেশী দিন স্থায়ী হয়। রাবারের রঙীন জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে উহার সহিত লৌহ, ক্যাডমিয়াম টাইটেনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর অক্সাইড মিশাইতে হয়।

প্রাকৃতিক রাবারের একটি প্রধান দোষ হইল এই যে, উহা খনিজ তৈলের দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। এই দিক দিয়া কৃত্রিম রাবার সুবিধাজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন প্রাকৃতিক রাবারের রপ্তানী বাধাপ্রাপ্ত হয়, সেই সময় আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে কৃত্রিম রাবার শিল্পের দ্রুত প্রসারলাভ ঘটে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক রাবার উৎপন্ন হয় বৎসরে ২০ লক্ষ টন এবং কৃত্রিম রাবার উৎপাদনের হারও বৎসরে ২০ লক্ষ টন। ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বেরিলিতে কৃত্রিম রাবারের একটি কারখানা সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে—ইহার উৎপাদনের হার বৎসরে ৩৩০০০ টন।

কৃত্রিম রাবারের মধ্যে সর্বপ্রধান হইল এস-বি-আর (SBR) বা বুনা-এস (Buna-S)। তিন ভাগ বিউটাডাইন ও একভাগ ষ্টাইরিনের বিক্রিয়ায় এই রাবার প্রস্তুত হয়।

$$\underset{\text{(বিউটাডাইন)}}{CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2} + \underset{\text{(ষ্টাইরিন)}}{CH_2{-}\underset{\displaystyle C_6H_5}{\overset{|}{CH}}}$$

$$\downarrow$$

$$\left[-(CH_2-CH=CH-CH_2)_x-(CH_2-\underset{\displaystyle C_6H_5}{\overset{|}{CH}})_y-\right]_n$$

(এস-বি-আর)
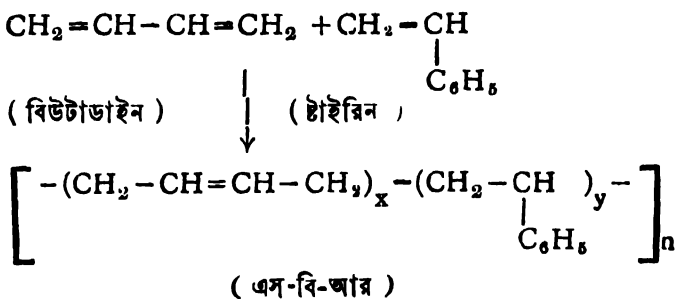
পেট্রোলিয়াম খনি হইতে পাওয়া যায় মিথেন গ্যাস; ইহাকে অ্যাসিটিলিন গ্যাসে রূপান্তরিত করা যায় তাপের প্রভাবে। অতঃপর ঐ অ্যাসিটিলিন হইতে বিউটাডাইন প্রস্তুত করা হয় নিম্নোক্তরূপে—

$$HC\equiv CH + 2\,HCHO \xrightarrow[\text{৫ atm.}]{\text{১০০°C}} \underset{OH}{CH_2}-C\equiv C-\underset{OH}{CH_2}$$

(অ্যাসিটিলিন) (ফরম্যালডিহাইড) (বিউটাইন-ডাই-অল)

$$\downarrow H_2/Ni;\ \text{১০০°C};\ \text{৩০০ atm.}$$

$$\underset{OH}{CH_2}-CH_2-CH_2-\underset{OH}{CH_2}$$

(১ : ৪-বিউটেন-ডাই-অল)

$$\longrightarrow \text{(ring: } CH_2-CH_2,\ CH_2\ \ CH_2,\ -O- \text{)}$$

(টেট্রাহাইড্রোফুরান)

$$\downarrow \text{২১০°C} \mid H_3PO_4$$

$$CH_2=CH-CH=CH_2$$
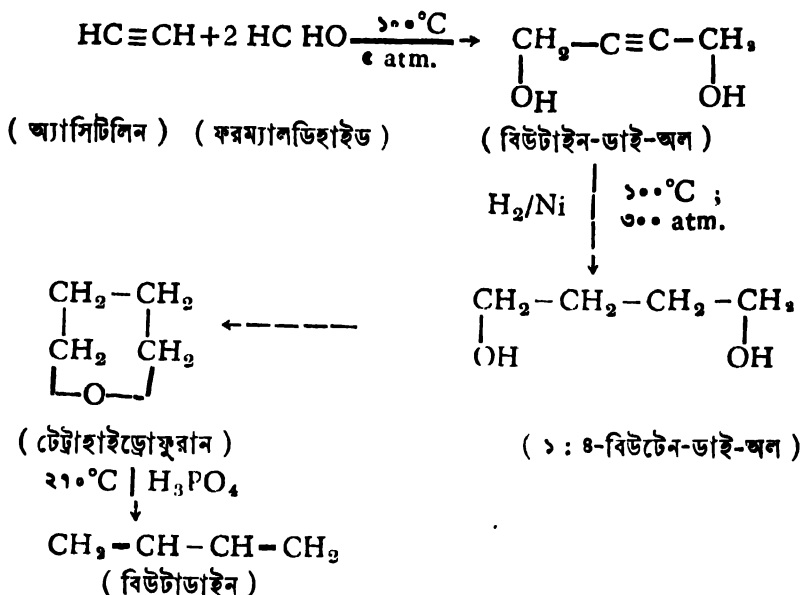
(বিউটাডাইন)

ইহা ছাড়া ইথাইল অ্যালকোহল হইতেও বিউটাডাইন প্রস্তুত করা চলে।

ষ্টাইরিন প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে ইথিলিন ও বেঞ্জিনের বিক্রিয়ায় ইথাইল-বেঞ্জিন প্রস্তুত করা হয় এবং পরে ঐ শেষোক্ত পদার্থটি হইতে হাইড্রোজেন দূর করা হয়—

$$C_6H_6 + C_2H_4 \xrightarrow[\text{৯৫°C}]{AlCl_3} C_6H_5-CH_2-CH_3$$

(বেঞ্জিন) (ইথিলিন)

$$(-H_2)\downarrow SiO_2/Ta_2O_5,\ \text{৬০০-৭০০°C}$$

$$C_6H_5-CH=CH_2$$
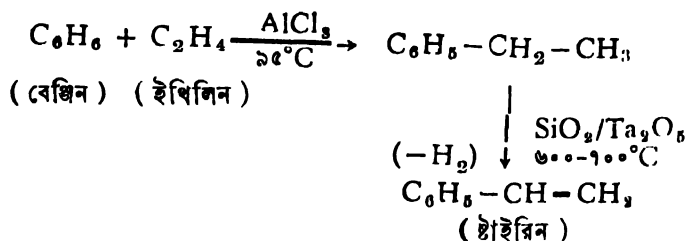
(ষ্টাইরিন)

অতঃপর ষ্টাইরিন ও বিউটাডাইন হইতে পূর্বোক্ত উপায়ে এস-বি-আর রাবার প্রস্তুত করা হয়। রাবারের জিনিষ তৈয়ারি করিতে এখন অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক রাবারের পরিবর্তে এস-বি-আর ব্যবহার করা হইতেছে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় না। কৃত্রিম রাবারের আঠালোভাব (Tackiness) কম বলিয়া টায়ার-শিল্পে অন্ততঃ শতকরা ২৫ ভাগ প্রাকৃতিক রাবার অপরিহার্য।

এস-বি-আর ছাড়া অন্যান্য কৃত্রিম রাবার-গুলিকে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এই শ্রেণীতে পড়ে বুনা-এন, নিয়োপ্রিন, বিউটাইল রাবার ও থাওকল। ইহারা সকলেই খনিজ তৈলের সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে।

বুনা-এন বা পারবিউনান রাবারের প্রস্তুত-পদ্ধতি অনেকটা এস-বি-আর রাবারের অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে ষ্টাইরিনের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় অ্যাক্রাইলো-নাইট্রাইল। এই শেষোক্ত পদার্থটি পাওয়া যায় ইথিলিন অক্সাইড ও হাইড্রো-সায়ানিক অ্যাসিডের সংমিশ্রণে।

নিয়োপ্রিন রাবার প্রস্তুত করা হয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে—অনুঘটক হিসাবে ব্যবহার করা হয় কিউপ্রাস ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণ :

$$2\,HC\equiv CH \xrightarrow[\text{৩০°C}]{CuCl/NH_4Cl} CH_2=CH-C\equiv CH$$

(মনোভিনাইল অ্যাসিটিলিন)

$$\downarrow HCl\ (\text{ঘন})$$

$$\left(-CH_2-CH=\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}-CH_2-\right)_n \xleftarrow[\text{পলিমেরিজেশন}]{\text{ইমালসন}} CH_2=CH-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{C}}=CH_2$$
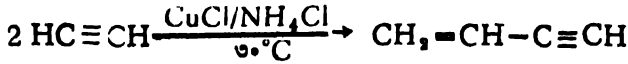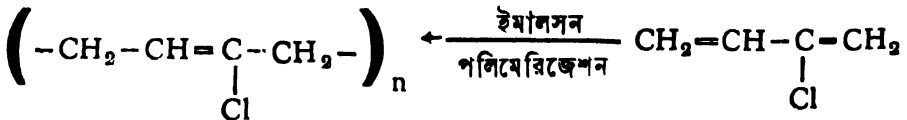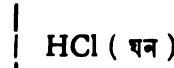
(নিয়োপ্রিন) (ক্লোরোপ্রিন)

বিউটাইল রাবার একটি কো-পলিমার। ইহার উপাদান হইল শতকরা ৯৮ ভাগ আইসো-বিউটিলিন এবং ২ ভাগ আইসোপ্রিন অথবা বিউটাডাইন :

$$CH_2=\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}}} \quad + \quad CH_2=\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}-CH=CH_2$$

$$\downarrow$$

$$\left[\left(CH_3-\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{|}{C}}}}-\right)_x \left(-CH_2-\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{C}}=CH-CH_2-\right)_y\right]_n$$
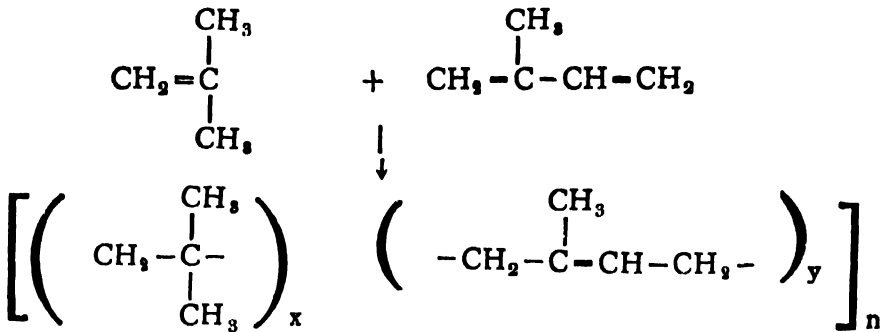
থায়োকল রাবার আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী প্যাট্রিক ১৯২০ সালে। গ্রীক ভাষায় গন্ধককে বলে 'থায়োন' এবং ইহা হইতেই থায়োকল শব্দের উৎপত্তি ; কারণ থায়োকল রাবারে গন্ধক বর্তমান। ইথিলিন ডাইক্লোরাইড এবং সোডিয়াম টেট্রা-সালফাইডের বিক্রিয়ায় থায়োকল-এ (Thiokol-A) রাবার প্রস্তুত হয় :

$$\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH_2}}-\underset{\displaystyle Cl}{\underset{|}{CH_2}} + Na-\underset{\displaystyle S}{\underset{\|}{S}}-\underset{\displaystyle S}{\underset{\|}{S}}-Na \longrightarrow \left(-CH_2-CH_2-\underset{\displaystyle S}{\underset{\|}{S}}-\underset{\displaystyle S}{\underset{\|}{S}}-\right)_n$$
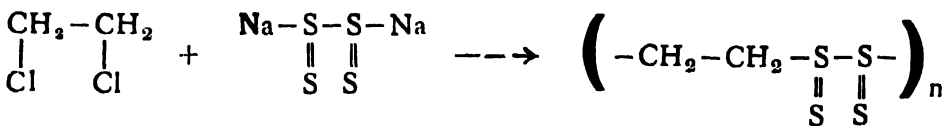
বুনা-এন নিয়োপ্রিন প্রভৃতি উপরিউক্ত সব কয়টি রাবারই খনিজ তৈল ও দ্রাবকের সংস্পর্শ সহ্য করিতে পারে—তবে ইহাদের মধ্যে থায়োকলেরই সহনক্ষমতা সর্বাধিক। কিন্তু ইহাতে গন্ধক থাকিবার দরুণ ইহা চর্মরোগ উৎপন্ন করিতে পারে।

বিভিন্ন কৃত্রিম রাবারের যে প্রস্তুত-পদ্ধতি সম্বন্ধে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কৃত্রিম রাবার শিল্পের জন্য প্রয়োজন পেট্রোলিয়াম-শোধনাগারের উপজাত দ্রব্যগুলি। যদিও পেট্রোলিয়াম-সম্পদে আমাদের দেশ এখনও অতীব দরিদ্র, তথাপি আসাম, বিশাখাপত্তনম ও বোম্বাইতে যে কয়টি শোধনাগার আছে, তাহাদের উপজাত দ্রব্যের দ্বারা ভারতে কৃত্রিম রাবারের উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

মানব-বৈশিষ্ট্যের বংশধারা

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

সন্তান-সন্ততির মধ্যে একই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য প্রতি পর্যায়ে দেখা গেলে সেই বৈশিষ্ট্যকে সাধারণতঃ বংশগত বলে গ্রহণ করা হয়। বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ কখনও স্ত্রীলোকের মধ্যে বেশী এবং পুরুষের মধ্যে কম, আবার কখনও স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী দেখা যায়। কোন ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এক এক পর্যায় অন্তর পরিস্ফুট হয়, আবার কোন ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবারের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হয়। আপাত-দৃষ্টিতে বংশগত বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবকে 'এলো-মেলো বলে মনে হলেও বংশলতিকার (Pedigree chart) সাহায্যে বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ক্রমিক ধারা পর্যবেক্ষণ করলে, অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যের সাধারণ উত্তরাধিকার সূত্র আবিষ্কার করা যায়। বংশলতিকার সাহায্যে মানব-বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধি-কারসূত্র আবিষ্কার করবার পূর্বে বংশানুক্রম প্রক্রিয়ার মূলসূত্র সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা জানি যে, পুরুষের একটি শুক্রাণু (Sperm) ও স্ত্রীলোকের একটি ডিম্বাণুর (Ovum) সংমিশ্রণে যে এক কোষবিশিষ্ট জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়, তা ক্রমাগত বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং তাদের সমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ। মানুষের প্রতিটি দেহকোষের কেন্দ্রে থাকে একটি নিউক্লিয়াস এবং প্রতিটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে সুতার মত দেখতে কয়েকটি জৈব পদার্থ—তাদের বলা হয় ক্রোমোসোম (Chromosome)। বিভিন্ন প্রজাতিতে (Species) ক্রোমোসোমের সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। মানুষের দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম থাকে; প্রতি জোড়া ক্রোমোসোমের একটি মাতার এবং অপরটি পিতার নিকট থেকে আসে। ২৩ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে যে একজোড়া ক্রোমোসোম মানুষের লিঙ্গকে নির্ধারণ করে—তাদিগকে যৌন ক্রোমোসোম (Sex Chromosome) আর বাকী ২২ জোড়াকে অ-যৌন ক্রোমোসোম বা অটো-সোম (Autosome) বলে। যৌন ক্রোমোসোম দুটিকে X ও Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। আকৃতি ও আয়তনে X ও Y ক্রোমোসোম দুটির মধ্যে অমিল দেখা যায়। স্ত্রীলোকের দেহকোষে দুটি X ক্রোমোসোম এবং পুরুষেব দেহকোষে একটি X ও একটি Y ক্রোমোসোম থাকে। প্রতি স্ত্রীলোক পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একটি করে X ক্রোমোসোম লাভ করে, কিন্তু প্রতি পুরুষ মাতার নিকট থেকে X এবং পিতার নিকট থেকে Y ক্রোমোসোম পেয়ে থাকে।

ক্রোমোসোমের মাধ্যমে পিতামাতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন জিন (Gene)। ডি-এন-এ (DNA) নামক এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা জিন গঠিত। ক্রোমোসোম বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জিন বহন করে থাকে। কোন বিশেষ জিন নির্দিষ্ট ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট কক্ষে (Locus) অবস্থান করে। যে জিন যৌন ক্রোমোসোমে অবস্থিত, তাকে লিঙ্গ অনুগামী জিন (Sex linked gene) এবং যে জিন অ-যৌন ক্রোমোসোমে অবস্থিত, তাকে অ-লিঙ্গ অনুগামী জিন (Autosomal gene) বলে। জিন যে বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে

তা সব সময় সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে যে বৈশিষ্ট্য সন্তান-সন্ততির বহিঃপ্রকৃতিতে (Phenotypically) প্রকাশ পায়, সেই বৈশিষ্ট্যকে প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) এবং যে বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে, তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) বলে। প্রকট বৈশিষ্ট্যকে প্রকট জিন (Dominant gene) এবং প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন জিন (Recessive gene) নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণতঃ সন্তান যদি পিতামাতা উভয়ের নিকট থেকে প্রকট জিন অথবা প্রচ্ছন্ন জিন পায়, তাহলে তার মধ্যে প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু সন্তান যদি পিতামাতার যে কোন একজন থেকে প্রকট জিন এবং অপর জন থেকে প্রচ্ছন্ন ক্রোমোসোমের অবস্থান সম্পর্কে পরিচয় পাওয়া যায়। মানব-বৈশিষ্ট্যের বংশলতিকা প্রস্তুত করতে হলে কতকগুলি প্রতীক চিহ্নের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। পুরুষকে চতুষ্ক এবং স্ত্রীলোককে বৃত্তের দ্বারা চিহ্নিত করাই সাধারণ রীতি। স্বামী-স্ত্রীকে একটি সরল রেখার দ্বারা সংযুক্ত করা হয় এবং তাদের ঠিক নীচে আর একটি সমান্তরাল রেখায় পুত্রকন্যাদের জন্ম অনুযায়ী বাম দিক থেকে সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে একটি লম্ব রেখার সাহায্যে দুই পর্যায়কে (Generation) সংযোগ করা হয়। বংশলতিকায় স্বাভাবিক (সুস্থ), অস্বাভাবিক (রোগগ্রস্ত) ও 'বাহক' পুরুষ ও স্ত্রীলোককে নিম্নে বর্ণিত প্রতীকের দ্বারা বোঝানো হয়ে থাকে (১নং চিত্র)।

মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা সব ক্ষেত্রে

□ স্বাভাবিক পুরুষ	■ অস্বাভাবিক পুরুষ	⊡ বাহক পুরুষ
○ ,, স্ত্রীলোক	● ,, স্ত্রীলোক	⊙ ,, স্ত্রীলোক

১নং চিত্র।

জিন লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় এবং প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে। যদি পিতামাতার একজনের চোখের মণির রং কালো, অপর জনের কটা হয় এবং তাদের সব সন্ততির যদি কালো চোখ দেখা যায়, কটা রঙের লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তাহলে কালো চোখ প্রকট এবং কটা চোখ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। মানুষের বেশীরভাগ বংশগত রোগ প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহ্যতঃ নীরোগ অবস্থায় যে ব্যক্তি বংশগত রোগের প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে, তাকে 'বাহক' (Carrier) বলে গণ্য করা হয়।

বংশলতিকায় বৈশিষ্ট্যের ধারা অনুসরণ করে জিনের প্রকৃতি ও তার যৌন অথবা অযৌন অনুধাবন করা কঠিন। যে সব বৈশিষ্ট্য মাত্র একটি জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবেশের উপরে নির্ভরশীল নয়, তাদের বংশধারা বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট বৈশিষ্ট্যের ধারা

পিতা অথবা মাতার কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্য যদি অর্ধেক পুত্রসন্তান ও অর্ধেক কন্যা-সন্তানের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে সেই রোগ বা বৈশিষ্ট্য অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এরূপ পরিবারের রোগগ্রস্ত সন্তানের পিতা অথবা মাতাকে রোগগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায় এবং

বংশলতিকায় রোগের ধারা অনুসরণ করে উপর পর্যায়ের দিকে অগ্রসর হলে রোগ কোন্ পর্যায়ের কোন্ ব্যক্তি থেকে উৎপত্তি হয়েছে, তার সন্ধান পাওয়া যায়। হাত-পায়ের আঙুল-গুলি ছোট হওয়ার বৈশিষ্ট্যকে Brachydactylism বলে এবং এটা অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। উপরে এই বৈশিষ্ট্যের বংশধারা দেখানো হয়েছে (২নং চিত্র)।

২নং চিত্র।

ব্যাধি বা বৈশিষ্ট্য অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোন সন্তান যদি পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একই বৈশিষ্ট্যের প্রচ্ছন্ন জিন লাভ করে, তাহলে তার মধ্যে ঐ জিনের অভিব্যক্তি (Manifestation) লক্ষ্য করা যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ থাকলে, তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।
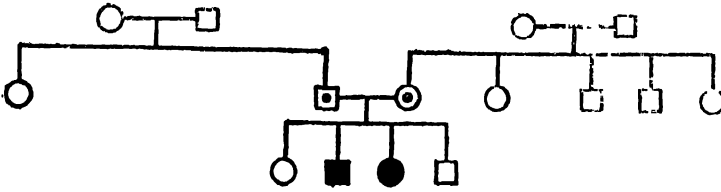
৩নং চিত্র।

(২) অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা

সন্তানের কোন অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য যদি তার পিতা, মাতা ও নিকট পূর্বপুরুষের মধ্যে লক্ষ্য করা না যায়, তাহলে সেই বৈশিষ্ট্যকে সহজে বংশগত বলে গ্রহণ করা যায় না। অ্যালবিনিজিম্, বিপাক বিশৃঙ্খলাজনিত বংশগত ব্যাধি (যেমন ফেনিলকেটোনুরিয়া, গ্যালাক্‌টোসেমিয়া প্রভৃতি) সুস্থ পরিবারের পুত্রকন্যাদের মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে থাকে। এই সব প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য কিভাবে পুত্র-কন্যার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে থাকে, তা একটি বংশলতিকার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে (৩নং চিত্র)।

(৩) লিঙ্গ অনুগামী প্রকট বৈশিষ্ট্যের ধারা

প্রতি পর্যায়ে কোন রোগ বা বৈশিষ্ট্যের প্রাদুর্ভাব পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি বেশী দেখা যায়, তখন সেই রোগ বা বৈশিষ্ট্য X ক্রোমোসোমে অবস্থিত প্রকট জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পূর্বে বলা হয়েছে যে,

প্রতি স্ত্রীলোক পিতা ও মাতা উভয়ের নিকট থেকে একটি করে X ক্রোমোসোম এবং প্রতি পুরুষ শুধু মাতার নিকট থেকে একটি X ক্রোমোসোম পায়—এই কারণে X ক্রোমোসোম সংশ্লিষ্ট প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের মধ্যে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অনেক সময় লিঙ্গ ও অ-লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের বংশগতির পার্থক্য বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়ে।
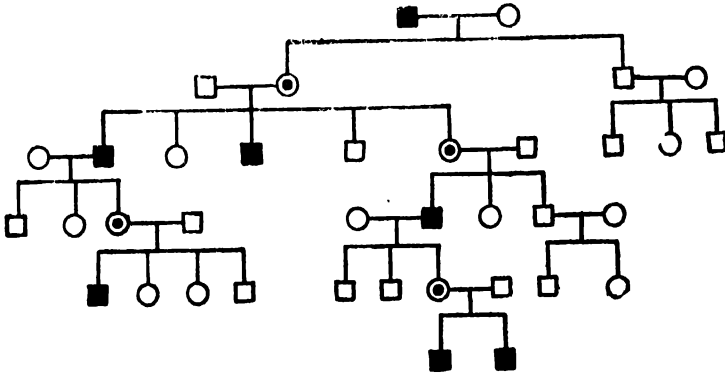
৪নং চিত্র।

৫নং চিত্র।

প্রথম ক্ষেত্রে পিতার বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র কন্যা-সন্তানের মধ্যেই আবির্ভূত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে অর্ধেক সন্তান-সন্ততির মধ্যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। নষ্ট এনামেলের ফলে দাঁত যে গাঢ় হলুদবর্ণ ধারণ করে, তা লিঙ্গ অনুগামী প্রকট জিনের উপর নির্ভরশীল। এই বৈশিষ্ট্যের ধারা উপরের বংশলতিকায় দেখানো হয়েছে (৪নং চিত্র)।

(৪) লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ধারা

হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা প্রভৃতি বংশগত রোগ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে বেশী প্রকাশ পায়। রোগের বংশগতি অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এক এক পর্যায় অন্তর এর আবির্ভাব ঘটে এবং রোগগ্রস্ত পুরুষ কন্যার মাধ্যমে তার রোগ দৌহিত্রকে প্রদান করে, কিন্তু তার নিজের পুত্র ও পৌত্রদের মধ্যে রোগের লক্ষণ কখনও প্রকাশ পায় না। এই শ্রেণীর বংশগত রোগ X ক্রোমোসোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্ত্রীলোকেরা রোগের 'বাহক' হয়ে থাকে। তাদের অর্ধেক পুত্র সন্তানদের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং অর্ধেক কন্যা-সন্তান রোগের 'বাহক' হয়ে জন্মগ্রহণ করে। 'বাহক' স্ত্রীলোকের সঙ্গে রোগগ্রস্ত পুরুষের

বিবাহে অর্ধেক পুত্র সন্তান ও অর্ধেক কন্যা-সন্তানের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকটিত হয়। একটি বংশলতিকার সাহায্যে লিঙ্গ অনুগামী প্রচ্ছন্ন জিনের ধারা বোঝানো হয়েছে (৫নং চিত্র)।

প্রপৌত্রের মধ্যে প্রকাশ পায়, কিন্তু কোন কন্যাসন্তানের মধ্যে প্রকাশ পায় না। এই বৈশিষ্ট্য Y ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কারণ Y ক্রোমোসোম সর্বদা পিতা থেকে পুত্র, পুত্র থেকে
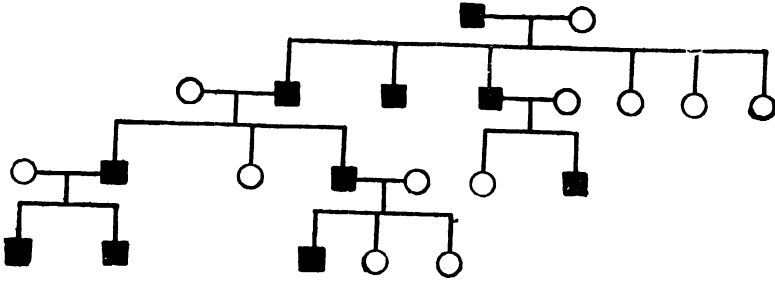
৬নং চিত্র।

(৫) Y-ক্রোমোসোম সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ধারা

অনেক বয়স্ক পুরুষের কানে যে চুল দেখা যায়, তা বংশ পরম্পরায় পিতা, পুত্র, পৌত্র, পৌত্র, পৌত্র থেকে প্রপৌত্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। উপরের বংশলতিকায় Y ক্রোমো-সোমে অবস্থিত জিনের ধারা দেখানো হয়েছে (৬নং চিত্র)।

সমপরিবাহী পদার্থ

বিশ্বরঞ্জন নাগ

রেডিও ও টেলিভিশনের সঙ্গে আর একটি কথা আজকাল বিশেষভাবে শোনা যায়। কথাটি হলো ট্র্যানজিস্টর (Transistor)। এক বিশেষ ধরণের ছোট আকারের রেডিও, যা ব্যাটারী দিয়ে চলে এবং অতি সহজে যত্র-তত্র নিয়ে যাওয়া যায়, সেই রেডিওর নাম হলো ট্র্যানজিস্টর রেডিও। নামটি এসেছে এই রেডিওতে ট্র্যানজিস্টর ব্যবহার হয় বলে। প্রায় বিশ বছর আগে ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কার করেন আমেরিকার বেল লেবরেটরীতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাত-নামা তিন জন বিজ্ঞানী—শক্‌লে (Shockley), বার্ডিন (Bardeen) ও ব্রাটেন (Brattain)। ভাল্‌ব দিয়ে যে সব কাজ করা যায়, সেই সব কাজ ট্র্যানজিস্টর দিয়েও করা যায়, উপরন্তু ট্র্যানজিস্টর আকারে অনেক ছোট এবং এতে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয়ও হয় কম। তাই ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই বিশেষভাবে সমাদৃত হয় এবং রেডিওর মাধ্যমে জনসাধারণেরও বিশেষ পরিচয় হয়। বিজ্ঞানের দিক থেকে বলা যেতে

পারে, ট্র্যানজিস্টর ইলেকট্রনিক্সে (Electronics) এক নতুন যুগের সূচনা করে।

ট্র্যানজিস্টর তৈরি হয় এক বিশেষ ধরণের বিদ্যুৎ-পরিবাহী পদার্থের দ্বারা, যার ইংরেজী নাম হলো সেমিকণ্ডাক্টর (Semiconductor), বাংলায় বলা যেতে পারে সমপরিবাহী। বিজ্ঞানের প্রথম যুগে মানুষ যখন তড়িতের সঙ্গে পরিচিত হয় তখনই লক্ষ্য করে যে, বিভিন্ন পদার্থে তড়িতের চলাচলে বিভিন্নতা আছে। এক ধরণের পদার্থে তড়িৎ সঞ্চার করলে তাড়ৎ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর এক ধরণের পদার্থে কিন্তু সীমিত জায়গাতেই জমা থাকে। তামা, রূপা, লোহা এবং অন্যান্য ধাতু প্রথম ধরণের পদার্থ। এদের নাম দেওয়া হয় পরিবাহী (Conductor)। গন্ধক, কাচ, গালা ইত্যাদি দ্বিতীয় ধরণের পদার্থ। এদের নাম দেওয়া হয় অপরিবাহী (Insulator)। কালক্রমে বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে বিশদভাবে পরীক্ষার ফলে দেখা যায়—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আবার আর এক শ্রেণীর পদার্থ আছে, যারা সীমিত জায়গায় তড়িৎকে ধরেও রাখতে পারে না, আবার তড়িৎ অল্প সময়ের মধ্যে এদের সর্বত্র ছড়িয়েও পড়তে পারে না। এই ধরণের পদার্থের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জার্মেনিয়াম (Germanium), সিলিকন (Silicon) ও গ্যালিনা, কপার অক্সাইড, ক্যাডমিয়াম সালফাইড জাতীয় বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ। এদের নাম দেওয়া হয় সমপরিবাহী।

তড়িৎ-বিদ্যার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের গূঢ় তত্ত্ব বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে আসে। জানা যায় যে, পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণের বিভিন্নতা আসে এদের পারমাণবিক গঠনের বিভিন্নতা থেকে। পরিবাহী পদার্থের পরমাণুগুলির ইলেকট্রনের একটি অংশ মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং এরাই তড়িৎকে এক অংশ থেকে অন্য অংশে বয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি কঠিন বন্ধনে বাঁধা থাকে বলে তড়িৎকে ছড়িয়ে দেবার কোন বাহক পাওয়া যায় না। সমপরিবাহী পদার্থের গুণাগুণ কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ দুর্বোধ্য ছিল। অতি বিশুদ্ধ সমপরিবাহী পদার্থ তৈরি করবার কায়দা যতদিন না আয়ত্ত হয়েছিল, ততদিন এদের গুণাগুণ জানাও সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফলাফলে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী দেখা যেত। উপরন্তু তত্ত্বের দিক থেকেও পরীক্ষার ফল বোঝা যাচ্ছিল না। তাই পদার্থবিদেরা একে পদার্থবিদ্যার একটি 'নোংরা অংশ' ধরে নিয়ে এদের পরিহার করে চলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েন।

সমপরিবাহী পদার্থকে বোঝা সম্ভব না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার চালু ছিল। পরিবর্তী প্রবাহকে (A. C.) সমপ্রবাহে (D. C.) পরিবর্তিত করবার জন্যে এদের ব্যবহার করা হতো। তামার একটি পাতের একটা দিককে অক্সিজেনের আবহাওয়ায় গরম করে নিলে দেখা যেত, তড়িৎ-প্রবাহ তামা থেকে কপার অক্সাইডে যেতে পারে, কিন্তু উল্টো দিকে যেতে পারে না। আবার গ্যালিনার একটি খণ্ড নিয়ে তার উপরে কোন ধাতুর তার চেপে লাগিয়ে নিলেও দেখা যায়, তড়িৎ-প্রবাহ ধাতুটি থেকে গ্যালিনায় যেতে পারে, কিন্তু উল্টো দিকে যেতে পারে না। তাই বহুকাল থেকেই পরিবর্তী প্রবাহকে সমপ্রবাহে পরিবর্তিত করবার জন্যে এবং বেতার-তরঙ্গ থেকে শব্দজ্ঞাপক তরঙ্গ উৎপন্ন করবার কাজে কপার অক্সাইড ও গ্যালিনার বহুল প্রচলন ছিল। ভাল্‌ব আবিষ্কারের পরে এই ব্যবহার কিছুটা কমে যায়, কেন না, ভাল্‌বের দ্বারা একাজ আরও সুষ্ঠুভাবে করা যেত। কিন্তু রেডার জাতীয় যন্ত্রে, যেখানে স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ (Microwave) ব্যবহৃত হয়, সে সব ক্ষেত্রে এই ধরণের ক্রিষ্ট্যালের ব্যবহার থেকে যায়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের যন্ত্রে

ভাল্‌ব ঠিক কাজ করতো না বলেই ক্রষ্টালের ব্যবহার চালু ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় রেডারে এই ক্রষ্টালের বহুল প্রচলনের ফলে বিজ্ঞানীদের সমপরিবাহী পদার্থ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অনেক বেড়ে যায়। বহু বিজ্ঞানী এদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁদের চেষ্টায় সমপরিবাহী পদার্থকে বিশুদ্ধিকরণের বিদ্যা আয়ত্তে আসে। তত্ত্ববিদেরাও সমপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে অনেক বেশী অবহিত হয়ে ওঠেন।

বহুজনের অধ্যবসায়ে পদার্থবিদ্যার 'নোংরা অংশটি' পরিষ্কৃত হয় এবং ছাইয়ের গাদা থেকে আবিষ্কৃত হয় একটি নতুন মাণিক। পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ থেকে অনেক বেশী উপযোগী গুণ নিয়ে দেখা দেয় সমপরিবাহী পদার্থ। পরিবাহী এবং অপরিবাহী পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ—কেন না, এদের তড়িৎ-গুণ সহজে পাল্টানো যায় না। সহজে যদি তড়িৎ-প্রবাহকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে ব্যবহার করা হয় পরিবাহী পদার্থ—যেমন, বাড়ীর ইলেকট্রিক লাইনে। প্রয়োজন অনুসারে এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝে রূপা, তামা বা অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। আবার তড়িৎ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে বা দুটি লাইনকে আলাদা রাখতে হলে ব্যবহৃত হয় অপরিবাহী পদার্থ। যেমন, বাড়ীর সুইচে ব্যাকেলাইট, লাইনের আবরণে রবার, দূর পাল্লার উচ্চ বিভবের বৈদ্যুতিক লাইনে চীনামাটি। এমনিভাবে তড়িৎ-চুম্বক তৈরি করবার কাজে ব্যবহার করা হয় লোহা, তাপ উৎপন্ন করবার জন্যে নিকেল ও ক্রোমিয়ামের গলিত মিশ্রণ, আলোর জন্যে টাংষ্টেন। এই সব পদার্থের তড়িৎ-গুণ প্রায় অপরিবর্তনীয়, পারিপার্শ্বিকের উপরে খুব অল্প পরিমাণেই নির্ভরশীল। পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণ অপরিবর্তনীয় হওয়ার প্রধান কারণ হলো এই যে, এদের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যার সহজে কোন পরিবর্তন করা যায় না। অপরিবাহী পদার্থের ইলেকট্রনের বন্ধন মুক্ত করা সহজ নয়। আবার পরিবাহী পদার্থে মুক্ত হওয়ার মত সব ইলেকট্রনই মুক্ত থাকে বলে তাদের সংখ্যাও বাড়ানো বা কমানো যায় না। শুধু মাত্র তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়েই পরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণের সামান্য পরিবর্তন করা যায়। যদি নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র তৈরি করতে হয়, তাহলে এমন কোন পদার্থ দরকার, যার মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যার সহজে পরিবর্তন করা যায়। পরিবাহী পদার্থের ইলেকট্রনগুলি বাইরে নিয়ে আসা যায় তাপ দিয়ে বা আলো ফেলে। ভাল্‌বে এমনি তাপের দ্বারা পরিবাহী পদার্থ থেকে বাইরে আনা মুক্ত ইলেকট্রনরই ব্যবহার হয়। ভাল্‌বের বায়ুশূন্য অংশে এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলি নিয়ন্ত্রণ করেই তড়িৎ-প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করা হয় এবং ফলে বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ভাল্‌বের দ্বারা চালানো সম্ভব হয়।

সমপরিবাহী পদার্থের তড়িৎ-গুণ খুব সহজেই পরিবর্তিত করা যায়। এদের পরমাণুর যে ইলেকট্রনগুলি মুক্ত হতে পারে, তার কিছু অংশ সাধারণতঃ মুক্ত থাকে এবং কিছু অংশ পরমাণুর সঙ্গেই বাঁধা থাকে। কতগুলি ইলেকট্রন বাঁধা থাকবে এবং কতগুলি মুক্ত থাকবে, তাও সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটিয়ে বা চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে দিয়ে বা অন্য পদার্থ মিশিয়ে। ধরা যাক জার্মেনিয়ামের গুণাগুণ। জার্মেনিয়াম ধাতু হলেও এর তড়িৎ-প্রকৃতি সমপরিবাহী। অতি বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের এক ঘন সেণ্টিমিটার একটি টুক্‌রার অবরোধ (Resistance) ২৩° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ৪৭ ওম্; অর্থাৎ এমন একটি টুক্‌রায় ৪৭ ভোল্ট তড়িৎ-বিভব প্রয়োগ করলে ১ অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ-প্রবাহ চলে। কিন্তু

তাপমাত্রা যদি ১০° সেন্টিগ্রেড বাড়ানো হয়, তাহলে ঐ টুক্‌রাটির অবরোধ কমে গিয়ে হয়ে যায় ৪৪ ওম্‌। আবার যদি ১০ কিলোগাউস চৌম্বক ক্ষেত্রে টুক্‌রাটি রেখে দেওয়া হয়, তাহলে অবরোধ বেড়ে গিয়ে হয়ে যায় ৫৫ ওম্‌। অন্য পদার্থ মিশিয়ে দিলেও টুক্‌রাটির অবরোধ অনেক কমে যায়। দেখা যায় অন্য পদার্থ মিশিয়ে বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামকে নিয়ন্ত্রিতভাবে অবিশুদ্ধ করে দুই ধরণের জার্মেনিয়াম পাওয়া যায়। এক হলো বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চেয়ে বেশী সংখ্যক ইলেকট্রনযুক্ত ঋণাত্মক (n-type) জার্মেনিয়াম। দ্বিতীয় হলো বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চেয়ে কম সংখ্যক ইলেকট্রনযুক্ত ধনাত্মক (p-type) জার্মেনিয়াম। প্রথম ধরণের জার্মেনিয়াম তৈরি হয় অ্যান্টিমনি বা আর্সেনিক মিশিয়ে এবং দ্বিতীয় ধরণের জার্মেনিয়াম তৈরি হয় গ্যালিয়াম বা ইণ্ডিয়াম মিশিয়ে। এই দুই ধরণের জার্মেনিয়ামেরই প্রতি ঘন সেন্টিমিটারের অবরোধ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের চেয়ে অনেক কম হতে পারে। উপরন্তু এই দুই ধরণের জার্মেনিয়াম পরস্পরের সঙ্গে যুক্তাবস্থায় রাখা হলে বিদ্যুৎ-বিভবের সাহায্যে ইলেকট্রনগুলিকে এক অংশ থেকে অন্য অংশে নিয়ে যাওয়া যায়। ফলে ভাল্‌বে যেমন নিয়ন্ত্রণযোগ্য মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়, জার্মেনিয়ামেও তেমনি ইলেকট্রন পাওয়া যেতে পারে।

বেল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরাই সর্বপ্রথম বিশেষভাবে বিশুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত অবিশুদ্ধ জার্মেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করে এদের নিয়ন্ত্রণযোগ্য ইলেকট্রনের বিভিন্ন গুণাগুণ আবিষ্কার করেন। সমসাময়িক অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও এর তত্ত্বের জট ছাড়িয়ে অন্তর্নিহিত ঘটনাগুলি বিজ্ঞানীদের আয়ত্তে আনেন। এর ফলেই আবিষ্কৃত হয় ভাল্‌বের ন্যায় বিদ্যুৎ-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করবার একটি নতুন যান্ত্রিক কৌশল—ট্র্যানজিস্টর। ইণ্ডিয়াম মেশানো একটি জার্মেনিয়াম-খণ্ডের দুই প্রান্তকে আর্সেনিকের বাষ্পে কিছুক্ষণ রেখে দিয়ে ঐ দুই প্রান্তে ও মাঝখানে তিনটি তার জুড়ে নিলেই ট্র্যানজিস্টর তৈরি হয়ে যায়। দুই প্রান্তে আর্সেনিক থাকায় প্রান্ত দুটি হয় ঋণাত্মক গোত্রের এবং মাঝখানের অংশে ইণ্ডিয়াম থাকায় এটি হয় ধনাত্মক গোত্রের। ফলে এক প্রান্ত ও মাঝখানের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন ঘটিয়ে অপর প্রান্তের তড়িৎ-প্রবাহ পরিবর্তিত করা যায় এবং বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা অপর প্রান্তে প্রথম প্রান্তের চেয়ে জোরালো তড়িৎ-বিভব পাওয়া যেতে পারে। এভাবে ট্র্যানজিস্টরের দ্বারা তড়িৎ-বিভবের জোর কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। কাজেই ভাল্‌বের ন্যায় দূরাগত বেতার-তরঙ্গের জোর ট্র্যানজিস্টরের দ্বারা বাড়ানো যায়। ফলে রেডিওতে এই ট্র্যানজিস্টরের ব্যবহার দেখা দেয়। শব্দ সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের জোর বাড়ানোর জন্যে অ্যামপ্লিফায়ারে বা মাইকের আনুষঙ্গিক সরঞ্জামেও এর ব্যবহার চালু হয়। ট্র্যানজিস্টরের সঙ্গে সঙ্গে সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োড, প্রচলিত ভাষায় ক্রিষ্ট্যালেরও প্রভূত উন্নতি হওয়ায় বেতার-তরঙ্গ থেকে শব্দ সৃষ্টিকারী তড়িৎ-প্রবাহ আহরণ করবার কাজেও সমপরিবাহী পদার্থ বিশেষভাবে উপযোগী হয়ে ওঠে।

উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলি ছাড়াও আজকাল সমপরিবাহী পদার্থের আরও অনেক ধরণের উপযোগিতা জানা গেছে। এর মধ্যে বিশেষ কয়েকটি উপযোগিতার কথা অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। আগেই বলা হয়েছে যে, সমপরিবাহী পদার্থের অবরোধ তাপমাত্রা ও চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আলো বা বিকিরিত তাপ সমপরিবাহী পদার্থের উপর পড়লে এর অবরোধ ক্ষমতা অনেকটা বদ্‌লে যায়। দ্বিতীয়তঃ কোন সমপরিবাহী পদার্থের একটি খণ্ডের দুই প্রান্তকে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক করে নিলে যে ডায়োড পাওয়া যায়, তার উপর আলো ফেললে বা দুই

প্রান্তের তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটালে দুই প্রান্তে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তঃ সমপরিবাহী পদার্থে বা এই পদার্থ দিয়ে তৈরি ডায়োডে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে এথেকে আলো ও অন্যান্য তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ বিকিরিত হয়। সমপরিবাহী পদার্থের এই সব গুণাগুণ সহজ ও সাধারণ পরীক্ষায়ই ধরা পড়ে, কিন্তু এর ব্যাখ্যা পদার্থ-বিদ্যার তাত্ত্বিক জটিলতার মধ্যে পড়ে এবং সাধারণের পক্ষে তা বিশেষ দুর্বোধ্যও বটে। তত্ত্ব না বুঝলেও কিন্তু গুণগুলি যে বিভিন্ন ধরণের কাজের উপযোগী হবে, তা সহজেই বোঝা যায়।

তাপমাত্রার উপর সমপরিবাহী পদার্থের অবরোধ-ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করে বলে তাপমাত্রা পরিমাপের জন্যে এর ব্যবহার হতে পারে। আবার যে সব যন্ত্রে তাপমাত্রা নির্দিষ্ট রাখতে হয়, সে সব যন্ত্রেও সমপরিবাহী পদার্থের থার্মোমিটার বহুল ব্যবহৃত হয়। এমনিভাবে চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের জন্যে বা চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন যন্ত্রের বিদ্যুৎ-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যেও এর ব্যবহার হয়। আলো পড়লে সম-পরিবাহী পদার্থের অবরোধ পরিবর্তিত হয় বলে আলো মাপবার জন্যেও এর ব্যবহার হয়, যেমন—ক্যামেরায় আলো নির্দেশক যন্ত্রে। এক্ষেত্রে একটি সমপরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে ব্যাটারীর সাহায্যে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠানো হয় এবং তড়িৎ-প্রবাহের পরিমাণ একটি মিটারে নির্দেশিত হয়। সমপরিবাহী পদার্থে আলো পড়লে তড়িৎ-প্রবাহ বেড়ে যায় এবং পক্ষান্তরে তড়িৎ-প্রবাহ পরিমাপক মিটার আলোর পরিমাণ নির্দেশ করে অপর পক্ষে আবার আলো ব্যবহার করে সমপরিবাহী পদার্থের সাহায্যে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রও তৈরি করা যায়; যেমন, চোর ধরবার অ্যালার্ম। আলোর কাছে রেখে দিলে কোন সমপরিবাহী পদার্থে যে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যায়, আলোর সামনে দিয়ে কেউ হেঁটে গেলে সেই তড়িৎ-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটবে। সেই পরিবর্তন কাজে লাগিয়ে অ্যালার্ম বাজানো যেতে পারে।

সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডেরও আলো পরিমাপের জন্যে বহুল প্রচলন আছে। আজকাল অধিকাংশ ক্যামেরায় সমপরিবাহী পদার্থের বদলে সাধারণতঃ ডায়োডেরই ব্যবহার হয়; কেন না, এর সঙ্গে ব্যাটারী লাগাতে হয় না। এক্ষেত্রে ডায়োডের উপর আলো পড়লে যে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারাই এর দুই প্রান্তের মধ্যে লাগানো মিটারে তড়িৎ-প্রবাহ চলে। তাই একটি ডায়োড ও মিটার ব্যবহার করেই আলোর পরিমাণ মিটারের নির্দেশ থেকে জানা যেতে পারে। আলোর ন্যায় বিকিরিত তাপও সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োড দিয়ে মাপা যেতে পারে। এমনি ডায়োডের আর একটি প্রসারিত ব্যবহারের ক্ষেত্র হলো সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন করবার কাজে। সূর্যালোককে পুরাপুরি কাজে লাগাবার জন্যে ডায়োডটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়, যেন সূর্যরশ্মির সব অংশ শুষে নিতে পারে। এই বিশেষ কাজের ডায়োডের নাম দেওয়া হয়েছে সৌর-কোষ (Solar battery)। সূর্যালোকে রেখে দিলে সাধারণ ব্যাটারীর মতই এই সৌর-কোষের দুই প্রান্তে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয় এবং একে ব্যাটারীর বিকল্পরূপে ব্যবহার করা যায়। মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসের অধিকাংশই এই সৌর-কোষ। ডানার উপরে বা যানের গায়ে কাচ লাগানো যে অংশ দেখা যায়, সেই অংশ সৌর-কোষের দ্বারাই পূর্ণ থাকে এবং এরাই সূর্যালোক থেকে তড়িৎ-শক্তি উৎপন্ন করে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালু রাখে।

সমপরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে এর দুই প্রান্তের তাপমাত্রার বিশেষ পার্থক্য হয় বলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে বা

কোন জায়গাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে, যেমন—রেফ্রিজারেটারে এর ব্যবহার দেখা যায়, কতকগুলি সমপরিবাহী পদার্থের খণ্ডকে জুড়ে নিয়ে এক প্রান্ত রেফ্রিজারেটারের মধ্যে রেখে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালেই অভ্যন্তরের প্রান্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় এবং রেফ্রিজারেটারের তাপমাত্রা কমিয়ে দেয়।

সমপরিবাহী পদার্থের তৃতীয় ধরণের গুণকে কাজে লাগানো সাম্প্রতিক কালেই আরম্ভ হয়েছে। দুটি ধাতুর চাদরের মধ্যে কিছুটা সমপরিবাহী পদার্থ রেখে দিয়ে চাদর দুটিতে তড়িৎ-বিভব যোগ করলেই পদার্থটি থেকে আলো নির্গত হয়। এই আলো ঘরের মধ্যে অভিনবভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ঘরের পর্দায় বা দেয়ালে সমপরিবাহী পদার্থ পেন্টের মত লাগিয়ে নিয়ে তড়িৎ-বিভবের সাহায্যে সমগ্র পর্দা বা দেয়াল থেকে স্নিগ্ধ আলো পাওয়া যেতে পারে। বিদ্যুতের খরচা এই ধরণের আলোতে অনেক কম এবং সব জায়গা সমভাবে আলোকিত করাও সম্ভব। বিজ্ঞাপনে বা সঙ্কেতের কাজেও এই ধরণের আলোর উপযোগিতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কার্যকরী সমপরিবাহী পদার্থের আলো উদ্ভাবনের কাজ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই সাধারণের ব্যবহারের জন্যে আলো পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

ট্র্যানজিস্টর আবিষ্কারের পর থেকেই দুর্বল তড়িৎ-প্রবাহ ব্যবহারকারী রেডিওর সমগোত্রীয় যন্ত্রে ভাল্‌বের বিকল্পরূপে সমপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হয়। অ্যাম্‌প্লিফায়ার, কম্পিউটার, কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র, শ্রবণ যন্ত্র প্রভৃতি অসংখ্য রকমের ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ট্র্যানজিস্টর পুরাপুরি ভাল্‌বের জায়গা দখল করে। কিন্তু ট্র্যানজিস্টরের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করবার ক্ষমতা সীমিত থাকায় বেতারের প্রেরক যন্ত্রে (Transmitter) এর বিশেষ প্রয়োগ হয় নি। কিন্তু ট্র্যানজিস্টরের ক্ষমতার পরিধি ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে এবং ছোট ছোট প্রেরক যন্ত্রে এর ব্যবহার আরম্ভ হচ্ছে। উপরন্তু সমপরিবাহী পদার্থের দ্বারা অতি আধুনিক কালে এক অভিনব ধরণের বেতার-তরঙ্গ উৎপাদক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্যালিয়াম আর্সেনাইড জাতীয় সমপরিবাহী পদার্থে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে আপনা থেকেই রেডারের উপযোগী স্বল্প দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ বিকিরিত হয়। মাইক্রোওয়েভের ক্ষেত্রে গ্যালিয়াম আর্সেনাইডের এই গুণ বলতে গেলে যুগান্তর এনেছে। আশা করা যাচ্ছে, এর ব্যবহারে যে সব যন্ত্র মাইক্রোওয়েভে চলে, যেমন—রেডার, মাইক্রোয়েভের টেলিফোন, সে সব যন্ত্রে অনেক সরলতা আসবে।

গ্যালিয়াম আর্সেনাইড জাতীয় সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডেরও একটি অভিনব গুণ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে এই ডায়োড থেকে আলো বা তাপ রশ্মি বিকিরিত হয়, যে আলো বা বিকিরিত তাপ খুব জোরালো, কেন্দ্রীভূত ও বিশুদ্ধ হয়। মহাশূন্যের সঙ্গে খবর আদান-প্রদানের কাজে এই আলো বা তাপ বিশেষ উপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

ট্র্যানজিস্টর বা ভাল্‌বের দ্বারা বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে জোরালো করা যায় বটে, কিন্তু স্বল্প দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে জোরালো করা যায় না। সমপরিবাহী পদার্থের ডায়োডের একটি বিশেষ গুণকে কাজে লাগিয়ে একাজও করা যায়। ফলে মাইক্রোওয়েভের যন্ত্রপাতি অনেক সূক্ষ্ম করা সম্ভব হয়েছে এবং বেতার-জ্যোতির্বিদ্যার (Radio-Astronomy) কাজও অনেক উন্নত হয়েছে।

মোট কথা, গত বিশ বছরের গবেষণার ফলে সমপরিবাহী পদার্থ আজ এমন এক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে যে, আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহার হবে

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমপরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে। আলো, রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন, বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা, রেডার, মহাকাশযানের ব্যাটারী, ক্যামেরার আলোর মিটার, আলোর বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সর্বত্রই সমপরিবাহী পদার্থ অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছে। সমপরিবাহী পদার্থের কথার শেষ নেই। বিংশ শতাব্দীর এক অভিনব ও বিস্ময়কর আবিষ্কার এই পদার্থ ও এই পদার্থ দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতি। গবেষণা যতই এগিয়ে চলেছে, সমপরিবাহী পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের বিস্ময়ও ততই বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে তাই সমপরিবাহী পদার্থ নিয়ে গবেষণা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। অসংখ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এবং সরকারী ও বেসরকারী গবেষণাগারে অসংখ্য বিজ্ঞানী এই গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশে কয়েকটি গবেষণাগারে এই বিষয়ে সামান্ত কাজ হলেও সমপরিবাহী পদার্থের উপযোগিতা সম্পর্কে আমরা এখনও অবহিত নই অথবা পদার্থবিদ্যার এক সময়ের এই 'নোংরা অংশ' সম্বন্ধে আমাদের বিরাগ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারি নি। অন্যান্য দেশের তুলনায় এই ব্যাপারে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। এমন কি, সাধারণভাবে ব্যবহৃত জার্মেনিয়াম বা সিলিকন জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করবার কোন প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগার এখনও স্থাপিত হয় নি বা স্থাপনার কোন উদ্যোগও দেখা যাচ্ছে না। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে—বিজ্ঞানের এই অবদান সভ্য মানুষের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে এবং যদি অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের নিস্পৃহ ভাব না কাটানো যায়, তাহলে দেশরক্ষা বা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির কাজে অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় আমাদের অনেক পিছিয়ে থাকতে হবে।

সঞ্চয়ন

রক্তশূন্য শিশুর জন্মের প্রতিকার আবিষ্কার

এই বিষয়ে জন নিউওয়েল লিখেছেন—বৃটেনে জাত প্রতি ২০০টি শিশুর মধ্যে একটি রক্তশূন্যতা (Rh-haemolytic) রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে। সম্প্রতি লিভারপুলের ডাক্তারদের চেষ্টা এই রোগ থেকে মুক্তির উপায় পাওয়া গেছে

মা ও শিশুর দৈহিক উপাদানের সামান্য তারতম্যের জন্যে এই রোগ হয়ে থাকে। এই তারতম্যের ফলে নবজাত শিশুর দেহে রক্তকণিকার একান্ত অভাব ঘটে। এই শিশুদের বলা হয় রিসাস বেবিজ (Rhesus babise)।

গর্ভস্থ শিশুদেহ ও মায়ের দেহের প্রতিক্রিয়ার ফলেই এই রোগ জন্মায়। প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজনের রক্তকণিকায় Rh নামে এক প্রকার উপাদান থাকে। যদি মাতা ও পিতা উভয়ের রক্তে এই উপাদান থাকে, অর্থাৎ তাঁরা উভয়েই যদি আর-এইচ পজিটিভ (Rh-positive) হয়, তাহলে বিপদের কোন আশঙ্কা থাকে না। আবার উভয়েই যদি আর-এইচ নেগেটিভ (Rh-negative) হয়, অর্থাৎ উভয়েই যদি এই উপাদান-মুক্ত হয়, তাহলেও কোন বিপদ ঘটে না। এমন কি, পিতা যদি আর-এইচ নেগেটিভ হয়, তবে মাতা আর-এইচ পজিটিভ হলেও কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু পিতা যদি আর-এইচ পজিটিভ হয় এবং সন্তান

যদি তার অনুরূপ হয় এবং মাতা যদি আর-এইচ নেগেটিভ হয়, তাহলেই বিপদ ঘটে।

সাধারণভাবে মা ও শিশুর রক্তকণিকা পরস্পর মেশে না, অন্ততঃ প্ল্যাসেণ্টার বাধা অতিক্রম করে তাদের পরিচলন সম্ভব হয় না। কিন্তু গর্ভকালের শেষাশেষি ছাঁকনিতে ত্রুটি দেখা দেয় ও শিশুর দেহ থেকে দু-একটি রক্তকণিকা মায়ের দেহে পরিবাহিত হতে থাকে। এখন এই শিশুর রক্তকণিকা যদি পিতৃসূত্রে প্রাপ্ত আর-এইচ পজিটিভ উপাদানযুক্ত হয় এবং মা যদি হয় আর-এইচ নেগেটিভ, তাহলে মায়ের দেহ তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে বিদেশী বস্তু বলে বিবেচনা করে। শিশুর রক্তকণিকার বিরুদ্ধে মায়ের দেহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। মায়ের দেহ অ্যাণ্টিবডি (Antibody) তৈরি করে শিশুর রক্তকণিকাগুলি নষ্ট করে ফেলে। অনেকটা টীকা নেবার পর যে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, এটি তার অনুরূপ।

মায়ের দেহ প্রথম শিশুর রক্তকণিকার বিরুদ্ধে বেশী শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না, কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানকে গোড়া থেকেই বিদেশী বস্তু বলে গণ্য করে এবং তার সমস্ত রক্তকণিকা নষ্ট করে ফেলে। এই শিশুরা একেবারেই রক্তশূন্য হয়।

এই রোগ থেকে মুক্তি পাবার উপায় হলো, মায়ের দেহকে যেন সন্তানের রক্তকণিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না হয়, তার আগেই সে কাজটি যেন অন্যভাবে করে দেওয়া হয়।

ঠিক এই কাজটি করেছেন লিভারপুর হাসপাতালের অধ্যাপক সি. এ. ক্লার্ক ও তাঁর সহকর্মীরা। যে সব মায়ের সন্তান আর-এইচ পজিটিভ, তাদের অ্যাণ্টিবডিযুক্ত ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে। ইনজেনশনের দ্বারা রক্তকণিকাগুলি নষ্ট করে দেবার ফলে পরবর্তী সন্তানের বিরুদ্ধে মায়ের আর নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয় না।

এই পদ্ধতি যুক্তভাবে লিভারপুল, শেফিল্ড, লীডস, ব্র্যাডফোর্ড ও যুক্তরাষ্ট্রের বাল্‌টিমোরে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ৭৮ জন স্ত্রীলোকের উপর পরীক্ষায় এই পদ্ধতির সুফল পাওয়া গেছে। তাদের দেহে সন্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। মনে হয়, শিশুর রক্তশূন্যতা (Rh-haemolytic) রোগটিকে সম্পূর্ণরূপে দূর করা সম্ভব হবে। এই পদ্ধতির একটি অসুবিধার দিক হলো এই যে, অ্যাণ্টিবডি ইনজেশনের জন্যে প্রচুর গামা গ্লোবিউলিনের (Gamma globulin) প্রয়োজন হয়।

একটি প্রবন্ধে ডাক্তারেরা বলেছেন—পদ্ধতিটিকে অন্য কাজেও লাগানো যাবে। স্পেয়ার পার্ট সার্জারির (Spare part surgery) সময় দেহে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এই ইনজেকশন দিয়ে তা প্রশমিত করা যাবে।

অগ্নিদগ্ধ হলে দ্রুত প্রাথমিক সাহায্য

লণ্ডনের কুইন মেরি হাসপাতালের ডাঃ জে. কোহন অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিদের দ্রুত প্রাথমিক সাহায্য দিয়ে তাদের কষ্ট লাঘব করতে ও হাসপাতালে পাঠাবার এক নতুন পদ্ধতি বের করেছেন

এই পদ্ধতির মূল কথা হলো নতুন ধরণের ড্রেসিং। এর দ্বারা মাথা থেকে পা পর্যন্ত মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ মানুষের জীবনও এক মিনিটের মধ্যে নিরাপদ করা যাবে।

এই ড্রেসিং-এর উপকরণ হলো প্লাষ্টিক উপাদানে

তৈরি পলিউরেথেন ফোম (Polyurethane foam)। বিভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এই ফোম ২ ইঞ্চি পুরু ও বিভিন্ন আকারে তৈরি করা হয়।

অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তিকে প্রথমে ফোমের চাদরে শোয়ানো হয়। তারপর সেই চাদর দিয়ে তাকে মুড়ে প্রয়োজনমত কাটাকুটি করে পিন এঁটে দেওয়া হয়।

একজন শিক্ষাবিহীন লোকও একাজ করতে পারে। বিরাট বিস্ফোরণ বা অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে যেখানে এক সঙ্গে বহুলোক অগ্নিদগ্ধ হয়, সেখানে এটা একটা বড় রকমের সাহায্য। সাধারণ ড্রেসিং-এর চেয়ে এই ড্রেসিং-এ রোগীকে অনেক নিরাপদে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া চলে।

সাধারণ ড্রেসিং-এ সময় লাগে বেশী এবং সেটা তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে ওঠে, পোড়া-জায়গার সঙ্গে জুড়ে যায় এবং সংক্রমণেরও ভয় থাকে। তাছাড়া এই ড্রেসিং-এ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।

ফোম ড্রেসিং-এর সুবিধা এই যে, হাসপাতালে পৌঁছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রোগীকে বিশেষ কষ্ট না দিয়ে ফোম ড্রেসিং খুলে নেওয়া যায়। এর অর্থ হলো এই যে, রোগীকে অজ্ঞান করবার জন্যে ঔষধ খাওয়াতে হয় না।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যেরা এই ফোম ড্রেসিং নিয়ে একনাগাড়ে ছয় দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন, কিন্তু তবুও তা গায়ে লেগে যায় নি।

হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ রোগীদের এক্সপোজার ট্রিটমেন্টের (Exposure treatment) সময় ফোমের গদিতে শুইয়ে রাখা হয়। পোড়া দেহের রস গড়িয়ে ফোমে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যায়।

মৎস্য উৎপাদনের ভবিষ্যৎ

জে. লুকাস এই সম্পর্কে লিখেছেন—মৎস্য প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন, অথচ পৃথিবীতে প্রোটিনের নিদারুণ অভাব। এটা বৃটেনের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার—কেন না, এই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান মৎস্য-শিকারের ব্যাপারে খুবই অসুবিধাজনক।

নিকট সমুদ্রের মাছ এই দেশের সব সমুদ্র-তীরেই পাওয়া যায়। নর্থ সীর অগভীর জল থেকে আসে মধ্য সমুদ্রের মাছ এবং গভীর সমুদ্রের মাছ আসে আটলান্টিক, গ্রীনল্যাণ্ড, পশ্চিমের গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কস, আইস ল্যাণ্ডের চতুর্দিক, নরওয়ে, উত্তর ও পূর্বের বার্নেট সী থেকে।

পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ লোক প্রোটিন অভাবে রয়েছে; সর্বনিম্ন প্রয়োজন—দিনে মাথাপিছু ৩০ গ্রাম—তাও তারা পায় না। বস্তুতঃ শতকরা ১০ ভাগ লোকের ভাগ্যে দিনে ১০ গ্রাম মাছও জোটে না। আবার নিরক্ষীয় ও দক্ষিণ গোলার্ধে, যেখানে প্রোটিনের অভাব নিদারুণ, সেখানকার মানুষকে প্রোটিনের জন্যে শুধু মাছের উপরই নির্ভর করতে হয়।

সমুদ্রে যখন সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে (জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরলেও) খাওয়াবার মত প্রচুর মাছ রয়েছে, তখন মাছের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে এই ভারসাম্যহীনতা কেন?

পৃথিবীব্যাপী বিরাট আকারে মৎস্য-শিল্প কি গড়ে উঠতে পারে? যদি পারে, তাহলে কেমন করে? এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়—ভৌগোলিক অবস্থান, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত,

তাপমাত্রা, সমুদ্রতলের আকার ও প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয় প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িত। তারপর রয়েছে কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের দিক। জাহাজ ও নৌকাগুলিকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তাদের মৎস্য-শিকারের যোগ্যতা বাড়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মাছধরা জালের প্রভূত উন্নতি হয়েছে—এখন ফ্লাক্স, সুতা, নাইলন, টেরেলিন ইত্যাদি সবই ব্যবহৃত হচ্ছে।

তারপর রয়েছে অর্থনৈতিক বাধা। জাহাজ ও জ্বালানি কিনতে টাকার দরকার, জাহাজ চালক ও কর্মীদের কৌশল আয়ত্ত করতেও টাকার দরকার। সর্বোপরি ভাল ডক এবং পরিবহন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্যেও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

মৎস্য-শিল্প সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং ২০০০ বছরেও এর মৌলিক কলাকৌশল প্রায় একই আছে। পুকুরে মিঠা জলের মাছের চাষ ও সমুদ্রের মাছ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া মৎস্য-পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করা হয় নি। এখনো সমুদ্রই মানুষের কাছে মাছের প্রধান উৎস।

নতুন সম্ভাবনা রয়েছে—আধুনিক কারিগরী বিদ্যার সাহায্যে সমুদ্রের অংশবিশেষ বেছে নিয়ে সেখানে মৎস্যের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটানো বা মৎস্য-শিকারের যোগ্যতা বৃদ্ধির মধ্যে। এই দুদিকেই কিছু অগ্রগতি ঘটেছে।

চারটি মৎস্যবহুল বিরাট ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্রেই সমুদ্রস্রোতবাহিত হয়ে অনেক নিউট্রিয়েন্ট জমা হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই চারটি ক্ষেত্রের কাছাকাছি দেশেই খাদ্যাভাব রয়েছে। এই চারটি ক্ষেত্র হলো দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, আফ্রিকার পশ্চিম ও পূর্ব উপকূল এবং ভারতের মালাবার উপকূল।

এই চারটি অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার সমুদ্র অঞ্চলেই ব্যাপকভাবে মৎস্য-শিকার অভিযান চালানো সুরু হয় ১৯৫৮ সালে। এখানে প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ টন মাছ ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য তিনটি অঞ্চলে এখনও অভিযান চালানো হয় নি। তবে অনুমান করা যায়, এই অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটিতে বছরে ৫০ লক্ষ টন মাছ ধরা পড়বে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, পুরনো ও নতুন মৎস্য অঞ্চলগুলি থেকে যদি ব্যাপকভাবে মৎস্য-উৎপাদন সুরু করা যায়, তাহলে আগামী ২০ বছরে পৃথিবীতে মৎস্য-উৎপাদন দ্বিগুণ হবে।

অনেকের মতে, এটা অতি আশাবাদী মনোভাবের পরিচায়ক; কারণ উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্ত অঞ্চল থেকে আর মৎস্য-উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে মৎস্য-শিকার পদ্ধতির যোগ্যতা বাড়ানো দরকার। পাল-তোলা নৌকার যুগ থেকেই ট্রলিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বর্তমানে তলদেশ থেকে, মধ্য-জলে ও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার জন্যে বিভিন্ন ধরণের ট্রলার রয়েছে। এদের মধ্যে মধ্য-জলের ট্রলারগুলিই বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করে।

ট্রলারগুলিও নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে। জাহাজের পাশাপাশি না রেখে এখন তাদের পিছনের দিকে রাখা হয়। এই ধরণের জাহাজের মধ্যে 'ফেয়ারটি' একটি অগ্রণী জাহাজ। এই ধরণের আরও আধুনিক জাহাজ হলো 'আর্কটিক ক্রিবুটার'। এই জাহাজ গভীর সমুদ্রে মাছ ধরবার উদ্দেশ্যেই নির্মিত। এগুলি সাধারণতঃ দেশ থেকে ১০০০ মাইল দূরে গিয়ে মৎস্য-শিকার করে থাকে। যান্ত্রিকীকরণ সত্ত্বেও এই কারখানা জাহাজে প্রোসেসিংয়ের জন্যে অনেক নাবিক রাখতে হয়। সেই জন্যে এই জাহাজের সাহায্যে মাছ ধরা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

স্থলে শ্রমিকদের শ্রমের সময় কমিয়ে দেওয়ায় ও জাহাজী শ্রমিকের জীবনযাত্রা কষ্টসাধ্য হওয়ায় এই সব গভীর সমুদ্রে মাছ-ধরা জাহাজের জন্যে শ্রমিক পাওয়া কঠিন। সে জন্যে আর্কটিক

ক্রিবুটারে অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সমুদ্রে মাছের ঝাঁকের সন্ধান করা হয় হাল্‌কা বিমান বা হেলিকপ্টারের সাহায্যে। জাহাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ইলেকট্রনিক ফিস ফাইণ্ডার (Fish finder)। একটি রেডার টাইপ স্ক্রীনে মাছের ঝাঁককে প্রত্যক্ষ করা যায়—এমন কি, বিচ্ছিন্নভাবে একটি বিশেষ মাছকেও দেখা যায়। এর ফলে বিশেষ মাছ ধরবার জন্যে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

এটা সত্যি যে, পুরনো মৎস্য-অঞ্চলগুলি অত্যধিক পরিমাণে কর্ষিত, কিন্তু সে এক বিশেষ ধরণের মাছের ক্ষেত্রে, এক বিশেষ গভীরতায়। তাই সেখানে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

বৈদ্যুতিক মাছ ধরা দুভাবে চালানো যেতে পারে। একটি হলো ইলেকট্রোট্যাক্সিস (Electrotaxis)—এতে দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে যখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চালানো হয়, তখন মাছগুলি অ্যানোডের (Anode) দিকে আকৃষ্ট হয়

দ্বিতীয়টি হলো ইলেকট্রোনারকোসিস ও ইলেকট্রোকিউশন (Electronarcosis and electrocution)। এতে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের দ্বারা মাছগুলির মৃত্যু ঘটানো হয়। এই পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা চলে। তবে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ-শক্তি ৮০ কিলোওয়াটের হলে বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

মৎস্য-শিল্পের অবশ্যই ভবিষ্যৎ আছে। পুরনো অঞ্চলগুলি অধিক ব্যবহৃত হলেও নতুন অঞ্চলগুলিতে অভিযান চালানো হচ্ছে।

একটি সমস্যা কিন্তু এখনও যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে নি। সেটি হচ্ছে ক্রেতাদের কুসংস্কার। উদাহরণস্বরূপ, উত্তর আটলান্টিকে এমন অনেক মাছ রয়েছে, যা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনে সমৃদ্ধ, কিন্তু কুৎসিত আকারের জন্যে তাদের কোন ক্রেতা নেই এবং তাদের কখনও ধরা হয় না।

আফ্রিকার কয়েকটি হ্রদে রয়েছে বৃহদাকারের হাতীশুঁড়ো মাছ, যা মেয়েদের খেতে দেওয়া হয় না। সংস্কার এই যে, ঐ মাছ খেলে মেয়েরা বন্ধ্যা হয়ে যায়। এর সমর্থনে অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। মৎস্য-শিল্পের উন্নতির জন্যে এই কুসংস্কার দূর করতে হবে—সাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

ব্যাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

কলিকাতার ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ব্যাণ্ডেল সহর থেকে ৭ মাইল দূরে হুগলী নদীর বাঁকে ব্যাণ্ডেল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। ত্রিবেণী রেল ষ্টেশনটি এর খুবই কাছে। চারটি ইউনিটের ২০০ ফুট উঁচু চারটি চিম্‌নি, চারটি বয়লার এবং কর্মচারীদের অসংখ্য বাসভবন সহ কারখানাটি যে ৪০০ একর পরিমিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে একদা ছিল এক বিরাট জলাভূমি, তাতে ধীবরেরা বাস করতো। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পর্ষদ বা ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডই এর মালিক ও পরিচালক। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে (এপ্রিল, ১৯৬১-মার্চ, ১৯৬৬) পর্ষদ এর রূপায়ণ প্রকল্প মঞ্জুর করে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ-শক্তির উন্নয়নকল্পে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছরে ১৯৫৫ সালের ১লা মে, এই পর্ষদ গঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ২০শে এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের উপস্থিতিতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন কেনেথ গ্যালব্রেথ আনুষ্ঠানিকভাবে এর নির্মাণ কার্যের উদ্বোধন করেন।

এই তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যে চারটি ইউনিট আছে, তাদের প্রত্যেকটিরই বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ৭৫ মেগাওয়াট। তবে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ পর্ষদের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের মতে, প্রতিটি ইউনিটের ৮২.৫ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা রয়েছে বলে এই চারটি ইউনিট থেকে মোট ৩৩০ মেগাওয়াট বা ১০০০ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এর তিনটি ইউনিটই চালু রয়েছে। প্রথমটি চালু হয়েছিল ১৯৬৫ সালের ১৪ই অগাষ্ট। বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত রেলগাড়ীতে এই বিভিন্ন শিল্প কর্পোরেশনের এলাকা বহির্ভূত অঞ্চলে এই কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। কলিকাতা এবং বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে বিদ্যুৎ-শক্তির চাহিদা পূরণে এই কেন্দ্রটি বিশেষভাবে সাহায্য করছে।

এই কারখানার বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ইন্ধন হিসাবে অতি নিম্নমানের কয়লা, কয়লার গুঁড়া ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দৈনন্দিন কয়লার চাহিদা তিন হাজার টনের মত। এর ফলে উচ্চমানের কয়লা ইস্পাত তৈরি ও উন্নত ধরণের ধাতুবিদ্যা সংক্রান্ত কাজে ব্যবহারের জন্যে বাঁচানো যাচ্ছে। এই কয়লা জ্বালিয়ে তারই তাপে বয়লারে জলকে বাষ্পে পরিণত করে সেই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে।

এজন্যে এখানে চারটি বয়লার আছে। প্রত্যেকটি বয়লার ১৪০ ফুট উঁচু ও ৯০ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া। এগুলি ঘণ্টায় ৬৫ হাজার পাউণ্ড অতি উত্তপ্ত বাষ্প উৎপাদন করতে পারে। এই বাষ্প ৮৯ হাজার কিলোওয়াটের যে চারটি টার্বোজেনা-রেটর আছে, তাতে সরবরাহ করা হয়। এই বাষ্পীয় শক্তির সাহায্যে ঐ টার্বোজেনারেটরে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। পাঁচতলাবিশিষ্ট উৎপাদন কেন্দ্র ভবনের তেতলায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন যন্ত্রসমূহকে রাখা হয়েছে। এই সকল যন্ত্রের সবচেয়ে ভারী অংশটির ওজন ১২০ টন।

গুঁড়া কয়লায় বয়লারের আগুন জ্বালিয়ে বাতাসের সাহায্যে সেই আগুন বয়লারের ফার্নেসের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ কয়লা কাজে লাগাবার আগে আগুনের শিখাকে জিইয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে জ্বালানী হিসাবে তেল ব্যবহার করা হয়। ১০ লক্ষ গ্যালন তেল রাখা যায়, এরকম দুটি বিরাট ট্যাঙ্কে এই তেল সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে।

সর্বাধুনিক পদ্ধতিতে নির্মিত এই বিরাট উৎপাদন কেন্দ্রটি পুরাপুরি স্বয়ংক্রিয়। এটি চালাবার জন্যে মাত্র ৪০০ লোকের প্রয়োজন হয়ে থাকে। এতে বাষ্পের তাপ রোধ করবার টার্বো-জেনারেটরগুলিকে আবর্তিত করবার পর সেই বাষ্পকে বয়লারের মধ্যে ফেরৎ নিয়ে এসে বারে বারে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা আছে। সমগ্র ভারতে এটিই বৃহত্তম তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

বিদ্যুৎ-শক্তিই যে কোন দেশের উন্নয়ন পরি-কল্পনার বুনিয়াদ—শিল্প ও বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তি। এই শক্তির আধিপত্য আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—এই যুগ বিদ্যুৎ-শক্তির যুগ। একথা উপলব্ধি করেই ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচয়িতাগণ দেশের তাপ-বিদ্যুৎ ও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকে অগ্রা-ধিকার দিয়েছেন। এর ফলও হয়েছে খুবই চমকপ্রদ। ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সুরুতে ভারতের বিদ্যুৎ-শক্তি উৎ-পাদনের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট। ১৯৬১ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষাশেষি তা ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে এসে দাঁড়ায়। ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পূর্তির তারিখ। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হলো ১২৭ লক্ষ কিলোওয়াট। প্রথম পরিকল্পনার সুরুতে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হতো, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের শেষে তার শতকরা ৪৫০ ভাগ বা ১০৪ লক্ষ কিলোওয়াট বৃদ্ধি পাবার কথা। এর মধ্যে ৫৮ লক্ষ

কিলোওয়াট অর্থাৎ ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে মার্কিন সাহায্যে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে সাহায্য করেছেন বিদেশী মুদ্রায় মোট ৫১ কোটি ১ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৩৮২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। এছাড়া, এখানে টাকায় ঋণ ও খয়রাতি দানের পরিমাণ ৩৩০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। এই সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে অংশতঃ অথবা সমপ্রভাবে আর্থিক সাহায্যের আকারে অথবা কারিগরী সাহায্যের মাধ্যমে।

আমেরিকার সাকুল্য সাহায্যের পরিমাণ ৭৩০ কোটি ডলার বা ৫৪৬৫ কোটি টাকা। সারা পৃথিবী থেকে ভারত যে সাহায্য পেয়েছে, এই অর্থ তার প্রায় তিন পঞ্চমাংশ। ভারতের রেলপথের আধুনিকীকরণে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে, শিক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করতে, ম্যালেরিয়া বিনাশে, ধাতব সম্পদের উন্নয়নে এবং ভারতের শিল্পোন্নতিতে উৎসাহ যোগাতে এই অর্থ সহায়ক হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন

মূল সভাপতি ও শাখা সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি

মূল সভাপতি

অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি ১৯২২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অধ্যাপক বি. বি. দে-র সহযোগে কুম্যারিন (Coumarin) সম্পর্কে গবেষণা করে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুটি গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং ১৯২৯ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেখানে তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক স্যার রবার্ট রবিনসনের অধীনে "সার্চ ফর অ্যান্টি-ম্যালেরিয়াল্স্ এবং 'সিন্থেসিস অব অ্যান্থোসায়ানিন্স্" সম্পর্কে গবেষণা করেন। তিনি তাঁর সঙ্গে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে গবেষণা করতে থাকেন এবং পরবর্তী সময়ে অধ্যাপক জি. বার্জারের সঙ্গে এডিনবরার মেডিক্যাল কেমিষ্ট্রি ইনষ্টিটিউট এবং গ্রাজের (অষ্ট্রীয়া) মেডিক্যাল কেমিষ্ট্রি ইনষ্টিউটে অধ্যাপক এফ. প্রেগল-এর সঙ্গে গবেষণা করেন। ভারতে ফিরে আসবার পর তিনি কোয়েম্বাটুরের কৃষি গবেষণা পরিষদে তিন বছর (১৯৩০-৩৩) গবেষণা করেন। পরে তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের রীডার এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি পাঁচ বছর কেমিক্যাল টেক্নোলজী বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন এবং এই বিভাগ ও ফার্মেসী বিভাগের উন্নয়নের সহায়তা করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন এবং ১৯৬৫ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তারপর তিনি ঐ বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

তাঁর পরিচালনায় শতাধিক ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। অধ্যাপক শেষাদ্রি এবং তাঁর সহযোগিগণ সম্মিলিতভাবে ভারত ও বিদেশী পত্রিকায় ১০০-এরও বেশী মৌলিক গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাঁর একটি পুস্তকের নাম "Chemistry of Vitamins and Hormones"। তাঁর গবেষণা প্রধানতঃ জৈবরসায়ন সম্পর্কিত;

যেমন—প্রাকৃতিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন যা ওষুধ, রং, কীটঘ্ন এবং অ্যান্টিঅক্সিডান্ট হিসাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কাঠ এবং ফল সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেছেন। বহু সংখ্যক নতুন যৌগের পৃথকীকরণ, উপাদান নির্ধারণ এবং তাদের সংশ্লেষণও সম্ভব হয়েছে। তিনি এদের শারীরতাত্ত্বিক গুণাবলী, জৈবসংশ্লেষণ এবং ব্যবহার সম্পর্কিত গবেষণায়ও বিশেষ উৎসাহী।

অধ্যাপক টি. আর শেষাদ্রি

অধ্যাপক শেষাদ্রি লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি German Academie fur Naturforschung, Halle-এর সদস্য, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর ফেলো ও কিছুকাল সহঃ সভাপতি, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো, সহ-সভাপতি ও এখন সভাপতি। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং ইণ্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েসন এবং কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির আচার্য পি. সি. রায় লেকচারারশিপ, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়ার ভাটনগর পদক পেয়েছিলেন। তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনারেরি ডি. এস-সি. ডিগ্রি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পদ্মভূষণ উপাধি লাভ করেন।

অধ্যাপক উদিতনারায়ণ সিং

সভাপতি—গণিত বিভাগ

ডাঃ সিং ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলের (যা বর্তমানে জে. পি. মেহতা মিউনিসিপ্যাল ইন্টার কলেজ হিসাবে পরিচিত) পড়া শেষ করে বেনারসের কুইন্স কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

অধ্যাপক উদিতনারায়ণ সিং

১৯৪১ সালে ডাঃ সিং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। পরলোকগত অধ্যাপক বি.এন. প্রসাদের তত্ত্বাবধানে 'থিয়োরী অব ট্রিগোনোমেট্রিক সিরিজ' সম্পর্কিত

গবেষণা ছিল তাঁর ডি. ফিলের কাজ। ১৯৫১ সালে তিনি ফরাসী সরকারের বৃত্তি পেয়ে প্যারিস যান এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ অধ্যাপক এস. ম্যাণ্ডেলব্রট-এর (S. Mandelbrojt) সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৫৪ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Tris honourable'-এর উল্লেখসহ ডি. এস-সি. (ষ্টেট) ডিগ্রি লাভ করেন। Concept of generalized Fourier Transform and its applications—সম্পর্কিত বিষয়ই তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। ১৯৫৪ সালে ভারতে ফিরে এসে আলিগড় মুস্লিম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগে রীডার হিসাবে তিনি নিযুক্ত হন। ১৯৫৮ সালে তিনি বরোদা এম এস. বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৬৩ সালে ডাঃ সিং ইলিনয়েস (আরবানা) বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকালটিতে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে এক বছর কাজ করেন। ইউ. এস. এ. এডুকেশন ফাউণ্ডেশনের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেন।

ডাঃ সিংয়ের অ্যানালিসিসে (আসল এবং জটিল উভয় ক্ষেত্রেই) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। বরোদার এম. এ. বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একটি গণিতের গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন।

অধ্যাপক ভি. এস. হুজুরবজার

সভাপতি—পরিসংখ্যান বিভাগ

ডাঃ ভি. এস. হুজুরবজার মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর সহরে ১৯১৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই, বেনারস ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন কৃতিত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৪৯ সালে তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি সম্ভাবনাবাদ এবং গাণিতিক পরিসংখ্যান সম্পর্কে নতুন গবেষণা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন—এই বিষয় সম্পর্কিত পুস্তকাদিতে তাঁর কাজের উল্লেখ আছে।

কিছুকাল ডাঃ হুজুরবজার গৌহাটি ও লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের রীডার ছিলেন। ১৯৫৩ সাল থেকে তিনি পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে যোগদান করেন। সম্ভাবনাবাদ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে তিনি কেম্ব্রিজ

অধ্যাপক ভি. এস. হুজুরবজার

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাডাম্‌স্ পুরস্কার লাভ করেন। ন্যাচারাল ফিলোজফি, বিশুদ্ধ গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত মূল্যবান গবেষণার জন্যে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এই পুরস্কার দিয়ে থাকে। ডাঃ হুজুরবজারের পূর্বে দু-জন ভারতীয় এই পুরস্কার লাভ করেন। তাঁরা হলেন ডাঃ এইচ. জে. ভাবা এবং ডাঃ এস. চন্দ্রশেখর।

১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৬৩ সালের মে পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (অ্যামেস) ফুলব্রাইট ভিজিটিং প্রোফেসর ছিলেন। এই সময়ে তাঁর Sufficient statistics-এর ধর্মসমূহ সম্পর্কিত গবেষণা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশান্যাল সায়েন্স

ফাউণ্ডেশনের স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাঁর গবেষণার জন্যে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। ডাঃ হুজুরবজার প্রিন্সটন, হার্ভার্ড, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা করেন এবং ১৯৬৩ সালের অগাষ্ট মাসে ক্যানাডার মণ্ট্রিলে অনুষ্ঠিত Discrete Distribution সম্পর্কে ইন্টারন্যাশান্যাল সিম্পোসিয়ামে বক্তৃতা দেন।

ডাঃ হুজুরবজার ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কমিটির সদস্য। ডাঃ হুজুরবাজার ন্যাশান্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস, কেম্ব্রিজ ফিলজফিক্যাল সোসাইটি এবং লণ্ডনের রয়াল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির ফেলো।

অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক
সভাপতি—পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ডাঃ ফকিরচাঁদ আউলাক পাঞ্জাবের জলন্ধরে ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় এস. ডি. এ. এস. স্কুলে তাঁর শৈশব শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ১৯৩২ সালে জলন্ধরের ডি. এ. ভি. কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করে তিনি লাহোরে গভর্নমেণ্ট কলেজে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে গণিতে উল্লেখযোগ্য নম্বর পেয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল ও কলেজের ছাত্রজীবনে তিনি অনেক পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত তিনি বৃত্তিও পান। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪২ সালে 'ডক্টর অব ফিলজফি' ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে "প্রব্লেম্স্ ইন ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স" সম্পর্কে থিসিসের জন্যে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর থিসিসের পরীক্ষকদের মধ্যে ই. এ. মিল্নেও ছিলেন।

১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার এবং ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত লাহোরের দয়াল সিং কলেজের লেকচারার ছিলেন। ১৯৪২ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন—তদবধি সেখানেই নিযুক্ত আছেন। ১৯৫৫ সালে তিনি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক

১৯৫০-'৫১ সালে তিনি কেম্ব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরিতে ছিলেন। ১৯৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি পরিদর্শনের জন্যে যে ভারতীয় প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন, অধ্যাপক আউলাক তার সদস্য ছিলেন। সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি ইউ. এস. এস. আর. পরিদর্শনেও আমন্ত্রিত হন।

অধ্যাপক আউলাকের ৭৫টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক আউলাকের গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে—'Partition theory of numbers and its applications to Statistical mechanics, Astro-physics, Magnetohydrodynamics, Superfluidity and Superconductivity'। তাঁর গবেষণার উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই করা হয় এবং কোন কোন পাঠ্যপুস্তকে তাঁর গবেষণার ফল সংযোজিত

হয়েছে। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে বাইশ জন ছাত্র পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন।

অধ্যাপক এস. চৌলার সহযোগিতায় সংখ্যার বিভাজন তত্ত্বের (Partition Theory of numbers) সম্পর্কে গবেষণা সুরু হয়। অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারীর সহযোগিতায় তাঁর তত্ত্ব এবং ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল মিকানিক্স-এর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক—ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল মিকানিক্স এবং পার্টিশন থিয়োরী অব নাম্বার-এর সমস্যাগুলি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। The problem of the maximum value of the numbers of partitions of n into k parts সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং এই গবেষণার ফল উচ্চশক্তিতে নিউক্লিয়ন-নিউক্লয়ন সংঘর্ষজাত বস্তু, যেমন—pion প্রভৃতি উৎপাদনের ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়।

গ্রহ এবং শ্বেত বামন তারকার Mass radius relationship ব্যাখ্যা করবার জন্যে অধ্যাপক কোঠারী যে চাপ আয়নন তত্ত্বের অবতারণা করেন তাকে ইলেক্ট্রোষ্ট্যাটিক ফিল্ডের ফলাফল ব্যাখ্যায়ও অন্তর্ভুক্ত করেন অধ্যাপক আউলাক। তিনি Bounded Harmonic Oscillator তত্ত্বের উন্নতি সাধন করেন এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এটি শ্বেত বামন তারকার অনুশীলনে প্রয়োগ করা হয়। তাঁর আবিষ্কৃত তত্ত্ব পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। Random fragmentation সম্পর্কে তাঁর গবেষণা সুবিদিত। এক বা দ্বিমাত্রিক বস্তুসমূহের খণ্ডিতকরণ-এর প্রারম্ভিক তত্ত্বসমূহকে তিনি ত্রিমাত্রিক বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রসারিত করেন এবং উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সঙ্গে নক্ষত্রপুঞ্জের ব্যাপক বিস্তৃতির ব্যাখ্যায়ও প্রয়োগ করেন। তাঁর এই গবেষণার ফল আরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এসব গবেষণা ছাড়াও তিনি অন্যান্য বিষয়ের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে তিনি Bunching of photons in a beam সম্পর্কে একটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর এই গবেষণালব্ধ তথ্যের যাথার্থ্য হ্যানবারি, ব্রাউন এবং টুইস এবং অন্যান্যের পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। তিনি আরও দেখিয়েছে যে, তীব্র বিকিরণ ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ল্যাম্ব শিফ্‌টকে (Lamb shift) পরিবর্তিত করা যায়—এই গবেষণালব্ধ ফলের জ্যোতিঃপদার্থবিদ্যা বিষয়ক তাৎপর্য আছে। অতিপরিবাহিতা গুণসম্পন্ন নাক্ষত্রিক পদার্থের সম্ভাবনা সম্পর্কেও অনুসন্ধান করা হয়েছে। তাঁর Stability problems in magnetohydrodynamics সম্পর্কিত গবেষণাও সুবিদিত।

অধ্যাপক আউলাক তাঁর ছাত্রদের গবেষণায় যথেষ্ট উৎসাহ এবং প্রেরণা দেন। ফলে তাঁর একদল উৎসাহী ছাত্র-গবেষকমণ্ডলী তৈরি হয়েছে। '৬০ সালে অধ্যাপক আউলাক ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো নির্বাচিত হন। তিনি বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক।

অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা

সভাপতি – রসায়ন শাখা

অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা ১৯২২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী কানপুরে জন্মগ্রহণ করেন। গত ২৩ বছর তিনি এলাহাবাদ, লণ্ডন, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর এবং রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কেমিষ্ট্রি রিভিউ কমিটির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। অধ্যাপক মেহরোত্রা প্রায় ৩০০ গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁর ৩৬ জন গবেষক ছাত্রের মধ্যে ২৪ জন পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি পেয়েছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে রেফারেন্স হিসাবে তাঁর গবেষণার উল্লেখ করা হয়।

তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ব্যাপক হলেও নিম্নোক্ত চারটি ক্ষেত্রেই তাঁর গবেষণা উল্লেখযোগ্য।

১। Absorption Indicators; ২। Redox Titrations, ৩। Complex Metaphosphates, ৪। Organic Derivatives of Elements।

লুব্রিক্যাণ্ট সম্বন্ধে জেনাতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৯৬৪ সালে অধ্যাপক মেহরোত্রা Heavy Metal Soap সম্বন্ধে অন্যতম প্রধান বক্তৃতা প্রদান করেন। ১৯৬৫ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশন্যাল অরগ্যানো-সিলিকন কনফারেন্সে তিনি প্রধান বক্তৃতা প্রদান করেন।

অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা

অধ্যাপক মেহরোত্রা বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণে বিশেষ উৎসাহী। বিজ্ঞান-এর সম্পাদক (১৯৪৭-'৫০) এবং সি. এস. আই. আর-এর ভারতীয় ভাষাসমূহের ইউনিট-এর চেয়ারম্যান হিসাবে এই ব্যাপারে তাঁর দান অনস্বীকার্য। ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব কেমিষ্ট্রি এবং জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সম্পাদকমণ্ডলীর তিনি একজন সদস্য। তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সি. এস. আই. আর ও এ. ই. ই-এর বিভিন্ন সংস্থার সদস্য। তিনি বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এরও সদস্য।

অধ্যাপক রামলোচন সিং

সভাপতি—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখা

অধ্যাপক সিং উত্তর প্রদেশের জৌনপুর জেলার এক কৃষক পরিবারে ১৯১৭ সালের ২০শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪০ সালে বারানসীর উদয় প্রতাপ কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪২ সালে আগ্রার সেণ্ট জন্স কলেজ থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে জড়িত থাকায় এক বছর পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট-গ্রাজুয়েট স্কুল অব জিওগ্রাফিতে যোগদান করেন এবং ১৯৪৫ সালে ভূগোলে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক সিং বারানসীর ইউ. পি. কলেজে ভূগোলের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী ফেব্রুয়ারী মাসে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে দু' বছর (১৯৫১-৫৩) তিনি অধ্যাপক ডাডলি ষ্ট্যাম্প-এর সঙ্গে গবেষণা করেন এবং "Banaras and its Umland: A Study in Settlement Geography" সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সেই পদে এখনও অধিষ্ঠিত আছেন।

ভূগোলের গবেষণায় অধ্যাপক সিং আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৫৬ সালে ব্রেজিলের রিও ডি জেনেরিয়োতে অনুষ্ঠিত ১৮শ আন্তর্জাতিক ভূগোল কংগ্রেসের একটি শাখার

সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কংগ্রেস এবং সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন। সরকার, পরিকল্পনা কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কমিটির তিনি সদস্য। তিনি ন্যাশন্যাল কমিটি ফর জিওগ্রাফির সদস্য এবং ১৯৪৬ সাল থেকে ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির অনারেরি সেক্রেটারী। ভারতবর্ষে তিনি ব্যবস্থাপনার ভূগোল (Geography of settlement) সংক্রান্ত গবেষণায় একজন পুরোধা। তিনি বেনারস হিন্দু

অধ্যাপক রামলোচন সিং

বিশ্ববিদ্যালয়ে Settlement Geography সম্পর্কে একটি শাখা স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন। নিজে তিনি গবেষণায় পুরাপুরি লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও একদল গবেষককে এই বিষয়ে উৎসাহিত করে তুলেছেন এবং দশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে ২৪ জনেরও বেশী গবেষক এই শাখা থেকে তাঁদের পি-এইচ. ডি. থিসিসের জন্যে করণীয় কাজ কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেছেন।

বেনারসের পৌর ভূগোল (Urban Geography) সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা (১৯৫৫) ভারতবর্ষে পৌর-ভূগোলের গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক গবেষককে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর রিসার্চ মনোগ্রাম—'Bangalore : An Urban Survey (1964)' প্রকাশিত হয়েছে এবং 'Umland of Varanasi : A Study in Settlement Geography' যন্ত্রস্থ। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তিনি ২৫টিরও বেশী গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন
সভাপতি—উদ্ভিদবিদ্যা শাখা

মৈনপুর জেলার শিকোহাবাদে এক জমিদার পরিবারে ১৯০৩ সালের ২১শে নভেম্বর ডাঃ আর. এন. ট্যাণ্ডন জন্মগ্রহণ করেন। এলাহাবাদে গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে তাঁর স্কুলের শিক্ষালাভ শেষ হবার পর এলাহাবাদের ইউয়িং ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ভর্তি হন। প্রথম দিকে তিনি ডাঃ ডব্লিউ. ডাডজনের কাছে উদ্ভিদবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৫ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করেন। দুই বছর বাদে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভের পর তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। অধ্যাপক জুলিয়ান এইচ. মিটারের অধীনে তিনি মাইকোলজি এবং প্ল্যাণ্ট প্যাথোলজি সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তিনি পরবর্তী কালে ইম্পিরিয়াল কলেজে (লণ্ডন) যান এবং অধ্যাপক ডাব্লিউ. ব্রাউন, এফ-আর-এস-এর অধীনে গবেষণা করেন। তিনি ছত্রাকের পুষ্টি সম্পর্কে অনুশীলন করে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ভারতবর্ষের অনেক নতুন ছত্রাক সম্পর্কে তথ্য এবং অনেক ছত্রাকও সংগ্রহ করেছেন। দেশীয় এবং বিদেশীয় সুপরিচিত পত্রিকায় তিনি ১২৫টিরও বেশী গবেষণা-

পত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (ব্যাঙ্গালোর), ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো। ইণ্ডিয়ান ফাইটোপ্যাথোলজিক্যাল সোসাইটি, ইন্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অব প্ল্যান্ট মরফোলজিষ্টস এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব প্ল্যান্ট

অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন

ফিজিওলজির তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। তিনি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর কাউন্সিলের সদস্য এবং ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস-এর সহ-সভাপতি। ১৯৬৫ সালে ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস (ইণ্ডিয়ার) জীববিজ্ঞান শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯৬৬ সালের জন্যে তিনি ইণ্ডিয়ান ফাইটো-প্যাথোলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি হন। উদ্ভিদবিদ্যা ছাড়াও তিনি সঙ্গীত ও খেলাধূলা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া সংস্থায় তিনি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং অবসর গ্রহণের সময় উক্ত সংস্থার সভাপতি ছিলেন।

অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

সভাপতি—প্রাণী ও কীট-পতঙ্গ বিজ্ঞান শাখা

অতি তরুণ বয়সে যাঁরা এযাবৎ বিজ্ঞান কংগ্রেসের শাখা-সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে আধুনিক জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রগণ্য, ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর নিজস্ব গবেষণার ক্ষেত্রে (Developmental biology) বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী। এছাড়া ভারতবর্ষের জীববিজ্ঞানকে বর্ণনাত্মক থেকে পরীক্ষাত্মক দিকে পরিবর্তনে তিনি এবং তাঁর কয়েকজন সহযোগীই প্রাথমিক উদ্যোক্তা। ডাঃ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর কয়েকজন ছাত্র অ্যামিবা, হাইড্রা, স্পঞ্জ-এর সেল মরফোজেনেসিস বিশ্লেষণের অনেক কার্যকরী এবং নিপুণ কৌশল প্রবর্তন করেছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। এখন তিনি ঐ কলেজেরই প্রাণিবিদ্যার অধ্যাপক এবং একদল গবেষক ছাত্রকেও পরিচালিত করেন। আন্তর্জাতিক মহলে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন, সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ বৈজ্ঞানিকরূপে সুপরিচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এস-সি (অনার্স) এবং এম. এস-সি. (প্রাণিবিদ্যায়) পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর তিনি যুক্তরাজ্যে গিয়ে অধ্যাপক সি. এইচ. ওয়াডিংটন এফ-আর-এস-এর অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে গবেষণা সুরু করেন। প্রায় ২৫ বছর বয়সে তিনি পি-এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ইনষ্টিটিউট অব অ্যানিমল জেনেটিক্স, এডিনবরা ত্যাগ করবার পর তিনি ব্রুসেলসের Laboratorie de Morphologie-তে Prof Jean Brachet-এর কাজের সঙ্গী হন। দেশে ফেরবার পরেই তিনি নবনির্মিত চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার সেন্টার-এ টিস্যু কালচার লেবরেটরি গঠনের জন্যে আহূত হন।

পরে ডাঃ মুখোপাধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজের নবসৃষ্ট প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁর বয়স ছিল ২৭। শীঘ্রই তিনি কলেজে Developmental biology সম্পর্কিত একটি প্রথম শ্রেণীর গবেষণাগার স্থাপন করেন। সারা ভারতবর্ষ থেকে আগ্রহী ছাত্রেরা এখানে গবেষণার জন্যে আগ্রহান্বিত হন। এখানকার গবেষণার ফল আন্তর্জাতিক নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার ফলে এই পরীক্ষাগার ভারতবর্ষে Developmental biology সম্পর্কিত

অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

একটি সর্বপ্রধান গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত হয়। তিনি একটি গবেষকমণ্ডলী গঠন করেছেন। সাম্প্রতিক পাঠ্য পুস্তকে তাঁর মৌলিক গবেষণার কিছু অংশ সন্নিবেশিত হয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আলোচনা-চক্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ এবং বহু আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। বর্তমানে ডাঃ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর সম্প্রদায় কোষের রূপান্তরণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পার্থক্য উৎপাদনের ভিত্তি এবং বহুবিধ কোষের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি C.S.I.R., U.G.C., I.C.M.R ও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে বহু ছাত্র ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছেন। Cell differentiation সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ইন্টারন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব এম্ব্রাওলজির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে Experimental embryology সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে ১৯৬২ সালে ডাঃ মুখোপাধ্যায় সার ডোরাব টাটা স্বর্ণ পদক পুরস্কার লাভ করেন। এশিয়ায় প্রাণিবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্যে গত বছর এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে জয়গোবিন্দ লাহা স্মৃতি স্বর্ণপদক পুরস্কার দানে সম্মানিত করেন। তিনি রকফেলার ইনষ্টিটিউট, নিউইয়র্ক-এর রকফেলার ফেলো, ওয়াশিংটন-এর ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমির ভিজিটিং সায়েন্টিষ্ট ছিলেন। তিনি নিউইয়র্কের Prof. Paul Weiss এবং বার্কলের (ক্যালিফোর্নিয়া) Prof Danial Mazia-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তাঁর কোন কোন সহযোগী বিশ্বের কয়েকজন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানীর (Developmental biology সম্পর্কিত গবেষণায় যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন) কাজের অংশগ্রহণ করেছেন।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। Developmenal biology সম্পর্কিত প্রধান গবেষণা কেন্দ্রের অধিকাংশই তিনি পরিদর্শন করেছেন। তিনি কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর অনেকগুলি নীতি-প্রস্তুতকারক সংস্থায় কাজ করেছেন এবং এই দেশে জীববিদ্যার প্রসারের জন্যে নতুন প্রেরণা সঞ্চারের কাজে অন্যান্য প্রধান বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি C. S. I. R.-এর বায়োলজিক্যাল রিসার্চ কমিটিতে আছেন। সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার এবং ইণ্ডিয়ান জার্ণাল অব এক্সপেরিমেণ্টাল বায়োলজির সম্পাদক মণ্ডলীর

তিনি সদস্য। তিনি কলিকাতার বোস ইনষ্টিটিউটের কাউন্সিলের সদস্য। ডাঃ মুখোপাধ্যায় একজন সুলেখক এবং সুবক্তা। তিনি অনেক জনপ্রিয় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের রচয়িতা। বাংলা ভাষায় তিনি ভ্রমণ কাহিনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। তাঁর স্ত্রীও একজন জৈব পদার্থবিদ (Biophysicist) এবং স্বামীর সঙ্গে তিনি একই গবেষণাগারে গবেষণা করছেন।

অধ্যাপক এ. কে. মিত্র

সভাপতি—নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখা

ডাঃ এ. কে. মিত্র ১৯০৩ সালের ৩১শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯২০ সালে খিদিরপুর অ্যাকাডেমি থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনে (বাংলার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়) যোগ দেন এবং ১৯২৪ সালে সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল। যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বৃত্তি পেয়ে বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ রমাপ্রসাদ চন্দের তত্ত্বাবধানে কলিকাতার ভারতীয় যাদুঘরে গবেষণা সুরু করেন। ডাঃ মিত্র সারনাথে খননকার্যে শিক্ষালাভ করেন এবং ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাকার্যে নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে ময়ূরভঞ্জের রাষ্ট্রীয় যাদুঘরের কিউরেটর হিসাবে খিচিং-এর যাদুঘর বিন্যস্ত করেন। এরপর তাঁর কাজ হয় বহুমুখী। তিনি হরিপুরের খননকার্য পরিচালনা করেন। ডাঃ বি. এস. গুহের তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রাণিতাত্ত্বিক সমীক্ষায় Physical Anthropology-তে শিক্ষার্থী হিসাবে ডেপুটেড হন। পরে অস্থি-সংস্থান বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষালাভের জন্যে আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি-লাভ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল "বাংলার লোকদের জাতিগত উপাদান।"

ভারতে ফিরে এসে ডাঃ মিত্র ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব সমীক্ষায় সহকারী নৃতাত্ত্বিক হিসাবে পুনরায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন তিনি সিন্ধু উপত্যকার

অধ্যাপক এ কে. মিত্র

নরকঙ্কাল সম্বন্ধে কাজ করেন। পরবর্তী কালে তিনি ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৯ সালে ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি নালন্দায় বৌদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে খনন করেন এবং সমাধির ভঙ্গীতে নবম শতাব্দীর একটি সম্পূর্ণ কঙ্কাল উদ্ধার করেন। সেই বছরেই তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি মানব প্রজনন-তত্ত্ব, জাতিসম্পর্কিত ইতিহাস এবং ডারম্যাটোগ্লিফিক্স (Dermatoglyphics) সম্বন্ধে গবেষণা চালাচ্ছেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা এবং Physical Anthropology-এর বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন।

অধ্যাপক অমিয় বি. চৌধুরী

সভাপতি—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা শাখা

অধ্যাপক চৌধুরী ক্রিমিতত্ত্বের (Helminthology) অধ্যাপক, পরজীবিতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ও কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ফিল্ড এপিডেমিওলজি ইউনিটের প্রধান (Chief)। এছাড়াও তিনি কলিকাতার কারমাইকেল হাসপাতালের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের প্রবীণ ভিজিটিং চিকিৎসক.

অধুনা পূর্ব-পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত চট্টগ্রামে অধ্যাপক চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে তাঁর M. B. B. S. ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫০ সালের প্রারম্ভে তিনি কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন।

অধ্যাপক অমিয় বি. চৌধুরী

পরজীবিতত্ত্বের গবেষক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সুবিদিত। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র বেড-সাইড ক্লিনিক্যাল রিসার্চ এবং ফিল্ড ষ্টাডিজ থেকে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের ব্যবহার, রেডিও-আইসোটোপ, ইমিউনো-ফ্লোরেসেন্স এবং ইমিউনো-ডিফিউসন পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি কয়েকটি গবেষণা পরিকল্পনা পরিচালনা করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটি পরিচালিত হয়েছে ইন্টারন্যাশন্যাল সেন্টার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং-এর সহযোগিতায়। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা হচ্ছে—পরজীবি ক্রিমির হিষ্টোকেমিক্যাল বিষয় সম্পর্কিত অনুশীলন, পরজীবীদের বৃদ্ধি এবং বিকাশ সম্পর্কিত ফিজিকো-কেমিক্যাল কারণ পরজীবি সংক্রমণের গতিশীল সঞ্চরণ, মানুষের রোগের কারণ হিসাবে হোষ্ট-প্যারাসাইট সম্পর্কের বিলোড়ন, পরজীবি সংক্রামিত রোগের ইমিউনোলজি, পরজীবি-নাশক ওষুধের ক্লিনিক্যাল ইভ্যাল্যুয়েশন ইত্যাদি। তিনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রায় ২০০ গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। বিদেশ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পুস্তকের তিনি বিভাগীয় লেখক।

১৯৫৭-৫৮ সালে তিনি রকফেলার ফাউণ্ডেশন বৃত্তি লাভ করেন এবং নিউইয়র্কের কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে গবেষণা চালান। তিনি ইউ. এস. এ, ইউ. কে, ইউরোপ, ইউ. এস. এস. আর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির নানা গবেষণা ও শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অধিবেশন ও সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৮ সালে লিসবনে এবং ১৯৬৩ সালে রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত ৬ষ্ঠ ও ৭ম আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে তিনি তাঁর গবেষণা-পত্র উত্থাপনের জন্যে আমন্ত্রিত হন। ১৯৫৮ সালে আমেরিকান সোসাইটি ফর ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিন-এর বার্ষিক সম্মেলনে, ১৯৬১ সালে রোমে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশান্যাল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল ডারমেটোলজির প্রথম কংগ্রেসে, ১৯৬৪

সালে রোমে অনুষ্ঠিত প্রথম ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অব প্যারাসিটোলজি এবং ১৯৬৬ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত ১১শ. প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি আমন্ত্রিত হন। ১৯৬১ সালে ইউ. এস. এস. আর-এ অনুষ্ঠিত সঞ্চারযোগ্য রোগ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত (১৯৬৫) Filariasis সম্পর্কিত ডাব্লিউ. এইচ. ও, আন্তঃরাজ্য সেমিনার এবং ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত (১৯৬৬) পরজীবি সংক্রামিত রোগ সম্পর্কে দ্বিতীয় সম্মেলনেও তিনি ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ভারতের অনেক বৈজ্ঞানিক সমিতি ও কমিটির সদস্য।

অধ্যাপক বি. এন সাহু
সভাপতি—কৃষি-বিজ্ঞান শাখা

উড়িষ্যা রাজ্যের কটক জেলার কালানটিরা গ্রামে ১৯১০ সালের ১লা অগাষ্ট ডাঃ বিশ্বনাথ সাহু জন্মগ্রহণ করেন। র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুল এবং র‍্যাভেনশা কলেজ থেকে শিক্ষা শেষ করে ১৯৩০ সালে তিনি বিহার ও উড়িষ্যা সরকারের বৃত্তিধারী প্রার্থী হিসাবে নাগপুর কৃষি কলেজে ভর্তি হন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৩৫ সালে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৩৫ সালের জুন মাসে বিহার ও উড়িষ্যার কৃষি বিভাগের পাটনা ফার্ম, দক্ষিণ বিহার রেঞ্জে যোগদান করেন। উড়িষ্যা আলদা প্রদেশ হিসাবে গঠিত হবার পর তিনি ১৯৩৭ সালে কটক ফার্মে বদ্‌লি হন। ১৯৪০ সালে তিনি কটক ফার্মের ম্যানেজার পদে উন্নীত হন এবং ১৯৪৬ সালে তিনি উড়িষ্যা সরকারের ফ্রুট ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি ক্যানাডার অন্টারিও কলেজে প্রেরিত হন এবং ১৯৩৭ সালে টরোন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিষ্টিংশন-সহ এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৯ সালে ইউ. এস. এ-র ইষ্ট ল্যানসিং-এর মিচিগান ষ্টেট কলেজ থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি উড়িষ্যার কৃষি প্রসারণ কার্যের ভার প্রাপ্ত হন। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার কর্তৃক তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কৃষি প্রসারণ কার্য পরিদর্শনে প্রেরিত হন। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার কৃষি উন্নয়ন অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি উড়িষ্যা সরকারের অ্যাগ্রোনোমিষ্ট হিসাবে নিযুক্ত হন। তিনি অ্যাগ্রোনোমির গবেষণা শাখা গঠন করেন এবং ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ভুবনেশ্বরস্থিত কৃষি কলেজের অ্যাগ্রোনোমির গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬০ সালে উৎকল কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনোমি বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক হিসাবে পুনরায় যোগ দেন। তখন থেকেই তিনি আণ্ডার-গ্রাজুয়েট ও পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষণ-প্রণালী, অ্যাগ্রোনোমির গবেষণা এবং প্রসারণ প্রভৃতি কাজ তত্ত্বাবধান করছেন। ১৯৬০ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি উৎকল মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অধ্যাপক বি. এন. সাহু

১৯৫০ সালে সিংহলে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমি ব্যবহার সম্পর্কিত সম্মেলনে তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে তিনি তাঁর "Land utilisation in Orissa" নামক পুস্তকটি উপহার দেন। এই পুস্তকেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে উড়িষ্যার মাটির শ্রেণী বিভাগ ও কৃষি আবহাওয়া অঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা দেন।

উড়িয়া সাহিত্য এবং প্রাচীন কৃষির উন্নতি বিধানে তাঁর দান যথেষ্ট। উড়িষ্যার মাটির রকম অনুযায়ী বিভিন্ন শস্যের সার সম্পর্কিত তাঁর গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উড়িষ্যার বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্যে স্থাপিত উড়িষ্যা বিজ্ঞান প্রচার সমিতির তিনি একজন সক্রিয় সদস্য। কৃষি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি একজন লোকরঞ্জক প্রবন্ধ লেখক। উড়িষ্যা সাহিত্য অ্যাকাডেমি তাঁর "Dhan" নামক পুস্তকটি প্রকাশ করেছে। এই পুস্তকে তিনি উড়িষ্যাকে চাউল উৎপাদনের দ্বিতীয় কেন্দ্র এবং ভারতবর্ষে শবর এবং গডভা—এই দুই জাতের অষ্ট্রো-এশিয়াটিক লোকদের প্রথম ধান চাষকারী বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব অ্যাগ্রোনোমি, ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স, ইণ্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি অব সয়েল সায়েন্স-এর সদস্য। তিনি উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কমিটির সদস্য। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী শব্দের পরিভাষার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিশনেরও তিনি সদস্য। ডাঃ সাহু উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব এগ্রিকালচার-এর ডীন। কলিকাতা, কল্যাণী, ভাগলপুর, রাঁচী, অন্ধ্র, বিক্রম ও গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

তিনি চাষ, সার, সেচ এবং ধান চাষ ও আগাছা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেছেন। তাঁর মৌলিক গবেষণা-পত্রের সংখ্যা ৩৫-এরও বেশী। ১৯৫১ সালে Vegetable Cultivation, ১৯৫২ সালে 'Fruit Culivation, ১৯৫৪ সালে 'গোমঙ্গল ও গোচিকিৎসা', ১৯৫৫ সালে 'Flower garden', ১৯৫৬ সালে 'Fodder Cultivation এবং ১৯৫৭ সালে 'Our fish wealth' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সব বই উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত। উড়িষ্যার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তাঁর কয়েকটি বই পাঠ্য পুস্তক এবং রেফারেন্স বই হিসাবে চালু আছে। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষি বিষয়ক সংজ্ঞা সংগ্রহ করে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাসহ তিনি সংকলিত করেন। কৃষির সঙ্গে সংযুক্ত উড়িষ্যার ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে তিনি 'Krushi Parba Parbani' শীর্ষক একটি পুস্তক রচনা করেছেন। তিনি 'Agriculture in India'-র তিন খণ্ডকে উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন মৈত্র

সভাপতি—শারীরবিদ্যা শাখা

অধ্যাপক মৈত্র ১৯০৯ সালে অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামেই (পূর্ব পাকিস্থান) প্রধানতঃ তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ হয়। কলেজের শিক্ষালাভ হয় কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯৩৩ সালে শারীরবিদ্যায় এম. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করবার পর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের তাৎকালীন শারীরবিদ্যার অধ্যাপক এন. এম. বসুর অধীনে গবেষণা সুরু করেন। সে সময়ে বাংলা দেশে শোথ রোগ মহামারী রূপে দেখা দেয়। সন্দেহ করা হয়েছিল যে, আর্দ্র ও গরম আবহাওয়ায় গুদামে মজুত করা চাল থেকেই এই রোগের সূত্রপাত হয়। অধ্যাপক মৈত্র এই সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। বর্ধমান জেলার বিভিন্ন রকমের চাল সংগ্রহ করে (বর্ধমান জেলায় তখন শোথ রোগ মহামারী রূপে দেখা দিয়েছিল)—

স্যাৎসেঁতে আবহাওয়ার মজুত করে রাখবার ফলে—তার অ্যামিনো-নাইট্রোজেন বৈষম্য বের করবার জন্যে সচেষ্ট হন। অর্থাভাবে তাঁর এই কাজ বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। পরলোকগত অধ্যাপক এস. সি. মহালনবীশ ১৯৪০ সালে তাঁকে ডেমনষ্ট্রেটর হিসাবে নির্বাচিত করেন এবং এই সময়েই অধ্যাপক মহলানবীশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শারীরবিদ্যা বিভাগ চালু করেন। এই সময়ে অধ্যাপক মৈত্র ফলিত রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক বি. এন ঘোষ এবং শারীরতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক বি. বি

অধ্যাপক সুশীলরঞ্জন মৈত্র

সরকারের সঙ্গে গোখুরা সাপের বিষ এবং তার সক্রিয় উপাদান (উপক্ষার) সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তিনি এবং ডাঃ এন. কে. সরকার Cardiotoxin নামক সাপের বিষের একটি সক্রিয় উপাদান আবিষ্কার করেন। এই উপাদানটি হৃদ্‌যন্ত্রকে অচল করে দিতে পারে। এই কাজের জন্যে অধ্যাপক মৈত্র ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি শারীরবিদ্যা বিভাগের লেক্‌চারার নিযুক্ত হন। সমস্ত বছর ধরে তিনি অধ্যাপক বি. বি. সরকার ও অধ্যাপক পি. বি. সেনের সহযোগিতায় শারীরবিদ্যা বিভাগের উন্নতির জন্যে আন্তরিকভাবে কাজ করতে থাকেন। ভারতবর্ষে এই ধরণের প্রতিষ্ঠান কেবল মাত্র এটিই। এখন তিনি মানব শারীরবিদ্যা, বিশেষতঃ শারীরবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে অধ্যাপক ই. অ্যাসমুসেনের অধীনে কোপেনহাগেনের Gymnastikteoretiske Laboratorium of Institute of Physiology-তে শিল্প ও শ্রম সম্পর্কিত শারীরবিদ্যায় বিশেষ ট্রেনিং লাভের জন্যে পালিত বৃত্তি (বিদেশ যাত্রার জন্যে) প্রদান করেন। তিনি অধ্যাপক অ্যাসমুসেনের কাছে এক বছর কাজ করেন এবং অল্প দিনের জন্যে জার্মেনীর ডর্টমুণ্ডের ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনষ্টিটিউট ও ষ্টকহোমের জিমন্যাসটিক লেবরেটরীতেও তিনি কাজ করেন। কলিকাতায় ফিরে এসে তিনি শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত শারীরতাত্ত্বিক গবেষণার কাজ সুরু করেন। কার্যের পারম্পর্যের (Graded work) ফলে সৃষ্ট শারীরতাত্ত্বিক ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন, শৈশব থেকে পরিণত অবস্থায় বালকদের শারীরিক যোগ্যতার উন্নতি, অবসাদ প্রভৃতি বর্তমানে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু। তিনি এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। ষ্টকহোমের অধ্যাপক এইচ. ক্রিস্টেনসন এবং কোপেনহেগেনের অধ্যাপক ই. অ্যাসমুসেন তাঁর পরীক্ষাগার এবং গবেষণার ধারা দেখে বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং তাঁর এলাকায় বালক-বালিকাদের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনে অধ্যাপক মৈত্র বিশেষ আগ্রহী। কলিকাতার সায়েন্স ক্লাবের মাধ্যমে সায়েন্স ক্লাব আন্দোলনে তিনি অগ্রণী। ভারতের শারীরতাত্ত্বিক সমিতির প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই তিনি এই সমিতির নানা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন;

বর্তমানে তিনিই এর সভাপতি। তিনি বনহুগলীর বিকলাঙ্গ শিশু হাসপাতালের সায়েন্টিফিক বোর্ডের সদস্য। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি কোষাধ্যক্ষ। Work Physiology-কে শিক্ষা গবেষণা এবং কৌশল প্রয়োগের দ্বারা সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই মানুষের হিতসাধনে তিনি উৎসাহী। Work and Industrial Physiology-তে তাঁর ছাত্রেরাই ভারতবর্ষে একমাত্র শিক্ষিত কর্মী এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের লেবার ইনষ্টিটিউট এবং মাইনিং রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলি

সভাপতি—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা শাখা

ডাঃ গাঙ্গুলী ১৯২৪ সালের ২৫শে নভেম্বর উত্তর প্রদেশের মিরাটে জন্মগ্রহণ করেন। মীরাট কলেজ, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা লাভ হয়। ১৯৪৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি মাষ্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। শিল্প-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার জন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫১ সালে তাঁকে ডি. ফিল এবং ১৯৫৬ সালে ডি. লিট ডিগ্রী দান করেন।

ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অল্প দিনের জন্যে তিনি মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হেলথ রিসার্চ ইউনিট, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজি (খড়্গপুর), ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সে (ব্যাঙ্গালোর) মনস্তত্ত্ববিদ হিসাবে কাজ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধানরূপে যোগদানের পূর্বে তিনি ভারতীয় বিমান বাহিনীর নিরাপদ বিমান চালনা দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং অ্যাভিয়েশন সাইকোলজি এবং হিউম্যান ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার হিসাবে দুই বছর নিযুক্ত ছিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলি ৪০টিরও বেশী মৌলিক প্রবন্ধ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তিনি কয়েকটি পুস্তকের রচয়িতা। শিল্প ও বিমান চালনার মনস্তত্ত্বে ডাঃ গাঙ্গুলী উৎসাহী। শিল্পের

অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলি

ক্ষেত্রে গতিবৃদ্ধি সমস্যা, শিল্পাঞ্চলের জনগণের মানসিক সমস্যা এবং ইকুয়িপমেণ্ট ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেন্সরি-মোটর কোঅর্ডিনেশনের সমস্যা সম্পর্কিত গবেষণায় তিনি বিশেষ উৎসাহী।

বর্তমানে তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষের সমস্যা-সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামাজিক পরিবর্তনের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করছেন। UNESCO, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব কালচারেল রিলেসন্স্ প্রভৃতির নানা পরিকল্পনা ডাঃ গাঙ্গুলীর দ্বারা পরিচালিত। অকুপেশন্যাল হেল্থ্ অ্যাড্ভাইসরি কমিটি অব দি ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, রিসার্চ কাউন্সিল অব দি ইণ্ডিয়ান ইণ্টারন্যাশন্যাল সেণ্টার প্রভৃতির তিনি সদস্য। তিনি বিদেশেও বহুবার গিয়েছেন। তিনি W. H. O.-কর্তৃক আহূত

স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সম্মেলনের ন্যায় আরও কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সভাপতি—ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিদ্যা শাখা

১৯২১ সালে অধ্যাপক ব্যানার্জী জন্মগ্রহণ করেন। ভাটপাড়ায় তাঁর স্কুলের শিক্ষা সুরু হয় এবং ১৯৪১ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্স-সহ কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি শিবপুর বি. ই. কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯৪৪ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. ই. (মেকানিক্যাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Shibley Scholar হিসাবে শিক্ষানবিশী করবার পর সরকারী বৃত্তিতে তিনি ১৯৪৬ সালে ইউ. কে. যান।

অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নাতকোত্তর অনুশীলন এবং গবেষণায় শিক্ষালাভের নিমিত্ত লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে ভর্তি হন। Gas Turbines and Heat Transfer সম্পর্কে তিনি Prof. O. A. Saunders-এর অধীনে কাজ করেন এবং ১৯৪৮ সালে D. I. C. এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. (ইঞ্জিনিয়ারিং) ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি স্বল্পকালের জন্যে মেসার্স ডাব্লিউ. এইচ. অ্যালেন অ্যাণ্ড কোং., বেডফোর্ড ও নর্থ বৃটিশ লোকোমোটিভ কোং, গ্লাসগোতে শিল্পসংক্রান্ত শিক্ষা লাভ করেন।

যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে ১৯৪৯ সালে তিনি শিবপুর বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগদান করেন ডাঃ এস. আর. সেনগুপ্তের অধীনে গ্যাস টারবাইনের উন্নতি বিষয়ে গবেষণা সুরু করেন। তখন থেকেই তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একটি রিসার্চ ইউনিট গঠন করেছেন এবং ১৯৬১ সাল থেকে তিনি এই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রধান হিসাবে কাজ করছেন।

অধ্যাপক ব্যানার্জী U. S. A. I. D কর্মসূচী অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করেছেন এবং Gas Turbine এবং Propulsion field-এ ইনষ্টিটিউশন এবং গবেষণা কেন্দ্রসমূহে কাজ করেছেন। তিনি Turbo-machinery সম্পর্কে গবেষণায় শিক্ষালাভের জন্যে অধ্যাপক ই. এস. টেলারের অধীনে ম্যাসাচুসেটস্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজিতে অনারেরি ভিজিটিং ফেলো হিসাবে ম্যাসাচুসেট্স্ ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির 'গ্যাস টারবাইন ডিভিসনে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ডে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

অধ্যাপক ব্যানার্জী বর্তমানে "Fluid Mechanics of Turbo-machinery" এবং 'দহন' সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। তিনি অনেক মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ভারতে কারিগরী শিক্ষার উন্নতিতে তিনি যথেষ্ট উৎসাহী এবং এই বিষয়ে তাঁর দানও মূল্যবান। ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (ইণ্ডিয়া) এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ফর টেকনিক্যাল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড মিকানিক্স-এর সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রবন্ধের সঙ্গে ব্যবহৃত ছবিগুলির ব্লক "সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার" পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত—স.

বিজ্ঞান-সংবাদ

যে যন্ত্র মানুষকে সচল রাখছে

রোগভোগের ফলে শরীরের অংশবিশেষ বিকল হলে তার স্থান গ্রহণ করবার মত যন্ত্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা তৈরি করে চলেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, লৌহ ফুস্‌ফুসের সঙ্গে এখন সবাই পরিচিত। এই যন্ত্র পোলিও রোগীদের শ্বাস নিতে ও বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।

ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারেরা এই সব যন্ত্রপাতিকে নিখুঁত করতে বহু সময় ও শ্রম ব্যয় করেন। তাঁরা জানেন, যে সব লোক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়েছেন, তাঁদের কাছে এই কাজের গুরুত্ব কতখানি। এই সব ডাক্তার ও ইঞ্জিনীয়ারদের চেষ্টাতেই মানুষ এখন তৈরি আঙুল, হাত-পা ইত্যাদির সাহায্যে সুন্দরভাবে কাজ-কর্ম করছে। ১০০টিরও বেশী বিভিন্ন দেশে বৃটেন আরোগ্যোত্তর ব্যবহারের জন্যে যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে থাকে। একটি যান্ত্রিক কব্জি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যা ব্যবহারকারীর নির্দেশে চলে। এর জন্যে শক্তি আসে ব্যবহারকারীর পকেটে রাখা ব্যাটারী থেকে।

বিদ্যুৎ-চালিত একটি হাত আর একটি হাতের নির্দেশে কাজ করতে পারে। গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অস্থি-র সংযোগস্থলগুলির স্থান গ্রহণকারী যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ধাতু ও প্লাষ্টিক দিয়ে এগুলি নির্মিত হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ডের প্রধান ভাল্‌ভের স্থানে প্লাষ্টিক ভাল্‌ভ্ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বাঁচবার আশা নেই, এমন মানুষও অস্ত্রোপচারের ফলে সুস্থ হয়ে উঠছেন। শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় রকমের অগ্রগতি।

হৃৎপিণ্ডের অস্ত্রোপচার এক সময়ে ছিল খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। বৃটেনে হৃৎপিণ্ড-ফুস্‌ফুস যন্ত্র (Heart-lung machine) উদ্ভাবিত হওয়ায় এখন আর একাজ তত কঠিন নয়।

যখন হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের কাজ চলে, তখন ডাঃ ডেনিস মেলরোজ উদ্ভাবিত এই যন্ত্র হৃৎপিণ্ডের কাজ চালিয়ে যায়। পাম্পের সাহায্যে যন্ত্রটি শুধু রক্ত সঞ্চালনের কাজ নয়, অক্সিজেন গ্রহণ করে রক্ত পরিশোধনের কাজও করে থাকে। এই যন্ত্রে একটি কাচের সিলিণ্ডারের মধ্যে ঘূর্ণায়মান ১৪০টি ষ্টেনলেস ষ্টিলের চাকতির সাহায্যে রক্ত পরিশোধনের কাজ চলে।

দূরে বসানো অন্য একটি বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র রোগীর মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থা, রক্তের চাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি শল্য-চিকিৎসককে জানিয়ে দেয়। তার ফলে তিনি নির্বিঘ্নে অস্ত্রোপচারের কাজ চালাতে পারেন।

পঙ্গপালের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান

সম্প্রতি লণ্ডনের অ্যান্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ সেণ্টারের গবেষণায় ভবিষ্যতে পঙ্গপাল দমন করা সম্ভব হবে বলে আশা পাওয়া গেছে। যে সব গাছপালা খেয়ে পঙ্গপাল বেঁচে থাকে, তাদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা নতুন অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। এর ফলে পঙ্গপালের জীবনযাত্রা-পদ্ধতিতে বিপর্যয় ঘটিয়ে তাদের প্রজনন রোধ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

অ্যান্টি-লোকাষ্ট রিসার্চ সেণ্টারটি ১৯৪৫ সালে একটি স্বাধীন সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এটি একটি গবেষণা ও আন্তর্জাতিক তথ্য-কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। এখানে বহু

দেশের পঙ্গপাল দমনকারী-কর্মীদের জন্যে একটি শিক্ষাক্রমও পরিচালিত হয়।

পঙ্গপাল দমনের ক্ষেত্রে এই নতুন আবিষ্কারটি ঘটলো প্রায় তখন, যখন পঙ্গপাল বিনাশের যুদ্ধে মানুষ প্রায় জয়ী হয়ে এসেছে। ১৯৬৬ সালের অগাষ্ট মাস পর্যন্ত কেন্দ্রে কোন পঙ্গপালের উৎপাতের বিবরণ আসে নি। এর কারণ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এখন পঙ্গপাল বিনাশ করা যায়। মাত্র এক গ্যালন রাসায়নিকের সাহায্যে ৩,০০০,০০০ পঙ্গপাল বিনাশ করা সম্ভব। কিন্তু এরকম কড়া রাসায়নিক ব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা সচেতন। তাই তাঁরা পঙ্গপাল দমনের অন্য পন্থা খুঁজছেন।

কিছুকাল পূর্বে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, মির নামক পদার্থের সাহায্যে পঙ্গপালের মধ্যে ঠিক সময়ের পূর্বেই প্রজননক্রিয়া সুরু করিয়ে দেওয়া যায়। আবার তাঁরা এও লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি পদার্থ পঙ্গপালের খাদ্যে না থাকলে তারা আদৌ প্রজননে সক্ষম হয় না। তাছাড়া বিজ্ঞানীরা জানেন, কি কি জিনিষ গাছপালাকে সবুজ রাখে।

এখনও অবশ্য অনেক পথ বাকী। তবু আশা করা যায়, বৈজ্ঞানিকেরা একদিন পঙ্গপাল প্রজননের সময় নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন। রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে তাঁরা এটা করবেন। বর্তমানে পঙ্গপালের প্রজনন ঘটে যখন গাছপালা সবচেয়ে সবুজ ও সতেজ থাকে। যদি এমন ঘটানো সম্ভব হয় যে, তারা ঠিক সময়ের পূর্বে প্রজনন সুরু করবে, তাহলে সেই সময় তারা প্রয়োজনীয় খাদ্য পাবে না এবং মানুষও তার কৃষির সবচেয়ে পুরনো শত্রুর হাত থেকে বেঁচে যাবে।

বৈদ্যুতিক মোটর গাড়ী

একবার ব্যাটারী চার্জ করিয়ে নিলে এক-টানা ১০০ মাইল চলতে পারে। এমন বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত মোটর গাড়ীর উৎপাদন বৃটেনে ১৯৭৮ সালের প্রথমার্ধেই সুরু হবে।

প্রথমতঃ ১২ ভোল্টের ৪টি লেড-অ্যাসিড ব্যাটারী একটি ডি-সি ইলেকট্রিক মোটরকে ৫ অশ্বশক্তি যোগাবে। এই মোটর সমন্বিত গাড়ী ১ জন যাত্রী নিয়ে ৬০ মাইল ও ৪ জন যাত্রী নিয়ে ৪০ মাইল যেতে সক্ষম হবে।

হাল্‌কা ধরণের সুপার ব্যাটারী ব্যবহার করে এই গতি যাতে ১০০ মাইল করা যায়, সেই বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছে।

আখের ছিবড়া থেকে আসবাব

বৃটেনের একটি ফার্ম আঁখের ছিবড়া পিষে আসবাব তৈরির উপাদান হিসাবে ব্যবহারযোগ্য করে তুলছেন।

এই ফার্মের নাম বাগাসী প্রোডাক্টস্ কোঃ লিমিটেড (ওয়ার্টফোর্ড, হার্টফোর্ডশায়ার)। উপাদানটির নাম দেওয়া হয়েছে বাগেলি। এটি বোর্ড ও পাউডারের আকারে পাওয়া যায়।

বাগেলিকে মেলামাইল সম্পৃক্ত কাগজের সঙ্গে বিশেষ চাপে সংযুক্ত করলে তা বেলামাইলে পরিণত হয়। বেলামাইলের স্ক্রু-গ্রহণ ক্ষমতা চীপবোর্ডের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশী। রেডিও ও টেলিভিশন ক্যাবিনেট তৈরিতে এই উপাদানের বহুল ব্যবহার হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
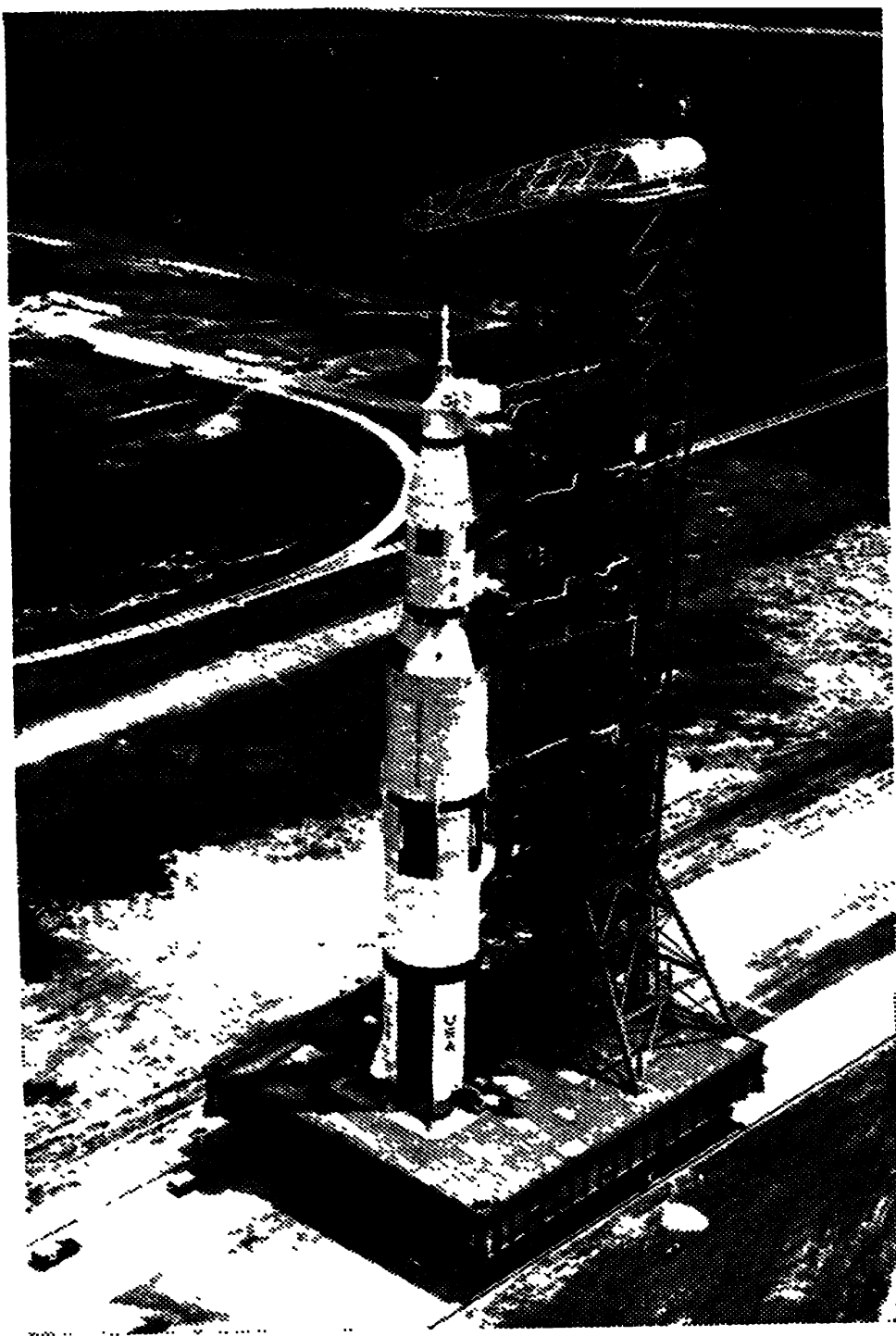
তিনজন আমেরিকান আকাশচারী নিয়ে ভবিষ্যৎ চন্দ্র অভিযানের জন্যে পরিকল্পিত পাঁচটি রকেট সমন্বিত ১১১ মিটার লম্বা স্যাটার্ণ রকেটটিকে ৩,০০০ টনের ক্রলারের সাহায্যে ফ্লোরিডার কেপ কেনেডির উৎক্ষেপণ মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

তড়িৎ-সমাহর্তা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন

আকাশের বুক চিরে বিজলীর ঝলক—লক লক করে প্রকাশিত হয়ে ক্ষণিকেই আবার আকাশের মধ্যেই কোথায় বিলীন হয়ে যায়—সে দৃশ্য প্রায় সকলেরই সুপরিচিত। কিন্তু কারও কারও মগজে হঠাৎ চিন্তা-ভাবনার বিজলীর ঝিলিকও খেলে যায়। তেমনি ঘটেছিল একবার, আজ থেকে প্রায় সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পূর্বে একজন আমেরিকাবাসীর ক্ষেত্রে। তাঁর ইচ্ছা হলো, আকাশের বুক থেকে বিজলী নামিয়ে আনবেন পৃথিবীর বুকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একখানা ঘুড়ি উড়িয়ে সেখান থেকে বিজলী আটক করে সত্য সত্যই একদিন পৃথিবীর বুকে নিয়ে এলেন। এই আমেরিকানের নাম হলো বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন। গল্পের মত শোনালেও তিনি তাঁর এই অভিজ্ঞতার বিবরণ তদানীন্তন কালের প্রচলিত সায়েন্টিফিক জার্নালে ছাপিয়ে দিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁর সেই পরীক্ষাটি পুনরায় করে দেখলেন—তাঁর বিজলী আটক করে আনবার কথা রহস্য কাহিনীর মত শোনালেও সত্য সত্যই ঘটে থাকে।

"ডেবী, আমার ভারী ইচ্ছা করে দয়ালু প্রভু যদি এখন যতক্ষণ স্থায়ী তার দ্বিগুণ স্থায়ী করে দিনগুলিকে রচনা করবার কথাটা উপযুক্ত বিবেচনা করে দেখতেন!" বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর পত্নীকে একবার এইরূপ উক্তি করে বলেন, "তাহলে আমি কিছু একটা করবার কৃতিত্ব অর্জন করতে পারতাম বোধ হয়!" বস্তুতঃ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন কি কিছু সম্পাদন করতে পেরেছিলেন জীবনে? জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন—বিজ্ঞান, উদ্ভাবন, শিক্ষা, সাহিত্য, প্রকাশন, সমাজসেবা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। যদি দিনের ব্যাপকতা দুই কি তিন হতো, তবে তিনি যে আরও কত কি সাধন করতেন, তা ভেবে উঠা কঠিন।

শিক্ষা ও জীবিকা অর্জন

ম্যাসাচুসেট্‌স্ কলোনীর বোষ্টন নগরে ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আজ থেকে প্রায় দুই শত ষাট বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারে তাঁরা ছোট-বড় ভাই-বোন মিলে সতেরো জন। তিনি তাঁদের মধ্যে পঞ্চদশ স্থানীয়। তাঁর বাবা তখনকার দিনের গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মোমবাতি তৈরির কাজে লিপ্ত; কিন্তু তাঁর যা আয়, তাতে সংসার চালানো দুঃসাধ্য। বেন নিজে নিজেই পড়তে শিখেন। আট বছর বয়সে তাকে স্কুলে পাঠানো হয়। এখনকার মত তখন বিনাবেতনে স্কুলে পড়াশুনার ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর বাবার পক্ষে তাঁর শিক্ষার খরচ চালানো সম্ভব

হলো না। কাজে কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে তাঁর মোমবাতি তৈরির দোকানে কাজে লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু বেন ছিল বরাবরই অস্থির প্রকৃতির—কাজের জন্যে সর্বদা চঞ্চল। বোষ্টন নগরের পোতাশ্রয়ের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতেন আর প্রায়ই বলতেন, তিনি একদিন সমুদ্র পাড়ি দিবেন। বাড়ী ছেড়ে যাতে না পালিয়ে যায়, সে জন্যে পিতা শঙ্কিত হয়ে বেনকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মুদ্রাকর হবার জন্যে রাজী করালেন। বড় ভাই জেম্‌স্‌ 'দি নিউ ইংল্যাণ্ড ক্যুরাণ্ট' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বারো বছরের বেন তখন কিছু সময়ের জন্যে একটু সুখী হয়েছিল ছাপার কাজকর্মে। তিনি হরফ গুছিয়ে বসিয়ে দিতে ও ছাপাকল চালাতে শিখে নিলেন।

লেখাপড়ার আগ্রহ তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, তিনি সামনে হাতের কাছাকাছি যে বই পেতেন সবই পড়তেন। এমন হয়েছে যে, খাবার পয়সা জমিয়ে বই কিনেও পড়েছেন প্রায়ই। সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র এই ছেলেটি নিজে নিজেই পাটীগণিত, অ্যালজেব্রা, নৌচলাচল-বিদ্যা, ব্যাকরণ এবং যুক্তিবিদ্যা পড়ে পড়ে শিখে ফেললেন। লেখাতেও তিনি রীতিমত পটুতা অর্জন করলেন। তাঁর লেখার প্রকাশভঙ্গী এত সুন্দর ছিল যে, মৃত্যুর পর যখন তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশিত হলো, তখন আমেরিকার সাহিত্য-জগতে তা উচ্চ-পর্যায়ের সাহিত্যরূপে বিবেচিত হয়েছিল।

বড় ভাই জেম্‌স্‌ কর্তৃক প্রকাশিত 'নিউ ইংল্যাণ্ড ক্যুরাণ্ট' পত্রিকায় রচনা প্রকাশের জন্যে বেন কৃতসংকল্প হন। কিন্তু তাঁর ছোট ভাইয়ের এই ইচ্ছায় নিষ্ঠা আছে বলে বড় ভাই মনে করতেন না। শ্রীমতী সাইলেন্স ডগ্‌উড্‌—এই ছদ্মনামে বেন ঐ পত্রিকায় রচনা পাঠাতে লাগলেন। লেখকের পরিচয় যখন জেম্‌স্‌ আবিষ্কার করলেন, তখন তাঁর মেজাজ খুব উত্তপ্ত হয়ে উঠলো এবং তিনি বেনের জীবন অতিষ্ঠ করে তোললেন। বেন সিদ্ধান্ত করলেন, তিনি নিজেই নিজের জীবনের পথ খুঁজে বের করবেন। আঠারো বছর বয়সে বেন তখন ফিলাডেলফিয়ার পথে পা বাড়ালেন।

ফিলাডেলফিয়াতে মুদ্রাকর হিসাবে তাঁর দক্ষতার কথা দ্রুত প্রচারিত হয়ে পড়লো এবং সকলেই তাঁর কাজের সুযোগ নিতে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। তিনি কিন্তু নিজেই নিজের ছাপাখানা খোলবার বাসনা প্রকাশ করলেন। সেই সময়ে আমেরিকার কোন কলোনীতেই ছাপাখানার যন্ত্রপাতি তৈরি হতো না—সে সব ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করতে হতো। পেনসিলভ্যানিয়া রাজ্যের গভর্নর সার উইলিয়াম কিথের প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর ভরসা করে তিনি ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করলেন ছাপাখার সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করবার জন্যে।

যে কোন কারণেই হোক, প্রতিশ্রুত আর্থিক সাহায্য আর এসে পৌঁছালো না।

কিন্তু বেনের দৃঢ়সংকল্প তাঁর পথ খুঁজে নিল আপন বুদ্ধিবলে। তিনি দেড় বছর ধরে ইংল্যাণ্ডে থেকে কাজ করলেন আর টাকা জমিয়ে নিলেন ছাপাখানা গড়ে তোলবার জন্যে। ইতিমধ্যে দেশে তাঁর কোন খবর না পেয়ে প্রণয়িনী ডিবোরা রিড অপর একজনের পাণিগ্রহণ করেন। অবশ্য কয়েক বছর পরে যখন সেই স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন, তখন বেঞ্জামিন ও ডিবোরা রিড পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ফিলাডেলফিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি "ফিলাডেলভিয়া গেজেট" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন। তাছাড়া, "পুওর রিচার্ডস্ অ্যাল্‌ম্যানাক" নামে একখানি বার্ষিকীও প্রকাশ করতে থাকেন। "পুওর রিচার্ডস্ অ্যালম্যানাক" আমাদের প্রচলিত পঞ্জিকা শ্রেণীর মত একখানি পত্রিকা। সূর্যোদয়, চন্দ্রের কলার হ্রাস-বৃদ্ধি, সুদূর মেয়াদী আবহাওয়ার পূর্বাভাস, চার্চে ধর্মচর্চার ব্যাপারে কোন কোন শুভ ও পবিত্র বিষয়ের খবর এই পত্রিকাতে পাওয়া যেত। তাছাড়া সততা, পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনেক সারগর্ভ ছোট ছোট বচন এই পত্রিকাতে ছাপিয়ে দেওয়া হতো। সেই সব বচনের অনেকগুলিই আজকের দিনেও প্রচলিত আছে।

জনসেবা ও লোকহিতকর কার্যাবলী

বিয়াল্লিশ বছর হবার মধ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জনসেবা, লোকহিতকর ও বৈজ্ঞানিক কাজকর্মে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখবার জন্যে এবার তিনি কারবার থেকে অবসর নিলেন। ছাপাখানার কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকবার সময় থেকেই তিনি এই সব কাজকর্ম সুরু করে দিয়েছিলেন।

তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। ফিলাডেলফিয়া সহরের অল্প বয়সী কারবারী ও মিস্ত্রীদের নিয়ে তিনি একটি আলোচনা-চক্র গড়ে তোলেম। সেই চক্র কালক্রমে ফিলাডেলফিরার গণ্ডী ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে পড়ে এবং আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটির রূপ পরিগ্রহ করে। 'কমিটিস্ অব সিক্রেট করেস্‌পণ্ডেন্স' (গোপন চিঠি চলাচলের সমিতিসমূহ) নামে সংস্থা তারা গড়ে তুলেছিল। সেই সংস্থাকে ভিত্তি করেই চাঞ্চল্যকর 'ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' (স্বাধীনতা-ঘোষণা) এবং আমেরিকান রিভোলিউশন (আমেরিকার বিপ্লব) সংঘটিত হয়েছিল।

আমেরিকার কলোনীসমূহের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল পদে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাঁর স্বাভাবিক শক্তি-সামর্থ্য এই কাজে প্রয়োগ করেন। কলোনীসমূহের মধ্যে ডাক চলাচল ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেন এবং ডাক চলাচলের ব্যবসায়টিকে লাভজনক করে তোলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ডাক-টিকিট ছাপা হয়। প্রথম প্রকাশিত টিকিটে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের ছবি ছাপিয়ে আমেরিকার ডাক চলাচল-ব্যবস্থায় তাঁর অবদানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

বেঞ্জামিন সবে তখন পঁচিশ বছর বয়সে পেঁৗছেছেন। তাঁর ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। কতদিন না খেয়ে পয়সা বাঁচিয়ে বই কিনে পড়েছেন—এই কথা স্মরণ করে আমেরিকায় সর্বপ্রথম চলমান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। ফিলাডেলফিয়া শহরে অগ্নিনির্বাপনের জন্যে তিনি একটি বিভাগ গড়ে তুলেছিলেন। অগ্নিদগ্ধ বেচারাদের দুঃখ-ক্লেশ লাঘবের উদ্দেশ্যে প্রথম আমেরিকান ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর গোড়া পত্তনের জন্যে তিনি সাহায্য করেন। অ্যাকাডেমি অব পেনসিলভেনিয়া প্রতিষ্ঠার জন্যেও তিনি সহায়তা করেন। কালক্রমে সেটিই পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়। কলোনীসমূহের মধ্যে ফিলাডেলফিয়া শহর যে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তার অনেকখানিই এই মহান পুরুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির জন্যে ঘটেছিল। বিজ্ঞান-জগতেও তিনি ছিলেন বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

বৈজ্ঞানিক তৎপরতা

আকাশ থেকে তড়িৎ নামিয়ে আনবার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ফ্রাঙ্কলিন স্থির তড়িৎ সম্পর্কে যে তত্ত্ব খাড়া করেন, সেটি মূলতঃ খুবই সরল এবং আজ পর্যন্ত তা আমাদের মধ্যে প্রচলিত রয়ে গেছে। তাঁর কথা হলো—যাবতীয় বস্তুই 'সাধারণ জড় পদার্থ' (Common matter) এবং তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত জড়-পদার্থ (Electrical matter) বা তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের (Electric fluid) সমবায়ে গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় সকল বস্তুর মধ্যেই নির্দিষ্ট পরিমাণ তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ বর্তমান থাকে। যদি তাথেকে কিছু পরিমাণ হারিয়ে যায় বা আরও কিছু পরিমাণ অন্য স্থান থেকে এসে যুক্ত হয়, তবেই বস্তুটি তড়িদাহিত (Charged) হয়ে পড়ে। যদি তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ সংযুক্ত হয়, তবে বস্তুটি ইতিবাচক অর্থাৎ পজিটিভ তড়িদাহিত এবং যদি তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ হারিয়ে ফেলে, তবে সেটি নেতিবাচক অর্থাৎ নেগেটিভ তড়িদাহিত হয়ে থাকে।

আজকের বিজ্ঞানের ভাষাতে আমরা কি বলে থাকি? প্রত্যেক বস্তুর পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন বর্তমান। সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন বিরাজ করবার ফলে পরস্পরের প্রভাব কাটাকুটি হয়ে যায় অর্থাৎ পরমাণু নিস্তড়িৎ অবস্থায় থাকে। একটি প্রোটন পজিটিভ তড়িতের একটি একক এবং একটি ইলেকট্রন একটি নেগেটিভ তড়িতের একটি এককের মান প্রকাশ করে থাকে। সুতরাং পজিটিভ তড়িদাহিত হওয়াতে ইলেকট্রনের সংখ্যা অপেক্ষা প্রোটনের সংখ্যাধিক্য, যা ইলেকট্রন কমে গেলেই

ঘটে। পক্ষান্তরে, নেগেটিভ তড়িদাহিত হলে প্রোটনের সংখ্যা অপেক্ষা ইলেকট্রনের আধিক্য ঘটে, যা ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে গেলেই হতে পারে। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই তত্ত্বের মূলে হ্রাস-বৃদ্ধির যে ধারণা বর্তমান, সেটি ঠিকই প্রচলিত আছে আজও।

তাঁর তত্ত্বের স্বপক্ষে ফ্রাঙ্কলিন কতকগুলি পরীক্ষা করে দেখান। একখণ্ড কাচের টুক্‌রা রেশমের কাপড় দিয়ে ঘষলে কাচের মধ্যে পজিটিভ ও রেশমের মধ্যে নেগেটিভ তড়িতাধান হাজির হয়। তখন অনেক বিজ্ঞানীই ভাবতেন যে, ঘর্ষণের ফলেই তড়িৎ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ফ্রাঙ্কলিন যুক্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, তড়িৎ সৃষ্টি করা হয় নি, বরং তড়িৎ ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থ রেশম থেকে কাচের মধ্যে পরিচালিত করা হয়েছে ঘর্ষণের ফলে।

তড়িৎ-তরল পদার্থ সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদর্শনের ব্যাপারটিকে ফ্রাঙ্কলিন বেশ নাটকীয় করে তোলেন। মেঝের উপর তড়িৎ-অপরিবাহী কাচ রেখে তার উপর দুখানি টুলে দুজন লোককে বসালেন। তাদের একজনকে পজিটিভ তড়িদাহিত করলেন, অর্থাৎ তার মধ্যে তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের আধিক্য ঘটলো। অপর জনকে নেগেটিভ তড়িদাহিত করলেন, অর্থাৎ তার মধ্যে ঘটলো তড়িৎ-ধর্ম সমন্বিত তরল পদার্থের ঘাট্‌তি বা কমতি। যখন লোক দুজন পরস্পরকে স্পর্শ করলো তখন তাদের তড়িতাধান লোপ পেল এবং তারা উভয়েই আঘাত (Shock) পেল। একজনের অধিক তরল অপর জনের ঘাট্‌তি পূরণ করে দিল। কোনরূপ তড়িদাহিত করা হয় নি, এমন কোন লোক পজিটিভ তড়িদাহিত লোকটিকে স্পর্শ করলে বা নেগেটিভ তড়িদাহিত লোকটিকে স্পর্শ করলে উভয় ক্ষেত্রেই সে আঘাত পাবে। যে নেগেটিভ তড়িদাহিত, তার চেয়ে এই লোকটির আধান বেশী এবং যে পজিটিভ তড়িদাহিত তার চেয়ে আধান কম বলে।

তড়িৎ সম্পর্কে অনুশীলন-কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে ফ্রাঙ্কলিন তড়িদাকর্ষী দণ্ডের (Lightning rod) উদ্ভাবন করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন তড়িদাহিত বস্তুর নিকট তীক্ষ্ণাগ্র কোন কিছু রাখলেই সেটি আহিত বস্তুর তড়িৎ আকর্ষণ করে টেনে নেয়। তিনি জানতেন, মেঘমাত্রেই তড়িদাহিত। তিনি তাই প্রস্তাব করলেন, কোন বাড়ীর শীর্ষদেশে তীক্ষ্ণাগ্র লোহার একটি দণ্ড বসানো হোক এবং সেটির সঙ্গে যুক্ত করে একটি তার টেনে এনে মাটিতে পুঁতে রাখা হোক। এই ব্যবস্থার ফলে আকর্ষণের দরুণ দণ্ডটির মধ্য দিয়ে মেঘের তড়িৎ ধীরে ধীরে নেমে আসবে এবং মেঘ নিস্তড়িৎ হয়ে পড়বে—তাহলে সজোরে ও সনিনাদে বজ্রপাত হবে না। নানাবিধ পরীক্ষা করে ফ্রাঙ্কলিন অনুমান করেন যে, মেঘ কখনও পজিটিভ বা কখনও নেগেটিভ তড়িদাহিত হয়ে থাকে। সুতরাং যতবার আকাশ থেকে মাটির দিকে তড়িৎ-মোক্ষণ (Discharge) হয়, ঠিক ততবারই মাটির দিক থেকে আকাশের দিকেও তড়িৎ-মোক্ষণ হয়ে থাকে।

আধুনিক কালে বজ্রপাত সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর সঙ্গে তাঁর অনুমানের বেশ মিল রয়েছে।

তড়িতাধান সংগ্রহের আধার হিসাবে 'লিডেন জার' সার্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে। ফ্রাঙ্কলিন সেই লিডেন জার নিয়েও অনুশীলন করেন। এই জার বাইরে দিকে ধাতুর পাতে মোড়া এবং ভিতরে জল ভর্তি একটি সাধারণ কাচের জারবিশেষ। তখন ধারণা ছিল, জলের ভিতরেই তড়িতাধান সংগৃহীত থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর তৎপরতার ফলাফল প্রকাশিত করে ফ্রাঙ্কলিন তদানীন্তন বিজ্ঞান-জগৎকে চমৎকৃত করেন। তড়িদাহিত লিডেন জারের ভিতর থেকে জল ফেলে দিলেন, আবার নতুন জল দিয়ে ভর্তি করলেন। কিন্তু লিডেন জারটি তখনও তড়িদাহিতই রয়ে গেল। তিনি এভাবে প্রমাণ করলেন যে, তড়িতাধান জলের ভিতর থাকে না, থাকে কাচের ভিতর। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে তিনি 'প্যারাল্যাল প্লেট ক্যাপাসিটর' উদ্ভাবন করেন। এটি আধুনিক যুগে টেলিভিশন ও রেডিও যন্ত্রে প্রয়োগ করা হয়।

ফ্রাঙ্কলিনের কীর্তিগাথা

তাঁর পাণ্ডিত্যপুর্ণ 'এক্সপেরিমেন্টস্ অ্যাণ্ড অবজারভেশনস্ অন ইলেকট্রিসিটি মেড্ অ্যাট ফিলাডেলফিয়া ইন অ্যামেরিকা' গ্রন্থে তড়িৎ সম্পর্কে যে সকল নীতি ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার ও রচনা করেন, সেগুলি লিপিবদ্ধ আছে। সারা পৃথিবী জুড়ে এই বৃহৎ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয় এবং জার্মান, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়। পৃথিবীর অগ্রণী বিজ্ঞানীরা এই গ্রন্থখানিকে সার আইজাক নিউটনের 'প্রিন্সিপিয়ার' সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কোন একখানি পত্রিকার মন্তব্য—'ডাঃ ফ্রাঙ্কলিনের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণাবলী নিয়ে তড়িতের এই 'প্রিন্সিপিয়া' রচিত ও তার উপর ভিত্তি করে যে তন্ত্র রচিত, তা যেমন সরল, তেমনই গভীর।' বিজ্ঞান-জগতের যত সম্মান সম্ভব ছিল, সবই ফ্রাঙ্কলিনের উপর বর্ষিত হয়েছিল। তিনি রয়াল সোসাইটির সদস্য এবং প্যারীর রয়াল অ্যাকাডেমী সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। তড়িতের 'এক তরল পদার্থ' (One fluid) সংক্রান্ত তত্ত্বটিই তাঁর বিশিষ্ট অবদান। আজকাল সকলেই আমরা বলে থাকি, তড়িতের স্রোত মানেই ইলেকট্রনের প্রবাহ—এখনও সেই একটি 'তরল প্রবাহেরই' (Fluid) তত্ত্ব মাত্র।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রকাশনের কার্যে নিরত থাকলেও জনসাধারণের সঙ্গে জড়িত কাজকর্মের জন্যেও ফ্রাঙ্কলিন সময় বের করতে পারতেন। আমেরিকান বিপ্লব তখন চলছে। কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস টমাস জেফারসন, জন এডাম্স্ এবং বেঞ্জামিন

ফ্রাঙ্কলিনকে দিয়ে গঠিত একটি কমিটি 'ডিক্লারেশন অব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' নামক দলিলের খসড়া রচনা করেছিল।

আমেরিকার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসে ফ্রাঙ্কলিনকে একজন দৈত্যের মত বলবান বীরপুরুষ বলে স্বীকার করা হয়। তড়িৎ সম্পর্কিত তত্ত্বের বিকাশ সাধন করাতে বিজ্ঞান-জগতেও তিনি একজন অগ্রদূতের আসন অলঙ্কৃত করে আছেন।

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

হবি বা সখের কাজ

বৃত্তিমূলক ও নিয়মিত কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অথবা অবসর সময়ে লোকে যে সব নির্দোষ, হাল্কা অথচ আনন্দদায়ক টুকটাক সখের কাজ করে, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'হবি'।

হবি নানা রকমের হতে পারে, যেমন—গান-বাজনা, ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফী, কাঠের কাজ, চামড়ার কাজ, খেলনা তৈরি, বাগান করা ইত্যাদি। একেবারে সাধারণ হবি হলো ডাকটিকেট সংগ্রহ করা। কেউ যদি এসব কাজ ব্যবসা বা আসল বৃত্তি হিসাবে করে, তবে সেটা কিন্তু ঠিক হবির পর্যায়ে পড়ে না। হবি বা সখের কাজ হলো তাই, যা আসল কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে খেয়ালখুশিমাফিক করা হয়।

হবি কখনো শিক্ষামূলক, কখনো বা নেহাৎ সখের কাজ। আবার এক এক লোকের এক এক হবি। তোমাদের অনেকেরই হয়তো একটা না একটা হবি আছে। কেউ হয়তো ডাকটিকেট বা অটোগ্রাফ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছ, কেউ বা খেলোয়াড় কিংবা সিনেমা আর্টিষ্টদের ছবি সংগ্রহ করছো। ডাকটিকেটের সংগ্রহ থেকে দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে। তাছাড়া পুরনো দুর্লভ ডাকটিকেটের চাহিদাও আছে বাজারে—খুব চড়া দরে বেচা-কেনা হয়ে থাকে।

হবি বা সখের কাজে কোন জোর জবরদস্তি নেই। নেহাৎই সখের ব্যাপার ওটা। যার যেমন পছন্দ, যার যেটা ভাল লাগে তাই করা যেতে পারে। আর এই হবি একান্তই অবসর সময়ের কাজ—মনের খোরাক। অবশ্য দেখতে হবে, হবি বা সখের কাজের ফলে আসল কাজের যেন ব্যাঘাত না হয়।

প্রত্যেকেরই একটা কোন হবি থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে অবসর সময়টা উপভোগ করা যায়, মনে স্ফূর্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। দৈনন্দিন কাজকর্মে ক্লান্তি বোধ করলে শরীর ও মনের অবসাদ দূর করবে ঐ হবি। রেহাই মিলবে একঘেয়েমি থেকে।

অবশ্য বুড়ো বয়সে ডাকটিকেট কুড়নো কিংবা অন্য কোন ছেলেমানুষি কাজ করা সাজে না। কিন্তু বাগান করা, গান-বাজনা করা, বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরা—ইত্যাদির মত হবি তাদের থাকতে পারে।

বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন কেবল বিজ্ঞানের চর্চাই করতেন না, অবসর সময়ে বেহালাও বাজাতেন। ওটা ছিল তাঁর হবি। আমাদের দেশের সত্যেন বসুও অবসর পেলেই সেতার বাজিয়ে থাকেন।

ইউরোপে খুবই হবির রেওয়াজ আছে। ইংরেজদের সম্বন্ধে কথা আছে, ওরা 'হবি-হর্স' অর্থাৎ হবির ঘোড়া চড়ে বেড়ায়। বাস্তবিক ওরা হবির কদর বোঝে এবং প্রত্যেকেরই একটা না একটা হবি আছে। এদিকে তেমন ঝোঁক নেই আমাদের দেশের লোকের। যদি মনে করা হয় হবি সময়ের অপব্যবহার ছাড়া কিছু নয়, তবে সেটা ভুল। এতে সাধারণতঃ খরচ নেই বরং লাভ আছে—চাহিদা মেটানো যায়। তাছাড়া মনের আনন্দ তো আছেই। শিক্ষার দিকটাও নিশ্চয় অবহেলা করবার নয়। বাড়্তি গুণ কি ফেলবার জিনিস? আমার এক আত্মীয় ছিলেন ডাক্তার। সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতেন রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে। কিন্তু দেখা যেত—একটু ফুরসুৎ পেলেই তিনি ছুতোরের মত কাঠের কাজ করছেন, তৈরি করছেন টুল, টেবিল, চেয়ার, আলমারী প্রভৃতি। বহুকাল ধরে এই ধরণের কাজ করেছিলেন তিনি। বলতেন, ডাক্তারী করছি প্রয়োজনের তাগিদে, আর এই কাঠের কাজ করছি সখে। অপর এক ভদ্রমহিলাকে জানি, তিনি ঘর সংসারের রান্নাবাড়া, ঝাড়পোঁছ ইত্যাদি যাবতীয় গৃহিণীপণার কাজ করে দিন-রাতে যখনই এতটুকু ফুরসুৎ পান, সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেন—চিত্র-বিচিত্র কাঁথা সেলাই করেন। এটা ওঁর সখের কাজ এবং এতে ওঁর অপার আনন্দ।

দেখা যাচ্ছে, সখের কাজ বা হবির দৌলতে একটা কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষ গড়ে তোলা শক্ত নয়।

হবির প্রয়োজনীয়তা এবং মূল্য জানতেন রবীন্দ্রনাথ। অনেক কাল আগেই তাই তিনি এর ব্যবস্থা করে গেছেন শান্তিনিকেতনে—চামড়ার কাজ, নাচ-গান, ছবি আঁকা, তাঁতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা। যারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই শিখলো, কিন্তু শিখলো না হাতের কোন কাজ, তারা তো নির্গুণ মানুষ। এদের লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বোকা হাতের মানুষ'।

ইদানীং আমাদের দেশের গভর্ণমেন্ট হবির কার্যকারিতা বুঝতে পেরেছেন এবং এই বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন। কলেজে কলেজে, আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা করে 'হবি হাউস' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। হবির দিকে ছাত্রছাত্রীদের মন আকৃষ্ট করাই এর উদ্দেশ্য। এতে লেখাপড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটা বিদ্যা আয়ত্ত করাও সম্ভব হবে।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) রকেটের জ্বালানী কাকে বলে ?

(খ) ইথার তরঙ্গ কি ?

(গ) বিভিন্ন গ্রহের ভর কি ভাবে মাপা হয় ?

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

উঃ ১। (ক) রকেটের জ্বালানী বুঝতে হলে আগে জানতে হবে, রকেটের ক্রিয়া-পদ্ধতি অর্থাৎ কি ভাবে বা কি কারণে রকেট উর্ধ্বে উঠে যায়। কালীপূজার সময় ব্যবহৃত হাউই বাজীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। যে কারণে দেওয়ালীর দিনে হাউই শোঁ করে উপরে উঠে যায়, সেই কারণেই রকেটও পায় তার উর্ধ্বগতি। হাউই-এর বারুদে আগুন লাগলে ভিতরে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস একটি ছিদ্র দিয়ে প্রচণ্ড বেগে নীচের দিকে বেরিয়ে আসতে থাকে। নিউটন বলে গেছেন—প্রত্যেক ক্রিয়ারই প্রতিক্রিয়া আছে। সেই প্রতিক্রিয়ার জোরেই হাউই উর্ধ্বাকাশে উঠে যায়। রকেটের ব্যাপারও এমনি, তবে সে ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের 'বারুদ' ব্যবহার করা হয়। তাকেই বলে জ্বালানী। এই জ্বালানী হচ্ছে রকেটের প্রাণস্বরূপ।

প্রথম দিকে কঠিন জ্বালানী রকেটে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু দেখা গেল, তাকে ইচ্ছামত ঠিকভাবে পোড়ানো বেশ অসুবিধাজনক। তখন রুশ বিজ্ঞানী ৎসিওলভস্কি ও আমেরিকান বিজ্ঞানী গডার্ড তরল জ্বালানী ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মার্চ গডার্ড সর্বপ্রথম তরল জ্বালানী সমন্বিত আধুনিক ধরণের রকেট উৎক্ষেপণে সক্ষম হন। এই পরীক্ষায় গডার্ড পেট্রল ব্যবহার করেছিলেন। তারপর থেকে গবেষণার ফলে আরও নানা জাতীয় তরল পদার্থ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ; যেমন—নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রাজিন, অ্যালকোহল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি।

এখন সমস্যা হলো—যে কোন প্রকার জ্বালানীরই জ্বলবার সময়ে অক্সিজেন দরকার। সাধারণ কঠিন জ্বালানী এবং কোন কোন তরল জ্বালানীর ভিতরেই অক্সিজেন থাকে। তাদের জ্বলতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অধিকাংশ তরল জ্বালানীরই জ্বলবার সময়ে আলাদা অক্সিজেন দরকার হয়। এই অক্সিজেন তরল অক্সিজেনরূপে সরবরাহ করা হয়। কাজেই তরল জ্বালানী-চালিত রকেটের মধ্যে দুটি তরল পদার্থ থাকে—একটি প্রকৃত জ্বালানী ও অপরটি তরল অক্সিজেন। আজকাল সমস্ত রকেটেই তরল

জ্বালানীর দ্বারা চালিত হয়। ভবিষ্যতে আরও এক প্রকার জ্বালানী ব্যবহার করা হবে—তা হলো পারমাণবিক শক্তি সমন্বিত জ্বালানী। এই জ্বালানীর শক্তি হবে প্রচণ্ড। আন্তগ্র্হ পরিভ্রমণে পারমাণবিক জ্বালানী খুব সাহায্য করবে বলে মনে হয়।

১। (খ) আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক রকমের তরঙ্গের সঙ্গে আমরা পরিচিত। যেমন—জলের মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে ঢিলটাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য তরঙ্গের সৃষ্টি হয়; 'ধানের ক্ষেতে ক্ষ্যাপা হাওয়া'—সেও তরঙ্গের সৃষ্টি করে। এছাড়া কোন রকম শব্দ করলেই বাতাসে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই সব ক্ষেত্রেই তরঙ্গ এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রবাহিত হয় কোন মাধ্যমের উপর ভর করে; যেমন—প্রথম ক্ষেত্রে এই মাধ্যম হলো জল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ধানের ক্ষেতে, তৃতীয় ক্ষেত্রে বাতাস। আমরা জানি—যেখানে বাতাস নেই, সেখানে শব্দ শোনা যায় না।

বিজ্ঞানীরা যখন সিদ্ধান্ত করলেন যে, আলোক এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে, তখন তাঁদের মনে প্রশ্ন দেখা দিল—এই তরঙ্গ কিসের উপর ভর করে চলে? কারণ বায়ুহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়েও আলোক প্রবাহিত হয়ে থাকে। আলোক-তরঙ্গের বিচরণ ক্ষেত্রে মাধ্যমের অভাব স্বভাবতঃই বিজ্ঞানীদের খুব ভাবিয়ে তুললো। এই সমস্যার সমাধানের জন্যে বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ফ্রেনেল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে এক মাধ্যমের কল্পনা করলেন এবং নাম দিলেন ইথার। ফ্রেনেলের মতে এই ইথার সকল স্থানে বিদ্যমান এবং আলোক ইথারের মধ্য দিয়ে তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়। ইথার-তরঙ্গ বলতে আমরা এই বুঝি। যাই হোক, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মার্কিনী বিজ্ঞানীদ্বয় মাইকেলসন ও মর্লের পরীক্ষা থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, ইথারের কোন অস্তিত্ব নেই। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা মতবাদেও ইথারকে বাদ দিয়েছেন।

১। (গ) গ্রহগুলির ভর মাপবার সহজতম উপায় হলো তাদের একটি উপগ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। ধরা যাক, গ্রহটি ও তার উপগ্রহের ভর যথাক্রমে M ও m এবং উপগ্রহটি v গতিবেগে গ্রহের চারদিকে আবর্তন করছে। গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যে দূরত্ব যদি R হয়, তবে আমরা জানি এদের

$$\text{পারস্পরিক আকর্ষণ শক্তি} = G\frac{mM}{R^2}$$

এখানে G একটি ধ্রুবক, যার মান আমাদের জানা আছে। উপবৃত্তাকার পথে আবর্তনের সময়ে সৃষ্ট

$$\text{কেন্দ্রাতিগ শক্তি} = \frac{mv^2}{R}$$

আমাদের এও জানা আছে—এই দুই শক্তি পরস্পর সমান অর্থাৎ

$$\frac{mM}{R^2} = \frac{mv^2}{R}$$

এথেকে সহজেই দেখানো যায়

$$M = v^2R$$

v এবং R জানা থাকলে এই সূত্র থেকে সহজেই গ্রহের ভর M নির্ধারণ করা যায়।

দীপক বসু

বিবিধ

৩ জন মহাকাশচারী ভস্মীভূত

২৮শে জানুয়ারী, কেপ কেনেডি থেকে রয়টার, এ. পি. ও এফ. পি. প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ—উৎক্ষেপণ মঞ্চের উপর অতিকায় স্যাটার্ণ রকেট (২১৮ ফুট উঁচু) খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার উপর মহাকাশযান অ্যাপোলো। অ্যাপোলোর একটি বদ্ধ কুঠুরিতে মহাকাশচারী ভার্জিল গ্রিসম, এডওয়ার্ড হোয়াইট ও রোজার শেফি। হঠাৎ রকেটে আগুন ধরে গেল। দেখা গেল, একটি একটি অগ্নিস্তম্ভ আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এমনই আগুনের প্রভা ও তেজ ছিল যে, কেউ সামনে গিয়ে ওদের উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে নি। তিন জন মহাকাশচারী ভস্মীভূত হয়ে গেলেন।

নদীর জলের নিয়মিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ভারতের প্রধান প্রধান নদীগুলির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নদীর জলের নিয়মিত রাসায়নিক বিশ্লেষণ চালাবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

কয়েকটি গবেষণা-কেন্দ্র বিশেষ ভাবে সেচ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে নদীর জলের রাসায়নিক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। উত্তর ভারতের নদীগুলির মধ্যে গঙ্গা, গণ্ডক, কোশী ও ব্রহ্মপুত্রে এবং মধ্য ভারতের চম্বল, নর্মদা, তাপ্তী ও যমুনা নদীতে এই রকম অনুসন্ধান চলছে।

সংগৃহীত তথ্যগুলি থেকে মোটামুটি জানা গেছে, উত্তর ভারতের নদীগুলিতে সারা বছর লবণাক্ততা কম, মাসিক ও বার্ষিক তারতম্যও কম এবং জল বেশীর ভাগ ক্ষারযুক্ত (ক্যালসিয়াম ও বাইকারবনেটের ভাগ বেশী)। মধ্য ভারতের নদীগুলিতে লবণাক্ততা শুধু বর্ষাকালেই কম।

কাঁচি-কাটা জল

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্নিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—এখানকার কোন বৈজ্ঞানিক এক নতুন ধরণের জল আবিষ্কার করেছেন। এই জল এক পাত্র থেকে অন্য পাত্রে ঢালতে হলে একবার একটু কাৎ করে দিলেই হলো—জল আপনা থেকেই গড়াতে থাকবে। পাত্রটিকে আর কাৎ করে ধরে রাখতে হবে না।

জল গড়ানো বন্ধ করতে হলে দরকার হবে কাঁচির। কাঁচি দিয়ে ফিতে কাটবার মত কেটে দিলে জল গড়ানো বন্ধ হবে।

এই জলের আবিষ্কারক হচ্ছেন ক্যালিফোর্নিয়া টেক্‌নোলজিক্যাল প্রতিষ্ঠানের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র ডেভিড জেম্‌স্ (বয়স ২১)। পলিমার আর জলের দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি ওই কাঁচি-কাটা জল আবিষ্কার করেছেন।

উপগ্রহ মারফৎ সংযোগ রক্ষা

নয়া দিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—কেন্দ্রীয় সংযোগ-রক্ষা দপ্তরের সচিব শ্রী এল. সি. জেন এক বেতার ভাষণে বলেছেন, ১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারত কৃত্রিম উপগ্রহ মারফৎ সংযোগ রক্ষায় নবযুগে প্রবেশ লাভ করবে।

শ্রী জৈন বলেছেন, ভারতের গ্রাউণ্ড ষ্টেশনটি ভারতীয় বৈদেশিক সংযোগ রক্ষা বিভাগ কর্তৃক পুনার ৬০ মাইল উত্তরে আরভিতে স্থাপিত হচ্ছে। ১৯৬৮ সালের মধ্যেই এই কাজ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যেই ভারত মহাসাগরের উপরে কৃত্রিম উপগ্রহের রীলে ষ্টেশনটিও স্থাপিত হবে।

এই সংযোগরক্ষা ব্যবস্থায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার এবং টেলিভিশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা হবে।

একটি আবিষ্কার

বোম্বাই থেকে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—সূর্যদেহ থেকে যে নিউট্রন কণিকা বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পেয়েছেন টাটা মৌলিক গবেষণা কেন্দ্রের মহাজাগতিক কণিকা-গবেষণা শাখা। এজন্যে তাঁরা একটি নতুন যন্ত্রও উদ্ভাবন করেছেন। সেই যন্ত্রের সহায়তায় ১৯৬৬ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে এই শক্তিশালী মহাজাগতিক কণিকা ধরা পড়েছে।

সে দিন সূর্যদেহের আধখানা জুড়ে তখন বিস্ফোরণ চলছিল। একটি বেলুনে ইলেকট্রনিক ডিটেক্টর রেখে সেটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মহাকাশে। ডিটেক্টর ঠিকই ধরে ফেললো, সূর্যদেহে বিস্ফোরণের কালে সেখানে যে মহাপ্রলয় ঘটছে, তারই সুযোগে গুচ্ছ গুচ্ছ নিউট্রন কণিকা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

গবেষণা সংস্থার একজন মুখপাত্র সম্প্রতি বলেন, নিউট্রন খুঁজে পেয়ে আমরা শুধু সূর্যকেই ভাল করে চিনলাম না, মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নতুন সম্পদ সংগৃহীত হলো।

মহাকাশে নিউট্রনের সন্ধান লাভের জন্যে আর একবারও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেছিলেন—১৯৬২ সালে। সেবার বেলুনে করে ফটোগ্রাফির প্লেট পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কাজেই আসে নি। তারপর চার বছর ধরে চেষ্টা চললো নতুন একটি যন্ত্র উদ্ভাবনের। অবশেষে গত এপ্রিল মাসে নতুন যন্ত্রটিকে বেলুনে করে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

জন্ম—৪ঠা মার্চ, ১৮৬৭; মৃত্যু—৩১শে জুলাই, ১৯৫৩।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ মার্চ, ১৯৬৭ তৃতীয় সংখ্যা

আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

শতাধিক বছর আগে প্রাতঃস্মরণীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক শুভক্ষণে সুদূর প্রতীচ্য থেকে আহরণ করে এনেছিলেন যে জ্ঞানের উজ্জ্বল শিখা, তাথেকে স্ফুলিঙ্গগুলি কালক্রমে এবং বংশ-পরম্পরায় প্রথমে একে একে এবং পরে বহু হয়ে প্রোজ্জ্বল দীপশিখার আকারে আত্মপ্রকাশ করে আজ শুধু বাংলা দেশেই নয়, সমগ্র ভারতের বুকে এক অভূতপূর্ব দীপান্বিতায় পর্যবসিত হয়েছে। আচার্যদেবের শিষ্য, প্রশিষ্য ও আরো অধস্তন শিষ্যেরা আজ পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেষ্ঠ রাসায়নিকরূপে সম্মানিত। ঠিক একই ভাবে আমরা আর একজন মহাপুরুষ আচার্যের নাম করতে পারি, তিনি হচ্ছেন বাংলা দেশ, তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শারীরবিদ্যার জনক, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়। আকারে, বেশভূষায় ও জীবনধারায় তু'জনের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল পার্থক্য, কিন্তু সৃজনী প্রতিভায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা এবং হৃদয়বত্তায় তু'জনে ছিলেন একই পথের পথিক। যে সকল তরুণ শিক্ষার্থী একবার তাঁদের সংস্পর্শে এসেছে, তারা তৎক্ষণাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত আকৃষ্ট হয়েছে, লোহা যেমন আকৃষ্ট হয় চুম্বকের দ্বারা তেমনি, আর তারাও তাঁদের পদপ্রান্তে বসে শুধু বিদ্যার্জনই করে নি, অভিসিঞ্চিতও হয়েছে চিরজীবনের মত তাঁদের অন্তরের পূত স্নেহধারায়। আচার্য সুবোধচন্দ্র মহলানবিশের স্নেহধন্য আমি তাঁর জীবন-কথা লিখতে বসি নি, আমার স্মৃতির মণিকোঠায় আচার্যদেব সম্বন্ধে যে কয়েকটি

বিশিষ্ট ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে, আজ সে সম্বন্ধেই দু'চারটি কথা বলবো।

আচার্যদেবের সঙ্গে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি সাক্ষাৎ পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী হিসেবে, প্রথম এম. বি বি. এস. ও বি. এস্-সি. পরীক্ষার ক্ষেত্রে। দীর্ঘ দেহ, পরিপাটি বেশভূষা, গম্ভীর পদক্ষেপ, মার্জিত অথচ মোলায়েম কথাবার্তা, ইংরেজ-সুলভ ইংরেজী উচ্চারণ, সব কিছুই মনে রেখাপাত করেছিল এক অনন্যসুলভ ব্যক্তিত্বের নিদর্শনরূপে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র হয়েও বি এস্-সি ও এম. এস-সি পড়বার সুপ্ত বাসনা ছিল মনে। স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কৃপায় নন্‌কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে বি. এস্-সি. পাশ করা সম্ভব হয়েছিল, তদানীন্তন অধ্যক্ষ লেঃ কর্ণেল বার্ণাডোর আপত্তি সত্ত্বেও। দুর্ভাগ্যক্রমে "বাংলার বাঘ" এবং বার্ণাডো প্রমুখ ইংরেজ অধ্যাপকদের ভীতিস্থল স্যর আশুতোষ ইতিমধ্যে মহাপ্রয়াণ করেছেন। তাই প্রেসিডেন্সী কলেজে শারীরবিদ্যায় এম. এস্-সি. পড়বার আবেদন-পত্র সুপারিশের জন্যে অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট নিয়ে গেলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অগত্যা অধ্যক্ষের সুপারিশহীন আবেদন-পত্রই দাখিল করতে হলো। যথাসময়ে জানতে পারলাম যে, যথাযথ প্রণালীতে না হবার দরুণ আমার আবেদন-পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি, অর্থাৎ এম. এস্-সি. ক্লাসে আমাকে ভর্তি হবার অনুমতি দেওয়া হয় নি। এক দারুণ হতাশা নিয়ে একদিন সকাল-বেলায় আচার্যদেবের সমাজপাড়ার বাড়িতে গিয়ে দর্শনপ্রার্থী হলাম। কিছুক্ষণ পরেই তিনি আমাকে দোতলার সুসজ্জিত ড্রয়িং রুমে ডেকে পাঠালেন এবং বিশুদ্ধ ইংরেজীতে সুস্নিগ্ধ স্বরে বসতে বলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি আমার জন্যে কি করতে পারেন।

কম্পিত বুকে, শুষ্ক গলায় ইংরেজীতে কথা বলবার প্রয়াসে হোচট খেতে খেতে বললাম—"একটি সত্য কথা বলবার জন্যে কি আমাকে শাস্তি পেতে হবে স্যর?"

তিনি একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"কি রকম?" "আমি নন্‌কলেজিয়েট ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে ভাল-ভাবে সম্মানের সঙ্গে বি. এস্-সি. পাশ করেছি। যদি সে হিসেবেই ভর্তি হবার জন্যে দরখাস্ত দিতাম, আর আমি যে মেডিক্যাল কলেজে পড়ি তা যদি ইচ্ছাক্রমে গোপন রাখতাম, তাহলে তো আমার আবেদন গ্রাহ্য হতো! তাথেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সত্য গোপন না করবার জন্যেই আমাকে শাস্তি পেতে হলো। আমি আপনার কাছে সুবিচারের জন্যে এসেছি।"

তিনি এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন—"তাই তো, সে কথাটা তো মনে আসে নি, আমরা গতানুগতিকভাবেই তোমার আবেদন অগ্রাহ্য করেছিলাম, তারই মধ্যে যে আর একটা বিশেষ দিক থাকতে পারে, তা তখন ভেবে দেখি নি। সত্যি কথা বলবার জন্যে শাস্তি পাওয়া কখনই উচিত নয়। দেখি আমি কি করতে পারি।"

ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাড়ি চলে এলাম, আর সে মুহূর্তে তাঁর প্রশান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, আমার প্রতি সুবিচারের আবেদন বোধ হয় নিষ্ফল হবে না। হলোও তাই। তিন দিন পরে আমি চিঠি পেলাম নির্দিষ্ট সংখ্যক সীটেরও অতিরিক্ত আর একটি সীটে আমার ভর্তি হবার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। এতদিন দূরে ছিলাম, মনে হলো এবার যেন একটি বিরাট মহীরুহের শীতল ছায়ায় এসে আশ্রয় লাভ করলাম। ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়েই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীরবিদ্যার অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ

দিতে গিয়ে তাঁর চোখ অশ্রুসজল ও কণ্ঠ এত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে, বার বার তাঁর মুখে চির সাবলীল কথাগুলিও যেন অস্ফুট শোনাচ্ছিল। আর অশ্রুসজল নেত্রে আমাদেরও মনে হচ্ছিল যেন আমাদের স্নেহময় পিতৃতুল্য আচার্যদেব চিরতরে আমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছেন।

কয়েক মাস পরে মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে একই সঙ্গে এম. বি, বি. এস ও এম. এস-সি. পরীক্ষায় পাশ করে শেষ পরীক্ষার ফল বের হবার আগেই সুদূর মধ্যভারতের ইন্দোর মেডিক্যাল স্কুলে শিক্ষকের কাজ নিয়ে চলে যেতে হলো। মনে অফুরন্ত আকাশচুম্বী উচ্চাশা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সাধ যত ছিল, সাধ্য ছিল সে তুলনায় নগণ্য। তাই উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেতে যাবার আশার মরীচিকায় ইন্দোর থেকে কলকাতা ছুটাছুটি আরম্ভ করলাম, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের "ঘোষ ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ" বৃত্তি লাভের আশায়। ঐ উদ্দেশ্যে আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করলে তিনি পরামর্শ দিলেন, ঐ কমিটির সদস্যদের সকলের সঙ্গে দেখা করতে। মে মাসের কাঠফাটা রোদ মাথায় করে আরম্ভ হলো আমার সদস্যদের দোরে দোরে ধর্ণা দেওয়া। সকলেই আশা দিলেন, কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল যে, তা নিতান্ত মৌখিক ভদ্রতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মীটিং-এর দিন সন্ধ্যায় আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, ঘোষ অধ্যাপকেরা সকলে একযোগে আমার বিরুদ্ধে গেছেন ; আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও হঠাৎ খুলনায় চলে যেতে বাধ্য হয়ে মীটিং-এ আসতে পারেন নি, ফলে আমি ভোট পেয়েছি মোটে তিনটি—আচার্যদেবের, অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের এবং তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ষ্টেপল্-টনের। আচার্যদেব আরও বললেন—"জীবনে কখনও ষ্টেপল্টন ও আমার মতৈক্য হয় নি, কিন্তু বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম, তোমার বিষয়ে আমরা অভিন্ন মত। অধ্যক্ষ মৈত্রও তোমার খুবই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু ষ্টেপল্টন ভোটের ফল দেখে বিরক্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সভাস্থল ত্যাগ করতে করতে বলে গেলেন যে, তাঁর হাতে যদি কোন ষ্টেট স্কলারশিপ থাকে তাহলে তোমাকে দিয়ে বিলেত যাওয়ার সাহায্য করবেন। তোমার হয়ে এতখানি ওকালতি তিনি করে গেছেন, সুতরাং কালই তুমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এস, হয়তো তোমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারবেন। আর আমার কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁকে বলো না, তাতে খারাপ হতে পারে।"

পরদিনই রাইটার্স বিল্ডিং-এ ষ্টেপল্টন সাহেবের সঙ্গে আচার্যদেবের পরামর্শমত দেখা করতে গেলে তিনি আমার সঙ্গে অতি সদয় ব্যবহার করে সান্ত্বনার সুরে বললেন—"মাই বয়, হতাশ হয়ো না। আমি আজই খোঁজ করেছিলাম ষ্টেট স্কলারশিপ খালি আছে কিনা, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিজ্ঞানের ফেলোশিপ আগামী বছরে খালি হবে, সে পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, আমি যদি সে পর্যন্ত এই পদে থাকি, তবে নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবো।"

কৃতজ্ঞচিত্তে শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিফল মনোরথ হয়ে ইন্দোরে ফিরে এলেও আমার মনে এক গভীর সন্তোষ বিরাজ করছিল এই জেনে যে, আমার পুজনীয় আচার্যদেব ছাড়াও আরো দুজন মনীষীর প্রশংসা ও স্নেহলাভে আমি ধন্য হয়েছি।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, 'বার বার বিফলতা সাফল্যের স্তম্ভ।' রবার্ট ব্রুসের দৃষ্টান্ত দিয়ে এসম্বন্ধে পরীক্ষার খাতায় প্রবন্ধ লিখেছি, কিন্তু ঐরূপ অঘটন অর্থাৎ ঐ প্রবাদ বাক্যের সত্যতা যে আমার জীবনেও ঘটতে পারে, তা আগে কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি। ফেলোশিপ লাভে দু'-দু'বারের চেষ্টায় বিফল হয়ে যখন আমি হতাশচিত্তে আশার মরীচিকার পশ্চাতে আর ছুটবো না বলে প্রতিজ্ঞা

করলাম, তখনই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে মাতৃতুল্যা অনাত্মীয়া একজন মহিলা আপনি এগিয়ে এলেন বিনা সর্তে আমার বিদেশে গিয়ে শিক্ষার জন্যে সাহায্যার্থে। যথাসময়ে সুখবরটি জানালাম আচার্যদেবকে। তিনিও আনন্দ প্রকাশ করে আশীর্বাদ করলেন। চেষ্টা চলতে লাগলো আমার দিক থেকে বিলাত যাত্রার।

কথায় বলে সৎকার্যের পথে অশেষ বাধা! পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হলো। পশ্চিম বঙ্গ থেকে পাশপোর্ট পাওয়া গেল না, বাড়ি থেকে বাবার অনুমতি পাওয়া গেল একান্ত দুঃসাধ্য সর্তাধীনে। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক স্যর এডোয়ার্ড শার্পিশেফারকে চিঠি লিখেছিলাম, তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণার অনুমতির জন্যে। তিনি লিখলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে মেরামতের কাজ চলেছে, সুতরাং সে সময় স্থানাভাব। তার উপর ভাইদের পড়াশুনার ব্যয় সংকুলানের ভাবনাও কম নয়। কিন্তু ভগবান যখন সদয় হন, তখন দুর্লঙ্ঘ্য বাধার প্রাচীরও ভেঙে খান খান হয়ে যায়, আর হলোও তাই। মধ্যভারতের হর্তাকর্তা স্যর রেজিনাল্ড গ্ল্যান্সীর দয়ায় মধ্যভারত থেকে পাশপোর্ট পাওয়া গেল। বাবার উপর'ওলা হাইকোর্টের বিচারে অর্থাৎ ঠাকুর্দার নিকট থেকে বিনাসর্তে পাড়ি দেবার অনুমতি পাওয়া গেল। ভাইদের দু'জনই পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করে একাধিক স্কলারশিপ পেয়ে গেল। সুতরাং শেষ মুহূর্তে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীট না পাওয়া সত্ত্বেও জাহাজের প্যাসেজ বুক করে ফেললাম এই ভেবে যে, যখন এত বাধাই দূর হয়ে গেল, তখন ওটাও দূর হবেই হবে।

কলম্বো থেকে বিদেশ যাত্রার আগে একবার বাড়িতে যাবার পথে কলকাতায় এলাম এবং আচার্যদেবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাহায্য-প্রার্থী হলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ সানন্দচিত্তে অধ্যাপক শার্পিশেফারের নিকট ব্যক্তিগত চিঠি দিলেন এই বলে যে, শেফার তাঁর বহু দিনের পুরনো বন্ধু; যখন তিনি কার্ডিফে অধ্যাপক ছিলেন তখন শেফার এক্সটারন্যাল পরীক্ষকরূপে নাকি লণ্ডন থেকে আসতেন। সুতরাং তাঁর কথায় এবং হাতে ঐ চিঠিখানি পেয়ে আমি মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে যেন বিদ্যুচ্ছটা দেখতে পেলাম। বিদায় মুহূর্তে প্রণাম করে হাত বাড়িয়ে পদধূলি মাথায় নিলাম, আর তিনিও হাত বাড়িয়ে একেবারে বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। গুরু-শিষ্যের প্রথম নিবিড় আলিঙ্গন গঙ্গা-যমুনার মিলনে প্রয়াগ তীর্থে পরিণত হলো।

১৯২৯ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছে সেই রাত্রিতেই রওনা হয়ে আমার গন্তব্যস্থল এডিনবরায় পরদিন সকাল বেলায় পৌঁছাই। প্রাতরাশ শেষ করেই ছুটে যাই অধ্যাপক শার্পিশেফারের সঙ্গে দেখা করতে ইউনিভার্সিটিতে। বহু দর্শন-প্রত্যাশী অপেক্ষা করছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, তবু অবাক হয়ে গেলাম, যখন অধ্যাপক মহলানবিশের পত্রখানা পাওয়া মাত্র আমাকে তিনি ডেকে পাঠালেন সকলের আগে। আমাকে বসতে বলে প্রথমেই আচার্যদেব সম্বন্ধে তাঁর কুশল বার্তা ও অন্যান্য অনেক কিছু জানতে চাইলেন। তারপর বললেন—"আমার মনে আছে, তোমাকে এখন আসতে বারণ করেছিলাম, কারণ বাড়ি মেরামতের জন্যে লেবরেটরিতে স্থানাভাব; তবু যখন এসে পড়েছ, আর আমার খুবই প্রিয় বন্ধু মহলানবিশ তোমার সম্বন্ধে যে ভাবে লিখেছেন, তাতে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় হবে; আর বিশেষতঃ তুমি যখন এত আগ্রহশীল যে, একুশ দিন জাহাজে থেকে লণ্ডনে পৌঁছে এক দিনের জন্যেও লণ্ডনে বিশ্রাম না করেই কার্যস্থলে ছুটে এসেছ।" অধ্যাপক শার্পিশেফারকে ধন্যবাদ ও

কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং মনে মনে বহুদূরে অবস্থিত আচার্যদেবকে প্রণাম জানালাম, কারণ শুধু তাঁরই সুপারিশের জোরে আমি স্থান পেলাম বিশ্ববিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ সার্পিশেফারের গবেষণাগারে ছাত্র হিসেবে।

বছর তিন গড়িয়ে গেল—পাটনা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপকরূপে ১৯৩২ সালে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হিসেবে এলাম আচার্যদেবের সহযোগী হয়ে। তখন তিনি কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক। এক বছর আগে বিলেত থেকে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করে আশীর্বাদ পেয়েছিলাম, আবার পেলাম সহ-পরীক্ষক হিসাবে। গুরু-শিষ্যের এভাবে বছরে দুই বা ততোধিকবার দেখা ও সহযোগিতা হতে লাগলো বহু বছর ধরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিদ্যার পরীক্ষার ক্ষেত্রে।

১৯৩৩ সালে আবার তাঁর আশীর্বাদ পেলাম আমার বিবাহ-বাসরে। তিনি সেখানে আমার শ্বশুর বাড়িরও নিমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন। সেখানেই আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন—"তোমার ভাইও তোমাদের পক্ষ থেকে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়ে এসেছে আমাকে। কিন্তু আমি আশা করেছিলাম যে, তুমি নিজেই এসে ঐ সুখবরটি আমাদের দেবে।" স্নেহময় পিতৃতুল্য অধ্যাপকের অভিমান হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ত্রুটির জন্যে মার্জনা ভিক্ষা করলাম।

বিয়ের কয়েক দিন পরে যখন দ্বিরাগমনে পাটনা থেকে কলকাতায় এলাম, তখন তিনি নিমন্ত্রণ করে তাঁর নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমাকে ও আমার পত্নীকে দুটি সোনার হাফ গিনি দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। শ্রদ্ধেয়া আচার্যপত্নী মণিকাদেবী আমার পত্নীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—একদিকে তুমি ছিলে আমার ভাইঝি, অন্যদিকে আমার বৌমা হলে।

১৯৩৫ সালে যখন মরণাপন্ন অসুখে পড়ে কলকাতায় তালতলার বাড়িতে ছিলাম শয্যাশায়ী, তখন কতদিন আচার্যদেব কলেজ থেকে ফেরবার পথে দেখে গেছেন আমাকে এবং অচিরে যাতে ভাল হয়ে উঠি, তার জন্যে আশীর্বাদ করে গেছেন। তারপর ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে কলকাতা ছেড়ে কেবল স্বাস্থ্যলাভের জন্যে যেতে হলো কাজ নিয়ে সুদূর কুন্নুরে এবং সেখান থেকে নয়া দিল্লীতে। ১৯৩৯ সালে যখন আবার পৃথিবী-ব্যাপী দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হলো, তখন কাজ ছেড়ে আবার কলকাতায় ফিরে এলাম এবং স্থায়ী ভাবে বালিগঞ্জ প্লেসের নিজ আবাস-ভবনে বাস করতে আরম্ভ করলাম। সেখান থেকে আচার্যদেবের বাসভবন খুবই কাছে। সুতরাং এতদিনে দূরত্বের ব্যবধান কেটে গিয়ে এল নিকটতর মেলামেশার সুযোগ। যখনই সুযোগ পেতাম আচার্যদেব ও পিসীমার কাছে ছুটে যেতাম, আর তাঁরাও পুত্রকন্যাধিক স্নেহে আমাদের কাছে টেনে নিতেন। কোন কারণে কয়েক দিন তাঁদের কাছে না গেলে, হয় টেলিফোন করতেন 'কেমন আছ?' আর নয়তো এক বাক্স ভীম নাগের সন্দেশ পাঠিয়ে দিতেন—যার নিগূঢ় মানে, তোমাদের দেখতে বড় ইচ্ছে, তাড়াতাড়ি এসো। লজ্জিত হয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতাম তাঁদের কাছে, অনাবিল স্নেহধারায় অভিসিঞ্চিত হতে। আচার্যদেব প্রায়ই বলতেন, 'বৌমা বহুদিন তোমার গান শুনি নি।' প্রতিমাকে তখনই গিয়ে অর্গ্যানের কাছে বসে অন্ততঃ গোটা পাঁচ-ছয় গান গাইতে হতো। একদিন বললেন—"তোমাদের কোন ছবি আমাদের কাছে নেই, একখানা দিয়ে যেও, যাতে সর্বদা তোমাদের সান্নিধ্য অনুভব করতে পারি।" ফটোখানা পেয়ে ৪।১১।৪৪ তারিখে পিসীমা লিখলেন,

90 Park Street.
(Circus P. O)
Calcutta, 4.11.44

পরম স্নেহের প্রতিমা,

তোমাদের ছবিখানি পেয়ে কত সুখী হয়েছি বলতে পারি না। এতদিন লিখতে পারি নাই বলিয়া অত্যন্ত লজ্জিত আছি। আশা করি ক্ষমা করিবে। আমার ইচ্ছা ছিল নিজে গিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করে আসব, কিন্তু তাহার সুবিধা করতে পারছি না। তাই আরও লিখতে দেরী হইল। তোমাদের ছবিখানি আমাদের ঘরে সাজানো আছে, সকলের দেখে খুব ভাল লাগছে। মনে মনে তোমাদের অনেক আশীর্বাদ করছি।

আশা করি দুজনে বেশ ভাল আছ।

আমাদের উভয়ের স্নেহাশীর্বাদ দুজনে গ্রহণ করিও।

শুভাকাঙ্খিণী
পিসিমা

ইতিমধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যার জন্যে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলা হয়েছিল এবং আচার্যদেবকে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শারীরিক অক্ষমতাহেতু তিনি বেশী দিন ঐ কর্মভার বহন করতে পারেন নি এবং ১৯৪২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। আমি তখন ঐ বিভাগে পার্ট-টাইম শিক্ষক। সেই বিদায়-সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বিদায় সম্ভাষণের উত্তরে সে দিন পূজনীয় আচার্যদেব অতি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সর্বদাই এত সুন্দর ইংরেজী বলতেন এবং সকলের সঙ্গে সর্বদা ইংরেজীতে কথাবার্তা বলতেন (অবশ্য ঘরোয়াভাবে আমরা কয়েক জন তার ব্যতিক্রম) যে, অনেকের মনে ধারণা ছিল যে, তিনি বাংলা ভাষায় লিখতে বা বক্তৃতা করতে পারেন না। কিন্তু সেদিন তিনি প্রমাণ করলেন যে, তিনি সব্যসাচী। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ তাঁর সভাপতির ভাষণে অনুরোধ জানালেন যে, অবসর গ্রহণের পর আচার্যদেব যেন বাংলা ভাষায় শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তক লিখে দেন; কারণ সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের শিক্ষকতায় অভিজ্ঞ যে শিক্ষক এমন সুন্দরভাবে বাংলা বক্তৃতা করতে পারেন, কেবল তিনিই এরূপ দুরূহ কাজ করতে পারেন, এই তাঁর বিশ্বাস।

আচার্যদেবের নিকট থেকে একটু দূরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, তিনি হাতছানি দিয়ে ডেকে এনে আমাকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের কাছে উপস্থিত করে বললেন—"অনুরোধটি নিশ্চয়ই রক্ষিত হবে, কিন্তু তার ভার আমি দিলাম আমার এই উপযুক্ত শিষ্যের উপর।"

শ্যামাপ্রসাদ বললেন—"আপনি কি পারবেন এ ভার নিতে।"

আমি উত্তর করলাম—"আচার্যদেবের আশীর্বাদে এবং আপনার শুভেচ্ছায় আমি নিশ্চয়ই পারবো।"

গুরুর কথার মর্যাদা রাখতে আমি এক বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাংলা ভাষায় "শারীরবিদ্যা" পুস্তিকাখানি রচনা করে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের হাতে দিই এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়। ফলে পেলাম আচার্যদেবের আশীর্বাদ, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫১ সালের নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার। আচার্যদেব আবার আশীর্বাদ করলেন।

১৯৪৩ সালে গুরুদেব কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজ থেকেও অবসর গ্রহণ করলেন। তখন জোর লড়াই চলছে, কৃতবিদ্য শিক্ষকেরা অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণে চলে গেছেন দূর দূরান্তরে। যে কোন একজনের পক্ষে আচার্যদেবের

পরিত্যক্ত আসনের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভবপর নয় বলে যুগ্মভাবে যে দু'জনের উপর ভার দেওয়া হলো, তাঁদের দু'জনের মধ্যে চললো রেষারেষি এবং ঝগড়াঝাঁটি। অত্যন্ত বিব্রতভাবে ঐ কলেজের কর্তৃপক্ষ শরণাপন্ন হলেন আচার্যদেবের উপযুক্ত পরামর্শের জন্যে। আচার্যদেব বললেন—"এই অবস্থায় বিভাগটি চালাবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে আমার জানা একটি লোকের—(এই ব'লে আমার নাম উল্লেখ করলেন), তাকেই আপনারা সাদরে ডেকে আনুন।" আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে শিক্ষক, সুতরাং কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের সাদর আহ্বান পেয়ে বিব্রতবোধ করে আচার্যদেবের কাছে ছুটে গেলাম। তিনিও বললেন যে, তাঁরও ইচ্ছা আমি তাঁরই মত একই সঙ্গে দুটি পদই গ্রহণ করি। তাঁরই আদেশ শিরোধার্য করে কারমাইক্যাল মেডিক্যাল কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং ইউনিভার্সিটির স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান বিভাগের প্রেসিডেন্ট ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সম্মিলিত ইচ্ছায় আমাকে একই সঙ্গে ঐ দুটি পদের গুরু দায়িত্বভার কাঁধে নিতে হলো। আচার্যদেবের শুধু অনাবিল স্নেহ নয় এমনি বিশ্বাস ও আস্থা ছিল তাঁর প্রিয় ছাত্রের উপর।

একাধারে নানা গুণ সত্ত্বেও আচার্যদেবের নার্ভগুলির উপর সংবেদনশীল প্রভাবের এত আধিক্য ছিল যে, কোন বিষয়ে পান থেকে চুন খসলে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। গৃহে প্রতিটি আসবাবপত্র, বই, কাগজপত্র, কাপড়-চোপড় থাকবে অতি পরিপাটিভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে বিন্যস্ত। কোন কারণে তার এতটুকু ব্যতিক্রম ঘট্‌লেও তিনি তা বরদাস্ত করতে পারতেন না। ফলে তাঁকে বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হতো। তাঁর মুখে বহুবার শুনেছি যে, শয্যায় শয়ন করলেও তাঁর মনে অনবরত যে সকল চিন্তার অন্তঃপ্রবাহ চলতে থাকতো, তার ফলে নাকি তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সুনিদ্রা কাকে বলে জানতেন না। পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থায়ও তিনি একই ভাবে চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সে কারণে ১৯৪২ সালে যখন কলকাতায় দু-দুবার জাপানী বোমা পড়লো, তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে সপরিবারে কয়েক মাস বাস করতে গিয়েছিলেন গিরিডিতে তাঁর নিজের বাড়িতে। সে সময়ে প্রায়শঃ তিনি আমার কাছে প্রাঞ্জল বাংলাভাষায় চিঠি লিখে তাঁর তৎকালীন মনোভাব প্রকাশ করতেন। তারপর আবার ১৯৪৬ সালে যখন কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তাণ্ডব চলছে, অদূরে মুসলমানের পাড়া, আর বাড়ির গায়ে আছে মুসলমান গুণ্ডাদের লীলানিকেতন একটি মসজেদ, তাই তখন তিনি তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িটি ছেড়ে অন্য কোন হিন্দুপ্রধান পাড়ায় গিয়ে থাকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পিসীমা তাঁর বড় বৌমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের কাছে কোন বাড়ি পেলে তাতে এসে থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বহু স্থানে খোঁজ করেছি, কিন্তু ভাল বাড়ির সন্ধান করে উঠতে পারি নি। সুতরাং তাঁরা বাধ্য হয়ে নিজেদের প্রাসাদোপম বাড়িটিকে একজন মুসলমানের কাছে ভাড়া দিয়ে আবার সমাজপাড়ায় তাঁদের পুরনো সংকীর্ণ বাড়ীতে সাময়িকভাবে উঠে গেলেন। যাঁরা কাছে ছিলেন, তাঁরা আবার কতকটা দূরে চলে গেলেন! এসব অস্বস্তিকর টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে একটা সঙ্কটময় কাল শেষ হয়ে এল স্বাধীনতা। কিন্তু দারুণ দুর্বিপাকময় ঝড়ের পর তরুশাখায় বসা কাকের যে অবস্থা হয়, আচার্য-দেব ও পিসীমারও তখন সেই অবস্থা। তাঁরা নিজের বাড়িতে ফিরে এলেও স্বাভাবিক অবস্থা বা মনের ভাব বা শরীরের স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন না। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছরের সুখে-দুঃখে জীবনসঙ্গিনী, মূর্তিমতী নিঃস্বার্থ ত্যাগ মণিকাদেবী ১৯৪৭ সালের ৯ই নভেম্বর শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ স্বামী ও তিনটি পুত্রকে

রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তখন সস্ত্রীক ইউরোপে, সুতরাং শেষ মুহূর্তে পিসীমার সঙ্গে দেখা হলো না—সে দুঃখ জন্মের মত থেকে গেল।

১০ই ডিসেম্বর ফিরে এসেই আমরা দেখা করতে গেলাম শোকসন্তপ্ত আচার্যদেবের সঙ্গে। কি দেখলাম, আচার্যদেবের ভাষায়ই বলছি, দেখলাম—"অনতিদূরে বাতাহত একটা প্রকাণ্ডকায় মহুয়া গাছের দুর্দশা···একেবারে শুক্‌নো একটা প্রচণ্ড বাতাসের অত্যাচারে সে বিপন্ন হয়ে সমস্ত ডালপালা আছড়ে প্রতিবাদ করছে। আর তার লক্ষ লক্ষ পুরনো জীর্ণ ও শুষ্ক পাতা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিপুল গাছটা পর্ণশূন্য হয়েছে।"

মনের তো এই অবস্থা, শরীরেরও তথৈবচ। তবু শিষ্যের প্রতি বাৎসল্যের কিছুমাত্র হ্রাস নেই। ফেরবার সময় বিলেত থেকে নতুন একখানি "Standard" গাড়ি কিনে সঙ্গে এনেছি জেনে কত খুশী ও কত আশীর্বাদ! বিদায় নিয়ে নীচে এসে যখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, উপরে তাকিয়ে দেখি—তিনি অসুস্থ দেহকে লাইব্রেরীতে টেনে এনে জানালায় দাঁড়িয়ে প্রীতিপূর্ণ নেত্রে আমাদের নতুন গাড়িতে প্রবেশ দেখছেন আর শুনতে পেলাম বলছেন—"একদিন তোমাদের নতুন গাড়িতে করে বেড়িয়ে আসবো।" প্রতিটি কথায় যেন স্বর্গীয় স্নেহ ও বাৎসল্য উছলে উঠছে!

তারপরেও তিনি প্রায় ছয় বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু বোধ হয় ঠিক তা বলা চলে না, যেন এক রকম জীবন্মৃত অবস্থাই। শক্তিমানের শক্তি হারিয়ে গেলে যে বিপর্যস্ত অবস্থা—সে অবস্থায়ই তিনি বেঁচেছিলেন। আমরা কাছে গেলে আনন্দ প্রকাশ করতেন, আর বলতেন—"আমি যখন এ জগতে থাকবো না, তখন তোমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবো।" "কলেজের আমার প্রিয় লেবরেটরীর খবর কি? ছোট হলেও ওটা আমাদের বড় প্রিয়। তোমরা সবাই যেন মনে রেখো 'বাসা ছোট হলেও আশা ছোট নহে।' সকলে মিলে এই ডিপার্টমেন্টকে জাঁকিয়ে তোলো, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।"

অন্য সময়ে বলতেন—"বিশ্বব্যাপী এই ঘোর দুর্দিনের অবসানে আমাদের দেশের—তথা জগতের নবজীবন লাভ হবে এটা ধ্রুব সত্য। তোমরা তার জন্যে প্রস্তুত হও। আমরা যারা ওপারের জন্যে পা বাড়িয়ে আছি, এই আশা নিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করে চলে যাই।"

১৯৫৩ সালের ৩১শে জুলাই ছিয়াশি বছর বয়সে স্বধর্মনিষ্ঠ স্নেহপ্রবণ আচার্যদেব মরজগৎ ত্যাগ করে প্রায় ছয় বছর পরে অমৃতলোকে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হলেন।

৪ঠা মার্চ (১৯৬৭) তাঁর জন্মশতবার্ষিকীর শুভদিন। অপরিসীম স্নেহধন্য শিষ্য আজ সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞচিত্তে এই মহাপুরুষের পুণ্যস্মৃতি চারণা করে নিজেকে ধন্য মনে করছে আর অমর্ত্যলোক বাসী তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছে,

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।"

পরিশিষ্ট

আচার্যদেবের কয়েকখানি পত্র

(১)

90, Park Street,
(Circus P. O)
Calcutta
The 2nd April, 19 0

My dear Pal,

Your registered lerter containing questions for the 1st M. B. Exam. reached this morning (Tuesday). The meeting of the Board was held yesterday—and owing to this unfortunate

delay in receiving the question they could not be placed before the meeting.

I am very sorry it has happened like this. The Controller's office might have telegraphed and given you more time.

The dates of the Orals and practicals are not yet fixed. They will probably commence on the 26th April, 1940. I shall ask the Controller to inform you as soon as possible.

Where is বধূমাতা now? I do hope you are both keeping well. Is your wife likely to be in Calcutta about the time of the examination? In that case my wife and self shall be very glad to see you both.

Kindest wishes to you both.

Yours Very Sincerely,
Sd/. S. C. Mahalanobis.

(২)

Prof. S. C. MAHALANOBIS

BARGANDA
GIRIDIH

পরম কল্যাণীয়েষু, 20. 12. 1942

স্নেহের রুদ্রেন্দু, দু'মাস হয়ে গেল এখানে এসেছি। ঘটনাচক্রে আমরা ১৬ই অক্টোবর — সেই দুরন্ত সাইক্লোনের রাতে কলিকাতা ছেড়েছিলাম। নিতান্ত বিধাতার অনুগ্রহে বিপদে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এখন ভাবলে স্বপ্নের মত মনে হয়।

তোমরা সকলে কেমন আছ? এখানে আসিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই — কিন্তু তোমাদের খবর পাইতে খুব ইচ্ছা হয়। কল্যাণীয়া মা প্রতিমা কেমন আছেন? কলিকাতা ছাড়িবার পূর্বে তোমরা একদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া বড় আনন্দ দিয়াছিলে। আমরা প্রায়ই সে কথা বলিয়া থাকি। প্রতিমা মার সুমিষ্ট গান ভুলিবার নহে। আবার কবে — বা কোন দিন — তাহা শুনিবার সুযোগ ঘটিবে কিনা জানি না।

কলেজের — আমার প্রিয় ল্যাবরেটরীর খবর কি? ছোট হলেও উহা আমাদের বড় প্রিয়। তোমরা সবাই যেন মনে রেখো "বাসা ছোট হলেও, আশা ছোট নহে"। সকলে মিলে এই ডিপার্টমেন্টকে জাঁকিয়ে তোলো, এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

আলো — আরো আলো — সত্যের ও জ্ঞানের — তোমাদের সাধনায় স্বদেশে ও দেশান্তরে পৌঁছাক। অনেক স্নেহাশীর্বাদ লও।

কল্যাণকামী শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

(৩)

Prof. S. C. Mahalanobis

Barganda
Giridih
20.12.1942

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, দু'মাস হয়ে গেল এখানে এসেছি। ঘটনাচক্রে আমরা ১৬ই অক্টোবর—সেই দুরন্ত সাইক্লোনের রাতে কলিকাতা ছেড়েছিলাম। লীলাময় বিধাতার আশ্চর্য বিধানে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এখন ভাবলে স্বপনের মত মনে হয়।

তোমরা সকলে কেমন আছ? এখানে আসিয়া তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই—কিন্তু তোমাদের খবর পাইতে খুব ইচ্ছা হয়। কল্যাণীয়া মা প্রতিমা কেমন আছেন? কলিকাতা ছাড়িবার পূর্বে তোমরা একদিন আমাদের বাড়ী আসিয়া বড় আনন্দ দিয়াছিলে। আমরা প্রায়ই সে কথা বলিয়া থাকি। প্রতিমা মার সুমধুর গান ভুলিবার নহে। আবার কবে—বা কোনদিন—তাহা শুনিবার সুযোগ ঘটিবে কিনা জানি না।

কলেজের আমার প্রিয় ল্যাবরেটরীর খবর কি? ছোট হলেও ওটা আমার বড় প্রিয়। তোমরা সবাই যেন মনে রেখো—"বাসা ছোট হলেও আশা ছোট নহে"। সকলে মিলে এই ডিপার্টমেন্টকে জাঁকিয়ে তোলো—এই আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

আলো—আরো আলো সত্যের ও জ্ঞানের—তোমাদের সাধনায় স্বদেশে ও দেশান্তরে পৌঁছাক।

অনেক আশীর্বাদ লও।

(স্বা:) কল্যাণকামী
শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

(৪)

Barganda,
Giridih
১লা বৈশাখ, ১৩৫০

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, নববর্ষে কল্যাণীয়া প্রতিমা মাকে ও তোমাকে আমাদের উভয়ের অনেক শুভকামনা ও স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি। বিদ্বেষ-বিষজর্জরিত পুরনো বৎসরের বুকের উপর কত তাণ্ডব লীলা ঘটিয়াছে—তা ভাবিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। সম্মুখে কি আছে জানি না। এস সকলে মিলিয়া ভগবানের চরণে মাথা রাখিয়া প্রার্থনা করি, এই প্রলয় পয়োধির মহামন্থনের অবসানে শান্তির অমৃত উঠুক।

আশা করি তোমরা দুজনে ভাল আছ। তোমার শ্বশুর মহাশয় কোথায় ও কেমন আছেন? তাঁহাকে আমাদের নববর্ষের অভিবাদন জানাইও।

এখানে গরম ক্রমশ: বাড়িয়া চলিয়াছে—আশঙ্কা হয় টিঁকতে পারিব কিনা। খাদ্য-সামগ্রীর অভাব ও নানা কষ্টে আর প্রবাসে ভাল লাগিতেছে না। এসকল কথা লিখিতে লজ্জা হয়—জগতের দুঃখরাশির কথা ভাবিয়া।

কদিন ধরে দুরন্ত ঝড় বইছে। আমার ঘরের অনতিদূরে বাতাহত একটি প্রকাণ্ডকায় মহুয়া গাছের দুর্দশা বসে বসে দেখছি। একেবারে শুকনো একটা প্রচণ্ড বাতাসের অত্যাচারে সে বিপন্ন হয়ে সমস্ত ডালপালা আছড়াইয়া প্রতিবাদ করছে। আর তার লক্ষ লক্ষ পুরনো জীর্ণ ও শুষ্ক পাতা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। কয়েক দিনের মধ্যেই এই বিপুল গাছটা পর্ণশূন্য হয়েছে। প্রকৃতির এ নিষ্ঠুর খেলা যে 'সংস্কারের প্রথা' তা তোমরা বিজ্ঞানবিদেরা বলে থাক। সত্যাই দেখছি সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি নব কিশলয় গজাতে আরম্ভ হয়েছে—যা অচিরে নিবিড় হরিৎপত্রে এই বিরাট

মহীরুহের গৌরব ও গাম্ভীর্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবে। এই ব্যাপারটা দেখে মনে হয়—লাঞ্ছিত জগতের বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে।

বিশ্বব্যাপী এ ঘোর দুর্দিনের অবসানে—আমাদের দেশের—তথা জগতের নব জীবন লাভ হবে, ইহা ধ্রুব সত্য। তোমরা তার জন্য প্রস্তুত হও। আমরা যারা ওপারের জন্য পা বাড়িয়ে আছি, এই আশা নিয়ে তোমাদের আশীর্বাদ করে চলে যাই।

সকলে অনেক স্নেহাশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী
(স্বাঃ) শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

(৫)

Prof. S. C. Mahalanobis

90 Park Street,
Calcutta
10. 6. 1943

পরম কল্যাণবরেষু,

স্নেহের রুদ্রেন্দ্র, তোমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক আছি। একবার আসিলে সুখী হইব। উপস্থিত সকল ব্যাপারের বিষয় আমি সাক্ষাৎভাবে অবগত আছি। কল্যাণ হউক।

পরশু (শনিবার) সকাল ১০ হইতে ১১টার মধ্যে আসিতে পারিলে ভাল হয়।

প্রতিমা মা কেমন আছেন ? দুজনে স্নেহাশীর্বাদ লও।

কল্যাণকামী
(স্বাঃ) শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

(৬)

90 Park Street
(Circus P. O.)
Calcutta—17
15. 6. 49

মা প্রতিমা,

তোমাদের জন্য যৎসামান্য মিষ্টি পাঠাইলাম, খাইলে সুখী হব। স্নেহাশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী
পিসেমশাই

(৭)

90 Park Street
(Circus P. O)
Calcutta—17
27. 11. 49

পরম কল্যাণীয়াসু,

মা প্রতিমা, ৬ই ডিসেম্বরের কথা ভুলিও না। আমার আঁধার সংসারে এখন ঐ একটি দিন কেবল আনন্দের দিন আছে। আগামী ৬ই ডিসেম্বর মঙ্গলবারে বিকাল ৫।।০টার সময়—তোমার পিসীমার 'জন্ম ও বিবাহের' সাম্বৎসরিক উপলক্ষ্যে আমাদের গৃহে প্রীতিসম্মিলন হইবে। গত বৎসরে তুমি ও কল্যাণীয় রুদ্রেন্দ্র এখানে আসিয়াছিলে—ও তুমি কত তোমার সুমধুর সঙ্গীতে আনন্দ পরিবেশন করিয়াছিলে। আশা করি এবারেও সে তৃপ্তি হতে বঞ্চিত হব না।

উভয়ে অনেক আশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী
পিসেমশাই

(৮)

90 Fark Street
(Circus P. O)
Calcutta—17
10. 3. 1950

মা লক্ষ্মী,

অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নাই। তোমরা কেমন আছ জানিবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে আছি।

২৯শে জানুয়ারী তোমরা কমল কুটিরে আসতে পেরেছিলে দেখে বড় ভাল লাগলো। ডাক্তার সাহেব ভাল ত ?

আমি নিজে টেলিফোন করতে পারি নে। এক লাইন লিখে তোমরা সকলে কেমন আছ জানালে সুখী হব। আমার শরীর নিতান্ত অপটু। ওপারের যাত্রী হয়ে দ্রুতগতিতে চলেছি।

সকলে স্নেহাশীর্বাদ লও।

একান্ত কল্যাণকামী
পিসেমশাই

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের জীবন-স্মৃতি

শ্রীসুজিত মহলানবিশ

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, ৪ঠা মার্চ (ফাল্গুন, ১২৭৩ সালে) মহলানবিশ পিতৃদেব কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আমাদের পিতামহ গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের পৈত্রিক বাসভূমি ছিল ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর জেলার পঞ্চসার গ্রামে। পিতামহ পরবর্তী কালে কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করেন এবং তাৎকালিক ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা বলিয়া পরিগণিত হন।

পিতৃদেবের শৈশব ব্রাহ্মসমাজের নির্মল পরিবেষ্টনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ছয় বৎসর বয়সে কলিকাতা বয়েজ স্কুলে (Calcutta Boys' School) ভর্তি হন। কলিকাতা বয়েজ স্কুল পরে এলবার্ট স্কুল নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এই বিদ্যালয়ের রেক্‌টর (Rector) ছিলেন। তিনি পিতৃদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই বিদ্যালয়ে পিতৃদেবের অনেকগুলি বন্ধু লাভ হইয়াছিল, তন্মধ্যে ছিলেন স্বর্গীয় প্রমথলাল সেন, বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, নরেন্দ্রনাথ ও ভুপেন্দ্রনাথ মজুমদার। মাঘোৎসবের সময়ে এই স্থানে তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া উৎসব করিতেন এবং প্রতি শুক্রবারে সৎ আলোচনা ইত্যাদি হইত। এই বিদ্যালয়ে পিতৃদেব চার বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন।

ইহার পর পিতৃদেব সিটি স্কুলে (City School) ভর্তি হন। সিটি স্কুলে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই পিতৃদেব কমল কুটিরে (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের গৃহ) এবং নববিধান সমাজে যাতায়াত করিতেন। সিটি স্কুলে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় শিক্ষকতা করিতেন। পিতৃদেব হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। পিতৃদেব সিটি স্কুলের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং বরাবর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

সিটি স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃদেব জেনারেল এসেম্ব্‌লিতে (General Assembly) ভর্তি হন। পিতৃদেব দ্বাদশ বৎসর বয়স হইতেই বক্তৃতা করিতে পারিতেন। জেনারেল এসেম্ব্‌লিতে অধ্যয়নের সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাহা শুনিয়া সকলে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যামিলটন সাহেব (Mr. Hamilton) পিতৃদেবকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং এই স্নেহের বন্ধন কোন দিন ছিন্ন হয় নাই। পিতৃদেব নিজবুদ্ধির দ্বারা নিজহস্তে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য্যন্বিত হইয়াছেন। পিতৃদেব সুলেখক বলিয়াও পরিচিত হন। "নব্য ভারত", "ব্যবসায়ী" ইত্যাদি কাগজে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ লিখিতেন।

জেনারেল এসেম্ব্‌লি হইতে পিতৃদেব মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। মেডিক্যাল কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন এবং এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে (Edinburgh University) তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর তিনি শারীরবিজ্ঞান (Physiology) অধ্যয়ন করেন। এডিনবরা গবেষণাগারে (Research Labaratory, Royal College of Physicians) তিনি দুই

বৎসর গবেষণা করেন। পিতৃদেব সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং পরে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো হন (Fellow of the Royal Society, Edinburgh)।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনন্দপূর্ণ দিনগুলির কথা পিতৃদেব কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার লিখিত এক প্রবন্ধ (Reminiscences of Edinburgh University) কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে এই প্রবন্ধটি কলিকাতার "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। এডিনবরাতে অধ্যয়ন কালে যে সকল বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণের সঙ্গলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, পিতৃদেব এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

"The foremost figure that stands in my memory, is that of the 'grand old man of Scotland'. No one, who had not seen this evergreen professor, would be able to form an adequate idea of the grand personality of the late Professor Blackie—apart from his profound Scholarship. Scotch to the core—you see the Highlander walking gleefully along the street with his tartan plaid round his shoulders and his silvery curls streaming behind the ears, down to his neck, now stopping to speak a kindly word to a little street arab, again pacing along, muttering Greek Verses to himself! Who said Blackie was ever old? Something must have been wrong with the man who was not fired with the enthusiasm for manly sports which Blackie used to infuse into the hearts of his students. Was there another Professor who loved his students more and was loved more by his students than Blackie?'

*

"Just the other day, my Alma Mater mourned the loss of one of the most brilliant teachers of Medical Science in the death of my esteemed teacher—the late Prof. Rutherford. It would be wellnigh impossible for an outsider to understand Rutherford rightly. But we, who had the privilege of being his students, knew him well and we dearly loved 'Bilirubin', as we liked to call him. His very idiosyncracies and his mannerisms were dear to us. For Rutherford without his peculiarities would not be Rutherford. But his heart and energies were undividedly devoted to the welfare of the students. I could talk to you a whole night about his funny little ways".

* * * *

"The Edinburgh University with its venerable buildings, its time-honoured traditions, its charming associations, its youthful friendships has left a never-to-be obliterated impression on my heart. The moulding of character by the personal influence of great teachers, the kindling of intellectual fire and awakening of noble aspirations

in young minds by the electric touch of giant intellects, are indeed the highest mission of all great educational institutions".

এডিনবরায় অধ্যয়নের সময় কয়েকটি স্কচ্ পরিবারের সহিত পিতৃদেবের বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠতা হয় এবং এই বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হইয়াছিল। এডিনবরাতে পাঠ্যাবস্থায় এক সময়ে পিতৃদেবের অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। পিতামহের নিকট হইতে সামান্য সাহায্য পাইতেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্য উপায়ে আয় করিতে হইত। তিনি একদিকে নিজে অধ্যয়ন করিতেন এবং অন্য সময়ে ছাত্র পড়াইয়া ও ছবি তুলিয়া (Photography) অর্থোপার্জন করিতেন। এইরূপ অর্থাভাব ও নানা বিঘ্নের মধ্যেও পিতৃদেব অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এই সময়ে কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে (University College, Cardiff) একটি শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ খালি হওয়াতে পিতৃদেব সেই পদে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে এই পদে কোন ভারতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন নাই। পিতৃদেব কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকের পদেও নিযুক্ত হন। কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়ে পিতৃদেব তিন বৎসর কাল শিক্ষকতা করিবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিদায় লইবার সময় ছাত্রগণ তাঁহাকে একটি বিদায় সম্ভাষণ দিয়াছিল। ছাত্রগণ তাঁহাকে যে কিরূপ ভালবাসিত ও শ্রদ্ধা করিত তাহার নিদর্শনস্বরূপ সেই বিদায় সম্ভাষণ-পত্র (Address) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"May we be permitted to take this opportunity of conveying to you by means of this brief address, an expression of our good feeling towards you as a Physiologist, as a teacher and as a man.

In such a short space, it would be difficult to epitomize the many excellent traits in your character which have made you loved and respected by us as a body of students.

During your stay in Cardiff, you have won your way to our hearts not only by your marked ability as a teacher of Physiology, but also by the kindly consideration which you have shown to us as students of medicine.

In addition to this, you have ever kept before us a high ideal of the noble profession which we are about to enter.

In conclusion, permit us to express our hope that by your wider sympathies, by your deep understanding of human nature, and by your keen sense of the nobler duties of man, you will endear yourself to your fellow countrymen as you have endeared yourself to a body of British medical students, who welcomed you as an alien, who loved you as a man and who will ever think of you as deserving of the grand old name of gentleman."

পিতৃদেব ১৯০১ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে একটি পদের জন্য চেষ্টা করেন। তৎকালীন বাংলার লাট স্যর জন উডবার্ণের (Sir John Woodburn) সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন। লাট তখন দার্জিলিং-এ অধিবাস করিতেছিলেন। লাট সাহেবের

ইচ্ছায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পিতৃদেবের জন্য একটি নূতন শারীরবিজ্ঞান বিভাগ স্থাপন করা হইল। লাট সাহেব পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন—"তোমাকে সামান্য বেতনে প্রবেশ করিতে হইল তার জন্য আমি দুঃখিত, তবে আশা করি পরে তোমাকে ভাল চাকুরী দিতে পারিব।"

এই সময়ে পিতৃদেব কয়েক দিন দার্জিলিং-এ অবস্থান করেন। দার্জিলিং-এ অবস্থান কালে তাঁহার সহিত করুণাচন্দ্র সেনের (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) পুনরায় বিশেষভাবে পরিচয় হয়। ইহার পূর্বে করুণাচন্দ্রের সহিত পিতৃদেবের একবার পরিচয় হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই করুণাচন্দ্রের ভগিনী ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা মণিকা দেবীর সহিত পিতৃদেবের বিবাহের প্রস্তাব হয়। সেই সময়ে মণিকা দেবীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী বিলাতে ছিলেন বলিয়া বিবাহ স্থগিত রাখা হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে পিতৃদেব পুনরায় দার্জিলিং গমন করেন। লাট সাহেব স্যর জন উডবার্ণ বিবাহের কথা শুনিয়া মণিকা দেবীকে বলেন—"আপনি একজন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বিবাহ করিতেছেন" (You are going to marry a distinguished person)। এই বৎসরে ডিসেম্বর মাসে পিতৃদেবের বিবাহ হয়। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের ৩০ বৎসর পরে তাঁহার গৃহ কমল কুটীরে বহু সমারোহে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর ২৫ বৎসর কাল পিতৃদেব পিতামহের গৃহে (২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট) বাস করেন এবং ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবনির্মিত গৃহে (৯০ পার্ক ষ্ট্রীট) গমন করেন। তদবধি তিনি সেই স্থানেই বাস করিতেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকের কাজে নিযুক্ত থাকাকালীন বহু ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত পিতৃদেবের বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল হর্নেল (Principal Hornell), অধ্যাপক কানিংহাম (Professor Cunningham), অধ্যাপক হ্যারিসন (Professor Harrison), অধ্যাপক পীক্ (Professor C. W. Peake) এবং অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Professor W. C. Wordsworth)। অধ্যাপক কানিংহাম পিতৃদেবকে আজীবন স্নেহ করিয়াছেন। বিলাতে তাঁহারই পিতার গৃহে পিতৃদেব সপরিবারে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরিবর্তন বা উন্নতি-সাধনে এই অধ্যাপকগণ সর্বদা পিতৃদেবের পরামর্শ লইতেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরী (Baker Laboratory) প্রতিষ্ঠার সময়ে অধ্যাপক পীক, অধ্যাপক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং পিতৃদেব এই তিনজন মিলিত হইয়া উহার নক্সা করেন। প্রথমে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের (Botany) ও শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) বিভাগ দুইটি এক স্থানে ছিল। তখন হইতেই পিতৃদেবের বিশেষ আকাঙ্খা ছিল যে, শারীরবিজ্ঞানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও শ্রমসাধন করেন। ভারতবর্ষে তখন কোন কলেজে (মেডিক্যাল কলেজ ব্যতীত) শারীরবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিবার ব্যবস্থা ছিল না। পিতৃদেবই সর্বপ্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে স্বতন্ত্র শারীরবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃদেব প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করিবার সময়ে লাটসাহেব, বহু বিজ্ঞানবিদ্ মনীষিগণ ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই শারীরবিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। পিতৃদেব ২১ বৎসর কাল প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডারউইন শতবার্ষিকী উৎসবে (Darwin Centenery Celebrations) যোগদান করিবার আমন্ত্রণ পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-

স্বরূপ পিতৃদেব সপরিবারে পুনরায় বিলাত গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ করিয়া সেখানকার বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলীর নিকট সমাদৃত হন। রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার জন্ম পিতৃদেব ও মাতৃদেবী উভয়েই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর পিতৃদেব ১৫ বৎসর কাল কার মাইকেল কলেজে (অধুনা আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। পিতৃদেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত বহু বৎসর কাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯১৬ হইতে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর বিভাগের অধ্যক্ষ এবং বোর্ড অব হায়ার স্টাডিজ ইন ফিজিওলজির (Board of Higher Studies in Physiology) সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯০৭ হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন। ইহা ব্যতীত তিনি ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৩৭ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বোটানিক্যাল সোসাইটি অব বেঙ্গলেরও সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের (Indian Science Congress) শারীরতত্ত্ব বিভাগে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই পিতৃদেব বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিবার এক অনন্যসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সরল ভাষায় বিজ্ঞানের গূঢ় তত্ত্ব বুঝাইতে পারিতেন এবং লোকমুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার সকল বক্তৃতাই অত্যন্ত উপভোগ্য হইত। তাঁহার মিউজিক অব দি হার্ট (Music of the Heart) শীর্ষক বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এমন প্রাঞ্জল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়ে এরূপ বক্তৃতা আর কখনও শুনেন নাই। এই বক্তৃতাটি প্রবন্ধাকারে নিউ ইণ্ডিয়া নামক সাময়িক পত্রে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"If you apply ear to the front of a person's chest, rather to the left of the middle line you will distinctly hear what I have called the 'Music of the Heart'. As the living pump works steadily, with each stroke you are told—

'No rest that throbbing slave may ask

For ever quivering over his task.'

It is the audible sign of the life of the heart, yea, it is the music of the very citadel of life.

* * * And all this work is done merrily—singing *lubb dup—lubb dup* all the while.

Blessed is the mortal whose heart continues to beat within the chest tuned to the proper music while he works through his alloted span of life for God, Humanity and the Fatherland."

বাংলার বহু খ্যাতনামা মনীষিগণ, যথা—স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় পিতৃদেবকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। পিতৃদেব অল্প বয়সে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের

যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। অপর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। ঐ সময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহাদের খুব উৎসাহ দিতেন এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রায়ই সেখানে বক্তৃতা দিতেন।

স্ত্রীশিক্ষা এবং সমাজ-সেবায় পিতৃদেব বহু বৎসর আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বেথুন কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসন ও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউসনে নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। তিনি প্রায়ই লরেটো কনভেন্ট স্কুল (Loreto Convent School) পরিদর্শন করিতে যাইতেন এবং সেখানকার পরীক্ষক ছিলেন।

কলিকাতায় বারানসী ঘোষ স্ট্রীটে তিনি মহিলাদিগের জন্য একটি হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজহস্তে সেই গৃহ সুসজ্জিত করেন। বহু খ্যাতনামা লোক ও বিদুষী মহিলাগণ এই প্রতিষ্ঠানে আসিয়া ইহা পরিদর্শন করিয়াছেন ও বক্তৃতা দিয়াছেন। মহারাণী সুনীতি দেবী, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, মিস্ ব্রক, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেকেই এখানে আসিয়াছেন।

পিতৃদেব কয়েক বৎসর আগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—"কয়েক বৎসর আগে একদিন চিঠি পেলাম—আমাকে ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি করা হয়েছে। আশ্চর্য হলাম। মণিকা দেবী ভরসা দিয়ে বললেন—এ বিধাতার ইচ্ছা—তুমি দ্বিধা কোর না। সে দিন থেকে নববিধান ও সাধারণের মধ্যে মিলনক্ষেত্র প্রস্তুতের ব্রত নিলাম।"

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ দূরীকরণে যাঁহারা যত্নবান হয়েছেন, পিতৃদেব ছিলেন তাঁহাদের অগ্রণী। তিনি যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন, মাঘোৎসবের সময়ে একবার মহিলা উৎসবের দিন উপাসনা করিবার জন্য মহিলাগণ মণিকা দেবীর ভগিনী ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীকে মনোনীত করেন। ইহাতে সাধারণ সমাজের প্রায় ৩০।৪০ জন সভ্য আপত্তি জানাইয়া সভাপতিকে চিঠি লেখেন, কিন্তু পিতৃদেবের ব্যক্তিত্ব ও উদার মনোভাবের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছিল। সুচারু দেবী উপাসনা করেন এবং সেই হৃদয়গ্রাহী উপাসনা শুনিয়া সকলে বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। এইভাবে দুই সমাজের মধ্যে মিলনের সেতু রচিত হয়।

পিতৃদেব বালক, বালিকা এবং শিশুদিগেরও বন্ধু ছিলেন। মাঘোৎসবের সময়ে বালক-বালিকা সম্মিলনের দিন তিনি বহুবার তাহাদের গল্প বলিয়াছেন। বালক-বালিকাগণ তাঁহার অমৃতময় বাণী শুনিয়া পরম আনন্দলাভ করিয়াছে।

১৯৪২ সালে, সুদীর্ঘ কর্মক্লান্ত জীবনের অবসর গ্রহণক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবিজ্ঞানের অধ্যাপকগণ (যাঁহারা সকলেই পিতৃদেবের অনুরক্ত প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন) তাঁহাকে একটি বিদায়-সম্ভাষণ দেন।

বিদায়-সম্ভাষণ পত্রে তাঁহারা যাহা লিখিয়াছিলেন, সেই কথাতেই আজ পিতৃদেবের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি—

"হে জ্ঞানি,

প্রতীচ্যের জ্ঞানালোক আহরণ করে যশের গৌরব-মুকুট শিরে যাঁরা ভারত-জননীর মুখোজ্জ্বল করেছিলেন, তাঁদের তুমি একজন।

হে গুণি,

যাঁরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ভাল যাহা কিছু সুদীর্ঘকাল কর্মবহুল জীবনের মধ্যে অবিমিশ্রভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তুমি তাঁদের অন্যতম।

হে আচার্য,

বিজ্ঞানের প্রদীপ যাঁরা বাংলার তথা ভারতের ঘরে ঘরে একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থভাবে

বিতরণ করেছেন, তুমি তাঁদের অগ্রগণ্য।

হে আদর্শ পুরুষ,

শত শত ঘাত-প্রতিঘাতেও যাঁরা কখনও জীবনের মহান আদর্শ হতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই, তুমি তাঁদের শ্রেষ্ঠ।

আজ সার্থক সুদীর্ঘ কর্মক্লান্ত জীবনের অবসর গ্রহণের ক্ষণে তোমার পুত্রতুল্য ছাত্রদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত গ্রহণ কর। বিধাতার আশীর্বাদে তোমার জীবন শতায়ু হউক এবং তোমার অবসর-ক্ষণ স্নিগ্ধ ও শান্তিময় হউক।"

পিতৃদেব অমরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করি। তিনি কর্মবহুল জীবনের যে মহান আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তাহা স্মরণ করি এবং জীবনে প্রতি-পালন করিতে পারি, ইহাই বিশ্বপিতার চরণে বিনীত প্রার্থনা।

ব্রহ্মাণ্ড

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ

অ্যাণ্ড্রোমিডা বা উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রপুঞ্জে একটি নীহারিকা দেখা যায়। খালি চোখে দৃষ্ট অপর অনেক নীহারিকার মত এটিকেও ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের অন্তর্গত একটি গ্যাসীয় মেঘলোক মনে করা হতো। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এক-শ' ইঞ্চি দূরবীনে এর প্রকৃত পরিচয় ধরা পড়েছে। ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের সীমানা পেরিয়ে এই নীহারিকাটি অসংখ্য নক্ষত্র সমাকীর্ণ অপর এক দ্বীপ-জগৎ। অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ ভেদ করে বহু দূরে এর অবস্থান। দূরত্বের দরুণই একে ঐ নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এক মেঘলোকের ন্যায় দেখায়। আমেরিকার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী নীহারিকা-বিশেষজ্ঞ ডক্টর ই. পি হাবল শুধু অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকাই নয়, মহাশূন্যে ১০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে ও পরে ২০০ ইঞ্চি দূরবীনের সাহায্যে কোটি কোটি নক্ষত্র-লোকের সন্ধান পেয়েছেন—যেগুলির প্রত্যেকেই আমাদের ছায়াপথ বিশ্বের মত এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ দ্বীপ-জগৎ বা বিশ্ব অর্থাৎ গ্যালাক্সী (Island Universe or Galaxy)।

ব্রহ্মাণ্ড বলতে বোঝায় অসংখ্য গ্যালাক্সী সমন্বিত আমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্য সমস্ত ব্যাপ্তিকে; অর্থাৎ এমন কিছু নেই, যা ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। ডক্টর হাবলের গবেষণার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের যে রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সংক্ষেপে এই ভাবে বলা যায়—বহু কোটি দ্বীপ-জগৎ ব্রহ্মাণ্ডময় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে চলেছে এবং সে কারণে ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে।

কাগজের কতকগুলি ছোট ছোট চাকৃতি কেটে রবারের বেলুনের গায়ে এঁটে দিয়ে যদি বেলুনটাকে ফোলানো যায়, তাহলে দেখা যাবে চাকৃতিগুলি পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। বেলুনটাকে যত ফোলানো যাবে, চাকৃতিগুলি ক্রমান্বয়ে তত পরস্পরের দূরবর্তী হবে। কোনও একটা চাকৃতির উপর যদি একটা মাছি বসে থাকে তবে সে দেখবে—চারদিকের আর সব চাকৃতি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

এবং যে চাকৃতি যত দূরে, তার গতিবেগ তত বেশী।

প্রতিটি কাগজের চাকৃতির উপর যদি কয়েকটা করে কালির বিন্দু দেওয়া থাকে, তাহলে বেলুন ফোলালে কালির বিন্দুগুলির কোনও নড়চড় হয় না —শুধু এক চাকৃতির বিন্দুসমষ্টি অন্য চাকৃতির বিন্দু-সমষ্টি থেকে দূরে সরে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থাও অনুরূপ। প্রতিটি কালির বিন্দু যেন এক একটি দ্বীপ-জগৎ বা গ্যালাক্সী। কতকগুলি করে দ্বীপ-জগৎ কালির বিন্দুর মত সমষ্টিবদ্ধ হয়ে আছে। তাদের আমরা দ্বীপপুঞ্জ (Cluster of Galaxies) বলবো; অর্থাৎ প্রতিটি চাকৃতি এক একটি দ্বীপপুঞ্জ।

ব্রহ্মাণ্ড এক বিরাট বুদ্বুদের মত প্রসারিত হয়ে যাচ্ছে। তার ফলে দ্বীপপুঞ্জগুলি কাগজের চাকৃতির মত একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু যে কোন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী আমরা হই না কেন—আমাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যে, আমরাই যেন কেন্দ্রে আছি, অন্যগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে পালাচ্ছে এবং যে দ্বীপপুঞ্জ যত দূরে তার গতিবেগ তত দ্রুত। কিন্তু কাগজের চাকৃতি যেমন আয়তনে বাড়ে নি, দ্বীপপুঞ্জগুলিও তেমনি আয়তনে বাড়ছে না, শুধু তাদের মধ্যেকার পারস্পরিক দূরত্ব বাড়ছে —তাদের অন্তর্বর্তী স্থানের ব্যবধান বাড়ছে।

বলে রাখা ভাল, উপরের উপমাটায় ত্রুটি রয়ে গেছে। বেলুনের গায়ে চাকৃতি বসানো হয়েছে, বেলুনের মধ্যে আছে হাওয়া। এই হাওয়ার ভিতরে ফাঁকা জায়গায় সর্বত্র ঐ রকম চাকৃতি আছে, কল্পনা করতে হবে। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডেই ঐরূপ পুঞ্জ পুঞ্জ দ্বীপ-জগৎ যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে—কোন সমতলে বা গোলকের পৃষ্ঠে তাদের অবস্থান নয়।

দ্বীপপুঞ্জগুলির আয়তন বাড়ছে না, কিন্তু পুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ-জগৎগুলিও স্থাণু হয়ে বসে নেই। তারা প্রত্যেকেই আপন আপন মেরু অবলম্বনে আবর্তন করছে, নিজেদের মধ্যে কেউ কারও কাছে আসছে, কেউ বা দূরে সরে যাচ্ছে—সৌরজগতের সীমানার মধ্যে থেকেই গ্রহ-উপগ্রহগুলি যেমন স্থান পরিবর্তন করে।

ছায়াপথ দ্বীপ-জগতের দুটি উপজগৎ আছে, তারাও দুটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রলোক বা গ্যালাক্সী বিশেষ। এদের নাম মেগালানীয় মেঘমালা (Magallanic clouds)। এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ছায়াপথ বিশ্বকে প্রদক্ষিণ করে। পূর্বেই বলা হয়েছে, অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্র-মণ্ডলে দৃষ্ট বিখ্যাত নীহারিকাটি প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বীপ-জগৎ—ছায়াপথ দ্বীপ-জগৎ থেকে চৌদ্দ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন এম-৩১ (M 31)। অ্যাণ্ড্রোমিডা দ্বীপ-জগতেরও দুটি উপজগৎ আছে, যারা গ্যালাক্সী হলেও আয়তনে ক্ষুদ্রতর এবং অ্যাণ্ড্রো-মিডার চারদিকে প্রদক্ষিণ করে। এই ক্ষুদ্র গ্যালাক্সী দুটির পরিচিতি এম-৩২ (M 32) এবং এন. জি. সি-২০৫ (N. G. C 205)। দুটি উপজগৎ সমেত ছায়াপথ গ্যালাক্সী, দুটি উপজগৎ সমেত অ্যাণ্ড্রোমিডা গ্যালাক্সী এবং আরও ১৭টি—মোট ১৯টি দ্বীপ-জগৎ নিয়ে আমাদের এই স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত। এদের প্রত্যেকেরই অক্ষ অবলম্বনে আবর্তন আছে, অন্যান্য গতি আছে, কিন্তু মহাকর্ষের টানে এক পরিবারভুক্ত—কেউই অন্যদের প্রভাব মুক্ত হয়ে দূরে সরে যেতে পারে না—যেমন পারে না গ্রহ-উপগ্রহগুলি সৌর-জগৎ ছেড়ে পালাতে।

ব্রহ্মাণ্ডের অপরাপর গ্যালাক্সীগুলিও ঐরূপ কতকগুলি করে এক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে এক একটি পুঞ্জ রচনা করে রয়েছে। তবে পুঞ্জের দ্বীপ-জগৎ-গুলি চাকৃতির কালির বিন্দুর মত এক সমতলে অবস্থিত নয় এবং তারা বেলুনের মত কোন গোলকের পৃষ্ঠদেশ অধিকার করে নেই, মহাশূন্যে তারা সর্বত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত।

এই সকল দ্বীপপুঞ্জের বিস্তার বাড়ছে না, কিন্তু পুঞ্জগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এই ভাবে গ্যালাক্সীগুলির পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির গতিবেগকে তাদের অপসরণ বেগ (Recession velocity) বলা হয়। ডপ্‌লার তত্ত্ব অনুযায়ী বর্ণালীতে লালের অপসরণ থেকে নির্ধারণ করা যায়, গ্যালাক্সীর গতি কোন্ দিকে অর্থাৎ এগিয়ে আসছে, না পিছিয়ে যাচ্ছে এবং এই গতিবেগের পরিমাণ কত। এই পদ্ধতিতেই দেখা গেছে, দুই গ্যালাক্সীর ব্যবধান যদি ১০ কোটি হবে। বর্ণালীতে লালের অপসরণ হিসেব করে উল্লিখিত তথ্যের উদ্ভব। এজন্যে তথ্যটিকে হাবলের লাল-অপসরণ সূত্র বলা হয়। হাবলের সূত্রে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও কিনারা অর্থাৎ প্রান্তীয় সীমা কল্পিত হয় নি, কাজেই কোনও গ্যালাক্সীরই কোন অবস্থান-বৈশিষ্ট্য নেই এবং প্রতিটি গ্যালাক্সীর আবাসিকই নিজেদের অবস্থানকে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র মনে করতে পারে।

ধরা যাক ক খ গ ঘ সারবন্দী ৪টি গ্যালাক্সী আছে। পর পর তাদের একে অন্যের মধ্যে দূরত্ব
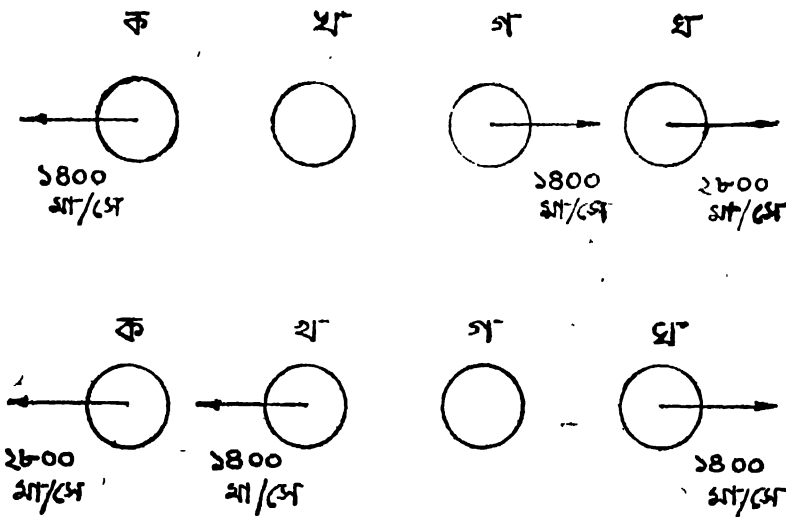
১নং চিত্র
দ্বীপ-জগতের অপসরণ বেগ।

আলোক-বর্ষ হয়, তবে একটি অপরটি থেকে প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল দূরে সরে যাচ্ছে।

১৯২৯ সালে দুই জ্যোতির্বিদ হাবল এবং হুমাসন একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তাঁরা দেখলেন, যে কোন গ্যালাক্সী থেকেই অপর গ্যালাক্সীগুলির দূরত্ব এবং তাদের অপসরণ বেগ সমানুপাতিক; অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে প্রথম গ্যালাক্সীর দূরত্ব যত, দ্বিতীয় গ্যালাক্সীর দূরত্ব যদি তার দ্বিগুণ হয়, তবে এই দ্বিতীয় গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগও দ্বিগুণ ১০ কোটি আলোক-বর্ষ (১নং চিত্র)। আমরা যদি খ গ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা দেখবো, প্রতি সেকেণ্ডে ক ১৪০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে, গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেণ্ড ২৮০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে। আমরা যদি গ গ্যালাক্সীতে থাকি, তবে আমরা দেখবো খ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে, ক প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল বাঁ-দিকে সরে যাচ্ছে এবং ঘ প্রতি সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল ডানদিকে যাচ্ছে। আমাদের কাছ থেকে প্রতি

সেকেণ্ডে ১৪০০ মাইল বেগে ১০ কোটি আলোক-বর্ষ পথ যেতে প্রথম গ্যালাক্সীর লেগেছে ১৩০০ কোটি বছর। প্রতি সেকেণ্ডে ২৮০০ মাইল বেগে আমাদের কাছ থেকে ঐ দূরত্বে যেতে দ্বিতীয় গ্যালাক্সীরও লেগেছে ১৩০০ কোটি বছর। সুতরাং গ্যালাক্সীগুলির গতিবেগ যদি ঠিক ঐ প্রকারই বরাবর থাকে, তাহলে ১৩০০ কোটি বছর পূর্বে তারা সব একত্র সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং তার পর বিভিন্ন বেগে চলতে আরম্ভ করে তাদের অন্তর্বর্তী দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে

দূরস্থিত গ্যালাক্সীগুলির অপসরণ বেগ ক্রমান্বয়ে বেশী। এযাবৎ দুরবীনের দৃষ্টিসীমার মধ্যে যেগুলি অবস্থিত, তাদের গতিবেগ হিসেব করে সর্বোচ্চ অপসরণ বেগ পাওয়া গেছে, আলোর গতির ৪০ শতাংশ অর্থাৎ সেই দূরস্থিত গ্যালাক্সীটি প্রতি সেকেণ্ডে ৭০ হাজার মাইলেরও বেশী সরে যাচ্ছে। সুতরাং দুরবীনের দৃষ্টি বহির্ভূত এমন গ্যালাক্সী থাকা সম্ভব, যার অপসরণ বেগ আলোর গতির সমান হবে অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল হবে। হাবলের সূত্রে জানা যায়, আমাদের কাছ থেকে বা পৃথিবী থেকে ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে যে গ্যালাক্সী অবস্থিত, তার অপসরণ বেগ আলোর গতির সমান। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন কিছুরই গতিবেগ আলোর গতির চেয়ে বেশী হতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ অপেক্ষা দূরস্থিত গ্যালাক্সীর অপসরণ বেগ যদি আলোর গতির সমানও হয়, তথাপি তার আলোকরশ্মি কোন দিনই পৃথিবীর নাগাল পাবে না। সুতরাং পৃথিবীর দৃষ্টিসীমা ঐ ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর পর্যন্ত। বর্তমানে দৃষ্টি-সহায়ক যন্ত্রপাতির দ্বারা পৃথিবী থেকে ন্যূনাধিক ২০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর পর্যন্ত দেখা যায়। ভবিষ্যৎ উন্নতিতে ঐ সকল যন্ত্রপাতি যত শক্তিশালীই হোক, ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ অপেক্ষা দূরস্থিত সমস্ত কিছুই তার অদৃশ্য থেকে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে দৃষ্টিসীমা ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তার বেশী হতে পারে না। অথবা বলা যায়, পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাসার্ধ ১৩০০ কোটি আলোক-বর্ষের দূরত্বের সমান।

যে জ্যোতিষ্কের আলো আমরা ১০০ কোটি আলোক-বর্ষ দূর থেকে পাচ্ছি, সে আলোকরশ্মি বস্তুতঃ ১০০ কোটি বছর পূর্বে আমাদের দিকে রওনা হয়েছিল—এতদিনে আমরা তার পৌঁছ-খবর পেলাম। এই সময়ের মধ্যে যদি সেই জ্যোতিষ্ক লয়ও পেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রলয় কাল পর্যন্ত দিনের পর দিন যত রশ্মি বিকিরণ করেছে, আমরা দিনের পর দিন তা পেতেই থাকবো। তারপর যে দিন তার রশ্মি প্রেরণ বন্ধ হয়ে যাবে তার ১০০ কোটি বছর পরে আমরা জানতে পারবো জ্যোতিষ্কটির মৃত্যু ঘটেছে। এই মুহূর্তে যদি আমরা পঞ্চাশ হাজার আলোক-বর্ষ দূরস্থিত কোনও জ্যোতিষ্কে উপস্থিত থাকতাম এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তির যদি তেমন ক্ষমতা থাকতো, তাহলে স্বচক্ষেই আমরা দেখতে পেতাম পৃথিবীতে বনমানুষ থেকে মানুষের ক্রমবিকাশের ধারা।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে দুইটি সমধিক প্রচলিত। একটির নাম প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (Big Bang) মতবাদ, অন্যটির নাম সদা-সমাবস্থা (Steady state) মতবাদ। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে কোনও এক অতীতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল এবং তারপর থেকে তার ক্রমবিবর্তন চলছে। সদা-সমাবস্থা মতবাদে আভ্যন্তরীণ নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও ব্রহ্মাণ্ডের সার্বিক অবস্থা চিরকাল একই রূপ থেকে যাচ্ছে। উভয় মতের সমর্থক বিজ্ঞানীরা আপন আপন

মতবাদের স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার অবতারণা করেছেন।

১৯২০ সালে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী জি. ই. লেমেটারের কল্পিত সৃষ্টিরহস্য এই যে, এক আদিম কণিকা (Primeval atom) থেকে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। জর্জ গ্যামো প্রমুখ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই মতেরই অনুবর্তন করে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ (Big Bang) মতবাদের প্রবর্তন করেন।

ব্রহ্মাণ্ডের বর্তমান নৈসর্গিক রীতিনীতির পরিবর্তন না ঘটে থাকলে সুদূর অতীতে এমন একদিন ছিল, যখন গ্যালাক্সী ও গ্যালাক্সীপুঞ্জ সকলে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে ছিল। তারও পূর্বে তাদের আর কোন পৃথক সত্ত্বা ছিল না, তারা সব একত্র সন্নিবিষ্ট ছিল। ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হচ্ছে বলেই অতীতে তার সঙ্কুচিত অবস্থা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু কেমন সেই সঙ্কোচন? গ্যামো প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেন, সঠিক কোনও ইতিবৃত্ত দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু অনুমান করতে দ্বিধা নেই যে, সেই জমাট পিণ্ডের ঘনত্ব ছিল মানুষের কল্পনার অতীত, সঙ্কোচন হেতু তার তাপমাত্রাও দাঁড়িয়েছিল অকল্পনীয়—ভয়াবহ। জমাট পিণ্ডটির সম্ভাব্য ঘনত্ব ছিল জলের তুলনায় এক শত কোটি গুণ বেশী, অর্থাৎ এক ঘনসেন্টিমিটারের ওজন হবে দশ কোটি টন। কালির পরিবর্তে ঝরণা কলমে ঐ বস্তু ভরে নিলে কলমটির ওজন দাঁড়াবে কম করেও কুড়ি কোটি টন। বর্তমানের দুই শত ইঞ্চির দূরবীনের দৃষ্টির অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্রাদি যাবতীয় বস্তুকে ঐ ঘনত্বে নিয়ে এলে যে স্থান অধিকার করবে, তার আয়তন ত্রিশটি সূর্যকে একত্রে জড়ো করে রাখলে যে আয়তন হবে তার সমান। এই ঘনত্বে ও তাপে কোন পদার্থেরই স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না, তারা ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। যে কোন পদার্থ ভাঙলেই তার শেষ বিভাগ দাঁড়ায় প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রনে। বিভক্ত এই জমাট মিশ্রণকে ঐ বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন ইলেম (Ylem)। ইলেমই ব্রহ্মাণ্ডের আদি পিণ্ড।

ঘনত্বেরও একটা সীমা আছে। আদি পিণ্ড সেই সীমায় পৌঁছালেই প্রতিক্রিয়ার ফলে হলো এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে সুতীব্র বেগে সুরু হলো প্রসারণ। প্রসারণের ফলে ইলেমের তাপ দ্রুত কমতে আরম্ভ করলো এবং ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের অর্থাৎ মৌলিক শক্তিকণাগুলির পক্ষে সম্ভব হলো বিবিধ সংগঠনে একে অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পরমাণুর সৃষ্টি করা। বিস্ফোরণ থেকে আরম্ভ করে পরমাণুর সৃষ্টি পর্যন্ত হয়তো মাত্র ঘণ্টাখানেক সময় অতিক্রান্ত হয়েছিল। পরমাণুর দ্বারা গঠিত গ্যাস ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, ফলে তার ঘনত্ব কমতে আরম্ভ করলো, পূর্বতন শত কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাও ক্রমে কমে এল। প্রথম তিন কোটি বছর এই ভাবেই চললো। গ্যাস বিরল থেকে বিরলতর হয়ে চতুর্দিকে প্রসারিত হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে শূন্য ডিগ্রীর দিকে নেমে আসছিল।

এই সময়ে ব্রহ্মাণ্ড রইলো ঘন অন্ধকারে নিমগ্ন। তারপর বিরল গ্যাসের সমষ্টিবদ্ধ হয়ে দ্বীপ-জগৎ ও নক্ষত্রাদি সৃষ্টির পালা। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ কোন সময়েই থেমে থাকে নি। বিস্ফোরণের পর গ্যাসীয় মেঘের বস্তুকণাসমূহ যেমন যেমন গতি-বেগ পেয়েছিল, সেই গতিবেগ নিয়ে কিংবা মহাকর্ষের লব্ধিতে সৃষ্ট পরিবর্তিত গতিবেগ নিয়ে আজও তারা বহির্মুখে ছুটে চলেছে এবং চলবার পথেই তাদের সংহতি থেকে ক্রমাগত সৃষ্ট হয়ে চলেছে দ্বীপ-জগৎ ও নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক।

মহাগুরু, মহাতপ্ত ও মহোজ্জ্বল একটি আদি পিণ্ড ও তার বিস্ফোরণের সমর্থনে জর্জ গ্যামো, উইৎসেকার প্রমুখ প্রখ্যাত বিজ্ঞানীরা নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য ও যুক্তি দেখিয়েছেন। আদি পিণ্ড

বা ইলেমের বিস্ফোরণ হেতু ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে—এই প্রকার অনুমান-নির্ভর বলে এই মতবাদকে Big Bang বা Big Squeeze বলা হয়। কিন্তু স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, ইলেমের আগে কি ছিল? প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে জর্জ গ্যামো সরস করে লিখেছেন—সেন্ট অগষ্টাইনের মনেও প্রশ্ন জেগেছিল—ভগবান তো স্বর্গ সৃষ্টি করলেন, পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তার আগে তিনি কি করছিলেন?

ঐ বিস্ফোরণের পর ক্রম-নিম্নগ চাপ ও তাপ মাত্রায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে অবস্থায় যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনই বিভিন্ন সংশ্লেষণে যুক্ত হয়ে ইলেমের শক্তিকণাসমূহ সর্ববিধ মৌলিক পদার্থের পরমাণু সৃষ্টি করলো। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ভারী মৌলিক পদার্থের উদ্ভব হতে অপরিসীম চাপ ও তাপের দরকার। অতএব সর্বপ্রথম ঐ সকল ভারী মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হলো। তারপর অতি দ্রুত পর্যায়ে অন্য সব অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণ মতবাদে এই ভাবেই সুদূরের কোন এক অতীতে ব্রহ্মাণ্ডের সূচনা হয়েছিল।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সম্পর্কে অপর অনুমানটি সদা-সমাবস্থা (Steady State) মতবাদ নামে আখ্যাত। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল, টি. গোল্ড ও এইচ. বণ্ডি এই মতবাদের স্রষ্টা। কোন আদি পিণ্ডের বিস্ফোরণের ফলে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সূত্রপাত—একথা এই বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। এঁরা বলেন, প্রসারণ সত্ত্বেও সার্বিক বিন্যাসে ব্রহ্মাণ্ড চিরকাল সমাবস্থায় আছে।

ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ হেতু দ্বীপ-জগৎসমূহের অন্তর্বর্তী দূরত্ব বাড়ছে। এখন থেকে কয়েক লক্ষ বছর পরে আমরা যদি আবার পৃথিবীতে এসে একই শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে ফটোগ্রাফ নিই, তাহলে সেই আলোকচিত্রে এখনকার অপেক্ষা অনেক কম দ্বীপ-জগতের ছবি ধরা পড়বার কথা। এমনটি যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে যে, কতকগুলি গ্যালাক্সী ইতিমধ্যে দূরে সরে গেছে, তাদের স্থান আর পূর্ণ হয় নি। সমাবস্থা-বাদী বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নতুন দ্বীপ-জগতের সৃষ্টি অবিরাম চলছে এবং অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে যে কোন সময়েই সেই শক্তিশালী দূরবীনের গৃহীত আলোকচিত্রে প্রায় সমসংখ্যক দ্বীপ-জগতের ছবিই ধরা পড়বে।

তাহলে মানতে হয় যে, গ্যালাক্সীগুলি দূরে সরে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের সাম্য রক্ষিত হয় সমহারে নতুন গ্যালাক্সীর সৃষ্টির দ্বারা। এই মতবাদই সদা-সমাবস্থা। প্রক্রিয়াটিকে ভাষান্তরে অবিরাম সৃষ্টি (Continuous Creation) মতবাদও বলা হয়।

এই মতের প্রধান প্রবক্তা বৃটিশ বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েল। তিনি বলেন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের গড় ঘনত্ব চিরকাল একই রয়ে যাচ্ছে। এই গড় ঘনত্ব অতীতে যা ছিল, বর্তমানে তাই আছে, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। প্রসারণ হেতু ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি বাড়লে ঘনত্ব যতটা কমে, পরিপূরক নতুন পদার্থের সৃষ্টির দ্বারা ঘনত্ব আবার সেই পূর্বেকার অবস্থায় ফিরে আসে। এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডের গড় ঘনত্ব আবহমানকাল একই থেকে যাচ্ছে। সৃষ্ট নতুন পদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয় নতুন গ্যালাক্সী ও তার মধ্যে নতুন নক্ষত্র। এই মতবাদে ব্রহ্মাণ্ডের আরম্ভ নেই, শেষও নেই —ব্রহ্মাণ্ড অনাদি অনন্ত।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই পরিপূরক নতুন পদার্থ আসে কোথা থেকে? এর উত্তর নিশ্চয়ই শূন্য থেকে। কিছু নেই থেকে কিছুর জন্ম! এর সমাধান করতে গিয়ে ঐ বিজ্ঞানীরা যে কল্পনার

আশ্রয় নিয়েছেন, তার ভিত্তিও কল্পনাশ্রয়ী। এখানেই এই মতবাদের একটি প্রধান দুর্বলতা।

এদিকে বেতার-জ্যোতিষের আবিষ্ক্রিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। ১৯৬৩-৬৫ সালের মধ্যে কতকগুলি আশ্চর্য বেতার-উৎসের সন্ধান পাওয়া গেল। আলোকচিত্রে দেখা যায়, এরা আয়তনে এক একটা সাধারণ নক্ষত্রের সমতুল্য অথচ একটা সম্পূর্ণ গ্যালাক্সী থেকে যে পরিমাণ বেতার-রশ্মি বিকিরিত হয়, এদের প্রত্যেকের বেতার-শক্তি অন্ততঃ ততটাই বিরাট। এদের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াসার। Quasi Stellar Radio Sources শব্দগুলিকে সংক্ষেপ করে Quaser শব্দটির উৎপত্তি।

এলেন স্যাণ্ডেজ, মার্টিন স্মিথ প্রমুখ বিজ্ঞানী-দের গবেষণায় জানা গেছে, কোয়াসারের অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে অন্য কোনও জ্যোতিষ্কের তুলনাই চলে না। এদের কোন কোনটার একক দেহে প্রায় একশত গ্যালাক্সীর দীপ্তি বর্তমান। এদের বিকিরণে অতিবেগুনী রশ্মির প্রাচুর্য, আর সেই সঙ্গে আছে অতি শক্তিশালী বেতার-তরঙ্গ। এদের বর্ণালীর সঙ্গে অপর কোন জ্ঞাত নক্ষত্র, নোভা, অতিনোভা, নীহারিকা অথবা দ্বীপ-জগতের বর্ণালীর মিল নেই। এত উজ্জ্বল বলেই এরা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্র বলে ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বৃহত্তম দূরবীনের স্বাভাবিক দৃষ্টিসীমা পেরিয়ে আরও বহুদূরে এদের অবস্থান।

কোয়াসারের দেহ থেকে বিকিরিত তেজের প্রকৃতি, তার দূরত্ব, তার শক্তিমত্তা প্রভৃতি পর্যালোচনা করে ফ্রেড হয়েল দেখলেন, এই অত্যাশ্চর্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে সমাবস্থা মতবাদের সামঞ্জস্য ঘটানো যায় না। তাই ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে ফ্রেড হয়েল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে তাঁর স্বরচিত ও কুড়ি বছর যাবৎ সমর্থিত সদা-সমাবস্থা মতবাদ প্রত্যাহার করেছেন।

ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ

ব্রহ্মাণ্ড সসীম কি অসীম—এই ভাবনা সর্বদেশের সর্বকালের চিন্তানায়কদের, কিন্তু আজও এর কোন প্রশ্নাতীত মীমাংসা হয় নি। মহাকর্ষ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মহামতি আইনস্টাইন অনুমান করেছিলেন 'দেশের বক্রতা' (Curvature of Space)। এই তথ্যকে ভিত্তি করেই অনেক মনীষী বলেছেন—"ব্রহ্মাণ্ড পরিমিত অথচ সীমাহীন" (Finite but Unbounded)। 'দেশের বক্রতা' বলতে কি বোঝায় তার কোন সুস্পষ্ট ধারণা কারও আছে কি না, সে বিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাও সন্দেহ প্রকাশ করেন। আবার 'পরিমিত অথচ অসীম' এই পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন শব্দদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ মানসচক্ষে আনা দুরূহ। এক্ষেত্রে ভূগোলকের একটা অনুরূপ দৃষ্টান্ত ঐ ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা আনতে সহায়ক হতে পারে; যেমন—পৃথিবীর বঙ্কিম উপরিভাগের আয়তন পরিমিত কিন্তু সীমাহীন। ভূপৃষ্ঠের আয়তনের বিস্তৃতি পরিমাপ করা যায়, কিন্তু তার উপর যতই ঘোরা যাক, তার সীমানা পাওয়া যাবে না। ভূপৃষ্ঠের আয়তনের কোন কেন্দ্রবিন্দু নেই, কোন প্রান্তও নেই। গোলকের পৃষ্ঠে যে কোন স্থানে দাঁড়িয়েই চতুর্দিকে একই দৃশ্যাবলী দেখা যাবে, পৃষ্ঠের যে কোন বিন্দুকেই কেন্দ্র ভাবা যেতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভূগোলকের একটি কেন্দ্র আছে, অতএব সীমিত একটি ব্যাসার্ধও আছে। ব্রহ্মাণ্ডেরও সেইরূপ কোথাও না কোথাও কোন একটি কেন্দ্র আছে, অতএব ব্যাসার্ধও আছে, কিন্তু তার ব্যাসার্ধের মাপ পরিবর্তনশীল—কারণ ব্রহ্মাণ্ড প্রসারিত হচ্ছে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাতত্ত্ব পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ঐ তত্ত্ব অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডের তিন প্রকার পরিণতি সম্ভব।

১। ব্রহ্মাণ্ড ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, অথবা

২। ব্রহ্মাণ্ড অনন্তকাল ধরে ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে যাবে, অথবা

৩। সীমিত সময়ের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড পর্যায়ক্রমে একবার প্রসারিত ও একবার সঙ্কুচিত হতে থাকবে।

প্রথম সম্ভাবনাটির কোনও প্রশ্ন ওঠে না, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রসারণ প্রমাণিত হয়ে গেছে। অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী দ্বিতীয় পরিণামে বিশ্বাসী, আবার অনেক প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তৃতীয় পরিণামে বিশ্বাস করেন।

সঞ্চয়ন

প্রোটিনসমৃদ্ধ ডালের উন্নতিসাধন

ডাল আমাদের অন্যতম প্রধান খাদ্য। একথা আজ ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ বেশী পরিমাণে ডাল খেতে অভ্যস্ত হলে বিশ্বের খাদ্যসমস্যার অনেকখানি সুরাহা হবে। দুঃখের বিষয় ভারতে ও অন্য বহু উন্নতিশীল দেশে ডাল সকল সময় সহজপ্রাপ্য নয়। আবার অনেক জায়গাতেই এত দুর্মূল্য যে, তা সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায়ও আমরা এই অবস্থায় এসে পৌঁচেছি। খাদ্যবস্তুতে প্রোটিনের অভাব যখন এত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন ডালের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দেবার সময় এসেছে।

এই বিষয়ে নয়া দিল্লীতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা এক নীরব সাধনা করে চলেছেন। এঁদের গবেষণার উদ্দেশ্য ডালের উৎপাদন বাড়ানো ও দর কমানো। এই প্রচেষ্টায় ভারতীয় ও মার্কিন কৃষি-বিজ্ঞানীরা একযোগে সহায়তা করছেন।

ডালের এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও মার্কিন কৃষি দপ্তর উভয়েই সাহায্য করছে। পরিকল্পনাটির নাম দেওয়া হয়েছে—আঞ্চলিক ডাল উন্নয়ন প্রকল্প। পরিকল্পনাটি বহুজাতিক এবং এর পরীক্ষামূলক কাজ দক্ষিণ এশিয়া থেকে সারা মধ্যপ্রাচ্য হয়ে আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। ভারত, ইরান, আফগানিস্তান, মিশর ও তুরস্ক এতে অংশ গ্রহণ করেছে। ভারত ও ইরানেই অধিকাংশ গবেষণার কাজ চলবে।

বর্তমানে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ যে খাদ্যবস্তুর উপর নির্ভর করে, তার গড়পড়তা পুষ্টিমূল্য পর্যাপ্ত নয়। জাপান ও ইজরায়েল ব্যতীত সমগ্র এশিয়া, দক্ষিণাঞ্চল ব্যতীত সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগ এবং প্রায় সমগ্র সেন্ট্রাল আমেরিকায় এই অবস্থা চলছে। এই পুষ্টির ঘাটতির পরিমাণ পর্যাপ্ত পুষ্টিমূল্যযুক্ত খাদ্যাঞ্চলের চেয়ে দৈনিক ৯০০ ক্যালরী কম।

খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণকেই পুষ্টিমূল্যের মাপকাঠি ধরা হয়। জান্তব প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ প্রোটিন বলে গণ্য হলেও কোন কোন উদ্ভিজ্জ প্রোটিনও কম উপকারী নয়। এই রকম প্রোটিন হলো ডালের প্রোটিন।

চাল, গম, সরগুম—এমন কি, ভুট্টার চেয়েও বেশী প্রোটিন আছে ডালে, সাধারণ খাদ্যশস্যের চেয়ে শতকরা ১০ ভাগ বেশী।

বিভিন্ন জাতীয় ডালের উন্নতিসাধন, শস্যের

ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ, মড়ক নিবারণ এবং চাষের উন্নতি নিয়ে ইতিমধ্যেই গবেষণা করা হচ্ছে।

পাঁচজন মার্কিন বিজ্ঞানী বর্তমানে এই পরিকল্পনায় ভারতে কাজ করছেন। এঁরা হলেন প্রজননবিদ্যাবিদ এবং উদ্ভিদ-প্রজননবিদ্যা-বিশারদ ডাঃ রিচার্ড মাৎসুরা, উদ্ভিদের রোগ বিশেষজ্ঞ ফ্রয়েড উইলিয়াম্‌স্‌, কৃষিবিদ ও অণুজীব-বিজ্ঞানী রবার্ট ডেভিস, কীটতত্ত্ববিদ কেনেথ গিবসন এবং পরিচালনার ব্যাপারে ওয়াল্টার ল্যানসিং।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্যে কয়েকজন ভারতীয় বিশেষজ্ঞ শীঘ্রই নিযুক্ত হবেন। নয়া দিল্লীর ভারতীয় কৃষি-গবেষণা মন্দির, মাদ্রাজ রাজ্যের কোয়েম্বাটুর কৃষি কলেজ এবং সকল রাজ্য সরকার ও অধিকাংশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রকল্পে সাহায্য করছেন।

এই পরিকল্পনার জন্যে বহু প্রকার ছোলা সংগ্রহ করা হয়েছে পরীক্ষার জন্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে অড়হড় সংগ্রহ করা হচ্ছে।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বিশেষজ্ঞেরা এখানে এই প্রকল্পে কাজ সুরু করেছেন।

ডালের মধ্যে নানাজাতীয় অ্যামিনো-অ্যাসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে। খাদ্যে এই অ্যামিনো-অ্যাসিডের মান বৃদ্ধি করতে পারলেই এর প্রোটিনের ভাগ উন্নত হয়। প্রকল্পে এই চেষ্টা করা হচ্ছে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণাকারীদের সহায়তায় ডাল উৎপাদন পরিকল্পনায় অ্যামিনো-অ্যাসিড সংক্রান্ত তথ্য কাজে লাগানো হবে। এই ব্যাপারে রকফেলার ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা হবে।

১৯৬৬ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার

ক্যান্সার রোগের গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে ১৯৬৬ সালে ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারটি দু-জন মার্কিন বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হলেন নিউ-ইয়র্কের রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাথোলজিষ্ট ডাঃ ফ্র্যান্সিস পি. রাউস এবং শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ৬৫ বছর বয়স্ক একজন শল্যচিকিৎসক অধ্যাপক ডাঃ চার্লস বি. হাগিন্স। এই মারাত্মক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এরকম কাজ এর আগে হয় নি।

ডাঃ হাগিন্সকে যে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। শল্যচিকিৎসক হিসাবে যাঁরা এই পুরস্কারটি পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি। এর আগে প্রথম যে সার্জেন বা শল্যচিকিৎসককে এই পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল, তাঁর নাম এমিল ডিয়োডোর কোচার। সুইজারল্যাণ্ডের এই প্রখ্যাত চিকিৎসক এই পুরস্কারটি পেয়েছিলেন ১৯০১ সালে। যে কাজের জন্যে ডাঃ হাগিন্সকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, তা ২৫ বছরেরও বেশী হলো তিনি সমাপ্ত করেছেন।

ডাঃ রাউসকে যে কাজের জন্যে পুরস্কৃত করা হয়েছে, সে কাজটি তিনি সমাধা করছিলেন ৫৫ বছর আগে। পুরস্কার দানের ব্যাপারে এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুদীর্ঘকাল পরে তিনি যে তাঁর কাজের জন্যে স্বীকৃতি পেয়েছেন, তার কারণ হলো পঞ্চান্ন বছর আগে তিনি যখন তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করেছিলেন, তখন তাঁর সহযোগী বিজ্ঞানীদের কাছে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য ধরা পড়ে নি। যদিও নোবেল কমিটি তাঁর গবেষণা সম্পর্কে বলেছেন, এর গুরুত্ব প্রতি বছরই বেড়ে গিয়েছে।

১৯১১ সালে ডাঃ রাউস যখন ৩২ বছর বয়সের যুবক, তখন তিনি বলেছিলেন যে, সুস্থ মুরগীর দেহে রোগগ্রস্ত মুরগীর দেহের অংশ-বিশেষের রস ইঞ্জেকসন করে ক্যান্সার ঘটিয়েছেন। তিনি কিন্তু ঐ রোগগ্রস্ত অংশের সূক্ষ্ম পরিস্রুত চূর্ণ নিয়ে রস তৈরি করে ইঞ্জেকসন দিয়েছিলেন। এই রোগের নাম সারকোমা, অর্থাৎ এক জাতীয় ক্যান্সার। তাঁর কথা তখন অনেকেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, ডাঃ রাউস ভুলে ক্যান্সার রোগগ্রস্ত পুরা কোষ সুস্থ মুরগীর দেহে ইঞ্জেকসন করে বসে আছেন। কাজেই ঐ মুরগীর দেহে যে রোগ দেখা গেছে, সেটা ক্যান্সার নয়।

ঐ সময়ে ক্যান্সার রোগদুষ্ট কোন কোষ বা সেল কোন প্রাণীর দেহ থেকে অন্য প্রাণীর দেহে জুড়ে দেওয়া বা সংযোজন করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। এই কাজের পথে ছিল বহু অন্তরায় এবং সেই প্রচেষ্টা তখন খুব কমই সফল হতো। কিন্তু ডাঃ রাউস প্রমাণ করেছিলেন যে, কোষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা এক দেহ থেকে অন্য দেহে রোগ-বীজাণু বহন করে নিয়ে যেতে পারে—এ হলো ভাইরাস।

কিন্তু ১৯৩০ সাল থেকে যে দশক সুরু হয়, সেই দশকের আগে অন্য কোন বিজ্ঞানীর গবেষণার দ্বারা ডাঃ রাউসের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় নি বা তাঁরই সিদ্ধান্ত ভিত্তি করে আর কোন গবেষক গবেষণাও চালান নি। কিন্তু এই যুগে রাউসের গবেষণার ফলাফলকে ভিত্তি করেই ভাইরাস-বাহিত ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে গবেষণা চালানো হচ্ছে এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনও চলছে।

ক্যান্সার রোগের গবেষণার ক্ষেত্রে শল্য-চিকিৎসক হাগিন্স ১৯৪১ সালে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ঐ বছরে অণ্ডকোষ অপসারণ কালে এই রোগ নিরাময়ের কারণ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চোখে পড়ে প্রোষ্টেট গ্ল্যাণ্ড বা মূত্রগ্রন্থিতে ক্যান্সার রোগের জন্যেই অণ্ডকোষ অপসারণের প্রয়োজন হয়েছিল। প্রোষ্টেট গ্ল্যাণ্ডে ক্যান্সার মধ্যবয়সীদের পক্ষে খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। রোগদুষ্ট অণ্ডকোষ অপসারণের ফলে রোগ নিরাময় ঘটে। ডাঃ হাগিন্স তখন প্রমাণ করেন যে, অণ্ডকোষের মধ্যে যে হর্মোন তৈরি হয়, তাও অণ্ডকোষ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে অপসারিত হওয়ায় রোগীর দেহে যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তারই ফলে এই নিরাময় ঘটে। দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন অন্তঃস্রাবী গ্রন্থি বা এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত জৈব রসকে বলে হর্মোন। তাঁর মতে, শল্যচিকিৎসার ফলে এই নিরাময় ঘটে নি।

এর ফলে হর্মোন ক্যান্সার গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। শল্যচিকিৎসা ছাড়াই পুরুষদের এই রোগে মেয়েদের হর্মোন খাইয়ে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে ক্যান্সার চিকিৎসার একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবিত হয়। মেয়েদের স্তনের ক্যান্সারের চিকিৎসাও অনুরূপ ভাবে পুরুষদের দেহ থেকে সংগৃহীত হর্মোনের সাহায্যে করা হয়। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে বেশ সুফলও পাওয়া যায়।

যে সকল হর্মোন প্রয়োগে পুরুষদের মেয়েলিভাব এবং মেয়েদের পুরুষালি ভাব বৃদ্ধির সাহায্য করে না, সে রকম হর্মোনও পরবর্তী কালে ডাঃ হাগিন্স কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই মারাত্মক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যেই ডাঃ হাগিন্স ও ডাঃ রাউসকে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। ১৯০১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট ৩৫০ জনেরও বেশী বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক ও শান্তিকামীকে ৩০০টি নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

ডাঃ রাউস ও ডাঃ হাগিন্স আরও

কয়েকটি ক্ষেত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ডাঃ রাউস রক্ত সংরক্ষণের যে উপায়টি উদ্ভাবন করেছেন, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্বের ব্লাড ব্যাঙ্কসমূহে এই ব্যবস্থা খুবই কাজে লাগছে। এই দু-জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকেও বহু পুরস্কার পেয়েছেন। এই দু-জনের কারোরই কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের কোন অভিলাষ নেই।

ডাঃ রাউস ক্যান্সার ভাইরাসের গবেষণা নিয়ে এখন আর বেশী মাথা না ঘামালেও তিনি জার্ণাল অব এক্সপেরিমেন্টাল মেডিসিন নামে সাময়িক পত্রের সম্পাদন করবার জন্যে এবং যে সকল গবেষক যকৃৎ ও পিত্তকোষ নিয়ে গবেষণা করছেন, তাঁদের নির্দেশ দানের জন্যে নিয়মিতভাবেই রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে এসে থাকেন। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই পত্রিকাখানিতেই তাঁর ক্যান্সার ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণার বিবরণী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

ডাঃ হাগিন্স সপ্তাহের সাত দিনই কাজ করে থাকেন এবং তিনি তাঁর শিকাগোর গবেষণাগারে যে সকল পদার্থ অন্য কোষে প্রবিষ্ট হয়ে ক্যান্সার রোগের সঞ্চার করতে পারে, এরকম কয়েকটি পদার্থ নিয়ে গবেষণা করছেন। এছাড়া ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধ করতে পারে, এরকম আরও কয়েকটি পদার্থ নিয়েও তাঁর গবেষণা চলছে। ডাঃ হাগিন্সের সহকর্মীদের অভিমত—এক্ষেত্রে ডাঃ হাগিন্সের গবেষণার ফলাফল এখনও পুরাপুরি প্রকাশিত হয় নি।

তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ

আমেরিকায় বর্তমানে দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই রেডিয়েশন বা তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা চালানো হচ্ছে। প্রথমতঃ হিমায়ন ব্যবস্থা বা রেফ্রিজারেশান ছাড়াই মাংস প্রভৃতি খাদ্যকে বীজাণুমুক্ত করে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখবার কোন পন্থা উদ্ভাবন করা যায় কিনা, সে বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা। দ্বিতীয়তঃ হিমায়ন ব্যবস্থায়ও যে সকল পাকা ফল ইত্যাদি সুদীর্ঘকাল রাখা যায় না সেই পচনশীল পদার্থসমূহকে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে ও হিমায়ন ব্যবস্থায় আরও বেশী সময় অটুট রাখা যায় কিনা, সে সম্পর্কেও পরীক্ষা করে দেখা।

খাদ্য নষ্ট ও বিকৃত হওয়ার পিছনে বহু কারণই আছে। ভৌতিক, রাসায়নিক ও এনজাইমগত পরিবর্তনের ফলে খাদ্যবস্তুর বিকৃতি ঘটে এবং নষ্ট হয়ে যায়। পোকামাকড় এবং যে সকল ক্ষুদ্র কীট অণুবীক্ষণে মাত্র দেখা যায়, সে সকলও রয়েছে খাদ্যবস্তু নষ্ট হবার পিছনে।

এই ক্ষুদ্র কীটসমূহ প্রায়ই পচনশীল বস্তুসমূহের পচে যাবার প্রধান কারণ হয়ে থাকে। এসব শত্রুর কবল থেকে কেবল মাত্র হিমায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ সম্ভব হয় না. তবে এই ব্যাপারে সহায়ক হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যেই পচন নিবারণ এবং আরও বেশী সময় এই সকল খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে।

পোকামাকড়ও পৃথিবীর বহু দেশেই শস্যের, বিশেষ করে গম, ময়দা প্রভৃতির প্রভূত ক্ষতি করে থাকে। বর্তমানে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে এই সমস্যা সমাধানের এবং পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। তেজস্ক্রিয়ায় পোকামাকড় মরে যায় অথবা বন্ধ্যা হয়ে যায় বলে এদের আর বংশবৃদ্ধি হয় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেশীর ভাগ উদ্যোগই এক্ষেত্রে ফিন ও শেল প্রভৃতি যে সকল মাছ সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়, তাদের সংরক্ষণে ব্যয়িত

হয়ে থাকে। এসব মাছ হিমঘরে টাট্‌কা অবস্থায় মাত্র কয়েক দিন রাখা যায়। কিন্তু শত শত টন সামুদ্রিক মাছ তেজস্ক্রিয়ার দ্বারা শোধন করে কেবলমাত্র কয়েক দিন নয়, কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত যে হিমঘরে অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়, তা এসকল মাছ বিভিন্ন স্থানে চালান দেবার সময় প্রমাণিত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়া পেঁপে, কলা, টমেটো প্রভৃতি নির্দিষ্ট কয়েক প্রকার ফল ও সব্জীর উপর প্রয়োগ করেও বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। কলা খুব তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং যথাসময়ে বিক্রয় করতে না পারলে নষ্টও হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে এসব ফল শীঘ্র যাতে না পাকে অর্থাৎ ফলের এই অবস্থা যাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারই জন্যে নানা পরীক্ষা চালানো হচ্ছে।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে ফল সংরক্ষণের গবেষণা হচ্ছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা দেখেছেন, পাকা পেঁপেকে গরম জল ও তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় তিন-চার দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। বিজ্ঞানীরা সপ্তাহখানেক রাখবার জন্যে চেষ্টা করছেন। এই গবেষণা সফল হলে পেঁপে নানাদেশে বিমানে না পাঠিয়ে জাহাজে করেই পাঠানো যাবে এবং তাতে পরিবহন খরচও অনেক কমে যাবে।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা টমেটো নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, একেবারে পাকা টমেটো আট থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যেতে পারে। ফলে এই সকল ফল বাজারে বিক্রয়ের সুযোগ অনেকখানি বেড়ে যায়। পচে-গলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনাও অনেকখানি হ্রাস পায়। এজন্যে এদের বিমানে চালান না দিয়ে জাহাজযোগে চালান দেবার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পাবে। এতে পরিবহনের খরচও অনেক কম লাগবে।

তেজস্ক্রিয়ার সাহায্যে খাদ্যবস্তুর অপচয় নিবারণ বহু দেশের খাদ্যের ঘাট্‌তি পূরণে সহায়ক হতে পারে। নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থের ধোঁয়া ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে ও খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ করা হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে সমগ্র বিশ্বেরই কল্যাণ সাধিত হবে, পচনশীল খাদ্য-দ্রব্যেরও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে।

গণিতশাস্ত্রের একটি ধ্রুবক π

অমিতোষ ভট্টাচার্য

গণিতশাস্ত্রকে বলা হয় বিজ্ঞানের রাণী। বিজ্ঞান-জগতে গণিতশাস্ত্রকে যদি রাণীর সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে, তা কিন্তু আদৌ বাড়াবাড়ি বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। এই শাস্ত্রের ব্যাপ্তি, গভীরতা আর প্রকাশক্ষমতার আভিজাত্য সম্পর্কে কারো মনে কোন প্রশ্ন নেই। বিজ্ঞানের সর্বশাখার নানা দুরূহ তত্ত্বকে সহজ করে নানা-ধরণের গাণিতিক শৃঙ্খলে বেঁধে রাখবার ক্ষমতা অঙ্কশাস্ত্রের যেমনটি আছে, অন্য কোন শাস্ত্রের করেছেন। এর নাম পাই এবং গণিতশাস্ত্রে π—এই গ্রীক অক্ষরটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। π-এর মান সব সময়, সব অবস্থায় স্থির থাকে বলে একে অঙ্কশাস্ত্রে বলা হয় ধ্রুবক বা Constant। অবশ্য অঙ্কশাস্ত্রে π ছাড়া আরও অসংখ্য ধ্রুবক আছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা শুধু π নিয়েই আলোচনা করবো।

বৃত্তের পরিধি আর ব্যাসের অনুপাতকে বলা হয় π এবং এর মান ২২/৭ বা ৩.১৪৩৬-এর
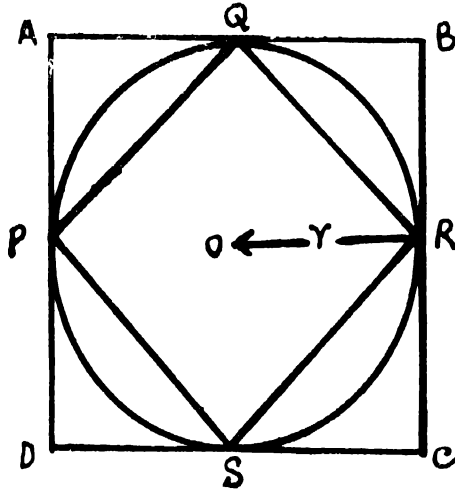
১নং চিত্র

তা নেই। নানারকমের জটিল সমীকরণ, সিদ্ধান্ত, অনুমান, ধ্রুবক ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিজ্ঞান-জগতের এই রাণীর রাজত্ব আর বিজ্ঞানের নানা শাখায় নিজেদের নিত্যনতুন ভাবে প্রকাশ করে নানা সমস্যার সমাধান করাই এই সব চরিত্র-গুলির বৈশিষ্ট্য। এই বৃহৎ রাজ্যের একটি চরিত্র বেশ মজার এবং গাণিতিকেরা এই চরিত্রটির আভিজাত্য নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ ও গবেষণা কাছাকাছি। এটা গেল π-এর মোটামুটি একটা সংজ্ঞা এবং আমরা সবাই এই পর্যন্ত জেনেই খুশী। কিন্তু π-এর পেছনে একটা গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে গণিতে π-এর ব্যবহার চলে আসছে। অঙ্কশাস্ত্রবিদ হিসাবে ইউক্লিডের পর আর্কিমিডিসের (খৃঃ পূঃ ২৮৭—২১২) মত প্রতিভা খুব বেশী দেখা যায় নি। পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের সূত্র

আবিষ্কার করা ছাড়াও জ্যামিতির নানা শাখায় তাঁর অবদান অনেক। বৃত্তের ক্ষেত্রফল (πr^2), গোলকের সমতলের ক্ষেত্রফল ($4\pi r^2$), ঘনফল ($\frac{4}{3}\pi r^3$), ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্যে আমরা যে সব সূত্র ব্যবহার করে থাকি, সে সবও আর্কিমিডিসের দৌলতে। আর্কিমিডিস এক নতুন পদ্ধতিতে π-এর মান বের করলেন। r-ব্যাসার্ধের কোন বৃত্তকে পরিবেষ্টিত করে সবচেয়ে ছোট যে বর্গক্ষেত্রটি আঁকা যায়, তা হলো ABCD (চিত্র-১) এবং এর ক্ষেত্রফল হলো $4r^2$। আবার এই বৃত্তটির ভিতরে সবচেয়ে বড় PQRS বর্গক্ষেত্রটিই আঁকা যায় এবং তার ক্ষেত্রফল হবে $2r^2$, কাজেই আর্কিমিডিস সিদ্ধান্ত করলেন, বৃত্তের ক্ষেত্রফল বর্তমান ক্ষেত্রে $4r^2$-এর কম আর $2r^2$-এর বেশী হবে। সুতরাং এইভাবে দুটি বর্গক্ষেত্র না এঁকে যদি বাহুর সংখ্যা বাড়িয়ে সুষম ষড়ভুজ করা যায়, তাহলে বাইরের আর ভিতরের ষড়ভুজ দুটির ক্ষেত্রফল দাঁড়াবে যথাক্রমে $৩.৪৬৪r^2$ এবং $২.৫৯৮r^2$। আবার সুষম অষ্টভুজ হলে হবে $৩.৩১৪\ r^2$ ও $২.৮২৮\ r^2$। অর্থাৎ এইভাবে যদি বৃত্তের ভিতরে আর বাইরে বাহুর সংখ্যা অনির্দিষ্ট-ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া যায়, তাহলে বহিঃক্ষেত্র আর অন্তঃক্ষেত্র দুটি বৃত্তটিকে ঘন করে বেষ্টন করে ফেলবে। যেহেতু বৃত্তের ক্ষেত্রফল হলো πr^2, কাজেই এই প্রক্রিয়ায় π-এর মান নির্ণয় করা সম্ভবপর হবে। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে আর্কিমিডিস ৯৬টি বাহুবিশিষ্ট দুটি সুষম বহুভুজ এঁকে আর সমস্যাটিকে সরল করবার জন্যে কিছু অনুমানের সাহায্য নিয়ে দেখালেন, π-এর মান $৩\frac{১০}{৭১}$ (বা ৩.১৪০৮) এবং $৩\frac{১০}{৭০}$ (বা ৩.১৪২৯)—এই ভগ্নাংশ দুটির মধ্যে থাকবে। বর্তমানে চার দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর আসন্ন মান হলো ৩.১৪১৬। কাজেই আর্কিমিডিসের চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাছাড়া আর্কিমিডিসের সমকালীন গণিতশাস্ত্রে এই ধরণের কোন পদ্ধতিতে π-এর মান নির্ধারণের চেষ্টা এক কথায় যুগান্তকারী বলা যায়। কারণ, সে সময় ক্যালকুলাস স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, বীজগণিতের শৈশব অবস্থাও পার হয় নি।

১৫০ খৃষ্টাব্দে টলেমি π-এর মান ৩.১৪১৬ ব্যবহার করে তাঁর গাণিতিক হিসেবপত্র করেছিলেন : যদিও ঠিক সেই যুগের চৈনিক অঙ্কশাস্ত্রবিদেরা π সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে প্রচার করেছিলেন যে, π হলো ১০-এর বর্গমূল, অর্থাৎ ৩.১৬২২৭। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটা আশ্চর্যজনক ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হলো। $\frac{৩৫৫}{১১৩}$—এই ভগ্নাংশটির আবিষ্কার যে ভাবেই হোক না কেন, ভগ্নাংশটি π-এর মস্তবড় প্রতিদ্বন্দ্বী হবার গৌরব লাভ করলো। কারণ সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত $\frac{৩৫৫}{১১৩}$-এর মান হলো ৩.১৪১৫৯২৯... এবং সাত দশমিক স্থান পর্যন্ত π-এর মান হলো ৩.১৪১৫৯২৬...। অর্থাৎ ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত π এবং $\frac{৩৫৫}{১১৩}$-এর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। যাঁরা π-কে $\frac{৩৫৫}{১১৩}$-এর সমান বলবার স্বপক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থিত করেছিলেন, তাঁরা ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ভুল ছিলেন, কিন্তু তা π-এর আসল মানের সমান কিছুতেই হলো না। আসলে π এমন একটি ধ্রুবক, যার সঠিক মান নির্ণয় আজও সম্ভব হয় নি। যদিও সাধারণভাবে অঙ্ক কষবার জন্যে π = ৩.১৪২ নিয়ে আমরা হিসেব করে থাকি, কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হয়ে Van Cenlen নামক একজন জার্মান গাণিতিক দশমিক স্থানের পর কুড়ি অঙ্ক পর্যন্ত π-এর মান বের করে পেলেন ৩.১৪১৫৯২৬৫৩৫৮৯৭৯৩২৩৮৪৬৪... এবং সেই সময়েই মানুষের আগ্রহ এমন এক স্তরে পৌঁচেছিল, যার ফলে দশমিকের পর ১০০ অঙ্ক পর্যন্ত π-এর মান নির্ণয় শেষ হয়েছিল। আধুনিক যুগে কম্পিউটার দিয়ে প্রায় ২০০০ অঙ্ক পর্যন্ত হিসেব করবার পরেও π-এর কোন সম্পূর্ণ মান তো দূরের

কথা—এমন কি, কোন রকম পৌনঃপুনিক দশমিকও পাওয়া যায় নি।

আগেই উল্লেখ করেছি যে, π হলো বৃত্তের সঙ্গে জড়িত একটা ধ্রুবক। সুতরাং জ্যামিতির সাহায্য নিলে আমরা আরও অনেক মজার মজার তথ্য জানতে পারবো। চিত্র—২(ক)-এ একটা অর্ধ-বৃত্তের মধ্যে তিনটি সমবাহু ত্রিভুজ আঁকা হয়েছে। অর্ধবৃত্তটির তিনটি জ্যা বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান এবং ত্রিভুজগুলি সমান বাহুবিশিষ্ট বলে প্রত্যেকটি কোণের মাপ হবে ৬০°। এখন যদি জ্যা তিনটিকে উপরের দিকে ঠেলে অর্ধবৃত্তাকার চাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অবস্থাটি ২য় চিত্রের খ-এর মত দাঁড়াবে। জ্যা তিনটিকে বেঁকিয়ে বৃত্তচাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এরা AB চাপটিকে (২-ক চিত্র দ্রষ্টব্য) সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন করতে পারবে না এবং ছোট্ট একটা চাপ AC বাইরে পড়ে থাকবে (২-খ চিত্র দ্রষ্টব্য)। যদি ব্যাসার্ধ r-এর মান ১ ধরে নেওয়া হয়, তাহলে মাপলে দেখা যাবে, চাপ AC=০·১৪১৫৯। অর্থাৎ,

চাপ BAC=৩·১৪১৫৯

$$= \pi \quad \cdots \quad \cdots \quad (১)$$

কিন্তু BAC চাপ COB সরলরেখার (বর্তমান ক্ষেত্রে বৃত্তের ব্যাস) উপর ১৮০° কোণ তৈরি করেছে। সুতরাং সমীকরণ (১) থেকে

$$\pi = ১৮০^\circ \quad \cdots \quad \cdots \quad (২)$$

অতএব দেখা যাচ্ছে, যে কোন কোণকে আমরা π-এর আকারে লিখতে পারি। যেমন—৯০° = $\frac{\pi}{২}$, ১২০° = $\frac{২\pi}{৩}$ ইত্যাদি। সাধারণতঃ উচ্চতর গণিতে কোণকে এভাবেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

(ক) (খ)

২নং চিত্র

দ্বিতীয় চিত্রটির (খ) অংশ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে BOD কোণের মান এখন আর ৬০° নেই, বরং ৬০°-এর চেয়ে ২°৪২′১৬″ কম। অর্থাৎ ∠BOD=৫৭°১৭′৪৪″ এবং কোন কোণের মান এই ৫৭°১৭′৪৪″-এর সমান হলে তাকে বলা হয় ১ রেডিয়ান (Radian)। কাজেই ব্যাসার্ধের সমান বৃত্তচাপ কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে বলে রেডিয়ান এবং ১ রেডিয়ান= ৫৭°১৭′৪৪″। এই হিসেব থেকে খুব সহজেই দেখানো যেতে পারে যে,

$$১^\circ = ০·০১৭৪৫ \text{ রেডিয়ান} \quad \cdots \quad (৩)$$

$$১' = \frac{১^\circ}{৬০} = ০·০০০২৯ \text{ ,,} \quad \cdots \quad (৪)$$

$$১'' = \frac{১'}{৬০} = ০·০০০০০৫ \quad \cdots \quad (৫)$$

রেডিয়ানের সংজ্ঞা থেকে আমরা আরও একটা সহজ সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তা হলো—

বৃত্তের চাপ = বৃত্তের ব্যাসার্ধ × কেন্দ্রস্থ কোণ (রেডিয়ান) ... ... (৬)

উদাহরণ হিসেবে ধরে নিই, একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ ১০০ ফুট এবং চাপ XY কেন্দ্রে

যে কোণ তৈরি করেছে, তার পরিমাণ হলো ৩০° ১৫′ ২০″ (চিত্র—৩)।

এখন সমীকরণ (৩), (৪) এবং (৫) থেকে আমরা এই কোণটিকে রেডিয়ানে প্রকাশ করতে পারি, অর্থাৎ

৩০° = ৩০ × ০'০১৭৪৫ = ০'৫২৩৫ রেডিয়ান

১৫′ = ১৫ × ০'০০০২৯ = ০'০০৪৩৫ ,,

২০″ = ২০ × ০'০০০০০৫ = ০'০০১০০ ,,

অথবা, ৩০° ১৫′ ২০″ = ০'৫২৮৮৫ রেডিয়ান। তাহলে সমীকরণ (৬) থেকে XY চাপের দৈর্ঘ্য হবে ০'৫২৮৮৫ × ১০০ বা প্রায় ৫২ ফুট সাড়ে ১০ ইঞ্চি। এই সহজ উদাহরণটি থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল যে, কোন বৃত্তাকার ক্ষেত্রের চাপ কেন্দ্রস্থ কোণ আর ব্যাসার্ধের মধ্যে যে কোন দুটির মান জানা থাকলে তৃতীয়টি নির্ণয় করা অত্যন্ত সহজ।

আমরা জানি, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৩৯৩৬ মাইল; সুতরাং ১° অক্ষাংশ ভূপৃষ্ঠের উপর যে চাপ তৈরি করবে তা হবে ০'০১৭৪৫৩৩ × ৩৯৬৩ বা ৬৯'৪১ মাইল। সাধারণতঃ আমরা ১৭৬০ গজে ১ মাইল মেপে থাকি, কিন্তু সমুদ্রে এই মাইলের হিসাবটি আলাদা। সামুদ্রিক মাইল বা নৌ-মাইল (Nautical mile) বলতে আসলে সমুদ্রের উপরিভাগে ১′ অক্ষরৈখিক চাপ বোঝায়। সুতরাং ১ নৌ-মাইল হলো ৬৯'৪১ + ৬০ বা ১'১৫৭ মাইল; অর্থাৎ ১ নৌ-মাইল আমাদের সাধারণ মাইলের ০'১৫৭ মাইল বা ২৭৬ গজ বেশী। নৌ-মাইলকে বলা হয় নট (Knot)। যখন বলা হয় একটি জাহাজের গতি ২৫ নট, তখন বুঝতে হবে জাহাজটি প্রতি ঘণ্টায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে ৩০ মিনিটের একটি অক্ষরৈখিক চাপ তৈরি করছে।

৩নং চিত্র

উপরে যে দুটি উদাহরণ দিলাম, প্রয়োগ-ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন হলেও আসলে এরা বৃত্তীয় গতি সংক্রান্ত সমস্যা এবং এই ধরণের সমস্যায় π-এর ব্যবহার এক কথায় অপরিহার্য। অথচ গণিতশাস্ত্রের এই বিশেষ অংশেই π-এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ নেই, এর ব্যবহার-ক্ষেত্র আরও ব্যাপক এবং বিশাল। শুধু আর একটি প্রয়োগ-ক্ষেত্রে π-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে π সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবো।

আমরা জানি যে, কোন খেলা সুরু হবার আগে পয়সা টস্ করা হয়ে থাকে। এক দলের অধিনায়ক টস্ করেন এবং অন্য অধিনায়ক ডাকেন। এটা নিতান্ত সাধারণ ঘটনা। পয়সা টস্ করলে লেজ উঠবে, কি মাথা উঠবে—সেটা স্রেফ সম্ভাবনার ব্যাপার এবং যিনি ডাকেন, তিনিও হয়তো মনে যা আসে তাই বলেন। এই ক্ষেত্রে দুই দলেরই টসে জেতবার সম্ভাবনা

(Probability) হলো পঞ্চাশ-পঞ্চাশ। এটা গেল বিজ্ঞানে সম্ভাবনা বা Probability বলতে আমরা যা বুঝি, তার নিতান্ত সহজ একটি উদাহরণ। এই জাতীয় নানা ধরণের সমস্যা বিজ্ঞানের নানা শাখায় (বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায়, পরিসংখ্যানে, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায়) ছড়িয়ে আছে এবং দেখা গেছে, এসব ব্যাপারেও গণিত-রাজ্যের এই অধিবাসীটির গুরুত্ব কম তো নয়ই, বরং স্বমহিমায় বিরাজমান। এই ব্যাপারটা নানাভাবে নানাজনে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। কিশোর পাঠকেরা একটু ধৈর্য ধরে নীচের পরীক্ষাটি করলে সত্যিই খুব আনন্দ পাবে। পরীক্ষাটি করতে হলে চাই একটা বড় কার্ডবোর্ড বা সাদা কাগজ। সাদা কাগজটির উপর কতকগুলি সমান্তরাল সরলরেখা আঁকতে হবে। আর চাই একটা কাঠি। যে কোন ধরণের সোজা কাঠিতেই চলবে। যেমন পেরেক, দেশলাইয়ের কাঠি, আলপিন ইত্যাদি। শুধু একটা বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে, তা হলো সমান্তরাল সরলরেখাগুলি সমান সমান দূরত্বে থাকবে আর এই দূরত্ব সব সময় কাঠিটির দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হওয়া চাই (চিত্র-৪)

এবার কাঠিটাকে এই কাগজটির উপর খুশীমত এলোপাতাড়ি পয়সা টস্ করবার মত ফেলতে হবে। মোট টসের কতবার কাঠিটা সমান্তরাল সরলরেখাগুলির যে কোন একটিকে স্পর্শ বা ছেদ করে, তার একটা হিসেব রাখতে হবে। যদি মোট x-সংখ্যক বার টস্ করা হয়ে থাকে আর তার মধ্যে মোট y-সংখ্যক বার কাঠিটা রেখাগুলির যে কোন একটিকে স্পর্শ করে থাকে, তাহলে দেখা যাবে, $\frac{x}{y}$-এর মান π-এর মানের প্রায় সমান হবে। মাত্র কয়েকবার টস্ করে এই ফলটি পাওয়া যাবে না এবং টস্ করাটা বিশ্বস্তভাবেই এলোপাতাড়ি হওয়া চাই। যত বেশী বার টস্ করা যাবে, ততই $\frac{x}{y}$-এর ভাগ-
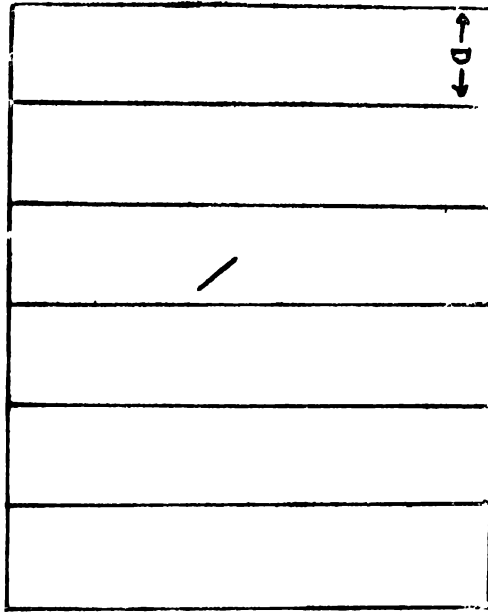
৪নং চিত্র
কাঠির দৈর্ঘ্য যদি ১" হয়, তাহলে D হবে ২"।

ফলটি π-এর কাছাকাছি হবে। Count Buffon অষ্টাদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তাঁর নাম অনুসারে একে Count Buffon's Theorem বলা হয়ে থাকে। ১৯০১ সালে ইতালীয় বিজ্ঞানী Lazzerini এই সিদ্ধান্তটির সত্যতা প্রমাণের জন্যে ধৈর্যের এক চরম পরীক্ষা দিলেন। তিনি একটা কাঠিকে ৩৪০০ বার টস্ করে দেখলেন, ১০৮২ বার সেটা কোন না কোন রেখাকে স্পর্শ (বা ছেদ) করেছে। তাহলে ৩৪০০ ÷ ১০৮২ হলো প্রায়, ৩.১৪২৩৩... অর্থাৎ π-এর তথাকথিত আসল মান থেকে মাত্র ০.০০০৭৪ বেশী, যা সাধারণ হিসেবের দিক থেকে একেবারেই নগণ্য। এই পরীক্ষাটি ধৈর্যের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলেও এর অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। π-এর মান পরীক্ষা-মূলকভাবে নির্ণয় করবার রাস্তা হিসেবেও দৃষ্টান্তটি উল্লেখযোগ্য।

নিতে হবে। অঙ্কশাস্ত্রের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা মোটামুটি সোজাভাবে সমস্যাটার একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করবো। ৫নং চিত্রে আমরা তিনটি বিভিন্ন টসে কাঠিটার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কথা কল্পনা করেছি। দেখা যাচ্ছে কোন সমান্তরাল সরলরেখাকে স্পর্শ করবে কি করবে না, তা দুটি অবস্থার উপর নির্ভর করছে। প্রথমতঃ কাঠিটির কেন্দ্র O থেকে নিকটবর্তী সরলরেখার দূরত্ব কতখানি এবং দ্বিতীয়তঃ কাঠিটা সমান্তরাল সরলরেখার সঙ্গে কতটা কোণ উৎপন্ন করেছে। ধরে নিই, P Q কাঠিটার দৈর্ঘ্য l. এবং A B ও C D সমান্তরাল সরলরেখা দুটির দূরত্ব a (l<a)। চিত্র ৫ (ক) থেকে দেখা যাচ্ছে, যদি কাঠিটার কেন্দ্র O, A B অথবা C D সরলরেখার কাছে থাকে এবং সরলরেখার সঙ্গে উৎপন্ন কোণ যদি বড় হয়, তাহলে কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে। কিন্তু
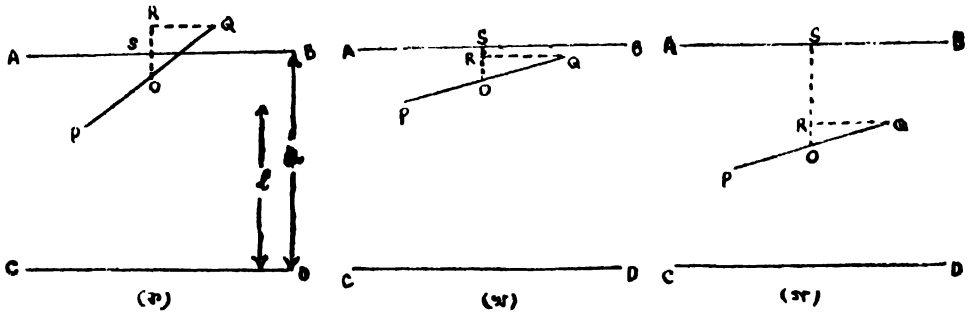
৫নং চিত্র

এভাবে কতকগুলি সমদূরবর্তী সমান্তরাল সরলরেখা আঁকা কাগজের উপর একটা নির্দিষ্ট মাপের কাঠি এলোপাতাড়ি ফেললে কাঠিটা কোন রেখাকে কাটবে কিনা এবং কাটলে তার সম্ভাবনা কতটা, এটা নিতান্ত 'চান্সের' ব্যাপার। এর মধ্যে π-এর আগমন কি করে হলো, তা বুঝতে গেলে আমাদের উচ্চতর গণিতের সাহায্য

যদি কোণ ছোট হয় (চিত্র-৫ খ) বা কাঠির কেন্দ্র সরলরেখা থেকে দূরে থাকে (চিত্র-৫ গ), তাহলে স্পর্শ করবে না। ক, খ আর গ চিত্রকে ভাল করে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব, কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে যদি কাঠিটার শীর্ষবিন্দু Q থেকে কাঠির কেন্দ্র O-এর উপরে অভিক্ষেপ (Projection) O R কাঠির কেন্দ্র থেকে

সরলরেখার দূরত্ব O S-এর চেয়ে বড় হয়। X-অক্ষে কাঠির সঙ্গে সরলরেখার উৎপন্ন কোণ আর Y-অক্ষে নির্দিষ্ট অভিক্ষেপের দৈর্ঘ্য আঁকলে আমরা ৬নং চিত্রটি পাব।

কারণ, কোণের মান 0° হলে PQ AB সরলরেখার উপর শুয়ে থাকবে এবং সেই অবস্থায় অভিক্ষেপ $OR = \frac{1}{2} l \sin 0^\circ = O$ হবে। যখন কোণের মান $\frac{\pi}{২}$ (=৯০°) হবে, তখন অভিক্ষেপ $OR = \frac{l}{২}$ (কারণ, $\sin\frac{\pi}{২} = ১$), অর্থাৎ অভিক্ষেপের দৈর্ঘ্য কাঠিটার দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের সমান হবে এবং এটিই হলো অভিক্ষেপের সবচেয়ে দীর্ঘতম দৈর্ঘ্য। আবার Q-এর মান ৯০°-র চেয়ে যত বাড়তে থাকবে, OR ততই কমবে এবং কমতে কমতে কোণটি যখন π-এর সমান (১৮০°) হবে, তখন OR-এর মান আবার শূন্য হবে।

৬নং চিত্র

সুতরাং উপরের ব্যাখ্যা থেকে বুঝতে পারা গেল, যে সমস্ত টসের বেলায় কাঠিটা কাগজের উপর এমনভাবে পড়বে, যাতে $OS < OR$ হবে, তখনই কাঠিটা সরলরেখাকে স্পর্শ করবে; অর্থাৎ চিত্র-৬-এ ORM রেখার দ্বারা বেষ্টিত X চিহ্নিত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেকটি বিন্দুই কাঠির দ্বারা সরলরেখাকে স্পর্শ বোঝায় এবং এই ক্ষেত্রের বাইরের বিন্দুগুলি স্পর্শ করে না বোঝায়।

তাহলে যত অধিক সংখ্যক বার কাঠিটাকে টস্ করা হবে, ততই X চিহ্নিত ক্ষেত্রের অভ্যন্তরস্থ বিন্দুগুলিকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী হবে। নিঃসন্দেহে এই ক্ষেত্রটির মধ্যে লক্ষ লক্ষ বিন্দুর অবস্থান সম্ভব; সুতরাং π-এর মান এই প্রক্রিয়ায় পেতে হলে বেশ কিছু সংখ্যক বার টস্ করতেই হবে। কাজেই ৩৪০০ বার টস্ করে ইতালীয় বিজ্ঞানী Lazzerini নিশ্চয়ই পাগলামির পরিচয় দেন নি—যদিও অনেক সময় এভাবে কাঠি টস্ করা নিতান্ত পাগলামির পর্যায়ে পড়ে।

অঙ্ক কষে দেখানো যায় যে, কাঠিটির দ্বারা সমান্তরাল সরলরেখাকে স্পর্শ (বা ছেদ) করবার সম্ভাবনা (Probability) হলো ক্ষেত্র ORM ÷ ক্ষেত্র OGKM এবং বর্তমান ক্ষেত্রে তার মান হবে $\frac{২l}{\pi a}$। আমরা সমস্যাটি সুরু করেছিলাম এই বলে যে, কাঠির দৈর্ঘ্যের চেয়ে সমান্তরাল সরলরেখার পারস্পরিক দূরত্ব দ্বিগুণ হবে, অর্থাৎ $a = ২l$. তাহলে $\frac{২l}{\pi a}$ হবে $\frac{1}{\pi}$। এই ব্যাখ্যা থেকে আর বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, মোট টস্ আসলে ক্ষেত্র OGKM এবং মোট স্পর্শ হলো ক্ষেত্র ORM। সুতরাং একটিকে আর একটি দিয়ে ভাগ দিলে π-এর মান পাওয়া যাবে।

মানবদেহে ধাতুর প্রভাব

শ্রীনিত্যগোপাল পোদ্দার

খাদ্য, পানীয় ও বায়ু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্য প্রয়োজনীয়। এদের মাধ্যমেই প্রবেশ করছে আমাদের দেহে অসংখ্য ধাতু। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে এদের কতকগুলির দান যেমন উল্লেখযোগ্য, নানারূপ রোগের উৎস হিসাবেও কতকগুলি অনস্বীকার্য। সুদীর্ঘ দশ বছরব্যাপী গবেষণা করে আমেরিকার ডার্টমাউথ মেডিক্যাল কলেজের ডক্টর স্রুডার দেখেছেন—কতকগুলি ধাতু খুব অল্প পরিমাণে হলেও শরীরের পক্ষে ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণের চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয়। মানবদেহ অধিক পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ তৈরি করতে পারে, কিন্তু ধাতু তৈরি করতে পারে না। মাইক্রোকেমিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধনের ফলেই অধুনা অ্যাটমিক অ্যাবজর্প্শন স্পেক্ট্রোফটোমিটার দিয়ে জীব-দেহের অভ্যন্তরের অতি অল্প পরিমাণ ধাতুরও পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণতঃ একজন সুস্থ ও সবল লোকের (৭০ কিলোগ্র্যাম) দেহের জন্যে ১০৫০ গ্র্যাম ক্যালসিয়াম, ২৪৫ গ্র্যাম পটাসিয়াম, ১০৫ গ্র্যাম সোডিয়াম, ৩৫ গ্র্যাম ম্যাগ্নেসিয়াম, ৪·২৫ গ্র্যাম লোহা, ১৫০ মিলিগ্র্যাম তামা, ২০ মিলিগ্র্যাম ম্যাঙ্গানিজ, ১৫ মিলিগ্র্যাম মলিবডিনাম, ৩ মিলিগ্র্যাম কোবাল্ট ও ১·৫ মিলিগ্র্যাম ক্রোমিয়াম প্রয়োজন।

মাটিতে কতকগুলি মৌলিক পদার্থ পরিমাণে খুব অল্প বা অধিক রয়েছে বলেই পৃথিবীতে 'অভিশপ্ত উপত্যকা' ও 'বিষময় সমভূমির' সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাংশে কতকগুলি স্থানে মাটিতে অতিরিক্ত পরিমাণে সেলিনিয়াম থাকায় গবাদিপশুর ক্ষুর পচে যায়। পূর্বে অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন অঞ্চলে মেষগুলি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে মারা যেত। খৈলে (Salt licks) অল্প পরিমাণ কোবাল্ট মিশিয়ে দিলে এই রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। প্রতি এক শত মেষের এক বছরের জন্যে এক আউন্স কোবাল্টই যথেষ্ট।

মানবদেহেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লোহা রক্তকণিকার অন্যতম সংগঠক। এটি মানবদেহে অক্সিজেন সঞ্চালনে সহায়তা করে। তাই অতি সামান্য পরিমাণেও এর অভাব হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। অল্প পরিমাণে লোহা দেহের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু পরিমাণ অতিক্রান্ত হলে এটি অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অ্যানিমিয়ার (Anemia) দরুণ যুক্তরাষ্ট্রে জননীরা চিনির সংমিশ্রণে ফেরাস সালফেট বটিকা সেবন করে থাকেন। তাঁদের শিশুরা অনেক সময় এই বটিকা গ্রহণে মারা যায়। বৃটেনে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত শিশুদের শতকরা দশজনেরই উৎস ফেরাস সালফেট। দক্ষিণ আফ্রিকায় বান্টু উপজাতীয় লোকেরা লোহার পাত্রে মদ তৈরি করে পান করে। সাধারণতঃ একজন স্বাস্থ্যবান লোকের যকৃতে ৪০ গ্র্যাম লোহা থাকে। কিন্তু এই মদের সঙ্গে ৫০ থেকে ১০০ মিলিগ্র্যাম লোহা দৈনিক তাদের পাকস্থলীতে প্রবেশ করে; ফলে তারা লিভার সিরোসিস রোগে (Liver Cirrhosis) আক্রান্ত হয়।

রক্তের অন্যতম সংগঠক তামা। ১৫০ মিলিগ্র্যাম তামা আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে

প্রয়োজন। পরিমাণ অতিক্রান্ত হলে এই ধাতু বিস হিসাবে কাজ করে। তামার বিষাক্ততায় 'উইলসন্স্ রোগ' (Wilson's disease) হয়। সাধারণতঃ যকৃৎ ও মস্তিষ্কে অতিরিক্ত পরিমাণে তামা সঞ্চিত হয়। এর ফলেই মস্তিষ্কে 'ট্রেমার' (Tremor) হয় এবং যকৃতের অনিষ্ট সাধন করে। শিশুরা এই সব রোগে আক্রান্ত হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।

শবদেহের অংশ পরীক্ষা করলে ক্যাডমিয়ামের সন্ধান মেলে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে। সাধারণতঃ ক্যাডমিয়ামের উৎস হচ্ছে ফস্ফেট সার, সেল মাছ এবং পাইপের সাহায্যে সরবরাহ করা পানীয় জল। মানবদেহে এই ধাতুর প্রভাব সম্পর্কে ডক্টর ক্রুডার ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণামূলক তথ্য বিশেস প্রণিধানযোগ্য। তাঁরা দুই দল ইঁদুরের প্রথম দলকে এমন খাদ্য দিলেন, যার ভিতর ক্যাডমিয়াম নেই এবং দ্বিতীয় দলকে এমন খাদ্য দিলেন, যার ভিতর পাশ্চাত্যের মানবদেহের ক্যাডমিয়ামের সমপরিমাণ ক্যাডমিয়াম বিদ্যমান। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের শতকরা নব্বইটি ইঁদুর উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হয়েছে আর তাদের আয়ুষ্কালও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু প্রথম দলের শতকরা নব্বইটি ইঁদুরের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। মানবদেহের উপর গবেষণা করেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়ার সন্ধান মিলেছে। আফ্রিকার উচ্চভূমির অধিবাসীদের মূত্রাশয়ে ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ আমেরিকা ও জাপানের অধিবাসীদের তুলনায় যথাক্রমে $\frac{১}{৮}$ ও $\frac{১}{৮}$ অংশ। ফলে আফ্রিকার ঐ অধিবাসীদের মধ্যে 'আর্টারি হার্ডেনিং' (Artery hardening) এবং 'হার্ট রেকেজ' (Heart wreckage) নেই বললেই চলে।

ক্যাডমিয়াম কি আর্টারি হার্ডেনিং এবং হার্ট রেকেজের মূল কারণ? এই প্রশ্নের উত্তর ব্যাপক গবেষণার অপেক্ষা রাখে। এই সব রোগের মূল কারণ প্রমাণিত হলে ক্যাডমিয়ামের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া মোটেই অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে না। রোগীকে ক্যাডমিয়ামের সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠনে সক্ষম একটি সহগ (Ligand) সেবন করালে রোগ নিরাময় হবে।

শবাংশ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবকোষে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। নবজাতকের দেহে এই ধাতুর পরিমাণ প্রাপ্তবয়স্কের তিন গুণ। ইঁদুরের উপর গবেষণা করে দেখা গেছে, ক্রোমিয়াম-বিহীন আহার দেওয়ায় শতকরা আশীটি ইঁদুর বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে মানবদেহের জীবকোষে ক্রোমিয়ামের পরিমাণ থাইল্যাণ্ডের লোকের জীবকোষের চেয়ে অনেক কম। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বহুমূত্র রোগে মৃত্যুর সংখ্যা থাইল্যাণ্ডের প্রায় দশ গুণ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইনসুলিন থাকা সত্ত্বেও অনেকে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

১। ক্রোমিয়াম ইনসুলিনকে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় সহায়তা করে। অথবা—

২। ক্রোমিয়াম কতকগুলি এনজাইমের সঙ্গে শর্করাজাতীয় খাদ্যের রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্দীপক (Promoter) হিসাবে কাজ করে এবং এর (ক্রোমিয়ামের) পরিমাণ হ্রাস পেলে এনজাইমগুলি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

শিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবার ফলে যথেষ্ট পরিমাণে সীসা চারদিক থেকে মানবদেহে প্রবেশ করছে। রং, সলডার ও পেট্রোলের ধোঁয়ায় প্রচুর পরিমাণে সীসা থাকে। শিল্পাঞ্চলের গাছপালায় এই ধাতু যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত হয়। অনেকের মতে, আমরা ক্রমাগত

এর কবলে পতিত হচ্ছি [অবশ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (W H. O) মতে, গত বিশ বছরে মানুষের পরিবেশে সীসার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায় নি]। বস্তি অঞ্চলেই 'সীসার বিষক্রিয়া' (Lead poisoning) সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে। পুরনো ও ক্ষয়িষ্ণু গৃহের রঙই এর ইন্ধন যোগায়। সাধারণতঃ শিশুরাই এই রোগের কবলে পড়ে।

উত্তর জাপানের কতকগুলি স্থানে মৃদুজল পান করে সন্ন্যাস রোগে (Appoplexy) বহু লোক মারা যায়। খরজলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম যৌগ (যেমন বাইকার্বোনেট বা ক্লোরাইড বা সালফেট) পাইপের সংগঠক ধাতুগুলির সঙ্গে বিবিধ যৌগ গঠন করে। পরে অন্যান্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাইপের ভিতর একটি স্থায়ী স্তরের সৃষ্টি হয়। সে স্তর ভেদ করে জলে মিশ্রিত কার্বন ডাইঅক্সাইডের অ্যাসিড প্রক্রিয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মৃদুজল সরবরাহ করা হলে এরূপ কোন স্তরের সৃষ্টি হয় না। জলে মিশ্রিত কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাসিড প্রক্রিয়ায় পাইপের ক্ষয় সাধন করে। ফলে মৃদুজল তামা, দস্তা, ক্যাডমিয়াম, সীসা প্রভৃতি ধাতু বহন করে নেয়। এসব ধাতু মিশ্রিত জলপানে 'আর্টারি হার্ডেনিং' রোগেরও উদ্ভব হয়।

ধাতুর মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধাতুর বিষক্রিয়াই সবচেয়ে বেশী। প্লুটোনিয়াম, ষ্ট্রনসিয়াম-৯০, সিজিয়াম-১৩৭ প্রভৃতি পদার্থের তেজস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় কতকগুলি বিপজ্জনক পদার্থের সৃষ্টি করে। মানবদেহের তন্তুগুলি রেডিও আইসোটোপের দ্বারা আক্রান্ত হলে নিষ্কৃতি পাওয়া একরূপ অসম্ভব। কতকগুলি রেডিও আইসোটোপ, বিশেষ করে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ থেকে বোন ক্যান্সার হয়ে থাকে।

মানবদেহে ধাতুর অনিষ্টসাধনের প্রমাণ পেয়ে বিজ্ঞানীরা নিরাশ হয়ে বসে নেই। গবেষণা চলেছে এবং চলবে। উদ্দেশ্য - রোগীকে নিরাময় করতে হবে, ধাতুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হবে। চিকিৎসা-জগতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে—নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলি ওষুধের বিশেষ পরিচয় হলো তারা যৌগিক সহগ (Chelating agent)। অবশ্য সহগ প্রয়োগে প্রয়োজন অনুসারে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া চাই—

১। সহগ এরূপ যৌগিক পদার্থ গঠন করবে, যা মলমূত্ররূপে শরীর থেকে বিদূরিত হতে পারে।

২। সহগ ধাতুকে এমন তন্তুতে বহন করে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে, যেখানে তার অভাব রয়েছে।

৩। সহগ, যে ধাতু রোগ-জীবাণুকে পোষণ করে' যৌগিক পদার্থ গঠন করে, তার কর্মক্ষমতা লোপ করে দেবে।

পূর্বে লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্তপাত করিয়ে অতিরিক্ত লোহা নিঃসারণ করা হতো। রক্তপাতের ফলে নতুন রক্তকণিকার উৎপত্তি হয়। সেই রক্তকণিকা বিভিন্ন তন্তুতে লোহা টেনে নেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ রক্তপাত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। লোহার সঙ্গে যৌগিক সংযোজন ঘটিয়ে এই রোগের চিকিৎসা করা যেতে পারে। বর্তমানে যৌগিক সংযোজক ডিস-ফেরিঅক্সামিন বি (Des-Ferrioxamine B) প্রয়োগে এর চিকিৎসা করা হয়ে থাকে।

তামার বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্কে ট্রেমার রোগ হয় এবং যকৃতের ক্ষয় সাধন করে। তামার সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠন করতে পারে এরূপ একটি সহগ পেনিসিলামাইন (Penicillamine) সেবনে এসব রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

কতকগুলি সংক্রামক ব্যাধি, রিউমেটিওড

আর্থিরিটিস (Rheumatiod arthiritis) এবং ক্যান্সারে রক্তে তামার পরিমাণ দুই বা ততোধিক গুণ বৃদ্ধি পায়। রক্তের মধ্যে জীবকোষে প্রয়োজনীয় তামার পরিমাণ হ্রাস পায়। তামার সঙ্গে যৌগিক পদার্থ গঠনের সহগ অ্যাসপিরিন (Aspirin) রক্ত থেকে তামা সংগ্রহ করে জীবকোষে ফিরিয়ে দেয়। অ্যাসপিরিনের পরিবর্তে কোন তাম্র-যৌগ প্রয়োগে ঐ একই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। রুগ্ন ইঁদুরের অন্তঃশিরায় তাম্রযৌগ ইন্‌জেকশন করে দেখা গেছে, জ্বর সেরে যায়। কপার সেলিসাইলেট (Copper salicylate) ইন্‌জেকশনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

সীসার বিষক্রিয়া চিকিৎসার গোড়া পত্তন হয় ১৯৫১ সালে ওয়াশিংটন শিশু হাসপাতালে। বিষাক্ততার ফলে একটি তিন বছরের শিশুর মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত (Brain damage) হয়। শিশুটিকে ক্যালসিয়াম ই ডি. টি. এ যৌগ (Calcium salt of E D T A) ওষুধ হিসাবে প্রয়োগ করায় তিন দিনের মধ্যে সে আরোগ্য লাভ করে।

কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের দ্বারা পাকস্থলী আক্রান্ত হলে আশু চিকিৎসা হিসাবে রোগীকে ঐ মৌলিক পদার্থের সঙ্গে অদ্রাব্য যৌগিক পদার্থ গঠন করতে পারে, এমন সহগ খাওয়াতে হবে। অদ্রাব্য যৌগিক পদার্থ মলরূপে শরীর থেকে নির্গত হয়। এইভাবে সিজিয়াম-১৩৭ ও ষ্ট্রনসিয়াম-৯০-এর কবল থেকে যথাক্রমে প্রুসিয়ান ব্লু ও সোডিয়াম এলজিনেটের (Sodium alginate) দ্বারা রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। অধুনা BAETA (Bis anhydro ethanolamine tetra acetic acid) নামে একটি সহগ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সহগ দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে রেডিও ষ্ট্রনসিয়াম নিঃসারণ করা যেতে পারে। অবশ্য রেডিও ষ্ট্রনসিয়াম দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার অল্প সময়ের মধ্যেই এর প্রয়োগ হওয়া চাই। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, DTPA-কে (Diethylene triamine penta acetic acid) প্রধানতঃ প্লুটোনিয়াম নিঃসারণের জন্যে ব্যবহার করা হলেও সেটা কোন টিউমারের প্রতিষেধক হিসাবেও কাজ করে।

যান্ত্রিক যুগের আবর্তে মানুষের পরিবেশের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। একদিকে যেমন মানবজীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়েছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, তেমনি আবার জরা, ব্যাধি, দুঃখ-দুর্দশাও বেড়ে গেছে বহু গুণে। ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ডক্টর পেটারসনের মতে, অদূর ভবিষ্যতে ধাতুর বিষক্রিয়া পারমাণবিক অস্ত্র এবং খাদ্য-সমস্যাকেও হার মানাবে। মানবদেহে খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের অভাব আজ এক বিরাট সমস্যা আর সে সমস্যা সমাধানের উপায়—খাদ্যপ্রাণ বটিকা। তেমনি আগামী দিনে দীর্ঘ-জীবন লাভের প্রধান অন্তরায় হবে মানবদেহে ধাতুর বৈরীসুলভ ক্রিয়া, যার প্রতিষেধক হবে যৌগিক সংযোজক (Chelating agent)।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মহাজাগতিক রশ্মির সাহায্যে পিরামিড সন্ধান

পুরাতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, মিশরের ফ্যারাওদের প্রকৃত সমাধি-প্রকোষ্ঠগুলি পিরামিডের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে গেছে সাড়ে চার হাজার বছর ধরে। উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই অনাবিষ্কৃত সমাধির সন্ধান করা যেতে পারে বলে মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্র এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদল নিয়ে একযোগে এই সন্ধানের কাজ করবেন। গিজেতে অবস্থিত সেফরেনের সুবিশাল দ্বিতীয় পিরামিডের অভ্যন্তরে অনাবিষ্কৃত সমাধি-কক্ষ আছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে তাঁরা এক্স-রে পদ্ধতির অনুরূপ একটি প্রক্রিয়া প্রয়োগ করবেন। এই কাজে এক্স-রে প্রক্রিয়া ঠিক উপযোগী নয়। তাই বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক রশ্মিকণা বা পারমাণবিক কণা পিরামিডের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। অপর দিকে থাকবে মহাজাগতিক রশ্মিকণা-নির্ধারক যন্ত্র। এই রশ্মিকণা পাথরের মত কঠিন বস্তু ভেদ করে গেলে তার তীব্রতা অনেক কমে যায়; কারণ কঠিন পাথর তার অনেকখানি শোষণ করে নেয়। কিন্তু এই পাথরের অভ্যন্তরে কোন ফাঁকা জায়গা থাকলে রশ্মিকণা তার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে তার তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং পিরামিডের মধ্যে কোন গোপন কক্ষ থাকলে কিছুটা অংশ ফাঁকা থাকবে। রশ্মি এই স্থান অতিক্রম করে পিরামিডের অপর দিকে রক্ষিত নির্ধারক যন্ত্রে পৌঁছুলে তার তীব্রতা ধরা পড়বে। কাজেই বিজ্ঞানীরা তখন পিরামিডের অভ্যন্তরে গোপন প্রকোষ্ঠের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবেন। অতঃপর পিরামিডের গাত্র ভেদ করে ঐ স্থান বরাবর সুড়ঙ্গ খনন করা হবে। এই কাজের জন্যে যে বিশেষ ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন হবে, বর্তমানে তা নির্মিত হচ্ছে ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলেতে অবস্থিত লরেন্স রেডিয়েশন লেবরেটরীতে। এখানে মার্কিন ও আরব বিজ্ঞানীরা প্রথমে নকল পিরামিড তৈরি করে ঐ যন্ত্র পরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর তাঁরা যন্ত্রটিকে নিয়ে যাবেন মিশরের গিজে শহরে। কয়েক মাস ধরে যন্ত্রটি অবিরাম কাজ করবে। আরব বিজ্ঞানীরা যন্ত্রটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেবেন এবং প্রতিদিন এর চৌম্বক ফিতাগুলি পরিবর্তিত করে দেবেন। কম্পিউটারের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ করা হবে কায়রোয়। এই বিজ্ঞানী দলের নেতৃত্ব করবেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক পদার্থবিদ ডাঃ লুইস আলভারেজ এবং কায়রোর আইন শ্যাম্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পারমাণবিক পদার্থবিদ্ ডাঃ এফ. এল. বেদেউই।

ভাবীকালের মোটর গাড়ী

বৃটিশ বিজ্ঞানীরা এমন তিনটি আবিষ্কার করেছেন, যার ফলে ভাবীকালের মোটর গাড়ীর রূপই বদ্‌লে যাবে। এই তিনটি আবিষ্কার হলো—অতি ক্ষুদ্র ব্যাটারী-চালিত রেডার সেট, ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক ক্লাচ (Electrostatic clutch) ও ট্র্যানজিস্টরাইজড ইগ্‌নিশন সিষ্টেম (Transistorised ignition system)।

একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে ডাঃ সিরিল হিলশম (রেডার রিসার্চ এস্টাব্লিশমেন্ট মেলভার্ন, বৃটেন) এক অতি ক্ষুদ্রাকৃতির রেডার সেটের ব্যবহার দেখিয়েছেন। তিনি একটি বৈদ্যুতিক ট্রেনে এই রেডার সেট যোগ করে

দেখিয়েছেন, তার সাহায্যে ট্রেনটির গতি, লক্ষ্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা যায়। এথেকে বোঝা যায় যে, ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্রাকৃতির রেডার সেট ট্রেন বা মোটর গাড়ীর সঙ্গে যুক্ত করলে সামনের বাধাবিঘ্ন বা কোন বিপদের সম্ভাবনা ঘটলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। এপর্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির রেডার সেট আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই জিনিসটা শুধু কল্পনাতেই ছিল। এর আর একটা শুভ ফল হবে এই যে, কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ায় ট্রেন দুর্ঘটনা অনেক কমে যাবে।

মোটর গাড়ীর ক্লাচে দুটি ডিস্ক এমনভাবে সংযুক্ত করা থাকে, যাতে সে দুটি একই দিকে ঘুরতে পারে। জি. ই. সি-র বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা—এই কাজ চালাতে পারে, এমন ইলেকট্রোষ্টাটিক ক্লাচ (Electrostatic clutch) উদ্ভাবন করেছেন। তাঁরা একটি তড়িৎ-অপরিবাহী উপাদানে তৈরি বড় ডিস্কের সামনে রিং-এর আকারে ছয়টি ছোট ছোট সেলুলোজ কার্বন ডিস্ক রেখে একই ফল পেয়েছেন। এই রকম একটি ক্লাচ গবেষণাগারে ১৮ মাস ধরে কাজ করছে, কিন্তু যন্ত্রটির কোনরূপ ক্ষতি হয় নি।

এই ক্লাচ অবশ্য এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এই ক্লাচের একটি সুবিধা এই যে, ম্যাগ্‌নেটিক ক্লাচের চেয়ে এতে ক্লাচ-অন-টাইম (ক্লাচ ব্যবহার করা থেকে ক্লাচ কাজ করবার সময়) কম লাগে।

ইগ্‌নিশন সিষ্টেম উদ্ভাবন করেছে অ্যালডারম্যাষ্টনের অ্যাটমিক ওয়েপন্‌স্ রিসার্চ এষ্টাব্লিশমেন্ট। অনেক দিন ধরেই এই সিষ্টেম নিয়ে কাজ হচ্ছিল। এই উদ্ভাবনের ফলে কন্ট্যাক্ট ব্রেকারস্‌-এর (Contact breakers) ক্ষয় ও অন্যান্য ঝঞ্ঝাট থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। উচ্চ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে বর্তমানে যে সুদীর্ঘ তার লাগে, তারও প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া জলীয় বাষ্পজনিত ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকবে না।

ফিজিক্স প্রদর্শনীতে বৃটিশ বিজ্ঞান দেখিয়েছেন, উপরিউক্ত তিনটি আবিষ্কারের ফলে ভাবীকালের মোটর হবে আরও নিরাপদ, নির্ভর-যোগ্য ও সস্তা।

ঊর্ধ্বে প্রেরিত দূরবীক্ষণের সাহায্যে নক্ষত্রের সন্ধান

এই প্রথম পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরে গিয়ে দূরবীক্ষণের সাহায্যে নতুন তিনটি তারকার সন্ধান করা হয়েছে। গত ১৫ই জুলাই নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্যাণ্ডস্‌-এর ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র থেকে এরোবি রকেটের সাহায্যে ৩৩০ পাউণ্ড ওজনের যন্ত্রপাতি পৃথিবী থেকে ৯০ মাইল ঊর্ধ্বে প্রেরিত হয়। পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরে থেকে ঐ যন্ত্রের সাহায্যে অতিবেগুনী আলোতে তিনটি নক্ষত্রের সন্ধান করা হয়। এদের একটি হলো ভেগা। এটি পৃথিবী থেকে ২৫ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত। এক আলোক-বর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোকরশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তাই বোঝায়। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬৩২৬ মাইল। দ্বিতীয় নক্ষত্রের নাম ল্যামডা স্করপিয়া ; এর দূরত্ব ২১৫ আলোক-বর্ষ। তৃতীয়টি হলো জেটা অফিউকাস ; এর দূরত্ব পাঁচ শতেরও বেশী আলোক-বর্ষ। আবহমণ্ডলের জন্যে ভূপৃষ্ঠ থেকে এই সকল নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই পরিকল্পনার নামকরণ করা হয়েছে 'স্ট্র্যাপ'। উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে ৫৫ মাইল দূরে একটি স্থানে যন্ত্রপাতিসমূহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং রকেটের সাহায্যে এগুলি পুনরায় ঊর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হবে বলে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী থিয়োডোর পি. স্টেটার বলেছেন

যে, এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা বিশ্লেষণ করতে বেশ কয়েক মাস লাগবে।

ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের অভিনব ব্যবস্থা

আমেরিকায় ফলমূল প্রভৃতি খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের একটি অভিনব পদ্ধতি সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে ফলমূল বহুদিন টাট্‌কা রাখা যায় এবং বহু দূরে পাঠালেও পচে নষ্ট হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অক্সিজেনের অবস্থিতির জন্যেই যে ফলমূল পেকে পচে যায় ও শাকসব্জী নষ্ট হয়, তা অনেকেই জানেন। এই পদ্ধতিতে খাদ্য-সংরক্ষণাগারে যে পরিমাণ অক্সিজেন থাকে, তার শতকরা ১ ভাগ মাত্র রেখে সকলই একটি যন্ত্রের সাহায্যে বের করে আনা হয় এবং অবস্থা অনুযায়ী সেখানে নাইট্রোজেন ভর্তি করা হয়। ঐ পদ্ধতিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানোর ব্যবস্থা আছে। এর ফলে ঐ সংরক্ষণাগারে রক্ষিত খাদ্য ও ফলমূলের পচন সাময়িকভাবে নিবারিত হয়।

এই সকল সাজসরঞ্জাম একটি ট্রাকের মধ্যেও বসানো যেতে পারে। কেবল ফলমূল, শাকসব্জীই নয়, মাছ-মাংস ও ফুল নিয়েও পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেছে। নাইট্রোজেনের মধ্যে রাখবার জন্যে ঐ সকল খাদ্য কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত অবিকৃত থাকে।

তবে মার্কিন কৃষি দপ্তর সংরক্ষণের এই নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন, এই পদ্ধতির আরও উৎকর্ষ বিধান প্রয়োজন। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, টমেটো, ফুটি, খরমুজ ও তরমুজ প্রভৃতি ফল সংরক্ষণের জন্যে পাকবার আগেই তোলা হয়। এখন ঐ সকল ফল একেবারে পাকবার পরেই বাগান থেকে তুলে এনে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণাগারে রাখা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে অকালেও অল্পমূল্যে নানারকমের ফল পাওয়া যেতে পারে এবং দূরদেশেও পাঠানো যেতে পারে। পচে নষ্ট খুবই কম হবে বলে এই সকল ফলমূল সস্তায় পাওয়া যাবে।

আমেরিকার বেষ্ট ফার্টিলাইজার নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ইঞ্জিনিয়ার ডেভিড ডিক্সন কর্তৃক এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। ঐ প্রতিষ্ঠানটি অক্সিডেন্টাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনেরই একটি শাখা। বেষ্ট ফার্টিলাইজারই খাদ্য সংরক্ষণের এই যন্ত্রটি তৈরি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে আরও দুটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান—ইউনিয়ন কারবাইড কর্পোরেশন ও রেডিও অব আমেরিকা খাদ্য সংরক্ষণের সাজসরঞ্জাম তৈরি করে থাকে।

শিল্পে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার

ফ্যাশনের জন্যেই কৃত্রিম তন্তুর চল, এই কথাই অধিকাংশ লোক জানে; যেমন—নাইলনের মোজা, রেওন ও টেরিলিনের জামা-কাপড় প্রভৃতি। কিন্তু নাইলন, টেরিলিন যে ফ্যাক্টরির কনভেয়র বেল্টকে অতিরিক্ত শক্তি জোগায় এবং ফায়ার ব্রিগেডের আগুন-নেবানো পাইপকে জোরদার করে, তা কয়জন জানে?

বৃটেনে প্রস্তুত রেওনের অনেকটাই যায় মোটর গাড়ীর টায়ারের অন্তর্বাস তৈরি করতে। কোর্টওল্ড লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশেষ রেওন দ্রুতগতিতে চলমান টায়ারের সমস্ত ধকল সহ্য করতে পারে।

বর্তমানে দ্রুত চলমান গাড়ীর টায়ারে ও বিমানের চাকায় নাইলন ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমান সব দিক দিয়ে যত হাল্‌কা হয়, ততই ভাল। সেদিক দিয়ে বিমানের চাকার পক্ষে নাইলন খুবই ভাল। নাইলন খুব শক্ত, উচ্চ গতিসম্পন্ন বিমান অবতরণের চাপ সহ্য করতে সক্ষম।

নাইলন সহজে পচে না। বন্ধুর পথে চলবার সময় ভারী গাড়ীগুলির টায়ারের উপরিভাগ কেটে-ছিঁড়ে যায়, কিন্তু তাতেও ভিতরের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মানুষের তৈরি তন্তু শক্ত, হাল্কা ও সহজে পচনশীল নয়। তাই তা দিয়ে নাবিক ও মৎস্য-শিকারীদের চমৎকার দড়ি, সূতা ইত্যাদি তৈরি হয়ে থাকে।

ভিতরের সূতাগুলির পরস্পর ঘর্ষণে সাধারণতঃ দড়ি সহজে ছিঁড়ে যায়। বৃটেনে উদ্ভাবিত বিশেষ নাইলন ব্যবহারে এই ক্ষয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

মানুষের তৈরি তন্তু দিয়ে এখন লরী বা রেল ওয়াগনে ব্যবহৃত ত্রিপল তৈরি হচ্ছে। এই তন্তুর সঙ্গে রবার ও প্লাস্টিক মিশিয়ে তরল পদার্থ বহনক্ষম ব্যাগ তৈরি করা যেতে পারে। এতে সুবিধা হবে এই যে, খালি অবস্থায় ব্যাগটিকে ভাঁজ করে রাখা যাবে।

জল তোলবার অভিনব পাম্প

আমেরিকার ব্যুরো অব মাইন্‌স্‌ কয়লার গুঁড়ার সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তিতে চালিত এক প্রকার অভিনব পাম্প আবিষ্কার করেছেন। মোটর গাড়ীতে গ্যাসোলিনের সাহায্যে যেমন বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়, তেমনি ঐ পাম্প চালাবার জন্যে কয়লার গুঁড়া থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হয়ে থাকে। নীচে থেকে উপরে জল তোলবার অথবা নলের মধ্য দিয়ে জল প্রবাহিত করবার জন্যে এই পাম্প ব্যবহৃত হয়। ব্যুরোর গবেষণাগারসমূহে কয়লা এবং কয়লার উপজাত বস্তুসমূহের নতুন নতুন ব্যবহার সম্পর্কে সর্বদাই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

ব্যুরো অব মাইন্‌সের ডিরেক্টর ওয়াল্টার আর. হিবার্ট এই প্রসঙ্গে বলেছেন—সম্পূর্ণ ত্রুটিশূন্য হলে এটিকে সেচকার্যে লাগানো যাবে এবং খরচও খুব কম পড়বে। খনিগর্ভে যারা কাজ করে, তারা কয়লার গুঁড়াতে বিস্ফোরণের বিষয়টি ভাল করেই জানে। এই বিষয়টি বহুকাল ধরে পর্যবেক্ষণ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ফলেই এই পাম্প উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে।

আইসোটোপের সাহায্যে ক্যান্সার রোগ নির্ণয়

স্যানফ্রান্সিসকোর ডাঃ কেনেথ জি. স্কট এবং জে. এম. ভোগেল টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইন্টার-ন্যাশন্যাল ক্যান্সার কংগ্রেসের অধিবেশনে ক্যান্সার রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রুবিডিয়াম আইসোটোপের কার্যকারিতার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁরা যে পর্যায়ে পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার এই আইসোটোপের সাহায্যে ধরতে পেরেছেন, ঐ পর্যায়ে মামুলী এক্স-রে অথবা প্রচলিত অন্যান্য পদ্ধতিতে তা ধরা পড়ে না। এই রোগ নির্ণয়ের এই পদ্ধতিটি সহজ এবং এতে খরচও খুব কম পড়ে।

ডাঃ স্কট ও ডাঃ ভোগেল পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোন সুস্থ ব্যক্তির রক্ত-কোষের রুবিডিয়াম আইসোটোপ আত্মসাৎ করতে যে সময় লাগে, কোন ক্যান্সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত-কোষ তার ২০ গুণ কম সময়ে তা আত্মসাৎ করে থাকে। গামা-রে স্পেক্‌ট্রোমিটারের সাহায্যে তাঁরা এই পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। বর্তমানে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে যেমন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, তেমনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কেও ভবিষ্যতে রুবিডিয়াম আইসোটোপের সাহায্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের নিউট্রনের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই আইসোটোপের সৃষ্টি হয় এবং আইসো-টোপের পারমাণবিক ওজন ব্যতীত আর সব রকম রাসায়নিক ধর্ম সর্বাংশে মৌলিক পদার্থের মতই থাকে।

বিমানযাত্রায় লেসারের ব্যবহার

তীব্র লেসার রশ্মির সাহায্যে সুকঠিন হীরার মধ্যেও ছিদ্র করা যায় এবং চোখের অস্ত্রোপচারে বিচ্ছিন্ন রেটিনারও পুনঃসংযোগ সাধিত হয়ে থাকে।

সম্প্রতি মার্কিন বিমান বাহিনীর ওহিয়োর রাইট প্যাটার্সন ঘাঁটির বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে লেসারকে বিমানযাত্রায়ও ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন্ পথে গেলে ঝড়ঝাপটা, অন্য কোন বিমানের সঙ্গে এবং ভূতলে অন্য কোন কিছুর সঙ্গে সংঘর্ষ হবে না, লেসার ব্যবস্থা বিমান চালককে তার নির্দেশ দিয়ে থাকে। আকারে এটি একটি ছোট দেশলাইয়ের মত।

দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াই

পৃথিবীর বহু স্থানে দাবানল এক গুরুতর বিপদস্বরূপ। বৃটেনে দাবানলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আঠালো জল (Steaky water) নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সমুদ্রের আগাছা থেকে পাওয়া সোডিয়াম অ্যালজিনেটের সঙ্গে জল মিশিয়ে এই তরল পদার্থটি ছড়িয়ে দিলে গাছ ও পাতায় লেগে থাকবে, গড়িয়ে পড়বে না।

লণ্ডনের কাছে বোরহ্যাম উড-এর গবেষণাকেন্দ্রে অরণ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষা চালানো হচ্ছে। এলাকার সীমান্তবর্তী গাছগুলিকে আঠালো জলের রিবন দিয়ে বেঁধে আগুন যদি আর বিস্তৃত হতে দেওয়া না হয়, তাহলে অগ্নিনির্বাপক দলের কাজের অনেক সুবিধা হবে।

অনধিকার প্রবেশ রোধ করবার জন্যে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

কারখানা বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ রোধ ও প্রস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে বৃটেনে একটি নতুন ধরণের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পকেট-মাপের প্লাষ্টিকের কার্ডে সাদা চোখে দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, এমন সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা থাকে। এই কার্ডগুলি চাবির কাজ করে।

এই কার্ডগুলি দরজা, গেট বা টার্নষ্টাইলে লক-ইউনিটগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত করে। এই পদ্ধতিতে এই ভাবে কার্ড-চাবি আছে, এমন বাঞ্ছিত ব্যক্তিরা প্রবেশাধিকার পান ও অনধিকার প্রবেশকারীরা প্রবেশে বাধা পান।

লক-ইউনিটগুলি প্রবেশ পথের মুখে দেয়ালে, চৌকাঠে অথবা ব্র্যাকেটে লাগানো থাকে। ২$\frac{1}{8}$×৬ ইঞ্চি আয়তনের কার্ডে লেখা অদৃশ্য সঙ্কেত পাঠ করে লক-ইউনিটগুলি তা কণ্ট্রোল ক্যাবিনেটকে জানিয়ে দেয়। কণ্ট্রোল ক্যাবিনেট তা বিচার করে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেয়।

যদি কোন নকল কার্ড ধরা পড়ে, তাহলে প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হয় না এবং নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত পান।

অন্য পদ্ধতিগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করলে 'চেকমেট' নামের এই পদ্ধতিতে শিল্পক্ষেত্রে অনেক গণ্ডগোলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

১৯৬৬ সালের জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে খ্যাতনামা ফরাসী পদার্থ-বিজ্ঞানী অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্ত্‌লারকে (Alfred Kastler)। পদার্থ-বিজ্ঞানে যে অবদানের জন্যে সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করেছেন, সেটি 'অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং মেথড' (Optical Pumping Method) নামে সুপরিচিত। পরমাণুসমূহের মধ্যে হার্ৎজীয় অনুরণন (Hertzian resonance) পর্যবেক্ষণের জন্যে আলোক-শক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত এই পদ্ধতিটি অতীব জটিল এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এই বিষয়টির ধারণা বোধগম্য করে তোলা খুবই কঠিন। এখানে এই পদ্ধতির মূল কথা সাধারণভাবে আলোচনা করা হবে।

অধ্যাপক কাস্ত্‌লার কর্তৃক উদ্ভাবিত এই পদ্ধতি অণু-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন সূক্ষ্মভাবে জানবার পক্ষে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কাস্ত্‌লারের এই কাজের সূত্রপাত হয় তাঁর সহকর্মী ডাঃ জাঁ ব্রসেলের গবেষণায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণাকালে ডাঃ ব্রসেল সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন, আলোক-শক্তি প্রয়োগ করে উত্তেজিত পরমাণুর চৌম্বক অনুরণন পর্যবেক্ষণ করা যায়। অধ্যাপক কাস্ত্‌লার পদার্থের মৌলিক অবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সম্প্রসারিত করেন। ১৯৫০ সালে 'জুর্ণাল দ্য ফিজিক' পত্রিকায় 'অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং প্রোসেস' (Optical Pumping Process) শিরোনামায় তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন, তীব্র আলোকে পরমাণুসমূহকে রেখে যদি যথাযথভাবে সমবর্তিত (polarised) করা হয়, তাহলে পরমাণুসমষ্টির বিন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে।

আমরা জানি, কোন অবস্থায় পরমাণুসমষ্টি কিভাবে বিন্যস্ত হবে, সেটা নির্ভর করে পরমাণুর স্তর ও তার দেশ-ধর্মের (Spatial properties) উপর। এই ব্যাপারে পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামক (Magnetic moment) এবং তাদের গতীয় ভ্রামকেরও (Kinetic moment) প্রভাব আছে।

আমরা জানি, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চার ধারে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন শক্তি-স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে। ইলেকট্রনগুলি যখন শক্তি লাভ করে বা হারিয়ে এক শক্তি-স্তর থেকে অন্য স্তরে লাফিয়ে চলে যায়, তখন আলোক শোষিত বা নির্গত হয়। আবার ইলেকট্রনের স্পিন (Spin) অনুযায়ী শক্তি-স্তরগুলি 'সূক্ষ্ম স্তরে' বিভক্ত। এছাড়া বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে পরমাণুর চৌম্বক অক্ষ বিভিন্ন ভাবে বিন্যস্ত হলে বিভিন্ন 'জীম্যান-স্তরের (Zeeman level) সৃষ্টি হয়। এরপর আবার পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামক ও তার নিউক্লিয়সি ভ্রামকের পারস্পর্য অনুযায়ী 'অতি সূক্ষ্ম স্তর' (Hyperfine structure) সৃষ্টি হয়। এই অতি সূক্ষ্ম স্তরগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় এই স্তরগুলি একটা নির্দিষ্ট ব্যবধানে থাকে, পক্ষান্তরে জীম্যান ব্যবধান রচিত হয় পরমাণুর উপর আরোপিত চৌম্বক ক্ষেত্রের মান অনুযায়ী। অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন স্তরে পরমাণুর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটানো যেতে পারে, অর্থাৎ কোন এক শক্তিস্তর থেকে উচ্চ বা নিম্নমানের স্তরে পরমাণুগুলিকে আনা যেতে পারে। যেমন ধরা যাক, কোন এক স্তরে শতকরা ৫০ ভাগ পরমাণু আছে এবং অপর একটি স্তরে আছে বাকী ৫০ ভাগ (সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে)। এখন অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং

পদ্ধতির সাহায্যে পরমাণুর সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি স্তরে শতকরা ২০ ভাগ পরমাণু ও অপর স্তরে শতকরা ৮০ ভাগ পরমাণুর বিন্যাস করা যেতে পারে। আরও সরল ভাষায় বলতে গেলে, কোন এক স্তরে পরমাণুর সংখ্যা বাড়ানো ও অপর স্তরে কমানো যেতে পারে, অথবা উল্টোভাবে এক স্তরে পরমাণুর সংখ্যা কমানো ও অপর স্তরে বাড়ানো যেতে পারে। কারণ বৃত্তাকারে সমবর্তিত আলোকের (Circularly polarised light) একমুখীকরণের (Orientation) পরিবর্তন ঘটলে পাম্পিং পদ্ধতিও বিপরীত দিকে সঞ্চালিত হয়।

এখন পরমাণুর সমাবেশে (যেমন কোন গ্যাসের পরমাণুর ক্ষেত্রে) জীম্যান স্তর অনুযায়ী দেশে (Space) পরমাণুর চৌম্বক অক্ষ পরিবর্তিত হয়। তখন পরমাণুগুলি সমবর্তিত হবার ফলে গ্যাসটি চৌম্বক ধর্ম প্রাপ্ত হয়। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, রুবিডিয়াম ও সিজিয়াম প্রভৃতি ক্ষারীয় পদার্থের পরমাণুর ক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করা গেছে। অধ্যাপক কাস্ত্‌লার ও তাঁর সহযোগীরা দেখিয়েছেন যে, অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতির সাহায্যে পরমাণুর নিউক্লিয়াসেরও একমুখীকরণের পরিবর্তন ঘটানো যায়। পারদ ও ক্যাডমিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের উপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা এটি লক্ষ্য করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, এই অপটিক্যাল পাম্পিং পদ্ধতি প্রধানতঃ নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছেই বিশেষ আগ্রহের বিষয়। কারণ এই পদ্ধতির সাহায্যে হিলিয়াম-৩ পরমাণুর নিউক্লিয়াসের অক্ষের একমুখীকরণের পরিবর্তন ঘটানো গেছে। এভাবে পরিবর্তিত হিলিয়াম গ্যাস নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত পরীক্ষায় সমবর্তিত লক্ষ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—গ্যাসীয় অবস্থায় পরমাণু বা নিউক্লিয়াস যখন পরিবর্তিত হয়, তখন যদি গ্যাস থেকে আলোক সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে কি হবে? দেখা গেছে, এক্ষেত্রে অক্ষগুলি ক্রমশঃ তাদের স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসে। স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরে আসবার এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় 'রিল্যাকসেশন' (Relaxation)। কিভাবে এই প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, পরমাণুগুলি আধারের (কাচ বা স্ফটিক-নির্মিত) গায়ে আঘাত করে। এক সময় ভাবা হতো, পরমাণুগুলি আধারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে। কিন্তু এখন জানা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় না। এখন ভাবা হয়, অত্যল্প সময়ের জন্যে পরমাণুগুলি আধারের গায়ে লেগে থাকে। আধারের সঙ্গে পরমাণুর এই ধাক্কার গোড়ায় ঘটে অবশোষণ (Adsorption) এবং তারপর হয় বাষ্পীভবন (Evaporation)। এক সেকেণ্ডের ১০ লক্ষ ভাগের একভাগ সময়ে এটা ঘটে যায়। কিন্তু নিউক্লীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের বিচারে এই অত্যল্প সময়ও হচ্ছে 'অতি দীর্ঘ' সময়। এই সময়ের আবার তারতম্য ঘটে আধারগাত্রের তাপমাত্রা ও প্রকৃতি অনুযায়ী। যখন কোন আধারগাত্রে কোন কিছু প্রলেপ মাখানো হয়, তখন পরমাণুর লেগে থাকবার সময় পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি আধারগাত্রে

প্যারাফিন বা সিলিকনের একটা প্রলেপ দেওয়া হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সময় কমে যাবে এবং রিল্যাকসেশনের সময় হবে দীর্ঘতর। এই ধরণের ঘটনা পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে এই বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা কঠিন। তবে এই জটিল বিষয়টি ইতিমধ্যেই নানা উল্লেখযোগ্য কাজে লাগানো হয়েছে। এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ফ্রান্সে অপ্‌টিক্যাল পাম্পিং ম্যাগ্‌নোমিটার (Optical pumping magnometer) নির্মিত হয়েছে। এই যন্ত্রটি ওজনে যেমন হাল্কা, তেমনি সহজে বহনও করা যায়। বিমান থেকে ফ্রান্সের চৌম্বক মানচিত্র প্রস্তুতের কাজে ভূ পদার্থবিজ্ঞানীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করেছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে এমন কয়েক রকম আকরিকের স্তর সনাক্ত করা গেছে, ভূগর্ভে যাদের অস্তিত্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে বলরেখার পরিবর্তনের দ্বারা ধরা যায়। এক নতুন ধরণের পারমাণবিক ঘড়িও এই পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে, যার সময়ের নির্ভুলতা অতুলনীয়। তবে কাস্ত্‌লার পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য প্রয়োগ হচ্ছে লেসার ও মেসারের ক্ষেত্রে।

অধ্যাপক কাস্ত্‌লার এককভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু তাঁকে পুরস্কার দেবার সময় সুইডিশ অ্যাকাডেমি ডাঃ জাঁ ব্রসেলের কথা বিবেচনা না করায় অধ্যাপক কাস্ত্‌লার দুঃখিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁদের দুজনকে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত ছিল। এই মন্তব্য থেকে তাঁর বিজ্ঞানী-সুলভ উদার হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

অধ্যাপক কাস্ত্‌লার ১৯০২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে "একোল নর্মেল সুপিরিওর' প্রতিষ্ঠানের পদার্থ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের বর্ণালী-বীক্ষণ বিভাগের প্রধান। ১৯৬৪ সালে তিনি ফ্রান্সের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন এবং তার পূর্বে অ্যাকাডেমির গ্র্যাণ্ড প্রিক্স লাভ করেন। প্যারীর পৌর কর্তৃপক্ষও তাঁকে গ্র্যাণ্ড প্রিক্স দিয়েছেন। আমেরিকার অপ্‌টিক্যাল সোসাইটি তাঁকে মীজ্‌ পদক এবং ফ্রান্সের জাতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন্দ্র তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করেছেন। লোভেন, পিসা এবং অক্স-ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেছেন। বিদেশের একাধিক বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি ও সোসাইটির সদস্যপদে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা
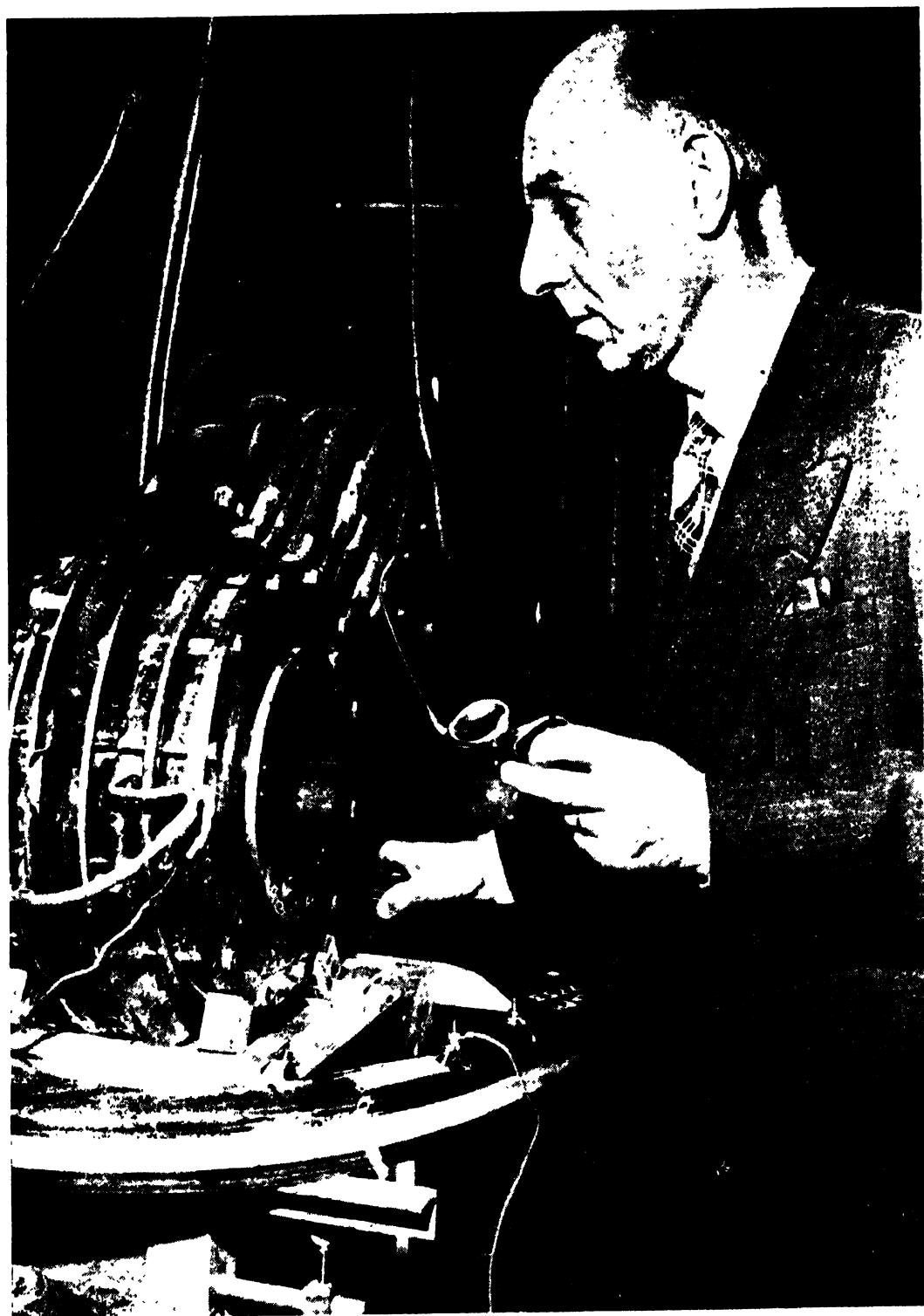
নিজ গবেষণাগারে অধ্যাপক আলফ্রেড কাস্তলার।

ইনি ১৯৬৬ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন

পেনিসিলিন আবিষ্কারের ইতিহাস

১৮৮১ সালের যে সময়ের কথা বলছি, তখন আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান জন্ম নিচ্ছে; কিন্তু পরিপূর্ণ আকার তখনও লাভ করে নি। ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর গবাদি পশুর উপর পরীক্ষা চালিয়ে টীকা দেবার উপকারিতা প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা সম্পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে নি। পাস্তুরের ছাত্র মেচ্‌নিকফ রক্তের ভিতর শ্বেতকণিকা (Phagocytes) আবিষ্কার করেন, যাদের কাজ হলো দেহের অভ্যন্তরে দূষিত জীবাণুগুলিকে আক্রমণ করে ধ্বংস করা। কিন্তু একটা প্রশ্ন সর্বদাই থেকে গেল যে, এই শ্বেতকণিকাগুলির জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতা থাকলেও দেহকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তাদের খুবই কম। শ্বেতকণিকাগুলি নির্দিষ্ট পরিমাণে রক্তের সঙ্গে মিশে আছে এবং তাদের ক্ষমতাও নির্দিষ্ট। তাই যখন দেহে এই কণিকাগুলির অভাব পড়ে অথবা অসংখ্য পরিমাণ জীবাণু যখন দেহকে বাইরে থেকে আক্রমণ করে, তখন এরা তাদের প্রতিরোধ করতে পারে না। অনেক দিন পর্যন্ত এই সমস্যার কোন সমাধান হয় নি। পর পর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধে হাজার হাজার আহত সৈনিক ও নাগরিক বাইরের দূষিত জীবাণুর আক্রমণ থেকে নিস্তার পায় নি—কেন না, ক্ষতস্থানে পচন নিবারণের জন্যে কোন প্রতিরোধক ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। পেনিসিলিন আবিষ্কার করে এই কাজ সমাধা করলেন সার আলেক-জাণ্ডার ফ্লেমিং। পেনিসিলিনের প্রধান কাজ হলো রক্তের ভিতর শ্বেতকণিকাগুলিকে যথেষ্ট প্রতিরোধক শক্তি যোগান দেওয়া, যাতে এরা সহজেই বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং দেহ সহজে বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে না বা ক্ষতস্থানে পচন ধরে না। তাছাড়া রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিতে এমন এক স্থিতিশক্তি প্রদান করে, যাতে ভবিষ্যতের যে কোন রকম আক্রমণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।

পেনিসিলিন আবিষ্কার এ-যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর অবদান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটময় মুহূর্তে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং কিভাবে মানুষকে দূষিত জীবাণুর আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার এক অদ্ভুত প্রতিরোধক শক্তি আবিষ্কার করেন, তা ভাবলে সত্যই আশ্চর্য হতে হয়। ইতিহাসের বিচিত্র গতিপথে মানুষের চিন্তাধারা কি রকম বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়, তা এই সব অনুধাবন না করলে বোঝা যায় না।

সার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৮৮১ সালে আয়ারশায়ারের ডারভেলে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায় তিনি চার মাইল দূরে গ্রামের এক স্কুলে পড়তেন। বাল্যকাল

থেকেই অসাধারণ অধ্যবসায় এবং ধৈর্য তাঁকে পরবর্তী কালে মহিমামণ্ডিত করেছিল। স্কুলের পাঠ শেষ করে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে লণ্ডন যাত্রা করেন। তারপর তিনি এক জাহাজী কোম্পানীর অফিসে কেরাণীর কাজ আরম্ভ করেন। এই সময়েই তিনি কার্যোপলক্ষে সেণ্ট মেরী মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত হন এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। তিনি টাইফয়েডের প্রতিরোধক টীকার আবিষ্কর্তা ডাঃ রাইটের কাছে প্রথম কাজে নিযুক্ত হন এবং আট বছর তাঁর গবেষণাগারে জীবাণু-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই সময় তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের জীবাণু পরীক্ষা করতেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এমন এক রাসায়নিক পদার্থ বের করা, যার কাজ হবে রক্তের Phagocyte-গুলিকে সতেজ করা।

এরপর ফ্লেমিং এক সৈনিক হাসপাতালে যোগ দেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে সুরু হয়েছে। যুদ্ধে আহত সৈনিকদের এখানে চিকিৎসার জন্যে পাঠানো হতো, কিন্তু তাদের বেশীর ভাগকেই বাঁচানো সম্ভব হতো না—কেন না, বাইরের ধূলাবালির সংস্পর্শে ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে উঠতো। এভাবে প্রায় সাত লক্ষ লোককে জীবনদান করতে হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান তখন অত্যন্ত অনুন্নত ছিল এবং এর কোন প্রতিকার করা তখনও সম্ভব হয় নি। ফ্লেমিং এবং ডাঃ রাইট দুজনেই কার্বলিক অ্যাসিড জাতীয় রাসায়নিক প্রতিরোধক ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁদের ধারণা ছিল, এই রকমের ওষুধ বেশীর ভাগ সময়েই জীবাণুকে বাড়তে সহায়তা করে। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন—এমন কোন জিনিষের দরকার, যাতে Phagocyte-গুলি বাড়তে পারে ও প্রচুর জীবনীশক্তি পায় এবং যার সাহায্যে বাইরের জীবাণুর ধ্বংস সম্ভব হতে পারে।

এরপর ফ্লেমিং আবার সেণ্ট মেরীতে ফিরে গেলেন এবং সেখানে আবিষ্কার করলেন যে, জীবদেহের পেশীর মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যেটা বাইরের জীবাণুগুলিকে সহজেই দ্রবীভূত করতে পারে। তিনি এর নাম দিলেন লাইসোজাইম (Lysozyme) এবং দেখালেন যে, দেহের অভ্যন্তরে এটি বিভিন্ন মাত্রায় বিদ্যমান। তিনি প্রাকৃতিক প্রতিরোধক শক্তির উপর বিশ্বাসী ছিলেন এবং প্রচার করলেন যে, এই লাইসোজাইমগুলিও এক রকমের প্রাকৃতিক প্রতিরোধক, যেগুলি রক্তের Phagocyte-গুলির কোন রকম ক্ষতি না করে বাইরের জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। যদিও লাইসোজাইম পরবর্তী কালে বিশেষ কাজে আসে নি, তবুও ঐ সময়ে এই আবিষ্কার তাঁকে একজন প্রখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

এরপর ১৯২৮ সালে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাণু-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এখানে তিনি পরীক্ষা করবার জন্যে কতকগুলি কাচের প্লেটে ছত্রাক-জাতীয় ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস তৈরি করেন এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখবার সময়

লক্ষ্য করেন—যে সব প্লেট ইতিমধ্যেই বাতাসের সংস্পর্শে এসে গেছে, তার একটি মধ্যে এক রকমের ছত্রাক জন্মেছে—যা থেকে নিঃসৃত পদার্থ সহজেই জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। ফ্লেমিং এর নাম দিলেন পেনিসিলিন। এরপর তিনি ঐ জীবাণুরোধক পদার্থ আলাদা করেন এবং প্রমাণ করেন যে, লাইসোজাইমের মতই এটি একটি রোগ-প্রতিরোধক প্রাকৃতিক বস্তু এবং এর ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী। কিন্তু তখন পেনিসিলিন ব্যবহারের সবচেয়ে অসুবিধা দাঁড়ালো এই যে, এটি অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর শোধন দরকার।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ফ্লেমিং রসায়নবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে এই বিষয়ে আর অগ্রসর হবার অসুবিধা ছিল। তিনি তাঁর এই গবেষণার সমস্ত ফলাফল একটি ডাক্তারী পত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং কিভাবে এর উন্নতিসাধন করা যায়, তারও এক মোটামুটি খসড়া দিলেন। ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লর্ড ফ্লোরি এবং ই. চেন প্রমুখ বিজ্ঞানীরা এই রকমই একটি প্রাকৃতিক প্রতিরোধকের সন্ধান করছিলেন। তাঁরা ফ্লেমিংয়ের পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাহিনী পড়ে ফ্লেমিংয়ের নির্দেশিত পদ্ধতিতে পেনিসিলিন তৈরি করতেন এবং ফ্লোরি সেটা বিভিন্ন প্রাণীদেহের উপর প্রয়োগ করে পরীক্ষা চালাতেন। কিন্তু পেনিসিলিন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বলে এই রকম পরীক্ষা চালানো অসুবিধাজনক এবং সর্বোপরি একে ঘনীভূত করা আর এক দুরূহ কাজ ছিল। উচ্চতাপে এর ঘনীভবন সম্ভব নয়, তাই নিম্নতাপে একে কঠিন পদার্থে পরিণত করে আলাদা করা হতো। এভাবে তাঁরা কাদার মত ঈষৎ বাদামী রঙের গুঁড়া পেনিসিলিন পেলেন এবং একে ৫০ লক্ষ গুণ তরল করে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা চালালেন। প্রথম প্রথম তাঁরা মনে করতেন যে, এই বাদামী রঙের গুঁড়ার মত পদার্থটাই বিশুদ্ধ পেনিসিলিন, কিন্তু পরে যখন আরও শোধন করা হলো, তখন এক প্রকার সাদা গুঁড়া পাওয়া গেল। প্রকৃতপক্ষে পূর্বের পেনিসিলিনের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণ অবিশুদ্ধ পদার্থ ছিল।

১৯৪০ সালের ২৬শে মে, শনিবার ৮টি ইঁদুরের উপর প্রথম পরীক্ষা চালান ডাঃ হিট্‌লী ও ডাঃ ফ্লোরি। এদের প্রত্যেকের দেহে প্রথমে ইন্‌জেকসন দিয়ে বিষাক্ত রোগ বীজাণু প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর রোগাক্রান্ত ইঁদুরগুলির মধ্যে চারটিকে পুরামাত্রায় পেনিসিলিন দেওয়া হয়। দুটিকে কিছু সময় অন্তর অন্তর ইন্‌জেকসন করা হতে থাকে আর শেষ দুটিকে রোগাক্রান্ত অবস্থাতেই বিনা চিকিৎসায় রাখা হয়। পরদিন সকালে দেখা গেল যে, যে দুটিকে ইন্‌জেকশন দেওয়া হয় নি, সে দুটি মারা গেছে আর অপর ছয়টির মধ্যে যেগুলিকে পুরামাত্রায় পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল, তারা বেশ সচেতন ও সজীব রয়েছে। বাকী দুটি জীবিত আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ রোগমুক্ত নয়।

তাঁদের এই পরীক্ষা 'The Lancet' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। ফ্লেমিং

পেনিসিলিনের আশ্চর্যজনক সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এলেন অক্সফোর্ডের গবেষণাগারে। এবারে মানুষের উপর পরীক্ষার পালা। কিন্তু তখন তাঁদের হাতে খুব কম পরিমাণই পেনিসিলিন অবশিষ্ট ছিল। ডাঃ ফ্লোরি অক্সফোর্ডের ৪৩ বছর বয়স্ক এক পুলিশের দেহে প্রথম পরীক্ষা চালান। গোলাপ তুলতে গিয়ে লোকটির মুখের কাছে একটু কেটে যায়। সেটাই বিষাক্ত হয়ে সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে। সব রকম সম্ভবপর উপায়ই অবলম্বন করা হলো, কিন্তু রোগের কিছুমাত্র উপশম হলো না। রোগীর চোখ-মুখে তখন মৃত্যুর ছাপ সুস্পষ্ট। এই অবস্থায় ডাঃ ফ্লোরি তাকে ২০০ মিলিগ্র্যাম পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দিলেন। এরপর প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর ১০০ মিলিগ্র্যাম করে পেনিসিলিন দেওয়া হতে লাগলো। এক দিনের মধ্যেই রোগীর উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। ক্ষতস্থান ক্রমশঃ শুকাতে আরম্ভ করলো এবং চোখে পুঁজ জমা বন্ধ হলো। পাঁচ দিনের ভিতর রোগী বিছানায় বসে খাবার খেতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যেই সমস্ত পেনিসিলিন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল; তাই রোগীকে আর বাঁচানো সম্ভব হলো না। ডাঃ ফ্লোরি এতে অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং স্থির করলেন, পরবর্তী পরীক্ষা কোন শিশুর উপরে চালানো হবে, যাতে কম পরিমাণ পেনিসিলিন লাগে।

এরপর একটি চার বছর বয়সের ছেলের উপর পরীক্ষা চালানো হলো। রক্তে বিষাক্ত জীবাণু সংক্রামিত হওয়ায় এর বাঁচবার আশা ছিল না। ডাঃ ফ্লোরি একে পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দিলেন। এই সময়ে অবশ্য যথেষ্ট ওষুধ হাতে ছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হতে থাকে—বসতে, দাঁড়াতে—এমন কি খেলা পর্যন্ত করতে পারতো। হঠাৎ পাঁচ দিনের দিন মাথার একটি দুর্বল রক্তবাহী নালী ফেটে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। পর পর পেনিসিলিনের নানারকম উন্নতিসাধন করা হয় এবং প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়।

পেনিসিলিন চিকিৎসা-জগতের এক অমূল্য সম্পদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বহু আহত সৈনিক এবং নাগরিক এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে। এই কৃতিত্বের জন্যে সার আলেক-জাণ্ডার ফ্লেমিংকে ১৯৪৪ সালে নাইট এবং ১৯৪৫ সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু এই পৃথিবীব্যাপী বিরাট খ্যাতি এবং অকুণ্ঠ স্বীকৃতি ডাঃ ফ্লেমিংকে কোন দিন কর্তব্য পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি নিরহঙ্কারী অমায়িক পুরুষ ছিলেন এবং প্রাকৃতিক শক্তির উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। নোবেল পুরস্কার বিতরণী সভায় তাই তিনি বলেছিলেন—"I did not do anything. Nature makes penicillin ; I just found it".

শ্রীরঘুনাথ দাস

স্টেথোস্কোপ

উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে (১৮১৬) এক শীতের সকালের কথা। প্যারিসের নেকার হাসপাতালে প্রাতঃকালীন পরিদর্শন শেষ করে তরুণ ফরাসী চিকিৎসক একটু বেড়াবার জন্যে বাগানের দিকে এগুলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো ক্রীড়ারত দুটি শিশুর দল। একদল একটি ঢেঁকির এক প্রান্তে হাতুড়ী দিয়ে আওয়াজ করছিল আর অন্য দলটি অপর প্রান্তে কান পেতে তা শুনছিল। চিকিৎসক কয়েক মিনিট ধরে তাদের লক্ষ্য করলেন। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন এক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেল। তক্ষুনি তিনি ফিরে এলেন হাসপাতালে। নিজের পড়বার টেবিলে বসে বড় একটি কাগজ গোল করে পাকিয়ে এক মুখ কানে ধরে অপর মুখ টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর পেন্সিল দিয়ে টেবিলে আওয়াজ করতে লাগলেন। পেন্সিলের আওয়াজ তাঁর কানে বেশ জোরে বাজতে লাগলো। এথেকে তিনি হৃৎস্পন্দন শোনবার যন্ত্র আবিষ্কারের সন্ধান পেলেন। এই তরুণ ফরাসী চিকিৎসকের নাম রেনি থিয়োফাইল লায়েনেক। এই সময়ে নেকার হাসপাতালের কোন এক ওয়ার্ডে এক স্থূলাঙ্গী রোগিণী বুকের ব্যাধিতে ভুগছিলেন। সরাসরি বুকের আওয়াজ শুনতে ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। লায়েনেক তাঁর কাগজ পাকানো টিউবটি রোগিণীর বুকের উপর ধরলেন। তিনি তখন হৃৎস্পন্দন ও ফুস্‌ফুসের শব্দ শুনতে পেলেন। সরাসরি কান পেতে শোনবার চেয়ে কাগজের টিউবের ভিতর দিয়ে ঐ শব্দ আরও সুস্পষ্ট শোনা গেল। এভাবে বুকের অসুখের চিকিৎসার জন্যে লায়েনেক এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

১৭৮১ সালে ফ্রান্সের কুইম্পার অঞ্চলে তাঁর জন্ম। বাবা থিয়োফাইল মেরী লায়েনেক ছিলেন একজন আইনবিদ্ ও কবি। লায়েনেকের যখন মাত্র ছয় বছর বয়স তখন তাঁর মা মারা যান। আট বছর বয়সে তিনি শিক্ষার জন্যে কাকা ডাক্তার গুইলামের কাছে যান। ১৪ বছর বয়সে তিনি কাকার কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন সুরু করেন। গৃহযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় তাঁর অধ্যয়ন ব্যাহত হয়। ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে তিনি যুদ্ধের জন্যে চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। ১৮০১ সালে তিনি প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করে এক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে করভিসাটের ছাত্র হিসাবে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত করেন। ১৮০৪ সালে তিনি চিকিৎসক উপাধি লাভ করেন। উপাধি লাভের পর তিনি তাঁর গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। প্যারিসে তখন ডাঃ বেইলীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। এই দুই তরুণ তখন ডেপুট্রেনের সহযোগী হয়ে বেশ কিছুদিন প্যাথোলজিক্যাল অ্যানাটমির উপর কাজ করেন। যক্ষ্মা সংক্রান্ত কিছু

গবেষণাও তিনি করেছিলেন। লায়েনেক বিচক্ষণ প্যাথোলজিষ্ট, সুশিক্ষক ও দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। ১৮১৪ সালে তিনি নেকার হাসপাতালের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮১৬ সালে নেকার হাসপাতালে তিনি ষ্টেথোস্কোপ আবিষ্কারের গোড়াপত্তন করেন। প্রথম প্রথম তিনি কাগজ গোল করে পাকিয়ে বুকের আওয়াজ শুনতেন। এতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি আবলুস কাঠ দিয়ে টিউবের মত করে কাজ চালাতেন। এক ফুট লম্বা ও সওয়া এক ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ছিল এই যন্ত্রটি। আবার কিছুদিন পরে এর নতুন সংস্করণ হলো। এটিকে ছুটি অংশে ভাগ করে আট্‌কানো হলো একসঙ্গে, তখন যন্ত্রটিকে সর্বদা বহন করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ তিনি উপলব্ধি করলেন—এই ফাঁকা রডগুলি দিয়ে যদিও হৃৎস্পন্দন খুব স্পষ্ট শোনা যচ্ছে, তবুও এই রড্ দিয়ে ফুস্‌ফুসের আওয়াজ পৃথক করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর। এই জন্যে তিনি ছুটি কাঠের ফাঁকা রডের মাঝে একটি মধ্যবর্তী নল তৈরি করেন। এর সাহায্যে তিনি বিভিন্ন ধরণের ফুস্‌ফুসের রোগে বিভিন্ন প্রকার শব্দ শুনতে সক্ষম হলেন। মুগ্ধ হয়ে তিনি শুনতে লাগলেন চিকিৎসার ইতিহাসের অলিখিত কথা —বুকের ঘর্ঘর, ঘর্ষণ আর মর্মর ধ্বনি। নতুন যন্ত্রটির নামকরণ করলেন স্টেথোস্কোপ, যে নামটি ছুটি গ্রীক কথার সমষ্টি—বক্ষ ও পর্যবেক্ষণ করা।

১৮১৯ সালে লায়েনেকের শ্রেষ্ঠ কাজ "Traite de l' auscultation Méditate" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। লায়েনেকের এই বইটি নানা তত্ত্ব ও তথ্যের খনি। এই বইটি হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুসের ক্লিনিক্যাল আসপেক্ট বা নিদান তত্ত্ব ও তাদের সূক্ষ্ম প্যাথোলজিক্যাল অ্যানাটমির বর্ণনায় পূর্ণ। তাঁর বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তা যুগান্তকারী বলে সম্মানিত হয়। সারা বিশ্বের চিকিৎসা কেন্দ্রে তাঁর হৃৎস্পন্দন শোনবার যন্ত্র ও পদ্ধতির ব্যবহার সুরু হয়।

অক্লান্ত গবেষণার অপরিসীম পরিশ্রমে লায়েনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর ফুস্‌ফুসে টিউবারকিউলোসিসের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন তিনি স্বদেশ বৃটানীতে বিশ্রাম নিতে ফিরে যান। তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্যের ক্রমশঃ উন্নতি হতে থাকে। অবশেষে বছর ছুয়েক পরে তিনি আবার প্যারিসে ফিরে এলেন। এখানে এসে তিনি রাজ্ঞীর অনুগ্রহ লাভ করেন ও তাঁর সহায়তায় ফ্রান্স মহাবিদ্যালয়ে মেডিক্যাল ক্লিনিকের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এর পরের চার বছর তিনি নিয়োগ করেন তাঁর এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে। বইয়ের নাম সামান্য পরিবর্তিত হয়ে "Traite de l' auscultation Méditate et des maladies des poumons et du poumons et du cœur."—এই নামে প্রকাশিত হলো ১৮২৬ সালে। লায়েনেক তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার সময় প্রায়ই নানারকম শারীরিক কষ্টে ভুগছিলেন। তাই স্মৃতি কথায় লিখেছিলেন "এই বই শেষ করবার সময়কার শেষ বছরটিতে আমি বুঝতে

পেরেছিলাম, অত্যধিক পরিশ্রমে আমার জীবনকে বিপদসঙ্কুল করে তুলেছি, কিন্তু এই বইটি আমার স্বপ্ন-সাধনা, আমি প্রকাশ করতে চলেছি। আমি আশা করি, তার মূল্য একটি মানুষের জীবনের চেয়ে অনেক বেশী। এর ফলে আমার কর্তব্য শেষ হবে, জীবনে আমার যাই ঘটুক না কেন।" বইটি প্রকাশিত হবার পর তিনি বৃটানীতে তাঁর নিজের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানেই তিনি ১৮২৬ সালে ১৩ই অগাষ্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

লায়েনেকের আরব্ধ অসমাপ্ত কাজ তাঁর পরবর্তী চিকিৎসকগণ সমাপ্ত করেন। লায়েনেকের পর এই ষ্টেথোস্কোপের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে। পূর্বসুরীর প্রবর্তিত ধারা অনুসরণ করে পায়োরী যন্ত্রটিকে ঈষৎ পরিবর্তিত করেন। পায়োরীর পর ষ্টেথোস্কোপের আরও রূপান্তর ঘটে। আধুনিক ষ্টেথোস্কোপে একটি বিস্তৃত বক্ষখণ্ড এবং দুটি নমনীয় বক্র নল লাগানো থাকে। এই নলের প্রান্ত দুটি কানে বেশ ভালভাবে আট্‌কে থাকে। এই রূপান্তরিত প্রান্ত দুটি আইভরি বা শক্ত রবারের তৈরি। সাধারণ স্টেথোস্কোপ ছাড়া অন্য ধরণের ষ্টেথোস্কোপেও উদ্ভাবিত হয়েছে; যেমন—ফোনেণ্ডোস্কোপ। এটিতে বক্ষ-খণ্ডের জায়গায় একটি ছোট ড্রাম লাগানো থাকে। এরপর বৈদ্যুতিক স্টেথোস্কোপ উদ্ভাবিত হয়েছে। এই যন্ত্রে আছে মাইক্রোফোন, টেলিফোন ও বৈদ্যুতিক ভাল্‌ব্‌। এর সাহায্যে হৃৎকম্পন, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতি ইচ্ছামত গভীরতা বা তীব্রতায় রোগীর কাছাকাছি না থেকেই শোনা যায়। রোগাক্রান্ত ফুস্‌ফুসের নানা অবস্থা ধরা পড়ে এই ষ্টেথোস্কোপের সাহায্যে এবং এটি হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। অনেক রোগই এতে অবিশ্বাস্য রকম নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয়। রক্তের চাপ নির্ণয়ে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্য অনস্বীকার্য। ফুস্‌ফুস, হৃৎপিণ্ড, প্লুরা, উদর ও দেহের অন্যান্য যন্ত্রের অবস্থা ও সন্তান-সম্ভবা মেয়েদের জঠরে শিশুর অবস্থান উপলব্ধির জন্যে ষ্টেথোস্কোপের সাহায্য নেওয়া হয়। তাই ষ্টেথোস্কোপ আজ চিকিৎসকের অপরিহার্য অঙ্গ। ইলেকট্রনিক রেখচিত্র হয়তো নিদানিক হৃদ-পরীক্ষার সূক্ষ্মতা খানিকটা বাড়িয়ে তুলতে পারে, কিন্তু হৃৎপিণ্ডের অবস্থা পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে সুন্দর, সুবেদী ও সূক্ষ্ম যন্ত্র হচ্ছে মানুষের কানে লাগানো লায়েনেকের প্রথম আবিষ্কার—ষ্টেথোস্কোপ।

শ্রীসতী চক্রবর্তী

নাইলনের কথা

মেয়েদের শাড়ী ও নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুতির উপকরণ হিসাবে নাইলনের নাম আজ সর্বত্র পরিচিত। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে নাইলনের ব্যবহারের কথা অনেকেরই হয়তো জানা নেই। নাইলনের সাহায্যে বেল্ট, দড়ি, টায়ার প্যারাসুটের কাপড় প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি হয়ে থাকে। মাত্র ত্রিশ বছর আগেও নাইলনের নাম কারও জানা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে আমেরিকার E. I. du Pont de Nemours & Co একটা নতুন ধরণের পলিমার (Polymer) সংশ্লেষণের চেষ্টা করছিলেন। ১৯৩৮ সালে এই du Pont কোম্পানীর গবেষণা বিভাগ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, তাঁরা একটা নতুন পলিমার সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নতুন পলিমারটির সংসক্তি (Tenacity) ও ঘর্ষণজনিত প্রতিরোধের ক্ষমতা সাধারণ রেশম, তুলা ও রেয়নের চেয়ে অনেক বেশী। এই পলিমারটির নাম দেওয়া হলো নাইলন।

নাইলন আবিষ্কারের পর তুলা বা রেশমের জিনিষে এর ব্যবহারের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা চিন্তা করতে লাগলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাইলন শিল্পের চরম উন্নতি হলো যুদ্ধ সংক্রান্ত প্যারাসুট, দড়ি প্রভৃতি নির্মাণে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর প্রচুর নাইলন উদ্বৃত্ত রয়ে গেল, কাজেই এই উদ্বৃত্ত নাইলনের সাহায্যে নানা রকম পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরির চেষ্টা চলতে লাগলো। পরবর্তী কালে এই নাইলন মোল্ডিং পাউডার (Moulding Powder) হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

নাইলন জিনিষটি কি এবং কোথা থেকে এর উৎপত্তি হয়? অনেকেই মনে করেন—নাইলন বলতে একটি জিনিষকেই বোঝায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিভিন্নপ্রকার যৌগিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন নাইলনকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলি সবই নাইলন শ্রেণীভুক্ত বটে, কিন্তু প্রত্যেকেরই ধর্ম পৃথক। যেমন—Hexamethylene diamine ও Adipic acid থেকে প্রস্তুত পলিমারের নাম Nylon 6-6; আবার Nylon-6 অথবা Parlon, Nylon 6-10, বা 6 Parlon প্রভৃতি। একপ্রকার নাইলনের কেবলমাত্র আণবিক ওজন বাড়িয়ে-কমিয়ে তার ধর্ম, যেমন—সান্দ্রতা, ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ প্রভৃতির পরিবর্তন করা যায়।

বর্তমানে ক্রমবর্ধমান নাইলনের চাহিদা রসায়নশিল্পে এক বিরাট বিপ্লব এনেছে। আমেরিকা, বৃটেন ও জাপান আজ নাইলন উৎপাদনে এগিয়ে গেছে। আমাদের ভারতেও একটি নাইলন উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। কারণ আমাদের জামা-কাপড় তৈরি করতে এবং কুটির শিল্পে মোল্ডিং পাউডারের জন্যে ব্যবহৃত নাইলন বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। নাইলনের ব্যবহার বহুমুখী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর উৎপাদনের এক বিরাট অংশ প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সুতার সঙ্গে মিশ্রণের জন্যে ব্যবহৃত হয়।

এবার এই প্রয়োজনীয় বস্তুটি প্রস্তুতের কথা আলোচনা করবো। মাত্র দুটি যৌগিক পদার্থের মিশ্রণকে উত্তপ্ত করেই নাইলন পাওয়া যায়। এদের মধ্যে একটি হলো Diamine —Hexamethylene dianamine এবং অপরটি হলো Diabasic acid, যেমন— Adipic acid। এই দুটি যৌগিক পদার্থের বিক্রিয়ার সময় যে জল উৎপন্ন হয়, তাকে বিক্রিয়ার কালেই সরিয়ে দেওয়া হয়।

প্রথমে Hexamethylene diaminine ও Adipic acid-কে জলে মিশ্রিত করা হয়। পরে এই দ্রবণটি কার্বনের গুড়ার সাহায্যে বর্ণহীন করা হয় এবং পরে এই দ্রবণটিকে কার্বনের গুঁড়ার সাহায্যে বর্ণহীন করা হয় এবং সামান্য পরিমাণ অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয়। তারপর এই লবণটিকে অটোক্লেভে রেখে 'পলিমেরাইজ' করা হয়। যখন দ্রবণটি অটোক্লেভে একটা বিশেষ ঘনত্বে এসে পৌঁছায়, কেবল তখনই লবণটি পলিমেরাইজ্‌ড্‌ হয়। এই প্রক্রিয়ায় যে নাইলন উৎপন্ন হয়, তা খুবই চক্‌চকে এবং সেই জন্যে এর দ্বারা পোষাক তৈরি সম্ভব নয়। এই চক্‌চকে ভাবকে কমাবার জন্যে বিক্রিয়ার সময় Titanium dioxide নামক একটি যৌগিক পদার্থ মেশানো হয়। এই পদ্ধতিতে তৈরি নাইলনকে বলা হয় Matt Nylon।

নাইলনের আণবিক ওজন ১২,০০০ থেকে ২০,০০০—যদি এর আণবিক ওজন ১২,০০০-এর কম হয়, তাহলে এর দ্বারা তৈরি সূতা খস্‌খসে হয় এবং টান সহ্য করতে পারে না। আবার যদি আণবিক ওজন ২০,০০০-এর বেশী হয়, তাহলে এই পলিমারকে গলানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং উৎকৃষ্ট নাইলনের জন্যে একটা নির্দিষ্ট আণবিক ওজনেই পলিমেরিজেসন বন্ধ করতে হবে। নাইলন শিল্পে এই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজটি একাই নিয়েছে অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই অ্যাসিড মিশ্রণের ফলে বিশেষ বিশেষ আণবিক ওজনের নাইলন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

Nylon 6-6 তরল অম্ল বা ক্ষারের দ্বারা আক্রান্ত হয় না। বস্ত্রশিল্পে নাইলনের প্রসারের কারণ হিসাবে এই দুটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু নাইলনের একটি বিরাট ত্রুটি এই যে, এটি দাহ্য পদার্থ। সুতরাং নাইলনের পোষাক পরিহিত ব্যক্তির পক্ষে আগুনের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ।

বর্তমান জগতে নাইলনের বহুমুখী ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তার জন্যে আজও নতুন ধরণের নাইলন প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে গবেষণা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

শ্যামল সেন

সহজে ইংরেজী তারিখের বার নির্ণয়

তোমরা হয়তো অনেকে শকুন্তলা দেবীর কথা শুনেছ। তিনি মাঝে কলকাতায় এসে সাউথ ইণ্ডিয়া ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে বড় বড় যোগ, গুণ, Square root, Cube root, Fifth root, Airthmetical progression, Geometrical progression, Factorial প্রভৃতি অঙ্কের সমাধান নিমেষের মধ্যে করে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের রিসার্চ ট্রেনিং সেকসনের ডিরেক্টর Dr. C. R. Rao শকুন্তলা দেবীকে ২৪টি সংখ্যার একটি অঙ্কের Cube root বের করতে দিয়েছিলেন। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর বলে দিয়েছিলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন তাঁকে $১+২+৩+\cdots+১০^{১২}$ অঙ্কের যোগফল জিজ্ঞাসা করে সঠিক জবাব পেয়েছিলেন। এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেছিলেন যে, যদি তিনি ১লা জানুয়ারীতে এক পয়সা, ২রা জানুয়ারীতে দুই পয়সা, ৩রা জানুয়ারীতে চার পয়সা, ৪ঠা জানুয়ারাতে আট পয়সা হিসাবে জমাতে আরম্ভ করেন, তাহলে জানুয়ারী মাসের শেষে তাঁর কত জমবে? শকুন্তলা দেবীর উত্তর দিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি। কিন্তু উত্তরটি ভদ্রমহিলার জানা ছিল না বলে অসুবিধা হয়েছিল। তবে Dr. Rao বই ঘেঁটে মিলিয়ে দেখলেন যে, উত্তরটি নির্ভুল। সবচেয়ে মজার খেলা তিনি দেখিয়েছিলেন, যখন দর্শকেরা তাঁদের জন্ম বা বিবাহের বছর, মাস ও তারিখ বলে বারের নাম জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মুহূর্তের মধ্যে ঐ বারের নাম বলে সকলকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর শেষ খেলাটাও কম চমকপ্রদ নয়। তিনি দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা ব্যক্তিকে বেছে নিলেন এবং তার হাতে ১৯৬৭ সালের একটা ক্যালেণ্ডার দিয়ে দর্শকদের যে কোন একটা 'বার' বলতে বললেন। একজন বললেন—বৃহস্পতিবার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ প্রভৃতি মাসের বৃহস্পতিবার কি কি তারিখ পড়েছে, তা আগাগোড়া গড়গড় করে বলে গেলেন। আবার তিনি উল্টোভাবে ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের যে কোন বারের তারিখগুলিও নির্ভুলভাবে তাড়াতাড়ি বলে গেলেন। দর্শকদের মধ্যে একজন তাঁকে ঠকাবার জন্যে জানুয়ারী মাসের বুধবার ও ফেব্রুয়ারা মাসের শুক্রবার, আবার মার্চ মাসের বুধবার ও এপ্রিল মাসের শুক্রবার—এইভাবে প্রতি মাসের তারিখগুলি বলতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁকে ঠকানো গেল না, তিনি সকলের করতালির মধ্যে তারিখগুলি সঠিক বলতে পেরেছিলেন।

শকুন্তলা দেবীর ক্যালেণ্ডারের খেলাগুলি খুব কঠিন বলে মনে হলো না। যদি ঘরে বসে কিছুদিন চর্চা কর, তাহলে তোমরাও ক্যালেণ্ডারের খেলাগুলি

দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে অবাক করে দিতে পার। প্রথমে তোমাদের চলিত ১৯৬৭ সালের যে কোন তারিখের বার সহজে নির্ণয় করবার পদ্ধতিটা বলছি।

ইংরেজী ক্যালেণ্ডারে জানুয়ারী মাসের যে তারিখ যে বারে দেখা যায়, সেই তারিখ ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও নভেম্বর মাসে ৩ দিন, এপ্রিল ও জুলাই মাসে ৬ দিন, মে মাসে ১ দিন, অগাষ্ট মাসে ২ দিন, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ৫ দিন বাদে যে বার হয়, সেই বারে পড়ে। কিন্তু জানুয়ারী ও অক্টোবর মাসের তারিখগুলি একই বারে পড়ে—কোন পরিবর্তন হয় না। জানুয়ারী মাসের ৯ তারিখ সোমবার পড়লে, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ৯ তারিখ বৃহস্পতিবার, এপ্রিল মাসে রবিবার, মে মাসে মঙ্গলবার, জুন মাসে শুক্রবার, জুলাই মাসে রবিবার, অগাষ্ট মাসে বুধবার, সেপ্টেম্বর মাসে শনিবার, অক্টোবর মাসে সোমবার, নভেম্বর মাসে বৃহস্পতিবার ও ডিসেম্বর মাসে শনিবার পড়বে। তোমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করে রাখতে পার। যেমন জানুয়ারী—0, ফেব্রুয়ারী—৩, মার্চ—৩, এপ্রিল—৬, মে—১, জুন—৪, জুলাই—৬, অগাষ্ট—২, সেপ্টেম্বর—৫, অক্টোবর—0, নভেম্বর—৩, ডিসেম্বর—৫।

এই তালিকাটি যে যত ভালভাবে মনে রাখতে পারবে, সে তত চট্‌পট ইংরেজী তারিখের বার নির্ণয় করতে পারবে। তার আগে আর একটা কথা বলা দরকার। ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারী—রবিবার। সুতরাং রবিবারকে ১, সোমবারকে ২, মঙ্গলবারকে ৩, বুধবারকে ৪, বৃহস্পতিবারকে ৫, শুক্রবারকে ৬ ও শনিবারকে 0 ধরতে হবে।

এখন যদি তোমাকে বলা হয়—২৬শে মার্চ কি বার? সঙ্গে সঙ্গে তুমি মনে মনে ২৬ তারিখের সঙ্গে মার্চের ৩ (উপরের তালিকা থেকে) যোগ করে যোগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করে যা ভাগশেষ থাকবে—সেই ভাগশেষ তোমাকে 'বার' বলে দেবে। এক্ষেত্রে ভাগশেষ মাত্র ১। সুতরাং তোমার উত্তর হবে রবিবার। আবার যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হয়—১৫ই অগাষ্ট কি বার? তুমি মনে মনে ১৫ তারিখের সঙ্গে অগাষ্টের ২ যোগ করে যোগফলকে ৭ দিয়ে ভাগ করে ৩ অবশিষ্ট পাবে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার উত্তর মঙ্গলবার বলতে বিশেষ দেরী হবে না।

যদি চলিত বছর লীপ-ইয়ার (Leap year) হয়, তাহলে ২৯শে ফেব্রুয়ারীর পরের তারিখের সঙ্গে ১ যোগ করে নিতে হবে এবং চলিত বছরের ১লা জানুয়ারী যে বার পড়বে, সেই বারকে সব সময় ১ ধরে নিয়ে নতুন করে বারের সংখ্যাগুলি পাল্‌টে নিতে হবে।

এবার তোমাদের ১৯০০ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের যে কোন তারিখের বার নির্ণয় করবার কৌশলটা বলবো।

১৯০০ সালের ১লা জানুয়ারী সোমবার ছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে সোমবারকে ১,

মঙ্গলবারকে ২, বুধবারকে ৩, বৃহস্পতিবারকে ৪, শুক্রবারকে ৫, শনিবারকে ৬ ও রবিবারকে 0 ধরতে হবে। মাসের ক্ষেত্রে উপরের তালিকায় যে সংখ্যাগুলি ধরা হয়েছে, তার কিছুই নড়চড় হবে না। ১৯০০-এর পরে বছরের সংখ্যা এবং সেই কয় বছরের মধ্যে কটা লীপ-ইয়ার পার হয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে খেয়াল রাখতে হবে।

এখন যদি তোমাকে বলা হয়—১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই কি বার ছিল? এখানে তুমি প্রথমে ১০ (১৯০০-এর পরে দশ বছর), পরে ২ (দশ বছরে ২টা লীপ-ইয়ার), তারপরে ১৩ (জুলাই মাসের তারিখ) এবং সর্বশেষে উপরের তালিকা থেকে জুলাই-এর ৬ যোগ করে যে ৩১ যোগফল হবে, তাকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ৪ অবশিষ্ট থাকবে। সুতরাং ঐ তারিখ বৃহস্পতিবার বলতে তোমার একটুকুও অসুবিধা হবে না। আবার যদি তোমাকে বলা হয়—১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাষ্ট কি বার ছিল? এখানে তুমি মনে মনে (৪৭+১১+১৫+২)÷৭ এই অঙ্কটা কষে ভাগশেষ বের করে ফেললেই উত্তর পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ভাগশেষ ৫ ; সুতরাং উত্তরটি শুক্রবার ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার সপ্তাহের কোন 'বার' বললে—সেই বারে জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর মাসের তারিখগুলি কি করে বলতে পারা যায়—তার পদ্ধতিটা বলছি।

এখন যদি তোমাকে বলা হয়—১৯৬৭ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি কি কি? তুমি যদি প্রতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি জেনে নিতে পার, তাহলে সাত পর পর যোগ করলে বাকী সপ্তাহের তারিখগুলি বলতে কোন অসুবিধা হবে না। তুমি আগে থেকেই জান যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের বৃহস্পতিবার—৫ তারিখ। এখন জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি 'মাসের সংখ্যা' (যা উপরের তালিকায় দেওয়া হয়েছে) বাদ দিলে ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল প্রভৃতি মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের তারিখ বের করা যায়। যদি কোন 'মাসের সংখ্যা' জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের তারিখ থেকে বড় বা সমান হয়, তাহলে জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের তারিখ থেকে বাদ দিয়ে সেই মাসের প্রথম সপ্তাহের নির্দিষ্ট বারের তারিখ নির্ণয় করতে হয়। এক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালের প্রতি-মাসের বৃহস্পতিবারের তারিখগুলি কি কি হবে, তা নীচে দেওয়া হলো।

জানুয়ারী—৫ (=৫—০), ১২, ১৯, ২৬। ফেব্রুয়ারী—২ (=৫—৩), ৯, ১৬, ২৩।
মার্চ—২ (=৫—৩), ৯, ১৬, ২৩, ৩০। এপ্রিল—৬ (=১২—৬), ১৩, ২০, ২৭।
মে—৪ (=৫—১), ১১, ১৮, ২৫। জুন—১ (=৫—৪), ৮, ১৫, ২২, ২৯।
জুলাই—৬ (=১২—৬), ১৩, ২০, ২৭। অগাষ্ট—৩ (=৫—২), ১০, ১৭, ২৪, ৩১।
সেপ্টেম্বর—৭ (=১২—৫), ১৪, ২১ ২৮। অক্টোবর—৫ (=৫—০), ১২, ১৯, ২৬।
নভেম্বর—২ (=৫—৩), ৯, ১৬, ২৩, ৩০। ডিসেম্বর—৭ (=১২—৫), ১৪, ২১, ২৮।

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। টেলিভিশনে কি ভাবে ফটোর আবির্ভাব হয়?

সত্যশঙ্কর সুর

প্রঃ ২। (ক) মহাকর্ষের উৎস কোথায়?
(খ) গ্রাভিটন কি?
(গ) আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগসম্পন্ন বস্তু আছে কি?

সুশীলকুমার নাথ

উ: ১। একটি ছবিকে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—সেটি কতকগুলি কালো ও সাদা অংশের সমন্বয় মাত্র (এখানে অবশ্য রঙীন ছবিকে ধরা হচ্ছে না)। ছবিটির বিভিন্ন অংশ যেন বিভিন্ন পর্যায়ের ঔজ্জ্বল্যে রয়েছে—কোন অংশ খুব উজ্জ্বল (সাদা), কোন অংশ একেবারেই উজ্জ্বল নয় (কালো), অন্যান্য অংশ এই দুই-এর মাঝামাঝি। স্বভাবতঃই ছবির বিভিন্ন পর্যায়ের উজ্জ্বল অংশ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ আলো আসে। উজ্জ্বলতম অংশ থেকে আসে অধিকতম আলো আর কালো অংশ থেকে আসে সর্ব্বাপেক্ষা কম আলো। ফটোইলেকট্রিক সেল নামে এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে আলোককে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়। যে রকম উজ্জ্বল আলো এসে ফটো-সেলের উপর পড়বে, সেই অনুপাতে বিদ্যুতের সৃষ্টি হবে। ফলে ছবিটির উজ্জ্বল অংশ থেকে আগত আলোক কালো অংশ থেকে আগত আলোকের চেয়ে অধিকতর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। এইভাবে ছবিটির সাদা-কালোর ব্যবধানকে বিভিন্ন পরিমাণের বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে অতঃপর এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। টেলিভিশনের গ্রাহক-যন্ত্র বেতার-তরঙ্গকে ধরে তা থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পৃথক করে নেয়। টেলিভিশন গ্রাহক যন্ত্রের পর্দার উপরে একটি রশ্মি এসে পড়ে। এই রশ্মির ঔজ্জ্বল্যকে নিয়ন্ত্রিত করে আগত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের শক্তির উপর নির্ভর করে পর্দার কোন অংশ সাদা, কোন অংশ কালো হয়ে ওঠে। এভাবে পর্দার উপর আসল ছবিটি ভেসে ওঠে।

এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত ছবিটা একসঙ্গে পাঠানো যায় না। ছবিটাকে কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিয়ে এই অংশগুলিকে একের পর এক পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে সমস্ত অংশকে একটি নির্দ্দিষ্ট

সময়ের মধ্যে পাঠাতে হবে। এই সময়টি হল ১/১০ সেকেণ্ড। আমরা কোন কিছু দেখলে তার ছাপটা মনের মধ্যে এই সময় পর্যন্ত থাকে। ফলে ১/১০ সেকেণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ ছবিটা পাঠালেই সেটাকে একটা গোটা ছবি বলে মনে হবে নতুবা ছাড়া ছাড়া লাগবে।

উঃ ২। (ক) মহাকর্ষ এমন একটা ব্যাপার যে, তার উৎস কি বা তা কেমন করে হচ্ছে—এর উত্তর বিজ্ঞানীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হয় নি। মহাকর্ষ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিতভাবে যা জানি, তা হলো—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। বস্তুর ভর ও পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব অনুযায়ী আকর্ষণ শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকে। আমরা আরও জানি যে, মহাকর্ষজনিত বল বায়ুহীন শূন্য অঞ্চল অথবা অত্যধিক ঘনত্বসম্পন্ন বস্তু—উভয়ের মধ্য দিয়ে কর্মক্ষম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তুর কোন্ বিশেষ গুণের উপর এই আকর্ষণ নির্ভর করে, সে বিষয়ে কিছু জানা যায় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দুটি বিপরীত বিদ্যুৎ-ধর্মী বস্তু পরস্পর পরস্পকে আকর্ষণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিদ্যুৎই হচ্ছে এই আকর্ষণের উৎস। আমরা ইচ্ছা করলে 'আবরক' ব্যবহার করতে পারি, যার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক বল অতিক্রম করবে না। কিন্তু মহাকর্ষের ক্ষেত্রে আমরা তা পারি না। মহাকর্ষ সর্বত্রগামী—সব কিছুকেই ভেদ করে চলে। মহাকর্ষের উৎস সম্বন্ধে তাই কিছু বলা সম্ভব নয়।

(খ) উপরের আলোচনায় বলা হয়েছে যে, মহাকর্ষজনিত বল ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রগামী ও সর্বত্র কর্মক্ষম। এখন বিদ্যুৎ-চুম্বক জনিত বলের ক্ষেত্রে (যেমন আলোক) আমরা জানি যে, ফোটন কণিকা এক জায়গা থেকে অপর জায়গায় ভ্রমণ করে। মহাকর্ষের ক্ষেত্রেও এই জাতীয় কোন কণিকা আছে কিনা—বিজ্ঞানীদের মাথায় এই চিন্তার উদয় হয়। তাই তাঁরা ফোটনের অনুরূপ এক জাতীয় কণিকার কল্পনা করেছেন এবং নাম দিয়েছেন—গ্রাভিটন। বিজ্ঞানীদের মতে আকর্ষণের সময়ে গ্রাভিটন কণিকা এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এদের সম্ভাব্য ধর্ম সম্বন্ধে বলা যায়—গ্রাভিটনের কোন ভর নেই এবং এরা বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মহাকর্ষজনিত বল এত ক্ষীণ যে, গ্রাভিটনের অস্তিত্ব থাকলেও তা কোন দিন আবিষ্কৃত হবে কিনা সন্দেহ।

(গ) আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে দেখিয়েছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী হতে পারে না।

দীপক বসু

বিবিধ

পরলোকে ডাঃ ওপেনহাইমার

প্রিন্সটন থেকে প্রচারিত রয়টারের খবরে প্রকাশ—১৮ই ফেব্রুয়ারী আমেরিকার প্রথম পারমাণবিক বোমা নির্মাণকারী ডাঃ জে. রবার্ট ওপেনহাইমার পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ বছর।

ডাঃ ওপেনহাইমার হারভার্ড এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন।

১৯৪৩-৪৫ সালে তিনি লস্ আলামসে সায়েন্স লেবরেটরির ডিরেক্টর ছিলেন। এই লেবরেটরীতেই পারমাণবিক বোমা প্রথম নির্মাণ করা হয়।

১৯৪৭ সালে তিনি প্রিন্সটনে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পদার্থবিদ্যার ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

১৯৫৪ সালে মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাঁকে গোপন দলিলপত্র দেখাতে অসম্মত হন। কারণ কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতি আছে বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু নয় বছর পরে পারমাণবিক কমিশন তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যে তাঁকে ৫০,০০০ ডলারের ফের্মি পুরস্কার দান করেন।

প্রাচীনতম মানুষের নিদর্শন

নাইরোবি থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—বিশ্বের খ্যাতনামা নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ লুই লিকী এখানে বলেন যে, তিনি দুই কোটি বছরের পুরনো একটি ফসিল আবিষ্কার করেছেন, যাকে মানুষের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষ বলা যায়।

ডাঃ লিকী এই নতুন আবিষ্কারটির নাম দিয়েছেন 'কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস'। এই ফসিলটি তাঁর ছয় বছর আগে আবিষ্কৃত কেনিয়াপিথেকাস উইকারি-র চেয়ে অন্ততঃ দ্বিগুণ পুরনো। তিনি বলেন, এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন মানবপরিবারের নিদর্শন।

ডাঃ লিকী এটি আবিষ্কার করেন ভিক্টোরিয়া লেকে বুসিঙ্গা দ্বীপে।

সাংবাদিক বৈঠকে ডাঃ লিকী বলেন যে, এই নতুন আবিষ্কারে পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু মিলে নয় জনের মোট ১১টি হাড়ের টুকরা পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞেরা ঐগুলি পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে,এগুলি প্রায় দুই কোটি বছরের পুরনো ফসিল।

বায়ুপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ

টোকিও থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—সম্প্রতি মস্কো বেতারে বলা হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন বায়ু-প্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছে।

দশ হাজার থেকে বার হাজার মিটার উঁচুতে যেখানে বায়ু-প্রবাহ স্থায়ী, সেখানে বেলুন তুলে দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বেলুনের সঙ্গে টারবাইন ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।

এই ভাবে বছরে এক কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তুন্দ্রা অঞ্চলে সরবরাহ করা হবে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫ ৪, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

২। শ্রীসুজিৎকুমার মহলানবিশ
৯০, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৩। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ
৪৪।৫৫, বি. টি. রোড
কলিকাতা-৫০

৪। শ্রীঅমিতোষ ভট্টাচার্য
ডিফেন্স ইলেকট্রনিক্স রিসার্চ লেবরেটরী
চন্দ্রায়ন গুট্টা লাইন্স
হায়দরাবাদ-৫

৫। শ্রীনিত্যগোপাল পোদ্দার
Dept. of Inorganic Chemistry
Indian Association for the
Cultivation of Science. Jadavpur,
Calcutta-32

৬। শ্রীরঘুনাথ দাস
গ্রাম—আউষবালী
পোঃ—মসাট
জেলা—হুগলী

৭। শ্রীসতী চক্রবর্তী
২৪।বি, মনসাতলা লেন, খিদিরপুর,
কলিকাতা-২৩

৮। শ্রীশ্যামল সেন
গ্রাম—সুবুদ্ধিপুর
পোঃ—বারুইপুর
জেলা—২৪ পরগণা

৯। অরুণকুমার রায়চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৯

১০। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
সায়েন্স কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | এপ্রিল, ১৯৬৭ | চতুর্থ সংখ্যা

সূর্য

দীপক বসু

ভূমিকা

পৃথিবীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে সূর্যের অবদানের কথা বর্ণনা করা বাহুল্য মাত্র। কেবল পৃথিবীতেই নয়, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে যদি কখনও কোনরূপ প্রাণের আবির্ভাব ঘটে, তবে সে ক্ষেত্রেও সূর্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুতঃ গ্রহ-উপগ্রহগুলির অস্তিত্বের জন্যেও সূর্যই দায়ী। তাই সূর্য এক কথায় এই বিশাল সৌরমণ্ডলের পিতৃস্বরূপ।

মেঘমুক্ত ও জ্যোৎস্নাবিহীন রাত্রিতে আকাশের দিকে তাকালে খালি চোখেই দেখতে পাওয়া যাবে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত আবছা সাদা মেঘের মত বিশাল একখণ্ড আলোকপুঞ্জ —আমাদের ছায়াপথ। প্রকৃতপক্ষে অবশ্য আকাশের গায়ে খালি চোখে ছোট-বড় যত নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, তাদের সকলেই আমাদের ছায়াপথের অন্তর্ভুক্ত। এক দিক থেকে অপর দিকে এর বিস্তৃতি ১০০,০০০ আলোক-বর্ষ এবং মধ্যস্থলে প্রায় ২০,০০০ আলোক-বর্ষ গভীর। সূর্য তার গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে ছায়াপথের এক কোণে পড়ে আছে—কেন্দ্র থেকে প্রায় ৩০,০০০ আলোক-বর্ষ দূরে।

আমাদের ছায়াপথের অসংখ্য নক্ষত্র সভ্যদের অন্যতম—সূর্য একটি সামান্য নক্ষত্র মাত্র। অনেক নক্ষত্রই সূর্যের চেয়ে বড়, আবার অনেকে অপেক্ষাকৃত ছোট। তবে সূর্যের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, সে আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। ফলে এর পৃষ্ঠদেশকে আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই

সূর্যের আলোক ও উত্তাপ-তরঙ্গের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কিন্তু সূর্য থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের অন্যান্য বিদ্যুচ্চোম্বক তরঙ্গও যে বিকিরিত হয়ে থাকে, তাদের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় নেই। এই তরঙ্গমালার পূর্ণ বিবরণ ১নং চিত্রে দেওয়া হলো। মূলতঃ এরা সবাই এক জাতীয় তরঙ্গ। এদের পরস্পরের মধ্যে তফাৎ কেবলমাত্র এই সাদা চিহ্নিত দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গই সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়। সাদা অংশ দুটি যেন সেই বায়ুমণ্ডলরূপী প্রাচীরের গায়ে দুটি 'জানালা'। একটিকে বলা যায় আলোকের জানালা—সেখান দিয়ে শুধু আলোক-তরঙ্গই প্রবেশ করতে পারে, অপরটি বেতারের জানালা—সেখান দিয়ে আসতে
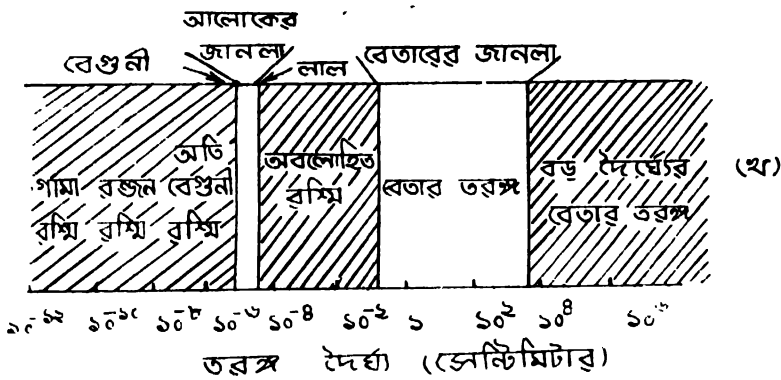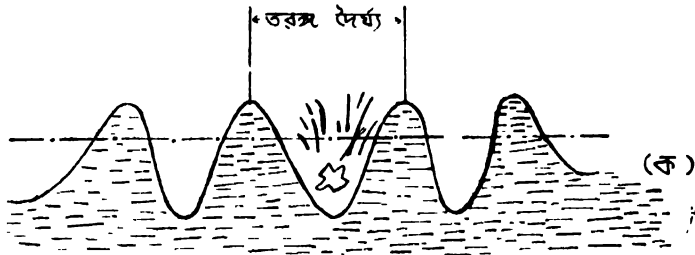
১নং চিত্র

(ক) জলে ঢিল ছুঁড়লে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি দুটি উচ্চতম স্থানের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বলে।

(খ) জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বিভিন্ন দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বিদ্যুচ্চোম্বক তরঙ্গমালা। এদের মধ্যে একমাত্র সাদা চিহ্নিত দৃশ্য আলোক ($৪ \times ১০^{-৫} - ৭.২ \times ১০^{-৫}$ সেঃ মিঃ) ও বেতার-তরঙ্গ (১ সেঃ মিঃ—৩০ মিঃ) ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছায়। অন্যান্য সব তরঙ্গই পথে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়।

শুধু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই নানা জাতীয় তরঙ্গের মধ্যে সকলে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌঁছাতে পারে না, পথে বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। চিত্রে দুটি মাত্র অংশকে সাদা দেখানো হয়েছে। পারে শুধুমাত্র বেতার-তরঙ্গ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রেডিও ষ্টেশন থেকে আগত যে বেতার তরঙ্গের সঙ্গে আমরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার-তরঙ্গও

সেই একই জাতীয়। আলোক ও বেতার ছাড়া বায়ুমণ্ডলের প্রাচীর ভেদ করে অন্য কোন তরঙ্গের ভূপৃষ্ঠে প্রবেশাধিকার নেই।

প্রথম দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুধু আলোকের জানালার মধ্য দিয়েই সকল পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। ফলে তাঁদের সামনে খুলে গেছে আরও নতুন জানালা। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা আজ যন্ত্রপাতি নিয়ে সূর্যকে সম্পূর্ণরূপে পর্যবেক্ষণের জন্যে বায়ুমণ্ডলের বাইরেও গিয়ে হাজির হয়েছেন। জ্যোতির্বিদদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সূর্য সম্বন্ধে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হবে।

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

সূর্য সম্বন্ধে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি কিন্তু সময়ের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলতে পারে নি। আবিষ্কারগুলি ঘটেছে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময়ে—নতুন নতুন সব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রের উদ্ভাবনকে কেন্দ্র করে। দুরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর তার সাহায্যে সূর্যকে প্রথম পর্যবেক্ষণ করেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। দুরবীক্ষণের আবিষ্কার সাদা আলোর সাহায্যে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সূত্রপাত করেছিল। এই ধাক্কা চলেছিল প্রায় দীর্ঘ আড়াই শত বছর। এর পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রনহফার স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্রকে সৌর গবেষণার কাজে প্রয়োগ করলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে হেইল স্পেক্ট্রোহিলিওগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করে সৌর-বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূর পর্যন্ত। এদিকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে একদল বিজ্ঞানী কাগজ-কলম নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেলেন, পর্যবেক্ষণলব্ধ বিভিন্ন তথ্য ব্যাখ্যা করবার জন্যে। তাঁদের হাতিয়ার হলো জার্মান বিজ্ঞানী প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও ভারতীয় বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার আয়নীকরণ সংক্রান্ত সূত্রাবলী। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে অগ্রগতি উভয় দিকে বেশ দ্রুত হতে লাগলো। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ফরাসী বৈজ্ঞানিক লিও কর্তৃক করোনাগ্রাফ যন্ত্র উদ্ভাবন, সৌর বেতার-তরঙ্গের আবিষ্কার ও সে সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা, ভি-২ রকেটের সাহায্যে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির পর্যবেক্ষণ এবং পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বকে সৌর গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ।

সূর্যের বিভিন্ন স্তর

পৃথিবীর আবহাওয়া বা এখানকার পারিপার্শ্বিক চেহারার সঙ্গে কিন্তু সূর্যের অবস্থার কোনরূপ তুলনা করা চলে না। সূর্যের কোথাও তরল বা কঠিন পদার্থের চিহ্নমাত্র নেই। সবটাই ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। কিন্তু এই প্রকাণ্ড জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন নয়। সূর্যমণ্ডল প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত (২নং চিত্র)। বিভিন্ন স্তরে নানারূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ঘটতে দেখা যায়।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি হচ্ছে সূর্যের প্রাণস্বরূপ। শুধু সূর্যের কেন, সমগ্র সৌরমণ্ডলেরই সমস্ত শক্তির উৎস। এখানে উত্তাপ প্রায় ২০,০০০,০০০°। চাপ আমাদের বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় ১,০০০,০০০,০০০ গুণ বেশী। ফলে গ্যাসীয় কণাগুলি অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে। এই প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণু নিজেকে ধরে রাখতে পারে না—ভেঙ্গে গিয়ে আয়নে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আয়নগুলি প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি ও পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। এছাড়া রয়েছে এর চেয়েও অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন প্রচুর সংখ্যক ইলেকট্রন। এই হলো সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের অবস্থা।

কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০,০০০ কিঃ মিঃ উপরে

গ্যাসের ঘনত্ব কিছুটা কমে গিয়ে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। কিন্তু এই অঞ্চল অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং প্রচুর পরিমাণে আলোক ও তাপ বিকিরণ করে। প্রায় ৩০০ কিঃ মিঃ গভীর এই স্তরের নাম আলোকমণ্ডল বা ফটোস্ফীয়ার। এখানে উত্তাপ প্রায় ৬০০০°—কেন্দ্রের তুলনায় অনেকটা কম। পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় আলোক ও উত্তাপ আলোকমণ্ডলই সরবরাহ করে থাকে। পৃথিবী থেকে আমরা থালার মত একেই দেখি।

দৃশ্য আলোতে খালি চোখে তাকিয়ে সূর্যকে যা দেখায়, আসলে কিন্তু সূর্য তার চেয়েও অনেক বড়। আলোকমণ্ডলের বাইরের দিকে প্রায় ১০০০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত অঞ্চলের গ্যাসরাশি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। ফলে এখানে বেশীর ভাগ পরমাণুই আয়নিত হয়ে যায় নি। এরা আলোক-তরঙ্গ থেকে কিছুটা শক্তি নিজের জন্যে শোষণ করে নেয়। ফলে আলোকমণ্ডল থেকে আগত আলোকের বর্ণালীতে কিছু সংখ্যক শোষণ-রেখা দেখতে পাওয়া যায়। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রনহফার এই সব রেখাগুলি নিয়ে বিশদভাবে গবেষণা করে এদের রহস্য উদ্ঘাটন করেছিলেন বলে এদের নাম দেওয়া হয়েছে ফ্রনহফার রেখা। সূর্যের এই অঞ্চলের নাম বিশোষণী মণ্ডল বা রিভার্সিং লেয়ার।

২নং চিত্র
সূর্যের বিভিন্ন স্তর

বিশোষণী মণ্ডল আস্তে আস্তে গিয়ে মিশেছে এর পরের স্তরে—যার নাম বর্ণমণ্ডল বা ক্রমোস্ফিয়ার। সাধারণ অবস্থায় আলোক-মণ্ডলের অত্যুজ্জ্বল আলোকের জন্যে বর্ণমণ্ডলকে খালি চোখে দেখা যায় না। তবে পূর্ণ সূর্য-

গ্রহণের সময়ে চাঁদ যখন আলোকমণ্ডলকে ঢেকে ফেলে, তখন বর্ণমণ্ডলকে সূর্যের চারদিকে একটা লাল চাকার মত দেখায়। এই জন্যেই এর নাম বর্ণমণ্ডল। বর্ণমণ্ডলের প্রধান উপাদান হাইড্রোজেন গ্যাসই হচ্ছে এর রঙের জন্যে দায়ী। হাইড্রোজেন ছাড়া এই অঞ্চলে ক্যালসিয়াম ও হিলিয়ামও আছে। বর্ণমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ২০,০০০ কিঃ মিঃ এবং উষ্ণতা প্রায় ১০,০০০°।
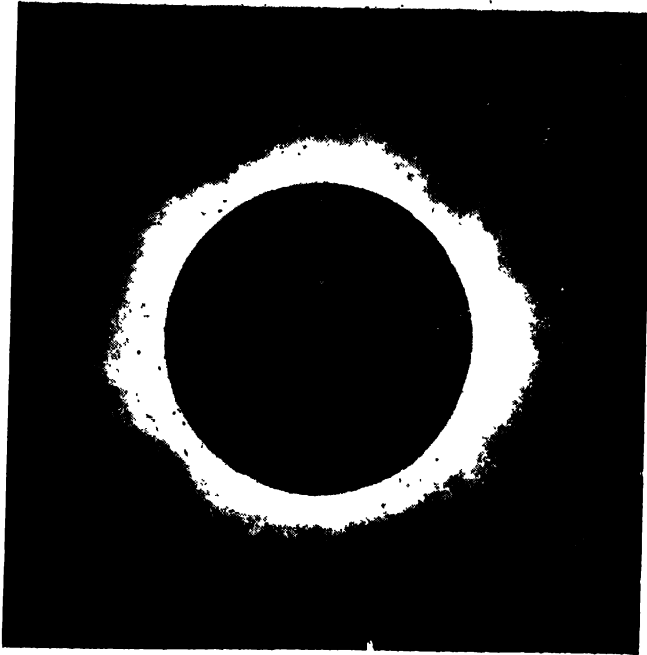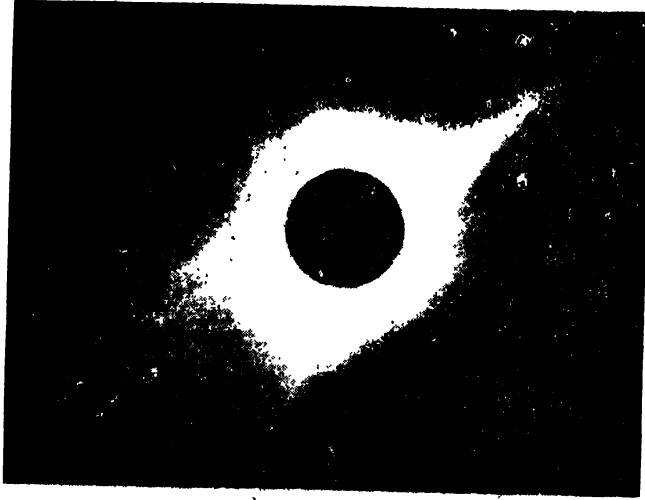
৩নং চিত্র

সূর্যের ছটামণ্ডল। উপরে—সৌরচক্রের চরম অবস্থা (১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী)। নীচে—সৌরচক্রের চরম অবস্থা (১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন)

বর্ণমণ্ডলের পরেই রয়েছে সর্বশেষ স্তর—বিশাল ছটামণ্ডল বা করোনা। ছটামণ্ডলের বিকিরিত আলোক অত্যন্ত ক্ষীণ। তাই বর্ণমণ্ডলের মত একেও পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছাড়া খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। গ্রহণের সময় কিন্তু এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। মাঝখানে চাঁদে ঢাকা কালো আলোকমণ্ডল, তারপর রক্তবর্ণ বর্ণমণ্ডল এবং সবশেষে ছটামণ্ডল। ছটামণ্ডলের 'ছটাগুলি' ফুলের পাপড়ির মত চতুর্দিকে লক্ষ লক্ষ মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে (৩নং চিত্র)। বস্তুতঃ ছটামণ্ডলের শেষ কোথায় বলা মুস্কিল। সর্বাধুনিক মতবাদ অনুযায়ী এটা পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত; অর্থাৎ আমরা প্রকৃতপক্ষে সূর্যের মধ্যেই ডুবে আছি। ছটামণ্ডলের উত্তাপ অত্যধিক—কোন কোন স্থানে প্রায় ১,০০০,০০০°। ফলে এই উত্তাপে পরমাণু এখানেও আয়নে পরিণত হয়। কোন কোন পরমাণু থেকে এমন কি ১০।১২টি পর্যন্ত ইলেকট্রন খসে যায়—তারও নিদর্শন বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। ছটামণ্ডল সম্বন্ধে আর একটা খুব মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এর আকার সব সময়ে এক রকম থাকে না। সৌরচক্রের (পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তিত হয়।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পূর্ণগ্রাস পৃথিবীর সব জায়গা থেকে দেখা যায় না। কিন্তু এই কয়েকটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কয়েক বছর ধরে আয়োজন করে পৃথিবীর যে কোন দুর্গমতম স্থানে পর্যন্ত হাজির হয়ে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এত পরিশ্রমও অনেক সময়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হয়তো আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলো বা দায়িত্বসম্পন্ন লোকদের কেউ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়লো বা আসল প্রয়োজনের সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র কাজ করলো না। অথবা এমনও হতে দেখা গেছে—সব আয়োজন ঠিকমত হওয়া সত্ত্বেও দূরবীক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী অত্যধিক উত্তেজনাবশতঃ সময়মত দূরবীক্ষণের ঢাকনা খুলতে ভুলে গেলেন! পরের সুযোগ আসতে আবার কয়েক বছর। আজকাল অবশ্য স্পেক্ট্রোহিলিওগ্রাফ ইত্যাদি যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ সব সময়েই করা চলে—গ্রহণের জন্যে অপেক্ষা করবার কোন দরকার হয় না। তবে চোখে দেখতে হলে পূর্ণ গ্রহণই সুবিধাজনক।

সূর্যপৃষ্ঠের বিচিত্র ঘটনাবলী

যদিও খালি চোখে তাকালে সূর্যকে একটি সাদা থালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, এই অতিকায় জ্বলন্ত বাষ্পরাশি বৈচিত্র্যহীন নয়। প্রকৃতপক্ষে কোন পর্যবেক্ষক কিছুক্ষণ ধরে দূরবীনের মধ্য দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকলে সেখানকার নানারূপ বিচিত্র ঘটনাবলী দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন। তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ নীচে দেওয়া হলো।

সূর্যপৃষ্ঠ—খালি চোখে তাকালে সূর্যপৃষ্ঠকে যেরূপ মসৃণ ও শান্ত দেখায়, আসলে মোটেই তা নয়। শক্তিশালী দূরবীনের ভিতর দিয়ে তাকালে দেখা যাবে, আলোকমণ্ডলের বাষ্পরাশি অত্যন্ত অশান্ত—যেন টগ্‌বগ করে ফুটছে। গোলাকৃতি শস্যদানার মত অসংখ্য বুদ্বুদ অভ্যন্তর থেকে পৃষ্ঠদেশে ভেসে উঠছে আর কিছুক্ষণ পরে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে (৪নং চিত্র)। এদের প্রত্যেকের ব্যাস প্রায় ১৫০০ কিঃ মিঃ, আয়ু কয়েক মিনিট মাত্র এবং এরা পারিপার্শ্বিক অঞ্চল থেকে শতকরা প্রায় ১০ ভাগ অধিকতর উজ্জ্বল। আলোকমণ্ডলের নীচে বিক্ষুব্ধ অঞ্চলে উদ্ভূত পরিচলন প্রক্রিয়ার ফলে এই সব বুদ্বুদের সৃষ্টি হয় বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

সৌরকলঙ্ক—সূর্যের পৃষ্ঠদেশে অনুষ্ঠিত নানারূপ বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দূরবীনের মধ্য দিয়ে সৌরকলঙ্ককে দেখলে অঞ্চলে ভাগ করা যায়—ভিতরের গভীর কালো অংশটি হচ্ছে প্রচ্ছায়া এবং তাকে ঘিরে রয়েছে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর উপচ্ছায়া। সমগ্র কলঙ্কটির মধ্যে প্রচ্ছায়া মাত্র একপঞ্চমাংশ পরিমিত
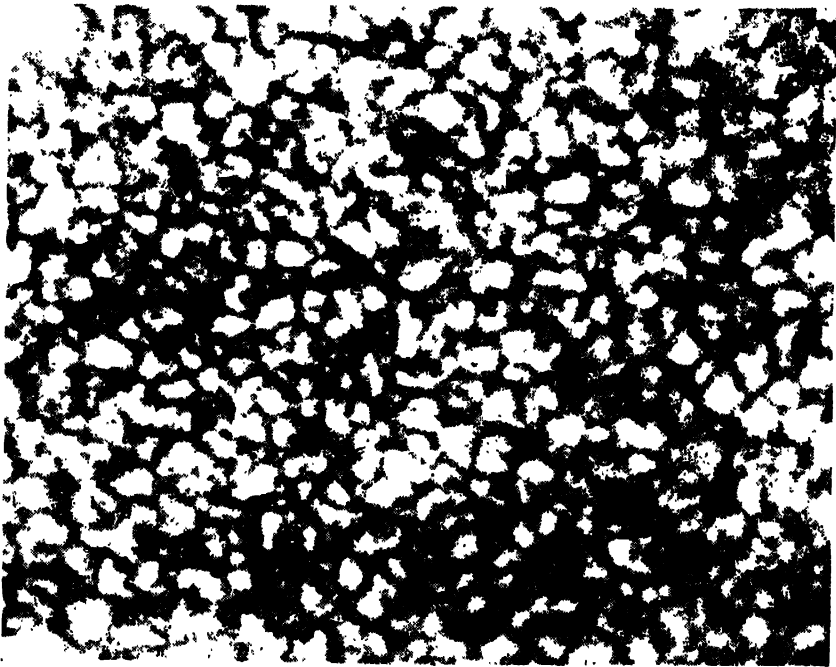
৪নং চিত্র

সূর্যপৃষ্ঠের বুদ্বুদ। দূরবীনের মধ্য দিয়ে আলোকমণ্ডলের দিকে তাকালে এই রকম দেখাবে।

সাদা আলোকমণ্ডলের গায়ে কতকগুলি কালো কালো দাগের মত দেখায় (৫নং চিত্র)। প্রকৃত পক্ষে এরা হচ্ছে সৌরদেহের উপর বিরাট বিরাট গহ্বর। এদের উত্তাপ সন্নিহিত আলোকমণ্ডলের উত্তাপের তুলনায় কিছুটা কম এবং এরা অত্যধিক চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সৌরকলঙ্কের আকৃতি নানারকম হতে পারে। খুব ছোট থেকে সুরু করে এদের এত বড়ও হতে দেখা গেছে যে, একাধিক পৃথিবীর তার মধ্য দিয়ে ঢুকে যাওয়া সম্ভব। প্রত্যেকটি সৌরকলঙ্ককেই দুটি স্থান অধিকার করে, বাকি সবটাই উপচ্ছায়া।

পর্যবেক্ষণের ফলে দেখা গেছে—এক একটি কলঙ্কের আয়ুষ্কাল কয়েক দিন থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। সৌরপৃষ্ঠের পূর্বপ্রান্তে এরা প্রথম আবির্ভূত হয়, তারপর ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এই ভাবে মধ্য রেখা বা মেরিডিয়ান অতিক্রম করে পশ্চিম প্রান্তে গিয়ে এক সময়ে মিলিয়ে যায়। কিছুদিন পরে এই কলঙ্ককে আবার পূর্বপ্রান্তে আবির্ভূত হতে দেখা যায় এবং সে এই ভাবে কয়েক বার

সূর্যকে পরিক্রমা করে। সৌরকলঙ্কের এই আপাত পরিভ্রমণ থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন যে, পৃথিবীর মতই সূর্যও তার মেরুদণ্ডের উপর ঘুরছে। এই ঘূর্ণনের বেগ মোটামুটি ভাবে ২৭ দিনে একবার। সৌরকলঙ্কের গতিবিধি বহুদিন

৫নং চিত্র

সৌরকলঙ্ক। ভিতরের দিকে কালো প্রচ্ছায়া। বাইরের দিকে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর উপচ্ছায়া।

থেকে পর্যবেক্ষণ করে আরও দেখা গেছে যে, এরা প্রথম আবির্ভূত হয় ৪৫° অক্ষরেখার (উত্তর ও দক্ষিণে) কাছাকাছি স্থানে। তারপর ক্রমশঃ বিষুব অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের মতই সৌর-পৃষ্ঠকেও সুবিধার জন্যে বিজ্ঞানীরা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করে নিয়েছেন।

সৌরকলঙ্কের পরিমাপ করা হয় তার সংখ্যা বা আয়তনের দ্বারা। বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে প্রতিদিনকার সৌরকলঙ্কের সংখ্যা ও আয়তন নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আসছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী শ্বাবে সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধে এক তাৎপর্যপূর্ণ আবিষ্কার করেন। তিনি দেখান যে, প্রায় ১১ বছর পর্যায়ক্রমে সৌরকলঙ্কের পরিমাপ বাড়ে বা কমে। একেই বলে সৌরচক্র। সৌরচক্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ সূর্যের সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ নির্ধারিত হয় সৌরকলঙ্কের দ্বারা। সৌরকলঙ্ক যখন বাড়ে, তখন সূর্য খুব চঞ্চল হয়ে ওঠে অর্থাৎ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধভাব ধারণ করে; সকল প্রকার বিকিরণের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। কলঙ্ক কমে আসলে একেবারে বিপরীত অবস্থা—সূর্য যেন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তাই সৌরচক্রের চরম ও অবম অবস্থা অনুযায়ী বলা যেতে পারে, সূর্য যথাক্রমে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হয়। পৃথিবীর উপর তার প্রভাবও সেই অনুযায়ী বর্ধিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত হযে থাকে। সৌরকলঙ্ক -বিশেষ করে কেন ১১ বছর পরপর বাড়ে ও কমে—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও স্পষ্ট নয়।

সৌরবিস্ফোরণ—সূর্যের সক্রিয়তা বা কর্ম-ক্ষমতার সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ উদাহরণ হচ্ছে সৌরবিস্ফোরণ। সৌরকলঙ্কের সন্নিহিত এক বিরাট অঞ্চল হঠাৎ অস্বাভাবিকরূপে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যেন সেখানে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছে (৬নং চিত্র)। সূর্যপৃষ্ঠের উপরে এদের আয়তন সাধারণতঃ কয়েক শত কোটি বর্গ কিঃ মিঃ পর্যন্ত এবং স্থায়িত্ব কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত হতে পারে। সৌরবিস্ফোরণ যদিও সৌরকলঙ্কের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তথাপি তা ঠিক কখন ঘটবে, আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কোন একটি সৌরকলঙ্ক হয়তো পর পর অনেকগুলি বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে, আবার এরকমও দেখা গেছে—সম আয়তনের অপর একটি কলঙ্কের ক্ষেত্রে একটিও বিস্ফোরণ ঘটলো না। অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক কলঙ্ক দেখলেই তার প্রকৃতি বুঝতে পারেন এবং তার উপর নজর রাখেন। বর্ণমণ্ডল অঞ্চলেই সৌরবিস্ফোরণ সংঘটিত হয়, যদিও এদের সঠিক উচ্চতা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন।

সৌরপৃষ্ঠে এদের আয়তন, স্থায়িত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের উপর নির্ভর করে সৌরবিস্ফোরণকে কতক-গুলি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। শ্রেণীগুলি ১

(ক্ষুদ্রতম), ১+, ২, ২+, ৩ ও ৩+ (বৃহত্তম) —এই কয়টি সংখ্যার দ্বারা সূচিত হয়। এই শ্রেণী-বিভাগ অবশ্য খুবই স্থূল এবং তা অনেকটাই নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের ব্যক্তিগত মতামতের উপর। তাহলেও এরূপ ব্যবস্থাই আজও চলে দৈর্ঘ্যের অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গ বিকিরিত ও বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকা নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। পৃথিবীর উপর এদের নানারূপ প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেকথা পরে আলোচনা করা হবে।
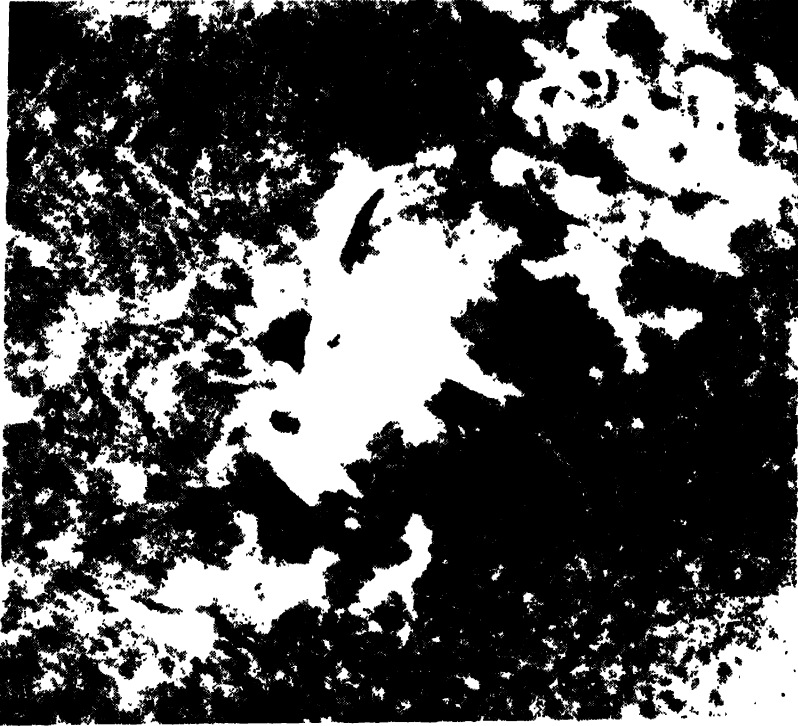
৬নং চিত্র
সৌরবিস্ফোরণ (শ্রেণী—৩)। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বরের ঘটনা

আসছে। সারা পৃথিবীর উপর কয়েক শত মানমন্দির থেকে সূর্যের উপর প্রায় ২৪ ঘণ্টা কড়া নজর রাখা হয়েছে। কখন এবং কোন্ অঞ্চলে বিস্ফোরণ ঘটলো, কতক্ষণ তা চললো, কোন শ্রেণীর বিস্ফোরণ—এই সব তথ্য সংগৃহীত ও বিজ্ঞানীদের কাছে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সৌরবিস্ফোরণের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে —এর সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চল থেকে নানা তরঙ্গ-

সৌরশিখা—সূর্যপৃষ্ঠের অপর এক বিস্ময়কর ঘটনা হলো সৌরশিখা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড এবং বিচিত্র আকৃতির লেলিহান অগ্নিশিখা হঠাৎ সূর্যের পৃষ্ঠদেশের উপর বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে দেখা যায় (৭নং চিত্র)। সাধারণতঃ সৌর-কলঙ্ক ও সৌরবিস্ফোরণের সন্নিহিত অঞ্চলেই এদের দেখতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় ২০,০০০ থেকে ২০০,০০০ কিঃ মিঃ এবং উচ্চতায় ২০,০০০

থেকে ৫০,০০০ কি: মি: পর্যন্ত হয়ে থাকে। সূর্যের অভ্যন্তর থেকে জ্বলন্ত গ্যাসরাশি প্রচণ্ড বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই সব বস্তুর অধিকাংশই আবার মোটামুটি একই পথে সূর্যপৃষ্ঠে নেমে আসে, কিছুটা অংশ মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়।

১নং চিত্র
সৌরশিখা। অগ্নিশিখার মত এরা সূর্যপৃষ্ঠ থেকে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়

এসব ছাড়াও আরও ছোট ছোট নানা চমকপ্রদ ক্ষণস্থায়ী ঘটনা সূর্যপৃষ্ঠে ঘটতে দেখা যায়। তাদের বিবরণ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

সূর্যের বেতার-তরঙ্গ

সূর্য থেকে যে বেতার-তরঙ্গ আসতে পারে, সে কথা অনেক আগেই সার অলিভার লজ প্রমুখ মনীষীরা বলে গেছেন। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে তাঁরা পরীক্ষার দ্বারা দেখাতে পারেন নি। মহাশূন্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ প্রথম ধরতে সক্ষম হন কার্ল ইয়ান্স্কি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে। এই আবিষ্কারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে 'বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা' নামে বিজ্ঞানের আধুনিক শাখা। সৌর বেতার-তরঙ্গের সন্ধান প্রথম পাওয়া যায় এক দৈব ঘটনার মাধ্যমে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যাণ্ডের উপকূলভাগে কার্যরত বৃটিশ রেডার যন্ত্রে এক অদ্ভুত ধরণের বেতার-সঙ্কেত ধরা পড়ে। বিশেষজ্ঞেরা প্রথমে একে শত্রুপক্ষের নতুন কোন ধাপ্পা বলেই ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে সার জে এস. হে অনুসন্ধান করে বললেন যে, এই তরঙ্গের উৎস হলো সূর্য। বস্তুতঃ সূর্যের উপর সেই সময়ে বিরাট এক সৌরকলঙ্ক দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধকালীন গোপনতার জন্যে অবশ্য এই খবর তখনকার মত চেপে রাখা হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর যখন খবরটি প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন হে-র এই আবিষ্কারের ফলে সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায় এবং বিভিন্ন স্থানে গবেষণাগার গড়ে ওঠে।

গত পচিশ বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে সৌর বেতার-তরঙ্গের প্রধানতঃ দুটি রূপের পরিচয় পাওয়া গেছে। এদের একটি সূর্যের শান্ত অবস্থা ও অপরটি বিক্ষুব্ধ অবস্থা সূচিত করে। 'শান্ত সূর্য' কথাটির অবশ্য কোন তাৎপর্য নেই। কারণ উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, সূর্য কখনওই শান্ত নয়। তার সারা দেহে সর্বদাই চলেছে প্রচণ্ড আলোড়ন। তাহলে আমরা সূর্যকে কখন শান্ত বলবো? সূর্যপৃষ্ঠের উপর যখন সৌরকলঙ্ক, সৌরবিস্ফোরণ বা এই জাতীয় কোন 'সক্রিয় অঞ্চল' না থাকে—সেই অবস্থাকে সূর্যের 'শান্ত' অবস্থা বলা হয়। তবে তখনও কিন্তু দেখা যায়, সূর্য থেকে বেতার-তরঙ্গ আসছে যদিও এই তরঙ্গ খুব স্থির ক্ষণে ক্ষণে এর তীব্রতা পরিবর্তিত হয় না। অপর পক্ষে, কোন 'সক্রিয় অঞ্চল' সূর্য-পৃষ্ঠের উপর দেখা গেলেই আগত বেতার-তরঙ্গের শক্তি অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। বিস্ফোরণ ঘটবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই বৃদ্ধি কয়েক হাজার গুণ হতে পারে। তারপর অবশ্য আস্তে আস্তে আবার শান্ত অবস্থার মানে ফিরে আসে। সৌরকলঙ্ক ও বিস্ফোরণই যে সূর্যের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় এই জাতীয় বেতার উচ্ছ্বাসের জন্যে দায়ী—সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আজ একমত।

যদি আমাদের চোখ হঠাৎ কখনও আলোকের পরিবর্তে বেতার-তরঙ্গের প্রতি সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে সেই বেতারের চোখ দিয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দেখবো? চিরপরিচিত সূর্যের বদলে যাকে দেখবো, সে কিন্তু এর চেয়ে অনেক বড়। কতটা বড় তা নির্ভর করছে, কত মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে দেখা হচ্ছে, তার উপর। শুধু তাই নয়, বিশাল সূর্যপৃষ্ঠের ঔজ্জ্বল্যও সর্বত্র সমান নয়। এক মিটার তরঙ্গের সূর্যের ঔজ্জ্বল্য অবশ্য সব জায়গায় প্রায় সমানই দেখা যাবে। কিন্তু তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এর চেয়ে কম হলে কেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং পরিধির দিকে ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে পরিধিতে একটি সুন্দর অত্যুজ্জ্বল বলয়ের সৃষ্টি করে। এক মিটারের বেশী দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটা বিপরীত; অর্থাৎ কেন্দ্রের ঔজ্জ্বল্য সবচেয়ে বেশী পরিধির দিকে ক্রমশঃ কম হয়ে আসে। এদিকে আবার এই সবের মধ্যে দেখা যাবে, হঠাৎ কোন কোন জায়গায় ঝল্‌সে উঠছে বেতার-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস—চোখ ধেঁধে যাবে! এই হচ্ছে বেতারের চোখে সূর্য বা বেতার-সূর্যের রূপ।

সূর্যের অন্যান্য রশ্মি ও পৃথিবীর উপর তাদের প্রভাব

আলোক এবং বেতারের জানালার মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে যে সব তথ্য জানা গেছে, এতক্ষণ তা আলোচনা করা হলো। ১নং চিত্রে যে বিশাল বিদ্যুচ্চৌম্বক তরঙ্গমালা দেখানো হয়েছে, তাদের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই পেয়েছিলেন। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে এই সব তরঙ্গের প্রবেশ নিষিদ্ধ বলে ভূপৃষ্ঠে বসে এদের পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয় নি। অথচ এদের বাদ দিলে সূর্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সে কথা বিজ্ঞানীরা বুঝেছিলেন। তাই তাঁরা নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে এদের ধরবার জন্যে। প্রথম দিকে সুউচ্চ পর্বতের উপর উঠে পর্যবেক্ষণ চালালেন। কিন্তু তাতেও বায়ুমণ্ডলের বাধা দূর হলো না। তারপর বেলুনে করে যন্ত্রপাতি পাঠাবার চেষ্টা করলেন। তাতে অবশ্য কিছুটা সুবিধা হলো। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানদের অবদান রকেটের আগমন বিজ্ঞানীদের অনেকটা সাহায্য করলো। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ভি-২ রকেট সূর্যের বর্ণালী পর্যবেক্ষণের কাজে লাগানো হলো। কিন্তু মুস্কিল দূর হলো না—কারণ রকেটের ঊর্ধ্বাকাশে স্থায়িত্ব খুব কম সময়ের জন্যে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা

অক্টোবর কৃত্রিম উপগ্রহ ক্ষেপণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে যুগান্তর আনলো, তার ধাক্কা জ্যোতির্বিজ্ঞানকেও প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে নিয়ে এসেছে। এরা যে সব যন্ত্রপাতি বহন করে উপরে নিয়ে যায়, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের বাইরে অনেক দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। বহিরাকাশ সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্য তারা বেতারের মারফৎ ভূপৃষ্ঠে বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এসব তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা গেছে যে, সূর্যের শান্ত অবস্থাতেও আলোক ও বেতার-তরঙ্গের মত রঞ্জেন ও অতিবেগুনী রশ্মি বিকিরিত হয়ে থাকে ও পৃথিবীতে আসে (৮নং চিত্র)। এরা উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণু-সমূহ থেকে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের আয়নে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর মোটামুটি ৫০ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ
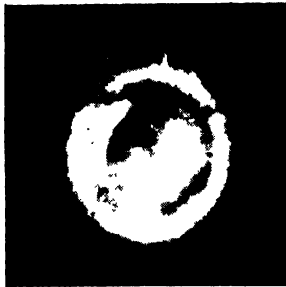
৮নং চিত্র
রকেটের সাহায্যে গৃহীত রঞ্জেনরশ্মির আলোতে সূর্যের চেহারা।

অঞ্চল এরূপ আয়নের দ্বারা গঠিত। এর নাম আয়নমণ্ডল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের উপর দূর পাল্লার বেতার যোগা-যোগের ক্ষেত্রে আয়নমণ্ডল অপরিহার্য।

সূর্যের বিক্ষুব্ধ অবস্থায় যখন সেখানে বিস্ফোরণ ঘটতে থাকে, তখন অধিকতর শক্তিশালী রঞ্জেন ও অতিবেগুনী রশ্মি বায়ুমণ্ডলে এসে পড়ে। এরা আয়নমণ্ডলে অতিরিক্ত আয়ন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি করে। এর ফল কিন্তু আমাদের পক্ষে কিছুটা অসুবিধাজনক। দূরপাল্লার যোগা-যোগের জন্যে যে বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, অতিরিক্ত আয়ন ও ইলেকট্রন তাদের শক্তি অনেকটা বা কোন কোন ক্ষেত্রে সবটাই শুষে নেয়। খবরের কাগজে যে মাঝে মাঝে বেতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার সংবাদ পাওয়া যায়, তা এই কারণেই ঘটে থাকে

তরঙ্গমালা ছাড়া বিদ্যুৎ-কণিকাও পৃথিবীতে এসে পড়ে। সৌরকলঙ্কের সন্নিহিত অঞ্চল থেকেই সাধারণতঃ এরা আসে। আর বিস্ফোরণ ঘটলে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কণিকা নিক্ষিপ্ত হতে দেখা যায়। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যারা—প্রায় আলোকের গতিবেগে চলে—তারা সোজা ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে। এরাই সূর্য থেকে আগত মহাজগতিক রশ্মি। অপেক্ষাকৃত কম গতিবেগসম্পন্ন কণিকাগুলি—সেকেণ্ডে প্রায় ১৫০০ কিঃ মিঃ বেগে ধাবিত হয়ে বিস্ফোরণের ২৪ ঘণ্টা থেকে ৪৮ ঘণ্টা পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। এরা কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আসতে পারে না। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে পড়ে দুই মেরুঅঞ্চলের দিকে বেঁকে যায়। কারণ সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের বল সর্বপেক্ষা বেশী। মেরুঅঞ্চলে গিয়ে সেখানকার বায়ুকণাকে এরা উত্তেজিত করে। ফলে সেখানকার আকাশে দেখা যায় নানা রঙের খেলা—যার নাম মেরু-জ্যোতি। বিষুবঅঞ্চলের দিকে ক্রমশঃ চৌম্বক ক্ষেত্রের বল কমে আসে বলে সৌর কণিকাগুলি সাধারণতঃ এদিকে আসতে পারে না। তাই আমাদের অক্ষরেখায় আমরা প্রকৃতির এই শ্রেষ্ঠ উপভোগ্য দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য থেকে চিরদিন বঞ্চিত। এছাড়া এই সব কণিকা

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার নাম চৌম্বক ঝটিকা।

সৌরশক্তির উৎস

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে—কি বিপুল পরিমাণ শক্তি প্রতি মুহূর্তে নানা জাতীয় বিকিরণের আকারে সূর্য থেকে নির্গত হচ্ছে। খুব সাধারণভাবে হিসাব করলে এই পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.১×১০^{২৩} অশ্বশক্তি বা ৩.৮×১০^{২৩} কিলো-ওয়াট। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে—এই অফুরন্ত শক্তির উৎস কোথায়?

আজ থেকে শতাধিক বছর পূর্বে বিখ্যাত পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনের মাথায় এই চিন্তা এসেছিল। সূর্য যদি তার নিজের শক্তি ভাঙ্গিয়ে খায়, তবে সহজেই দেখানো যায় যে, প্রতি বছরে তার উত্তাপ ২° করে কমবে। সে ক্ষেত্রে কয়েক হাজার বছরের বেশী তার আয়ু হতে পারে না। কেলভিন প্রথমে ভেবেছিলেন—সূর্যের আকর্ষণে প্রচণ্ড বেগে উল্কার ঝাঁক এসে তার উপর পড়ে এবং সেটাই হলো শক্তির উৎস। কয়েক বছর পরেই তিনি এই ধারণা পরিত্যাগ করে হেলম্‌-হোল্টজের মতবাদ গ্রহণ করলেন। এই মতবাদ অনুযায়ী সূর্য যদি খুব ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত হয়, তবে তার অভিকর্ষজনিত শক্তি উত্তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। কিন্তু অঙ্ক কষে দেখা গেল—যে হারে প্রতিনিয়ত তাপ বিকিরিত হচ্ছে, তাতে এই উপায়ে অর্জিত শক্তিও মোটামুটি ২০ লক্ষ বছরের বেশী চলবে না। পক্ষান্তরে সর্বাধুনিক উপায়ে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যে বয়স নির্ধারণ করেছেন, তা হলো ৩,৩০০ লক্ষ বছর। সূর্যের বয়স তো এর চেয়ে অনেকটাই বেশী হবে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বস্তুর শক্তিতে রূপান্তরণ সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত মতবাদ ও সূত্র $E=mc^2$ প্রকাশিত হলো। এই সূত্র অনুযায়ী m গ্র্যাম বস্তুকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তবে mc^2 পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাবে। এখানে c হচ্ছে আলোকের গতিবেগ—সেকেণ্ডে ৩×১০^{১০} সে: মি:। এদিকে আবার দেখা গেল যে, বিশেষ পরিবেশে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করতে পারে। কিন্তু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর একত্রে একটা হিলিয়াম পরমাণুর ভরের চেয়ে কিছুটা বেশী। তাহলে এই উদ্বৃত্ত পরিমাণ বস্তু কোথায় যায়? এই উদ্বৃত্ত বস্তুই আইনষ্টাইনের উপরিউক্ত সূত্র অনুসারে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূর্যের অভ্যন্তরে যে অত্যধিক তাপ ও চাপ রয়েছে, তাতে এই বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সূত্রটি থেকে সহজেই অনুমেয়, কি প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি এই উপায়ে নির্গত হতে পারে। দেখা গেল—এই প্রক্রিয়ায় সেই শক্তির ব্যাখ্যা করা চলে।

অপর দিকে সার জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ বললেন যে, বিশেষ অবস্থায় পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণিকা পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে শক্তি বিকিরণ করতে পারে। কিছুদিন এই দুই মতবাদ নিয়ে বাগ্‌-বিতণ্ডা চললো। পরে দেখা গেল—জীনসের মতবাদ হলো সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। পক্ষান্তরে পর্যবেক্ষণ থেকে সূর্যের অভ্যন্তরে হিলিয়ামের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। তাই হাইড্রোজেনের হিলিয়ামে রূপান্তরণজনিত শক্তির উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদই মেনে নেওয়া হয়েছে।

সূর্য কি একটা চুম্বক?

সূর্যের যে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র আছে, সে কথা প্রথম সন্দেহ করা হয় ১৮৭৮ সালের সূর্যগ্রহণের পর। এই সময়ে দেখা গেল—ছটামণ্ডলের ছটাগুলি যেন একটা চুম্বকের চতুষ্পার্শ্বস্থ বলরেখার ঢঙে সজ্জিত। এর পর সৌরচক্রের অবম অবস্থায়

ছটামণ্ডলের চেহারা দেখে ষ্টোর্মার প্রমুখ অনেক বিজ্ঞানীই সিদ্ধান্ত করলেন যে, সূর্য নিশ্চয়ই একটি চুম্বক। সৌরশিখার আকৃতি দেখেও অনেকে অনুরূপ মত প্রকাশ করলেন। এতে উৎসাহিত হয়ে হেইল্ সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ গ্রহণ করবার ব্যবস্থা করলেন। হেইলের মতানুসারে সূর্যের পৃষ্ঠদেশে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রায় ৫০ গাউস। কিন্তু বিজ্ঞানী থীসেন আরও সঠিকভাবে মেপে বললেন যে, এর পরিমাণ মাত্র ১ গাউসের কাছাকাছি। পরে ব্যাবককও থীসেনকেই সমর্থন করলেন। পর্যবেক্ষণ থেকে আরও জানা গেল যে, পৃথিবীর মত সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্রও দ্বিমেরুজ। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ ও চৌম্বক উত্তর-দক্ষিণ যেমন পরস্পরের সঙ্গে কিছুটা কোণ করে আছে, সূর্যের ক্ষেত্রে তা নয়। সূর্যের দুই মেরুরেখা এক ও অভিন্ন। শুধু তাই নয়, সূর্যের মেরুদ্বয় পরস্পরের মধ্যে ঘন ঘন পরিবর্তনশীল; অর্থাৎ বর্তমানে যে দিক উত্তর ও যে দিক দক্ষিণ মেরু, কয়েক বছর পরে তা বিপরীত হয়ে যাবে। সম্ভবতঃ সৌরচক্রের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই সম্বন্ধে এখনও পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলছে।

উপসংহার ও মন্তব্য

আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তার অধিকার হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। এমন কি, মহাশূন্যেও আজ তার পদক্ষেপ পড়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিক শক্তির বলে বলীয়ান এই যুগের মানুষও প্রকৃতির সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্ত চলতে পারে না। সূর্যের অভাবের কথা তো কল্পনাই করা যায় না। তার বিকিরণ শক্তি যদি কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়, পৃথিবীর উপর তার ফলাফল ভাবতে গেলেও শিউরে উঠতে হয়।

পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্যে সূর্য অপরিহার্য। সেজন্যে সূর্য আমাদের বড় প্রিয় এবং সূর্যকে নানাভাবে জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা গোড়া থেকেই উঠেপড়ে লেগেছেন। আমরা এতদিন সূর্যকে দেখেছি, কারণ সূর্যের আলোক-তরঙ্গ এসে আমাদের চোখে পড়ছে—সূর্যের প্রভাব অনুভব করেছি। কারণ সূর্যের উত্তাপ-তরঙ্গ আমাদের শরীরকে উত্তেজিত করছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আজ সূর্যের 'কথা-বার্তা' শুনতে পারছি, কারণ রেডিও ষ্টেশনের মত সূর্য থেকে বেতার-তরঙ্গ এসে বিজ্ঞানীর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। এতেও কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা তাই বায়ুমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে এসেছেন সূর্যের অন্যান্য রশ্মির সন্ধানে, দুর্গম মেরুঅঞ্চলে হানা দিয়েছেন সূর্যের বিদ্যুৎ-কণিকা ধরবার জন্যে।

কোন এক দেশের বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সম্ভব নয় এত বড় সূর্যের এত দিকে লক্ষ্য রাখা। তাই সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা মিলিত হয়েছেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে সূর্যের রহস্য সমাধানের জন্যে। এরই ফলে ব্যবস্থা হয়েছিল ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষের। সূর্য ছিল তখন প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ—সৌরচক্রের চরম অবস্থায়। আবার ১৯৬৩-৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক 'শান্ত সূর্য' বর্ষ। সূর্য তখন একেবারে শান্ত—সৌরচক্রের অবম অবস্থা। এই সব মিলিত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে নতুন নতুন তথ্য, ফলে প্রচারিত হচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব। আশা করা যায়—সূর্য সম্বন্ধে এখনও যে সব অজ্ঞাত রহস্য রয়েছে, তা অদূর ভবিষ্যতে উদ্ঘাটিত হবে।

কৃত্রিম রেশম

শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু

রেশমী পোষাক-পরিচ্ছদের কমনীয়তা শরীরের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। প্রাকৃতিক রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকা অর্থাৎ রেশম-কীট থেকে। গুটিপোকার উৎস ছাড়াই রেশম তৈরির পরিকল্পনা মানুষের মাথায় আসে অনেক দিন থেকে।

প্রাকৃতিক রেশম প্রোটিনের তন্তু, কিন্তু কৃত্রিম রেশম তৈরি হয় সেলুলোজ থেকে।

১৬৬৪ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে রেশম তৈরি করা সম্ভব। তারপর অনেক বছর ধরে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। ১৮৫৫ সালে সুইডিস রসায়নবিদ জর্জ য়ুডেমারস সর্বপ্রথম কৃত্রিম রেশম তৈরির পেটেন্ট গ্রহণ করেন। মালবেরি এবং অন্যান্য গাছের ছাল থেকে সংগৃহীত সেলুলোজ থেকে তিনি রেশমের তন্তু তৈরি করেন এই তন্তু কিন্তু কাপড় বোনবার মত যথেষ্ট শক্ত ছিল না।

১৮৮৩ সালে ইংরেজ পদার্থ-বিজ্ঞানী সার জোসেফ ডাব্লিউ. সোয়ান অপেক্ষাকৃত শক্ত রেশম-তন্তু প্রস্তুতে সক্ষম হন; তবে প্রাকৃতিক রেশমের চেয়ে এই রেশমের দাম পড়েছিল অনেক বেশী।

১৮৯০ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী কাউন্ট হিলারী ডি চারডোনেন্ট প্রথম কাপড় বোনবার উপযোগী শক্ত কৃত্রিম রেশম তৈরি করেন। তিনি প্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের সহকারী ছিলেন। মালবেরি গাছের পাতা থেকে তিনি প্রথম সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। পরে অবশ্য তুলা ইথারে ডুবিয়ে তার দ্রবণ তৈরি করে তাথেকে তিনি প্রয়োজনীয় সেলুলোজ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিই কৃত্রিম রেশম শিল্পের জনক বলে পরিচিত তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিটি ছিল নিম্নরূপ:—

নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের পাতলা দ্রবণে সেলুলোজ যোগ করে সেলুলোজ মনো এবং ডাই-নাইট্রেট তৈরি করা হয়। কঠিন অবস্থায় তা পাইরোক্সিলিন নামে পরিচিত। এই পাইরোক্সিলিন ইথার-অ্যালকোহল মিশ্রণে দ্রবীভূত করে কলোডিয়ন পাওয়া সম্ভব। এই কলোডিয়নকে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চাপ দিয়ে বাতাসে বেরিয়ে আসতে দিলে সেলুলোজ নাইট্রেটের তন্তু পাওয়া যায়। সেই তন্তু কষ্টিক সোডা বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফেটের দ্রবণ সহযোগে ফোটালে সেলুলোজ অর্থাৎ চারডোনেন্ট উদ্ভাবিত কৃত্রিম রেশম পাওয়া সম্ভব কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এই উপায়ে রেশম তৈরি করতে গেলে উৎপাদনের ব্যয় প্রচুর পড়ে যায়।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১১ সালের পর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কৃত্রিম রেশম তৈরি সুরু হয়। এই ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ছিল আমেরিকান ভিস্কোজ কর্পোরেশন নামে এক বৃটিশ কোম্পানী।

ভিস্কোজ পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম নিম্নলিখিত ভাবে তৈরি হয়:—

সেলুলোজ কষ্টিক সোডার দ্রবণ সহযোগে ফুটিয়ে তাতে কার্বন ডাইসালফাইড যোগ করা হয়। ফলে কতকগুলি বিভিন্ন সোডিয়াম জ্যানথেটের এক মিশ্রণ তৈরি হয়। মিশ্রণটি কষ্টিক সোডার দ্রবণে দ্রবণীয়। কষ্টিক সোডার জন্যে দ্রবণটি ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে। এর সান্দ্রতা একটু বেশী হয়। এই সান্দ্র তরল পদার্থটিকে

খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে চাপ দিয়ে পাঠালে এবং পাত্‌লা সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যোগ করলে চক্‌চকে সুন্দর কৃত্রিম রেশমের তন্তু (সেলুলোজ) পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশী কৃত্রিম রেশম তৈরি হয়। কৃত্রিম রেশম সাধারণভাবে রেয়ন নামে পরিচিত। কৃত্রিম রেশম তৈরি করবার আরও দুটি পদ্ধতি আছে। তাদের একটিতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড বা অনার্দ্র জিঙ্ক ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের সঙ্গে সেলুলোজ ফোটালে সেলুলোজ ট্রাই-অ্যাসিটেট পাওয়া যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়া সমাপ্ত হলে জল যোগ করে সেলুলোজ ট্রাই-অ্যাসিটেটকে সম্ভবমত সেলুলোজ ডাই-অ্যাসিটেটে পরিণত করা হয়। ঐ সেলুলোজ ডাই-অ্যাসিটেটকে ধৌত করে শুকিয়ে নেবার পর অ্যাসিটোন-সমৃদ্ধ কতকগুলি জৈব তরল যৌগের মিশ্রণে দ্রবীভূত করা হয়। এই দ্রবণটিকে চাপ প্রয়োগে খুব ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে একটা উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে চালনা করলে উদ্বায়ী অ্যাসিটোন ইত্যাদি দ্রাবক বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং সেলুলোজ অ্যাসিটেটের কৃত্রিম রেশম তন্তু পাওয়া যায়। এই ভাবে তৈরী রেশম সহজদাহ্য নয়; কিন্তু এভাবে তৈরি করতে গেলে খরচা বেশী পড়ে।

আর একটি পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম তৈরি করা যায়, যাকে বলা হয় কিউপ্রোঅ্যামোনিয়াম পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে সেলুলোজ অ্যামোনিয়া-যুক্ত কপার হাইড্রক্সাইডের দ্রবণে যোগ করে ফোটানো হয়। সেলুলোজ দ্রবীভূত হলে সেই দ্রবণ চাপ প্রয়োগে খুব সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে যোগ করা হয়। ফলে সেলুলোজের অর্থাৎ কৃত্রিম রেশমের তন্তু পাওয়া যায়। এই ধরণের রেশম খুব সস্তা হয়ে থাকে।

এই সব উপায়ে প্রস্তুত রেশম কৃত্রিম হলেও পুরাপুরি কৃত্রিম বলে দাবী করা যায় না; কারণ এই সব বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মূল উপাদান সেলুলোজ উদ্ভিদ থেকেই সরাসরি সংগ্রহ করা হয়।

অ্যাসিটেট রেয়ন ভিস্‌কোজ রেয়নের চেয়ে বেশী টেঁকসই এবং বেশী সুন্দর। তবে অ্যাসিটেট রেয়নের দাম ভিস্‌কোজ রেয়নের চেয়ে বেশী। অ্যাসিটেট রেয়নকে শুধু অ্যাসিটেট এবং ভিস্‌কোজ রেয়নকে শুধু রেয়ন বলে অনেক সময় অভিহিত করা হয়।

সাধারণভাবে কৃত্রিম রেশম প্রাকৃতিক রেশমের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম সহজদাহ্য। প্রাকৃতিক রেশম পোড়ালে চুল পোড়া গন্ধের মত গন্ধ নির্গত হয়। কৃত্রিম রেশম পোড়ালে সে রকম কোন গন্ধ পাওয়া যায় না।

পর্যায় সারণী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য

মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া ইহাদের একটি শ্রেণীতে সুষ্ঠুভাবে সজ্জিত করিবার চেষ্টা অনেক দিন পূর্ব হইতেই চলিতেছিল। কারণ শতাধিক মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলী পৃথক পৃথকভাবে মনে রাখা বা আলোচনা করা খুবই কঠিন। এক্ষেত্রে সমধর্মী মৌলিক পদার্থগুলিকে যদি কোনও উপায়ে একটি শ্রেণীতে পর পর সজ্জিত করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মৌলিক পদার্থগুলির ধর্মাবলী পর্যালোচনা করা সহজ হয়। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহাদের মধ্যে রাশিয়ার খ্যাতনামা বিজ্ঞানী মেণ্ডেলিফ ১৮৬৯ সালে যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী ও গ্রহণযোগ্য। মেণ্ডেলিফ যে ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া মৌলিক পদার্থগুলিকে সজ্জিত করেন, তাহা এইরূপ :

'যদি মৌলিক পদার্থগুলিকে তাহাদের পারমাণবিক ওজনের ক্রমানুসারে সজ্জিত করা যায়, তাহা হইলে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের ধর্মাবলী পুনরাবৃত্ত হয়।' এই সূত্রটি পর্যায় সূত্র (Periodic Law) নামে খ্যাত। মেণ্ডেলিফ উপরিউক্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া কি উপায়ে মৌলিক পদার্থগুলিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন, নিম্নে বিশদভাবে তাহার আলোচনা করা হইল।

মেণ্ডেলিফ কর্তৃক আবিষ্কৃত পর্যায় সারণীতে (Periodic Table) লম্বভাবে নয়টি স্তম্ভ এবং সমান্তরালভাবে সাতটি স্তম্ভ রহিয়াছে। লম্বমান স্তম্ভগুলি শ্রেণী (Groups) এবং সমান্তরাল স্তম্ভগুলি পর্যায় (Periods) নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি পর্যায়ে সমান সংখ্যক মৌলিক পদার্থ নাই। প্রথম পর্যায়টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাতে মাত্র দুইটি মৌলিক পদার্থ অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে একটি হাইড্রোজেন (H) এবং অপরটি হিলিয়াম (He)। এই জন্য প্রথম পর্যায়টিকে অতিক্ষুদ্র পর্যায় বলা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায় দুইটির প্রত্যেকটিতে আটটি করিয়া মৌলিক পদার্থ আছে। এই দুইটি পর্যায়কে ক্ষুদ্র পর্যায় বলা হয়। ক্ষুদ্র পর্যায় দুইটির পদার্থগুলিকে আদর্শ মৌলিক পদার্থ (Typical Elements) বলা হয়। চতুর্থ এবং পঞ্চম—এই উভয় পর্যায়ের প্রতিটিতে আঠারটি করিয়া মৌলিক পদার্থ আছে বলিয়া দীর্ঘ পর্যায় নামে পরিচিত। দীর্ঘ পর্যায় দুইটির মৌলিক পদার্থগুলি দুই ভাগে বিভক্ত—স্বাভাবিক মৌল (Normal elements) এবং পরিবর্তনশীল মৌল (Transitional elements)। চতুর্থ পর্যায়ে সেলিনিয়াম (Se) হইতে জিঙ্ক (Zn) পর্যন্ত দশটি এবং পঞ্চম পর্যায়ে ইটরিয়াম (Y) হইতে ক্যাডমিয়াম (Cd) পর্যন্ত দশটি মৌলিক পদার্থ পরিবর্তনশীল এবং উভয় পর্যায়ের অন্যান্য মৌলিক পদার্থগুলি স্বাভাবিক মৌল। এখন এই সকল স্বাভাবিক এবং পরিবর্তনশীল মৌলিক পদার্থগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা দরকার।

স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বাহিরের কক্ষটি (Shell) অসম্পূর্ণ থাকে। যখন একটি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে অপর একটি মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত হয়,

PERIODIC TABLE

Groups		I A	I B	II A	II B	III A	III B	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII A	VII B	VIII	VIII	VIII	O
Period 1		H 1 1·008																	He 2 4·003
„ 2		Li 3 6·940		Be 4 9·09			B 5 10·82		C 6 12·01		N 7 14·00		O8 16·00		F 9 19·00				Ne 10 20·183
„ 3		Na 11 23 00		Mg 12 24·32			Al 13 26·97		Si 14 28·06		P 15 31·00		S 16 32·06		Cl 17 35·46				A 18 39·944
„ 4	First Series	K 19 39·10		Ca 20 40·08		Sc 21 45·10		Ti 22 47·90		V 23 50 95		Cr 24 52·01		Mn 25 54·93		Fe 26 55·84	Co 27 58·94	Ni 28 58·69	
	Second Series		Cu 29 63·57		Zn 30 65·38		Ga 31 69·72		Ge 32 72·69		As 33 74·91		Se 34 78·96		Br 35 79·92				Kr 36 83·7
„ 5	First Series	Rb 37 85·48		Sr 38 87·63		Y 39 88·92		Zr 40 91·22		Nb 41 92·91		Mo 42 95·95		Tc 43 97·8		Ru 44 101·7	Rh 45 102·91	Pd 46 106·7	
	Second Series		Ag 47 107·88		Cd 48 112·41		In 49 114·76		Sn 50 118 76		Sb 51 121·76		Te 52 127·61		I 53 126·92				Xe 54 131·3
„ 6	First Series	Cs 55 132·91		Ba 56 137·36		La 57* 138·92		Hf 72 178·6		Ta 73 180·88		W 74 183·92		Re 75 186·31		Os 76 190·2	Ir 77 193·1	Pt 78 195·23	
	Second Series		Au 79 197·2		Hg 80 200·62		Tl 81 201·39		Pb 82 207·21		Bi 83 209 00		Po 84 210		At 85 210 (?)				Rn 86 222
„ 7		Fr 87 223		Ra 88 226·05		Ac 89 227		Th 90 232·12		Pa 91 231		U 92 238·07		→Transuranium elements					
*Rare Earths 58—71		Ce 58 140 13		Pr 59 140·9		Nd 60 144·27		Pm 61 ?		Sm 62 150·4		Eu 63 152		Gd 64 156·9					
		Tb 65 159·2		Dy 66 162 46		Ho 67 164 9		Er 68 167 2		Tm 69 169·4		Yb 70 173·04		Lu 71 174·99					

Figures after the symbols indicate atomic numbers and figures below atomic weights.

তখন ঐ অসম্পূর্ণ বহির্কক্ষে ইলেকট্রন যুক্ত হয়। পরিবর্তনশীল মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে পরমাণুর একাধিক কক্ষ অসম্পূর্ণ থাকে; যথা—অন্তিম কক্ষ (Ultimate Shell) এবং উপান্ত কক্ষ (Penultimate shell)। ইলেকট্রন উহাদের যে কোনও একটি কক্ষে যুক্ত হইতে পারে বা একটি কক্ষ হইতে অপর কক্ষে স্থানান্তরিত হইতেও পারে। এই প্রকারের পারমাণবিক গঠনের জন্য পরিবর্তনশীল মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত ধর্মগুলি বর্তমান :

(ক) উহাদের যোজ্যতা (Valency) পরিবর্তনশীল,

(খ) ঐ সকল মৌলিক পদার্থগুলি রঙীন লবণ উৎপন্ন করে,

(গ) উহারা জটিল যৌগিক পদার্থ গঠন করিতে সক্ষম,

(ঘ) ঐ সকল মৌলিক পদার্থ অনুঘটক (Catalyst) রূপে ক্রিয়া করে।

ষষ্ঠ পর্যায়ে মোট বত্রিশটি মৌলিক পদার্থ বর্তমান। এই জন্য ইহাকে সুদীর্ঘ পর্যায় বলা হয়। এই বত্রিশটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে Cs, Ba এবং Tl হইতে Rn অবধি আটটি হইতেছে স্বাভাবিক মৌল। অবশিষ্ট চব্বিশটি মৌলের মধ্যে Ce হইতে Lu অবধি চৌদ্দটি মৌলকে বলা হয় বিরল মৃত্তিকা মৌল (Rare Earth elements)। এই মৌলিক পদার্থগুলি প্রকৃতিতে খুব সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অবশিষ্ট দশটি মৌলিক পদার্থ পরিবর্তনশীল।

সপ্তম পর্যায়টি অসমাপ্ত এবং ইহাতে কেবল মাত্র তেজস্ক্রিয় (Radio-active) এবং ইউরেনিয়ামোত্তর (Trans-Uranium) মৌলিক পদার্থগুলি স্থান পাইয়াছে।

প্রথম পর্যায় ভিন্ন অন্য পর্যায়গুলি ক্ষারীয় মৌলিক পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া নিষ্ক্রিয় গ্যাসে শেষ হইয়াছে। যে কোন একটি মৌলিক পদার্থ হইতে গণনা আরম্ভ করিলে অষ্টম মৌলিক পদার্থটির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম প্রথমটির অনুরূপ হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দ্বিতীয় পর্যায়ের ফ্লোরিনের (F) ধর্ম তৃতীয় পর্যায়ের ক্লোরিনের (Cl) ধর্মের অনুরূপ। এই ঘটনা পর্যায় সারণীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পর্যায় সারণীর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার উপশ্রেণীগুলি। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পর্যায়ের মৌলিক পদার্থগুলি a ও b দুইটি উপশ্রেণীতে বিভক্ত। a উপশ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলি বাম দিকে এবং b উপশ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলি ডানদিকে স্থাপিত। এক একটি শ্রেণী বা উপশ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলি মূলতঃ সমধর্মী। প্রথম শ্রেণীর a উপশ্রেণীর মৌলগুলির (Li হইতে Fr) প্রত্যেকটি ক্ষারধর্মী। সপ্তম শ্রেণীর b উপশ্রেণীর হ্যালোজেনগুলি * সমধর্মী। শূন্য শ্রেণীর মৌলগুলি কোনরূপ যৌগ গঠন করে না। ইহাদিগকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় মৌল। এই সকল বৈশিষ্ট্য ভিন্ন পর্যায় সারণীর আরও দুইটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। তাহা হইল—(১) তড়িৎ-রাসায়নিক ধর্ম (Electro-chemical behaviour) এবং (২) কৌণিক সম্পর্ক (Diagonal relationship)। এখন ইহাদের সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

পর্যায় সারণীর যে কোন একটি পর্যায় ধরিয়া প্রথম শ্রেণী হইতে সপ্তম শ্রেণীর দিকে যাইতে থাকিলে মৌলিক পদার্থগুলির ইলেকট্রো-পজিটিভ ধর্ম ধীরে ধীরে কমিতে থাকে; যেমন—সোডিয়াম (Na) উচ্চ ইলেকট্রো-পজিটিভ ধর্মী, কিন্তু ক্লোরিন (Cl) ইলেকট্রো-নেগেটিভ ধর্মী। আবার কোনও শ্রেণীর বরাবর উপর হইতে নীচে নামিতে থাকিলে মৌলিক পদার্থের ইলেকট্রো-নেগেটিভ ধর্ম ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। কোন পর্যায় বরাবর

---

* ফ্লোরিন (F), ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br) ও আয়োডিন (I) মৌলগুলি হ্যালোজেন নামে পরিচিত।

বাম হইতে দক্ষিণে মৌলিক পদার্থগুলির অক্সাইডের ক্ষারধর্ম (Basicity) ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। যেমন—

Na_2O	MgO	Al_2O_3	SiO_2
তীব্র ক্ষারীয়	ক্ষারীয়	উভয় ধর্মী (Amphoteric)	মৃদু অ্যাসিড ধর্মী

P_2O_5	SO_3	Cl_2O_7
অ্যাসিড ধর্মী	তীব্র অ্যাসিড ধর্মী	অতি তীব্র অ্যাসিড ধর্মী

কোনও শ্রেণীর প্রথম মৌল পরবর্তী শ্রেণীর দ্বিতীয় মৌলের সমধর্মী। ইহাকে কৌণিক সম্পর্ক (Diagonal Relationship) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—লিথিয়াম (Li), ম্যাগ্‌নেসিয়ামের (Mg) সমধর্মী; বেরিলিয়াম (Be) অ্যালুমিনিয়ামের (Al) সমধর্মী ইত্যাদি।

পর্যায় সারণীর ব্যবহার

(১) পর্যায় সারণী উদ্ভাবিত হইবার ফলে প্রায় ১০২টি মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম পৃথক পৃথক ভাবে জানিবার প্রয়োজন নাই, কেবলমাত্র নয়টি শ্রেণীর পাঠ আবশ্যক। যে কোন শ্রেণীর যে কোন মৌলিক পদার্থের ধর্মাবলী ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ধর্মের সঙ্গে তুলনীয়।

(২) পারমাণবিক ওজনের সংশোধন—মেণ্ডেলিফের পর্যায় সারণী আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মৌলিক পদার্থ ইণ্ডিয়ামের (In) যোজ্যতা (Valency) দুই ধরিয়া উহার পারমাণবিক ওজন ৭৬ স্থির করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে পর্যায় সারণীতে ইণ্ডিয়ামের স্থান লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। পর্যায় সারণীতে আর্সেনিক (As—পারমাণবিক ওজন ৭৪.৯) এবং সেলিনিয়ামের (Se—পারমাণবিক ওজন ৭৮.৯) মধ্যে কোন শূন্যস্থান নাই। কিন্তু মেণ্ডেলিফের পর্যায় সূত্রানুসারে মৌলিক পদার্থগুলি তাহাদের পারমাণবিক ওজনের ক্রমানুযায়ী সজ্জিত হইবে। সুতরাং ইণ্ডিয়ামের স্থান As ও Se-এর মধ্যে হওয়া উচিত। কিন্তু মেণ্ডেলিফ এই কথা মানিয়া লইলেন না, তিনি বলিলেন যে, ইণ্ডিয়ামের পারমাণবিক ওজন ভুল, উহা ৭৬ না হইয়া হইবে ১১৪; সুতরাং উহার যোজ্যতা হইবে তিন এবং পর্যায় সারণীতে ইহা ক্যাডমিয়াম (Cd) ও টিনের (Sn) মধ্যে স্থাপিত হইবে। পরবর্তী কালে ইণ্ডিয়ামের সঠিক যোজ্যতা নির্ণয়ের ফলে মেণ্ডেলিফের ধারণা অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

(৩) নূতন মৌলের আবিষ্কার—মেণ্ডেলিফ যখন পর্যায় সারণী আবিষ্কার করেন তখন অনেক কম সংখ্যক মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই কারণে তখন পর্যায় সারণীতে অনেকগুলি ঘর শূন্য রহিয়া গিয়াছিল। পর্যায় সারণীতে এই সকল শূন্য স্থানগুলির অবস্থান লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েকটি অনাবিষ্কৃত মৌলের ধর্ম পূর্বাহ্লেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি এই মৌলগুলির নাম দেন একা-বোরন (Eka-Boron), একা-সিলিকন (Eka-Silicon) এবং একা-অ্যালুমিনিয়াম (Eka-Aluminium); অর্থাৎ তিনি বলেন যে, এই মৌল তিনটি বোরন, সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়ামের সমধর্মী হইবে। প্রায় ১৫ বৎসর পরে ঐ তিনটি মৌলিক পদার্থ যখন আবিষ্কৃত হয়, তখন দেখা যায়—মেণ্ডেলিফ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন তাহা নির্ভুল।

পর্যায় সারণীর ব্যর্থতা

(১) চৌদ্দটি বিরল মৃত্তিকা (Rare Earth) মৌলকে পর্যায় সারণীতে স্থান দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

(২) পর্যায় সারণীর কোথাও কোথাও উচ্চ পারমাণবিক ওজনসম্পন্ন মৌলের পরে

ভিন্ন পারমাণবিক ওজনসম্পন্ন মৌল স্থাপিত হইয়াছে; যেমন—আর্গন (A), পটাসিয়াম (K), কোবাল্ট (Co), নিকেল (Ni), টেলুরিয়াম (Te), আয়োডিন (I), থোরিয়াম (Th) ও প্রোট্যাক্টিনিয়াম (Pa) ইত্যাদি। কিন্তু এই ঘটনা পর্যায় সূত্রের পরিপন্থী; সেই জন্য পর্যায় সারণীতে কিছু রদবদলের প্রয়োজন হয়। মেণ্ডেলিফের পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা বলিলেন যে, পর্যায় সারণীতে মৌলগুলিকে পারমাণবিক সংখ্যার (পরমাণুর মধ্যে প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয়) ক্রমানুসারে সজ্জিত করিলে এই সমস্যা দূর হইবে এবং এই মতবাদ মানিয়া লওয়া হয়।

(৩) প্রথম শ্রেণীতে যেখানে ক্ষারীয় মৌলগুলি অবস্থান করিতেছে, তথায় কপার (Cu), সিলভার (Ag) এবং গোল্ড (Au) স্থান পাইয়াছে; কিন্তু ইহাদের সহিত ক্ষারীয় ধাতুগুলির ধর্মের সাদৃশ্য খুবই কম। ম্যাঙ্গানিজ (Mn) একটি ধাতু, কিন্তু ইহা সপ্তম শ্রেণীতে হ্যালোজেনগুলির সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি সমধর্মী মৌল দূরে দূরে অবস্থান করিতেছে; যথা—কপার (Cu) ও মার্কারি (Hg); বেরিয়াম (Ba) ও লেড (Pb), বোরন (B) ও সিলিকন (Si); সিলভার (Ag) ও টেলুরিয়াম (Te) ইত্যাদি।

(৪) পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের অবস্থান বিতর্কমূলক। প্রথম শ্রেণীর ক্ষারীয় ধাতুর সহিত ইহার ধর্মের সমতা যেমন দেখা যায়, তেমনই সপ্তম শ্রেণীর হ্যালোজেনগুলির ধর্মের সহিতও ইহার ধর্মের মিল দেখা যায়। সেই জন্য পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান নির্দেশ করা কঠিন। এখানে পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান কোথায় হইবে, তাহা আলোচিত হইল।

পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের স্থান

হাইড্রোজেনের দ্বারা গঠিত যৌগিক পদার্থগুলির বিষয় পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, হাইড্রোজেন অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সহিত যুক্ত হইয়া তিন প্রকারের যৌগিক পদার্থ গঠন করে। ক্ষারীয় ধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া ইহা হাইড্রাইড গঠন করে। এই সকল হাইড্রাইড শুভ্র ও কঠিন। অধাতব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসীয় হাইড্রাইড গঠন করে। এই সমস্ত গ্যাসীয় হাইড্রাইডগুলি সাধারণতঃ অম্লধর্মী। পর্যায় সারণীর মধ্যেকার উভয় ধর্মী (Amphoteric) মৌলগুলির (কার্বন, বোরন, সিলিকন ইত্যাদি) হাইড্রাইড গ্যাসীয় এবং ইহারা তড়িৎ-বিশ্লেষণক্ষম নয় (Non-electrolyte)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, হাইড্রোজেনের সহিত বিভিন্ন মৌলের বিভিন্ন ধর্মের যৌগ গঠনের দৃষ্টান্ত অনুসারে পর্যায় সারণীতে হাইড্রোজেনের অবস্থান একটি আলোচ্য বিষয়। ইহাকে প্রথম অথবা সপ্তম এই দুই শ্রেণীতেই স্থান দেওয়া যায়।

হাইড্রোজেন একযোজী (Monovalent) মৌল এবং ক্ষারীয় ধাতুর ন্যায় ইহার পরমাণুর বাহিরের কক্ষে মাত্র একটি ইলেকট্রন থাকে। এই জন্য ইহাকে ক্ষারীয় ধাতুর সহিত প্রথম শ্রেণীতে স্থাপন করা যায়। ইহা ছাড়াও হাইড্রোজেন একটি ইলেকট্রো-পজিটিভ মৌল। ইহা দ্রবণে পজিটিভ আয়ন (H^+) দেয়। ইহা অধাতুর সহিত যুক্ত হইয়া যৌগ গঠনে সক্ষম। যে কোনও অম্ল হইতে ইহার একটি একটি করিয়া পরমাণু প্রতিস্থাপিত করিতে পারা যায়। ইহার অক্সাইড ক্ষারীয় ধাতুর অক্সাইডের ন্যায় স্থায়ী। ইহা একটি বিজারক দ্রব্য (Reducing agent) এবং প্যালাডিয়ামের (Pd) সঙ্গে যুক্ত হইয়া সঙ্কর-ধাতু (Alloy) গঠন করে। প্যালাডিয়াম কর্তৃক হাইড্রোজেন শোষণ জাতীয় ঘটনাকে

অন্তর্ধৃতি (Occlusion) বলে। উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য হাইড্রোজেনের স্থান পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে হওয়া উচিত। কিন্তু হাইড্রোজেন কঠিন ও তরল অবস্থায় ধাতুর ন্যায় ব্যবহার করে না। আবার হাইড্রোজেনকে যদি প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া যায়, তাহা হইলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মধ্যে ছয়টি শূন্যস্থান থাকে। এই ছয়টি শূন্যস্থান ছয়টি অনাবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থের ইঙ্গিত দেয়, যাহাদের পারমাণবিক ওজন এক হইতে চারের মধ্যে। কারণ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক ওজন এক এবং হিলিয়ামের চার। কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। সুতরাং হাইড্রোজেনকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া চলে না।

হাইড্রোজেনের সহিত হ্যালোজেনগুলির ধর্মের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখিয়া ইহাকে সপ্তম শ্রেণীতেও স্থান দেওয়া চলিতে পারে। হাইড্রোজেন হ্যালোজেনের ন্যায় একযোজী (Monovalent) এবং দ্বি-পারমাণবিক (Di-atomic) গ্যাসীয় মৌল। ইহা হ্যালোজেনদের সহিত যুক্ত হইতে পারে অথবা জৈব যৌগিক পদার্থ হইতে হ্যালোজেনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইতে পারে। অধিকন্তু হাইড্রোজেনকে সপ্তম শ্রেণীতে স্থাপন করিলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মধ্যে কোন শূন্যস্থান থাকে না। কিন্তু হ্যালোজেনের ন্যায় হাইড্রোজেন জারকধর্মী (Oxidizing) মৌল নয়।

হাইড্রোজেন নেগেটিভ তড়িৎ-ধর্মী মৌলের (যেমন হ্যালোজেন) সহিত যুক্ত হইয়া অম্ল গঠন করে। এখানে হাইড্রোজেন ইলেকট্রো-পজিটিভ। আবার হাইড্রোজেন পজিটিভ তড়িৎ-ধর্মী মৌলের (যেমন—ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি) সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রাইড গঠন করে। এখানে হাইড্রোজেন ইলেকট্রো-নেগেটিভ।

যদি আমরা হাইড্রোজেনের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, ইহার পরমাণুর নিউক্লিয়াসে একটি মাত্র প্রোটন এবং বাহিরের কক্ষে একটি মাত্র ইলেকট্রন আছে। ইলেকট্রনটি ত্যাগ করিয়া ইহা পজিটিভ আয়নে (H^+) পরিণত হয়; যথা—$H - e = H^+$। ইহাকে ক্ষারীয় ধাতুর সহিত তুলনা করা যায় $Na - e = Na^+$, আবার ইহা একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া নেগেটিভ আয়নে (H^-) পরিণত হয়, যথা—$H + e = H^-$; ইহাকে হ্যালোজেনের সহিত তুলনা করা যায়, $Cl + e = Cl^-$।

উপরিউক্ত বিভিন্ন দৃষ্টান্ত দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে যে, হাইড্রোজেন পর্যায় সারণীর কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অবস্থিত নয়। ইহার যথোপযুক্ত স্থান পর্যায় সারণীর শীর্ষে। ইহাকে পর্যায় সারণীর আদর্শ বা মূল বলা যায়।

হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেস

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতি বছরের মত এবারও ইংরেজি নববর্ষ ভারতের বিজ্ঞানী বিজ্ঞান-কর্মী ও গবেষকদের কাছে একটি বিশেষ আহ্বান বহন করে এনেছিল। সে আহ্বান ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের। এই বছর (১৯৬৭) বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম বার্ষিক অধিবেশনের আহ্বান জানিয়েছিলেন হায়দরাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিপূর্বে আরও দু-বার হায়দরাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়ে গেছে। প্রথম বার অধিবেশন হয়েছিল ১৯৩৭ সালে এবং দ্বিতীয়বার ১৯৫৪ সালে। কিন্তু সে দুটি অধিবেশনে যোগদানের সুযোগ আমাদের হয় নি। তাই আমাদের কাছে হায়দরাবাদে এবারের অধিবেশনে যোগদানের একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। সে আকর্ষণ এক দিকে যেমন ভারতীয় ও বিদেশী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মিলিত হবার ও তাঁদের বক্তব্য শোনবার, অপর দিকে তেমনি ইতিপূর্বে অদেখা কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শহর দেখবারও।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপাচার্য ডাঃ ডি. এস. রেড্ডি, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, মূল সভাপতি অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি এবং প্রো-চ্যান্সেলার নবাব মুকারাম জাহ।

[ব্লক : 'অমৃত' পত্রিকার সৌজন্যে]

কলকাতা থেকে আমরা একটা বড় দল ৩রা জানুয়ারী সকালে উপনীত হয়েছিলাম একদা ভারত, তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী রাজন্য

নিজামের রাজধানী ও বর্তমান স্বাধীন ভারতের নবগঠিত অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ শহরে। অবশ্য আমরা নেমেছিলাম সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে ষ্টেশনে। কলকাতার হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনের মত সেকেন্দ্রাবাদ ষ্টেশন হলো একই শহরের যমজ-রেলওয়ে ষ্টেশন। কলকাতা থেকে আর একটি বড় দল বিজ্ঞান কংগ্রেস স্পেশাল ট্রেনযোগে তার আগের দিন সেখানে উপনীত হন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রায় দু-হাজার প্রতিনিধিদের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের এবারের মূল অধিবেশন আয়োজিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সুরম্য ল্যাণ্ড-স্কেপ গার্ডেন্স্-এ। ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্নে ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনের সুসজ্জিত মণ্ডপে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও প্রতি-নিধিদের উপস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ১৩ বছর আগে তাঁর পিতা স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জহওরলাল নেহরুও এই ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪১তম বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন করেছিলেন। এবারের অধিবেশনের সূচনা হয় বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সঙ্গে এবং তারপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ ডি. এস. রেড্ডি সমবেত প্রতিনিধি ও বিদেশাগত বিশিষ্ট অতিথি-দের স্বাগত সম্ভাষণ জানান।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীমতী গান্ধী দেশের উন্নয়নে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিকার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, দেশ এখন উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্বে উপনীত হয়েছে—দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পর্বে। বর্তমানে আমরা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগণের খাদ্য জোগাবার জন্যে কৃষিগত বিপ্লব এবং শিল্প গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহারের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নতুন কারিগরী বিদ্যার প্রয়োগ, উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহার এবং সার ও কীটঘ্ন দ্রব্যের সাহায্যে কৃষির বৈজ্ঞানিকীকরণ। এই বিপ্লবের ধারক ও বাহক হচ্ছেন বিজ্ঞানীরা—তাঁদের হাতেই রয়েছে প্রগতি ও ধ্বংসের চাবিকাঠি। ভারতে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজ্ঞানীদের সরকার ও জনগণের সবচেয়ে বড় সহায়ক হতে হবে। শিক্ষাদাতা ও উদ্ভাবকরূপে তাঁদের ভারতীয় বিপ্লবের প্রথম সারিতে দাঁড়াতে হবে। অর্থ-নীতির চাবি রয়েছে যাঁদের হাতে, তাঁদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে।

প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কারিগরী জ্ঞান ও অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্যে আমরা পরনির্ভর হতে পারি না। আমাদের লক্ষ্য হলো, আগামী ১৯৭১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন করা এবং ১৯৭৫ সালের মধ্যে সর্ববিধ বৈদেশিক সাহায্য থেকে মুক্ত হওয়া। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী। গত ২০ বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু গবেষণা-গার স্থাপিত হয়েছে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি যথাসাধ্য অর্থব্যয় করছেন। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি, এদেশের বহু বিজ্ঞানী উন্নততর সুযোগের আশায় বিদেশে চলে যাচ্ছেন এবং তাঁদের অনেকে আর এদেশে ফিরছেন না। এই ঘটনা বাস্তবিকই দুঃখের ও দুর্ভাবনার বিষয়। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের চিন্তা করা প্রয়োজন। স্বদেশী হওয়াই হলো আজ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জস্বরূপ। সে চ্যালেঞ্জ তাঁদের গ্রহণ করা

উচিত। উপসংহারে তিনি বলেন, বিজ্ঞানের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক ও মেধা যে সামাজিক অগ্রগতির জন্যে অপরিহার্য, এই বোধ জাগাতে না পারলে প্রকৃত বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না।

এবারের অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক টি. আর. শেষাদ্রি। মূল সভাপতির ভাষণে তিনি এবার প্রচলিত রীতির কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এতদিন প্রচলিত রীতি ছিল মূল সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশে বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণভাবে কিছু বলবার পর নিজস্ব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। অধ্যাপক শেষাদ্রি এবার সে রীতি অনুসরণ না করে তাঁর ভাষণে 'বিজ্ঞান ও জাতীয় কল্যাণ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলেন।

প্রারম্ভে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিজ্ঞানী ও জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে এই কংগ্রেসকে যাতে গড়ে তোলা যায়, তার উপায় অবলম্বন করা উচিত। বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান উন্নয়ন ও জাতীয় কল্যাণে সে সবের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনাই আমাদের বার্ষিক অধিবেশনে মুখ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং সেই সঙ্গে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বিজ্ঞানশিক্ষার প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এরপর তিনি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞানের মেধাগত ও সাংস্কৃতিক মূল্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও অণুজগৎ, বিজ্ঞান-নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতা ও অণুজগতের সূক্ষ্মতা থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জটিলতার চিন্তায় নেমে আসতে হবে। এখানে আমাদের খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ-সংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

এ-সমস্তই অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং তার সমাধানকল্পে আমাদের সম্পদ ও দৃষ্টি আশু নিয়োগ করা প্রয়োজন। ফলিত বিজ্ঞানের উপরই এসবের সমাধান নির্ভর করে এবং এবিষয়ে সাফল্য অর্জিত হলে দেশের স্বাস্থ্য ও সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এবং তখনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান গবেষণা ও কৃষ্টির পথ প্রশস্ত হতে পারে। দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জাতীয় জীবনে ফলিত বিজ্ঞানে গবেষণার এত প্রয়োজন যে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিকেও এবিষয়ে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। কারণ গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক যুগে জাতীয় কল্যাণই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

উপসংহারে অধ্যাপক শেষাদ্রি বলেন, একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শুধু অর্থ ও উপকরণ থাকলেই সত্যিকারের বিজ্ঞান গবেষণা সার্থক হতে পারে না। এগুলির প্রয়োজন অবশ্যই আছে, কিন্তু আসল প্রয়োজন মানবিক উপাদান। অধ্যাপক শেষাদ্রি তাঁর ভাষণে কল্যাণরাষ্ট্রে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীর ভূমিকা সম্পর্কে এভাবে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেন, সেবিষয়ে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা পরে এক আলোচনা-সভায় মিলিত হন।

উদ্বোধনের দিনে মূল সভাপতির ভাষণের পর আর কোন অনুষ্ঠান-সূচী ছিল না। দ্বিতীয় দিন সকালে বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে আয়োজিত যন্ত্রপাতি এবং বিজ্ঞান-পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অন্ধ্র প্রদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীজগনমোহন রেড্ডি। প্রদর্শনী দুটি পৃথক ভবনে আয়োজিত হয়। গত বছর চণ্ডীগড় অধিবেশনের তুলনায় এবারের প্রদর্শনী অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক

যন্ত্রপাতি নির্মাণে এবং বিজ্ঞানের পাঠ্য ও অন্যবিধ পুস্তক প্রকাশনায় ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি আরও অগ্রসর হয়েছেন দেখে আমরা যেমন আনন্দিত হয়েছি, তেমনি আশান্বিতও হয়েছি।

প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর দ্বিতীয় দিন থেকে বিভিন্ন শাখা সভাপতিদের ভাষণ, বিশেষ বক্তৃতা, গবেষণা-নিবন্ধ পাঠ, আলোচনা-চক্র ইত্যাদি শুরু হয় এবং ৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। পদার্থবিদ্যা শাখার অধ্যাপক এফ. সি. আউলাক আলোচনা করেন 'র‍্যান্ডম ফ্র্যাগমেনটেশন' সম্পর্কে, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের সভাপতি অধ্যাপক আর. এন. ট্যাণ্ডন বলেন 'ছত্রাকজাত পুষ্টির কয়েকটি দিক', শারীরতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ সুশীলরঞ্জন মৈত্র আলোচনা করেন 'কর্ম-শারীরতত্ত্ব: পশ্চাৎ-পট ও উপযোগিতা', মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক এইচ. সি. গাঙ্গুলী বলেন 'মানসিক স্বাস্থ্য শিল্প' বিষয়ে, যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুবিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেন 'বিমান ও মহাকাশযানের চালনা পদ্ধতি', সংখ্যায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক ভি. এস, হুজুরবাজার বলেন 'সম্ভাব্যতা বন্টনের অভেদক', রসায়ন শাখার সভাপতি অধ্যাপক আর. সি. মেহরোত্রা আলোচনা করেন 'অ্যালকোক্সাইড্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যালকিল—অ্যালকোক্সাইড্‌স্ অফ মেটাল্‌স্ অ্যাণ্ড মেটালয়েড্‌স্,' ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি অধ্যাপক আর. এল. সিং বলেন 'মরফোমেট্রিক অ্যানালিসিস্ অফ টেরেন,' প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি অধ্যাপক শিবতোষ মুখোপাধ্যায় আলোচনা করেন 'সেল্‌স্ ইন টাইম অ্যাণ্ড ডিফারেনসিয়েশন, গণিত শাখার সভাপতি ইউ. এন. সিং আলোচনা করেন 'জেনারেলাইজ্‌ড্ ফাংকশন, জেনারেলাইজ্‌ড্ ফোরিয়ার ট্রান্সফরম অ্যাণ্ড দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন', কৃষি-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক বিশ্বনাথ সাহু বলেন, 'ভারতকে ক্ষুধা থেকে রক্ষায় কৃষি-বিজ্ঞানীর সুযোগ-সুবিধা', ভেষজ ও পশু-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি অধ্যাপক অমিয়ভূষণ চৌধুরী আলোচনা করেন 'অক্যাল্ট্ পরজীবী ও মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া' এবং নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব শাখার সভাপতি ডাঃ অচ্যুতকুমার মিত্র বলেন খাদ্য বিপ্লবের সংগঠক এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায়' সম্পর্কে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধি-বেশনে বিদেশের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের যোগদান ও অংশগ্রহণ হচ্ছে একটি প্রধান অঙ্গ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিশ্বের বারোটি রাষ্ট্র থেকে সর্বসমেত ২১ জন বিশিষ্ট বিদেশী বিজ্ঞানী এবারের অধিবেশনে যোগদান করে-ছিলেন। আফগানিস্থান থেকে এসেছিলেন ডাঃ মহম্মদ নুরী এবং মিঃ মহম্মদ আজম জেয়ার; সিংহল থেকে ডাঃ ডি. ভি. ডাবলিউ আবেগুণবর্ধন এবং মিঃ পি এ. জে. রত্নশ্রী; ডেনমার্ক থেকে অধ্যাপক বার্ণার্ড পেটারস্; ফ্রান্স থেকে ডাঃ পি লেপিন; জার্মান সাধারণতন্ত্র থেকে ডাঃ জর্জ মেলচারস, অধ্যাপক এইচ. জে. হোরস্তাথ এবং ডাঃ পল গ্রেগ্‌স্; হাঙ্গেরী থেকে অধ্যাপক আরতুর হর্ণ এবং অধ্যাপক ইস্তভান কোভাক্স; জাপান থেকে ডাঃ শোজিরো উয়েও; মালয়েশিয়া থেকে ডাঃ জে. এ. বুলঅক্স; পোল্যাণ্ড থেকে অধ্যাপক ক্ষিয়েলেভস্কি; যুক্তরাজ্য থেকে ডাঃ জে. এস. ফরেষ্ট এবং অধ্যাপক এম. বি. উইলকিন্স; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ডাঃ জোসেফ মায়ার, ডাঃ শ্রীমতী মারিয়া মায়ার, ডাঃ ওয়েষ্টন অ্যাণ্ডারসন এবং অধ্যাপক আর. দে. বোডিন এবং সোভিয়েট রাশিয়া থেকে এসেছিলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অ্যাকাডেমিশিয়ান এ. এম. প্রখোরফ, অ্যাকাডেমিশিয়ান পি. এন. ফেডোসিয়ে-রেফ, অ্যাকাডেমিশিয়ান ভি. এম. গলুশকোফ, অ্যাকাডেমিশিয়ান এ. এস. সাদিকোফ,

অ্যাকাডেমিশিয়ান এম. এম. শিয়েমিয়াকিন, ডাঃ এস. জি. কোর্ণিয়েয়েফ এবং মিঃ ভি. আই. একাচেনকো।

এঁদের মধ্যে অধ্যাপক প্রখোরফ এবং ডাঃ অ্যাণ্ডারসন পদার্থ-বিজ্ঞান শাখায়, অধ্যাপক সাদিকোফ, অধ্যাপক শিয়েমিয়াকিন এবং ডাঃ উয়েও রসায়ন-বিজ্ঞান শাখায়, অধ্যাপক উইল-কিন্স প্রাণিবিদ্যা ও কীটতত্ত্ব এবং উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখায়, ডাঃ লেপিন ভেষজ ও পশু-বিজ্ঞান শাখায়, অধ্যাপক গলুশকোফ এবং ডাঃ ফোরেষ্ট যন্ত্রবিদ্যা ও ধাতুতত্ত্ব শাখায় কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতা এবং অধ্যাপক ফোডোসিয়েয়েফ ও ডাঃ মেলচারস দুটি লোকরঞ্জন বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিদেশাগত বিজ্ঞানীরা ছাড়া কয়েক জন বিশিষ্ট ভারতীয় বিজ্ঞানীও প্রতি বছর বিশেষ বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। এই বছর চন্দ্রকলা হোরা স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন ডাঃ বি. এস. ভীমাচার। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতে মৎস্য গবেষণার উন্নয়ন'। মূল সভাপতি অধ্যাপক শেষাদ্রি একটি লোকরঞ্জক বক্তৃতা দেন 'প্রকৃতিজ দ্রব্যের রসায়নে কয়েকটি মূল্যবান উন্নতি' সম্পর্কে। ডাঃ বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় এবার চতুর্থ বার্ষিক বীরেশচন্দ্র গুহ স্মারক-বক্তৃতায় 'বিজ্ঞান ও ক্যান্সার সমস্যা' সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবীণ রসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ নীলরতন ধর 'বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি' সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তাঁর এই বক্তৃতাটি যেমন তথ্যের দিক থেকে, তেমনি প্রাঞ্জলতা ও সরসতায় সকলকে মুগ্ধ করে। অধ্যাপক আর. কে. শাকসেনা চতুর্থ বার্ষিক মুন্দকর স্মারক বক্তৃতা দেন। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ সাহা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'জৈব অণুর গঠনশৈলী ও কার্যকারিতা'। এছাড়া যাঁরা বিশেষ বক্তৃতা দেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ সি. আর. রাও, ডাঃ জি. এস. সিধু, ডাঃ এম. কে. সিঙ্গাল এবং অধ্যাপক এস. কে. একম্বারম।

এবছর যে সব আলোচনা-চক্র আয়োজিত হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—একটি হচ্ছে 'বিজ্ঞান ও সামাজিক অবস্থার পারস্পরিক সম্পর্ক' এবং দ্বিতীয়টি 'ভূগর্ভের উপরের স্তর প্রকল্প' বিষয়ে। শেষোক্ত আলোচনাটি আয়োজিত হয় ভূপদার্থিক গবেষণা বোর্ড, ভূপদার্থিক গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ভারতীয় ভূপদার্থিক ইউনিয়ন, ভারতের ভূতত্ত্ব সমিতি, ভূতত্ত্ব সমীক্ষা এবং বিজ্ঞান কংগ্রেসের ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার যুক্ত উদ্যোগে এবং বহিরাগত কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও এতে অংশ গ্রহণ করেন।

প্রতি বছরের মত এবারও সারাদিনের গুরুগম্ভীর আলোচনার পর কয়েক দিন সন্ধ্যায় আনন্দানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৪ঠা জানুয়ারী দক্ষিণ ভারতের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না নৃত্যশিল্পী কুমারী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি পরিবেশন করেন ভারতের নৃত্যাবলী। তাঁর অনুষ্ঠান-সূচীতে ছিল, ভারত-নাট্যম, ওড়িশি ও কুচিপরী নৃত্য। ৬ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল ক্লাসের ছাত্রী কুমারী অখিলেশ্বরীও কুচিপরী নৃত্য প্রদর্শন করেন এবং তারপর অন্ধ্র প্রদেশের বিশিষ্ট কাওয়ালী গায়ক জনাব আজিজ আহমেদ খাঁ উরসী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কুমারী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি ও অখিলেশ্বরীর অনবদ্য নৃত্যকলা এবং আহমেদ খাঁর দরাজ কণ্ঠের কাওয়ালী সঙ্গীত আমাদের বিশেষ আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু ৫ই জানুয়ারীতে পরিবেশিত লক্ষ্ণৌয়ের শশিভূষণ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের 'চণ্ডালিকা' বাংলা নৃত্যনাট্য সর্বতো-ভাবে আমাদের হতাশ করেছিল। বাঙালী প্রতিনিধিদের তো কথাই নেই, দক্ষিণ ভারতের বহু রসজ্ঞ দর্শককেও বলতে শুনেছিলাম—'এই কি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য!' জানি না কি কারণে রবীন্দ্রনাথের সুখ্যাত নৃত্যনাট্যের এই অসার্থক

প্রয়াসকে অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই সব আনন্দানুষ্ঠান ছাড়া বৃটিশ কাউন্সিলের সৌজন্যে কয়েকটি আকর্ষণীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং অভ্যর্থনা সমিতি দুটি প্রীতিসম্মেলনে প্রতিনিধি ও বিদেশীয় অতিথিদের আপ্যায়িত করেন।

হায়দরাবাদ শহর ও আশেপাশের দ্রষ্টব্যগুলি প্রতিনিধিদের দেখাবার ব্যবস্থা করেছিলেন অভ্যর্থনা সমিতি। হায়দরাবাদের সালার জঙ মিউজিয়ামের সুখ্যাতি অনেকদিন আগেই শুনেছিলাম। এবার সেটি স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এই মিউজিয়ামের অতুলনীয় শিল্প সংগ্রহ দেখে দর্শকমাত্রেই বিস্ময়াবিষ্ট হন এবং আমরাও হয়েছিলাম। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে ৭৭টি কক্ষ ঘুরে দেখেও সব জিনিষ ভালভাবে দেখা হলো না বলে মনে হয়েছিল। শহরদর্শনের সূচীতে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গোলকুণ্ডা দুর্গ, চারমিনার, মক্কা মস্‌জিদ, হাইকোর্ট, ওস্মানিয়া হাসপাতাল, ঝোলানো বাগান, হিমায়েত সাগর ও সেকেন্দ্রাবাদ দেখবার সুযোগ হয়। আর একদিনের ভ্রমণ-সূচীতে হায়দরাবাদ থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে কৃষ্ণানদীর উপর নির্মীয়মান নাগার্জুনসাগর বাঁধ দেখতে পেয়েছিলাম। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনকালে হায়দরাবাদে একটি নিখিল ভারত শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। এই সুযোগে সেটিও আমরা দেখেছিলাম। এই বিরাট সম্মেলন আয়োজনের জন্যে অভ্যর্থনা সমিতি ধন্যবাদার্হ।

তাঁদের সকল ব্যবস্থাপনায় আমরা পরিতুষ্ট হতে পেরেছিলাম বলতে পারলে খুবই সুখী হতাম। কিন্তু এবার প্রতিনিধিদের অসন্তোষের নানা কারণ ঘটেছিল। এবারে অধিবেশনে আমাদের এমন কয়েকটি মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কোন অধিবেশনে হয় নি।

উপগ্রহের কক্ষপথ

গোপীনাথ সরকার

অজানাকে জানবার, না-দেখাকে দেখবার কৌতূহল মানুষের চিরকালের। তাই জল-স্থল-অন্তরীক্ষে আজ তার দুর্বার অভিযান। তার হুকুমে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট মহাশূন্যের বুক চিরে উদ্ঘাটন করছে অনন্ত রহস্য ও নিয়ে আসছে নতুন নতুন তথ্য।

সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে গ্রহ, আর গ্রহের চারদিকে উপগ্রহ। যে কোন সময়ে সূর্য থেকে গ্রহের দূরত্ব r হলে, সূর্যের দিকে গ্রহের ত্বরণ হবে $\frac{\mu}{r^2}$ আর এই সময় গ্রহের গতিবেগের বর্গ v^2 হচ্ছে $\frac{2\mu}{r}$ থেকে ছোট। ফলে গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার। যদি এমন হতো যে, v^2, $\frac{2\mu}{r}$-এর সমান বা বড়, তাহলে গ্রহ ছুটে চলতো অধিবৃত্তাকার বা পরাবৃত্তাকার পথে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, যদি কোন বস্তু বিশ্বের সকল বস্তুর আকর্ষণের বা প্রতিরোধের বাইরে থেকে চলতে পারতো, তাহলে অনন্তকাল ধরে অব্যাহত গতিতে সোজাপথে চলতে পারতো। আর কোন আকর্ষণ বা প্রতিরোধের মধ্যে এসে পড়লেই এর গতিপথ যাবে বেঁকে।

পৃথিবী থেকে যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে ছাড়া যায়, তারা হতে পারে দু-রকমের। হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পড়ে এর চারদিকে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার পথে ঘুরবে; নয়তো পৃথিবীর বাঁধন ছিঁড়ে চলে যাবে চিরদিনের জন্যে, কোন দিনও ফিরে আসবে না। পৃথিবী ছেড়ে গেলেও সূর্যের আকর্ষণমুক্ত না হতে পেরে তার চারদিকে ঘুরতে পারে বা তার আকর্ষণমুক্ত হয়ে সৌরজগৎ পেরিয়ে মহাশূন্যের কোথাও উধাও হতে পারে।

কি ধরণের পথে উপগ্রহ ছুটে চলবে, তা নির্ভর করছে কোন্ গতিতে, কিভাবে তাকে পৃথিবী থেকে ছুড়ে দেওয়া হচ্ছে, তার উপর। সূর্যের আকর্ষণের যে নিয়মে গ্রহ চলে, পৃথিবীর আকর্ষণের সেই নিয়মই উপগ্রহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ R হলে পৃথিবীপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ হবে $\frac{\mu}{R^2}=g$ অর্থাৎ $\mu=gR^2$।

কাজেই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে উপ গ্রহের গতিবেগের বর্গ v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$-এর সমান হয়, তাহলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাকে ধরে রাখতে পারবে না। ফলে পৃথিবীকে শেষ বারের মত বিদায় জানিয়ে উধাও হতে পারবে অধি-বৃত্তাকার পথে, আর কোন দিনও ফিরবে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অবশ্য সেকেণ্ডে ৭ মাইল বা ঘণ্টায় ২৫২০০ মাইল বেগে ছুড়ে দিলেই উপগ্রহটি চিরদিনের জন্যে বিদায় নেবে। সেজন্যে এই গতিবেগকে বলা হয় 'এস্কেপ ভেলোসিটি' বা নির্গমন বেগ।

আর v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$ থেকে বড় হয়, তাহলে? পৃথিবী বৃথাই উপগ্রহটিকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করবে। সব বাঁধন ছিঁড়ে সে উধাও হবে মহাশূন্যে পরাবৃত্তাকার পথে। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সেকেণ্ডে ৭ মাইলের বেশী বেগে যেতে পারলেই এটা সম্ভব। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু সূর্যের আকর্ষণমুক্ত হওয়া সহজ নয়। ফলে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকবে। সূর্যের প্রবল আকর্ষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে দরকার প্রচণ্ড গতির। যদি কল্পনা করা যায় যে, উপগ্রহটি সেকেণ্ডে প্রায় ২৭ মাইল বা ঘণ্টায় ৯৭২০০ মাইল বেগে স্থির পৃথিবী থেকে ছুট দিয়েছে, তাহলে সৌরজগতের বাইরে চলে যেতে পারবে।

এখন v^2 যদি $\frac{2gR^2}{r}$ থেকে ছোট হয়, তাহলে কোন্ পথে ছুটবে?

এক্ষেত্রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ উপগ্রহটিকে ধরে রাখতে পারবে এবং সেটি উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকবে। এই উপবৃত্তের একটা 'ফোকাস' বা উপকেন্দ্র থাকবে পৃথিবীর কেন্দ্রে আর অন্যটি থাকবে—যেখান থেকে উপগ্রহটি ছাড়া হচ্ছে, তার কাছাকাছি। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সেকেণ্ডে ৭ মাইলের কম বেগে ছুড়ে দিলে এই ধরণের কক্ষপথ হয়।

বৃত্তাকার কক্ষপথেও উপগ্রহটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে পারে। তবে এক্ষেত্রে নির্ধারিত দূরত্বে যা নির্গমন গতি হবে, বৃত্তাকার পথের জন্যে গতিবেগ হবে তার ·৭০৭ গুণ। তাছাড়া পৃথিবীর কেন্দ্র ও উপগ্রহের উৎক্ষেপণ-স্থান সংযুক্ত সরলরেখার সঙ্গে সমকোণ করে উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণ করতে হবে। এই নিয়মে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করলে সেকেণ্ডে প্রায় ৫ মাইল গতিবেগ দরকার। আর চাঁদের দূরত্বে গতিবেগ হবে সেকেণ্ডে ·৬৪ মাইল।

'নির্গমন বেগের' চেয়ে কম গতিবেগ দরকার বৃত্তাকার কক্ষপথের জন্যে। সেজন্যে এটা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এর অসুবিধা হচ্ছে এই যে, একটা আবর্তন

সম্পূর্ণ করবার আগেই উপগ্রহটি পৃথিবীতে এসে ধাক্কা খায়। কাজেই দুই ধাপে গতিবেগ বাড়িয়ে একে নির্ধারিত উচ্চতায় তোলা হয়। রকেটের সাহায্যে উপগ্রহটিকে সোজা লম্বভাবে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে সমকোণ করে নিক্ষেপ করলে সেটি বৃত্তাকার পথে আবর্তন সুরু করে। অবশ্য অন্য পদ্ধতিও রয়েছে। এতে উপগ্রহটিকে লম্বভাবে না তুলে দিগন্তের দিকে নিক্ষেপ করে বিভিন্ন ধাপে গতিবেগ বাড়িয়ে নির্ধারিত বৃত্তাকার কক্ষে স্থাপন করা হয়। অধিবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর মহাকর্ষের বাইরে চলে যেতে যে শক্তির প্রয়োজন, তার চেয়েও বেশী শক্তির প্রয়োজন হতে পারে কয়েকটি বৃত্তাকার পথের জন্যে। এদের দূরত্ব হবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ৩½ গুণের বেশী।

চাঁদ উপগ্রহ হয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এর কক্ষপথ প্রায় অনেকটা বৃত্তাকার। আর গতিবেগ হচ্ছে সেকেণ্ডে '৬৪ মাইল। পৃথিবীর মহাকর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হলে এর গতিবেগ হওয়া দরকার সেকেণ্ডে প্রায় ১ মাইল ('৯০৮ মাইল)। এর আকর্ষণও পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। সেজন্যে সেকেণ্ডে মাত্র ১½ মাইল বা ২'৪১ কিলোমিটার গতিবেগে চাঁদ ছেড়ে আসতে পারলেই এর প্রভাবমুক্ত হয়ে মহাশূন্যে উধাও হওয়া যায়। পৃথিবী যদি হঠাৎ তার আকর্ষণী শক্তি হারায়, তাহলে চাঁদের কি হবে? চাঁদের উপর পৃথিবীর যা আকর্ষণ, তার দ্বিগুণ আকর্ষণ সূর্যের। তাই চাঁদ তখন আর পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে না। সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকবে এমন একটা পথে, যেটা পৃথিবীর বর্তমান কক্ষপথের অনেকটা অনুরূপ। পক্ষান্তরে সূর্য তার আকর্ষণী শক্তি হারালে পৃথিবী ও চাঁদ একসঙ্গে মহাশূন্যে উধাও হবে। আর তাদের আপেক্ষিক কক্ষপথের খুব সামান্যই পরিবর্তন ঘটবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথ মোটামুটি ঠিক থাকলেও কোন সময় পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায়, কোন সময় বা পৃথিবীর দিকে সরে আসে। ফলে বৃত্তাকার কক্ষপথের অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে। আবার কক্ষপথে প্রতিরোধ-শক্তি থাকলে এর গতিবেগ যায় বেড়ে ও বৃত্তাকার পথের ব্যাসার্ধ যায় কমে। অবশ্য দু-একটা আবর্তনে এই পরিবর্তন বোঝা যায় না। বেশ অনেকগুলি আবর্তনে এই পরিবর্তন ধরা পড়ে। এই ভাবে গতিবেগ ও ব্যাসার্ধ ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে উপগ্রহ তার কক্ষ-গতি হারিয়ে ফেলে অবশেষে পৃথিবীতে এসে ধাক্কা খাবে।

সঞ্চয়ন

সৌর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ

১লা মার্চ,'৭১ ক্যালিফোর্ণিয়ার পয়েন্ট আর্গুয়েলের ওয়েষ্টার্ণ টেষ্ট রেঞ্জ থেকে আমেরিকান স্কাউট রকেটের সাহায্যে প্রথম ইউরোপীয় যুক্ত মহাকাশ গবেষণা উপগ্রহটি উৎক্ষিপ্ত হয়েছে।

ঠিক এই সময়ে উপগ্রহটিকে উৎক্ষেপণের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। একমাত্র উচ্চমানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতাই ইউরোপীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রথম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ প্রকল্পকে সম্ভব করতে পারে। এই কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী সবকিছু কাজ সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করবার জন্যে বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্র একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

উৎক্ষেপণ সময়ের গুরুত্বের বিষয় বুঝতে হলে পরীক্ষার বিষয়গুলি জানতে হবে। সংখ্যায় এরা সাতটি। পাঁচটি করবেন বৃটেনের বিশ্ববিদ্যালয় দলগুলি ও একটি করবেন ফ্রান্সের পারমাণবিক বিজ্ঞান গবেষণাগার সেন্টার দেতুদে নিউক্লের স্থ স্তাকলে, আর একটি করবেন উট্রেখ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাচ গবেষক কর্মীবৃন্দ। এঁদের সকলেরই গবেষণা মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আগত ইলেকট্রোম্যাগ্‌নেটিক বিকিরণ সম্পর্কে। অধিকাংশ বিকিরণ রশ্মি আসে সূর্য থেকে, তবে কিছু আসে খুবই দূর থেকে। যেখান থেকেই তারা আসুক না কেন, সূর্য নিজের ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের সাহায্যে তাদের প্রভাবিত করে। সূর্যের উপর মাঝে মাঝে যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল অঞ্চলের সৃষ্টি হয়, তাদের সৌরকলঙ্ক বলা হয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে সূর্যের এই ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডগুলি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সূর্যের ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডগুলি সেই সব অঞ্চল থেকে সূর্য-পরিক্রমারত গ্রহগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত।

বিদ্যুৎ-শক্তিযুক্ত কণার উপর ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের ক্রিয়া ঘটতে থাকে। প্রধানতঃ কণাগুলির গতি ও যাত্রাপথ বদ্‌লে যায়। সূর্যের ফিল্ডটি খুবই খেয়ালী। দশ বছর সৌরকলঙ্কের হ্রাস-বৃদ্ধির যে চক্র দেখা যায়, প্রধানতঃ সূর্যের ফিল্ডের খেয়ালীপনা তারই উপর নির্ভর করে। দশ বছর অন্তর এক বছর সৌরকলঙ্কের আধিক্য ঘটে। এই সময়কে বলা যায় 'সূর্যের গ্রীষ্মকাল'। এই শেষ 'গ্রীষ্ম' গিয়েছে ১৯৫৭-৫৮ সালে 'আন্তর্জাতিক ভূ-বিজ্ঞান বৎসরে'। সূর্যের দুই গ্রীষ্মের মধ্যবর্তী কালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সবচেয়ে কম থাকে। সূর্যে যখন গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, তখন সেখানে আগুন জ্বলে ওঠে, সৌরকলঙ্কগুলির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটে—অনেকটা বিরাটাকার পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের মত। এর ফলে প্রচুর পরিমাণ দ্রুতগতিসম্পন্ন অতি উত্তপ্ত গ্যাস বের হয়ে আসে। এই গ্যাসের অধিকাংশই হাইড্রোজেন (সূর্যে এবং সর্বত্র সর্বাধিকদৃষ্ট উপাদান)। কিন্তু বিস্ফোরণের ফলে এই আয়নিত গ্যাস ভেঙ্গে যায় ও ইলেকট্রনবর্জিত হয়ে শুধু নিউট্রন ছেড়ে দেয়। এই গ্যাসের একটা বড় অংশ অনুরূপ ভগ্ন হিলিয়াম।

আয়নিত গ্যাস বা প্লাজ্‌মা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে সেকেণ্ডে ২০০০ কিলোমিটার গতিতে এবং যেখানে যায়, সেখানে ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডকেও প্রসারিত করে দেয়। এই ব্যাপারটাকে 'সূর্যের বায়ু-প্রবাহ' নাম দেওয়া হয়েছে। উপলখণ্ডের উপর দিয়ে জলস্রোতের

মত এই বায়ু-প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে গ্রহগুলির চতুর্দিকে। এখানে তার একটি ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ডের সঙ্গে দেখা হয়—যেমন ধরুন, পৃথিবীর ম্যাগ্‌নেটিক ফিল্ড—এখানে সে কিছু কণা হারায়। এই পথে আগত কণাগুলির গতি রুদ্ধ বা পরিবর্তিত হয়। একটি মজার ব্যাপার হলো এই যে, প্রবল সৌর বায়ু-প্রবাহের একেবারে মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়ালে একগাছি চুলও নড়বে না।

এদিকে সৌর ঝড়ের শীর্ষ সময়ে জটিল এবং বহু প্রসারিত সব ক্রিয়া চলতে থাকে। পরিক্রমারত কৃত্রিম উপগ্রহ এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলে এমন সব তথ্য উদ্ঘাটিত হবে, যা বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর পরমাণু ভাঙবার যন্ত্রের সাহায্যেও এযাবৎ লক্ষ্য করতে পারেন নি। এই সব বৃহৎ যন্ত্রের আংশিক ব্যয়েই মানুষ প্রকৃতির পরীক্ষা থেকে লাভবান হতে পারে।

গত সৌর গ্রীষ্মের সময় মহাকাশ গবেষণা শৈশব অবস্থায় ছিল, সৌর বায়ু-প্রবাহের কথাও অজানা ছিল। ১৯৬৭ সাল হবে প্রথম সৌর গ্রীষ্ম, যখন মহাকাশে যন্ত্রসমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ সূর্যে অগ্নিকাণ্ডের প্রতিক্রিয়া ধরতে পারবে।

পৃথিবীর কাছাকাছি পরিবেশে যেখানে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রধানতঃ চলাফেরা করে, সেখানে কি ঘটে ?

বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড না ঘটলেও সূর্য থেকে নিকটবর্তী বিন্দুতে তার ক্রিয়ার আধিক্য অর্থাৎ সৌরমণ্ডলে বিস্তৃত চৌম্বক ক্ষেত্র গ্রহমণ্ডলীর বাইরে থেকে প্রবেশকারী বিদ্যুৎযুক্ত (Charged) কণিকার উপর আরও বেশী পরিমাণে ক্রিয়া করবে। এই কণিকার কিছু অংশ পৃথিবীর পরিবেশের মধ্যেও এসে পড়ে। এগুলিকে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) বলা হয়। কারণ এগুলি বিশ্বের বহু দূর প্রান্ত থেকে আসে—ঠিক কোথা থেকে এবং কেমন করে আসে, তা জানা যায় না। এদের কিছু নিশ্চয়ই আসে কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত এবং লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত ছায়াপথ (Galaxy) থেকে। অল্প কিছু 'কসমিক-রে' আসে আরও দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে।

এই উভয় প্রকার মহাজাগতিক রশ্মিই সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত পারমাণবিক কণিকার অনুরূপ, কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি অঞ্চলে তারা সৌরকণিকার তুলনায় সংখ্যায় অনেক কম। এদের প্রধান পার্থক্য শক্তিতে। সৌরকণিকাগুলির শক্তির পরিমাপ করা হয় মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Mev) হিসাবে। আর মহাজাগতিক রশ্মির শক্তি পরিমাপ করা হয় সহস্র মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Gev) দিয়ে। যদি এর চেয়ে কম শক্তিশালী হতো, তাহলে সেগুলি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতো না। সূর্যের যখন 'গ্রীষ্ম কাল' তখন গ্রহগুলির মধ্যবর্তী সৌরক্ষেত্র দুই প্রকার মহাজাগতিক রশ্মিরই প্রভাব হ্রাস করে। আর যখন সূর্যে অগ্নিকাণ্ড (Flare) ঘটে, তখন এই প্রভাব আরও বেশী রকম পরিলক্ষিত হয়।

পৃথিবীর নিজেরও চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে প্রায় ৪০,০০০ মাইল পরিব্যাপ্ত। এই এলাকার সৌর-ক্ষেত্রের চেয়ে পৃথিবীর ক্ষেত্রের শক্তি বেশী। এই ক্ষেত্র তুলনামূলকভাবে অচঞ্চল ও নির্দিষ্ট আকারের।

এর ফলে বহিরাগত কণিকাগুলি চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরুবিন্দুর (Pole) দিকে ধাবিত হয়—অবশ্য যদি তাদের ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করবার শক্তি থাকে তবেই। বহু কণিকা হটে যায় এবং বহু বন্দী হয়। গত সৌর গ্রীষ্মের সময় প্রথম যন্ত্র সমন্বিত উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর বিকিরণ বলয়ের আবিষ্কারে আমরা এই সব বন্দী কণিকার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পেয়েছি। এই বলয়গুলি 'ভ্যান অ্যালান বেল্ট' নামে পরিচিত। কিন্তু এই বলয়-

গুলিতে কণাগুলি কেমন করে আট্‌কা পড়ে এবং সৌর আবহাওয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয় স্পষ্ট করে জানা যায় নি।

এর সঙ্গে সৌর অগ্নিকাণ্ডের একটা সম্পর্ক অনুমান করা যায় এবং এটা স্পষ্ট যে, সৌর অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে 'অরোরার' আচরণের সম্পর্ক রয়েছে। মেরুবিন্দুর চতুর্দিকে অরোরার আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এথেকে বোঝা যায়—সেখানে আকাশের মাথার অংশ এমনই বিদ্যুৎযুক্ত হয় যে, সে স্থান আলোকিত হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ এরকম আলোকিত হয়ে ওঠবার কারণ—ভ্যান অ্যালান বেল্টে আটক-পড়া কণাগুলির বিপুল পরিমাণে মেরুবিন্দুতে জমা হওয়া। সৌর অগ্নিকাণ্ডজনিত ঝাপ্‌টায় কণাগুলি বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর মেরুবিন্দুতে এসে জমা হয়।

এই সব জটিলতার বিষয় বুঝাতে গেলে আকাশের উপরে থেকে বিদ্যুৎ-পৃষ্ট কণাগুলির পরিবর্তন এবং একই সময়ে সূর্যের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। এই কাজের জন্যেই প্রথম "এসরো" (ই-এস-আর-ও) কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। পৃথিবীর আবহাওয়া ভূপৃষ্ঠের পক্ষে বিকিরণরোধক বর্মস্বরূপ, কিন্তু এর ওপাশে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে।

ইউনিভার্সিটি কলেজ (লণ্ডন), লিসেস্টার ইউনিভারসিটি টীম ও উট্রেখ্‌ট্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স-রে যন্ত্রপাতি সূর্যের উপর নজর রাখবে। এক্স-রে সৌরকলঙ্ক শক্তির খুব সূক্ষ্ম নির্দেশক। তিনটি ইম্পিরিয়াল কলেজ এবং লীড্‌স্‌ ও স্যাক্‌সের পরীক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-পৃষ্ট কণার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা হবে।

প্রাচীনতম মানুষ

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

মানবজাতির বিবর্তনের ধারা খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আজ একথা স্বীকার করেন যে, কোন এক উন্নত ধারার বনমানুষ থেকে আজকের সভ্য মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। বনমানুষ থেকে মানুষের বিবর্তনের টুক্‌রা টুক্‌রা ইতিহাস বিজ্ঞানীরা পর পর সাজাতে বসেছেন। পাথরের স্তর থেকে খুঁজে বের করেছেন নিদর্শন। জীবজগতের ইতিহাসে মানুষের অস্তিত্ব একেবারে নতুন যুগের হলেও শিলালিপিতে তার নিদর্শন দুষ্প্রাপ্য। হয়তো সব ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয় নি বলে অনেক কিছু অস্পষ্ট হয়ে আছে। মানুষের এই পূর্বপুরুষ খোঁজবার তাগিদে বহু বিজ্ঞানীই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন।

মানুষের নিজেকে জানবার এক স্বাভাবিক আকর্ষণ ও দুর্বলতা আছে। তাই যখন কোন নতুন ফসিল-মানুষ আবিষ্কারের কথা জানা গেছে, তখন তাকে প্রাচীনতম বলে স্বীকৃতি দেবার এক স্বাভাবিক চেষ্টা হয়েছে। হয়তো পরবর্তী কালের আবিষ্কারে সে ধারণা বদ্‌লে গেছে। এমন কি, মাথার খুলি জাল করে 'পিল্টডাউন' মানুষকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলে চালাবার চেষ্টা হয়েছিল।

জার্মেনীর নিয়াণ্ডার্থাল গিরিপথে ১৮৫৬ সালে এক গুহার মধ্যে পাওয়া গেল নিয়াণ্ডার্থাল মানুষের মাথার খুলি। প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে এর এক আস্ত কঙ্কাল আবিষ্কৃত হলো, ফ্রান্সের এক গুহা থেকে। ১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের এক চুনাপাথর চূর্ণের সময় আজ থেকে ৩০,০০০ বছর আগেকার ক্রোম্যাগনন মানুষের পাঁচটি আস্ত

কঙ্কাল পাওয়া গেল। ১৮৯০ সালে হল্যাণ্ডবাসী ডক্টর ইউজেন ডুবোয়া আগ্নেয়গিরি বেষ্টিত জাভা-দ্বীপে সোলো নদীর তীরে জাভা-মানুষের ফসিল আবিষ্কার করেন। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক রেমণ্ড-ডার্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে আবিষ্কার করেন অষ্ট্রেলোপিথেকাস-এর ফসিল। ১৯২৭ সালে পিকিং শহরের কাছে পাওয়া গেল পিকিং-মানুষের ফসিল। প্রতিটি আবিষ্কারই মানব-জাতির বিবর্তনের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা বহন করছে, কিন্তু এরা কেউই প্রাচীনতম মানুষ বলে স্বীকৃতি পায় নি। এদের মধ্যে মানুষ ও বনমানুষের অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যায়। আমরা জানি, স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে যে যত বেশী উন্নত পর্যায়ের জীব, তুলনামূলক ভাবে তার মস্তিষ্ক তত বেশী বৃহত্তর। বনমানুষ ও আজকের মানুষ অর্থাৎ 'হোমো স্যাপিয়েন্স'-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, বনমানুষের মস্তিষ্কের আধার প্রায় ৬০০ সি সি.-এর মত এবং সেই তুলনায় মানুষের ১৬০০ সি. সি। এছাড়া প্রথম মানুষ উপলখণ্ড দিয়ে ধারালো হাতিয়ার তৈরি করতে শিখেছিল। বনমানুষ তা পারে নি। তাই ফসিল-মানুষের সঙ্গে যদি সেই যুগের হাতিয়ার পাওয়া যায়, তবে তাকে মানুষের পূর্বপুরুষ বলতে কোন সংশয় থাকে না।

সম্প্রতি ডক্টর এল. এস. বি. লীকি আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশ থেকে প্রাচীনতম মানুষের ফসিল আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন। আজ থেকে প্রায় দু'কোটি বছর আগেকার আদিম মানুষ 'কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস' আবার নতুন করে আলোড়ন তুলেছে জীববিজ্ঞানী মহলে। ট্যাঙ্গানিকার জনবিরল অলডুভাই উপত্যকায় লীকি পরিবার ১৯৩১ সাল থেকে তাঁদের অভিযান চালিয়ে যান। এই ফসিল-সঞ্চিত উপত্যকার প্রথম সন্ধান পান ১৯১১ সালে একজন জার্মান প্রজাপতি-সংগ্রহকারী। ১৯১৩ সালে জার্মান অধ্যাপক রেকের অধীনে এক প্রাথমিক অভিযান চালান। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাজ স্থগিত রাখা হয়। বহুদিন পরে ১৯৩১ সালে অধ্যাপক রেক ও ডক্টর লীকি সেই সিংহ, গণ্ডার, কেউটে, হায়েনা অধ্যুষিত জায়গায় অল্প সময়ের জন্যে অভিযান চালান। কঠিন লাভাস্রোতে জমা আগ্নেয় পাথরের উপর সঞ্চিত হয়েছিল পলি। এর মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে ফসিলের টুক্‌রা। ডক্টর লীকির খুব ভাল লেগে গেল সেই জনবিরল উপত্যকা। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন হয়তো এখানে পাওয়া যেতে পারে। সেই থেকে তিনি পাথরের স্তরে স্তরে হারিয়ে যাওয়া প্রায় ১৫০টা লুপ্ত জীবের সন্ধান পেয়েছেন।

ডক্টর লীকি নিত্যনতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো ধারণা পরিবর্তন করেছেন। তাঁর এই কাজে সাহায্য করেছেন তাঁর সহধর্মিণী ও সন্তান। ১৯৫৯ সালের ১৭ই জুলাই—ডক্টর লীকি অসুস্থ। মিসেস লীকি সে দিন একাই বেরিয়েছিলেন ফসিলের সন্ধানে। পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত পথ—মাঝে মাঝে গাড়ী আটকে যাচ্ছে। কি দেখে তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন ক্যাম্পে। উত্তেজিতভাবে বললেন—আমি পেয়েছি, আমি সেই মানবের সন্ধান পেয়েছি। ডক্টর লীকি সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন সেই আদিম মানুষের ফসিল দেখবার জন্যে। একটা জায়গায় একটা মাথার খুলি পড়ে আছে দেখে ডক্টর লীকি সেটা তুলে ধরলেন। প্রায় তিরিশ বছরের অক্লান্ত সাধনার মূল্যায়ন করবার দিন এসেছে। আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো মিসেস লীকির কপোলে। কয়েক সপ্তাহ ধরে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো চতুর্দিকে। আরও কিছু হাড়ের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই আদিম মানুষের নামকরণ করা হলো 'জিনজ্যানথ্রোপাস'। জিনজ্‌ কথার অর্থ হলো—প্রিয় বালক। ডক্টর

লীকির মতে, জিনজ্যানথ্রোপাস আজকের সভ্য মানুষের ঠিক পূর্বপুরুষ নয়। তারা বনমানুষ অষ্ট্রেলোপিথেকাস-এর সমগোত্রীয়।

সমস্যা দেখা দিল কিছু প্রাগৈতিহাসিক পাথরের হাতিয়ার নিয়ে। বনমানুষ 'জিন্‌জ' এর ব্যবহার জানতো না। কাদের উদ্ভাবনী শক্তিতে এগুলি তৈরি হয়েছিল? তবে কি সত্যই প্রাচীনতম মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে? বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। উপত্যকার স্তর নিরীক্ষায় নিমগ্ন ছিলেন ডক্টর লীকি। পুত্র জনাথন হঠাৎ তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে এক টুক্‌রা দাঁত তুলে ধরলেন—'সেবার-টুথ' জাতীয় বাঘের। পূর্ব-আফ্রিকায় প্রথম নিদর্শন পাওয়া গেল ঐ জাতীয় বাঘের। তখন খোঁজবার পালা চললো। খুঁজতে খুঁজতে সবাই বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছেন। হঠাৎ মিসেস লীকির চোখ দুটা যেন অস্বাভাবিক উজ্জল হয়ে উঠলো। এ তো বাঘের দাঁত নয়—কিছু মানুষ জাতীয় জীবের মাথার খুলি···হাতের আঙুল···। খোঁড়া হলো পরিখা। জোর অনুসন্ধান চললো। অনুসন্ধানের ফলে কিছু করোটি, আরও সম্পূর্ণ·· নীচের পাটির চোয়াল···কিছু দাঁত পাওয়া গেল।

উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটছে। হঠাৎ একদিন জন্‌ আবিষ্কার করলেন আর একটা নীচের চোয়াল—তাতে তেরটি দাঁত অবিকৃত অবস্থায় লাগানো আছে। ডক্টর লীকি নিঃসন্দেহ হলেন—এরা জিনজ্যানথ্রোপাস-এর চেয়ে অনেক পুরনো দিনের। এরাই কি তবে সেই পাথরের হাতিয়ারের মালিক? ডক্টর লীকি এর প্রাথমিক নামকরণ করেন 'হোমো হাবিলিস' অর্থাৎ হাতুড়ে মানুষ। সবচেয়ে আশ্চর্য—হাতুড়ে মানুষের মস্তিষ্কের আধার জিনজ্যানথ্রোপাস-এর মস্তিষ্কাধারের চেয়ে অনেক বড় এবং নীচের চোয়ালের সঙ্গে আধুনিক সভ্য মানুষের চোয়ালের সাদৃশ্য দেখা গেল।

আজকে সবাই অধীর হয়ে আছে অলডুভাই উপত্যকা থেকে নতুন কিছু শোনবার জন্যে। হাতুড়ে মানুষ আজ বহু বিতর্কিত নাম। এর নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রায় চল্লিশটি দাঁত, চারটি মাথার খুলি, দু-পাটি নীচের চোয়াল, হাত ও পায়ের কিছু হাড় আর কণ্ঠাস্থির সাহায্যে। ডক্টর লীকি মনে করেছিলেন, তাঁর হাতুড়ে মানুষই প্রাচীনতম মানুষ বলে দাবী করতে পারে। তিনি এর পোষাকী নামকরণ করেছেন—কেনিয়াপিথেকাস উইকেরী। এই উল্লেখযোগ অবদানের জন্যে রয়েল জিওগ্রাফিক সোসাইটির পক্ষ থেকে তাঁকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

বিস্ময়ের ঘোর কেটে না যেতেই পৃথিবীর সবাই আবার নতুন করে শুনলো কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস-এর কথা। ডক্টর লীকি সংশোধন করে বলেছেন—তাঁর নবতম আবিষ্কার আজ থেকে প্রায় দু'কোটি বছর আগেকার মানুষের এবং কেনিয়াপিথেকাস আফ্রিকানাস যে প্রাচীনতম মানুষ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—হাতুড়ে মানুষের চেয়ে প্রায় এক কোটি বছরের প্রাচীন। নাইরোবি থেকে প্রায় ২৫০ মাইল পশ্চিমে ভিক্টোরিয়া হ্রদের এক দ্বীপে ৯জন পুরুষ, নারী ও শিশুর প্রস্তরীভূত অস্থি-কঙ্কাল পেয়েছেন। ভাবী দিনের মানুষের কাছে হয়তো আরও নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাস অনেক স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে।

ভারতের শক্তির উৎস ও তাহার প্রয়োগ

শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ

কোন দেশের লোকপিছু কত শক্তি প্রয়োগ হয়, তাহার উপর সেই দেশের উন্নতি নির্ভর করে। আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতিতে, যান-বাহন পরিচালনায় এবং আরও নানাভাবে শক্তির প্রয়োগ করা হয়। প্রাচীন কালে প্রাকৃতিক শক্তির উৎসের বিষয় তেমন কিছু জানা ছিল না। সেই জন্য পশু ও মানবদেহের শক্তির সাহায্যে অনেক কাজ চালান হইত। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহারই প্রশস্ত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি উৎস সর্বজন-গ্রাহ্য আর বাকি কিছু কিছু ব্যবহৃত হইলেও তাহা চলিত শক্তির উৎসের মধ্যে ধরা হয় না। গ্রাহ্য উৎস হিসাবে নিম্নলিখিত শক্তি ধরা যাইতে পারে—(১) খনিজ কয়লা, (২) খনিজ তেল ও গ্যাস এবং (৩) জলপ্রপাত হইতে উদ্ভূত শক্তি। বর্তমান শতকে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মোট শক্তির তুলনায় তাহার পরিমাণ খুবই কম। ভারতে এই সকল উৎস কি পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, তাহার আনুমানিক হিসাব হইল—

	মিলিয়ন টন	মোট ব্যবহৃত শক্তির শত-করা হার
খনিজ কয়লা—	৫৪·৬০	৩৩·০
খনিজ তেল—	৯·৫০	৫·৮
জলপ্রপাত—	০·৯০	০·৬

ইহা ভিন্ন শক্তির উৎস হিসাবে অন্য যাহা কিছু ব্যবহৃত হয়, তাহার পরিমাণও দেওয়া গেল।

গোবর—	৪৬·০০	২৭·৯
কাঠ—	৩৫·০০	২১.২
কৃষিজাত আবর্জনা	১৯·০০	১১·৫
মোট—	১৬৫·০০	১০০·০

তেল বা অন্য যে সকল পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কয়লায় শক্তির তুল্য পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে মাথাপিছু কত শক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেশ—	লোকপিছু বাৎসরিক শক্তির পরিমাণ টন হিসাবে।
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—(ইউ এস এ.)	৮·৬
বৃটেন (ইউ.কে.)—	৫·০
পশ্চিম জার্মেনী—	৩·৬
নেদারল্যাণ্ড—	২·৫
ইটালী—	১·১
জাপান—	১·১
ভারত—	০·১

এই সকল সংখ্যায় অবশ্য গ্রাহ্য শক্তির উৎসকেই ধরা হইয়াছে। গোবর প্রভৃতির ব্যবহার ধরিলে ভারতের হিসাবে ০·২ বা ০·৩ টন বৃদ্ধি পাইতে পারে। দেখা যাইতেছে—ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় ভারতে মাথাপিছু শক্তির পরিমাণ খুবই কম।

আমাদের দেশে শিল্প ও অন্যান্য প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন আলোচনা করিয়া

দেখা যাউক, শক্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা কতটা বর্তমান আছে।

গোবর—শক্তি হিসাবে গোবরের প্রয়োগ হয় প্রধানতঃ রান্নার কাজে। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় যে, বৎসরে ১২০০ মিলিয়ন টন কাঁচা গোবর পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ৪০০ মিলিয়ন টন জ্বালানী এবং ১২৫ মিলিয়ন টন সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকিটা নষ্ট হয়।

কাঠ—জ্বালানী হিসাবে ৬০ মিলিয়ন টন কাঠ ব্যবহৃত হয়। এই ৬০ মিলিয়ন টন কাঠ পাইতে হইলে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০,০০০ একর বন কাটিয়া সাফ করা দরকার (ধরা যাইতে পারে প্রতি একরে ২০০০ টন কাঠ পাওয়া যাইতে পারে)। ফলে খুব অল্প দিনেই দেশের সমস্ত বনভূমি নষ্ট হইবে এবং ক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হইবে। বন বিভাগ শত চেষ্টা করিয়াও এই বাৎসরিক ক্ষতি প্রতি বৎসরে পূরণ করিতে পারিবে না। সুতরাং যত শীঘ্র হয় জ্বালানী হিসাবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করিয়া খনিজ কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

খনিজ কয়লা—আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত খনিজ কয়লার মোটামুটি হিসাবে আনুমানিক ১২৩০০০ মিলিয়ন টন কয়লা আমাদের দেশে পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ভিন্ন আরও ২০০০ মিলিয়ন টন লিগ্‌নাইট পাওয়া সম্ভব। এই পরিমাণ সারা পৃথিবীর খনিজ কয়লা-সম্পদের $\frac{১}{২৫}$ অংশ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে—লোকসংখ্যা হিসাবে আমাদের সারা পৃথিবীর $\frac{১}{২৫}$ ভাগ। সুতরাং আমাদের দেশে খনিজ কয়লার সম্ভাবনা বেশী মনে হইলেও মাথাপিছু পৃথিবীর গড়পরতা হিসাব হইতে অনেক কম।

জলপ্রপাত—বৈদ্যুতিক কিলোওয়াট হিসাবে ধরিলে ১৯৬৬ সালে মোটামুটি ৫'০১ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবার মোট সম্ভাবনা হিসাব করিলে দেখা যায়, সবগুলি নদ-নদী কাজে লাগাইলে মোট ৪১'১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইতে পারে।

খনিজ তেল ও গ্যাস—আমাদের দেশে ইহার সর্বাত্মক সন্ধান চলিতেছে। ক্রমেই দেখা যাইতেছে, এই শক্তির উৎসের সম্ভাবনা প্রচুর। বর্তমানে ইহার মোট পরিমাণ অনুমান করা সম্ভব নয়। এই উৎসের সাহায্যে ১৯৬৬ সালে মোট যে শক্তি উৎপন্ন হইবে, তাহার মোট পরিমাণ ০'৪৪ মিলিয়ন কিলোমিটার।

পারমাণবিক শক্তি—আমাদের দেশে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সম্ভাবনা অন্য অনেক দেশ হইতে উজ্জ্বলতর বলিয়া মনে হয়। যে সকল খনিজ পদার্থের সাহায্যে পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। মাদ্রাজ ও কেরলের সমুদ্র-উপকূলে মোনাজাইট পাওয়া যায়, তাহা হইতে ৯'০ শতাংশ-যুক্ত ২০০,০০০ টন থোরিয়ামের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিহারেও বহু পরিমাণ ইউরেনিয়াম পাওয়া গিয়াছে। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে এই খনিজ পদার্থের মাইনিংও চলিতেছে। এই সকল খনিজ পদার্থের সন্ধান এখনও চলিতেছে। ভারতে ইহার মোট সম্ভাবনার কথা এখন বলা সম্ভব নয়।

এখানে যে সকল শক্তির উৎসের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার প্রায় সবগুলিই ব্যবহারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; যেমন—খনিজ কয়লা, তেল অথবা থোরিয়াম বা ইউরেনিয়াম প্রভৃতি যাহা আমরা ব্যবহার করি, তাহা আর পুনরায় ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। মানুষ আজ পর্যন্ত ইহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে তৈয়ারও করিতে পারে না। কাজেই পৃথিবীতে এই সকল উৎস এককালে যাহা জমা হইয়াছে, আমরা সেই জমা সম্পদ খরচ করিয়া ক্রমে নিঃস্ব হইতেছি।

প্রোফেসর জেগর ১৯৩০ সালে এক হিসাব

লইয়া বলিয়াছিলেন যে, সারা পৃথিবীতে মোট খনিজ কয়লার পরিমাণ ২০০০ বিলিয়ন টন। ১৯৩০ সালের হিসাব মত সারা পৃথিবীতে প্রতি বৎসর ০·৫ বিলিয়ন টন কয়লা ব্যবহৃত হইত। ১৯৩০ সালে যে সকল দেশ পিছাইয়া ছিল, তাহাদের অনেকেই আজ স্বাধীন হইয়া দেশকে সমৃদ্ধশালী করিবার চেষ্টায় অনেক বেশী কয়লা ব্যবহার করিতেছে। ক্রমে যে তাহা বৃদ্ধি পাইবে, এই বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত। এই সকল বিষয় বিচার করিয়া প্রোফেঃ জেগর মনে করেন যে, আমাদের কয়লা-সম্পদ সম্ভবতঃ আর ১০০০ বৎসর আমাদের শক্তি সরবরাহের কাজে লাগিবে।

ইংল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরীর কর্তৃপক্ষ এক অনুসন্ধানী কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বর্তমান হারে খরচ হইলে ২০০০ বৎসর পর্যন্ত কয়লার ব্যবহার চলিতে পারে। তাহার পরে আর খনিজ কয়লা পাওয়া যাইবে না। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা আরও শোচনীয়—২০০ বৎসর পর্যন্ত চলিতে পারে। তৈল-সম্পদ তার আগেই শেষ হইবে।

জল-শক্তি অবশ্য পৌনঃপৌনিক। ইহার ব্যবহারের পরেও জল আবার বাষ্প হইয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে—আমাদের নদী-নালা ভরাইয়া দিবে। আমরা তাহার সাহায্যে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া কাজ চালাইব। কিন্তু ইহা আর কতটুকু! জল-শক্তি কি আর কয়লার অভাব পূরণ করিতে পারিবে? ১৯৩০ সালের হিসাবে পৃথিবীতে মোট সম্ভাব্য জল-শক্তির ৬ শতাংশ ব্যবহৃত হইত। সম্ভাব্য শক্তি কাজে লাগাইলেও তাহা কেবল আমেরিকার উৎস হইতে ব্যবহৃত শক্তির মাত্র ½ অংশ হইবে।

বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত। ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস-সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় কনফারেন্সে তাঁহারা মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত উৎসগুলি লইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতেছেন—

(১) জোয়ার-ভাটার শক্তি।

(২) সমুদ্রের উপরিভাগ এবং গভীরে তাপমাত্রার তারতম্য হইতে অদ্ভুত শক্তি।

(৩) পারমাণবিক শক্তি।

(৪) সৌর শক্তি।

ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি কেবল লেবরেটরীর পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। (৩) পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের চেষ্টা চলিতেছে এবং ইহার ব্যবহারও আরম্ভ হইয়াছে। শান্তির সময়ের কাজে ভারত ইহার ব্যবহার সুরু করিয়াছে। শক্তি উৎপাদনের জন্য দুইটি রিয়্যাক্টর ইতিমধ্যেই চালু হইয়াছে এবং আরও একটি স্থাপনের তোড়-জোড় চলিতেছে (ট্রম্বেতে ইহার সম্বন্ধে সর্বাত্মক গবেষণা চলিতেছে, ধ্বংসাত্মক কাজ বাদে)। কিন্তু ইহার মালমশলাও সীমিত। থোরিয়াম বা ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ছাড়া সাধারণভাবে প্রাপ্য কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন করিতে না পারিলে ইহাও খুব বেশী দিন চলিবে না।

তাহা ছাড়া ইহার ব্যবহারে বিপদ আছে। এই সকল পদার্থ হইতে যে সকল রশ্মি নির্গত হয়, তাহা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। হিরোসিমা এবং নাগাসাকির কথা কেহই ভোলে নাই। পারমাণবিক বোমায় যে ক্ষতি হয়, অতি অল্প পরিমাণে সেই সকল রশ্মির আঘাতও যথেষ্ট ক্ষতি করে। অনেক বিচক্ষণ জীববিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন। বোগুষ্টেড তাঁহার "The Atomic Age and Our Biological Future" নামক পুস্তকে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—সন্তান জন্মিবার সময় যদি প্রারম্ভেই উৎপাদক সেলে (Cell) পারমাণবিক শক্তি হইতে উদ্ভূত রশ্মির আঘাত লাগে, তবে তাহা তখনই নষ্ট হইয়া যাইবে, সুতরাং ভবিষ্যতের ভয় নাই। কিন্তু

এই রশ্মির প্রভাবে যদি এতটা মিউটেশন হয় যে, সেল অবস্থায় নষ্ট না হইয়া তাহাকে অসম অবস্থায় পরিণত করে, তবে সেই সন্তান জন্মের পরেও উৎপাদনে সক্ষম হইবার পূর্বেই মারা যাইবে। সুতরাং তাহাদের লইয়াও বংশ-বিপত্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অনেক মিউটেশন এমন এক ধরণের হয়, যাহার কোন চিহ্ন এক পুরুষে লক্ষ্য করা যায় না। তাহাদের লইয়াই ভবিষ্যৎ জাতিগত বিপত্তি। কারণ এই রশ্মির ক্রিয়া শোধিত হয় না—ক্রমে জমা হইতে থাকে। সুতরাং বংশ হইতে বংশ বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে এবং ক্রমে মানবজাতিকে ধ্বংস করিবে অথবা বিকৃত করিয়া দিবে। পারমাণবিক শক্তি লইয়া যেখানে কাজ হয়, সকলেই এই সম্বন্ধে খুব সজাগ থাকেন এবং মাঝে মাঝেই কর্মীদের পরীক্ষা করা হয়. যাহাতে তাহারা রশ্মি-সঞ্জাত নির্ভয়-সীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু তাহাতেও কতটা বিপদ এড়ান যাইবে, ভবিষ্যৎই তাহা নিরূপণ করিবে। কিন্তু এই কথা ঠিক, আমরা একটা ভবিষ্যৎ বিপদের ঝুঁকি লইয়াই এই দিকে অগ্রসর হইতেছি।

আর এক ভবিষ্যৎ শক্তির উৎস—সৌর শক্তি। সূর্য যে শক্তির উৎস, তাহা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আমাদের জানা ছিল। বাস্তবিক পক্ষে আমরা কয়লা প্রভৃতি যে সকল উৎস ব্যবহার করি, তাহাও সূর্য-শক্তি হইতে উদ্ভূত। জল-শক্তি প্রভৃতি বা কাঠ, গোবরও সূর্য-শক্তিরই রূপান্তর। কিন্তু ইহারা পরোক্ষ। সূর্য-শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রচুর। কিন্তু আমাদের বর্তমান সভ্যতায় কেন্দ্রীভূত শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সৌর-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে অনেক অসুবিধা। আমরা খনির কয়লা প্রভৃতি সুবিধাজনক কেন্দ্রীভূত শক্তির উৎস হাতের কাছে পাইয়াছি বলিয়া এই দিকে নজর দেই নাই। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ইহার অবশ্যই আছে। আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী শক্তি আমরা এই উৎস হইতে পাইয়া থাকি। এই পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে আমরা যে শক্তি ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রতি বৎসরে তাহার মোট পরিমাণ ২১×১০^{১২} কিলোওয়াট। ১৯৬৭ সালে আমেরিকার গভর্ণমেন্ট হিসাব দেখাইয়াছে যে, আমরা ১৬×১০^{১২} কিলোওয়াট পরিমাণ শক্তি কয়লা, তেল প্রভৃতি হইতে পাই এবং বাকি ৫×১০^{১২} কিলোওয়াট খরচ করি মানুষ ও গৃহপালিত পশুর খাদ্য ইত্যাদি রূপে। আমরা সূর্য হইতে প্রতি বৎসর $২\cdot০১ \times ১০^{১৮}$ কিলোওয়াট শক্তি পাইয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী শক্তি পাই সূর্য হইতে। এই শক্তি ভালভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে আমাদের কোন দিন শক্তির উৎসের অভাব হইবে না। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এই সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন এবং কিছু কিছু কার্যকরী পন্থায় সফলও হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূর্য-শক্তি প্রয়োগে যে খরচ পড়ে, কয়লা প্রভৃতি উৎস হইতে প্রাপ্ত শক্তির খরচের তুলনায় তাহা অনেকটা বেশী। সেই জন্য সৌর শক্তি সর্বাত্মকভাবে এখনও খুব জনপ্রিয় হয় নাই। খরচের প্রশ্ন ছাড়া অন্য অনেক অসুবিধাও আছে।

কোক-চুল্লী

শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

কোক শব্দটির অর্থ হয়তো অনেকেরই জানা আছে বা জানা নেই। যাঁদের জানা নেই তাঁদের জন্যে প্রথমেই কোক জিনিষটি কি, তা বলা প্রয়োজন। কয়লাকে বাতাসের সংস্পর্শে না আসতে দিয়ে যদি উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা যায়, তবে যে কালো রঙের শক্ত জিনিষটি পড়ে থাকে, তাকে কোক বলে। সুতরাং সব কয়লা থেকেই কোক পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমানে কোক শব্দটির অর্থ একটু আলাদা—এটি সব কয়লা থেকে পাওয়া যায় না। প্রথমেই জানা দরকার যে, কয়লার কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। সব কয়লা থেকে একই রকমের কোক পাওয়া যায় না—কখনও বেশ শক্ত ও জমাট জিনিষ পাওয়া যায় আবার কখনও ভঙ্গুর কোক পাওয়া যায়। এটি নির্ভর করে কয়লার উপর। শক্ত ও জমাট পদার্থকে কোক বলে এবং এই জিনিষটির দাম বর্তমান কালে অপরিসীম। এই কোক না থাকলে লৌহশিল্প গড়ে উঠতো না। সুতরাং যেখানে লৌহশিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানেই কোকশিল্প গড়ে উঠেছে। প্রতি টন লৌহ উৎপাদনের জন্যে ০·৮ টন কোকের প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার পর ভারতবর্ষে ১০ মিলিয়ন টন (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ) লৌহ উৎপাদন হবার কথা—তবে উৎপাদন ১০ মিলিয়ন টনের কিছু কম অবশ্যই হচ্ছে। কারণ বোখারো কারখানা এখনও গড়ে ওঠে নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় শেষে উৎপাদন আরও বেড়ে যাবে—তৃতীয় পরিকল্পনার পর ভারত সরকারের অধীনস্থ দুর্গাপুর কারখানাতে ১·৬ মিঃ টন লৌহ উৎপাদন হচ্ছে বা হবার কথা এবং চতুর্থ পরিকল্পনার পর ৩·৪ মিঃ টন উৎপাদন হবে। রাউরকেলায় হচ্ছে ১·৮ মিঃ টন এবং পরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ২·৫ মিঃ টন। ভিলাইয়ে হচ্ছে ২·৫ মিঃ টন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার পর দাঁড়াবে ৩·২ মিঃ টন। ১৯৭০ সালের পর বোখারো কারখানা থেকে ২·২ মিঃ টন উৎপাদন হবে। এগুলি ছাড়া আরও তিনটি ইস্পাত কারখানা ভারতে আছে—টাটা (২·০ মিঃ টন), বার্ণপুর (১·০ মিঃ টন) ও মহীশূর (০·১ মিঃ টন)। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, এই বিপুল পরিমাণ ইস্পাত তৈরি করবার জন্যে কত বেশী কোক উৎপাদন করা দরকার।

কোক উৎপাদনের পদ্ধতিকে বলা হয় Carbonization। এই পদ্ধতি দুই প্রকার—(ক) উচ্চ তাপ প্রয়োগে, (খ) নিম্ন তাপ প্রয়োগে। পদ্ধতি (ক) পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে—কারণ লৌহ উৎপাদনের কোক এই পদ্ধতি ছাড়া কোন উপায়ে তৈরি করা সম্ভব নয়। পদ্ধতি (খ) জনপ্রিয় নয়—তবে ক্রমশঃ এটি বৃদ্ধি পাবে, কারণ এতে তরল পদার্থ বেশী পাওয়া যায় এবং গৃহস্থের ব্যবহারের জন্যে এই কোক ব্যবহার করা যেতে পারে। (খ) পদ্ধতিতে গ্যাস কম পাওয়া যায়, কিন্তু গ্যাসের ক্যালোরিফিক মান বেশী থাকে। এই দুই পদ্ধতিতে যে ভাবে গ্যাসের রাসায়নিক সংযুক্তি পরিবর্তিত হয়, তার একটি তুলনামূলক ছক দেওয়া হলো।

গ্যাস	Coking temperature ৫০০° সেঃ—শতকরা ভাগ	Coking temperature ১০০০° সেঃ—শতকরা ভাগ
CO_2	৯'০	২'৫
C_nH_m	৪'০	৩'৫
CO	৫'৫	৪'০
H_2	১০'০	৫০'০
CH_4 & homologs	৬৫'০	৩৪'০
N_2	২'৫	২'০

এখন একটি প্রশ্ন জাগতে পারে, কেন কয়লাকে বাতাসের সংস্পর্শে না আসতে দিয়ে গরম করলে শক্ত হয়ে যায়—এর সঠিক কারণ অবশ্য এখনও বলা যায় না, তবে যেটুকু জানা গেছে, তা হলো ৩৪০° সেঃ—৪৫০° সেঃ তাপ প্রয়োগে কয়লা থেকে একটি তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়। সেই তরল পদার্থটি কঠিন পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে একটি শক্ত জিনিষের সৃষ্টি করে, যেমন হয় Thermo-Setting resin, অর্থাৎ যে সব প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ তাপ দেবার পর জমে যায় এবং তার আর কোন পরিবর্তন ঘটে না তাপ প্রয়োগে—বেশ কিছু উচ্চ তাপ পর্যন্ত। এখন এই যে তরল পদার্থের আবির্ভাব ঘটলো, এটি হতে পারে—(১) তাপ প্রয়োগে কয়লা থেকে কিছু অংশ ভেঙে গিয়ে (Thermal breaking of the coal substance) তরল পদার্থের সৃষ্টি করে অথবা (২) কয়লায় যে সব অল্প তাপ সহনশীল জৈব পদার্থ থাকে, সেগুলি তাপ প্রয়োগে তরল পদার্থে পরিণত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সব কয়লা সমান নয়, কোন কয়লায় কোক তৈরি হবার ক্ষমতা বেশী আছে আবার কিছু কয়লায় কম আছে। সেজন্যে পৃথিবীর সর্বত্রই বিভিন্ন প্রকারের কয়লাকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করা হয়ে থাকে, যাকে বলা হয় Blending। ভারতবর্ষের কয়লায় বেশী পরিমাণে ছাই থাকে। ভারতবর্ষের ভাল কয়লা এখন যেভাবে খরচ হচ্ছে, সেই ভাবে খরচ করতে থাকলে মাত্র ৫০ বছর পর আর কোন ভাল কয়লা পাওয়া যাবে না। সেই কারণে সর্বদাই blending করা হয়। কোক তৈরির জন্যে সাধারণতঃ আমাদের দেশে ৩৫—৪৫ ভাগ blending করা হয়।

প্রথমে যে চুল্লীর প্রচলন ছিল, তাকে বলা হতো বিহাইভ (Beehive) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বর্তমানের By-Product পদ্ধতি থেকে আলাদা। আগে একটি কয়লার গাদা তৈরি করে তাকে বাতাসের সঙ্গে আসতে না দিয়ে গরম করা হতো এবং যে গ্যাস নির্গত হতো, তা বাতাসেই ছেড়ে দেওয়া হতো। কিছু কোক পুড়েও যেত, আর কোকও খুব ভাল হতো না। যে বিপুল পরিমাণ গ্যাস বাতাসে ছেড়ে দেওয়া হতো তার ফলে সেই অঞ্চল খুবই কলুষিত হয়ে পড়তো। কিন্তু বর্তমান কালে এই পদ্ধতির প্রচলন একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানের প্রচলিত পদ্ধতি—By-Product পদ্ধতিতে গ্যাস সংগ্রহ করা হয় এবং সেই গ্যাস থেকে বহু জিনিষ আলাদা করা যায়, যার প্রয়োজনীয়তা এখন খুবই বেশী এবং গ্যাসটিও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। ১নং চিত্রে একটি কোক-চুল্লী সামগ্রিকভাবে দেখানো হলো। ছবিটির বামদিকে যে জিনিষ দেখা যাচ্ছে, তাকে বলা হয় Quenching tower—চুল্লী থেকে নির্গত গরম কোক একটি গাড়ীর সাহায্যে ঐ স্থানে নিয়ে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। ছবিটির ডান দিকে দেখা Service Bunker—এখানে পরিমিত আয়তনের কয়লা জমা থাকে। চুল্লীকে যে গাড়ীর সাহায্যে ভর্তি করা হয় অর্থাৎ চার্জিং কার-

গুলি এই সার্ভিস বাঙ্কার থেকে সময়মত কয়লা নিয়ে চুল্লীতে ভর্তি করে দেয়। মাঝখানের অংশটিতে চুল্লীগুলি দেখানো হয়েছে। চুল্লীর সামনের অংশের (ছবিতে যে অংশ দেখা যাচ্ছে) নাম Coke wharf। এখানে কোককে জল দিয়ে ঠাণ্ডা করবার পর ফেলে দেওয়া হয় এবং এখান থেকে বেল্টের দ্বারা সুবিধামত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়।

gas main। ৮নং অংশ চুল্লীর Charging hole অর্থাৎ যেখান দিয়ে চুল্লীতে কয়লা দেওয়া হয়। ৯নং অংশ Regenerator—গরম গ্যাস Regenerator দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, ফলে এটি গরম হয়ে যায় এবং পরে যে গ্যাস পোড়ানো হবে, তাকে এর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করাবার পর পোড়ালে বেশী পরিমাণে তাপ কাজে লাগাতে পারা যায়
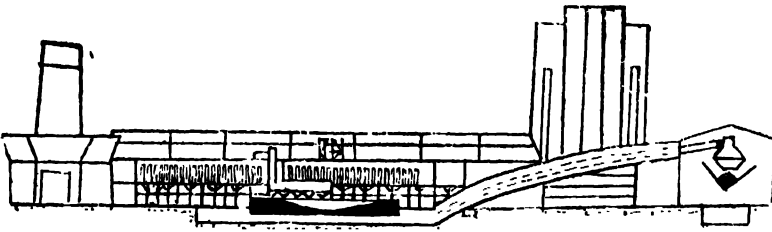
১নং চিত্র

২নং চিত্রে কোক-চুল্লীর আরও একটু নিখুঁত বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১নং অংশ হচ্ছে চার্জিং কার, যার দ্বারা চুল্লী ভর্তি করা হয়। ২নং অংশ হচ্ছে Pushing machine—এই যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে চুল্লীর দরজাটি খুলে দেওয়া হয় এবং একটি লম্বা লোহার বিমের দ্বারা সমস্ত কোক চুল্লী থেকে ঠেলে বের করে দেওয়া হয়। সর্বশেষে দরজাটি আবার বন্ধ করে চুল্লীকে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ৩নং অংশের নাম কোক গাইড কার—এই অংশের দ্বারা অপর দিকের দরজাটি খুলে নেওয়া হয় এবং পরে ঠিক জায়গায় দরজাটিকে লাগানো হয়। ৪নং অংশে গরম কোক গ্রহণ করা হয় এবং ৫নং অংশে গরম কোক Quenching tower-এ ঠাণ্ডা করবার পর এখানে ফেলে দেওয়া হয়। ৬নং অংশে একটি চুল্লীকে আড়াআড়িভাবে দেখানো হয়েছে—এই অংশে কয়লা আছে। ৭নং অংশ হচ্ছে যেখান দিয়ে গ্যাস নির্গত হয়; অর্থাৎ Hydraulic

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমাদের দেশের কয়লায় অনেক ছাই থাকবার জন্যে ব্যবহারে বেশ অসুবিধা হয়ে থাকে। তাই পৃথিবীর সব জায়গাতেই এবং আমাদের দেশেও যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তা হলো শোধন পদ্ধতি। কয়লাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শোধন করে নেবার ফলে কাদা মাটি অনেকখানি কমে যেতে পারে এবং সেই কয়লা ব্যবহারের উপযোগী হয়ে থাকে। শোধন পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে এটুকুই বলা যেতে পারে যে, কয়লাকে নির্দিষ্ট মাপে ভেঙে নিয়ে এমন একটি মাধ্যমে রাখা হয় এবং কৃত্রিম তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়, যার ফলে কয়লা উপরের দিক দিয়ে চলে যায় এবং কাদা মাটি জাতীয় অবাঞ্ছিত বস্তুগুলি নীচের দিকে জমে যায়।

সুতরাং কোক-চুল্লীতে যে কয়লা দেওয়া হবে, তাকে আগে থেকে নানাভাবে মিশিয়ে এমন করে নিতে হবে, যাতে এথেকে উৎপন্ন

কোককে মারুৎ-চুল্লীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথমে উত্তপ্ত চুল্লীতে কয়লা ভরে দেওয়া হয় চার্জিং কারের সাহায্যে চুল্লীর ভিতরের তাপ সর্বদাই ১০০০° সেঃ রাখা হয়। চুল্লীতে কয়লা ভরে দিয়েই উপরের ঢাক্‌নাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় (যেখান দিয়ে কয়লা ভরা হয়)। সাধারণতঃ ১৬—১৯ ঘণ্টা সময় কাল মনে পড়ে যায়। By-Product শিল্পে যে গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাকে নানা উপায়ে শোধন করে নেওয়া হয় এবং তার ফলে অনেক কিছুর সন্ধান মিলে যায় এবং গ্যাসও অনেকটা বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই গ্যাসের জ্বালানী ক্ষমতা থাকবার দরুণ এর চাহিদাও অনেক। প্রথমতঃ এই গ্যাসকে কোক-চুল্লীতেই
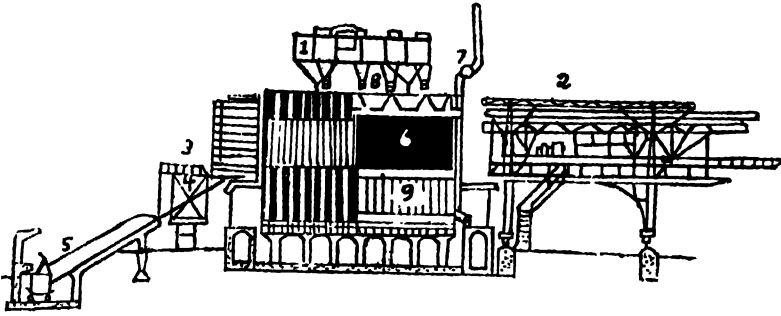
২নং চিত্র

লাগে কোক তৈরি করবার জন্যে। প্রথমে কয়লা উচ্চ তাপের সংস্পর্শে এসে ভাঙতে সুরু করে এবং বাদামী রঙের ধোঁয়া বের হতে থাকে। এই ধোঁয়া থেকে কত জিনিষ যে পাওয়া যায়, তা আগে কেউ কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি। কি না পাওয়া যায় এথেকে! মোটামুটি-ভাবে দরকারী জিনিষের কয়েকটি হলো—কোল-টার, অ্যামোনিয়া, বেনজিন, টলুয়িন, ন্যাপ-থালিন এবং কোল গ্যাস। এই কোল-টার থেকে হাজার হাজার জিনিষ পাওয়া যায়, যার জন্যে একে বলা হয় তরল সোনা বা Liquid gold। কত রকমের ওষুধ, প্রসাধন সামগ্রী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু, যেমন—প্লাস্টিক, সুতা (রাসায়নিক) এবং আরো অনেক কিছু। তাই আধুনিক কালে প্রত্যেক কোক-চুল্লীর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পও গড়ে উঠেছে, যার নাম By-Product। কোক-চুল্লী বা Coke oven বলতে গেলেই Coke oven & By-Product নামটাই আজ-

ব্যবহার করা যেতে পারে, কারণ কোক-চুল্লীকে সর্বদাই ১০০০° সেঃ উত্তাপে রাখতে হয়। এখানে দুটি চুল্লীর দেয়ালের মাঝখানে কোন জ্বালানী গ্যাস পোড়ানো হয়—হয় কোল গ্যাস, না হয় মারুৎ-চুল্লী থেকে নিঃসৃত গ্যাসের দ্বারা। দুটি গ্যাসই ব্যবহার করা হয় সুবিধামত। কোল গ্যাসের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ Calorific value, মারুৎ-চুল্লী থেকে উৎপন্ন গ্যাস থেকে অনেক গুণ বেশী। তবে একটি কথা জেনে রাখা ভাল যে, কোন গ্যাসকে পোড়াবার আগে যদি বেশ গরম করে নিতে পারা যায়, তবে শেষ পর্যন্ত বেশী উচ্চ তাপ উৎপাদনে সক্ষম হওয়া যায়, যাকে বলা হয়ে থাকে Preheating of the gas। কিন্তু কোন গ্যাসে হাইড্রো-কার্বন থাকবার দরুণ তাকে পোড়াবার আগে গরম করা যায় না, কারণ তাহলে হাইড্রোকার্বন ভেঙ্গে যাবে এবং গ্যাসের উৎকর্ষও কমে যাবে। আবার মারুৎ-চুল্লীর গ্যাসে ঐ অসুবিধা

না থাকবার জন্যে পোড়াবার আগে ঐ গ্যাসকে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করা যেতে পারে এবং তা করা হয়েও থাকে। এখন এটুকু জানা দরকার যে, একক পরিমাণ কয়লা থেকে উচ্চ তাপের—কার্বোনিজেশন পদ্ধতিতে নিম্ন অনুপাতে নিম্নোক্ত জিনিষগুলি পাওয়া যায়:—

কোক	—	শতকরা ৭৬ ভাগ
টার	—	" ৩ "
তেল	—	০.৭৫
অ্যামোনিয়া	—	০.২৫
গ্যাস	—	২০.০ "

এখন কোক-চুল্লীর গঠন সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। এই চুল্লীর সমস্ত অংশই তাপ-সহনশীল ইটের দ্বারা তৈরি। ৩নং চিত্রে চুল্লীর গঠন-বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। চুল্লীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরণের তাপ-সহনশীল ইটের দ্বারা তৈরি, চিত্রের সাহায্যে তা বর্ণনা করা হয়েছে।
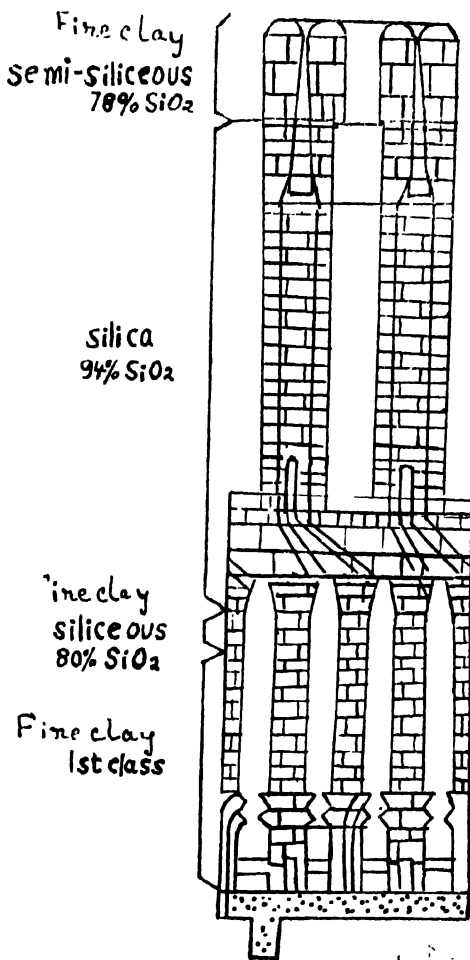
৩নং চিত্র

চুল্লীর গঠন-প্রণালী খুবই জটিল। সাধারণতঃ ৮০টি চুল্লীবিশিষ্ট একটি ব্যাটারী তৈরি করতে প্রায় ২০,০০০ টন ইটের প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ চার রকমের ইট ব্যবহৃত হয়ে থাকে—

ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাকটরিজ, সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ, ইনসুলেটিং অর্থাৎ যে রিফ্র্যাকটরিজের মধ্য দিয়ে তাপ চলাচল খুবই কম হয় এবং সাধারণ লাল ধরণের ইট। তবে সবচেয়ে বেশী লাগে ফায়ার ক্লে ও সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ। এই যে বিভিন্ন ধরণের ইট ব্যবহার করা হয়, তাদের আকারেরও প্রভেদ আছে। বহু আকারের ইট এখানে দরকার হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, প্রায় ৩০০ আকারের, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Shapes ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাকটরিজ এবং প্রায় ৬০০ আকারের সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ ব্যবহার করা হয় কোক-চুল্লী তৈরি করবার সময়। ৩নং ছবির নীচের অংশকে বলা হয় Regenerator এবং উপরের অংশ আসল চুল্লী। চুল্লীর ভিতর কয়লা দেওয়া হয় এবং তা পরে কোকে পরিণত হয়। চুল্লীর দুই পার্শ্বে যে ফাঁক থাকে তাতে অবিরাম কোল গ্যাস বা মারুৎ-চুল্লীর গ্যাস পোড়ানো হয় এবং এমন ভাবে তাপ সৃষ্টি করা হয়, যাতে চুল্লীর ভিতরকার তাপমাত্রা ১০০০° সেঃ থাকে। সাধারণতঃ যেখানে গ্যাসকে পোড়ানো হয়, তার তাপমাত্রা ১৩০০° সেঃ থাকে। এখন ৩নং চিত্র থেকে প্রতীয়মান হবে যে, চুল্লীর নীচের অংশকে Regenerator বলা হয় এবং চুল্লীর দুই দিকে যে গ্যাস পোড়ানো হয় বায়ুর সাহায্যে, সেই গ্যাসের Product of combustion অর্থাৎ পোড়ানোর পর যে গ্যাসের সৃষ্টি হলো, সেই গ্যাসের Sensible heat অর্থাৎ বাইরের তাপ খুব বেশী থাকবার দরুণ সেই গ্যাসকে Regenerator-এর মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে অনেকখানি তাপ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কিছুক্ষণ পর, সাধারণতঃ আধঘন্টা পর সেই উত্তপ্ত Regenerator-এর মধ্য দিয়ে বায়ু প্রবেশ করানো হয়। ফলে যখন বাতাস চুল্লীর ভিতর (অর্থাৎ চুল্লীর দুই দিকে) পোড়ানো হয় গ্যাসের সাহায্যে, তখন সেই তাপ কাজে লাগানো যায়। চুল্লীর নীচের অংশ অর্থাৎ Regenerator অংশ ফায়ার ক্লে রিফ্র্যাকটরিজ-এর দ্বারা নির্মিত। চুল্লীর অংশ সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজের দ্বারা নির্মিত। সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ ব্যবহারে একটি জিনিষ সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই যে, চুল্লীর তাপ কখনও ৮০০° সেঃ-এর নীচে নামানো চলবে না, তাহলে চুল্লী কিছু দিনেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজের বিশেষত্ব এই যে, তাপ প্রয়োগের ফলে সিলিকার নিয়ত-কারিতায় পরিবর্তন ঘটে এবং সিলিকার আয়তনেরও পরিবর্তন হয়। কিন্তু এই আয়তন পরিবর্তন ৮০০° সেঃ-এর উপরে আর ঘটে না। ফলে যদি সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজকে সর্বদাই ৮০০° সেঃ-এর উপরে রাখা যায়, তাহলে কখনও এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

প্রথম চুল্লীতে যখন আগুন দেওয়া হয় অর্থাৎ কাজ আরম্ভ হয়, তখন অত্যন্ত ধীরে ধীরে চুল্লীকে গরম করা হয়—একবার ৮০০° সেঃ উত্তপ্ত হয়ে গেলে চিন্তার বিশেষ কারণ থাকে না। চুল্লীতে যে সিলিকা রিফ্র্যাকটরিজ ব্যবহার করা হয়, Indian Standard Institution-এর মান অনুসারে তার ঘনত্ব ২.৩৩—২.৩৫। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো Quartz থাকা, যার ফলে রিফ্র্যাকটরিজের ঘনত্ব বেড়ে যায়। সুতরাং এই ঘনত্ব দিয়েই রিফ্র্যাকটরিজের গুণাগুণ বিচার করা যেতে পারে। ভারত সরকারের অধীনে যে তিনটি ইস্পাত কার-খানা গড়ে উঠেছে, সেখানে যে সব কোক-চুল্লী আছে, মোটামুটি প্রথম স্তরে সেগুলি নিম্নরূপ ছিল—রাউরকেলায় ৭০টি চুল্লীবিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারীর কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। এগুলির ১২ লক্ষ টন কোক উৎ-পাদনের ক্ষমতা আছে। ভিলাইয়ে ৬৫টি চুল্লী-বিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারী আছে—প্রথম ও দ্বিতীয়টি আরম্ভ হয় ১৯৫৯ সালে এবং তৃতীয়টি

আরম্ভ হয় ১৯৬০ সালে; এর ১২ লক্ষ টন কোক উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। দুর্গাপুরে ৭৮টি চুল্লীবিশিষ্ট তিনটি সম্পূর্ণ ব্যাটারীর মধ্যে প্রথমটি ১৯৫৯ সালে এবং বাকী দুটি ১৯৬০ সালে, উৎপাদন ক্ষমতা—১৪ লক্ষ টন কোক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে দুর্গাপুর প্রোজেক্টের কোক উৎপাদন আরম্ভ হয় ১৯৫৯ সালে—ক্ষমতা ২ লক্ষ টন কোক।

কোক-চুল্লী তৈরি করতে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। আমাদের দেশে আজ পর্যন্তও কোন কোক-চুল্লী তৈরি করা সম্ভব হয় নি, কেবল মাত্র নিজেদের প্রচেষ্টায়। অদূর ভবিষ্যতে অবশ্য তৈরি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। বর্তমানে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান ও পশ্চিম জার্মেনী এই শিল্পে বিশেষ দক্ষ। আমাদের দেশে অবশ্য আমেরিকা ও জাপান এখনও কোন কোক-চুল্লী তৈরি করে নি। দেশের অগ্রগতি যতই বৃদ্ধি পাবে, কোকশিল্পের প্রসার ততই বৃদ্ধি পাবে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

মশার বিরুদ্ধে নতুন অস্ত্র

লণ্ডনের নিকটবর্তী রোথামষ্টেড এক্সপেরিমেণ্টাল ষ্টেশনে একটি শক্তিশালী নতুন কীটনাশক দ্রব্য উদ্ভাবিত হয়েছে। এই কাজে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত সংস্থা—ন্তাশন্তাল রিসার্চ ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন।

এটি শুধু মাছির বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকরী রাসায়নিক হবে না, কয়েক শ্রেণীর মশার বিরুদ্ধেও হবে সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ কীটনাশক দ্রব্য। মাছি বিনাশের ব্যাপারে এই দ্রব্য স্বাভাবিক পাইরেথ্রিনের চেয়ে ২০ গুণ কার্যকরী হবে।

পাইরেথ্রাম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্বাভাবিক কীটনাশক দ্রব্য। এটি ক্রিস্থানথিমাম সিনেরেরিয়েফোলিয়াম (Chrysanthemum cinerariae folium) নামক এক প্রকার সাদা ডেজি জাতীয় ফুলে পাওয়া যায়। কিন্তু খুব বেশী পরিমাণে এই স্বাভাবিক কীটনাশক দ্রব্য পাওয়া যায় না। সেজন্তে বর্তমানে এরূপ গুণসম্পন্ন কৃত্রিম দ্রব্য উৎপাদনের বহু চেষ্টা হয়েছে।

রোথামষ্টেডের ইনসেক্‌টিসাইড অ্যাণ্ড ফাঞ্জিসাইড দপ্তরে ডাঃ এম. ইলিয়ট ও তাঁর সহকর্মীরা বহু ধরণের ক্রিস্থানথিমিক অ্যাসিড নিয়ে গবেষণা সুরু করেন

১৯৬১ সালে তাঁরা একটি সাধারণ কম্পাউণ্ড তৈরি করেন, যা স্বাভাবিক পাইরিথ্রিনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কার্যকরী। পরে আরও অনেকগুলি কম্পাউণ্ড উদ্ভাবিত হয়, যা আরও বহুগুণ বেশী কার্যকরী।

প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা যায়, এই কম্পাউণ্ড মানুষ বা প্রাণীর উপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না এবং কীটনাশের উদ্দেশ্যে একে এক শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা চলবে।

যখন সস্তায় এটি প্রস্তুত করা যাবে, তখন এর ব্যবহার শুধু মাছিবিনাশী এরোসল-এ সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাগানে সংরক্ষিত খাদ্যের ক্ষেত্রেও একে ব্যবহার করা চলবে।

ঘূর্ণিবাত্যা বন্ধ করবার অভিনব ব্যবস্থা

মানুষের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা অর্জনের পূর্বেই ঘূর্ণিবাত্যার প্রচণ্ড গতি নষ্ট করে দেওয়া যেতে

পারে—এরকম একটি ব্যবস্থা ক্যালিফোর্ণিয়ার আমেরিকার জাতীয় বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত এম্‌জ্‌ রিসার্চ সেন্টার নামে গবেষণা কেন্দ্রে ডাঃ ভার্ণন জে. রোসো কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়েছে। তবে কোন প্রাকৃতিক ঘূর্ণিবাত্যার উপর এই প্রক্রিয়া এখনও প্রয়োগ করা হয় নি।

ঘূর্ণিবাত্যা কেন হয়? কি কারণে বাতাসের গতি মেঘগুলিকে চোঙের আকারে গড়ে তোলে এবং ঘন্টায় কয়েক শত মাইল বেগে ছুটে যায়, ডাঃ রোসো গবেষণাগারে এই সকল সমস্যার তাত্ত্বিক সমাধান করেছেন।

তিনি বলেন—দুর্দান্ত ঝড়ের মেঘ ধন ও ঋণতড়িৎ-যুক্ত জলকণা সৃষ্টি করে। এই ধরণের ছুটি মেঘখণ্ড এক মাইলের ব্যবধানে সমান্তরাল-ভাবে থাকলে ধনবিদ্যুতান্বিত কণাসমূহ ঋণবিদ্যুতান্বিত কণার দিকে এবং ঋণ-বিদ্যুতান্বিত কণাসমূহ ধনবিদ্যুতান্বিত কণার দিকে প্রবাহিত হয়। একে অন্যের দিকে ধাবমান জলকণাসমূহের মধ্যে যে বাতাস থাকে তাদের মধ্যে ঘূর্ণায়মান গতির সৃষ্টি হয়, সৃষ্টি হয় ঘূর্ণিবাত্যার। যতক্ষণ বিদ্যুতান্বিত কণাসমূহের বিদ্যুৎ-শক্তি এভাবে সম্পূর্ণ ক্ষয় না হয়ে যায়, ততক্ষণ ঘূর্ণন চলতে থাকে।

এই ঘূর্ণন বন্ধ করবার জন্যে ডাঃ রোসো ৪০ মিলিমিটার ব্যাসের কামান থেকে ঐ মেঘখণ্ডে কয়েকটি অভিনব কামানের গোলা নিক্ষেপ করবার সুপারিশ করেছেন। ঐ সকল গোলার মধ্যে থাকবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যারাসুট এবং তাদের মধ্যে থাকবে মোট দু-মাইল দৈর্ঘ্যের ইস্পাতের তার। মেঘখণ্ডে গোলাবর্ষণের পর ঐ গোলা ফেটে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে তাথেকে বেরিয়ে আসবে প্যারাসুটসমূহ এবং তাদের মধ্যে যে সকল ইস্পাতের তার থাকবে, তাদের বিস্তার ঘটবে। ঐ সকল তার মেঘের সংস্পর্শে আসবার ফলে দেখা দিবে বিদ্যুতের ঝলকানি। ফলে যে বিদ্যুৎ-শক্তির জন্যে ঘূর্ণিব্যাত্যা চলতে থাকে, তা হ্রাস পাবে, ঘূর্ণিবাত্যাও থেমে যাবে।

ডাঃ রোসো গবেষণাগারে বাষ্পের মেঘ তৈরি করে এবং তাদের কণাগুলিকে বিদ্যুতান্বিত করে ঘূর্ণিবাত্যা সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলেই ঘূর্ণন বন্ধ হয়ে যায়। তারের সাহায্যেও এই বিদ্যুৎ-শক্তি হ্রাস করে এই কৃত্রিম ঘূর্ণিবাত্যা বন্ধ করা যায়।

খরার বিরুদ্ধে মাটির গভীরে সার ইঞ্জেকসন

খরার বিরুদ্ধে জয়ী হবার উদ্দেশ্যে মাটির গভীরে সার সঞ্চারিত করে দেবার বিষয়টি দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের হার্টফোর্ডশায়ারের রোথামস্টেড এক্সপেরিমেন্টাল ষ্টেশনে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

বিভিন্ন শস্যের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে মাটির সঠিক খাদ্যগুণ নির্ণয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে।

ঐ ষ্টেশনের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ ডাব্লিউ. জি. কুক বলেছেন, সার ইঞ্জেকসনের পদ্ধতিটি দীর্ঘ মূল সমন্বিত গাছের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে এই জন্যে যে, মাটির উপরের অংশ শুকিয়ে গেলেও নীচের অংশ ভিজা থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ফুল গাছে সার প্রয়োগ করলে তার শিকড়ের একটা বড় অংশ মাটির নীচে চলে যায়।

মিঃ কুক বলেন, এমন ফলের গাছ বা মূলজাতীয় সবজি নিশ্চয়ই আছে, যা মাটির গভীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। পটাশ ও ফস্‌ফেট থেকে এমন সার উৎপাদন করা সম্ভব, যা সহজেই জলে ধুয়ে মাটির গভীরে গিয়ে জমা হবে।

পলিথিলিন অক্সাইড মিশ্রিত জলের অদ্ভুত প্রকৃতি

জল স্বভাবতঃই নিম্নগামী। ঊর্ধ্বগামী জলও যে হতে পারে—এক গ্লাস থেকে আর এক গ্লাসে ঐ জল একটু ঢালবার পর আপনা থেকেই যে অন্য গ্লাসে গিয়ে পড়তে পারে, তা সম্প্রতি জানা গেছে। তবে ঐ জল বিশুদ্ধ জল নয়। ঐ জলে বিশুদ্ধ জলের ভাগ থাকে শতকরা ৯৯.৫ থেকে ৯৯.৮ ভাগ। এতে ০.২ ভাগ থেকে ০.৫ ভাগ থাকে পলিথিলিন অক্সাইড। এই জিনিষটি রং, প্লাস্টার ও কাপড়চোপড়ে ব্যবহার করা হয়।

অতি অল্প পরিমাণে ঐ জিনিষটি জলে মেশানো হলে ঐ জলের একটি অদ্ভুত প্রকৃতি ও গুণ দেখা যায়। ঐ মিশ্রিত জল একটি পাত্র থেকে আর একটি পাত্রে ঢালবার সময় দেখা যায়, কিছুটা ঢালবার পর পাত্রটি খাড়াভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলেও প্রথম পাত্রটি শূন্য না হওয়া পর্যন্ত আপনা থেকেই ঐ জল দ্বিতীয় পাত্রে গিয়ে পড়ছে।

জাহাজ থেকে কোন মোটা দড়ি জাহাজের পাশে ফেলে দিলে যেমন হয়, এটি ঠিক তেমনি। এই দড়িটিকে ঠেলে না দিলেও আপনা থেকেই নীচের দিকে পড়তে থাকে। দড়ির ওজন আর তার নিজের গতিবেগ বা মোমেনটাম রয়েছে এর পিছনে। এখানেও পলিথিলিন অক্সাইড মিশ্রিত জল প্রথম যে পাত্রে ঢালা হলো, সেই পাত্রের জল বাকী জলটুকু টেনে নিয়ে আসবে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার পাসাডেনায় অবস্থিত ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলোজীর ২১ বছর বয়স্ক তরুণ কর্মী ডেভিড জেম্‌স্‌ একদিন পলিথিলিন অক্সাইড মিশ্রিত জল একটি পাত্র থেকে আর একটি পাত্রে ঢালছিলেন। ঢালা বন্ধ করতে চাইলেও তিনি দেখলেন যে, জলপ্রবাহ বন্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি পাত্রটিকে খাড়া করে রাখলেন। তারপর ঝাঁকুনি দিয়েও দেখলেন যে, ঐ প্রবাহ বন্ধ হচ্ছে না। তখন একটি গ্লাসে ভর্তি হবার পর কাঁচি দিয়ে কেটে সেই প্রবাহ বন্ধ করতে হলো। জেম্‌স্‌ এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন—এই পলিমার মিশ্রিত জলের অণুর গঠন বিশেষ রকম লম্বা ধরণের বলেই এই রকম হয়ে থাকে।

নতুন ধরণের আলোকচিত্র মুদ্রণ-যন্ত্র

নতুন ধরণের একটি বৃটিশ ফটোপ্রিন্টিং মেশিনে ঘণ্টায় ৭৫টি ছবি (৪০″×২১″ আয়তনের) ছাপা যাবে। এই মেশিনে সেমি-ড্রাই ডাইলিন প্রোসেসে (Semi-dry dyeline process) কাজ হয়।

স্থাপত্য, ইঞ্জিনীয়ারিং ও ডিজাইন অফিসের কাজের জন্যে বিশেষ করে এই মেশিন উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই যন্ত্রের আবৃত পেপার ডিসপেন্সার ৪০ ইঞ্চি প্রশস্ত ৫০ গজ পর্যন্ত কাগজ ধারণে সক্ষম। একটি রিভার্স কন্‌ট্রোলও এর সঙ্গে সংযুক্ত।

মূল ও নেগেটিভ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দেওয়া হয়। তারা একটি আলোকিত গ্লাস সিলিণ্ডারের সামনে পরস্পর সংলগ্ন থাকে। এক্সপোজারের পর দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে নেগেটিভকে ডেভেলপিং সেকশনের মধ্যে পুরে দেওয়া হয় এবং তা ব্যবহারযোগ্য হয়ে মেশিনের মাথায় উঠে আসে।

এই যন্ত্রের জন্যে ৮০ ওয়াটের ফ্লুরেসেন্ট ল্যাম্পের প্রয়োজন হয়—ভোল্ট ২০০।২৫০ এ-সি হওয়া চাই। পাঁচ অ্যাম্পিয়ারের মত কারেন্ট খরচ হয়।

ফ্লোজিষ্টনবাদ

শ্রীমৃণ্ময় সামন্ত

ষোড়শ শতাব্দীর কথা। অ্যালকেমিবিদ ও দার্শনিকেরা বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন। অ্যালকেমিবিদেরা বললেন, তিনটি মূল নীতির উপর বস্তুর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি হলো পারদ, এটি বস্তুর ধাতব ধর্মের কারণ। আর একটি গন্ধক, যার উপর বস্তুর বর্ণ নির্ভর করে। তৃতীয়টি লবণ, বস্তুর দ্রাব্যতা ও আরও অনেক ধর্ম এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল বললেন—মাটি, বায়ু, জল ও আগুন—এই চারটি পদার্থের সমন্বয়ে সকল বস্তু গঠিত। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা অ্যারিষ্টটলের মত সমর্থন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আকাশ হচ্ছে এমন একটি পদার্থ, যার মধ্যে উপরিউক্ত চারটি উপাদানই বর্তমান। মাটি, বায়ু, জল, আগুন ও আকাশ—এই পাঁচটিকে একত্রে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে পঞ্চভূত বলা হয়।

পদার্থের উপাদান সম্বন্ধে অ্যালকেমিবিদ ও দার্শনিকদের এই যে অভিমত, তা কিন্তু সবাই মেনে নিতে পারলেন না। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি রবার্ট বয়েল প্রকাশ্যভাবে এর বিরোধিতা করতে লাগলেন।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী জন বেকর আগুন সম্বন্ধে নিজস্ব এক অভিমত প্রচার করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিজ্ঞানী ষ্টাল এরই পরিবর্ধন করে বললেন, প্রত্যেক দাহ্যবস্তুর মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যার জন্যে সেটি জ্বলে ওঠে। এই বস্তুর নাম রাখা হলো ফ্লোজিষ্টন। গ্রীক ভাষায় ফ্লোক্স শব্দটির অর্থ অগ্নিশিখা, আর এথেকেই ফ্লোজিষ্টন (অগ্নি-উৎপাদক) শব্দটির উৎপত্তি। ফ্লোজিষ্টনের প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে কল্পনার উপর, স্বাভাবিক অবস্থায় এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। দহনের সময় এটি অগ্নিশিখার আকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং এই ছদ্মবেশেই পদার্থ থেকে বেরিয়ে যায়। দাহ্যবস্তুকে দহন করলে যে অংশ পড়ে থাকে, তাকে বস্তুভস্ম বলে। বস্তুকে নিঃসন্দেহে ফ্লোজিষ্টনতত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুভস্ম ও ফ্লোজিষ্টনের যোগ বলা যায়; অর্থাৎ

বস্তু = বস্তুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন।

ফ্লোজিষ্টনের পরিমাণ সকল বস্তুতে সমান নয়। কয়লা, তেল ইত্যাদি বস্তুর মধ্যে এর পরিমাণ খুব বেশী। আবার ধাতব পদার্থের মধ্যে এর পরিমাণ খুবই কম। কম ফ্লোজিষ্টনবিশিষ্ট যে কোন বস্তু বেশী ফ্লোজিষ্টনবিশিষ্ট অন্য বস্তু থেকে ফ্লোজিষ্টন গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং ফ্লোজিষ্টনবাদ অনুসারে ফ্লোজিষ্টনবিহীন ধাতুভস্মকে দাহ্যবস্তুর সঙ্গে দহন করলে আবার ধাতু ফিরে পাওয়া সম্ভব।

দাহ্যবস্তু = বস্তুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন

ধাতুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন = ধাতু

বিজ্ঞানী শীলি সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, বায়ু দুটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত—ফায়ার বায়ু ও ফাউল বায়ু। গ্যাস জারের মধ্যে সীসাভস্ম পুড়িয়ে তিনি ফায়ার বায়ু পান। তিনি লক্ষ্য করেন, ফায়ার বায়ুর মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে বেশ আরাম লাগে। আরও লক্ষ্য করবার বিষয়, একটি মোমবাতিকে যদি জারের মধ্যে রাখা হয় তাহলে তা উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে। আরও একটি পরীক্ষায় শীলি একটি বায়ুপূর্ণ একমুখ খোলা কাচের জারে লোহা নিয়ে জারটিকে উপুড় করে একটি জলের পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েক দিন পরে

দেখা গেল, জারের এক-পঞ্চমাংশ বায়ুশূন্য হয়ে জলে ভরে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, জারের মধ্যে অবশিষ্ট বায়ুর ধর্ম ঠিক ফায়ার বায়ুর বিপরীত অর্থাৎ তাহা পুরাপুরি শ্বাসকার্য ও দহনকার্যের অসহায়ক। এই বায়ুই শীলির ফাউল বায়ু [শীলির ফায়ার বায়ু বর্তমানের অক্সিজেন ও ফাউল বায়ু বর্তমানের নাইট্রোজেন]।

বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিষ্টলি শীলির অনুরূপ ফল পান। তিনি যখন বায়ু সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেছেন, তখন বায়ুকে সোনা বা পারদের মত মৌলিক পদার্থ মনে করা হতো। ড্যানিয়েল রাদারফোর্ড এই সময় প্রমাণ করেন যে, বায়ু দুটি উপাদানে তৈরি। প্রথমটি বর্তমানের কার্বন ডাইঅক্সাইড—চুনের জলের সাহায্যে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। আর একটি বর্তমানের নাইট্রোজেন—শ্বাসকার্যের পর পরিত্যক্ত বায়ুকে কার্বন ডাইঅক্সাইড মুক্ত করলে এটা পাওয়া যায়। প্রিষ্টলি এসব পরীক্ষার কথা জানতেন। তিনি কিছু সীসাকে বাতাসে উত্তপ্ত করে সীসাভস্মে পরিণত করলেন। তারপর একটি বড় লেন্সের সাহায্যে সূর্যকিরণ কেন্দ্রীভূত করে বেল জারের মধ্যে রাখা সীসাভস্মে তাপ দিলেন। উৎপন্ন গ্যাসকে বোতলের মধ্যে পারদের উপর সংগ্রহ করা হলো। পারদের লাল রঙের অক্সাইড থেকেও তিনি একইভাবে গ্যাস সংগ্রহ করেন। প্রিষ্টলি দেখলেন, দুটি গ্যাসই অভিন্ন এবং উভয়েই দহনক্রিয়ার সহায়ক।

এর পর প্রিষ্টলি দুটি অনুরূপ গ্যাস জারের মধ্যে একটিতে তাঁর সৃষ্ট গ্যাস ও অপরটিতে সাধারণ বায়ু নিলেন। দুটি গ্যাস জারের মধ্যেই দুটি পোষা ইঁদুর রাখা হলো। পনেরো মিনিটের মধ্যে সাধারণ বায়ুতে রাখা ইঁদুরটি মারা গেল, অপর ইঁদুরটি তখনও উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরও পনেরো মিনিট পরে দ্বিতীয় ইঁদুরটি মারা যায়। প্রিষ্টলি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, তাঁর তৈরি গ্যাস (বর্তমানের অক্সিজেন) শ্বাসকার্যের জন্যে অপরিহার্য।

শীলি ও প্রিষ্টলি উভয়েই ছিলেন ফ্লোজিষ্টন তত্ত্বের সমর্থক। দুজনই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন অক্সিজেন ফ্লোজিষ্টনবিহীন গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং দহনক্রিয়ার সময় এটা দাহ্যবস্তুর ফ্লোজিষ্টন দ্রুত গ্রহণ করে; ফলে বস্তু অধিকতর ঔজ্জ্বল্যে জ্বলে ওঠে।

প্রিষ্টলির ধারণা ছিল যে, দহনের ফলে যে ফ্লোজিষ্টন প্রতিনিয়ত পরিত্যক্ত হচ্ছে, গাছ সে সব গ্রহণ করছে—ফলে বায়ু দূষিত হতে পারছে না। তিনি প্রমাণ করে দেখান, গাছ দিনের বেলায় অক্সিজেন ত্যাগ করে। পরবর্তী কালে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ইনজেন হাউস প্রমাণ করেন, দিনের বেলায় গাছ যে অক্সিজেন ত্যাগ করে, তার পরিমাণ সূর্যকিরণের প্রখরতার উপর নির্ভরশীল।

ষোড়শ শতাব্দীতে সুইস চিকিৎসক প্যারাসেলসাস দেখান যে, সালফিউরিক অ্যাসিডে লোহার গুঁড়া দিলে একরকম গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস দাহ্য ও বর্তমানের হাইড্রোজেন। বিজ্ঞানী হেলমন্টও একই ফল পান। কিন্তু তাঁরা দু'জন আর বেশী দূর এগোন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্যাভেণ্ডিস দেখান—দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়।

প্রিষ্টলি ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষার কথা জানতেন। তিনি বললেন, হাইড্রোজেন এমন একটি পদার্থ, যার মধ্যে প্রচুর ফ্লোজিষ্টন আছে। ক্যাভেণ্ডিসও ফ্লোজিষ্টন তত্ত্বের প্রভাবের বাইরে ছিলেন না। তাঁর মতে, হাইড্রোজেন হলো ফ্লোজিষ্টনপূর্ণ জল আর অক্সিজেন ফ্লোজিষ্টনহীন জল। অর্থাৎ

হাইড্রোজেন = জল + ফ্লোজিষ্টন
অক্সিজেন = জল − ফ্লোজিষ্টন
অর্থাৎ হাইড্রোজেন + অক্সিজেন = জল

বিজ্ঞানের উপর ফ্লোজিষ্টনের একাধিপত্য যখন প্রায় দেড়-শ' বছরের মত, তখন ল্যাভয়সিয়ার তাঁর গবেষণা সুরু করেছেন। তুলাদণ্ডের সাহায্যে তিনি ওজন করে দেখালেন, বস্তু অপেক্ষা বস্তুভস্মের ওজন বেশী। কিন্তু ফ্লোজিষ্টন তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তু থেকে বস্তুভস্মের ওজন কম হবার কথা। কারণ

বস্তু = বস্তুভস্ম + ফ্লোজিষ্টন

ল্যাভয়সিয়ারের পরীক্ষার বিষয়বস্তু নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :—

ধরা যাক 'ক' গ্র্যাম পারদকে 'প' গ্র্যাম বায়ুর মধ্যে রাখা হলো। একটা বড় লেন্সের সাহায্যে পারদে তাপ দেওয়া হলো। উৎপন্ন পারদভস্মের ওজন যদি 'খ' গ্র্যাম হয় ও অবশিষ্ট বায়ুর ওজন যদি 'ফ' গ্র্যাম হয়, তবে দেখা গেল

খ—ক = প—ফ

অর্থাৎ পারদভস্মের ওজন পারদ থেকে যতটা বাড়লো, বায়ুর ওজন ততটা কমলো। পাত্রে অবশিষ্ট 'ফ' গ্র্যাম বায়ু দহনক্রিয়া ও শ্বাসকার্যে সহায়তা করে না। এইবার পারদভস্ম আলাদা করে লেন্সের সাহায্যে তাপ দিলে আবার পারদ ও বায়ু উৎপন্ন হবে। ওজন করে দেখা গেল, ফেরৎ পাওয়া পারদ ও বায়ুর ওজন যথাক্রমে 'ক' ও (প—ফ) গ্র্যাম। ফেরৎ পাওয়া বায়ু শ্বাসকার্য ও দহনক্রিয়ার সহায়ক।

এথেকেই প্রমাণ পাওয়া গেল, বায়ুর মধ্যে দুটি উপাদান বর্তমান,

(১) অক্সিজেন—শ্বাসকার্য ও দহনকার্যের সহায়ক।

(২) নাইট্রোজেন—শ্বাসকার্য ও দহনকার্যের অসহায়ক।

দহন আসলে পদার্থের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন ও এর ফলে যে বস্তুভস্ম উৎপন্ন হয়, তা ধাতুর অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা সম্বন্ধে ল্যাভয়সিয়ার বললেন, ফ্লোজিষ্টনপূর্ণ জল হলো হাইড্রোজেন আর ফ্লোজিষ্টনবিহীন জল হলো অক্সিজেন। হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলনের ফলে জল উৎপন্ন হয়।

এতদিন ধরে জানা ছিল, এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে ফ্লোজিষ্টনের জায়গা বদলের ফলে আগুনের সৃষ্টি হয়। ল্যাভয়সিয়ারই প্রথম ফ্লোজিষ্টনের আধিপত্য অস্বীকার করেন ও নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে দেন যে, রসায়ন-বিজ্ঞানে ফ্লোজিষ্টনের কোন স্থান থাকতে পারে না।*

[প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত ১০ই মার্চ (১৯৬১) এই প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। আলোচনার ভিত্তিতে প্রবন্ধটি পরিমার্জিত করে প্রকাশ করা হলো। স]

ডাঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের ডিরেক্টর বিখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ ডাঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও এই বৎসর রয়েল সোসাইটির (লণ্ডন) ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। এই বৎসর তিনিই একমাত্র ভারতীয়, যিনি এই সম্মানে ভূষিত হইলেন।

ডাঃ রাও ১৯২০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর হাদাগলিতে (দঃ ভাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পরিসংখ্যানে প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন।

১৯৪১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে তিনি ডেপুটেশনে কেম্ব্রিজের ডাকওয়ার্থ লেবরেটরিতে প্রেরিত হন—গেবেল ময়ার (আফ্রিকা) প্রাচীন অধিবাসীদের উৎপত্তি সম্পর্কিত অ্যানথ্রোপোমেট্রিক প্রোজেক্ট সম্পর্কে গবেষণার জন্য।

এই প্রোজেক্টে গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধ রচনা করিয়া তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তী কালে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণার জন্য তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সিনিয়র ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন।

ডাঃ রাও ১৯৬৫ সালে লণ্ডনের রয়েল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটির গাই রৌপ্যপদক লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইন্টারন্যাশন্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সেস-এর ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮ সালে ইউ.এস.এ-র ইনষ্টিটিউট অব ম্যাথেমেটিক্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্স-এর ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৫৭ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিক্যাল কনফারেন্সের ষ্ট্যাটিষ্টিক্স এবং ডেমোগ্রাফি শাখায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৯৬০ সালের অধিবেশনে পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি ছিলেন ইন্টারন্যাশন্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের তিনি কোষাধ্যক্ষ (১৯৬২-১৯৬৫) ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন।

১৯৫৩-'৫৪ সালে ডাঃ রাও ইউ. এস. এ-র ইলিনয়েস বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাথেম্যাটিক্যাল ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ভিজিটিং রিসার্চ প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৩-'৬৪ সালে তিনি ইউ. এস এ-র ষ্ট্যাণ্ডফোর্ড এবং বাল্টিমোরের জন্স হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ষ্ট্যাটিষ্টিক্সের ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে যান এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও রয়েল ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন। তিনি টৌকিও এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও বক্তৃতা প্রদান করেন। ডাঃ রাও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত পরিসংখ্যান সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন।

তিনি পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রায় ১০৩টি গবেষণা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি 'Advanced Statistical Methods in Biometric Research' এবং 'Linear Statistical Inference and its Applications' নামক দুইখানি পুস্তক লিখিয়াছেন এবং ইহা ছাড়া তিনখানি পুস্তকের তিনি যুগ্ম-লেখক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

ডাঃ সি. রাধাকৃষ্ণ রাও এফ. আর. এস.

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউটের রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং স্কুলের ডিরেক্টর ডাঃ সি, রাধাকৃষ্ণ রাও এই বৎসর রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

করে দেখ

পয়সার নৃত্য

সোডাওয়াটার, সরবৎ বা জলভর্তি বোতল রেফ্রিজারেটরে রেখে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয়। ঠাণ্ডা-করা এক বোতল জল গ্লাসে ঢেলে নেবার পর খালি বোতলটা বেশ কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা থাকে। খালি বোতলটাকে টেবিলের উপর রেখে তার খোলা মুখের উপর আঙুল দিয়ে দু-এক ফোঁটা জল লাগিয়ে দাও। এবার বোতলটার জল-লাগানো মুখের উপর একটা তামার পয়সা (পয়সা না পেলে ঐ রকমের একটা তামা বা পিতলের চাক্তি হলেও চলবে) বসিয়ে দাও। পয়সাটা জলের সঙ্গে বোতলের মুখে এমনভাবে লেগে যাবে যে, কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না।
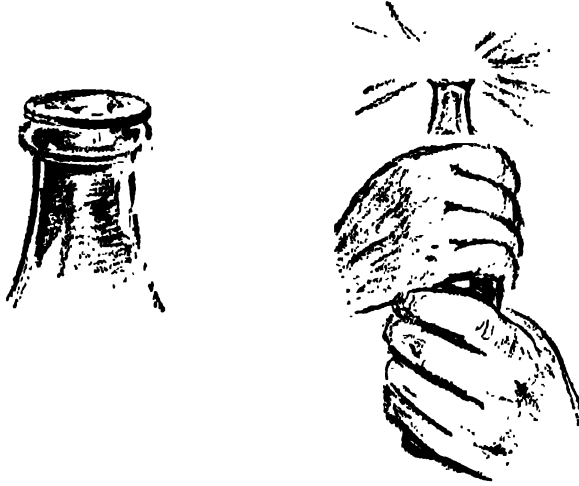
এবার দু-হাত দিয়ে বোতলটাকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে থাক। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবে—পয়সাটা একটু একটু ওঠা-নামা করছে এবং তার ফলে খুট্‌খুট্‌ শব্দ হচ্ছে। এবার তোমার হাত সরিয়ে নিলেও দেখবে—তখনও পয়সাটার শব্দ সমানভাবেই চলছে। কেন এমন হয়, সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। গরম দিলে বাতাস যে প্রসারিত হয়, এটা তারই একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত। বোতলের মধ্যে যে ঠাণ্ডা বাতাস ছিল, হাতের গরমে সেটা প্রসারিত হয়ে বেরিয়ে যাবার দরুণই পয়সাটা ওঠা-নামা করে থাকে।

ক্ষুদে মাছি—ড্রসোফিলা

জীববিজ্ঞানের যে সমস্ত যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়েছে তার সবগুলিই নিম্নস্তরের প্রাণীদের উপর গবেষণালব্ধ ফল। ঐ সমস্ত আবিষ্কারের ফল পরে উন্নত স্তরের প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। আজ তোমাদের কাছে একটি ক্ষুদে-মাছির কথা বলবো—যে মাছি দু-দু'বার নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে মাছিটিকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বলা চলে না। বিজ্ঞানীরা উক্ত মাছির উপর গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁদের পুরস্কারের মূলে আছে এই মাছির অবদান।

যে মাছিটির কথা বলছি, সেটি কিন্তু আমাদের ঘরের সাধারণ মাছির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং আকারেও খুব ছোট। তোমরা সকলেই হয়তো এই মাছিকে দেখেছ। কলা, আঙ্গুর ইত্যাদি যে কোন ফল খোসা ছাড়িয়ে রেখে দিলে দেখবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এক রকম ক্ষুদে মাছি এসে সেখানে ভীড় করেছে। এগুলিই আমাদের আলোচ্য মাছি। এই মাছিগুলি এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া এদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যায় না। ফলের লোভে আসে বলে এদের ফল-মাছি (Fruit fly) বলা হয়। প্রাণী-বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিয়েছেন ড্রসোফিলা (Drosophila)। ড্রসোফিলার অনেকগুলি প্রজাতি আছে—আমরা এখানে ড্রসোফিলা মেলানোগেষ্টার (Drosophila melanogestar) প্রজাতির কথা বলবো। যে কোন জীবের দুটি বৈজ্ঞানিক নাম থাকে। একটি হলো গণের নাম (Generic name) এবং আর একটি হলো প্রজাতির নাম (Specific name)। মানুষেরও বৈজ্ঞানিক নাম দুটি—হোমো স্যাপিয়েন্স (Homo sapiens)। প্রথমটি হলো গণের নাম এবং দ্বিতীয়টি প্রজাতির নাম। যাহোক, এবারে ড্রসোফিলা নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

প্রাণী-জগতে ড্রসোফিলার স্থান

নিম্নস্তরের প্রাণী মাত্রেই অমেরুদণ্ডী অর্থাৎ আমাদের মত এদের মেরুদণ্ড নেই। সুতরাং ড্রসোফিলাও নিঃসন্দেহে অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রত্যেক প্রাণীই কোন না কোন পর্বের অন্তর্গত এবং প্রত্যেক পর্বেরই শ্রেণী থাকে। আবার শ্রেণীর অন্তর্গত বর্গ এবং বর্গের অন্তর্গত গোত্র থাকে। প্রত্যেক গোত্রের আবার গণ এবং প্রজাতি থাকে। প্রাণিবিদ্যানুযায়ী ড্রসোফিলার শ্রেণী বিভাগ এরূপ—

পর্ব — সন্ধিপদ

শ্রেণী — পতঙ্গ

বর্গ	—	দ্বিপক্ষবিশিষ্ট পতঙ্গ
গোত্র	—	ড্রসোফিলিডি
গণ	—	ড্রসোফিলা
প্রজাতি	—	মেলানোগেষ্টার

ড্রসোফিলা হলো সন্ধিপদ বর্গের অন্তর্গত; কারণ সন্ধিপদের নিম্নোক্ত লক্ষণগুলি আছে—

(১) ড্রসোফিলার শরীর কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত,

(২) প্রত্যেক খণ্ডের পা বা উপাঙ্গগুলি জোড়া লাগানো বা সন্ধিযুক্ত,

(৩) এদের শরীর বহিঃকঙ্কালের দ্বারা আবৃত,

(৪) এদের মাথায় পুঞ্জাক্ষি আছে।

ড্রসোফিলা কীট-পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত; কারণ আরশোলা, গঙ্গাফড়িং, পিঁপড়ে ইত্যাদি পতঙ্গের মত এদের শরীর মস্তক, বক্ষ এবং উদর—এই তিনভাগে বিভক্ত। তাছাড়া এদের তিন জোড়া পা এবং একজোড়া শুঁড় আছে। দুটি ডানা আছে বলে ড্রসোফিলা দ্বিপক্ষ বর্গের অন্তর্গত।

গবেষণা-কার্যে ড্রসোফিলার অবদান—প্রজননবিদ্যা হলো জীববিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। পিতামাতার গুণাবলী সন্তান-সন্ততিতে বংশানুক্রমে কিভাবে সঞ্চারিত হয়, প্রজননবিদ্যার সাহায্যে তা জানা যায়। ড্রসোফিলার উপর গবেষণা করে প্রজনন-বিদ্যার অনেকগুলি মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ড্রসোফিলা সমস্ত জীববিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিজ্ঞানীরা এদের গবেষণার উপযোগী আদর্শ প্রাণী বলে মনে করেন।

এবারে কতকগুলি মূল্যবান আবিষ্কারের কথা আলোচনা করছি—যেগুলি ড্রসোফিলার উপর গবেষণালব্ধ ফল।

(১) টি. এইচ. মর্গ্যান সর্বপ্রথম ড্রসোফিলা নিয়ে গবেষণা স্থুরু করেন এবং 'জিন' থিওরীর প্রতিষ্ঠা করেন, যার জন্যে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যে আণুবীক্ষণিক সূত্রবৎ পদার্থ থাকে, তার নাম ক্রমোসোম। এই ক্রমোসোমকে বংশানুক্রমের বাহক বলা হয়। মর্গ্যানের আবিষ্কার থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক ক্রমোসোমের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম বিন্দু বিন্দু পদার্থ আছে—তার নাম জিন।

(২) সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে হবে, সেটা নির্ভর করে ক্রমোসোমের উপর। ক্রমোসোমের সাহায্যে লিঙ্গ নির্ধারণের এই প্রক্রিয়া ড্রসোফিলাতেই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।

(৩) কতকগুলি রোগ, যেমন—রাতকানা, বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া (Haemo-

philia—যার জন্যে রক্তের জমাট বাঁধবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়; ফলে কোন ক্ষতস্থান থেকে অবিরত রক্তক্ষরণ হতে থাকে) ইত্যাদি রোগ বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। এই বংশগত রোগ যৌন ক্রমোসোমের সাহায্যে এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয়। এই ধরণের বংশানুক্রমের প্রক্রিয়াও ড্রসোফিলাতেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়।

(৪) পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণকালীন যে বিকিরণ ঘটে, তার ফলে ক্রমোসোমের সারিবদ্ধ জিনে পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তিত জিন বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়ে নানারকম রোগ ও মহামারীর সৃষ্টি করে। কৃত্রিম উপায়ে এই যে জিনের পরিবর্তন, তা সর্বপ্রথম ড্রসোফিলাতেই আবিষ্কৃত হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী এইচ. জে. মূলার এক্স-রে'র সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে ড্রসোফিলার জিন পরিবর্তনে সাফল্য লাভ করেন। এই মূল্যবান আবিষ্কারের জন্যে তিনি ১৯৪৭ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সুতরাং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, সামান্য একটি ক্ষুদে মাছি—তাথেকে কত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে।

শুভ্রা দেবনাথ

টাইটানিয়াম

সভ্যজগতের কর্মচাঞ্চল্য যে শুধু লৌহশিল্পের প্রসার ও প্রাধান্যেই বিস্তার লাভ করেছে, একথা আজকে বোধ হয় তোমাদের আর নতুন করে বলতে হবে না। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেই লৌহের ব্যবহার অপরিহার্য। এক কথায়—লৌহ ও ইস্পাত বর্তমান যন্ত্রযুগের ভিত্তিস্বরূপ। কিন্তু যে হারে লৌহের ব্যবহার হচ্ছে—তাতে আগামী শ'খানেক বছরের মধ্যেই ভাঁড়ার ফুরিয়ে যাবার দিন এলো বলে। কাজেই এখন থেকেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে সুরু করেছেন। ভাববারই কথা—কেন না, পৃথিবীর লৌহভাণ্ডার শেষ হলে তো সভ্যজগতের প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং বিজ্ঞানীরা ভাবছেন—কি করে লৌহভাণ্ডার শেষ হবার পূর্বে লৌহের ন্যায় আর একটি শক্তিশালী ধাতু আবিষ্কার করা যায়।

ভেবে ভেবে তাঁরা একটি ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন, অর্থাৎ লোহার বদ্‌লি খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা—এই পৃথিবীর মাটিতেই। মাটির প্রতিটি স্তরে এই শক্তিশালী ধাতু লুকিয়ে আছে। লোহার শেষ কণাটুকু শেষ হলেও কলকারখানাকে

সচল রাখতে। এই ধাতু দিয়ে আমরা কাজ চালিয়ে যেতে পারবো। আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।

এই শক্তিশালী ধাতুটির নাম টাইটানিয়াম। এই ধাতুটি ইস্পাতের চেয়ে দ্বিগুণ শক্ত অথচ মজাটা কি জান? ইস্পাতের চেয়ে এই ধাতু অনেক বেশী হাল্কা। ফলে ইস্পাতের চেয়েও এর সম্ভাবনা বেশী। ভারী বা হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং নানান যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থেকে সুরু করে এরোপ্লেন, গ্যাস টারবাইন, রকেট ও অন্যান্য মহাকাশ যান ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যাবে একদিন। এর আর একটি সুবিধা হলো—এই তেজী ধাতুটি অন্যান্য ধাতুর চেয়ে ক্ষয় পায় খুব ধীর ধীরে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু, যেমন—লোহা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির গড় আয়ু সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। কিন্তু টাইটানিয়ামের গড় আয়ু যদি জানতে চাও, তাহলে বলবো—একে অমর-অক্ষয়ও বলা যেতে পারে। অ্যাসিড, অ্যালক্যালি কিংবা লবণের সাধ্য নেই এর কোন ক্ষতি করে। সমুদ্রের তলায় হাজার হাজার বছর ফেলে রাখলেও এর গায়ে মরচে পড়বার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এমন কি, অ্যাকোয়া রিজিয়া অর্থাৎ ঘন হাইড্রোক্লোরিক ও নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণ—যার কাছে সোনা, রূপা, প্লাটিনাম পর্যন্ত গলে জল হয়ে যায়—টাইটানিয়ামকে কাবু করতে পারে না। শুধু তাই নয়—এর তাপ সইবার ক্ষমতাও অসাধারণ। এর গলনাঙ্ক (Melting point) ১৭২৫° সেন্টিগ্রেড, ইস্পাতের চেয়ে ২০০° ডিগ্রি বেশী।

১৭৯০ সালে প্রথম টাইটানিয়াম অক্সাইডকে খনিজ পদার্থ থেকে আলাদা করা হয়। এর পরেও ১২০ বছর সময় লেগেছে এই ধাতুটিকে আলাদা করে পেতে। ধাতুশিল্পে এর ব্যবহার হয়েছে এই মাত্র সেদিন; অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে। তারপর থেকে এর প্রয়োগ দিন দিনই বেড়ে চলেছে—বেড়ে চলেছে হাল্কা ও ভারী যন্ত্রশিল্পে। ১৯৪৮ সালে যেখানে মাত্র ১০ টন টাইটানিয়াম নিষ্কাশিত হয়েছিল, ১৯৫৪ সালে সেখানে হয়েছে ৭২০০ টন। আর ১৯৫৫ সালে হয়েছে ২০,০০০ টন। তাহলেই বুঝতে পারছো, কি বিরাট ভবিষ্যৎ নিয়ে এগিয়ে আসছে এই টাইটানিয়াম। একদিন আসবে যেদিন সত্য সত্যই লৌহভাণ্ডার শেষ হয়ে যাবে, সেদিন তার স্থান দখল করবে টাইটানিয়াম।

সুনীল সরকার

লুইগি গ্যালভ্যানি

লুইগি গ্যালভ্যানির নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। চল-বিদ্যুতের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর গবেষণার ফল থেকেই চল-বিদ্যুতের সূত্রপাত হয়। গ্যালভ্যানি ১৭৩৭ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ইটালীর বলোনায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি যাজক হবেন। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্যে তিনি প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে রাজী করান। ডাক্তারী ডিগ্রি লাভের পর অচিরেই তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় সুনাম অর্জন করেন। বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজে ডাঃ লুইগি গ্যালভ্যানি অ্যানাটমির অধ্যাপনা করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিকিৎসা-ব্যবসায়ও সুরু করেন।

তিনি পাখার অস্থিসংস্থান সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য কাজও করেন এবং পাখীর শ্রবণ-যন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা প্রশংসা অর্জন করে। গবেষণাগারে তাঁকে সাহায্য করতেন তাঁর স্ত্রী লুসি গ্যালিয়াজি ও তাঁর ছাত্রগণ। তাঁর গবেষণাগারে একটি বিদ্যুৎউৎপাদক যন্ত্র ছিল। মানুষ ও প্রাণিদেহে বৈদ্যুতিক শক্-এর প্রভাব অনুশীলনের জন্যে এই যন্ত্রটি ব্যবহৃত হতো। তখন অনেক চিকিৎসকই বিশ্বাস করতেন, বিদ্যুতের সাহায্যে মানুষের কোন কোন ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভব। ডাঃ গ্যালভ্যানিও বিশ্বাস করতেন—বৈদ্যুতিক শক্ প্রয়োগে মানুষের কয়েক ধরণের স্নায়ু-বৈকল্য (Nervous disorder) নিরাময় করা যায়। তাঁর বিশ্বাসের সত্যতা নিরূপণের জন্যে তিনি নানাবিধ পরীক্ষাও করেন।

এক আকস্মিক ঘটনায় ডাঃ গ্যালভ্যানির যুগান্তকারী আবিষ্কারের সূচনা হয়। দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী হৃদ্‌রোগে ভুগে শরীর সবল রাখবার জন্যে রোজ তাঁকে ব্যাঙের মাংসের সুপ খেতে হতো এবং ডাঃ গ্যালভ্যানি প্রতিদিন নিজে সুপ তৈরি করতেন।

একদিন সকালে তাঁর গবেষণাগারে টেবিলের উপর কয়েকটি চামড়া ছাড়ানো ব্যাং পড়েছিল। কাছে ছিল বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র এবং একটা সরু ছুরি। ছুরিটি একটি মৃত ব্যাঙের উপর পড়ে ছিল। ডাঃ গ্যালভানি বেরিয়ে যাবার পর তাঁর স্ত্রী কোন কাজে গবেষণাগারে ঢুকে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন, টেবিলের উপর রক্ষিত মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংটি স্পন্দিত হচ্ছে।

তিনি ছুটে গিয়ে ডাঃ গ্যালভ্যানিকে ঘটনাটা বলেন। কেন এমন হয়, তার কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎই এর জন্যে দায়ী। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বন্ধ রেখে ছুরি দিয়ে ব্যাঙের স্নায়ু স্পর্শ করে দেখা গেল

পেশীর স্পন্দন আর হয় না। পুনরায় যন্ত্রটি চালু করতেই পেশীট স্পন্দিত হতে লাগলো। বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র থেকে উৎপন্ন বৈদ্যুৎ ছুরির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মৃত ব্যাঙের স্নায়ুর উপর কাজ করছিল। এই সব ঘটনা দেখে ডাঃ গ্যালভ্যানির মনে প্রশ্ন জাগে, বজ্রপাতের সময়েও তো মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং ঠিক এভাবেই স্পন্দিত হতে পারে।

সব কাজ ছেড়ে ডাঃ গ্যালভ্যানি বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণায় মন দিলেন। তাঁর মনে আরও প্রশ্ন জাগে—জীবন ও বিদ্যুতের মধ্যে সম্পর্ক কি? বিদ্যুৎ কি জীবনের প্রকাশক? দিনের পর দিন তিনি এই সব প্রশ্নের সমাধান করবার জন্যে নানা পরীক্ষা রকম করতে থাকেন।

আকাশের বিদ্যুতে মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং স্পন্দিত হয় কিনা, দেখবার জন্যে পরীক্ষার প্রস্তুতি চললো। কিন্তু আকাশের বিদ্যুতের জন্যে ঝড় ও বজ্রপাতের প্রয়োজন, আর তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। অবশেষে ধাতব দণ্ড ও তারের সাহায্যে তিনি আকাশের বিদ্যুৎকে পরীক্ষাগারে আনতে সক্ষম হন। দেখা গেল—ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রে যে স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তা যেমন মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংকে স্পন্দিত করে, আকাশের বিদ্যুৎও ঠিক তেমনি মৃত ব্যাঙের ঠ্যাংকে স্পন্দিত করে। কয়েক বার তিনি পরীক্ষাটা করে দেখেন। আকাশ থেকে লিডেন জারে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে তা মৃত ব্যাঙের ঠ্যাঙের মধ্য দিয়ে মোক্ষণ করে দেখা গেল—ব্যাঙের ঠ্যাং স্পন্দিত হয়। নানাভাবে পরীক্ষা চলতে থাকে। সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেন নি। ১৭৮৬ সালের অক্টোবর মাসে একদিন তিনি একটা মৃত ব্যাঙের ঠ্যাং তামার তারের আংটায় গেঁথে বারান্দায় লোহার রেলিংয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো, বাতাসে দোল খেয়ে যতবার ব্যাংটা লোহার রেলিং স্পর্শ করছে, ততবারই তার মাংসপেশী স্পন্দিত হচ্ছে। মনে হলো যেন মৃত ব্যাঙের দেহে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। ডাঃ গ্যালভ্যানি অবাক হয়ে গেলেন। সব রকম আবহাওয়ায় যে কোন সময়ে তিনি এই অদ্ভুত ঘটনা লক্ষ্য করেন। ব্যাং নিয়ে এই অদ্ভুত পরীক্ষায় মেতে থাকতেন বলে লোকে তাঁকে উপহাস করে ব্যাং-নাচানো অধ্যাপক বলতো।

এসব গবেষণা থেকে ডাঃ গ্যালভ্যানির বিশ্বাস হলো—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরে প্রকৃতি-দত্ত বিদ্যুৎ আছে। এই বিদ্যুৎ মস্তিষ্ক থেকে স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে সারা দেহে পরিব্যাপ্ত হয়; আর মাংসপেশী হচ্ছে এই বিদ্যুতের ভাণ্ডার। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস যে ঠিক নয়, তা পরে প্রমাণিত হয়েছে। প্রাণীদের শরীরে বিদ্যুৎ থাকে না। তামার আংটা ও লোহার রেলিং-এর সংযোগে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ

ডাঃ গ্যালভ্যানি আর্দ্র মৃত ব্যাং, তামা ও লোহার সমবায়ে একটি সেকেলে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সৃষ্টি করেছিলেন বলা যায়। ব্যাঙের ঠ্যাঙের স্পন্দন থেকে বোঝা যেত বিদ্যুৎ-সঞ্চালন সুরু হয়েছে। এর পূর্বে বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রদর্শনের অন্য কোন সহজ উপায় ছিল না, ডাঃ গ্যালভ্যানি দেখলেন ব্যাঙের ঠ্যাং সেই কাজ করে। তাঁর বিশ্বাস ঠিক না হলেও এই যুগান্তকারী গবেষণা বিদ্যুতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে। এই বিদ্যুতের সহায়তায়ই মানবসভ্যতার দ্রুত উন্নতি সাধিত হতে থাকে। এই পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যুৎ বলতে বোঝাতো স্থির-বিদ্যুৎ এবং ঘর্ষণের দ্বারা এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হতো।

১৭৯১ সালে ডাঃ গ্যালভ্যানি তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু অবলম্বনে "Commentary on the Forces of Electricity in Muscular Motion" নামক মনোগ্রাফ প্রকাশ করেন।

ডাঃ গ্যালভ্যানির গবেষণায় দেখা গেল—বস্তুর নানা রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সহজে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। এভাবে শক্তির এক নতুন উৎস আবিষ্কৃত হয়।

১৭৯৭ সালে নেপোলিয়ন ইটালী অধিকার করবার পর ডাঃ গ্যালভ্যানিকে রাজানুগত্যের শপথ নিতে বলা হয়। কিন্তু তিনি আনুগত্যের শপথ গ্রহণে অস্বীকৃত হন। ফলে তাঁর অধ্যাপনার কাজ চলে যায়। অভাব-অনটনে তিনি সাংঘাতিক কষ্ট ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু পরে তাঁকে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয় এবং রাজকীয় ঘোষণায় বলা হয় যে, তাঁর আনুগত্যের শপথ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে তাঁর স্ত্রী মারা যান। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে ডাঃ গ্যালভ্যানির শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। ফলিডল কি? মানুষ ও জীবজন্তু ইহা খেয়ে মরে কেন?

সৌমেন্দ্রনাথ সরকার

প্রঃ ২। (ক) ডপ্‌লার এফেক্ট কি?

(খ) মোসবাওয়ার এফেক্ট কি?

(গ) জোডিয়াক্যাল লাইট কি?

(ঘ) শরীরে প্রোটিন আধিক্যের ফল কি?

(ঙ) ধূমকেতুর লেজ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই।

মদনমোহন মুখোপাধ্যায়

উঃ ১। নানারূপ কীট-পতঙ্গ খাদ্যশস্যের গাছ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গাছপালা খেয়ে নষ্ট করে। সময়মত এদের বিনষ্ট না করলে প্রচুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ফলিডল হচ্ছে এক ধরণের কীটঘ্ন পদার্থ। গাছের উপর এই পদার্থটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এগুলি অতি তীব্র বিষ। তাই মানুষ বা জীবজন্তু, পশুপক্ষী যে কেউ খাক না কেন, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তবে মাস খানেক পরে ঐসব গাছপালা খেলে কারো কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই।

উঃ ২। (ক) রেল লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে দূর থেকে একটা ইঞ্জিন যদি বাঁশী বাজাতে বাজাতে আসতে থাকে, তবে ঐ বাঁশীর শব্দটা একটু লক্ষ্য করলেই একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়—ইঞ্জিনটা যত কাছে আসছে, শব্দ ততই কর্কশতর হচ্ছে। যেই ইঞ্জিন সামনে দিয়ে চলে গেল, বাঁশীর শব্দও একেবারে ধপ্‌ করে নেমে গেল। এরপর ইঞ্জিন যত দূরে চলে যাচ্ছে, শব্দের কর্কশতাও ততই কমে আসছে। এখন শব্দের কর্কশতা নির্ভর করে তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার উপর। কম্পন-সংখ্যা যত বেশী, শব্দের কর্কশতা ততই তীব্র। কাজেই সাধারণভাবে বলা যায়, যদি তরঙ্গ-বিকিরণকারী কোন উৎস ও দর্শকের (আলোকের ক্ষেত্রে) বা শ্রোতার (শব্দের ক্ষেত্রে) মধ্যে কোন আপেক্ষিক গতি থাকে, তবে উৎস যত নিকটে আসে, বিকিরিত তরঙ্গের সংখ্যা তত বেড়ে যায় (শব্দ অধিকতর কর্কশ হয়ে ওঠে)। আর উৎসটি যত দূরে চলে যায়, তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যাও ততই কমে আসে (শব্দের কর্কশতা কমতে থাকে)। এটাই হচ্ছে ডপ্‌লার এফেক্ট—বিজ্ঞানী ডপ্‌লার এর আবিষ্কর্তা।

(খ) মোসবাওয়ার এফেক্টের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল। এই বিভাগের জন্যে

নির্দিষ্ট স্বল্প স্থানে তা বলা সম্ভব নয়। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ১৯৬৬ সালের জুন সংখ্যায় এই বিষয়ে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি দ্রষ্টব্য।

(গ) চন্দ্রবিহীন সন্ধ্যায় গোধূলীর ঠিক পরেই পশ্চিমাকাশে দিগন্তের উপরে অনেক সময় কোণাকৃতি একটা উজ্জ্বল আলোর ছটা দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য এবং নিম্ন অক্ষরেখার অঞ্চলেই এটি বেশী দেখা যায়। এর ঔজ্জ্বল্য মোটামুটি আমাদের ছায়াপথের ঔজ্জ্বল্যের মত। অবশ্য নীচের দিকে ঔজ্জ্বল্য বেশী, উপর দিকে কম। প্রধানতঃ জোডিয়াক (রাশিচক্র বা সূর্যের আপাত গতিপথ) অঞ্চলেই এই ধরণের ঘটনা পরিলক্ষিত হয় বলে এর নান জোডিয়াক্যাল লাইট। পৃথিবীর কাছাকাছি উল্কা জাতীয় কণিকা থেকে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে জোডিয়াক্যাল লাইটের সৃষ্টি করে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

(ঘ) প্রোটিন আমাদের শরীরে দুই ভাবে কাজ করে। শিশুর শরীরে প্রধানতঃ নতুন নতুন কোষ সৃষ্টির কাজে অ্যামিনো অ্যাসিডের দরকার এবং তা আসে প্রোটিন থেকে। বয়স্ক লোকেরও অবশ্য নতুন কোষ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে, বিভিন্ন কোষের ক্ষয়পূরণের জন্যে। তবে শিশুদের তুলনায় এই প্রয়োজন অনেক কম। তাই অতিরিক্ত প্রোটিন সে ক্ষেত্রে শক্তির যোগান দিয়ে থাকে। শরীর যদি প্রোটিন থেকে উৎপন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড অত্যধিক হজম করে, তবে তা কার্বহাইড্রেটের মত ফ্যাট বা চর্বি সৃষ্টি করতে পারে। আর প্রোটিনের পরিমাণ যদি এত বেশী হয় যে, হজম করা সম্ভব নয়—তবে তা বর্জন করা হয় এবং বর্জনীয় পদার্থের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

(ঙ) ধূমকেতুর লেজ একটা বিস্ময়কর ও রহস্যজনক বস্তু। ধূমকেতুর মাথাটা ছোট ছোট বস্তুকণিকার দ্বারা গঠিত। এই কণিকাগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট নয়। তাই সূর্যরশ্মির চাপে সম্ভবতঃ কণিকাগুলি মাথার বাইরের থেকে ছিট্‌কে যায়। এরাই লেজ গঠন করে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সূর্যমুখী ফুল যেমন সব সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, ধূমকেতুর লেজটা ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ সূর্যের বিপরীত দিকে ঘুরে থাকে। সূর্যরশ্মির চাপই যে এজন্যে দায়ী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ধূমকেতু যতই সূর্যের কাছে আসে, ততই লেজটা বড় হতে থাকে এবং সূর্যের কাছ থেকে দূরে চলে যাবার সময় লেজটা ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। লেজটা যত বড়ই হোক না কেন, আসলে খুব হাল্কা, ঘনত্ব অত্যন্ত কম—এত হাল্কা যে, গোটা একটা ধূমকেতুকে গুটিয়ে পকেটে রেখে দেওয়া যায়, যদিও সেটা অনেক সময় ২৫,০০০,০০০ মাইল পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

দীপক বসু

বিবিধ

সৌর জগতের বাইরে

আগামী বারো-চৌদ্দ বছরের মধ্যেই মানুষের তৈরি চালকবিহীন মহাকাশ-যান সৌরমণ্ডলের বাইরে যেতে পারবে, দূরবর্তী গ্রহের আকাশেও তারা হানা দেবে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানী ডক্টর হোমার জো স্টুটার্ট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেছেন, ১৯৭৮ সালের মধ্যে আমরা বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস বা নেপচুনের দিকে মহাকাশ-যান পাঠাতে পারবো। নয় বছরের মধ্যে সেগুলি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুবে

নেপচুনের আকাশে সরাসরি পৌঁছুতে লাগবে প্রায় ত্রিশ বছর, কিন্তু জেটবিমান যে আলোকপাত করেছে, তাথেকে আমরা এখন বুঝতে পারছি, একটি গ্রহের মহাকর্ষ ক্ষেত্র থেকে আর একটি গ্রহের মহাকর্ষ ক্ষেত্রে পৌঁছুতে অতি অল্প সময় লাগবে। সৌরমণ্ডলের দূরতম গ্রহেও আমরা নয় বছরের মধ্যে পৌঁছুতে পারবো।

মহাকাশ-যানখানা একটি গ্রহের দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকলেই সে অকস্মাৎ শক্তি অর্জন করে গ্রহের দিকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবে, শক্তির কোন নতুন উৎসের প্রয়োজন হবে না।

এক গ্রহের আকাশ থেকে অন্য গ্রহের আকাশে লাফিয়ে চলা—এমন কি, সৌর-মণ্ডলের বাইরে চলে যাওয়াও অসম্ভব হবে না এবং তা ১৯৮০ সালের মধ্যেই সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

পরলোকে অপূর্বকুমার চন্দ

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী অপূর্বকুমার চন্দ ১৪ই মার্চ দিল্লীতে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

তাঁর জন্ম হয় শিলচরে, ১৮৯২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী। তিনি সে যুগের প্রখ্যাত কংগ্রেস-নেতা স্বর্গতঃ কামিনীকুমার চন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

স্বর্গতঃ চারুচন্দ্র দত্তের কন্যা শ্রীমতী লোপা-মুদ্রার সঙ্গে অপূর্বকুমার চন্দের বিবাহ হয়। বিবাহের পাঁচ ছয় বছর পরেই তাঁর স্ত্রী মারা যান। তাঁর এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

কংগ্রেস আন্দোলনে জড়িত থাকবার ফলে তিনি শিলচর সরকারী শিক্ষায়তন থেকে বহিষ্কৃত হন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে আসেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন এবং পরে আই-ই-এস হন।

শিক্ষকতার জীবনে তিনি ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কলেজ, ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথম ভারতীয় জনশিক্ষা অধিকর্তা এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রথম চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।

১৯৩৬ সালে ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি লীগ অব নেশন্‌স্‌-এ যোগদান করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভার তিনি মনোনীত সদস্য ছিলেন।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

২। শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু
২২৩, মিত্রপাড়া রোড
নৈহাটি, ২৪ পরগণা

৩। শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
ও শ্রীশ্যামল ভট্টাচার্য
অবধায়ক—শ্রীফণীমোহন মুখোপাধ্যায়
(সন্দেশ্বরতলা)
পোঃ—চুঁচুড়া, জেলা—হুগলী

৪। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

৫। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
৪৮, পঞ্চাননতলা লেন,
বেহালা, কলিকাতা—৩৪

৬। শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ
২২০ আউটার সার্কেল রোড
জামশেদপুর-১

৭। গোপীনাথ সরকার
গণিত বিভাগ, চন্দননগর কলেজ
চন্দননগর,হুগলী

৮। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
অবধায়ক—এন. এন. মুখোপাধ্যায়
রিফ্র্যাক্টরিজ সেকশন
সেণ্ট্রাল রিসার্চ অ্যাণ্ড কণ্ট্রোল লেবরেটরি
দুর্গাপুর ষ্টিল প্লাণ্ট
দুর্গাপুর-৩

৯। শ্রীমৃন্ময় সামন্ত
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্রাবাস
১, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

১০। শুভ্রা দেবনাথ
জীববিদ্যা বিভাগ
রাণীগঞ্জ কলেজ,
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

১১। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ও ৭, নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড
কলিকাতা-১

১২। শ্রীসুনীল সরকার
(ইনষ্ট্রাক্টর)
B. P. C. Junion Technical School
P. O. Krishnagar. Dist. Nadia

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | মে, ১৯৬৭ | পঞ্চম সংখ্যা

জমির উর্বরতা ও সার

শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান ভারতবর্ষের প্রগতির অন্তরায় দুটি—খাদ্য ও জনসংখ্যা। দ্বিতীয়টি এখানে আলোচ্য বিষয় নয় এবং এই বিষয়টির উপর অনেক আলোচনা হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতে খাদ্যের উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। একর প্রতি আমাদের দেশে যে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের (যেমন—আমেরিকা, জাপান, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ) তুলনায় অত্যন্ত কম। ভারতবর্ষ এখনও কৃষি-প্রধান, যদিও ভারতে বিভিন্ন শিল্প প্রসার লাভ করেছে। এখনও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা মূলতঃ প্রাকৃতিক জলসেচ এবং অতি অল্প পরিমাণে সারের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্রোজেক্ট অর্থাৎ ক্যানেল, গভীর নলকূপ ইত্যাদির ব্যবস্থা আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে, কিন্তু তার পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়; তাই কোন বছর ভাল, কোন বছর খারাপ। কাজেই পৃথিবীর স্বাবলম্বী দেশগুলির সাহায্যপ্রার্থী হওয়া ছাড়া আর আমাদের কোন উপায় থাকে না।

জমির ফলন যে কয়টি জিনিষের উপর নির্ভর করে, তার মধ্যে সার অন্যতম। সার জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে, একথা সর্বজনস্বীকার্য। উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্যে নিম্নোক্ত জিনিষের প্রয়োজন—(ক) অধিক পরিমাণে প্রয়োজনীয়—নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম ও জল, (খ) অল্প পরিমাণে প্রয়োজনীয়—চুন, লোহা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, গন্ধক প্রভৃতি। নাইট্রোজেনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে—"Man

must feed nitrogen back into the soil or face a decrease in the supply of food". সার অর্থাৎ Fertilizer কথার অর্থ হলো, যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। আগামী চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; কারণ এছাড়া ভারতবর্ষের বর্তমানে আর কোনও উপায় নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-ব্যবস্থার জন্যে যদিও কিছু করা হয়েছিল, তৃতীয় পরিকল্পনায় কিছুই করা হয় নি—সেখানে শিল্প-ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ফলে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষিকে অগ্রাধিকার দেবার বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার ফলেই সার উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়েছে।

জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে যে সব জিনিষ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাকে সাধারণতঃ দুটি শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে—(ক) প্রাকৃতিক সার, (খ) কৃত্রিম সার বা রাসায়নিক সার। প্রাকৃতিক সারের মধ্যে গোবর সার, পচা পাতা, খইল ও ছাই ইত্যাদি অন্যতম। রাসায়নিক সারকে যথাক্রমে চার ভাগে ভাগ করা যায়—(১) নাইট্রোজেন সার, (২) ফস্ফরাস সার, (৩) পটাস সার ও (৪) মিশ্র সার। নাইট্রোজেন সারের মধ্যে আছে অ্যামোনিয়াম সালফেট বা চলিত কথায় সালফেট সার, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট, নাইট্রো-লাইম। প্রকৃতির এমনি ব্যবস্থা আছে, যাকে বলা হয় নাইট্রোজেন সাইকল্—যার ফলে নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর মাধ্যমে মাটির মধ্যে পর্যায়ক্রমে চলাচল করছে। প্রকৃতির বিচিত্র ব্যবস্থায় নাইট্রোজেনঘটিত বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ খাদ্য হিসাবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের প্রয়োজন মিটিয়ে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে পুনরায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। মাটির মধ্যে বিভিন্ন জীবাণুর প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন অজৈব নাইট্রেটে পরিণত হয়। উদ্ভিদ তার পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে ওই সব নাইট্রেট টেনে নিয়ে আত্মসাৎ করে। উদ্ভিদ-দেহের নাইট্রোজেনঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ আবার প্রাণীরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহ পচে মাটিতে মিশে যায়, প্রাণীদের মলমূত্রও মাটিতে মেশে। এভাবে নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগিক পদার্থ পুনরায় মাটিতে চলে যায়। জীবাণুর প্রভাবে এর কতকাংশ গ্যাসরূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়, আর কতকাংশ নাইট্রেট রূপে পুনরায় উদ্ভিদদেহে ফিরে আসে।

এখানে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, নাইট্রোজেনঘটিত সারের হিসাব টন নাইট্রোজেন-এ রাখা হয়। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় উৎপাদিত নাইট্রোজেন সারের হিসাব—

সিন্ধ্রী—	১১৭,০০০	টন নাইট্রোজেন
এফ এ. সি. টি—	২০,০০০ "	"
মহীশূর—	১,৩০০ "	"
নাঙ্গাল—	৮০,০০০ "	"
সাহু কেমিক্যাল্স্—	১০,০০০ "	"

১৯৬৫-'৬৬ সালে নিম্নলিখিত নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে—

অ্যামোনিয়াম সালফেট—	২৩০,০০০	টন নাইট্রোজেন
নাইট্রো-লাইম—	১৬০,০০০ "	
ইউরিয়া—	২৪০,০০০ "	"
অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট—	২৪০,০০০ "	"
অ্যামোনিয়াম সালফেট/ নাইট্রেট—	৩০,০০০ "	"
নাইট্রো-ফস্ফেট—	৪০,০০০ "	"

ফস্ফেট ফারটিলাইজার বলতে সাধারণতঃ সুপার ফস্ফেটকেই বোঝায়। যদিও অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট, ডাইক্যালসিয়াম ফস্ফেটও এরই অন্তর্ভুক্ত। জমিতে নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, এর সঙ্গে ফস্ফেট সার দেওয়া শুধু মাত্র উপকারীই নয়, প্রয়োজনীয়ও বটে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে নাইট্রোজেন ফস্ফেটের

যে বিসদৃশ অনুপাত ছিল :১, তাকে তৃতীয় পরিকল্পনা কালে যদিও ১ ১ অনুপাতে আনবার কথা ছিল, তথাপি এখন দেখা যাচ্ছে ২ : ১ অনুপাত পর্যন্ত নেমেছে।

পটাস সারের খুব বেশী প্রচলন নেই—পটাসিয়াম সালফেট ও পটাসিয়াম ক্লোরাইড বা মিউরিয়েট—এই দুটিই পটাসের উল্লেখযোগ্য সার। মিউরিয়েট সারের প্রয়োজন হয় বা উৎপন্ন হয় ২৪,০০০ টন এবং পটাসিয়াম সালফেট ৯০০০ টন।

মিশ্র সার আর কিছুই নয়, বিভিন্ন সারের মিশ্রণ মাত্র। মিশ্র সারকে সাধারণতঃ ৩-১২-৬ বা ২-১২-৬ বা ৫-১০-৫—এই ভাবে লেখা হয়। এই ভাবে লেখবার অর্থ হলো শতকরা ভাগ—৩-১২-৬ যথাক্রমে N, P_2O_5 ও K_2O এর অংশ; অর্থাৎ উল্লিখিত অনুপাতে কোন নাইট্রোজেন সার, ফস্‌ফেট সার ও পটাস সারকে মেশানো হয়েছে।

প্রতি বছর ফলনের পর জমির উর্বরতা হ্রাস পায়, কারণ গাছের বৃদ্ধির সময় জমি থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করবার ফলে জমিতে ঐ সব জিনিষের ঘাটতি পড়ে এবং প্রতি বছর সার ব্যবহার করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। উল্লিখিত সারগুলি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখন দেখা গেছে যে, জমিতে যদি শুধু মাত্র অ্যামানিয়াম সালফেট ব্যবহার করা হয়, তবে জমির উর্বরতা প্রতি বছর হ্রাস পায় এবং জমিতে আশানুরূপ ফলন হয় না। এই ব্যাপারটি আমাদের দেশে খুবই দেখা যাচ্ছে। একটু অনুসন্ধানে আসল রূপটি সহজেই ধরা যায়। জমিতে শুধু মাত্র অ্যামোনিয়াম সালফেট সার দিলে যে সালফেট অংশ পড়ে থাকে, জমিতে তার রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে এবং সালফেট আয়ন সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ফলে সালফেট আয়ন এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের যুক্ত প্রক্রিয়ায় উর্বরতা হ্রাস পায়। কাজেই যদি সালফেট সার ব্যবহার করতে হয়, তাহলে প্রতি বছর বা এক বছর অন্তর জমিতে কিছু পরিমাণ চুন ছড়িয়ে দিতে হবে। এর ফলে চুন সালফেট আয়ন ও অ্যাসিডের প্রভাব থেকে জমিকে রক্ষা করবে। চুনের পরিবর্তে অনেক সময় হাড়ের গুঁড়াও কাজ দেয়। হাড়ের গুঁড়া দুটি কাজ করে—এক দিকে জমিকে অম্লের প্রভাব থেকে রক্ষা করে, অন্য দিকে উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

ফলনের জন্যে প্রাকৃতিক সার ও রাসায়নিক সার জমিতে ব্যবহারের প্রয়োজন—একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু যদিও পূর্বে বলা হয়েছে তবুও একথা বলা দরকার যে, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল দেওয়া না হলে জমির ফলন হতে পারে না—জমির উর্বরতাকে কোন রকমে কাজে লাগানো যেতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত ব্যবহারের জন্যে চাই প্রয়োজনীয় জল। এই জলের জন্যে প্রাকৃতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না—কারণ প্রায়ই এরূপ অবস্থা হতে পারে; কাজেই সেচের কৃত্রিম ব্যবস্থার দরকার। কৃত্রিম জল-সেচ ব্যবস্থা, প্রচুর পরিমাণে (অবশ্যই পরিমিত) সারের ব্যবহার আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধিক খাদ্য ফলানোই বর্তমান ভারতের সঙ্কট ত্রাণের একমাত্র উপায়।

এখানে এবার কৃত্রিম সার তৈরি সম্বন্ধে বলবার আগে আমাদের দেশে বর্তমান সারের অবস্থা অর্থাৎ কোন্ জায়গা থেকে এগুলি পাওয়া যায় এবং কারা তৈরি করে, তা একটু জানা দরকার। সার তৈরি হয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। সরকারী প্রতিষ্ঠানটির নাম ফারটি-লাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া। এর অধীনে ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় কারখানা আছে। সর্বপ্রথম হচ্ছে সিন্ত্রী, তাছাড়া এটি হচ্ছে

F. C. I-এর কেন্দ্রস্থল। আর আছে ট্রম্বে ফারটিলাইজার, দুর্গাপুর ফারটিলাইজার, নাঙ্গাল ফারটিলাইজার, নাইভেলী ফারটিলাইজার। আরও একটি হচ্ছে রাউরকেলা ফারটিলাইজার—এটির নাম আলাদা করে বলবার উদ্দেশ্য হলো, এটি F. C. I.-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটি হিন্দুস্থান ষ্টিল লিমিটেড-এর অধীনে। F. C. I-এর অধীনে আরও দুটি কারখানার নাম এখানে করা উচিত—আসাম ও গোরক্ষপুর ফারটিলাইজার। FACT Fertilizer, যেটি ফারটিলাইজার অ্যাণ্ড কেমিক্যাল্‌স, ত্রিবাঙ্কুরের একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে—সাহু কেমিক্যাল্‌স, পেরী অ্যাণ্ড কোম্পানী, বিশাখাপত্তম ফারটিলাইজার, মধ্যপ্রদেশ ফারটিলাইজার, রাজস্থান ফারটিলাইজার প্রভৃতি। এখানে ফারটিলাইজার কারখানাগুলির অবস্থান, কোন সালে তৈরি শেষ হবে এবং কত পরিমাণ সার তৈরি হবে, তার একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হলো।

(ক) সরকারী প্রতিষ্ঠান

কারখানা	প্রদেশ (অবস্থান)	যে সালে শেষ হবে	আরও কত তৈরি হবে টন অব নাইট্রোজেন	কোন্ ধরনের সার	কোন্ জিনিষ থেকে তৈরি হবে
রাউরকেলা	উড়িষ্যা	১৯৬৩-৬৪	১২০,০০০	নাইট্রো-লাইম	কোক ওভেন গ্যাস
দুর্গাপুর	পঃ বাংলা	১৯৬৯-৭০	৫৪,০০০	ইউরিয়া	অ্যামোনিয়া
ট্রম্বে	মহারাষ্ট্র	১৯৬৫-৬৬	৯০,০০০	ইউরিয়া ও নাইট্রো-ফস্‌ফেট	পেট্রো-কেমিক্যাল্‌স্
নাইভেলী	মাদ্রাজ	১৯৬৫-৬৬	৭০,০০০	ইউরিয়া	লিগ্‌নাইট
নামরূপ	আসাম	১৯৬৬-৬৮	৩২,০০০	ইউরিয়া ও সালফেট	অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস
FACT	কেরল	১৯৬৪-৬৫	৪০,০০০	অ্যামোনিয়াম সালফেট, ফস্‌ফেট, ক্লোরাইড	ন্যাপ্‌থা
গোরখপুর	উত্তর প্রদেশ	১৯৬৬-৬৭	৮০,০০০	ইউরিয়া	ন্যাপ্‌থা

(খ) বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

কারখানা	প্রদেশ (অবস্থান)	যে সালে শেষ হবে	আরও কত তৈরি হবে টন অব নাইট্রোজেন	কোন্ ধরনের সার	কোন্ জিনিষ থেকে তৈরি হবে
কানটি	মধ্য প্রদেশ	১৯৬৪-৬৫	৫০,০০০	ইউরিয়া	কয়লা
হনুমানগড়	রাজস্থান	১৯৬৫-৬৬	৮০,০০০	অ্যামোনিয়াম সাল্‌ফেট	"
কোথাগুডিয়াম	অন্ধ্র	১৯৬০-৬৬	৮০,০০০	ইউরিয়া	"
বিশাখাপত্তম	"	১৯৬৫-৬৬	৮০,০০০	ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট	ন্যাপ্‌থা
সাহু কেমিক্যাল্‌স্	উত্তর প্রদেশ	১৯৬৬-৬৭	১০,০০০	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	কয়লা
পেরী কোম্পানী	মাদ্রাজ	১৯৬৩-৬৪	৪,২০০	অ্যামোনিয়াম ফস্‌ফেট	ন্যাপ্‌থা
বাইপ্রোডাক্ট অব ষ্টীল প্ল্যান্টস	—	১৯৬৫-৬৬	১০,০০০	অ্যামোনিয়াম সালফেট	অ্যামোনিয়া

সিন্ধ্রী সার কারখানায় বর্তমানে ১১১,০০০ টন নাইট্রোজেন সার তৈরি হয়। এই কারখানায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে আরও ১১,০০০ টন নাইট্রোজেন (ইউরিয়া) ও ৩৬,০০০ টন নাইট্রোজেন (অ্যামোনিয়াম সালফেট/নাইট্রেট) তৈরি হচ্ছে। FACT কারখানার অধীনে উপরিউক্ত যোজনা ছাড়া আরও ২০,০০০ টন নাইট্রোজেনজনিত সার তৈরি হয়ে থাকে। নাঙ্গাল সার কারখানায় তৈরি হয় ৮০,০০০ টন নাইট্রোজেন (ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, বা নাইট্রো লাইম)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে প্রতি টন অ্যামোনিয়াম সালফেট সারের দাম ছিল ৩১৫ টাকা। ১৯৫৭ সালে ঐ দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৩৫০ টাকা। ১৯৫৯ সালে টেরিফ কমিশন প্রতি টন সারের দাম ৩০০ টাকা রাখবার অনুরোধ জানান। বর্তমানে প্রতি টন সারের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭৫ টাকা।

এখন সার তৈরির পদ্ধতিগুলি সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করা যাক। আলোচনা অবশ্য খুবই কম হবে, কারণ প্রতিটি পদ্ধতিই বিশাল এবং কোন একটি আলোচনা নিয়েই একটি প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। প্রথমেই ধরা যাক সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত অ্যামোনিয়াম সালফেট। এই সার তৈরির জন্যে ছুটি জিনিষের প্রয়োজন--অ্যামোনিয়া ও সালফিউরিক অম্ল। অ্যামোনিয়া সাধারণতঃ ছুটি উপায়ে পাওয়া যায়—(১) নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে ১ : ৩ অনুপাতে মিশিয়ে অনুঘটকের সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগ সাধন—এটি অনেক উপায়ে (প্রায় ছয়টি) তৈরি করা যায়। আমাদের দেশে সিন্ধ্রী কারখানায় অ্যামোনিয়া তৈরি করা হয় Haver's process-এ নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে। এই ছুটির সংযোগ ঘটালেই—

$$2NH_4OH+H_2SO_4=(NH_4)_2SO_4+2H_2O$$
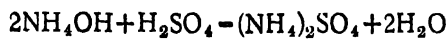
অ্যামোনিয়াম সালফেট

অ্যামোনিয়াম সালফেট মিলবে। কিন্তু কথাটা যত সহজে বলা হলো অত সহজে মিলবে না। কারণ তখন একটি জলীয় দ্রবণ মাত্র পাওয়া যাবে। এথেকে অ্যামোনিয়াম সালফেট সার পেতে গেলে বাষ্পীভবন, পাতন ও কেলাসীকরণ পদ্ধতির সাহায্যের প্রয়োজন। পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায় এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। কিন্তু আমাদের সিন্ধ্রীতে এই পদ্ধতির বদলে অন্য পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়।

$$2NH_4OH+Ca\,SO_4+CO_2=(NH_4)_2SO_4+Ca\,CO_3\downarrow+H_2O.$$
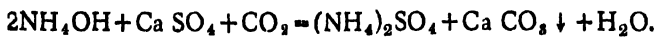
জিপ্‌সাম অ্যামোনিয়াম সালফেট

প্রথমে জিপ্‌সামকে গুঁড়া করে জলে দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ওই দ্রবণে চালনা করা হয়। ফলে উপরিউক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপ পড়ে এবং তাকে সরিয়ে ফেলা হয় এবং আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে সার পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গন্ধক খুবই কম আছে, প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। কিন্তু জিপ্‌সাম আমাদের দেশে প্রচুর

পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করবার ফলে তাই আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে এবং কিছুটা দুর্ভাবনা কমেছে।

দ্বিতীয় এবং আধুনিক সার হলো ইউরিয়া। সার হিসাবে চাহিদা ছাড়াও প্লাষ্টিক শিল্পেও ইউরিয়ার প্রচুর চাহিদা আছে। এই সার তৈরি করতে দরকার হয় দুটি জিনিষের—অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড।

$$CO_2 + 2NH_3 = NH_4.CO_2NH_2 \text{ (অ্যামোনিয়াম কার্বামেট)}$$
$$NH_4\,CO\,NH_2 = NH_2.CO.NH_2 + H_2O$$
(ইউরিয়া)

অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাইঅক্সাইড—এই দুটির রাসায়নিক সংযোগ বিভিন্ন উপায়ে সংঘটিত হতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণে দুটিকে একটি পাত্রে নিয়ে চাপ ও তাপ প্রয়োগ (১৬০°-১৮০° সে: ও ১৫০-২০০ বায়বীয় চাপ) করলে ইউরিয়া তৈরি হয় এবং আনুষঙ্গিক পদ্ধতিগুলি—যেমন, বাষ্পীভবন ইত্যাদি অবশ্যই আছে। এটি অবশ্য অনেকগুলি পদ্ধতির একটি—নাম সলভে পদ্ধতি (Solvay Process)।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ($NH_4\ NO_3$) অ্যামোনিয়া ও নাইট্রিক অম্ল—এই দুটির রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্টি হয়। সুপার ফস্‌ফেট সারটি প্রস্তুত করা হয় রক ফস্‌ফেট নামক পাথর থেকে। ঐ পাথর গুঁড়া করে তার সঙ্গে সালফিউরিক অম্ল মেশালে সুপার ফস্‌ফেটে পরিণত হয়।

$$Ca_3(PO_4)_2 + 2H_2SO_4 + H_2SO_4 = CaH_4(PO_4)_2 + 2(CaSO_4.2H_2O)$$
মনোক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট   জিপ্‌সাম
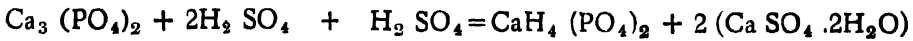
এই মনোক্যালসিয়াম ফস্‌ফেটই হচ্ছে সুপার ফস্‌ফেটের আসল জিনিষ। এই পদ্ধতির নাম ডেন পদ্ধতি (Den Procoss)। পৃথিবীর অন্য দেশে আর একটি সারের ব্যবহার আছে—অবশ্য দিনে দিনে তার ব্যবহার কমে আসছে। তার নাম চিলি সল্টপিটার (সোডিয়াম নাইট্রেট খনিজ)। নাম থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, চিলি দেশই এর প্রাপ্তিস্থান। ব্যবহারের ফলে এটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। আমাদের দেশে ঐ রকম খনিজ বিশেষ নেই, সুতরাং তার প্রচলনও কম।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান হলেও প্রতি একরে ফলন খুবই কম। তার কতকগুলি কারণ আছে—(১) আমাদের দেশে চাষের পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ও তার ব্যবহার কম। (২) আমাদের দেশে কতকগুলি কৃষি গবেষণাগারের অতি অল্প পরিমাণ জমিতে ভাল ভাবে চাষ হচ্ছে; ফলে সেটুকু জমিতেই ভাল ফলন হচ্ছে। কিন্তু গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এসে সব জমিতেই যাতে ভাল ফলন হয়, আমাদের এখন তার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। (৩) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ট্র্যাক্টর ইত্যাদির দ্বারা বিরাট ভূখণ্ডে একসঙ্গে চাষ হচ্ছে। ভাল করেই চাষ হচ্ছে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণে, কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা একেবারেই অন্য রকম। বিশেষ বড় জমি একেবারেই দেখা যায় না। ছোট ছোট জমি ২ কাঠা, ৫ কাঠা, ১০ কাঠা ইত্যাদি এবং এক একটি জমির মালিকানা এক একজনের—ফলে চাষেরও হেরফের হয়। তাই আমাদের দেশে একসঙ্গে ভাল করে চাষ করবার অসুবিধা আছে। এক্ষেত্রে সরকার যদি

আইন করে সব জমি ৩-৪ একর টানা জমিতে পরিণত করে দিতে পারেন—কো-অপারেটিভ বা অন্ত উপায়ে, তাহলে খুবই ভাল হয়। (৪) প্রাকৃতিক সার ও রাসায়নিক সার প্রতি বছর ভালভাবে ব্যবহার করতে হবে। কারণ চাষের ফলে প্রতি বছর জমির যে উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে, তা পুরণ করে দিতে হবে। সারের ব্যবহার আমাদের দেশের জমিতে পরিমিত নয়। (৫) উপযুক্ত পরিমাণে জলের অভাব। জলসেচের ব্যবস্থা এমনই যে, যে সময় জলের দরকার, সেই সময় জল দিতে পারে না—যেটুকু জমিতে জল দেওয়া হয়, তা আমাদের দেশের সমস্ত জমির তুলনায় খুবই কম। তাই জলসেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন আবশ্যক। (৬) উপযুক্ত বীজের অভাব। বীজ ভাল না হলে ভাল চাস হলেও ফলন ভাল হবে না। তাই ভাল বীজ চাই। এবারের চাষে একটি নতুন বীজের সন্ধান পাওয়া গেছে, নাম 'তাই চুং'—যার ফলন খুবই আশাপ্রদ। কাগজে এই বীজের কথা কয়েক বারই প্রকাশিত হয়েছে। একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে, এই চাষে চাই বেশী জল ও বেশী সার। কিন্তু ফলন পাওয়া যাবে তিন গুণেরও বেশী।

ভারতবর্ষের জনগণের মনে আজ একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা—আমাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা। এই ব্যাপারটি সফল করতে হলে সর্বাগ্রে চাই খাদ্যে স্বয়ংনির্ভরতা। তাই অধিক পরিমাণে খাদ্য উৎপাদনই হচ্ছে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। অধিক খাদ্য ফলাতে গেলে যে কয়টি বিশেষ বিষয়ের উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে, তার মধ্যে জমির উর্বরতা রক্ষা ও প্রচুর সার উৎপাদন অন্যতম। বর্তমানে দেশব্যাপী কৃষি-ব্যবস্থা ও খাদ্য-উৎপাদনের এই শোচনীয় ব্যর্থতা দেখে নিরাশ হলে চলবে না বা বিদেশ থেকে সাময়িকভাবে খাদ্য আমদানী করে সন্তুষ্ট থাকলেও চলবে না—আমাদের আত্মনির্ভরশীল হতেই হবে। নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

পরমাণুর গঠন-রহস্য উদ্ভেদে আলফা ও বিটা কণিকা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

পারমাণবিক জগতে আলফা ও বিটা কণিকা হচ্ছে পদার্থ বিজ্ঞানীদের প্রেরিত প্রথম দূত এবং অতি সুষ্ঠুভাবেই এরা দৌত্যকার্য সমাধা করে পারমাণবিক জগতের অনেক খবরই এনে দিয়েছিল বিজ্ঞানীদের কাছে। পদার্থের অভ্যন্তরে এই সব কণিকা ছুঁড়ে দেবার পর এদের গতিপথের পরিবর্তন থেকে পদার্থের পারমাণবিক গঠন সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু সে সব আলোচনার ভিতর যাবার আগে আমাদের আলফা ও বিটা কণিকার ধর্মগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে আলফা ও বিটা কণিকা উভয়েই আমাদের কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। বিশেষ অবস্থায় হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক ও ইলেকট্রনই যথাক্রমে আলফা ও বিটা কণিকা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছে মাত্র। পাঠকের নিশ্চয়ই জানা আছে যে, পর্যায়সারণীর শেষের দিকের মৌলিক পদার্থগুলি তেজস্ক্রিয় এবং তারা সব সময় তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করে ক্রমে সীসায় পরিণত হয়।

প্রথমে এই রশ্মিকে শুধু মাত্র শক্তিশালী বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিকিরণ বলেই মনে করা হয়েছিল, কিন্তু চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এই রশ্মিকে অতিক্রম করিয়ে দেখা গেল যে, এই রশ্মি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এই তিনটি রশ্মির জাতি-ধর্ম, নামধাম কিছুই জানা ছিল না বলে এদের নাম দেওয়া হলো আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি। দেখা গেল, আলফা ও বিটা রশ্মি উভয়েই চৌম্বক ক্ষেত্রে সমকোণে ঝুঁকে পড়ে, কিন্তু এদের বক্রতার মুখ বিপরীত ও অসমান। আলফা রশ্মির তুলনায় বিটা রশ্মির দিক বিক্ষিপ্ত হয় অনেক বেশী। তৃতীয় অংশটির অর্থাৎ তথাকথিত গামা রশ্মির কোন দিক বিচ্যুতি ঘটে না। চৌম্বক ক্ষেত্র কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এর গতির উপর। কিন্তু এর পদার্থ ভেদ করবার ক্ষমতা অসাধারণ বলে প্রমাণিত হলো। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা গেল যে, আলফা রশ্মি হচ্ছে দ্রুতগতিসম্পন্ন ধনাত্মক তড়িৎ-কণিকার স্রোত এবং বিটা রশ্মি হচ্ছে ঋণাত্মক তড়িৎ কণিকার স্রোত। আরও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তগুলি সমর্থিত হলো এবং আলফা ও বিটা কণিকাকে হিলিয়াম কেন্দ্রক ও ইলেকট্রন বলে বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারলেন। দেখা গেল যে, গামা রশ্মি অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ও অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিকিরণ। বলা বাহুল্য, আলফা কণিকার তড়িৎ-শক্তি ইলেকট্রনের তড়িৎ-শক্তির দ্বিগুণ ও বিপরীত ধর্মী এবং এর ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় চার গুণ, অর্থাৎ একটি বিটা কণিকা বা ইলেকট্রনের ভরের প্রায় সাড়ে সাত হাজার গুণ। যেহেতু আলফা কণিকার ভর চার পারমাণবিক একক এবং এর বৈদ্যুতিক চার্জ দুই একক, সেহেতু স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, এরা দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত অগ্রসর হয়েছি, এবার প্রকৃত প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। আলফা ও বিটা কণিকার আয়তন যে কোন মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক আয়তনের তুলনায় নগণ্য। সুতরাং পরমাণুর পরিপ্রেক্ষিতে এগুলিকে তড়িৎ-বিন্দু (Point charge) বলে গণ্য করা যেতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত আলফা কণিকার প্রারম্ভিক গতিবেগ $২'২২ \times ১০^{৯}$ সে. মি. থেকে $১'৪৫ \times ১০^{৯}$ সে. মি.-এর মধ্যে সচরাচর হয়ে থাকে; অর্থাৎ কণিকাগুলির গতিশক্তি যথাক্রমে $১'৫৩ \times ১০^{-৫}$ আর্গ থেকে $'৬৪৫ \times ১০^{-৫}$ আর্গের মধ্যে থাকে। আলফা বা বিটা কণিকাগুলির শক্তি নির্ভর করে তাদের জন্মদাতা তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর। বিটা কণিকাগুলি অতি মন্থর গতি থেকে সুরু করে অতি উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন হতে পারে। '৫ ভোল্ট বিভব পার্থক্যের মধ্য দিয়ে পাঠালে ইলেকট্রনের গতিবেগ হয় $৪'২ \times ১০^{৭}$ সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে; অর্থাৎ আলোর গতিবেগের '০০১৪ গুণ। উচ্চতম গতিবেগসম্পন্ন বিটা কণিকাগুলির গতিবেগ প্রায় আলোর গতিবেগের '৯৯৮ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং এই সব ইলেকট্রনের গতিশক্তি হয় $১'২ — ১০^{-৫}$ আর্গ পর্যন্ত। আমরা গতিশীল ইলেকট্রনগুলিকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ক্যাথোড কণিকা বলে অভিহিত করবো।

দ্রুতগতিসম্পন্ন আলফা কণিকা ও ইলেকট্রন-স্রোতের ধর্মগত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। একটি নির্দিষ্ট আকারের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে নির্গত একটি সমান্তরাল আলফা অথবা ক্যাথোড রশ্মিকে যদি উচ্চ বায়ুশূন্যতার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়ে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ফেলা যায়, তবে উক্ত ছিদ্রটির একটি পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি প্লেটের উপর অঙ্কিত হয় এবং এক্ষেত্রে ছিদ্রটির সীমারেখা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যদি ছিদ্র আর ফটোগ্রাফিক প্লেটের মধ্যবর্তী স্থানে কোন পদার্থ (কোন গ্যাস অথবা পাতলা ধাতব পাত) রাখা হয়, তবে ছিদ্রটির প্রতিকৃতির সীমারেখা

হয়ে যায়। অর্ধস্বচ্ছ কোন তরল পদার্থের মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মি পাঠালে যেমন অবস্থা হয়, অনেকটা সেই রকমেরই। আলফা ও ক্যাথোড কণিকার দ্বারা সংঘটিত উপরিউক্ত ঘটনা. বিক্ষেপণ (Scattering) নামে পরিচিত। প্রকৃত ব্যাখ্যাও খুব সহজেই পাওয়া গিয়েছিল। পাঠকও নিশ্চয় বুঝতে পারবেন যে, পদার্থের অণুর সঙ্গে কণিকাগুলির সংঘর্ষের ফলেই তাদের সমান্তরাল ও সরলরৈখিক গতিবেগ কিঞ্চিৎ ব্যাহত হয়। এই সহজ সরল ব্যাখ্যাটি প্রথম লর্ড রাদারফোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত হয়। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় ছিল যা, তা হচ্ছে এই যে, এক একটি আলফা কণিকার বিক্ষেপণ হয় প্রায় ৯০° কিংবা তারও বেশী, যদিও একমাত্র ভারী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রেই এই ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রের (নিউক্লিয়াসের) তড়িৎ-শক্তি হাল্কা মৌলিক পদার্থের চেয়ে অনেক বেশী এবং এই কারণে হাল্কা মৌলিক পদার্থের পরমাণু-কেন্দ্রক ও একটি আলফা কণিকার মধ্যে যে তড়িতের স্থৈতিক বিকর্ষণ-শক্তি কাজ করে, তা ভারী মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে যে বিকর্ষণ-শক্তি কাজ করে, তার চেয়ে অনেক কম এবং সেজন্যে আলফা কণিকার দিক বিচ্যুতিও প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কম হয়ে থাকে। সুতরাং এই ঘটনা লর্ড রাদারফোর্ডের পরমাণুর চিত্রকে আরো দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

আলফা ও বিটা উভয় প্রকৃতির কণিকাই কোন গ্যাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তাকে আয়নিত করে এবং নিজেদের গতিশক্তি ক্রমশঃই হারিয়ে ফেলে। আয়ন উৎপাদনকারী কণিকাটির গতিবেগ একটি সীমার নীচে নেমে গেলে আর তা আয়ন উৎপাদন করতে পারে না। আবার. একটি সর্বোচ্চ আয়ন উৎপাদনকারী গতিবেগ আছে, যার থেকে কণিকাটির কম বা বেশী গতিবেগ হলে উৎপন্ন আয়নের সংখ্যা হ্রাস পায়। আলফা ও ক্যাথোড কণিকার ক্ষেত্রে এই গতিবেগ প্রায় সমান এবং এর আঙ্কিক পরিমাপ হচ্ছে ৮.৪ × ১০⁸ সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে। অবশ্য একথা মনে করলে খুবই ভুল করা হবে যে, এই গতিবেগ-সম্পন্ন একটি আলফা কণিকা যত আয়ন উৎপাদন করবে, একটি বিটা কণিকাও তত আয়ন উৎপাদন করবে। প্রকৃতপক্ষে একই গতিবেগসম্পন্ন একটি আলফা ও ক্যাথোড কণিকার তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় যে, আলফা কণিকার আয়ন উৎপাদনের ক্ষমতা ক্যাথোড কণিকার প্রায় দশ গুণ।

উভয় প্রকার কণিকাই পদার্থের দ্বারা শোষিত হয়ে থাকে; অর্থাৎ কোন পদার্থকে ভেদ করবার সময় আলফা অথবা বিটা রশ্মির কণিকার সংখ্যা এবং গতিবেগ উভয়ই হ্রাস পায়। আলফা কণিকার গতিবেগ হ্রাস পেয়ে গ্যাসীয় আণবিক গতিবেগের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় এবং আলফা কণিকাগুলি তার আগে গ্যাসের মধ্য দিয়ে মোটামুটিভাবে একটি সুনির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করে থাকে। এই দূরত্বকে আলফা কণিকাগুলির পাল্লা (Range) বলা যেতে পারে। খুব কম সংখ্যক কণিকাই থেমে যায় অথবা রশ্মির মূল গতিপথ থেকে বিচ্যুত হয়। আলফা কণিকার ক্ষেত্রে কোন পদার্থকে অতিক্রম করবার সময় কণিকাগুলির গতিবেগই মূলতঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়, কিন্তু বিটা কণিকার ক্ষেত্রে হ্রাস-প্রাপ্তি হয়ে থাকে মূলতঃ কণিকার সংখ্যার দিক থেকে। আলফা ও বিটা কণিকা শোষণের পার্থক্য প্রধানতঃ এখানেই।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলা যেতে পারে যে, পদার্থের অভ্যন্তরে ক্যাথোড রশ্মির শোষণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ক্যাথোড রশ্মির শোষণের উপর আমরা একটু বিশেষ রকম মনোযোগ দেব।

পদার্থ ভেদকারী ক্যাথোড রশ্মির জীবনের দুই রকমের ঘটনা, যা আমাদের কাছে বিশেষ লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে, প্রথমতঃ ক্যাথোড কণিকার সংখ্যা হ্রাস ও দ্বিতীয়তঃ ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ হ্রাস। এই ঘটনা দুটি তত্ত্বগতভাবে পৃথক পৃথকরূপে বিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন, কিন্তু সে সব তত্ত্বকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা খুব সহজসাধ্য নয়, অন্ততঃ আগে ছিল না।

বিস্তারিত পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের ফলে লেনার্ড দেখালেন যে, ক্যাথোড রশ্মি শোষণের ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ সাধারণতঃ আস্তে আস্তে হ্রাস পায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্যাথোড কণিকাগুলি কোন অণুর সঙ্গে সংঘাতের ফলে নিজস্ব প্রাথমিক গতিবেগ হারিয়ে ফেলে এবং তার গতিবেগ গ্যাসীয় আণবিক গতিবেগের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। লেনার্ড দেখালেন যে, ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা* শোষক পদার্থটির বেধ বা পুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে এক্স-পোনেনশিয়াল নিয়ম অনুসারে হ্রাস প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদি I_0 তীব্রতাবিশিষ্ট ক্যাথোড রশ্মিকে x বেধবিশিষ্ট কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করানো হয়, তবে নির্গত ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা নিম্নলিখিত সূত্রানুযায়ী সূচিত হবে।

$$I = I_0 e^{-ax}$$

a রাশিটিকে পদার্থের শোষণ-গুণাঙ্ক (Absorption coefficient) বলা হয়। ক্যাথোড কণিকার গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকলে কোন বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে এটি একটি ধ্রুবক রাশি হয়ে থাকে, তবে বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এর মান বিভিন্ন হয়। স্পষ্টতঃই দেখা যায়, যে পদার্থের শোষণ ক্ষমতা যত বেশী, a-র মানও তার ক্ষেত্রে তত বেশী হয়ে থাকে। হাইড্রোজেনের চেয়ে অ্যালুমিনিয়ামের শোষণ-গুণাঙ্ক বেশী। আবার অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে সীসার শোষণ-ক্ষমতা আরও বেশী ; তাই সীসার শোষণ-গুণাঙ্ক আরও বড়।

উপরিউক্ত সমীকরণটি লেনার্ড এবং বেকারের পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু a-র মান যেহেতু গতিবেগের (ক্যাথোড কণিকার) উপর নির্ভর করে, সেহেতু পরীক্ষাধীন পদার্থটির বেধ এমনভাবে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে ক্যাথোড কণিকাগুলির গতিবেগ মোটের উপর অপরিবর্তিতই থাকে। এই সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ক্যাথোড কণিকার গতিবেগের সম্ভাব্য পরিবর্তনের জন্যে পরীক্ষালব্ধ ফলাফলকে সংশোধিত করে নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। কারণ, দেখা গেছে যে, ক্যাথোড কণিকাগুলির গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের শোষণ-গুণাঙ্ক a অতিদ্রুত হ্রাস পায়। ক্যাথোড রশ্মির শোষণ সম্পর্কে লেনার্ডের 'ভর শোষণ নীতি' (Mass absorption law) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এখানে নীতিটি উল্লেখ করলে হয়তো খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না। নীতিটি বেশ সরল অথচ চমকপ্রদ। লেনার্ডের নীতিটি হচ্ছে এই যে, কোন পদার্থের ক্যাথোড রশ্মি শোষণ-ক্ষমতা তার ঘনত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। এই নীতির বৈজ্ঞানিক মূল্য মোটামুটিভাবে তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক উভয় ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত, তবে এস্থলে আমরা সে সব জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করবো না।

*ক্যাথোড রশ্মির গতিপথের লম্ব প্রস্থচ্ছেদ করবার একটি সমতল কল্পনা করলে তার একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রতি সেকেণ্ডে যত ইলেকট্রন পড়ে, তাকে ক্যাথোড রশ্মির তীব্রতা বলা হয়।

যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধে ভল্লাতকের প্রয়োগ

শ্রীসূর্যকান্ত রায়

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভল্লাতক (চলিত ভাষায় পরিচিত ভেলা) মানুষের কষ্টসাধ্য কতকগুলি রোগ চিকিৎসার জন্ম আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বর্ণিত ভেষজসম্ভারের মধ্যে অন্যতম ভেষজরূপে পরিগণিত। বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া না গেলেও বাল্মীকি রামায়ণ ও ব্যাসদেবের মহাভারতে উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রচলিত চরক, সুশ্রুত, বাগভট্ প্রভৃতি সুপ্রাচীন আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থসমূহে ইহার বহুল ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়। চিকিৎসার্থে ব্যবহার ছাড়াও এই বৃক্ষের ফলের আঠার সাহায্যে রজকেরা কাপড় চিহ্নিত করে বলিয়া ইহা Marking nut হিসাবেও অনেকের নিকট সুপরিচিত।

ভারতের সন্নিহিত হিমালয়ের সকল প্রদেশে—এমন কি, পূর্ব আসাম প্রভৃতি স্থানে ইহার জন্ম। সাধারণতঃ বীরভূম, হাজারিবাগ, বানেশ্বর, বোটানিক্যাল গার্ডেনস্—শিবপুর অঞ্চলেও প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। বৃক্ষ বেশ উচ্চ হয় (প্রায় ২৫।৩০ ফুট)। কাণ্ড ঋজু, ধূসর বর্ণ এবং বহু ক্ষুদ্র শাখা সমন্বিত। পত্র সুপ্রশস্ত ও দীর্ঘ, অগ্রভাগ গোলাকার ও পৃষ্ঠদেশ শ্বেতাভ। পুষ্প হরিদ্রাভ পীতবর্ণ। ফল ১ ইঞ্চি লম্বা, দেখিতে অনেকটা হৃৎপিণ্ডের মত আকৃতিবিশিষ্ট—মসৃণ, উজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ ও চ্যাপ্টা-নাকের মত। ফলের ভিতরে কাগজী-বাদামের মত এক রকম ছোট বাদাম থাকে; সেটা অনেকে চিবাইয়া খায়। কাঁচা ফলের রস শ্বেতবর্ণ, পাকিলে কালো হয়। মে-জুন মাসে গাছে ফুল হয় এবং ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে ফল পাকে। এই গাছের কাঠে প্রচুর আঠা থাকে। এই আঠা অথবা ফলের রস গায়ে লাগিলে চুলকণা (Erruption), ক্ষত (Ulcer) এবং হাত-পায়ের ফুলা (Swelling) উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া ইহা খুব সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হয়। এমন কি, ভল্লাতক বৃক্ষতলে শয়ন করিলে বা বৃক্ষের ফুলের হাওয়া লাগিলে ঐ সকল লক্ষণ দেখা যায় এবং কখনও বা মৃত্যুর লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই কারণেই লোকে ভল্লাতককে বিষাক্ত ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু প্রকৃতির কি বিচিত্র রহস্য—যেহেতু এই ফলের আঠা বা রস বিষাক্ত, সেহেতু ইহার ফলত্বক খুব পুরু ও শক্ত এবং সহজে ভাঙ্গা যায় না। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহা ভল্লাতক ছাড়া আরও বহু নামে পরিচিত। তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি সার্থক পরিচয় ও গুণ-প্রকাশক নামের উল্লেখ করা হইল; যথা—পরিচয়-জ্ঞাপক নাম শৈলবীজ অর্থাৎ পর্বতময় প্রদেশে জন্মে বলিয়া; তৈলবীজ অর্থাৎ ইহার ফলে যথেষ্ট তৈল বর্তমান; বীরতরু অর্থাৎ ইহার কাষ্ঠে প্রচুর আঠা আছে বলিয়া ছেদনকার্য কষ্টসাধ্য। গুণ-প্রকাশক নাম অরুষ্কর অর্থাৎ ক্ষতোৎপাদক; বাতারি অর্থাৎ আমবাতনাশক (Enemy of Rheumatism); ক্রিমিঘ্ন অর্থাৎ কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধির বীজাণুনাশক; অর্শোহিত—অর্শরোগের পক্ষে হিতকর; শোফকৃৎ—ফুলা উৎপাদন করে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—Semicarpus anacardium, Linn. এবং ইংরেজী নাম—Marking nut।

ইহার ফলের ভিতর যে তৈলবহুল রসাল আঠা থাকে, তাহাই চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু যেহেতু ইহার আঠার ব্যবহার খুব নিরাপদ নহে, সেহেতু ব্যবহারের

পূর্বে উত্তমরূপে শোধন করিয়া লওয়া উচিত। শোধন করিবার নিয়ম হইতেছে, ভেলা ও ইটের গুঁড়া একসঙ্গে নিবিড়ভাবে ঘর্ষণ করিয়া ফলগুলি জলে ধুইয়া লইলে দোষ কাটিয়া যায় অথবা ভেলাগুলি ডাবের জলে ভিজাইয়া রাখিবার পর ধুইয়া লইলেও শোধিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যাইতে পারে যে, ভেলার আঠার সংস্পর্শে বা প্রভাবে যদি পূর্ববর্ণিত কুফল দেখা দেয়, তাহা হইলে নেয়াপাতি ডাবের জল পান, ধৌতকার্যে ব্যবহার এবং নারিকেল তেল মাখিলে ঐ দোষমুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং এইগুলিকে ভল্লাতকের দোষ প্রতিষেধকরূপে গণ্য করা যায়।

তীক্ষ্ণ গুণসম্পন্ন হইলেও আয়ুর্বেদ মতে যদি যথোপযুক্তভাবে শোধন করিয়া প্রয়োগ করা হয়, তবে ভল্লাতক অমৃতের ন্যায় ফলদান করে এবং বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য রোগ আরোগ্য করে। ইহাতে যে সকল অন্তর্নিহিত ধর্ম আছে, তাহার উল্লেখ প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, ইহা মধুর ও কষায়, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, ছেদক, বিপাকান্তে মধুর রস প্রদায়ক, অগ্নিকারক, পুষ্টিকর, তর্পক, বায়ু, কফ ও পিত্তনাশক। ইহা কুষ্ঠ (Leprosy), অর্শ (Piles), গ্রহণী (Chronic diarrhœa), আনাই (Flatulence), শোফ (Swelling), জ্বর (Fever), কৃমি (Helminthic and bacterial disorders), বৃষ্য (Aphrodisiac), বৃংহণ (Nutrient and developer), কেশ্য (Hair tonic) এবং উদর রোগ—বিশেষভাবে প্লীহা-বিবৃদ্ধিজনিত (Splenomegalia), শ্বিত্র (Leucoderma) প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। শোনা যায় যে, কর্কট রোগে (Cancer) এই ভেষজটির ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে সম্প্রতি ভারতের বহু গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা চলিতেছে

ব্যাপকভাবে যদিও এই ভেষজটির বহু রোগে প্রয়োগের উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু চরকে রসায়নার্থে (Rejuvinator) এবং সুশ্রুতে কুষ্ঠ, অর্শ ও বিষাক্ত কীটাদির দংশনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে ইহা বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রায়ই একক এই ভেষজের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ভেষজ-গুণাগুণ সমন্বিত আধুনিক মতবাদসম্পন্ন পাশ্চাত্য গ্রন্থসমূহে ব্যবহার ছাড়াও শ্বাস, কাশ ও আমবাত প্রভৃতি রোগে ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যায়।

উল্লিখিত রোগসমূহে ইহার ব্যবহার ছাড়াও রাজযক্ষ্মা রোগে (Pulmonary Tuberculosis) ব্যবহার করা যায় কিনা, তাহাই এই আলোচনার অন্যতম বিষয়বস্তু। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আয়ুর্বেদের মতে ইহা কৃমিঘ্ন। এই ক্ষেত্রে কৃমি শব্দের দ্বারা ইহা অন্ত্রস্থ কৃমি (Worms) এবং পাশ্চাত্য মতানুযায়ী রোগোৎপাদক বীজাণুকে'ও (Pathogenic bacteria) বুঝাইতে পারে। কারণ আয়ুর্বেদে রক্তজ, কফজ প্রভৃতি বহু কৃমির উল্লেখ দেখা যায়। ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, ইহাতে কুষ্ঠরোগের বীজাণুনাশক শক্তি আছে বলিয়াই ইহা কুষ্ঠরোগে বিশেষ কার্যকরী। পাশ্চাত্য মতানুযায়ী কুষ্ঠ ও যক্ষ্মা রোগের বীজাণু উভয়েই 'Acid fast' গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং ইহারা কতকাংশে সমধর্মী ও দেখিতে দণ্ডাকৃতি (Rod shaped)। এই কারণেই ইহা অযৌক্তিক মনে হয় না যে, কুষ্ঠরোগে বহুল ব্যবহৃত ভল্লাতকের কৃমিঘ্ন, শ্বাসনাশক, জ্বরঘ্ন, রসায়ন প্রভৃতি গুণ থাকিবার ফলে ইহা যক্ষ্মারোগে ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, রসায়নার্থে ভল্লাতক সুস্বাদু হালুয়ার আকারে (সুজি, গরুর দুধ, গব্যঘৃত এবং ভল্লাতকের ক্বাথের মিশ্রণে প্রস্তুত) ব্যবহার রাজস্থানের কতিপয় পরিবারে এখনও প্রচলিত। এইরূপ শুনা যায় যে, জনৈক দুঃস্থ যক্ষ্মারোগীর কোনরূপ ব্যয়সাধ্য

চিকিৎসার সামর্থ্য না থাকায় কেবলমাত্র 'ভল্লাতক হালুয়া' সেবন করিয়া সুস্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে তাঁর আরোগ্যের কারণ যাচাই করা সম্ভব হয় নাই।

যাহা হউক উপরিউক্ত যুক্তির বলে ভল্লাতক হালুয়া কতিপয় (ছয় জন) পরীক্ষিত ও স্থিরীকৃত যক্ষ্মারোগীর উপর পাতিপুকুর যক্ষ্মা-হাসপাতালে প্রয়োগ করা হয়। ইহাদের সকলেরই প্রধান উপসর্গ ছিল শ্বাসকষ্ট, ক্ষুধামান্দ্য, প্রবল কাশি ও জ্বর। একজন রোগীর গ্রহণী ছিল, যাহা অহিফেনঘটিত ঔষধেও বাগে আনা সম্ভব ছিল না। একজন রোগীর উপরিউক্ত সকল উপসর্গ ছাড়াও পাদশোথ (Oedema feet) ছিল। এই ছয় জন রোগীকে এক সপ্তাহ হইতে তিন মাস কাল পর্যন্ত ভল্লাতক হালুয়া ১·০৫ গ্র্যাম হইতে ৬ গ্র্যাম পর্যন্ত রোগীর বলাবল ও ভেষজ-সহিষ্ণুতা বিবেচনা করিয়া খাওয়ান হয়। ফলাফলে দেখা যায়, চার জন রোগী উপরিউক্ত উপসর্গগুলির কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে, ক্ষুধা বিশেষভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হইয়াছে, সুনিদ্রা হইয়াছে এবং রক্ত পরীক্ষায় রোগের হ্রাস-বৃদ্ধিসূচক মাপ (Sedimentation rate) সন্তোষজনকভাবে নামিয়া আসিয়াছে। যাহার গ্রহণী রোগ বশে আনা সম্ভব হইতেছিল না, তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। অপর দুই জন রোগীর মধ্যে এক জনের কয়েক দিন সেবনের পর রক্ত নির্গমনের অন্তর সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ও কাশি কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং অপর জনের গায়ে চুলকণা (যাহা ডাবের জলের দ্বারা ধৌত ও নারিকেল তেল মালিসে চার দিনেই প্রশমিত হয়) প্রকাশ পাওয়ায় এই চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যদিও কাহারও কাহারও মতে প্রথমে রক্ত নির্গমন বৃদ্ধি পাইলেও উহা প্রয়োগ করিতে থাকিলে পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। যাহা হউক, এই ছয় জন রোগীর উপর প্রয়োগের ফলাফল বিশেষ নৈরাশ্যজনক নহে বরং আশাপ্রদ বলা যাইতে পারে।

উপরিলিখিত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, যে যুক্তির বশবর্তী হইয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা খুব অযৌক্তিক নহে। তবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহার সঠিক প্রয়োগ-মাত্রা ও ফলের কোন্‌টি বিশেষ-ভাবে কার্যকরী অংশ, তাহা স্থির করিয়া লইতে হইবে। কারণ মাত্রা বিশেষতঃ কার্যকরী অংশের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আয়ুর্বেদশাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান নহে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং আশা করা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে রোগ নির্ণয় পরবর্তী কালে যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং আয়ুর্বেদ মতানুযায়ী রোগ নির্ধারণ ও চিকিৎসার দ্বারা গবেষণা চালাইয়া গেলে হয়তো যক্ষ্মারোগের পরমৌষধ ভল্লাতক হইতে আবিষ্কৃত হওয়া কিছু মাত্র বিস্ময়ের কারণ হইবে না।

যক্ষ্মারোগের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভল্লাতকের ব্যবহার একটি তেজী ও তীক্ষ্ণ অস্ত্র হিসাবে গণ্য হইবার সম্ভাবনা নিতান্ত অনুজ্জ্বল নহে বলিয়াই মনে হয়।*

* পাতিপুকুর যক্ষ্মা-হাসপাতালের রোগীদের তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রবন্ধ প্রকাশের অনুমতি দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ এবং যাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সহযোগিতায় এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইয়াছে সেই পরম সুহৃদ শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। লেখক।

প্রসরণশীল বিশ্ব

সুখেন্দু সোম

সীমাহীন বিরাট ও অবিশ্বাস্যরূপে বিপুল এই মহাবিশ্বে রয়েছে অজস্র নক্ষত্র-জগৎ (Gallaxy)। ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী সার আর্থার এডিংটনের (১৮৮২—১৯৪৪) মতে, এক-একটা নক্ষত্র-জগৎ সাধারণভাবে এক-শ' কোটি তারকায় গঠিত। এরূপ কোটি কোটি নক্ষত্র-জগৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এধারে-ওধারে প্রায় সমভাবে ছড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে। শক্তিশালী বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে পৃথিবীর মানুষ অসীম আকাশের গায়ে পাঁচ হাজার কোটি আলোক-বর্ষ দূরেও তার দৃষ্টি-শক্তি প্রসারিত করে এযাবৎ এক হাজার কোটি নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পেয়েছে। এর পরেও যে কত আছে, তা কে জানে?

ওলবার ধাঁধা (Olber's Paradox)—খুব বেশী দিনের কথা নয়—১৮২৬ সাল। খ্যাতনামা জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলহেম ওলবার (১৭৫৮—১৮৪০) লক্ষ্য করেন যে, মহাকাশে ক্রমবর্ধমান ব্যাসযুক্ত অসংখ্য গোলক পেঁয়াজের কোয়ার মত আমাদের ঘিরে আছে। এরূপ পর পর দুটি গোলকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা বর্ধিত ব্যাসার্ধের বর্গফলের সমানুপাতিক। আবার বিপরীত বর্গের সূত্রানুসারে (Inverse Square Law) নক্ষত্র-জগতের দীপনমাত্রা তার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। এর ফলে দূরত্বের জন্যে নক্ষত্র-জগতের আলো যতটা কমে আসে, ঠিক ততটুকু আবার বেড়ে যায় তাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। অগণিত নক্ষত্র জগতের সম্মিলিত আলোকরশ্মির অগ্নিবৃষ্টিতে কেন আমরা তবে পুড়ে ছাই হয়ে যাই না?—ওলবারের এই অদ্ভুত প্রশ্নের ধাঁধা দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানী-মহলে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহাশূন্যে ইণ্টারফিয়ারেন্সের জন্যে এই আলোর একটা মোটা অংশ লয়প্রাপ্ত হলেও শেষ পর্যন্ত যেটুকু পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, তাতেও আমাদের সমগ্র আকাশ দিনরাত সর্বদা সূর্য অপেক্ষাও অধিক ঝলমল করতো।

উনবিংশ শতাব্দীর একদল বিজ্ঞানী মনে করতেন যে, শুধু মাত্র আমাদের নক্ষত্র-জগৎ ছাড়া মহাবিশ্ব একেবারেই ফাঁকা। তাই একটি নক্ষত্র-জগৎ থেকে কতটুকুই বা আলো আমরা পেতে পারি! কিন্তু ওলবার ধাঁধা সমাধানে এই যে প্রয়াস, তা ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হলো বিংশ শতাব্দীর সূচনায়, যখন মানুষ শক্তিশালী দূরবীক্ষণের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলো যে, আমাদের জগতের পরপারেও আরো অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান। কারো কারো মতে, জন্ম থেকে সুরু করে যে সব দূর-দূরান্তের জগতের আলো পৃথিবীতে এখনও এসে পৌঁছায় নি, আমাদের আকাশের ঔজ্জ্বল্যে তাদের কোন অবদান নেই। তাই হয়তো আকাশ তত দীপ্তিমান নয়। কিন্তু তবুও যে পরিমাণ আলো এসে পড়ে, তাতেও রাতের আকাশের এতটা অন্ধকার হওয়া উচিত ছিল না।

লাল অভিমুখী প্রতিসরণ (Red Shift)—ওলবার ধাঁধার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেছে সাম্প্রতিক কালে। সূক্ষ্ম বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রে নক্ষত্র-জগতের আলোর বর্ণরেখার লাল রঙের দিকে স্থানচ্যুতির কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বলেন যে, সুদীর্ঘ পথ বেয়ে আসবার সময় আলোকরশ্মি কিছুটা তেজ ও

তদনুরূপ কম্পন-বেগ হারিয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে লালের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু তরঙ্গবাদ বা কণিকাবাদ কোনটাই মহাশূন্যে আলোর এই তেজক্ষয় স্বীকার করে না। আবার কোন কোন মহল থেকে এমনও শোনা যায় যে, আলোকরশ্মির খানিকটা তেজ কেড়ে নেয় মহাজাগতিক ধূলিকণার দল, যার ফলে বর্ণালী-রেখার এরূপ স্থানচ্যুতি ঘটে। কিন্তু পরীক্ষা ও হিসাবে যখন দেখা গেল যে, এই স্থানচ্যুতির মাত্রা ও হারানো তেজের পরিমাণে কোন মিল নেই, তখন এই অদ্ভুত যুক্তি আর টিকলো না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বর্ণরেখার এই স্থানচ্যুতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেল অষ্ট্রিয়ার পদার্থবিদ সি. জে. ডপ্‌লারের (১৮০৩—১৮৫৩) সূত্র প্রয়োগ করে। জানা গেল—নক্ষত্র-জগৎ প্রতিনিয়তই দূরে দূরে সরে যাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে। এই সব অপসৃয়মান জগৎ থেকে নির্গত আলোর কম্পন-হার ক্রমাগত কমে গিয়ে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়, যার ফলে বর্ণরেখাসমূহ লাল রঙের দিকে প্রতিসরিত হয়। দেখা গেছে, এই প্রতিসরণের মাত্রা নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগের সমানুপাতিক। বীক্ষণাগারে পরীক্ষায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, যতই দূরে যাওয়া যায়, ততই এই অপসরণ-বেগ, তথা বর্ণরেখার স্থানচ্যুতির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। প্রচণ্ড বেগে দূরে সরে-যাওয়া নক্ষত্র-জগতের জলন্ত গ্যাস-কণিকাসমূহের ভিতর যেগুলি আমাদের দিকে ছুটে আসে, তাদের এই গতিবেগ যদি অপসরণ-বেগ থেকে বেশী হয়, তবে এই সব কণিকা বেগুনী-অভিমুখী বর্ণরেখা প্রদান করে। বহির্নক্ষত্র-জগতের মধ্যে আমাদের সব চেয়ে নিকটতম হলো অ্যাণ্ড্রোমিডা মণ্ডলের কুণ্ডলাকৃতির নীহারিকা, যেটি প্রতি সেকেণ্ডে ২০০ মাইল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু দূরত্বের সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে যখন আমাদের দিকে ছুটে-আসা তার গ্যাস-কণিকাগুলির বেগ ছাড়িয়ে যায়, তখনই তার বর্ণরেখাগুলি লাল রঙের দিকে সরে পড়ে। খুব কাছের দু-একটি ছাড়া সাধারণভাবে মহাবিশ্বের প্রায় সব নক্ষত্র-জগৎ তীব্রবেগে দূরে সরে যায়। এজন্যেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিনিয়তই প্রসারিত হচ্ছে। যদিও প্রত্যেকটি জগতের প্রতিটি নক্ষত্র এক-একটি বিশাল আলোর খনি, তবুও যেহেতু এরা অবিরাম প্রচণ্ড বেগে দূর থেকে দূরে চলে যায়, সেহেতু এদের আলোর কোটি কোটি ভাগের চেয়েও কম আলো আমাদের উপর ঝরে পড়ে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এভাবেই ওলবার ধাঁধার সমাধান করেছেন।

হাব্‌ল সূত্র—ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন বীক্ষণাগারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এডুইন পি. হাব্‌ল (১৮৭০—১৯৪৯) লক্ষ্য করেন যে, নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগ তার দূরত্বের সমানুপাতিক এবং এই মর্মে ১৯২৫ সালে তিনি যে সূত্র আবিষ্কার করেন, তা এই—

অপসরণ-বেগ = ধ্রুবক × দূরত্ব

যদি এই দূরত্ব ও গতিবেগ যথাক্রমে সেন্টিমিটার ও সেন্টিমিটার পার সেকেণ্ডে মাপা হয়, তবে এই ধ্রুবকের মান দাঁড়ায় $১\cdot৯ \times ১০^{-১৭}$। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রতি এক কোটি পারসেক (১ পারসেক = ৩·২৬ আলোক-বর্ষ) দূরত্ব বৃদ্ধির জন্যে এই অপসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ১০০ মাইল করে বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন নক্ষত্র-জগতের এই সরে যাবার গতি ও দূরত্ব নিয়ে লেখচিত্র অঙ্কন করলে মূল উৎস বিন্দু দিয়ে যে সরল রেখা পাওয়া যাবে, তাকে অসীমের দিকে বাড়িয়ে অনেক অনেক দূরের নক্ষত্র-জগতের অপসরণ-বেগ নির্ণয় করা যায়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এর সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়—কেন না, বহু

দূর-দূরান্ত থেকে আগত আলোকরশ্মির তেজ এতই কমে আসে যে, তা শক্তিশালী যন্ত্রেও সাড়া জাগায় না।

বিকেন্দ্রিক মহাবিশ্ব—বেতার দূরবীক্ষণে যতদূর দৃষ্টি চলে, তাতে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই মহাবিশ্ব আমাদের চতুর্দিকে সমভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। এতে স্বভাবতঃ একথাই মনে হয় যে, আমাদের নক্ষত্র-জগৎ, তথা স্থানীয় গ্রুপ বুঝি মহাবিশ্বের কেন্দ্র। অনুরূপভাবে অন্য কোন নক্ষত্র-জগৎ-বাসী (?) তার চতুষ্পার্শ্বের বিশ্বস্ফীতি দেখে একই কারণে মনে করবে যে, তারাও বুঝি মহা-বিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে। অতএব মহাবিশ্বের কোন নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই।

বিশ্বের বয়স—কোন নক্ষত্র-জগতের বর্তমান দূরত্বকে তার এই মুহূর্তের অপসরণ-বেগ দিয়ে ভাগ করে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তা সব নক্ষত্রের বেলায় সমান, যাকে বলা হয় হাব্‌ল ধ্রুবক। এর মান হলো $\frac{১}{১.৯ \times ১০^{-১৭}}$ সেকেণ্ড—১.৮×১০^{৯} বছর; অর্থাৎ ১.৮ মহাপদ্ম বছর আগে এই বিশ্বস্ফীতি সুরু হয়, যার ফলে বিভিন্ন নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আকাশ ও পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আমাদের জগতের অনেকগুলি নক্ষত্রের নিউক্লিয়াস জ্বালানী পুড়ে যাবার হার ও তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম ধাতুর সীসায় রূপান্তরিত হবার কাল দেখে হিসাব করেছেন যে, উক্ত বয়স তিন মহাপদ্ম বছরেরও বেশী। তাই হাব্‌ল ধ্রুবক নির্ণয় করতে গিয়ে নিশ্চয়ই বেগ ও দূরত্ব মাপবার কাজে একটা বড় রকমের ভুল রয়ে গেছে। আধুনিক কালে অতি সূক্ষ্ম শক্তিশালী যন্ত্রের দ্বারা নির্ণীত চার শত কোটি পারসেক দূরে অবস্থিত হ্রদসর্প (Hydra) নক্ষত্র-জগৎপুঞ্জ (Cluster of Gallaxies) নেওয়া হয়েছে, যেখানে গ্যাস-কণিকাগুলির ছুটাছুটি লাল প্রতিসরণে খুব কমই অংশ গ্রহণ করে। যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্ণরেখাসমূহের স্থানচ্যুতির মাত্রা বের করে ডপ্‌লার সূত্রের সাহায্যে এই নক্ষত্রপুঞ্জের অপসরণ-বেগ সেকেণ্ডে ৬০,০০০০ কিলোমিটার বের করা হলো। এক্ষণে এই দূরত্বকে গতিবেগ দিয়ে ভাগ করে হাব্‌ল ধ্রুবক বা বিশ্বের বয়স যে সাত মহাপদ্ম বছর পাওয়া গেল, তা নানা দিক থেকে বাস্তবের অনুগামী।

অতিঘন তত্ত্ব (Super dense theory)—সাত মহাপদ্ম বছর আগে বিশ্বস্ফীতি সুরু হবার পূর্বে অতি অল্প পরিসর জায়গায় মহাবিশ্বের বস্তু-কণাসমূহ যখন অতি ঘনীভূত অবস্থায় জমাট বেঁধে ছিল, তখন বিশ্বের ঘনত্ব ছিল জলের ঘনত্বের চেয়েও এক-শ' হাজার মহাপদ্ম গুণ বেশী। সেই সময়ে প্রতি ঘনসেণ্টিমিটার স্থানে এক-শ' কোটি টন পদার্থ অবস্থান করতো। শেষে একদিন কোন এক অজ্ঞাত কারণে, জর্জ গ্যামোর অনুমান অনুসারে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যে বিস্ফারণ সুরু হলো, তার রেশ আজও অব্যাহত রয়েছে। ক্রমাগত প্রসরণের দরুণ মহাবিশ্বের ঘনত্ব ক্রমশঃ কমে গিয়ে জলের ঘনত্বের কোটি কোটি ভাগের এক হাজার ভাগে গিয়ে দাঁড়ালো এবং সম্ভবতঃ তখন নক্ষত্র-জগতের সৃষ্টির সূচনা হলো। এই অতি ঘন তত্ত্ব অনুসারে যাবতীয় নক্ষত্র-জগতের বয়স হাব্‌ল ধ্রুবক থেকে যে কিছুটা কম, তার স্বাক্ষর বহন করে আমাদের জগৎ, যার বয়স হলো ছয় মহাপদ্ম বছর।

আইনষ্টাইন বিশ্ব—মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের (১৮৭৯—১৯৫৫) মহান অবদান হলো, তাঁর বিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্বে বিশ্বস্থানের বক্রতার আবিষ্কার। এই বক্রতা দুই প্রকার—যোগবোধক ও বিয়োগবোধক। যোগবোধক বক্রতা ভিতরের দিকে বাঁকানো—যেমন একটা গোলাকার বর্তুলের পৃষ্ঠদেশ। আর বিয়োগবোধক বক্রতা হলো, যা বাইরের দিকে বেঁকে গেছে—এর দৃষ্টান্ত হলো ঘোড়ার পিঠের গদী। এই উভয় প্রকার নম-

ইউক্লিডীয় বক্রতাযুক্ত স্থানের মাঝে রয়েছে অবক্র স্থান, যা ইউক্লিডীয় ও সমতল। সমতল স্থানে কোন গোলকের আয়তন তার ব্যাসার্ধের ঘন ফলের সঙ্গে সমহারে বর্ধিত হয়, কিন্তু যোগ-বোধক স্থানে এই হার কম এবং বিয়োগবোধক স্থানে বেশী। বিভিন্ন আয়তনের বিশ্বস্থানের নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা গণনা করে যদি দেখা যায় যে, দূরত্বের ঘন ফলের তুলনায় সেটা নিম্ন বা উচ্চ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবে ঐ স্থানের বক্রতা যোগ-বোধক বা বিয়োগবোধক। কিন্তু মুস্কিল এই যে, বহু দূর-দূরান্তের নক্ষত্র-জগতের দূরত্ব সঠিক-ভাবে নির্ণয় করবার কোন উপায় নেই। অবশ্য দীপনমাত্রার ক্রমক্ষীয়মানতা দেখে বিপরীত বর্গের সূত্রানুযায়ী তাদের দূরত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা চলে বটে, তবে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এখন যে সব জগৎ দেখছি, সেগুলি সুদূর অতীতের। ইতিমধ্যে হয়তো অনেক পরিবর্তন এসে গেছে।

আকাশ-পদার্থ-গণিতবেত্তা আইনষ্টাইনের মতে, অজস্র বস্তুপিণ্ডের উপস্থিতিতে বিশ্বস্থানে যোগবোধক বক্রতার সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে মহাবিশ্ব বিরাট গোলকের মত সীমাবদ্ধ ও প্রান্ত-হীন হয়ে পড়েছে। আইনষ্টাইনের বিশ্ব অনন্ত নয় বটে, কিন্তু তার ব্যাসার্ধ বিরাট—১৫ কোটি আলোক-বর্ষ মাইল। 'সীমার মাঝে অসীম'—এই আইনষ্টাইন বিশ্বে আলো পুরাপুরি ঘুরে এসে তার উৎস বিন্দুতে মিলনে সক্ষম। এর ফলে তত্ত্বের দিক থেকে দর্শক একদিন তার নিজের পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাবে—তবে এর জন্যে কোটি কোটি বছর অপেক্ষা করতে হবে।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী মহাবিশ্বে দুটি শক্তি কাজ করে—একটি হলো নিউটনের মহাকর্ষ শক্তি, যা দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্তানুপাতিক, আর একটি হলো আইনষ্টাইন মহাজাগতিক বিকর্ষণী শক্তি ($G\mu\nu - \lambda G\mu\nu$), যা দূরত্বের সমানুপাতিক। এই বিকর্ষণী শক্তি যদিও সৌরজগতের বেলায় খুবই কম ($G\mu\nu - O$), কিন্তু দূরের নক্ষত্র-জগতের ক্রমবিস্তৃতিতে এটি ক্রমবর্ধমানরূপে ক্রিয়াশীল। আইনষ্টাইন তাঁর অদ্ভুত ও অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভা বলে যে বিশ্ব রচনা করেছেন, সেখানে তাঁর বিকর্ষণী শক্তি ও নিউটনের আকর্ষণী শক্তি—এই উভয়ই সমান হয়ে গেছে। এই দুই বিরোধী শক্তির সমতার ফলে আইনষ্টাইন বিশ্ব স্থিতি-স্থাপকতা (Equilibrium) লাভ করেছে। যদি কোন কারণে এই স্থিতিশীল বিশ্বের বস্তুমান কমে যায়, তবে এই আকর্ষণী শক্তি হ্রাস পাবে। কিন্তু বিকর্ষণের প্রভাবে বিশ্বের বিস্ফারণ সুরু হবে এবং এই বিস্তারণের সঙ্গে বিশ্বের বস্তুপিণ্ডসমূহের ভিতরকার দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে আকর্ষণ ক্রমাগত দুর্বল হয়ে বিকর্ষণ সবল হয়ে উঠবে; অর্থাৎ বিশ্ব দ্রুতগতিতে বেড়েই চলবে। আবার যদি কোন কারণে আইনষ্টাইনের স্থিতিশীল বিশ্বের বস্তুমান বেড়ে যায়, তবে এর সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং নিউটনের আকর্ষণী শক্তি ক্রমশঃ জোরদার হয়ে বিশ্বের ক্রমসঙ্কোচন ঘটাবে।

কিন্তু গবেষণাগারের পর্যবেক্ষণের ফলাফলের সঙ্গে আইনষ্টাইন বিশ্ব যথার্থভাবে সঙ্গতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। শুধু তাই নয়, এই বিরাট মহাবিশ্বের প্রতিফলন একটা সীমাবদ্ধ গোলকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

ডি সিটার বিশ্ব—এর কিছু পরে এলেন হল্যাণ্ডের জ্যোতির্বেত্তা লাইডেনের অধ্যাপক উইলহেম ডি সিটার (১৮৭২—১৯৩৪)। আইন-ষ্টাইন বিশ্বের মত ডি সিটারের বিশ্বে বস্তুসত্ত্ব মোটেই ভিড় করে নেই, বরং ক্রমবর্ধমান বিকর্ষণী শক্তির প্রচণ্ড ক্রিয়ায় অসম্ভব রকম বিস্ফারণের ফলে ডি সিটার বিশ্বের ঘনত্ব কমে প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাই আইনষ্টাইনের জগৎ হলো বস্তুপ্রধান, কিন্তু

গতিহীন; অপর পক্ষে ডি সিটারের জগৎ হলো গতিপ্রধান কিন্তু বস্তুহীন।

ছুটি আদর্শ বিশ্ব—আমাদের বর্তমান বিশ্ব—যেখানে বস্তুও রয়েছে আর গতিও রয়েছে, সে কিন্তু ঠিক ঠিক আইনষ্টাইন বা ডি সিটারের বিশ্ব কাউকেই মেনে চলে না। তাই প্রশ্ন জাগে, তবে বিশ্বের আসল স্বরূপ কি?

রাশিয়ার গণিতবেত্তা আলেকজাণ্ডার ফ্রিড্‌ম্যান এবং বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিদ জর্জ লেমাইতার—এই উভয়ের মতে আমাদের বিশ্বের দুই প্রান্তে রয়েছে ছুটি আদর্শ বিশ্ব—তার একটি হলো আইনষ্টাইনের, অপরটি হলো ডি সিটারের। সুদূর অতীতে কোন এক সময় আইনষ্টাইন বিশ্ব দিয়ে আমাদের যাত্রা হয়েছিল সুরু। তারপর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে যেমনি মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হতে লাগলো, তেমনি তার ঘনত্বও ক্রমশঃ কমতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তা ডি সিটারের বিশ্বের দিকে এগিয়ে গেল। বর্তমানে আমরা এই দুই আদর্শ বিশ্বের মাঝে কোথাও আছি এবং কোটি কোটি বছর পরে ডি সিটারের শূন্য বিশ্বের খুব কাছাকছি পৌঁছে যাব। ক্রমবর্ধমান বিশ্বে যে আমাদের বাস, তার বাস্তব প্রমাণও মেলে। ৫ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে কন্যা রাশিতে নক্ষত্র-জগতের স্তবক, ৬৫ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে সপ্তর্ষি মণ্ডলে, ৯৪ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে উত্তর কিরীট মণ্ডলে, ১১০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে বুটিশ মণ্ডলে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের স্তবক যথাক্রমে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫০, ৯৩০০, ১৩৪০০, ২৪০০০ মাইল বেগে আমাদের জগৎ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

স্থিতাবস্থা তত্ত্ব (Steady State Theory)—বিশ্বের ঘনত্ব সর্বদাই কমে যাচ্ছে—এই কথা কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না ইংরেজ গণিতজ্ঞ হার্মান বণ্ডী ও টমাস গোল্ড। তাঁরা একযোগে প্রচার করলেন যে, বিশ্বের যে কোন স্থান অতীতে যেমনটি ছিল, বর্তমানে তাই আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। প্রতিনিয়ত নক্ষত্র-জগতের অপসরণের ফলে মহাবিশ্বের যে ঘনত্ব কমে যাচ্ছে, তা রোধ করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখবার জন্যে এই দুই গণিত-বিজ্ঞানীর মতে নিত্য নতুন পদার্থ সৃষ্ট ও ঘনীভূত হয়ে পুরনো নক্ষত্র-জগতের স্থলে অনুরূপ নতুন জগতের জন্ম দিচ্ছে। বণ্ডী ও গোল্ডের সমঘন জগতে বস্তুহীনতা থেকে যে বস্তুর সৃষ্টি হয়, এতে অনেকের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আর এক জ্যোতির্বেত্তা ফ্রেড হয়েল বণ্ডী-গোল্ডের সঙ্গে যোগ দিয়ে আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মৌলিক সমীকরণগুলির প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন সাধন করে এই আপত্তি খণ্ডন করেন। অতি ঘন তত্ত্বে ও সংশোধিত মহাকর্ষ তত্ত্বে সমুদয় নক্ষত্র-জগতের বয়স ন্যূনাধিক ছয় মহাপদ্মের মত, কিন্তু যেহেতু বণ্ডী-গোল্ড-হয়েল বিশ্বে নিয়তই নক্ষত্র-জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, সেহেতু সবগুলির বয়স এক হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে হিসাব করে দেখা গেছে, নক্ষত্র-জগতের গড়পড়তা বয়স হাব্‌ল ধ্রুবকের এক-তৃতীয়াংশ।

বিবর্তনশীল বিশ্ব—১৯৪৮ সালে দুজন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোল ষ্টেব্‌বিন্স ও আলবার্ট ই. হুইটফোর্ড বহুদূরের কতিপয় নক্ষত্র-জগতের আলো বিশ্লেষণ করে বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, তা ডপ্‌লারের লাল পরিবর্তন অপেক্ষাও ৫০% বেশী লাল। কারো কারো মতে মহাজাগতিক ধূলিকণা কর্তৃক আলোক বিচ্ছুরণ এই অতিরিক্ত রক্তিম আভার কারণ। কিন্তু এতে এত অধিক পরিমাণ ধূলিকণার প্রয়োজন যে, হিসাবে তা দাঁড়ায় সমগ্র নক্ষত্র-জগতের বস্তুমানের এক-শ' গুণ, যা মহাবিশ্বে পদার্থের বন্টন ও বিশ্বস্থানের বক্রতার মাপকাঠিতে একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া যখন একই গুচ্ছে অবস্থিত সব নক্ষত্র-জগৎ একই রকম লাল দেখায় না, তখন সহজেই বলা যেতে পারে যে, এটা ধূলিকণার কারসাজি নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যাড্ ডে কর্তৃক বিভক্ত দুই শ্রেণীর নক্ষত্র-জগতের ভিতরে যেগুলি কুণ্ডলাকৃতির, সেখানে রয়েছে প্রচুর ধূলি গ্যাস কণিকার মেঘ সহ 'পপুলেসন-১' গোত্রীয় নীলাভ তারকার সংখ্যাধিক্য, আর দ্বিতীয় শ্রেণী অর্থাৎ উপবৃত্তাকার নক্ষত্র-জগৎ হলো লাল তারকায় (পপুলেসন-২) সমৃদ্ধ, কিন্তু ধূলি-গ্যাস কণিকা বিমুক্ত। প্রথমোক্ত জগতে প্রবীণ তারকাদের মৃত্যু ঘটলেও সেখানকার ধূলি-গ্যাস কণিকা থেকে নবীন তারকার জন্ম-লাভের ফলে সাধারণভাবে তারকার সংখ্যার সমতা বজায় থাকে। কিন্তু উপবৃত্তাকার জগতে আয়ুশেষে যখন বয়স্ক তারকা নিবে যায়, তখন ধূলিকণার অভাবে সেখানে কোন নতুন তারার সৃষ্টি হয় না। প্রথমে ষ্টেব্‌বিন্স ও হুইটফোর্ড উপবৃত্তাকার নক্ষত্র-জগতে যে অধিকতর লাল আলো দেখতে পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে হুইটফোর্ড একাকী পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে কুণ্ডলাকৃতির জগতে কিন্তু সে রকমটি দেখতে না পেয়ে অবাক হয়ে যান। প্রায় সমদূরত্বে অবস্থিত পাশাপাশি এই দুই জাতীয় জগতের ভিতরে শুধু উপবৃত্তাকার জগতের অত্যধিক রক্তিম আভা যে ধূলিকণার কারসাজি নয়, এটা তিনি বুঝতে পারলেন। বর্তমানে আমরা যে লাল রঙের উপবৃত্তাকার তারকার জগৎ দেখছি, প্রকৃতপক্ষে তা অনেক আগেকার—যখন লাল তারকার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল, কিন্তু সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমান্বয়ে এই সংখ্যা কমে গেছে। সময়ের সঙ্গে নক্ষত্র-জগতের এই যে ক্রমবিবর্তন, তা কিন্তু গোল্ড-হয়েলের স্থিতিস্থাপক বিশ্বের বিরোধী।

বিয়োগবোধক বক্রতা—অনেক গণিতজ্ঞের মতে ক্রমবর্ধমান বিশ্বের প্রসরণশীলতা অনন্ত কাল ধরে চলবে। তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, নক্ষত্র-জগতের অপসরণ বেগজনিত গতীয় শক্তি নিউটনের মহাকর্ষ-সৃষ্ট স্থিতিস্থাপকতা শক্তির প্রায় ৬৫০ গুণ, যার ফলে পরস্পর দুটি জগতের অপসরণ বেগ তাদের নিষ্ক্রমণ বেগকে (Escape velocity) ছাড়িয়ে যায়, যার দরুণ এরা পরাবৃত্তাকার পথে দূর থেকে দূরে সরে যায়, অর্থাৎ সোজা কথায় বিশ্বস্ফীতির কোন শেষ নেই। হাব্‌ল অতি সতর্কতার সঙ্গে বিপরীত বর্গসূত্র প্রয়োগে সুদূর নক্ষত্র-জগতের ঔজ্জ্বল্য বিচার ও দূরত্ব নির্ণয় করে দেখতে পেলেন যে, নক্ষত্র-জগতের সংখ্যা দূরত্বের ঘনফলের বৃদ্ধির হার থেকে অধিকতর দ্রুতবেগে বেড়ে যাচ্ছে। এই দেখে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, বিশ্বস্থান বিয়োগবোধক বক্রতাসম্পন্ন। তাই এটি অনন্ত ও অসীম। কিন্তু নক্ষত্র-জগতের ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিতে হাব্‌ল যে দূরত্ব বের করেছেন, তা ষ্টেব্‌বিন্স-হুইটফোর্ডের বিবর্তন-বাদ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল। এই কারণে দূরত্ব নির্ণয়ে কিছুটা সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।

গণিতের সাহায্যে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে. বিশ্বস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায়ে—

$$(\text{হাব্‌ল ধ্রুবক})^{২} = ৫{\cdot}৮ \times ১০^{-১৭} \quad [\text{গড়পড়তা ঘনত্ব}] \cdots\cdots (১)$$

বিশ্বের সর্বাধিক সঙ্কোচন মুহূর্ত থেকে সময় গণনা করে গণিত প্রমাণ করেছে—

$$\text{বিশ্বের উত্তাপ} = \frac{১{\cdot}৫ \times ১০^{১০}}{(\text{সময়})^{\frac{১}{২}}} \quad \cdots (২)$$

$$\text{বিশ্ববস্তুর ঘনত্ব} = \frac{\text{ধ্রুবক}}{(\text{সময়})^{\frac{১}{২}}} \quad \cdots\cdots (৩)$$

২ ও ৩নং সমীকরণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, বিশ্বের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার উত্তাপ ও ঘনত্ব ক্রমশঃ কমে যায়। ২নং সমীকরণে সময়—হাব্‌ল ধ্রুবক $= \frac{১০^{১৭}}{১{\cdot}৮}$ সেকেণ্ড ধরলে বিশ্বের বর্তমান পরম উত্তাপ (Absolute temperature) যে ৫০° বের হয়, তা বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। ১ ও ৩নং সূত্র থেকে একথা সহজেই প্রমাণিত হয়

যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাব্‌ল্ ধ্রুবকেরও কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

স্পন্দন বাদ—বিশ্বের আসল রূপ ঠিক করে বলা আজও সম্ভব হয় নি। এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন বিশ্ব সসীম, আবার কেউ বলেন অসীম এবং এর প্রসরণ চলবে অনন্ত কাল। কিন্তু বর্তমানে স্পন্দন বাদে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বিস্তৃতি চিরকাল ধরে চলবে না। ক্যালিফোর্ণিয়ার ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজীর ডাঃ আর. সি. টলম্যান বলেন, যখন মহাবিশ্বের ভর নির্দিষ্ট সন্ধিমান ছাড়িয়ে যাবে, তখন আপনা-আপনিই তার বিস্ফারণ বন্ধ হয়ে যাবে। তারপরে সুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। দীর্ঘকাল ক্রমবর্ধমান সঙ্কোচনের ফলে যখন বিশ্ব ন্যূনতম আয়তন লাভ করবে, তখন আবার সুরু হবে প্রসরণ। এভাবেই স্পন্দনশীল বেলুনের মত পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে মহাবিশ্বের সঙ্কোচন ও প্রসরণ। বিভিন্ন মতবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই, তবে একটা বিষয়ে সবাই একমত যে, বর্তমান বিরাট বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিপুল বেগে সম্প্রসরিত হচ্ছে।

মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্র ২৭০ কোটি আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্র-জগতের স্তবক পর্যন্ত আমাদের নিয়ে এসেছে এবং মাউন্ট প্যালোমার বীক্ষণাগারের ২০০ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ আমাদের দৃষ্টিশক্তি ৬৫০ কোটি আলোক-বর্ষেরও বেশী প্রসারিত করেছে। কিন্তু এখানেই বিশ্বের ইতি নয়—এরপর বেতার-দূরবীক্ষণের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির শেষ সীমায় যে অস্পষ্ট নক্ষত্র-জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায় যে, এর অপসরণ বেগ হলো আলোর বেগের নয়-দশমাংশ। এর পরেও এমন সব জগৎ রয়েছে, যাদের বেগ আলোর বেগের সমান। কিন্তু এদের পরিচয় মানুষ কোন দিনই পাবে না। তাই বিশ্বকে জানা কখনও সম্ভব নয়। এই অন্তহীন বিশ্বে মানুষ কত মর্মান্তিকভাবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তবুও মূর্খের মত তার দুর্জয় সাহস—বিশ্বকে জানতে হবে।

সুগন্ধ মিশ্রণের ধারা ঃ বিজ্ঞানী পাউচার

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

সুগন্ধ তৈরি ও মিশ্রণের ধারা প্রাচীন। আমাদের দেশে আতর তৈরি ও ব্যবহারের বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায়। নূরজাঁহা নাকি গোলাপী আতরের উদ্ভাবন করেছিলেন। বিজ্ঞানী পাউচারের বইয়ে এই বিষয়ে নিম্নোক্তরূপ উল্লেখ রয়েছে—মুঘলদের একজন তাঁর উদ্যানে গোলাপ জল দিয়ে জলাশয়গুলি ভর্তি করে রাখতেন। রাজকুমারীদের মধ্যে একজন এই রকম জলের উপরে ভাসতে দেখলেন তৈলাক্ত জিনিষ এবং তিনি তা সংগ্রহ করালেন। দেখা গেল, তা অত্যন্ত সুগন্ধময় এবং রাজকুমারী তাকে সযত্নে রেখে দিলেন।

গোলাপজাত দুটি জিনিষের খুব বেশী প্রচলন—অটো (Otto) ও আতর। মনে রাখা দরকার যে, দুটির মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। গোলাপের খাঁটি গন্ধবহ তেলটি হলো—অটো। আর আতর হলো, চন্দন তেলে ডুবিয়ে রাখা

গোলাপ ফুলের নির্যাস। ইউরোপে অটোর প্রচলন (দেশী আতরের চেয়ে) বেশী।

সুগন্ধ প্রস্তুত করতে হলে কয়েকটি উপাদান মিশিয়ে করা যায়—একথা স্বীকার্য ও সর্বজনবিদিত। তবে যদি কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিত অবস্থায় তা করা হয়, তবে জাপানীদের কৃত ইংরেজি প্রবাদ Out of sight, out of mind-এর হাস্যকর ভাবান্তর Unseen is insane-এর মতই হয়ে দাঁড়ায়; অর্থাৎ বিজ্ঞানানুগভাবে সুগন্ধ প্রস্তুত না হলে তার মধ্যে দোষত্রুটি অনেক কিছুই রয়ে যাবে। দীর্ঘস্থায়িত্বের অভাব, অদ্রব অবস্থায় কোন কোন উপাদানের উদ্ভব, দোকানে বা খরিদ্দারের কাছে অন্য রকম অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হতেই পারে, যদি বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে সুগন্ধ মিশ্রিত না হয়ে থাকে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে হয় এই যে, সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত হলে সুগন্ধের ফলাফলও নিশ্চয়ই সুষম হবে—অর্থাৎ সেরূপ ক্ষেত্রে সুগন্ধ হয়ে উঠবে সব রকমের কুক্রিয়াবর্জিত, এক শালীনতাপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত রুচিকর সৌরভ। স্বভাবতঃই এই রকমের সুগন্ধ হবে নাসিকাগ্রাহ্য।

দেখা গেছে যে, গন্ধবহ তেলের (Essential oil) ধরণ ও ধাঁজ নির্ভর করে 'দেশে কালে চ পাত্রে চ'। তাছাড়া প্রভাব রয়েছে জলবায়ুর, সংগ্রহকালীন সময়ের, আনুষঙ্গিক উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সময়ে আবহ অবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সরল ও জটিল বিষয়ের। একথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে, উপযুক্ত কারণগুলির যে কোন একটি সুগন্ধবহ তেলের মান নির্ণায়ক। এছাড়াও কত রকমের অন্য কারণ রয়েছে, যারা অলক্ষ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে গন্ধবহ তেলের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

অনেকের মনে হয়তো স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে যে, তবে যে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে বা একদেশ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সুগন্ধবহ তেলের সঞ্চয় এই সমস্যার হাত থেকে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যে নিষ্কৃতি দেবে না কি? কিন্তু সে ক্ষেত্রেও অন্তরায় রয়েছে। সুগন্ধবহ তেল দীর্ঘকাল জমা হয়ে পড়ে থাকলে ধীরে ধীরে বিকৃত হতে থাকে, বিকৃতি পরিশেষে সুগন্ধকে কোন্ পর্যায়ে পরিচালিত করবে, তা বলা দুষ্কর। এমনও হতে পারে যে, পূতিগন্ধই তার শেষ পরিণতি।

শুধু কি তাই? ধরে নেওয়া গেল যে, এক দেশের একই ফলন-কালের ফুল সংগৃহীত হলো। তাতেও সমতা বজায় রাখবার হাত থেকে নিস্তার নেই। যে পদ্ধতিতে নির্যাস নিষ্কাশিত হবে (যেমন Enfleurage, Chassis ইত্যাদি পদ্ধতির দ্বারা), তার উপরও নির্ভরশীল সুগন্ধের গুণাগুণ ও মাত্রাধিক্য

বিভিন্নরূপে প্রাপ্ত যুঁই ফুলের অ্যাবসলিউট একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্বোক্ত দুটি পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত অ্যাবসলিউটের মধ্যে সুগন্ধের বেশ কিছু তারতম্য হয়ে থাকে। আবার তদুপরি দ্রাবক মাধ্যমের (যেমন, বেন্‌জিন, পেট্রোলিয়াম ইথার) উপরেও সুগন্ধের মাত্রাভেদ হয়ে থাকে।

আবহ ও ভূতাত্ত্বিক পার্থক্যের দরুণ পূর্বভারতীয়, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ান ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের চন্দনের তেলে সৌরভ ও উপাদানের কত প্রভেদই না রয়েছে! পূর্বভারতীয় চন্দন তেলের বৈশিষ্ট্য (সুগন্ধ বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় Balsamic note) পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ান চন্দন তেলের নেই বলে মনে হয়।

সম-মানের উপাদান ব্যবহৃত হলে তবেই তো সর্বদা আশা করা যায় হুবহু সুগন্ধের উৎপাদন। তাই সম-মানের উপাদান সংগ্রহ করবার জন্যে

কত প্রয়াসই না হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশ্বস্তসূত্রে এমনও খবর পাওয়া গেছে যে, কোন এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সুগন্ধ প্রস্তুতকালে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়, সেগুলির সংখ্যা নিতান্ত বেশী নয়। তথাপি সেই প্রতিষ্ঠানের একখানি খাতা রয়েছে, যার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সুগন্ধের নাম, বৈশিষ্ট্য, রাসায়নিক ধ্রুবাঙ্ক (Constant), সরবরাহকারী স্থানের নাম, ফলনের সময়, উদ্ভিদের বয়স ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মাননির্ণায়করূপে নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতির দ্বারা বেশ সুফল পাওয়া যায় এবং পাওয়ারই কথা। তবে এই ব্যাপারে খাতার ভিতরে ভাষায় সবটাই তো ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, সেখানে ভাষা হয়ে দাঁড়ায় ব্যঞ্জনা, আভাস ও ইঙ্গিত। ভেষজবিদ্যার পরিপোষকরূপে রয়েছে 'ফারমাকোপিয়া' শ্রেণীর বই। কিন্তু সুগন্ধ-বিজ্ঞানে এমন বই অসম্ভব; কয়েকটা রাসায়নিক গুণাবলীর সংগ্রহই সেখানে যথেষ্ট নয়। উপরন্তু প্রয়োজন রয়েছে তীব্র ও তীক্ষ্ম ঘ্রাণশক্তির।

সুগন্ধ মিশ্রণের ধারা লিপিবদ্ধ-করা যে খাতা বা বই থাকবে, তাতে উৎস বা সরবরাহকারী দেশ, প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাকারের আনুষঙ্গিক ব্যাপার তো থাকবেই। কারণ সুগন্ধের উপর এদের প্রভাব সর্বাধিক। তাছাড়া বিভিন্ন ধরণের প্রাপ্য সুগন্ধ বা গন্ধবহ তেলের উৎসও জানা দরকার। ধরা যাক, এনিশিক অ্যালডিহাইড-এর কথা। সচরাচর দুটি উপায়ে এটি পাওয়া যায়—প্যারা-ক্রেশল অথবা এনিথল থেকে। জিরেনিয়ল পাওয়া যেতে পারে পামারোজা (Ex-palmarosa) অথবা পিনিন (Ex-pinene) থেকে। তেমনি লিনালিল অ্যাসিটেটের উৎস—বয়েস ড্য রোজ, পেটিটগ্রেন, শিউ অথবা পিনিন। বলা বাহুল্য পৃথক পৃথক উৎসজাত সুগন্ধের মাত্রারও তারতম্য রয়েছে। যে সুগন্ধের মিশ্রণে বিশেষ ধরণের যে উপাদান ব্যবহৃত হয়, বরাবরই তা ব্যবহৃত হওয়া উচিত; অর্থাৎ গোলাপের কোন কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুতকালে যদি জিরেনিয়ল (পামারোজাজাত) ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তবে বরাবরই তা ব্যবহার করতে হবে। অন্য উপায়ে প্রাপ্ত (যেমন পিনিন থেকে) জিরেনিয়ল ব্যবহার করা চলবে না বা চলা উচিত নয়। এর কারণ অতি সরল। এই রকমের সঙ্কীর্ণ পদ্ধতি অবলম্বিত না হলে সুগন্ধের মান-বিভ্রম ঘটবে।

অ-ডি-কোলন এবং ল্যাভেণ্ডার জল জাতীয় সুগন্ধ প্রস্তুতকালে খুব বেশী উপাদান লাগে না, নিরোলি, ল্যাভেণ্ডার শ্রেণীর গুটিকয়েক উপাদান প্রচুর অ্যালকোহল (Alcohol) বা সুরাসার সহযোগে এগুলি প্রস্তুত হয়। অল্পসংখ্যক উপাদানের দরুণ প্রতিটি উপাদানের মানের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য বিষয়। এসব মিশ্রণের বেলায় ফলন-কালের প্রতি নজর রাখা অতি প্রয়োজন। কারণ সকল ঋতুতে একই ফসলের সমান সুগন্ধ থাকে না। জিরেনিয়াম অয়েলের তিনবার ফলন-কাল—বসন্ত সমাগমে, জুন মাসে এবং কদাচিৎ অক্টোবর, নভেম্বরে। প্রথম ফলনটিই এর মধ্যে প্রশস্ত। ফলন তখনই সংগ্রহ করা হয়, যখন পাতাগুলি হলদে হতে সুরু করে; কারণ এমনি সময়েই লেবুর গন্ধ থেকে গোলাপের গন্ধ পরিবর্তিত হতে দেখা গেছে।

সুগন্ধ প্রস্তুতকালে মিশ্রণযোগ্য উপাদানগুলির সবই যে জলবৎ তরল হবে—এমন কোন কথা নেই। হয়তো ভ্যানিলিন, কুমারিন, হেলিওট্রোপিন, মাস্ক, রেজিনোইড্স্ শ্রেণীর গুঁড়া বা আঠালো জিনিষেরও ভুরি ভুরি ব্যবহার রয়েছে। মিশ্রণ-ধারার ভিতর যদি কোন দ্রাবক (যেমন ডাই-ইথাইল থলেট, বেনজাইল বেনজোয়েট) না থাকে, তবে সমস্যায় পড়তে হয়—কিসে গুঁড়া বা

কঠিন উপাদানগুলি দ্রব করা যাবে। গরম জলের কুণ্ডের (Water bath) উপর স্বল্পকাল গরম করলে ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল, বেঞ্জায়িল অ্যাসিটেট অথবা জিরেনিয়ল শ্রেণীর তরল উপাদানগুলি দ্রাবকরূপে নিরাপদে কার্যকর থাকে। তবে সাবধান হতে হয় লেবুজাতীয় উপাদানের বিষয়ে। এগুলি গরম করা মোটেই নিরাপদ নয়। মিশ্রণকালে এদের মাত্রাধিক্য হয়তো থাকতে পারে। তা সত্ত্বেও এদের গরম করবার অর্থ এদের সুগন্ধের বিনাশসাধন ও দ্রুত হারে পরিবর্তন।

অনেক সময় এমন সব উপাদানের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যেগুলির মিশ্রণ কালে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। তারপর রয়েছে অধঃক্ষেপ (Precipitate) উদ্ভাবনের সমস্যা। দেশী সুইট অরেঞ্জ তেলের সঙ্গে রোজমেরীয় তেল মিশ্রিত হলে মিশ্রণটি ঘোলা হয়ে যায়। কখনও কখনও গুঁড়া গুঁড়া Precipitate-ও মিশ্রণ-পাত্রের তলদেশে জমা হয়। এই ধরণের ব্যাপার একেবারেই পরিত্যাজ্য। তারপর রয়েছে কয়েক শ্রেণীর সুগন্ধ বা দ্রাবকের (ত্বকের উপরে) কুপ্রভাব। যেমন, একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মিথাইল হেপ্টিন কার্বনেট। লিপস্টিক (Lipstick) সুগন্ধিত করতে যে সুগন্ধ ব্যবহার করা হয়, তাতে সামান্য মাত্রায় মিথাইল হেপ্টিন কার্বনেট থাকলে অধর-ওষ্ঠ ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা গেছে।

সুগন্ধ তৈরির জটিল মিশ্রণের ধারা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং কত রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, তার একটা মোটামুটি বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

(ক) মিশ্রিত উপাদানের ভিতর যদি মুক্ত (বা অসংযুক্ত) অম্ল ও অ্যালকোহল থাকে, তবে উভয়ে এস্টার তৈরি করবে।

$$R_1.COO\ \boxed{H+HO}\cdots R_2 \rightarrow H_2O+R_1.COOR_2$$
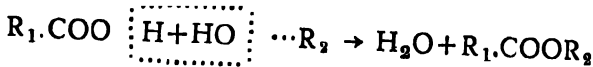
অম্ল অ্যালকোহল

(খ) এস্টারগুলির পরস্পর বিনিময় সাধন (Trans-esterification)

$$R_1.COOR_2+R_3.COOR_4 \rightarrow R_1\ COOR_4+R_3.COOR_2$$
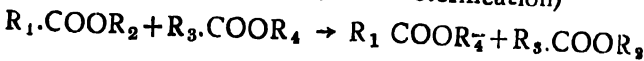
(গ) মুক্ত অ্যালডিহাইড ও অ্যালকোহল সহযোগে অ্যাসিটাল অথবা অধিকতর সম্ভাব্য হেমি-অ্যাসিটাল উৎপাদন।

(ঘ) ট্রান্স-অ্যাসিটালিজেসন।

(ঙ) অ্যালডল উৎপাদন ইত্যাদি। এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখের দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

শাখাপল্লব সমন্বিত এক বিরাট মহীরুহ যেমন তার চতুষ্পার্শ্বে সুশীতল ছায়ার সৃষ্টি করে, এর প্রতিটি শাখা-প্রশাখা-পত্রই এই ব্যাপারে অবদান যোগায়। অনুরূপভাবে বিজ্ঞানানুগভাবে মিশ্রিত হলে সুগন্ধের রূপায়ণ হয় সার্থক এবং তখন প্রতিটি উপাদানই নাসিকাগ্রাহ্য মনমাতানো স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনায় সহায়ক হয়।

সুগন্ধ-বিজ্ঞানী পাউচার

বিশ্বের খ্যাতিমান সুগন্ধ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম হলেন উইলিয়াম আর্থার (অথবা আরও পরিচিত 'ওয়াল্টার') পাউচার (William Arthur Poucher)। এঁর জন্ম ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে; জন্মস্থান—হর্নক্যাসল, লিঙ্কনশায়ার। প্রাথমিক

বিদ্যালয়—বাথ কলেজ এবং লণ্ডনের কিংস কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্তির পর ইনি এক কেমিষ্ট-প্রতিষ্ঠানে চার বছর কাজ করেন। বিকাশোন্মুখ জীবনে সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা যায়। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্বেই সাধারণের কনসার্টে অংশগ্রহণ করতেন। এই সময়ে দিনে ছ-ঘণ্টা ধরে পিয়ানো বাজাতে অভ্যাস করেছিলেন। এইরূপ একাগ্র আত্মনিয়ন্ত্রণ মন্ত্র ভাবী জীবনে সূক্ষ্ম সুগন্ধ-বিজ্ঞানে তাঁকে বিজেতার আসন দান করেছিল।

পাউচার হলেন Perfumes, Cosmetic and Soaps নামক অতি সারবান পুস্তকের রচয়িতা। ইনি ফার্মাসিষ্ট, রসায়নশাস্ত্রী ও প্রসাধন বিশেষজ্ঞ, আমেরিকার সোসাইটি অফ কস্‌মেটিক কেমিষ্টস্‌-এর সুবর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত (১৯৫৪) এবং বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে নিঃসন্দেহে সর্বাধিক খ্যাতিমান বৃটিশ সুগন্ধ-বিজ্ঞানী।

জীবনের প্রারম্ভে পাউচার চিকিৎসক হবার আশায় St. Bartholomew-এর হাসপাতালে যোগদান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টশতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সোম (Somme) নদের তীরে যুদ্ধে ফার্মাসিষ্টরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে তিনি উপদেষ্টা রসায়ন-বিজ্ঞানীরূপে স্থিত হলেন এবং তখনই উপর্যুক্ত পুস্তকখানি প্রণয়ন করেন। বিগত ৪০ বছরে পুস্তকটির ৭টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং ফরাসী ও জাপানী ভাষায় পুস্তকখানির অনুবাদ হয়েছে।

ছবি তোলা (ফটোগ্রাফি) উপর পাউচারের ঝোঁক দীর্ঘকালের। লিখেছেন—'Escape to the Hills', এছাড়া স্কটল্যাণ্ড সম্বন্ধে পাঁচখানি, লেক ডিষ্ট্রিক্ট বিষয়ে দুখানি, উত্তর ওয়েলস বিষয়ক তিনখানি, Pennines সম্বন্ধে দু'খানি এবং আয়ারল্যাণ্ড, সুরুয়ে (Surrey) এবং ডোলোমাইটস্‌—প্রত্যেক বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন। পর্বতারোহণের প্রতি তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ রয়েছে। তাঁর সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে ২৫,০০০ মনোক্রোম নেগেটিভ এবং ১০,০০০ কলার ট্রান্সপারেন্সি এবং বহু এনলার্জ্‌ড্‌ প্রিণ্ট। কিন্তু এই ৩৫,০০০ ছবির সংগ্রহ এমন সুষ্ঠুভাবে সাজানো আছে যে, প্রায় নিমেষের মধ্যে যে কোন ছবি তিনি বের করে ফেলতে পারেন। বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা পাউচার এমনও দুর্লভ স্থানে বিচরণ করেছেন, যেখানে তিনিই হলেন প্রথম ইংরেজ ভ্রমণকারী। তাঁর দূর ভ্রমণ চলেছে অবাধে—Zermatt, Chamonix, Canada, New Mexico এবং Grand Canyon। এঁর প্রিয় খেলা হলো গল্‌ফ্‌। মোটর গাড়ী চালনায়ও তিনি সুদক্ষ ও সাবধানী। সুগন্ধ-বিজ্ঞানী পাউচার, পর্বতারোহণকারী, ফটোগ্রাফার ও গল্‌ফ্‌ ক্রীড়ামোদীও রয়েছেন এত প্রবীণ বয়সে।

থার্মো-ইলেকট্রিসিটি

শ্রীসৌরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বস্তুজগতে অহরহ সংঘটিত হচ্ছে কত ঘটনা। আমরা সচেতন ভাবে না দেখলে বা না জানলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কোন সময় থেমে নেই—প্রতি মুহূর্তে আগের থেকে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। জড়জগতের এই পরিবর্তনকে আমরা কয়েকটা ধাঁচে ফেলে বিচার করতে পারি। যেমন বস্তুর সঙ্গে বস্তুর বিক্রিয়া, শক্তি ও বস্তুর বিক্রিয়া, শক্তির এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তন প্রভৃতি। এর মধ্যে তৃতীয় ধাঁচের এক বিশেষ ঘটনা—থার্মো-ইলেকট্রিক এফেক্ট বা তাপ-শক্তির বিদ্যুতে পরিবর্তন বর্তমান আলোচ্য বিষয়।
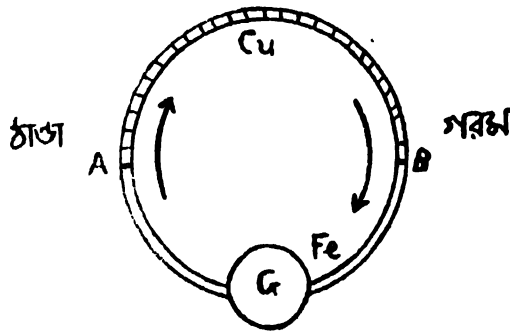
শক্তির রূপ পরিবর্তন বিজ্ঞানের এক মূল নীতি। এই নীতিরই প্রকাশ দেখি আলোক শক্তির বিদ্যুতে রূপান্তরে—ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্টে; রাসায়নিক শক্তির বিদ্যুতে রূপান্তরে—সাধারণ বৈদ্যুতিক সেল-এ। তাপ-শক্তিকেও যে অনুরূপভাবে বিদ্যুতে পরিবর্তিত করা যায়—এই তথ্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন সীবেক ১৮২১ সালে।

তিনি দেখান যে, দুটি বিভিন্ন ধাতুর তার দিয়ে একটা বর্তনী (Circuit) তৈরি করে ধাতুদ্বয়ের সংযোজক দুটি স্থানের মধ্যে তাপমাত্রার প্রভেদ রাখলে বর্তনী দিয়ে তড়িৎ-স্রোত বা কারেন্ট প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি এর নাম দেন থার্মো-ইলেকট্রিসিটি। ১নং চিত্রে দেখানো হয়েছে—তামা ও লোহার তার দিয়ে একটা বর্তনী করা হয়েছে। বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশক একটা গ্যালভ্যানোমিটারও রাখা হয়েছে। প্রারম্ভে A ও B ধাতুদ্বয়ের উভয় সংযোগকেই 0° সেঃ তাপমাত্রায় রেখে দেওয়া হলো। তারপর কোন এক সংযোগ, ধরা যাক A-কে সব সময়ই 0° সেঃ তাপমাত্রায় রেখে B-কে আস্তে আস্তে তাপ দেওয়া হতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্যালভ্যানোমিটারে কাঁটার বিক্ষেপণ দেখা যাবে; অর্থাৎ বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত

১নং চিত্র

হতে থাকবে। প্রবাহের গতিপথ হবে গরম সংযোগ স্থানে তামা থেকে লোহায় এবং ঠাণ্ডা সংযোগে লোহা থেকে তামায় (তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে)। যতই গরম সংযোগের তাপমাত্রা বাড়ানো হবে, ততই এই প্রবাহের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। অবশেষে প্রায় ২৭৫° সেঃ তাপমাত্রায় তড়িৎ-প্রবাহের মান হবে সর্বোচ্চ। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে মান কমতে থাকবে—কমতে কমতে ৫৫০° সেঃ তাপমাত্রায় মান হবে শূন্য অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তাপমাত্রা আরও বাড়ালে তড়িৎ-প্রবাহ আবার সুরু হবে, তবে এবার হবে বিপরীত ও দিক যে আগের মতই হবে, তার কোন মানে নেই। সেটা নির্ভর করবে ধাতুদ্বয়ের পরস্পরের আপেক্ষিক ধর্মের উপর ও সংযোগ-স্থল দুটিতে তাপমাত্রার প্রভেদের উপর। সীবেক পরীক্ষার ফলাফল হিসেবে একটা তালিকা করে তাতে অনেকগুলি ধাতু সাজিয়ে দিয়েছেন। অংশতঃ এই তালিকা হলো:

Bi—Ni—Co—Pd—Pt— U—Cu—Mn—Ti— Hg—Pb—Sn—Cr—Mo—Rh—Ir—Au—Ag—Zn—W—Cd—Fe—As—Sb—Te। এই তালিকায় দুটি তাৎপর্য আছে—১। এর যে কোন দুটি ধাতু দিয়ে পূর্বোক্ত পরীক্ষা
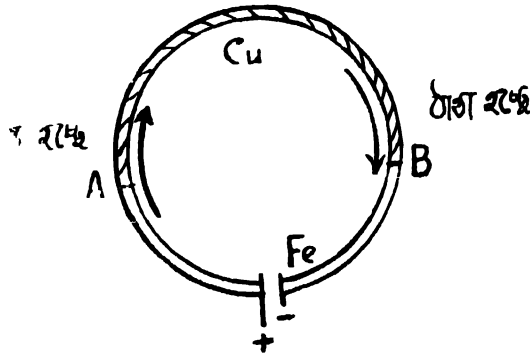
২নং চিত্র

দিকে; অর্থাৎ গরম সংযোগে লোহা থেকে তামায় এবং ঠাণ্ডা সংযোগে তামা থেকে লোহায় (২নং চিত্র)। এরূপ তাপমাত্রার পারিভাষিক নাম Inversion temperature।

সীবেক কর্তৃক আবিষ্কৃত এই ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সীবেক এফেক্ট এবং এই এফেক্টে অংশ গ্রহণকারী ধাতুদ্বয়ের যুগ্ম-ভূমিকার নাম থার্মো-কাপ্‌ল্।

শুধু তামা ও লোহার মধ্যেই নয়, অন্য যে কোন দুটি বিভিন্ন ধাতু দিয়েও এই পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। তবে তড়িৎ-প্রবাহের মান করলে যে ধাতু আগে থাকবে, তাথেকে পরের ধাতুতে (গরম সংযোগ দিয়ে) তড়িৎ-প্রবাহ যাবে। ২। তালিকায় ধাতুদ্বয়ের দূরত্ব মোটামুটি সেই কাপ্‌লের তড়িৎ-প্রবাহের মাত্রার পরিচায়ক; যেমন—বিসমাথ (Bi) ও অ্যান্টিমনির (Sb) থার্মো-কাপ্‌ল্, লোহা (Fe) ও তামার (Cu) থার্মো-কাপ্‌লের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কারণ Bi ও Sb-এর দূরত্ব Cu ও Fe-এর দূরত্ব অপেক্ষা অনেক বেশী। এই তালিকায় অবশ্য ধরে নেওয়া হয়েছে যে, গরম সংযোগের তাপমাত্রা সব সময় Inversion temp.-এর নীচে থাকবে।

Inversion ঘটনাটা আবিষ্কার করেছিলেন কামিং, সীবেকের আবিষ্কারের কিছুকাল পরে। তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, যদি পূর্বোক্ত তামা-লোহার কাপ্‌লে ঠাণ্ডা সংযোগের তাপমাত্রা 0° সেঃ না রেখে, ধরা যাক ১০° সেঃ রাখা যায়, তাহলেও বর্তনীতে সর্বোচ্চ তড়িৎ-প্রবাহ যাবে, যখন গরম সংযোগের তাপমাত্রা ২৭৫° সেঃ। কিন্তু এবার তড়িৎ-প্রবাহের মান শূন্য ও তার দিক পরিবর্তন ঘটবে ৫৫০° সেঃ-এ নয়, ৫৪০° সেন্টিগ্রেডে। সুতরাং গরম সংযোগের যে তাপমাত্রায় তড়িৎ-প্রবাহ সর্বোচ্চ হয়, তা প্রত্যেক কাপ্‌লের জন্যে নির্দিষ্ট। এই তাপমাত্রার নাম দেওয়া হয়েছে নিরপেক্ষ তাপমাত্রা (Neutral temp.)। কিন্তু উক্ত সংযোগের যে তাপমাত্রার জন্যে তড়িৎ-প্রবাহ শূন্য ও বিপরীতমুখী হতে আরম্ভ করবে, তা নির্দিষ্ট নয়। ঠাণ্ডা সংযোগের তাপমাত্রা নিরপেক্ষ মান থেকে যত কম, Inversion তাপমাত্রা উক্ত মানের চেয়ে তত বেশী।

কাপ্‌লের কার্যকারিতা নির্ণীত হয় তার থার্মো-ইলেকট্রিক পাওয়ার দিয়ে। একথা সবাই জানেন যে, তড়িচ্চালক বলের (e. m. f.) জন্যেই কোন বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে পারে। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তড়িৎ-প্রবাহ চলবার জন্যে বর্তনীতে উদ্ভূত একটা তড়িচ্চালক বল কাজ করে। এখন প্রথমে উভয় সংযোগকে $T°$ তাপমাত্রায় রেখে এক সংযোগের মান $\Delta T°$ বাড়ালে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বল যদি ΔE হয়, তবে $T°$-তে কাপ্‌লের থার্মো-ইলেকট্রিক পাওয়ার হচ্ছে $\Delta E/\Delta T$; অর্থাৎ সাধারণভাবে $T°$ ও $(T+1)°$ তাপমাত্রাদ্বয়ের জন্যে কাপ্‌লে কত তড়িচ্চালক বল উদ্ভূত হয়।

সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রার পার্থক্য ও কাপ্‌লের তড়িচ্চালক বলের সম্পর্কটা মজার। তাপমাত্রার পার্থক্যকে x-অক্ষ ও তড়িচ্চালক বলকে y-অক্ষ ধরলে উভয়ের রেখচিত্র প্রাথমিক দৃষ্টিতে দেখতে হয় অধিবৃত্তাকার (Parabolic)। অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও আছে।

পেলশার এফেক্ট (Peltier effect)—১৮৩৪ সালে পেলশার সীবেক এফেক্টের উল্টো ঘটনা অর্থাৎ বিদ্যুতের তাপে পরিবর্তনের ঘটনা আবিষ্কার করেছিলেন। দুটি বিভিন্ন ধাতু জুড়ে একটা থেকে অন্যটায় তড়িৎ-স্রোত পাঠালে সংযোগ স্থল—হয় ঠাণ্ডা, নয় তো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; অর্থাৎ তাপের শোষণ হয় কিংবা উদ্ভব ঘটে। দিক পরিবর্তন করে তড়িৎ-স্রোত পাঠালে আগে যা হচ্ছিল, তার বিপরীত হতে থাকে।

সীবেকের বর্তনীর অনুরূপ একটা বর্তনী নেওয়া যাক। তবে এই বর্তনীতে সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রা সমান রেখে একটা ব্যাটারী দিয়ে তড়িৎ-স্রোত পাঠানো হচ্ছে। তুলনার জন্যে তড়িৎ-প্রবাহের গতিপথ প্রথমোক্ত পরীক্ষার মতই রাখা হলো। দেখা যাবে, এবার B সংযোগ ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা এবং A সংযোগ ধীরে ধীরে গরম হতে থাকবে; অর্থাৎ সীবেক এফেক্টে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাবার জন্যে যে সংযোগকে গরম করতে হয়েছিল, পেলশার এফেক্টে ব্যাটারী দিয়ে একই দিকে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে সেই সংযোগই ঠাণ্ডা হতে থাকবে। এথেকে বোঝা যায় যে, যখন শুধু তাপমাত্রার প্রভেদ হেতু সীবেক তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে থাকে, তখনও B-তে তাপ শোষণ এবং A-তে তাপোদ্ভব হতে থাকে। B ও A-তে যথাক্রমে তাপের উৎস ও শোষক না রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যে উভয়ের তাপমাত্রা সমান হয়ে যাবে ও তড়িৎ-স্রোত বন্ধ হয়ে যাবে। সীবেক তড়িৎ-প্রবাহ চালু রাখতে গেলে বাইরে থেকে তাপ সরবরাহের প্রয়োজন, এথেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। পেলশার এফেক্ট Reversible অর্থাৎ তড়িৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে সংযোগ-

দ্বয়ের এফেক্টও অদলবদল হয়ে যায়—একথা আগেই বলা হয়েছে।

পেলশার এফেক্ট ও জুল এফেক্টের গোলমাল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকায় উভয়ের পার্থক্যটা বলে নেওয়া ভাল। যে কোন বর্তনীতে তড়িৎ-প্রবাহ চললে বর্তনীর রোধের (Resistance) দরুণ কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপকে বলা হয় জুল-তাপ (Joule-heating)। প্রবাহ যে দিকেই চলুক না কেন, এই তাপ সব সময়েই উৎপন্ন হবে, কখনও শোষিত হবে না, অর্থাৎ এটা তড়িৎ-প্রবাহের দিক নিরপেক্ষ। এজন্যে জুল-তাপকে বলা হয় Irreversible, কিন্তু পেলশার এফেক্ট Revrsible। এখানেই উভয়ের মূলগত পার্থক্য।

উভয় এফেক্টের ব্যাখ্যায় সরল ইলেকট্রন তত্ত্ব

সরল ইলেকট্রন তত্ত্ব দিয়ে আলোচ্য এফেক্ট-দ্বয়ের প্রাথমিক দিকগুলি বেশ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি, ধাতু বিদ্যুতের পক্ষে সুপরিবাহী। আধুনিক তত্ত্ব অনুযায়ী পরিবাহী বস্তুগুলি তাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন ধরে রাখে। এই ইলেকট্রনগুলি অন্তরাণবিক শূন্যে মুক্তভাবে ছুটাছুটি করে বেড়ায়। সে দিক দিয়ে এদের ব্যবহার অনেকটা গ্যাসের অণুর মত হওয়ায় এদের অনেক সময় ইলেকট্রন-গ্যাস বলেও অভিহিত করা হয়। একক আয়তনে এদের সংখ্যা (ঘনত্ব) ধাতু এবং ধাতুর তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। যখন দুটি বিভিন্ন ধাতু একপ্রান্তে যুক্ত করা হয়, তখন একের ইলেকট্রন-ঘনত্ব সাধারণতঃ অন্যের ঘনত্ব থেকে পৃথক হওয়ায় উচ্চ ঘনত্বের ধাতু থেকে নিম্ন ঘনত্বের ধাতুতে ইলেকট্রন পরিব্যাপ্ত হতে থাকে। এভাবে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হবার ফলে 'দাতা' ধনাত্মক এবং 'গ্রহীতা' ঋণাত্মক তড়িৎ-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে উভয়ের মধ্যে একটা তড়িৎ-ক্ষেত্র স্থাপিত হয়, যার মান বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এমন হয় যে, আর ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হতে পারে না। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে 'Dynamic equilibrium' হয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক নির্দিষ্ট বিভব-প্রভেদ স্থাপিত হয়। ধাতু দুটি অন্য প্রান্তে সংযুক্ত করলে সেখানেও অনুরূপ বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উভয় সংযোগে সৃষ্ট বিভব-প্রভেদ থেকে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বলদ্বয় পরস্পরের সমান ও বিপরীতমুখী হওয়ায় বর্তনী সম্পূর্ণ হলেও তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয় না। সংযোগদ্বয়ে তাপমাত্রার প্রভেদ থাকলে এক সংযোগের বিভব-প্রভেদ ও তড়িচ্চালক বল অন্য সংযোগের বিভব-প্রভেদ ও তড়িচ্চালক বলের সমান হয় না। কারণ আগেই বলেছি, ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। ফলতঃ উভয় বলের বিয়োগ ফলের পরিমাণ তড়িচ্চালক বল বর্তনীতে কাজ করে তড়িৎ-প্রবাহ চালাতে থাকে।

এই তো গেল সীবেক এফেক্টের ব্যাখ্যা। এই তত্ত্ব দিয়ে পেলশার এফেক্টেরও ব্যাখ্যা করা যায়। এক্ষেত্রে সংযোগদ্বয়কে একই তাপমাত্রায় রাখা হয় এবং আগের মতই উভয় সংযোগে বিপরীতমুখী তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হয়। এখন ব্যাটারী দিয়ে বর্তনীতে তড়িৎ-স্রোত পাঠালে এক সংযোগে প্রবাহকে বিভব-প্রভেদের অনুকূলে এবং অন্য সংযোগে প্রতিকূলে যেতে হয়। একটা পাহাড়ের উপর উঠতে গেলে আমাদের যেমন পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি প্রতিকূল স্থানে তড়িৎ-স্রোতকে বিভব-প্রভেদের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে কাজ করে এগুতে হয়। সেই কাজই তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই সংযোগ গরম হয়ে ওঠে। অনুকূল সংযোগে তড়িৎ-স্রোত যেন বিভব-প্রভেদের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে কাজ করে বর্তনীর বিভব-প্রভেদ, সংযোগের তাপ সঞ্চয় থেকে। ফলে সেই স্থানটি তাপ হারিয়ে আস্তে

আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। এথেকে সহজেই বোঝা যায় যে, সীবেক তড়িৎ-প্রবাহ চালাবার জন্যে যে সংযোগ গরম রাখতে হয়েছিল, পেলশার তড়িৎ-প্রবাহে সেই সংযোগই কেন ঠাণ্ডা হতে থাকে।

টমসন এফেক্ট—সার উইলিয়াম টমসন তত্ত্বগতভাবে সীবেক-তড়িচ্চালক বলের পরিমাপ বের করতে গিয়ে দেখেন—যদি কেবলমাত্র সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রার পার্থক্যই উক্ত বলের কারণ হতো, তবে সেই বল তাপমাত্রার পার্থক্যের সমানুপাতিক হবে; অর্থাৎ তড়িচ্চালক বল ও তাপমাত্রার পার্থক্য সরল রৈখিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হবে। কিন্তু আগেই বলেছি, এদের সম্বন্ধে হলো অধিবৃত্তাকার। টমসন অনুমান করলেন যে, বর্তনীতে নিশ্চয়ই আরো কোন তড়িচ্চালক বলের সন্ধান মিলবে। ইলেকট্রন তত্ত্ব দিয়েই তিনি এর সন্ধান পেলেন। তিনি দেখলেন, ইলেকট্রনের ঘনত্ব তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে—কম তাপমাত্রায় ঘনত্ব বেশী ও বেশী তাপমাত্রায় ঘনত্ব কম। সুতরাং কোন ধাতুতে যদি তাপ-মাত্রার ঢাল (Temp. gradient) থাকে, তবে ঢাল অনুযায়ী ইলেকট্রন বন্টনের জন্যে ধাতুতে একটা তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি হতে পারে। তিনি পরীক্ষা করেও দেখান যে, এক্ষেত্রেও ব্যাটারী দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠালে যেখানে প্রবাহকে তড়িচ্চালক বলের বিপরীতে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাপ উদ্ভূত হয় এবং যেখানে অনুকূলে যেতে হচ্ছে, সেখানে তাপ শোষিত হয়। এই এফেক্টের নাম দেওয়া হয়েছে টমসন এফেক্ট। সীবেক এফেক্টে গরম সংযোগ থেকে ঠাণ্ডা সংযোগ পর্যন্ত তাপমাত্রার ঢাল থাকে এবং সেখানে টমসন-তড়িচ্চালক বল কাজ করে। একে বল হিসাবে ঢুকিয়ে টমসন আশানুরূপ ফল পেলেন।

কিন্তু একটা ঘটনার এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা দিতে পারে না। তত্ত্ব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, পরিবাহী বস্তুতে তড়িচ্চালক বল সর্বদা উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রার অঞ্চল অভিমুখী হবে। কারণ উচ্চ তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব কম থাকায় সেই স্থানটি উচ্চতর বিভব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস্তবে এর বিপরীতও দেখা যায়; যেমন—বিস্মাথ, কোবাল্ট, লোহা প্রভৃতির ক্ষেত্রে তড়িচ্চালক বল উচ্চ তাপমাত্রা থেকে নিম্ন তাপমাত্রা অভিমুখী, কিন্তু তামা, রূপা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রে নিম্ন তাপমাত্রা থেকে উচ্চ তাপমাত্রা অভিমুখী।

থার্মো-ইলেকট্রিসিটির ব্যবহার

নীচে থার্মো-ইলেকট্রিসিটির তিনটি ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে বলা হলো।

(১) তাপমান যন্ত্র হিসাবে থার্মোকাপ্‌লের প্রয়োগ খুব প্রচলিত। কোন বস্তুর তাপমাত্রা মাপতে হলে কাপ্‌লের এক সংযোগ বস্তুস্পর্শে রেখে অন্য সংযোগ বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়। তাপমাত্রার বৈষম্যের ফলে যে তড়িৎ-প্রবাহ উদ্ভূত হয়, তা একটি ক্যালিব্রেটেড মাইক্রো-অ্যামিটার দিয়ে মাপা হয়। এতে তড়িৎ-প্রবাহের মানকে একেবারে বস্তুর তাপমাত্রা হিসাবে দেখানো হয়। নিকেল-নাইক্রোম কাপ্‌ল্ দিয়ে প্রায় ১২০০° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। তামা ও কন্‌স্টানটান কাপ্‌ল দিয়ে —২০০° সেঃ থেকে ৪০০° সেঃ পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। থার্মোকাপ্‌লে উদ্ভূত তড়িৎ-স্রোত খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ—তামা ও লোহার কাপ্‌লে সংযোগদ্বয়ের তাপমাত্রা ০° সেঃ ও ১০০° সেঃ হলে উদ্ভূত তড়িচ্চালক বল হবে মোটে ০·০০১৩ ভোল্ট। এজন্যে অনেকগুলি কাপ্‌ল এক সঙ্গে জুড়ে থার্মোপাইল নামে একটা যন্ত্র আছে, যা দিয়ে খুব সামান্য পরিমাণ বিকিরিত তাপও মাপা চলে। একান্তরভাবে থার্মো-সংযোগ-

গুলিকে বিকিরিত তাপের সামনে ধরা হয় ও অন্য সংযোগগুলিকে কোন নির্দিষ্ট ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় রাখা হয়।

(২) তড়িৎ-প্রবাহ নির্দেশক যন্ত্র হিসাবেও এর ব্যবহার আছে। জে. এ. ফ্লেমিং পরিবর্তী তড়িৎ-স্রোত নির্দেশক একটা যন্ত্র তৈরি করেছেন।

(৩) তড়িৎ-শক্তির উৎস হিসাবে আমরা থার্মোকাপ্‌ল্‌কে পেতে পারি। এজন্যে বর্তনীতে খুব কম প্রতিরোধ (Resistance) রাখা প্রয়োজন। আজকাল মহাকাশ-যাত্রায় যে সৌর-ব্যাটারীর কথা শোনা যায়, তা এই নীতির উপর ভিত্তি করেই গঠিত।

সঞ্চয়ন

সূর্যদেহ পরীক্ষার জন্যে মার্কিন উপগ্রহ কক্ষপথে প্রেরিত

সূর্যদেহে বিস্ফোরণ ও সৌরকলঙ্ক বর্তমানে চরম পর্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। অশান্ত সূর্যকে নানাদিক থেকে পরীক্ষার এটাই উপযুক্ত সময়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই সূর্যদেহ পরীক্ষার জন্যে নয়টি যন্ত্র সহ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ সম্প্রতি কক্ষে প্রেরণ করেছে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে—এই উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কাজ প্রাথমিক পর্যায়ে ভালই চলে। কক্ষ পরিক্রমারত সৌর মানমন্দির ও. এস-ও-৩ মহাকাশযানটি মহাকাশে নিজের অবস্থান ঠিক করে নিয়ে সূর্যের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার যন্ত্রপাতিগুলি চালু করে।

৬২১ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটি ৩৫০ মাইল উর্ধ্বে কক্ষপথে প্রেরিত হয়। উৎক্ষেপক হিসাবে ডেল্টা রকেটটি খুবই নির্ভরযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ পরিকল্পনায় ১৯৬০ সাল থেকে এইবার নিয়ে মোট ৪৬ বার এই রকেট ব্যবহৃত হলো।

সূর্যদেহ পরীক্ষা করে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সৌর ঝটিকা সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে, যার ফলে হয়তো ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব হবে।

এই পরিকল্পনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানী ওয়ার্ণার নিউপার্ট বলেন—প্রথম দুটি সৌর মানমন্দির সৌর বিস্ফোরণ সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহায্য করেছিল। তিনি বলেন, এখনও কিন্তু এই সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের জানা নেই। কাজেই এখনই কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করবার চেষ্টা করা চলে না।

সূর্যদেহে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে সৌর-জগতের মধ্য দিয়ে যে মারাত্মক তেজ বিকিরিত হয়, তা চন্দ্রগামী মহাকাশচারীদের পক্ষে গুরুতর বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। এই তেজ পৃথিবীর আবহমণ্ডলে আঘাত করে বেতার-বার্তা আদান-প্রদান বন্ধ করে দেয়, চৌম্বক ঝঞ্ঝা ঘটায় এবং পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরও প্রভাব বিস্তার করে।

সূর্যের প্রচণ্ডতা তার ১১ বছরের চক্রাবর্তনে কখনও হ্রাস পায়, কখনও বা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সূর্যদেহের বিস্ফোরণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ চরমে পৌঁছাবার দিকে এগিয়ে চলেছে। ১৯৬৯ সালে তা চরম পর্যায়ে উপনীত হবে।

ও. এস. ও-৩ মহাকাশযানে টেলিভিশনের অনুরূপ একটি যন্ত্র আছে। এই যন্ত্র সূর্যের ছবি পাঠাবে পৃথিবীতে। একটি তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল ব্যারোমিটার সৌরবিস্ফোরণের তথ্যাদি পাঠাবে।

মঙ্গলগ্রহে কি জীবন আছে?

নকল মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টিকারী একটি ইউনিট সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাকাডেমির মাইক্রোবায়োলোজিক্যাল ইনষ্টিটিউটে তৈরি করা হয়েছে। এখানকার একটি স্বচ্ছ দেয়ালের আড়ালে একটি প্রকোষ্ঠে মঙ্গলগ্রহের নকল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়; যেমন—সৌরবিজ্ঞানের তথ্যাদি অনুসারে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয় মঙ্গলগ্রহের জলবায়ু, গ্রহপৃষ্ঠে সংঘটিত দৈনন্দিন বৈচিত্র্য, তাপমাত্রার চাপ, আর্দ্রতা, আবহাওয়ার বাষ্পীয় গঠন, অতিবেগুনী বিকিরণ ও মঙ্গলগ্রহের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য।

রহস্যাবৃত লোহিত গ্রহটিতে যদি জীবনের অস্তিত্ব থেকে থাকে, তাহলে জৈব পদার্থও থাকবে। জৈব পদার্থের অস্তিত্বের সঙ্গে অপরিহার্যভাবেই নানা রকম ক্ষুদ্র জীব মানিয়ে নিতে পারে কিনা, প্রথমতঃ তা নিরূপণ করবার জন্যে এবং যদি পারে তাহলে এরূপ মানিয়ে নেবার অনুকূল কারণসমূহ খুঁজে বের করবার জন্যে নকল মঙ্গলগ্রহের পরিবেশে পরীক্ষা সুরু হয়েছে।

আগেকার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্ষুদ্র জীবসমূহের উপর উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা এবং অতিবেগুনী বিকিরণের ফলাফল কি হয়, তা দেখা হতো। বহু ব্যাক্টিরিয়া এর প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু এর আগে পর্যন্ত ক্ষুদ্র জীবগুলিকে একবার একটি উপাদান প্রতিরোধ করা সম্পর্কে পরীক্ষা করা হতো। কিন্তু আলোচ্য প্রকোষ্ঠে যে সব ক্ষুদ্র জীব নিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেগুলির উপর বিভিন্ন উপাদানের মিলনের যুগপৎ প্রতিক্রিয়া দেখা হচ্ছে।

এমন কি, প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উল্লেখযোগ্য ফলাফলও পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, রঞ্জিত ব্যাক্টিরিয়া অরঞ্জিত ব্যাক্টিরিয়ার চেয়ে মঙ্গলগ্রহের পরিবেশ অধিকতর প্রতিরোধ করতে পারে। রঞ্জিতকরণের ফলে ব্যাক্টিরিয়া অতিবেগুনী বিকিরণের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পায়। এই প্রসঙ্গে এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নয় যে, মঙ্গলপৃষ্ঠে দৃষ্ট রং বদলের কারণ হয়তো কোন না কোন ভাবে ক্ষুদ্র জীবের ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

ভেঙ্গে ভেঙ্গে জাহাজকে বন্দরে ভিড়ানো

জাহাজ সম্পর্কে সর্বাধুনিক কল্পনা হলো—মাল ওঠানো বা নামানোর সুবিধার জন্যে তাকে বিশেষ বিশেষ অংশে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

এই নতুন ধরণের জাহাজকে দেখতে হবে অনেকটা তৈলবাহী জাহাজের মত; অর্থাৎ ইঞ্জিন, নাবিকের ঘর ইত্যাদি থাকবে পিছনের দিকে। জাহাজটি হবে মোট চার-পাঁচ অংশে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশই আলাদাভাবে ভেসে থাকতে পারবে।

জাহাজটি যখন বন্দরে প্রবেশ করবে, মালবাহী অংশগুলিকে তখন বিচ্ছিন্ন করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে মাল খালাস করবার জন্যে। যে সব অংশের মাল ইতিপূর্বেই খালাস হয়ে গেছে, সেগুলিকে টেনে জাহাজের ইঞ্জিনের অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। এর ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ অন্য গন্তব্য-স্থলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে পারবে।

এই জাহাজের পরিকল্পনা করেছেন একটি বৃটিশ মেরিন ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্ম। এটি বর্তমানে বৃটিশ সরকার কর্তৃক গঠিত ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই কর্পোরেশন নতুন পরিকল্পনা ও আবিষ্কারে সাহায্য করে থাকেন।

একটি বৃটিশ জাহাজ নির্মাতা ফার্মের আর একটি পরিকল্পনা হলো—সমুদ্রে ষ্টেশন নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

সমুদ্রের উপর বিমানপথ ধরে এই ষ্টেশনগুলি নির্মিত হবে। এই ষ্টেশনগুলি থেকে বিমানকে আবহাওয়া সংক্রান্ত খবর ও নির্দেশ দেওয়া হবে এবং বিপদের সময় উদ্ধারকার্যও পরিচালনা করা যাবে।

প্রত্যেকটি ষ্টেশনে হবে বড় বড় গোলাকার ষ্টীলের প্ল্যাটফরম—অনেকটা তৈল ও গ্যাসের সন্ধানে নর্থ-সীতে ব্যবহৃত জল-ষ্টেশনগুলির মত।

বৃটেনের সিপ ইয়ার্ডে এরকম সাতটি জল-ষ্টেশনে নির্মিত হচ্ছে। সী-কোয়েষ্ট নামক ষ্টেশনটি বৃহত্তম। এর তিনটি পায়ার প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য ১৪১ ফুট। এগুলি হয় সমুদ্রের তলদেশকে স্পর্শ করে, নয় তো কূপ-খনন রীগটিকে স্থির রাখতে সাহায্য করে।

এই তিনটি পায়ার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ফুটবল মাঠের চেয়ে বড় ত্রিকোণাকার একটি ডেক। ওই ডেকের উপরই কূপ-খনন যন্ত্রটি বসানো থাকে। এর উপরে রয়েছে ৫০ জন কর্মীর জন্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসস্থান এবং একটি হেলিকপ্টার নামবার প্ল্যাটফরম।

প্রোটিন

কল্যাণকুমার চক্রবর্তী

দেহবর্ধক, পুষ্টিকারক ও ক্ষতিপূরক খাদ্যরূপে প্রোটিনের অবদান সুবিদিত। প্রোটিন মানব-দেহের প্রায় ১৫ শতাংশই অধিকার করে আছে। উদ্ভিদ নানারকম অজৈব পদার্থ থেকে প্রোটিন প্রস্তুত করে। এই প্রোটিন কঠিন বস্তু অথবা উদ্ভিদ-কোষে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের অংশ প্রাণীদেহে সৃষ্টি করে প্রাণীজ প্রোটিন। মানুষের পক্ষে অন্যান্য প্রাণীদের মত উদ্ভিজ্জ প্রোটিন সম্পূর্ণরূপে হজম করা সহজ বা সম্ভব নয়। খাদ্যের আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে অ্যামিনো অ্যাসিড, হর্মোন বা উত্তেজক রস (যথা—ACTH—Adrenocorticotropic hormone, Insulin ইত্যাদি) ও পিত্তলবণে পরিণত হয়। [অ্যামিনো-অ্যাসিড=গ্লাইসিন, লিউসিন, হিস্টিডিন, এরূপ প্রায় ২৫টি যৌগ]। কোন কোনটি আবার যকৃৎ ও বৃক্কে ডিঅ্যামিনেশন ঘটায় এবং এইভাবে উদ্ভূত অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করে ইউরিয়া এবং অ্যামিনো অ্যাসিডের অবশিষ্টাংশ তৈরি করে গ্লুকোজ কিংবা ফ্যাটি অ্যাসিড অথবা জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে। একজন বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক যে ৩০০০ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়, তন্মধ্যে প্রোটিনের দান খুব সামান্যই। নতুন কোষ-সংস্থানের বৃদ্ধি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিপূরণ করাই হলো এর প্রধান কাজ। প্রতি গ্রাম প্রোটিনে উৎপন্ন হয় ৪.৪০ কিলোক্যালরি তাপ।

আমাদের সাধারণ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রোটিনের শতাংশ নিম্নে দেওয়া হলো—

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন

উৎস	প্রোটিনের শতাংশ
চাল	৮
গম	১৪
ভুট্টা	১০
রাই	১১
ওট্ বা যই	১০
মটর	২১
চীনা বাদাম	২৯
পাউরুটি	৬·৫
কাঁচা আলু	২
শুক্‌নো আলু	৬
কলা	১·৫
মুসুর ডাল	২৫·১
মুগ ডাল	২৪·০
অড়হর ডাল	২২·৩
ছোলার ডাল	১৭·১

প্রাণীজ প্রোটিন

উৎস	প্রোটিনের শতাংশ
মাতৃদুগ্ধ	১·৩
ছাগদুগ্ধ	৪·৫
মহিষ-দুগ্ধ	৪·৫

প্রাণীজ প্রোটিন

উৎস		প্রোটিনের শতাংশ
গোদুগ্ধ		৩·৬
মাখন		০·৭৫
পণির		৩৩
মাছ		২১
মুরগীর মাংস (রন্ধন করা)		২৪
গোমাংস (রন্ধন করা)		২৬
হাঁসের ডিম	সাদা অংশ	১১·১
	কুসুম	১৬·৮
মুরগীর ডিম	সাদা অংশ	১২·২
	কুসুম	১৫·৭
মাছ—		
কই		২৩·৩
মাগুর		১৯·৫
শিঙ্গী		২৪·৫৬
ট্যাংরা		১৭·৩
মৃগেল		১৮·৭
রুই		১৭·৩
কাৎলা		১৮·২৫
ইলিশ		২০·৫

গ্রীক শব্দ প্রোটিয়োস (Proteios=প্রাথমিক) থেকে প্রোটিন কথাটির উদ্ভব। এটি কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি জটিল যৌগিক পদার্থ। কোনটিতে আবার ফস্‌ফরাস, লোহা, তামা বা আয়োডিনও আছে। মোটামুটিভাবে প্রোটিনে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরিমাণ এইরূপ—

C=৫০·৫৫%, H=৬·৫—৭·৩%, O=১৯·২৪%, N—১৫·১৯%, S=০·৩—২·৪%।

প্রোটিনের আণবিক ওজন অনেক বেশী—কোন কোনটির প্রায় ২০,০০০,০০০ ও হতে পারে। এটি নির্ধারণের পুরনো পদ্ধতি হলো এর শতাংশিক গঠন এবং কোনও মৌলের শতাংশ থেকে এর ক্ষুদ্রতম আণবিক ওজন নির্ণয় করা। হিমোগ্লোবিনে-০·৩৩৫% লোহা বর্তমান, আবার যেহেতু একটি হিমোগ্লোবিন অণুতে এক পরমাণুর চেয়ে কম লোহা থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং আণবিক ওজন কমপক্ষে ১৬,৭০০।

লোহার পারমাণবিক ওজন—৫৬=প্রোটিনের আণবিক ওজনের ০·৩৩৫%

$$\text{অতএব, } \frac{৫৬}{\text{আণবিক ওজন}} = \frac{০·৩৩৫}{১০০}$$

$$\therefore \text{আণবিক ওজন} = ১৬,৭০০$$

এভাবে দুটি বা তিনটি পরমাণু থাকলে তদনুযায়ী যথাক্রমে ৩৩,৪০০ (=১৬,৭০০×২) ও ৫০,১০০ হবে।

আলট্রাসেণ্ট্রিফিউজ-এর (Ultracentrifuge) ব্যবহার, অস্মোটিক চাপ ও ডিফিউশনের গতির পরিমাপ করেও আণবিক ওজন নির্ণয় করা সম্ভব। কয়েকটি প্রোটিনের আণবিক ওজন নিম্নরূপ—

প্রোটিনের নাম	আণবিক ওজন
ডিমের অ্যালবুমিন	৪০,০০০—৪৫,০০০
সিরাম (ঘোড়ার অ্যালবুমিন)	৬৮,০০০—৭৩,০০০
হিমোগ্লোবিন	৬৩,০০০—৬৮,০০০
ল্যাক্টোগ্লোবিউলিন	৩৮,০০০—৪১,০০০
গ্লিয়াডিন	৪২,০০০—৪৪,০০০

আর্দ্র-বিশ্লেষণের ফলে প্রোটিনের প্রকাণ্ড অণু ক্রমেই নিম্ন থেকে নিম্নতর আণবিক ওজনের বিভিন্ন যৌগে পরিণত হয়।

প্রোটিন → মেটা-প্রোটিন → প্রোটিওস → পেপটোন → পলিপেপ্টাইড

অ্যামিনো অ্যাসিড (প্রধানতঃ) ↓

কার্বোহাইড্রেট ← সহজতর পেপ্টাইড

পিউরিন ও পিরিমিডিন

এই সব পরীক্ষা থেকে মন্তব্য করা হয়েছে যে, প্রোটিন হলো পেপ্টাইড লিঙ্কের দ্বারা যুক্ত কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিও বিভিন্ন; যেমন—রক্তের হিমোগ্লোবিনে ১১ শতাংশ হিষ্টিডিন আছে। সিল্ক ফাইব্রয়েনে আছে গ্লাইসিন (৫০%), অ্যালানিন (২৫%), টাইরোসিন (৬.৬%) এবং কম পরিমাণের অন্যান্য অ্যাসিড। অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত ইনসুলিনে আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান; যথা—৩০% লিউসিন, ২১% গ্লুটামিক অ্যাসিড, ১২% সিষ্টাইন, ১২% টাইওসিন, ৮% হিষ্টিডিন—ইত্যাদি।

ডিমের শুভ্রাংশ জলে ফুটালে যে ঘোলাটে ভাব দেখা যায় বা দুধ থেকে যে ছানা কাটে, তাই উক্ত খাদ্যে প্রোটিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আর একটি সনাক্তকরণ হলো এই যে, আমাদের হাতে ঘন নাইট্রিক অ্যাসিড পড়লে, হাতের চামড়া তৎক্ষণাৎ হলদে হয়ে যায় এবং কোনও ক্ষার বা ক্ষারজাতীয় বস্তুর (যেমন, সাবান) সংস্পর্শে এলে তা কমলা রঙে পরিবর্তিত হয়।

কোনও প্রোটিন স্ফটিকাকার (যেমন—ইনসুলিন, ডিমের অ্যালবুমিন ইত্যাদি), আবার কোনটি আঁশালো (যথা—সিল্ক, চুল প্রভৃতি)। কিন্তু যে সব প্রোটিন আঁশালো নয়, সেগুলি আঁশরূপে পাওয়া যায়। প্রোটিন থেকে আর্ডিল নামক আঁশ তৈরি করা হয়। বৃটেনে আই. সি. আই. কোম্পানী মটরবাদামের প্রোটিন থেকে ভিকারা জাতীয় আঁশ প্রস্তুত করে থাকে। এছাড়া অন্যত্র প্রস্তুত করা হয় সয়াবিন ও দুধ থেকে বিবিধ প্রোটিন ফাইবার। ইটালীতে ল্যানিট্যাল নামে যে কৃত্রিম পশম আবিষ্কৃত হয়েছে, তা মূলতঃ কেজিন—কষ্টিক সোডাতে কেজিন এবং কার্বন ডাইসালফাইডের দ্রবণ সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সালফিউরিক অ্যাসিডের পাত্রে ঠেলে দেওয়া হয় এবং ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে ব্যবহার করে কঠিন বস্তুতে পরিণত করা হয়।

ফরম্যালডিহাইডের সঙ্গে দুধের কেজিনের বিক্রিয়া ব্যবহৃত হয় প্লাষ্টিকের বোতাম, কাগজের সাইজিং (Sizing) করতে ও কেজিন প্রস্তুতিতে। প্লাজ্‌মা-প্রোটিনের জলীয় দ্রবণ (রক্ত থেকে কেন্দ্রাপসারণী বলের সাহায্যে রক্তকোষ দূরীভূত করে) বৃহত্তর অস্ত্রোপচার কিংবা সাংঘাতিক আঘাতের সময় অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্যশস্যের অঙ্কুর, খই, ভাতের আঠালো পদার্থ ইত্যাদির মধ্যেকার প্রোটিনের সঙ্গে ঘন কস্টিক সোডার বিক্রিয়ায় যে অ্যামিনো অ্যাসিডের 'সাবান' প্রস্তুত হয়, তা নোনাজলে সামুদ্রিক সাবান অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কারক ও নির্গন্ধ বলে সামুদ্রিক সাবানের প্রতিস্থাপনযোগ্য

প্রোটিনের মধ্যে যে পেপটাইড অণু বা সংযোজক রয়েছে, তাকে জৈবসংশ্লেষিত করা (Biosynthesis) সম্ভব হলেও প্রোটিনকে সোজাসুজিভাবে করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রোটিনের নিষ্কাশন আজকাল সম্ভব হচ্ছে।

খ্যাতনামা ইংরেজ জৈবরসায়নবিদ্ ডক্টর এন. ডারিউ. পিরী গাছের পাতা থেকে প্রোটিন নিষ্কাশন ও প্রস্তুতিকরণে সক্ষম হয়েছেন। অনেকগুলি বিশেষ প্রোটিনের সমবায়ে গঠিত পাতার এই প্রোটিন, প্রাণীজ প্রোটিনের (ডিম ও দুধ ছাড়া) সমতুল্য। রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং শূকর, ইঁদুর, মুরগী ও শিশুর খাদ্যে প্রয়োগ করবার ফলে একথা প্রমাণিত হয়েছে। নিষ্কাশনাদির পর এই প্রোটিনের একটি ঘন সবুজ রং হয়। এর গন্ধ চা অথবা স্পিনাকের (Spinach) ন্যায়। বৃক্ষপত্র গবাদিপশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হলে তাদের মাংস যদি মানুষের আহার্য হিসাবে গৃহীত হয়, তাহলে মূল প্রোটিনের মাত্র এক-দশমাংশ পায় মানুষ। সুতরাং পাতা থেকে নিষ্কাশিত প্রোটিন মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং নিষ্কাশনের পর পাতার ছিব্‌ড়াতে যে প্রোটিনাংশ থাকে, তা গবাদিপশুর খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে।

এছাড়া জাপানে অ্যালজি (Algae) নামক প্রোটিনবহুল একপ্রকার সামুদ্রিক শ্যাওলা বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়। এজন্যে সেখানে প্রতি বছর ৩৪০,০০০ টন অ্যালজির প্রয়োজন হয়। আসামের জোড়হাটে অ্যালজি জন্মাবার পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষা চলছে।

প্রোটিনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসের সন্ধান মিলেছে। সেটি হলো পেট্রোলিয়াম। বিভিন্ন দেশে এসম্বন্ধে গবেষণা হচ্ছে। ফ্রান্সে কেরোসিন ও লুব্রিকেটিং অয়েলের মাঝামাঝি একটি গ্যাস অয়েল ব্যবহার করা হয়। এর পদ্ধতি অনুকরণে আমাদের দেশে জোড়হাটে এই বিষয়ে কাজ চালানো হচ্ছে; আর অন্যদিকে চলছে কাঁচা পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার সম্বন্ধে পরীক্ষা। এক ফরাসী গণনানুযায়ী পৃথিবীর মোট প্রাণীজ প্রোটিনের বাৎসরিক উৎপাদন যে ২০০ লক্ষ টন, তা প্রায় ৪০০ লক্ষ টন পেট্রোলিয়াম থেকে প্রস্তুত হতে পারে।

অষ্ট্রেলিয়ার সিডনীর নিকটবর্তী কোনও এক পশু-গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিক পি. জে. রীজ ও স্বর্গতঃ পি. জে. শিঙ্কেল বলেছেন যে, খুব অল্প পরিমাণে কোন প্রোটিন, আর সিষ্টাইন সালফার জাতীয় সালফারবিশিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড ভেড়ার অ্যাবোম্যাজাম (Abomasum) নামক চতুর্থ পাকস্থলীতে সোজাসুজিভাবে প্রবেশ করালে পশমোৎপাদন বেড়ে গিয়ে প্রায় শতকরা ৩্‌শ ভাগ পর্যন্ত হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কোন দৈনিক আহার্যপ্রাপ্ত ভেড়া যেখানে বছরে ৬½ পাউণ্ড পশম উৎপাদন করতে সক্ষম, সেখানে উপরিউক্ত পদ্ধতি অবলম্বনে বাৎসরিক উৎপাদন ১৫ থেকে ২০ পাউণ্ডে দাঁড়ায়।

শিক্ষা প্রসঙ্গ

মার্কিন বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি

কোনও কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে বেশী ক্ষমতা অর্পণ করা মার্কিন ঐতিহ্যের বিরোধী। মার্কিন শিক্ষা ব্যবস্থার বেলায়ও একথা সত্য। যদিও ১৬ বছর বয়স অবধি প্রত্যেক মার্কিন ছেলে-মেয়েকে বাধ্যতামূলকভাবে বিদ্যালয়ে যেতে হয়, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ে তারা কি শিখবে এবং কিভাবে শিখবে, তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের উপর। সেই কর্তৃপক্ষের উপর জেলা বা নাগরিক (Municipal) সরকারের কিছু প্রভাব থাকলেও রাজ্যের বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব অল্প ও নিতান্তই পরোক্ষ।

বর্তমান অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সব শিক্ষা পরিষদকেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থসাহায্য চাইতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারে শিক্ষাবিদ যাঁরা আছেন, তাঁদের মন রাখতে না পারলে অর্থ-সাহায্য পাওয়া কঠিন। এই কারণে স্থানীয় শিক্ষা সংস্থাগুলি নিজেদের শিক্ষা পদ্ধতিকে একটা বিশিষ্ট মানের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করে। এছাড়া কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নেই।

এই কারণে মার্কিন শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। এইটুকু শুধু বলা চলে যে, যে সব স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগুলির (School Board) দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত, তাঁরা কি ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা করছেন।

গত ৮।৯ বছরে মার্কিন উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার মান অনেক উন্নতি লাভ করেছে। এর কারণ দুটি। এক, রুশ বৈজ্ঞানিকেরা মার্কিন বৈজ্ঞানিক-দের আগে নকল-চাঁদ বা স্পুটনিক তৈরি করবার ফলে আমেরিকায় একটা ধুয়া ওঠে যে, হয়তো মার্কিন বিজ্ঞানের মান, রুশ বিজ্ঞানের চেয়ে নিকৃষ্ট। কথাটা খুব সত্য ছিল না। সত্য ছিল এই যে, নকল-চাঁদ বানাতে যে ধরণের যন্ত্রবিদ্যা লাগে, তার খাতে গবেষণার জন্যে মার্কিন সরকার সে সময় পর্যন্ত অর্থব্যয় করেন নি।

আর একটা সত্য কথা ছিল এই যে, যে ধরণের বিদ্যা নকল-চাঁদ তৈরি করায় লাগে, সে বিদ্যায় পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের সংখ্যা দেশে কম ছিল। কারণ, সে ধরণের বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনও জাতীয় সচেতনতা ছিল না। রুশ বৈজ্ঞানিকেরা নকল-চাঁদ তৈরি করায় এই সচে-তনতা বেড়ে উঠলো।

এই সচেতনতা বৃদ্ধির আর একটা কারণ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু বৈজ্ঞানিক যুদ্ধের ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। এর ফলে রেডার, পারমাণবিক বোমা, গাইডেড মিসাইল ইত্যাদির আবিষ্কার ও যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর সেই সকল আবিষ্কারের প্রচণ্ড প্রভাবের কথা জনসাধারণের জানা ছিল। ফলে সমাজে, বৈজ্ঞানিকদের অবদান সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠেছিল

এই সব কারণে ১৯৫৮ সাল থেকে বিজ্ঞানের ব্যাপারে দেশে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ আসে। এছাড়া সরকার নকল-চাঁদ, আন্তগ্র্হ যান ও

ব্যালিষ্টিক যান তৈরির কাজে অর্থব্যয় সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে পদার্থবিদ্যা ও নানা যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবেশের জন্যে বহু উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশ করা ছাত্র আবেদন করতে থাকে। তখন দেখা যায়, দেশের বহু উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার যা মান, তাতে ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে ঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে না। ফলে উচ্চ বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যে একটা সাড়া পড়ে যায়।

স্থানীয় শিক্ষা সংস্থাগুলির পক্ষে এধরণের মান উন্নয়ন সম্ভব ছিল না। তাঁরা বাধ্য হয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের কাছে সাহায্য চান। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে কতকগুলি সমিতির সৃষ্টি হয়, এই উন্নয়নের সাহায্যের জন্যে। এর ফলে যে সব নতুন শিক্ষা মানের সৃষ্টি হয়েছে, দেশের বহু প্রগতিশীল স্থানীয় শিক্ষা সংস্থা সেই মান অনুসারে পড়াবার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে দেশের বহু শিক্ষা সংস্থা কতকগুলি কেন্দ্রীয় সমিতির প্রভাবে এসেছে। এই প্রবন্ধে কেন্দ্রীভূত শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও আলোচনা করবো।

উপরে যে সব নতুন সমিতিগুলির কথা বলা হয়েছে, এদেশের পুস্তক প্রকাশকেরাও এঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ও এঁদের নতুন শিক্ষা পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক লিখতে অনুরোধ করেন। বিদ্যালয়গুলিতে এই নতুন পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ানো হচ্ছে। প্রতি বছরের শেষে এই বইগুলির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়।

এই নতুন শিক্ষা-পদ্ধতির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে এখানকার বিদ্যালয়গুলির গঠন সম্বন্ধে একটু বলা দরকার। এখানকার ৫ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। এর পরের দু-বছর তারা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ও শেষ চার বছর উচ্চ বিদ্যালয়ে যায়। এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার কথা বলা হবে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় জোর দেওয়া সুরু হয় প্রধানতঃ উচ্চ বিদ্যালয়ে। স্বভাবতঃ গণিত শিক্ষায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকেই জোর পড়তে থাকে।

উচ্চ বিদ্যালয়ে, বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে যে গবেষণা হচ্ছে, তাদের মধ্যে প্রধানগুলির নাম হলো, পদার্থবিদ্যায় পি. এস. সি. এস. বা Physical Sciences Curriculum Study। রসায়ন কেমষ্টাডি (Chem. Study) এবং জীববিদ্যায় বি. এস. সি. এস. (Biological Sciences Curriculum Study)। এছাড়া ভূ-বিদ্যা (Geology) শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় আধুনিক ভূ-বিজ্ঞান (Modern Earth Science) নাম দিয়ে। আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানে, ভূবিদ্যা, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, মহাকাশবিদ্যা ও পৃথিবীর জন্ম ইতিহাস সম্বন্ধে পড়ানো হয়।

এই প্রবন্ধে প্রধানতঃ জীববিদ্যার কথা বলা হবে। বি. এস. সি. এস পদ্ধতির স্রষ্টা সমিতির নাম হলো American Institute of Biological Sciences বা A. I. B. S.। এরা প্রধানতঃ মাধ্যমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকা ও শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করেন। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে যে, এই নতুন পদ্ধতির প্রভাব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপরও পড়েছে।

এ. আই. বি. এস-এর প্রধান কার্যালয় কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে। জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা (National Science Foundation) এদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করে।

পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতিতে ছাত্রেরা প্রধানতঃ কতকগুলি আবিষ্কৃত সত্যের কথা পড়তো এবং জীববিদ্যার চর্চায় যে সব ধারণা থাকা প্রয়োজন, সেগুলি পাখী পড়ার মত শেখানো হতো এবং জীববিদ্যার প্রধান আবিষ্কৃত নিয়মগুলির (Principles) উপর জোর দেওয়া হতো। এতে ছাত্রেরা

বিজ্ঞান শিখতো, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হতো না। নতুন পদ্ধতিতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিবর্তনের ইতিহাস এরা শেখে এবং পরীক্ষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি ভাবে হয়, সেটা বোঝে। এই পদ্ধতিতে উপপাদ্য (Hypothesis) তৈরি করা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার দ্বারা তার সত্যতা নির্ধারণ করা—এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

পাঠ্যপুস্তক ও লেবরেটরীর সাহায্য ছাড়া আরও অন্যান্য বহু জিনিষের সাহায্যে জীববিদ্যা পড়ানো হয়। ঐ জিনিষগুলির মধ্যে ওভারহেড প্রোজেক্টর, ফিল্ম, লেবরেটরী, ব্লক, চার্ট, মডেল ইত্যাদি বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়।

ওভারহেড প্রোজেক্টর ব্যবহার করবার মস্তবড় সুবিধা এই যে, শিক্ষক ছাত্রদের সামনে দাঁড়িয়েই ছবি বা কোন লেখা পিছনের দেয়ালে বা পর্দার উপর প্রক্ষেপ করতে পারেন। এর জন্যে শিক্ষককে পিছনে ফিরতে হয় না। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত নানা ধরণের ফিল্ম তৈরি করা হয়েছে।

লেবরেটরী ব্লক মানে, জীববিদ্যায় কোন কোন বিশেষ বিষয়ের উপর কতকগুলি বই খুব বিস্তারিতভাবে লেখা। এই বইগুলি বহু ইউনিভার্সিটির বিশিষ্ট অধ্যাপকের দ্বারা লিখিত।

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের কারিকুলাম বদ্‌লাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের সিলেবাস বদ্‌লানো হয়। ১-৬ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সহজ পরীক্ষার ভিতর দিয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বিজ্ঞানের কোনও পাঠ্যপুস্তক প্রথম ৬ শ্রেণীতে ধার্য করা হয় না। ছাত্রদের বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল জাগানোই প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতিটি শ্রেণীতে শিক্ষক বেশীর ভাগ সময়েই Group project করেন। তাতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যোগদান করে।

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের (Nature Study) উপর জোর দেওয়া হয়। চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রদের মোটামুটি ধারণা দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেই। যেমন—ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের যে ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, তার একটির নাম হলো Kitchen Physics।

সপ্তম থেকে নবম শ্রেণীতে ভূবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান পড়ানো হয়। দশম শ্রেণীতে মৃত্তিকা বিজ্ঞান (Earth Science) এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পদার্থ, রসায়ন ও জীববিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া হয়। মোটকথা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রছাত্রীদের দশম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ভিতর বিজ্ঞানের যে কোনও দুটি শাখার শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

নতুন পদ্ধতিতে পড়াবার ক্ষমতা বহু পুরনো শিক্ষকের না থাকায় তাদের শিক্ষার (Training) ব্যবস্থাও করা হয়। এর জন্যে শিক্ষকদের নানা ধরণের স্কলারশিপের ব্যবস্থাও আছে। গরমের ছুটিতে (৩ মাস) শিক্ষকদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

এছাড়া প্রতিটি উচ্চ বিদ্যালয়েই নতুনভাবে লেবরেটরী তৈরি করা হয়েছে। এই লেবরেটরীতে ছাত্রেরা নিজেদের রিসার্চ বা এক্সপেরিমেন্ট করবার সুযোগ পায়।

প্রতিটি শিক্ষকই বিদ্যালয়ের পরিবেশ বুঝে নিজে জীববিদ্যার কারিকুলাম ঠিক করে নেন। প্রতিদিনই ৪৫ মিনিট বিজ্ঞানের ক্লাশ থাকে। এছাড়া সপ্তাহে ২ দিন লেবরেটরীর কাজ ধার্য করা থাকে। প্রতিটি লেবরেটরীর জন্যে আরও ৪৫ মিনিট সময় দেওয়া হয়। ঐ দুই দিন ছাত্রেরা ক্লাসে সবশুদ্ধ ৯০ মিনিট সময় পায়। ঐ সময়ের বেশীর ভাগই ছাত্রদের এক্সপেরিমেন্ট করতে দেওয়া হয়।

অধিকাংশ বিদ্যালয়েই ছাত্রদের সারা বছরে

২।৩টি টার্ম পেপার লিখতে দেওয়া হয়। কোন্ বিষয়ে টার্ম পেপার লেখা হবে, তা শিক্ষকের সাহায্যে ছাত্রেরা ঠিক করে। বিজ্ঞানের ভাল ভাল পত্রিকা, যেমন Scientific American বা Science ইত্যাদি থেকেও কোনও প্রবন্ধ পছন্দ করে ছাত্রেরা তার উপর টার্ম পেপার লিখতে পারে। তাছাড়াও কোনও কোনও বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সারা বছরে একটি Original Research Problem-এর উপর কাজ করতে দেওয়া হয়। সাধারণতঃ বছরের শেষে ছাত্রেরা রিসার্চে বেশী সময় ব্যয় করে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ছাত্রদের জন্যে যথেষ্ট বই রাখা হয়। বিভিন্ন বই পড়ে ছাত্রেরা তাথেকেই অনেক সময় রিসার্চের ধারণা পায়। ক্লাসে শিক্ষক ও ছাত্রদের ভিতর খোলাখুলি আলোচনার ব্যবস্থাও আছে।

জীববিদ্যার উপর কোনও একটি বিষয় (Topic) ঠিক করা হয়। সেই বিষয়ে ছাত্রেরা নানা বই পড়ে তৈরি হবার পর ক্লাসে আলোচনা করে। শিক্ষক সেই আলোচনায় মডারেটরের কাজ করেন এবং ছাত্রেরা ভুল করলে শুধরে দেন।

স্থানীয় মিউজিয়ামগুলিতে মাঝে মাঝে বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরা উচ্চ-বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বক্তৃতা দেন। অধ্যাপকদেরও কখনও কখনও আমন্ত্রণ জানানো হয়, কোনও বিষয়ে বক্তৃতার জন্যে। প্রতিটি বিদ্যালয় থেকেই Field Trip-এর বন্দোবস্ত করা হয়। স্থানীয় কারখানা, হাসপাতাল, মিউজিয়াম ইত্যাদিতে ছাত্রদের মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়।

পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্যোপযোগী নতুন সামুদ্রিক আগাছার চাষ

১৯৬৩ সালের প্রথম থেকে ফরাসী পেট্রো-লিয়াম ইনষ্টিটিউট (আই. এফ. পি.) সমুদ্রজাত নীল রঙের এক রকম সামুদ্রিক আগাছার চাষ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। মধ্য আফ্রিকার কোন কোন জাতের লোকেরা এই সামুদ্রিক আগাছার পুষ্টিমূল্যের কথা ভালভাবেই জানে। ১৯২৯ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযানের বিবরণীতে প্রথমে এই আগাছাকে Arthrospira এবং পরে Spirulina নামে উল্লেখ করা হয়। যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহলের বিষয় হলেও এই সামুদ্রিক আগাছা সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন বিবরণই প্রকাশিত হয় নি।

সবুজাভ নীল রঙের এই সামুদ্রিক আগাছা মধ্য আফ্রিকায় প্রায় তিন একর বা তারও বেশী অঞ্চল জুড়ে লবণাক্ত জলের উপরিভাগে জলপদ্মের মত ভেসে থাকে।

প্রাচীন কাল থেকেই স্থানীয় অধিবাসীরা খাদ্য এবং বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে এই জলজ

আগাছাগুলিকে ব্যবহার করে আসছে। চানার (Millet) সঙ্গে একত্রে এটি আজও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য।

এই অঞ্চল থেকে সংগৃহীত নমুনার প্রাথমিক পরীক্ষায় দেখা গেছে—এই জাতীয় অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের মধ্যে এই সায়ানোফাইসির প্রাচুর্য সর্বাধিক। এই জলাভূমির জলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত আছে। খনিজ মিশ্রণের অধিকাংশই সোডিয়াম লবণ থেকে কার্বোনেট, বিশেষ করে বাইকার্বোনেট আকারে আসে। সুতরাং এই জল অতিমাত্রায় ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে। কাজেই ফরাসী পেট্রোলিয়াম ইনষ্টিটিউটে এই বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা আরম্ভ হয় এবং তাঁদের অনুরোধে কয়েকটি খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ বৈদেশিক লেবরেটরীতেও এর গবেষণা চলে।

এই আগাছার পুষ্টিমূল্য অনস্বীকার্য। এটি একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে পরিগণিত এবং বর্তমানে জ্ঞাত প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাদ্যের মধ্যে এটি অন্যতম। বিশ্লেষণের ফলে জানা গেছে, এই প্রোটিনগুলির—FAO—1955 অনুযায়ী নির্দিষ্ট সমন্বয়ের একমাত্র সালফা অ্যামিনো অ্যাসিড ছাড়া, প্রয়োজনীয় সবগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড সমান বা বেশী মাত্রায় আছে। একমাত্র সালফার অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ সংশোধন করা দরকার। তাহলে তত্ত্বগতভাবে এই সামুদ্রিক আগাছা অ-সম প্রোটিন খাদ্যদ্রব্যে একটি চমৎকার সংযোজন হবে।

বর্তমানে এক দিকে প্রোটিনের নতুন উৎস সন্ধানের সমস্যা সুবিদিত। অপর দিকে পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যাদি দহনের ফলে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড (পূর্বে যা কাজে লাগানো হতো না) ফটোসিন্থেসিসের জন্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জন্যে আই. এফ. পি. এই খাদ্যোপযোগী জলজ আগাছা সম্বন্ধে গত তিন বছরেরও বেশী সময় ধরে তাত্ত্বিক ও ফলিত পর্যায়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

উন্মুক্ত স্থানে এই জলজ আগাছার চাষের পদ্ধতি নিখুঁত করে তোলবার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ফ্রান্সের দক্ষিণে বৃহৎ জলাধার নির্মিত হয়েছে এবং লেবরেটরীতে সংশ্লেষিত মাধ্যমে চাষ, পরিস্রাবণ ও ফসল সংগ্রহের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বৃদ্ধির হার, ফসল সংগ্রহ এবং শুষ্ক খাদ্য হিসাবে এই সামুদ্রিক আগাছার ফলন হিসাব করা হয়েছে—বছরে প্রতি একরে ১৬-১৮ টন। আই. এফ. পি-র পক্ষে মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য হিসাবে এর ব্যবহারের জন্যে চাষের খরচ সম্ভবতঃ খুবই কম হবে এবং সামুদ্রিক আগাছা অনুৎপাদক অঞ্চলে এই উৎকৃষ্ট উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ করাও সম্ভব হবে।

ডক্টর সহায়রাম বসু সংবর্ধনা

বাংলা, তথা ভারতের বিশিষ্ট উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডক্টর সহায়রাম বসুর অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ৮ই এপ্রিল কলকাতার আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ হলে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে গুণমুগ্ধ সুহৃদ, ছাত্র ও অনুরাগীদের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ডক্টর বসুর পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে

ডক্টর সহায়রাম বসু

গঠিত কমিটি এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ভারতে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডক্টর সহায়রাম বসু একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। ১৮৮৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার নাগবোল গ্রামে সহায়রাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বেণীমাধব বসু বাংলার প্রাদেশিক বিচার বিভাগে সরকারী চাকরি করতেন। হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষা পাস করে সহায়রাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে তিনি 'বি' কোর্সে স্নাতক ডিগ্রী এবং ১৯০৮ সালে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। পিতার পরামর্শে তিনি আইন বিষয়ে পড়া সুরু করেন এবং ১৯১০ সালে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর আইনবৃত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, মাত্র ৬ বছর তিনি হাইকোর্টে ছিলেন। এই সময় তিনি সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সার রাসবিহারী ঘোষের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৯ সালে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য গিরিশচন্দ্র বসু তাঁর নবগঠিত কলেজে উদ্ভিদ-বিদ্যায় অধ্যাপনার জন্যে সহায়রামকে আহ্বান জানান এবং ছত্রাক-বিজ্ঞানে গবেষণা করতে উপদেশ দেন। এই সময় সহায়রামের মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—আইন না উদ্ভিদবিদ্যা—কোন্‌টিকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করবেন। শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করাই স্থির করেন। ১৯১৬ সালে তিনি তৎকালীন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে (বর্তমান আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ) উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এই সময় সহায়রাম কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের জীববিদ্যার অধ্যাপক একেন্দ্রনাথ ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন। অধ্যাপক ঘোষ তরুণ সহায়রামের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেয়ে তাঁকে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের 'পলিপোর' শ্রেণীর ছত্রাক সম্বন্ধে গবেষণায় অনুপ্রাণিত করেন। কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনায় কাজে যোগ দেবার কিছুকাল পরেই তিনি সেখানে গবেষণা সুরু করেন। প্রখ্যাত ছত্রাক-বিজ্ঞানী টম পেচ-এর অধীনে উদ্ভিদ শ্রেণীবদ্ধকরণ বিদ্যায় বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে তাঁকে

সিংহলের রয়েল বোটানিক গার্ডেনে পাঠানো হয়।

সিংহল থেকে ফিরে এসে সহায়রাম ছত্রাক বিষয়ক গবেষণায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস দাখিল করেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করেন।

ছত্রাক-বিজ্ঞান সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী ঘোষ ভ্রমণ-বৃত্তি লাভ করে তিনি এক বছরের জন্যে ইউরোপে গমন করেন। এই সময় তিনি ইউরোপের বিশিষ্ট ছত্রাক-বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্যে আসেন এবং বৃটিশ মিউজিয়ামের কিউ গার্ডেন ও প্যারিসের প্রাকৃতিক ইতিহাস মিউজিয়ামের হার্বেরিয়ামে কাজ করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি এক বছরকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সহযোগীরূপে কাজ করেন।

ছত্রাক-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডক্টর বসু ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ভারতে জাত আহারোপযোগী ছত্রাক সম্বন্ধেও তিনি গবেষণা করেন এবং এই জাতীয় ছত্রাকের চাষ সুরু করবার জন্যে ভারতের কৃষি বিভাগকে পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 'পেনিসিলিয়াম নোটাটাম' নামক ছত্রাক থেকে 'পেনিসিলিন' অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের সংবাদে উৎসাহিত হয়ে ডক্টর বসু পলিপোর জাতীয় ছত্রাকের ভেষজমূল্য অনুসন্ধানে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং 'পলিপোরিন' নামে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারে সক্ষম হন। পরবর্তী কালে 'ক্যাম্পষ্টেরিন' নামে আর একটি অ্যান্টিবায়োটিকও আবিষ্কৃত হয়। এই দুটি অ্যান্টিবায়োটিকের ভেষজগত উপযোগিতার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং বর্তমানে তাদের কার্যকর-উপাদান পৃথকীকরণের চেষ্টা চলছে। প্রায় ৫৪ বছরব্যাপী ডক্টর বসু ছত্রাক সম্পর্কে গবেষণা করেছেন এবং ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তাঁর ১১৭টি গবেষণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ছত্রাক-বিজ্ঞানে অনন্য গবেষণার জন্যে ডক্টর বসু স্বদেশ ও বিদেশের বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তিনবার গ্রিফিথ স্মৃতি পুরস্কার, বিহার কৃষিবিভাগ তাঁকে উডহাউস স্মৃতি পুরস্কার এবং বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ব্রুল স্মৃতিপদক ও বার্কলে স্মৃতিপদক প্রদান করেন। পলিপোর সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে তিন বছরকাল গবেষণাবৃত্তি দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে ডক্টর বসু এডিনবরার রয়েল সোসাইটির ফেলো এবং ১৯৩০ সালে ইতালীর আন্তর্জাতিক মাইক্রো-বায়োলজি সোসাইটির সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩১-৩৮ সালে তিনি ভারতের বোটানিক্যাল সোসাইটির সভাপতিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। ছত্রাক-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে তিনি একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকায় যান এবং বিভিন্ন গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। ১৯৫০ সালে স্টকহোলমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি ছত্রাক-বিজ্ঞান শাখার সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান শাখার তিনি সভাপতিত্ব করেছেন। ১৯৫৭ সালে ফরাসী শিক্ষা দপ্তরের আমন্ত্রণে তিনি জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থার (C. N. R S.) গবেষণা-অধ্যক্ষরূপে কাজ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ভেষজ ছত্রাকবিদ্যার অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। ১৯৬৩ সালে তিনি আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজের এমেরিটাস অধ্যাপক-

পদে বৃত হন। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় উদ্ভিদ-নিদানতত্ত্ব সমিতি এবং বাংলার উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সমিতি তাঁকে সম্মানিত ফেলো নির্বাচন করেন।

মানুষ হিসেবে ডক্টর বসু নিরহঙ্কার, অমায়িক ও আত্ম-উদাসীন এবং আধ্যাত্মিকতাবাদী। তাঁর সংস্পর্শে এসে সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন। বিলম্বে হলেও এই নীরব বিজ্ঞান-সাধককে দেশবাসী সংবর্ধনা জ্ঞাপন করায় আমরা পরম আনন্দিত।

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-সংবাদ

নতুন ধরণের স্বয়ংক্রিয় আলুর খোসা ছাড়ানো যন্ত্র

ঘণ্টায় চার টনেরও বেশী আলু পরিস্কৃত করে খোসা ছাড়াতে পারে, এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন একটি বৃটিশ কোম্পানি। ফুড প্রোসেসিং প্ল্যাণ্টের কাজে এটি ব্যবহৃত হবে। এর সাহায্যে আলু ছাড়া গাজর প্রভৃতি অন্যান্য মূল জাতীয় ফসলও ছাড়ানো যাবে।

প্রথমে আলু বা অন্য সব্জি একটি হপারে ঢালা হয়। সেখান থেকে এলিভেটারের সাহায্যে সেগুলি যায় ব্যাচিং হপারে। তার নীচে বসানো থাকে বৈদ্যুতিক প্রোব গজ। সেটি ছোট-বড় আলু বাছাই করে সেগুলিকে ষ্টীম চেম্বারে রাখবার পর আকস্মিকভাবে চেম্বারের চাপ কমিয়ে দেওয়া হয়।

ষ্টীম প্রবেশ করানো ও আলুগুলির পরস্পর ঘষড়ানির ফলে আলুর খোসাগুলি উঠে যায়। তারপর একটি পীল রিমুভ্যাল ড্রামে জলের স্রোতের সাহায্যে খোসাগুলি একেবারে তুলে ফেলা হয়।

উদ্ভাবক ফার্ম দাবী করেছেন যে, এই নতুন যন্ত্রটি এই ধরণের অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় মাত্র এক চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে থাকে। এই পদ্ধতিতে অপব্যয় খুব অল্পই। প্রতি সাত পাউণ্ড সব্জীর জন্যে মাত্র এক পাউণ্ড ষ্টীমের প্রয়োজন হয়।

নতুন ফটো-প্রিন্টিং মেশিন

প্রস্থে ১২০ সেণ্টিমিটার মুদ্রণক্ষম বৃটিশ অ্যামোনিয়া প্রিন্টিং মেশিনটি মাঝারি ধরণের ইঞ্জিনীয়ারিং, আর্কিটেক্‌চার্যাল ও ব্যবসায়িক কাজের পক্ষে আদর্শ যন্ত্রস্বরূপ হবে। এর ২.৮ কিলোওয়াটের ল্যাম্পটি অন্যান্য মাঝারি ধরণের ফটো-প্রিন্টিং মেশিনের তুলনায় হবে খুবই নমনীয়।

যন্ত্রটির পরিচালন-ব্যয় বেশী নয় এবং পরিচালন করাও সহজ। এটি এয়ার মেলের কাগজ থেকে মাঝারি ও শক্ত কাগজ—এমন কি, অস্বচ্ছ কাপড় এবং অ্যালুমিনিয়ামযুক্ত প্লাষ্টিক কার্ড-এরও ফটোকপি করতে পারে। যন্ত্রট মিনিটে ১৫ ফুট পর্যন্ত ফটো মুদ্রণ করতে সক্ষম।

অপারেটর যাতে খুব অল্প পরিশ্রমে পরিচালনা করতে পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যন্ত্রটি নির্মিত। দ্রুত ও নিখুঁত পরিচালনার সুবিধার্থে নিয়ন্ত্রণকারী বোতামগুলি একটিমাত্র প্যানেলে সাজানো থাকে।

মনুষ্য-দেহ থেকে তথ্য সংগ্রহ

কর্মরত মানুষের দেহ থেকে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বৃটেনের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন।

এই যন্ত্র দেহের সঙ্গে যুক্ত করলে সেটি কর্মরত শ্রমিক, ঘরণী বা অফিসারের শরীর সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করবে।

কাউন্সিলের হ্যাম্পষ্টেড (লণ্ডন) লেবরেটরীর মিঃ এইচ. এস. উল্ফ বলেন, এই নতুন যন্ত্র, কোন মানুষ কাজে বেরোবার পর তার কয়েক ঘণ্টার বা দু-তিন দিনের হৃৎস্পন্দন, তাপমাত্রা ইত্যাদির খবর রেকর্ড করে রাখবে, ঠিক যেমন মহাকাশচারীদের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

এই যন্ত্রটি হলো একটি ছোট্ট ইলেকট্রো-কেমিক্যাল সেল—দুটি ইলেকট্রোডকে একটি সুরু তার দিয়ে জোড়া। যন্ত্রটি এত ছোট যে, এটি পরলে বাইরে দেখা যায় না। এর কোন শব্দও হয় না। বাস ড্রাইভার, কনডাক্টর, বিমানচালক, ও স্কুলের ছেলেদের নিয়ে এই যন্ত্রটির পরীক্ষা করা হয়েছে।

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলী

উদ্ভিদের স্নায়ুমণ্ডলীর মত একটা কিছু আছে। মস্কোর তরুণ গবেষক ভিতালি গোর-চাকফ গবেষণার ফলে এই তথ্যটির কথা বলেছেন।

ব্যাপকভাবে এই বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, উদ্ভিদ কখনো সংবাদাদি আদান-প্রদান করতে পারে না। পোকামাকড় ধরবার পাতাযুক্ত ডাইওনিয়া, মাছির ফাঁদযুক্ত ডিউ প্ল্যান্টের প্রতি-ক্রিয়াগুলি তার অদ্ভুত ব্যতিক্রম।

ভিতালি গোরচাকফ প্রমাণ করেছেন যে, এই উদ্ভিদগুলিতে তাপ ও রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই প্রতিক্রিয়ার গতি অনেক জীবের—যেমন, শামুক ও ব্যাঙের তুলনায় দ্রুততর। তিনি বহু উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন; যেমন—সীম, মটর ইত্যাদি।

গোরচাকফ উদ্ভিদের মধ্যে বোধশক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন বিতর্ক উত্থাপন করেন নি, তবে তিনি মনে করেন, উদ্ভিদ যে সঙ্গীত সম্পর্কে আগ্রহহীন—একথা বলা যায় না। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুততর করে, তবে জাজ সঙ্গীত বৃদ্ধির ক্ষতি করে। উদ্ভিদকে নিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে দেবার মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তা ধরবার জন্যে যন্ত্র ব্যবহারের সমস্যা নিয়ে গোরচাকফ এখন কাজ করছেন।

শরীরের তাপ কমিয়ে চিকিৎসা

আমেরিকার কোন এক ক্যান্সারগ্রস্ত অধ্যাপক চিকিৎসকদের অনুরোধ করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পূর্বে তাঁকে যেন ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলা হয়, যাতে ক্যান্সারের কোন ওষুধ আবিষ্কারের পর ডাক্তাররা তাঁকে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, সে ব্যবস্থা অচল, যেহেতু কোন উন্নত শ্রেণীর জীবকে অতিরিক্ত ঠাণ্ডার মধ্যে রাখলে বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

এবারে এই সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মেনীতে যে সব পরীক্ষা হয়েছে, তাথেকে জানা গেছে, সাবকুলিং-এর ফলে মস্তিষ্কের কোষ নষ্ট হয়ে মানুষের মৃত্যু হয়, হৃদ্‌স্পন্দন বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হবার ফলে নয়। মনুষ্যেতর জীবজন্তুর উপর হাইপো-থারমিয়া বা সাবকুলিং পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে, শূন্য ডিগ্রীর নীচে দেহের তাপ কমালেও পুনরুত্তপ্ত প্রক্রিয়ার সময় স্বাস্থ্যের কোন গুরুতর ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু দেহের ভৌতিক রূপান্তর ঘটে ও মস্তিষ্কের কোষ বিনষ্ট হয় এবং তার ফলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর এসব জীব-জন্তুর আর জ্ঞান ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় না। পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, সাবকুলিং প্রক্রিয়ার সময় দেহের কোষগুলির মধ্যে বরফকুঁচি জমে এবং তার মধ্যে যে লবণ থাকে, তা দেহের টিসুগুলিকে অবধারিতরূপে নষ্ট করে। এই সম্বন্ধে পশ্চিম জার্মেনীতে ব্যাপক পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা

বোয়িং কোম্পানী যুক্তরাষ্ট্রের জন্যে সুপারসোনিক ট্রান্সপোর্ট (S S T) নামে একরূপ অতিকায় জেট বিমান নির্মাণ করছে। ১৯৭০ সালের মধ্যেই এর উড্ডয়নের-পরীক্ষা হবে। ৩৫০ জন যাত্রীবাহী এই জেট লাইনারের সর্বোচ্চ গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ২,৮৮০ কি. মিটার।

করে দেখ

ম্যাজিক কাচ

তোমার কোন বন্ধুকে তিন অঙ্কের যে কোন একটি সংখ্যা লিখতে বল। তবে মনে রাখতে হবে, সংখ্যাটির প্রথম ও তৃতীয় অঙ্ক দুটির মধ্যে যেন অন্ততঃ ২-এর তফাৎ থাকে। তোমার বন্ধু অবশ্য তোমাকে না দেখিয়ে যে কোন সংখ্যা লিখবে এবং তোমার নির্দেশ মত যোগ-বিয়োগ করে যে ফল পাবে, সেটা তুমি এক অদ্ভুত উপায়ে তাকে জানিয়ে দিতে পার। ধর, সে লিখলো—৩১৭। এবার তাকে সংখ্যাটা উল্টে লিখতে বল। তাহলে সংখ্যাটা হবে ৭১৩। ৭১৩ থেকে ৩১৭ বিয়োগ দিতে বল। বিয়োগ ফল হবে ৩৯৬। এই বিয়োগ ফল ৩৯৬-কে আবার উল্টে দিতে বল। উল্টে দিয়ে পাওয়া যাবে ৬৯৩। এবার ৩৯৬ ও ৬৯৩ যোগ করতে বল। যোগফল হবে ১০৮৯। এই নিয়ম অনুসারে যে কোন সংখ্যা নিয়ে যোগ, বিয়োগ করলেই দেখবে, তার ফল হবে—১০৮৯।

এবার খেলাটার কথা বলছি। একটা গ্লাসে জল নিয়ে তাতে খানিকটা সাবান গুলে নাও। ঐ সাবান-জলে আঙ্গুল ডুবিয়ে সেই আঙ্গুল দিয়ে জানালার কাচের গায়ে ১০৮৯ সংখ্যাটি লিখে দাও। শুকিয়ে যাবার পর লেখার কোন চিহ্নই দেখা যাবে না।

শেষ যোগফলটা বের করবার পর তোমার বন্ধুকে সেই নির্দিষ্ট জানালাটার কাছে গিয়ে কাচের উপর জোরে ফুঁ দিতে বল। বন্ধুটি দেখে অবাক হয়ে যাবে যে, কাচখানা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, কিন্তু তার মধ্যে তারই লিখিত অঙ্কের যথাযথ উত্তর ১০৮৯ সংখ্যাটি ফুটে উঠেছে। এর কারণ আর কিছুই নয়—সাবান-জলে ডোবানো আঙুল দিয়ে কাচের যে জায়গাটুকু স্পর্শ করা হয়—সেখানে কুয়াশা জমে না।

এই খেলাটা শীতকালেই ভাল দেখানো যায়। গরমের সময় ফুঁ দিলে কাচের গায়ে কুয়াশা জমবে না। তবে অবশ্য কৃত্রিম ব্যবস্থায় খেলাটা দেখানো যেতে পারে।

—গ—

আকাশযানের ক্রমবিকাশ

তোমরা জান, বিশাল আকৃতির আকাশযানগুলি আজকাল শতাধিক যাত্রী নিয়ে শব্দের চেয়েও দ্রুততর গতিতে আকাশপথে একটানা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু আকাশপথে পরিভ্রমণের এই অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে যে কতকালের সাধনা ও প্রস্তুতি রয়েছে, সে কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়।

ঠিক কোন্ সময় থেকে মানুষ সত্য সত্যই আকাশে ওঠবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছিল, সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে কিছু বলা না গেলেও যতদূর জানা যায় তাতে মনে হয়, রোজার বেকনই বোধ হয় সর্বপ্রথম বেলুনের মত কোন ফাঁপা গোলকের সাহায্যে আকাশে বিচরণের সম্ভাব্যতার কথা চিন্তা করেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিখ্যাত চিত্রকর ও বৈজ্ঞানিক লিওনার্ডো দা ভিন্সি আকাশে ওড়বার একটি যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। উড্ডয়নক্ষম যন্ত্র নির্মাণ এবং তাকে পরিচালনার জন্যে প্রোপেলারের কথা তিনি বলেছিলেন। হাতের জোরে পাখীর ডানার মত বিরাট ডানা সঞ্চালিত করে আকাশে ওড়বার কথাও তিনি ভেবেছিলেন। তারপর আকাশে ওড়বার জন্যে অনেকেই অনেক রকম যন্ত্র তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু কোনটাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয় নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যোসেফ মঁগোলফিয়ে এবং এটনে মঁগোলফিয়ে নামক দুজন ফরাসী যুবক কাপড়ের তৈরি বেলুন ধোঁয়ায় ভর্তি করে আকাশে ওড়ালেন ১৭৮৩ সালে। বেলুনে চড়ে সর্বপ্রথম আকাশে ওঠে একটা ভেড়া, একটা হাঁস

ও একটা মুরগী। এরপরে বেলুনে চড়ে ডি রোজিয়ার নামে একজন যুবক প্রথম আকাশে ওঠবার গৌরব অর্জন করেন। তিনি মিনিট পাঁচেকের মত আকাশে ছিলেন এবং ৮০ ফুটের বেশী উপরে ওঠেন নি। কারণ বেলুনটা ৮০ ফুট লম্বা একটা দড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল। এরপর মাসখানেকের মধ্যে তিনি আর একজন সঙ্গী নিয়ে মুক্ত বেলুনে চড়ে ৩০০ ফুট উপর দিয়ে আধ ঘণ্টার কম সময়ে পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করেন। এর ফলে বেলুনে চড়ে আকাশ-ভ্রমণে অনেকেই ক্রমশঃ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু বেলুনকে বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে চলতে হয়, ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা যায় না; তাছাড়া গতিবেগও কম। অবশেষে জীন মেরি ব্যাপ্‌টিষ্ট মিউজনিয়ার নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার সিগারের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি বেলুন তৈরি করেন এবং নীচে ঝুলানো গণ্ডোলার সঙ্গে হাতে ঘোরানো প্রোপেলার লাগিয়ে দেন। নতুন ধরণের এই বেলুনটা তেমন কার্যকরী না হলেও এই পন্থা অবলম্বন করেই পরবর্তী কালে ইচ্ছামত পরিচালনার উপযোগী এয়ার সিপ বা ডিরিজিবল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল।

১৮৪৩ সালে মঙ্ক ম্যাসন নামে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক মিউজনিয়ার টাইপের একটি ডিরিজিবল নির্মাণ করে সাফল্যের সঙ্গে তার পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। এর অল্পকাল পরেই হেনরি জেফার্ড নামে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ১৪৩ ফুট লম্বা সিগারের মত একটা ডিরিজিবল তৈরি করেন এবং গতিপথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে ৩ অশ্বশক্তির ভারী একটা ষ্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রোপেলার চালিয়ে ১৭ মাইল দূরে নির্দিষ্ট স্থানে নির্বিঘ্নে অবতরণ করেন।

এভাবে বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় ক্রমশঃই ডিরিজিবলের উন্নতি সাধিত হতে থাকে। আকাশ-ভ্রমণে ডিরিজিবলের সাফল্য দর্শনে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায়ও কেউ কেউ উন্নত ধরণের ডিরিজিবল নির্মাণে উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তবে এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর হয়েছিল জার্মেনী। জার্মান গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় ১৯০০ সালে কাউণ্ট ভন জেপেলিন সুদৃঢ় কাঠামোয় গঠিত বিরাট আকৃতির অতি শক্তিশালী এক এয়ারসিপ নির্মাণ করেন। নির্মাতার নাম অনুযায়ী এই জাতীয় এয়ারসিপের নাম রাখা হয়—জেপেলিন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একটা জেপেলিনই লণ্ডনের উপর বোমা ফেলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল, এই ধরণের এয়ারসিপ সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নয়। এরপর গ্রাফ জেপেলিন এবং হিণ্ডেনবার্গ নামে আটলাণ্টিক পাড়াপাড়কারী বিশাল আকৃতির যাত্রীবাহী এয়ারসিপ নির্মিত হয়। এগুলিকে বলা হতো সুপার জেপেলিন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষও R-33, R-34, R-100, R-101 প্রভৃতি নামে কতকগুলি বিরাট আকৃতির এয়ারসিপ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু পর পর কতকগুলি মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবার ফলে উভয় দেশই এয়ারসিপের ব্যবহার বন্ধ করে দেয়।

বেলুন আবিষ্কারের বহুকাল আগে থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ আকাশে উড়ে বেড়াবার চেষ্টা করছিল। বেলুন যখন আরোহী নিয়ে আকাশে দীর্ঘ পথ অতিক্রমে সক্ষম হয়েছে, বাতাসের চেয়ে ভারী উড়ন-যন্ত্র তখনও তার ভ্রূণাবস্থা অতিক্রম করতে পারে নি। তখনও সে উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে হাঁস-মুরগীর মত বাতাসে ভর করে কয়েক-শ' গজ যেতে পারতো মাত্র। এই যন্ত্রকে বলা হয় গ্লাইডার। অনেক রকমের গ্লাইডার উদ্ভাবিত হয়েছিল। হাত-পা সঞ্চালন এবং শরীরকে ব্যালান্স করে গ্লাইডারের সাহায্যে কেউ কেউ বেশ কিছু সময়ের জন্যে আকাশে ভেসে থাকতেও সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু এতে আকাশে উড়ে বেড়াবার কোনই সুবিধা হয় নি। এই সময়ে ভারী যন্ত্রের সাহায্যে আকাশ-ভ্রমণের ব্যাপারে যাঁরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে জার্মেনীর অটো লিনিয়েন্থালের নামই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৬ সালে ৪৮ বছর বয়সে একদিন উড়তে গিয়ে গ্লাইডার সমেত পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। আকাশ বিচরণে তিনি কৃতকার্য হতে না পারলেও ভারী যন্ত্রের উড্ডয়ন সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে সর্বপ্রথম এরোপ্লেন আবিষ্কারে এই তথ্যগুলি যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর—অরভিল ও উইলবার রাইট নামে আমেরিকার অধিবাসী দুই ভাই সর্বপ্রথম এরোপ্লেনে করে আকাশে ওঠেন। রাইট ভ্রাতারা অনেক দিন ধরেই গ্লাইডার নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। তারপর লিনিয়েন্থালের তথ্যাদির অনুসরণে নতুন ধরণের একখানি গ্লাইডার তৈরি করে তাতে প্রোপেলার ও ইঞ্জিন জুড়ে কিটি হকের মাঠে প্রথম বারেই তাঁরা সাফল্য অর্জন করেন। এরোপ্লেনে করে সেদিন আকাশে ওড়া দেখবার জন্যে তাঁরা অনেক লোককেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই প্রবল বেগে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। দুই ভাই তাঁদের এরোপ্লেন নিয়ে কিটি হকের মাঠে উপস্থিত হলেন। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখবার জন্যে সেদিন পাঁচজনের বেশী লোক উপস্থিত ছিল না (তার মধ্যে একটি আবার বালক)—এমন কি, এই ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ জনসাধারণকে জানাবার জন্যে খবরের কাগজের কোন সংবাদদাতাও ছিলেন না। যাহোক, অরভিল বাইপ্লেনে উঠে বসলেন। নির্দিষ্ট সময়ে প্লেন ছাড়া হলো। প্রবল বাতাসের মধ্যেই প্লেনখানা আকাশে উঠে গেল। মাত্র বারো সেকেণ্ড উড়ে ৫৪০ গজ দূরে গিয়ে প্লেনখানা ভূমিতে অবতরণ করলো। এরপরে উইলবার প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু ৫৯ সেকেণ্ড ওড়বার পর প্রবল বাতাসের ধাক্কায় প্লেনখানা মাটিতে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারপর তাঁরা বড় আর একখানা প্লেন তৈরি করে ডেটনের নিকট হফ্‌ম্যান

প্রান্তরে জনসাধারণের কাছে আকাশে ওড়বার পরীক্ষা দেখাবার আয়োজন করেন; কিন্তু আবহাওয়ার প্রতিকূলতায় কৃতকার্য হতে পারেন নি। ১৯০৫ সালের শেষভাগে তাঁরা একটানা প্রায় সাড়ে চব্বিশ মাইল উড়তে সক্ষম হন। এভাবে পর পর কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে তাঁরা একটানা অনেক দূরের পথ অতিক্রমে কৃতকার্য হন। রাইট ভ্রাতাদের সাফল্য লাভের পর ইউরোপে অনেকে এরোপ্লেনে ওড়বার পরীক্ষা করছিলেন। লর্ড নর্থক্লিফ ঘোষণা করেন—এরোপ্লেনে করে যিনি প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হতে পারবেন, তাঁকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন। ১৯০৯ সালে হিউবার্ট লেথাম তাঁর প্লেনে করে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করতে চেষ্টা করেন। তিনি পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি। তার দিন পাঁচেক পরেই লুই ব্লেরিও নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বাজি জিতে নেন। পরের বছরে খবরের কাগজের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, প্রথমে যিনি ২৪ ঘণ্টার ভিতরে লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেষ্টার পর্যন্ত উড়ে যেতে পারবেন, তাঁকে দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। এরোপ্লেনে ১৮০ মাইল পথ অতিক্রম করা সম্ভব হবে—এটা কেউ বিশ্বাস করতে পারে নি। গ্রেহাম হোয়াইট নামে একজন ইংরেজ এবং লুই পলহাঁ-ই যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে প্রতিযোগিতায় জয়ী হন।

বিভিন্ন লোকের চেষ্টার ফলে এভাবে এরোপ্লেনের পাল্লা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই এরোপ্লেনের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ক্রমে ক্রমে নতুন করে দূর-দূরান্তরে এরোপ্লেনের অভিযান সুরু হয়। ইতিমধ্যে আমেরিকায় হাইড্রো-প্লেন উদ্ভাবিত হয়। এই প্লেন যেমন আকাশে উড়তে পারে, জলের উপরেও তেমন চলতে পারে। ১৯১৯ সালে আমেরিকার হাইড্রো-প্লেন NC-4 লেঃ কমাণ্ডার রীডকে নিয়ে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে লিসবনে পৌঁছায়।

এরপর দ্রুতগতিতে আকাশযানের উন্নতি সাধিত হতে থাকে। সে সব কাহিনী খুবই বিস্ময়কর। কিন্তু এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। পরে তোমরা সে সব কথা জানতে পারবে।

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

রবার্ট ওপেনহাইমার

প্রথম পারমাণবিক বোমা নির্মাণকারী হিসাবে রবার্ট ওপেনহাইমারের নাম আজ সুবিদিত। ওপেনহাইমারের আগেই বহু বিজ্ঞানী পরমাণুর প্রকৃতি এবং পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত নানারকম গবেষণা চালিয়ে বহুবিধ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই সব তত্ত্ব ও তথ্যের সাহায্যে পারমাণবিক বোমা তৈরি করবার কৃতিত্ব প্রধানতঃ ওপেনহাইমারেরই প্রাপ্য। এই জন্যে বিজ্ঞান-জগতের অনেকেই তাঁকে 'The man who made the bomb' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

রবার্ট ওপেনহাইমার

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল নিউইয়র্ক শহরের এক অভিজাত ইহুদী পরিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের টুক্‌রা টুক্‌রা ঘটনা থেকেই তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতামহের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের

কয়েকটি পাথর উপহার পাওয়ার পরেই ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় ঔৎসুক্য দেখা যায়। শৈশবেই তিনি তাঁর মায়ের কাছে চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতের শিক্ষা পান। এই সময়ে তিনি ভাবতেন যে, ভবিষ্যতে তিনি একজন কৃতি স্থপতি হিসাবে খ্যাতি লাভ করবেন। কিন্তু সাত বছর বয়স হবার আগেই তিনি স্থির করে ফেললেন যে, স্থপতি হয়ে কোন লাভ নেই, তাঁকে কবি হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিতা লিখতে সুরু করে দিলেন। তাঁর সেই বয়সের কবিতাই প্রতিষ্ঠিত কবিদের ঈর্ষার কারণ হতে পারতো। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খেলনা ছিল একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে সব জিনিষ নিরীক্ষণ করা ছিল তাঁর প্রিয় খেলা।

এভাবে বাল্যকালে ওপেনহাইমার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে তাঁকে Ethical Culture School নামে একটি স্কুলে পড়তে পাঠানো হলো। অত্যন্ত মেধাবী বা প্রতিভাশালী না হলে এই স্কুলে পড়া কারুর পক্ষেই সম্ভব হতো না। এই সময়ে বিভিন্ন ভাষা শেখবার দিকে তাঁর ঝোঁক চাপলো। তিনি অতি দ্রুত গ্রীক, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এবং ইটালিয়ান ভাষা শিখে ফেললেন। তিনি স্থির করলেন—পৃথিবীর সমস্ত ভাষা, তাদের সাহিত্য এবং সেই সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করেই তিনি সারা জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি ল্যাটিন ভাষায় কথাবার্তা বলতে সুরু করলেন এবং ঐ ভাষাতেই সনেটের পর সনেট লিখে চললেন। গ্রীক ভাষায় তিনি এমন সুন্দরভাবে এবং এত দ্রুত কথা বলতে পারতেন যে, গ্রীকরাও তাঁকে হিংসা করতে সুরু করেছিল। তিনি প্রায়ই ফরাসী ভাষায় কবিতা লিখে তার ছন্দ-বৈচিত্র্য অপরিবর্তিত রেখে সেই কবিতা গ্রীক এবং ইটালিয়ান ভাষায় অনুবাদ করতেন।

এই সময়ে ভূতত্ত্বের প্রতি আবার তাঁর অনুরাগ বৃদ্ধি পায়। তিনি ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত অনেক বই পড়ে ফেললেন এবং একটি লাইব্রেরীও তৈরি করেন এবং বিভিন্ন রকমের পাথর সংগ্রহ করতে সুরু করলেন। আমেরিকার যেখানে যত ভূ-তত্ত্ববিদ এবং ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তিনি নিয়মিত পত্রালাপ করতে লাগলেন। তাঁকে শীঘ্রই নিউইয়র্ক শহরের Minerological Club-এর সভ্য করে নেওয়া হলো। তাঁর বয়স তখন এগার বছর। এর কিছুদিন পরেই ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত বক্তৃতা দেবার জন্যে ঐ ক্লাব থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এলো। কেবলমাত্র পত্রের মাধ্যমেই তিনি ঐ ক্লাবের সভ্য হয়েছিলেন। ক্লাবের প্রবীণ সদস্যেরাও ঘুণাক্ষরে বুঝতে পারেন নি যে, মাত্র এগার বছরের বালককে তাঁরা সভ্য করে নিয়েছেন। ঐ আহ্বান আসবার পর ওপেনহাইমার প্রথমে একটু ভয় পেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তাঁর মনে সাহস ও বিশ্বাস ফিরে আসে। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে ক্লাবে গিয়ে হাজির হলেন। বালক ওপেনহাইমারকে দেখে ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা তো হতবাক। প্রাথমিক বিস্ময়

কাটিয়ে ওঠবার পর তাঁরা মনযোগ সহকারে তাঁর বক্তৃতা শোনলেন। শ্রোতাদের অনেকেই স্বীকার করলেন যে, ম্যানহাট্টান দ্বীপের শিলার গঠন-বৈচিত্র্য এবং প্রকৃতি সম্পর্কে এই বালকের বক্তৃতা থেকে তাঁরা অনেক নতুন তথ্য জেনেছেন। ক্লাবের পত্রিকায় এই বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

স্কুলের পড়া শেষ হবার পর তিনি পিতার সঙ্গে ইউরোপের সর্বত্র ভ্রমণ করেন। কৈশোরেই ইউরোপের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয় তাঁর উত্তর-জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উনিশ বছর বয়সে তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এলেন। তাঁর প্রধান বিষয় ছিল রসায়ন। রসায়ন ছাড়া অন্যান্য যত বিষয় নেওয়া সম্ভব, তিনি তাঁর সব কটিই পাঠ্য করেছিলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষায় যত নম্বর পেয়ে তিনি উত্তীর্ণ হলেন, তত নম্বর আর কোন ছাত্র কোন দিনও পান নি। পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন—'That boy will either shake up physics or the world'—উত্তরকালে ওপেনহাইমার উভয়কেই কাঁপিয়েছিলেন।

হার্ভার্ড থেকে তিনি গেলেন কেম্ব্রিজে। সেখানকার বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরীতে তিনি গবেষণা সুরু করেন এবং এখানেই তিনি লর্ড রাদারফোর্ড, নীল বোর প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত পরমাণু-বিজ্ঞানীদের সংস্পর্শে আসেন। এরপর তিনি গেলেন জার্মেনীর গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর পূর্বপুরুষ জার্মান দেশেরই অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি জার্মান ভাষা জানতেন না। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জার্মান ভাষা শিখে নিয়ে সেই ভাষায় 'কোয়ান্টাম ম্যাথামেটিক্স' নামক অত্যন্ত জটিল বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধের জন্যে তিনি ডক্টর অব ফিলসফি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি গেলেন জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং তারপর গেলেন লীডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র দু-সপ্তাহ পরে তিনি সেখানে ডাচ ভাষায় বক্তৃতা দেন। প্রতিভার এমন বিকাশ খুব কম বৈজ্ঞানিকের জীবনেই দেখা যায়—অন্ততঃ এত অল্প বয়সে। তখনও তাঁর চব্বিশ বছর পূর্ণ হয় নি।

তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব এবং প্রতিভার জন্যে ইউরোপের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অধ্যাপনা করবার জন্যে তাঁর কাছে আহ্বান জানানো হয়। তিনি অবশ্য আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজী এবং ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ায় অধ্যাপনা শুরু করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শিখে এই দেশীয় কাব্য ও দর্শন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

এর কিছুকাল পর থেকেই ইউরোপ এবং আমেরিকার সেরা বিজ্ঞানীরা ক্রমান্বয়ে পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক চমকপ্রদ আবিষ্কার করে চলছিলেন। ১৯৪০ সালে আইনষ্টাইনের অনুরোধে এবং জার্মান সমরশক্তি পর্যুদস্ত করবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট

রুজভেল্ট পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করেন। এই প্রকল্পটির জন্যে তিনি দু-শ' কোটি ডলার মঞ্জুর করেন। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে, এর আগের বছরেও আইনষ্টাইন প্রেসিডেণ্টকে অনুরূপ অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রেসিডেন্ট সে বছর মাত্র ছয় হাজার ডলার মঞ্জুর করেছিলেন।

নিউ মেক্সিকোর লস আলামসে এই প্রকল্পটি গড়ে তোলা হলো। এই প্রকল্পটির ব্যাপারে অতি মাত্রায় সতর্কতা এবং গোপনীয়তা রক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। এই প্রকল্পটির সর্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হলো মিঃ ব্র্যাডলিকে। ইনি আর কেউই নন, সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক রবার্ট ওপেনহাইমার। বিজ্ঞানীদের সবাইকেই অনুরূপ ছদ্মনাম এবং ছদ্মবেশ ধারণ করতে হলো। এই প্রকল্পটির সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে ওপেনহাইমার বছরের পর বছর আহার-নিদ্রা ভুলে কঠিন পরিশ্রম করতে লাগলেন। এই প্রকল্পটিকে সাহায্য করবার জন্যে ওপেনহাইমারের তত্ত্বাবধানে আরও দুটি শাখা প্রকল্প গঠন করা হলো। টেনেসীর ওকরীজ প্রকল্পে ৭৫০০০ এবং ওয়াশিংটনের হ্যানফোর্ড প্রকল্পে ৭০,০০০ লোক কাজ করতে লাগলো।

অবশেষে পারমাণবিক বোমা তৈরি হলো। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভোর সাড়ে পাঁচটায় লস আলামস থেকে প্রায় দু-শ' মাইল দূরে ট্রিনিটের মরু অঞ্চলে বোমাটি ফাটানো হলো। বোমা ফাটাবার ফলাফল কল্পনাতীত। সাড়ে চার-শ' মাইল দূরের লোকেরা আলো, ধোঁয়া এবং বিস্ফোরণের শব্দে হতবাক হয়ে গেল। প্রচণ্ড উত্তাপে মরুভূমির বালুকারাশি কাচে পরিণত হলো। আশেপাশের সমস্ত জীবন শেষ হয়ে গেল। যারা শেষ হয় নি, তারা পরে দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হলো। বোমা ফাটাবার পর ওপেনহাইমার সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন। সেই শ্লোকের অর্থ—' আমি আজ জগৎ-ধ্বংসকারী মহামরণে পরিণত হয়েছি'।

এর তিন সপ্তাহ পরে নাগাসাকি ও হিরোসিমায় দুটি বোমা ফেলা হলো। লক্ষ লক্ষ লোক একেবারে শেষ হয়ে গেল। এইভাবে পারমাণবিক বোমার ব্যবহার ওপেন-হাইমারের মোটেই পছন্দ হয় নি। তিনি পারমাণবিক শক্তি প্রকল্প থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনলেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। পারমাণবিক শক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে অবশ্য প্রায়ই তাঁর ডাক পড়তে লাগলো রাজ দরবারে। এরপর তিনি প্রিন্সটনে উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। পৃথিবীর সকলের কাছে পারমাণবিক শক্তির রহস্য জানানো সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেছিলেন—'Secrecy strikes at the very root of what science is and what it is for'।

এর বছর কয়েক পরে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার পারমাণবিক শক্তি কমিশন তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে যে, তিনি কমিউনিষ্টদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই

অজুহাতে তাঁর কমিশনের গোপনীয় দলিলপত্র দেখবার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়। অথচ এর নয় বছর পরে এই কমিশনই তাঁর অসাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যে তাঁকে ৫০,০০০ ডলার পুরস্কার প্রদান করে। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ওপেনহাইমার বলেছেন—'The peoples of this world must unite or they will perish'।

১৯৬৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী প্রায় ৬৩ বছর বয়সে নিউ জার্সির প্রিন্সটন শহরে রবার্ট ওপেনহাইমার পরলোক গমন করেছেন। অসম্ভব শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান দেবার জন্যে বিজ্ঞান-জগৎ তাঁকে চিরদিন স্মরণ করবে। এই অস্ত্রের সাহায্যে পৃথিবী ধ্বংস করা সম্ভব হলেও তার জন্যে ওপেনহাইমারকে দায়ী করা উচিত হবে না বলেই বিশ্বাস করি।

প্রভাতকুমার দত্ত

ঘড়ির কথা

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ সময় স্থির করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছিল এবং বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন উপায়ে মোটামুটিভাবে সময় স্থির করবার এক-একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। সময় নির্ধারণের জন্যে প্রাচীন ভারতে এক প্রকার জল-যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তলদেশে সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নির্দিষ্ট আয়তনের একটি তাম্রপাত্র তার চেয়ে বৃহত্তর অপর একটি জলপূর্ণ পাত্রে ভাসিয়ে রাখা হতো। ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করে পাত্রটি ডুবে যেতে যতটা সময় লাগতো, তাকেই একদণ্ড ধরা হতো। সারা দিন-রাতে পাত্রটি ৬০ বার জলপূর্ণ হতে পারতো। কথিত আছে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ভাস্করাচার্যের কন্যা লীলাবতীর বিবাহের সময় এরূপ একটি ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। কোষ্ঠীবিচারে লীলাবতীর বৈধব্য দোষ দেখে তা খণ্ডন করবার জন্যে ভাস্করাচার্য একটি বিশেষ লগ্নে তার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিবাহের দিন সঠিকভাবে লগ্ন নিরূপণের জন্যে জলঘড়ির ব্যবস্থা করা হয়। কৌতূহলবশে লীলাবতীও জলপাত্রটিকে দেখছিলেন। সবার অলক্ষ্যে তাঁর মস্তকাভরণ থেকে দৈবাৎ একটা মুক্তা স্খলিত হয়ে ভাসমান পাত্রটিতে পড়ে এবং তার ছিদ্র বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভবিতব্যই জয়যুক্ত হয়েছিল।

এরপর গ্রহাদির গতিবিধি দেখে সময় নির্ণয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দিন, মাস ও বছর হিসাবে সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। পরবর্তী কালে দিনকে যখন আরও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করবার প্রয়োজন অনুভূত হলো,

তখন ক্রমান্বয়ে নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হতে লাগলো। প্রথমতঃ লম্বভাবে স্থাপিত স্তম্ভ বা দণ্ডাদির ছায়া দেখে দিনের ভগ্নাংশ নির্ধারিত হতো। পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও, তখন এই উপায়েই দিনকে সমান কতকগুলি ভাগে ভাগ করে নেবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তারপর ক্রমশঃ সূর্যঘড়ি বা রবিচক্র (Sundial), জলঘড়ি (Clepsydra), বালিঘড়ি (Sand glass) প্রভৃতি নানাবিধ সময়-নির্দেশক কৌশল উদ্ভাবিত হয়। সূর্যের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত ছায়াপাত দেখে রবিচক্রের সময় নিরূপিত হতো। কোন পাত্রের সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে নির্দিষ্ট পরিমাণ বালিকণা বেরিয়ে আসতে যতটা সময় লাগে, তাকেই সময়ের নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ হিসাবে ধরা হতো। গাত্রতাপ নির্ধারণের জন্যে রোগীর শরীরে কতক্ষণ থার্মোমিটার লাগিয়ে রাখা দরকার, অনেক হাসপাতালে আজও তা ছোট ছোট বালিঘড়ির সাহায্যে নির্ণীত হয়ে থাকে। এক রকমের জল-ঘড়িতে সম-আয়তনের দুটি পাত্রের একটিকে খালি. রেখে অপরটিকে জলপূর্ণ করে রাখা হতো। সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে এক পাত্র থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল অপর পাত্রে যেতে যতটা সময় লাগতো, তাকেই সময়ের এক নির্দিষ্ট অংশের পরিমাপ হিসাবে ধরা হতো।

পরবর্তী কালে বিবিধ কৌশল অবলম্বনে জলঘড়ির অনেক বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশিদের সঙ্গে ফ্র্যাঙ্করাজ শার্লিম্যানের (শার্লিম্যানের রাজত্বকাল ৭৬৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত) বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। এই সূত্রে খলিফা বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে শার্লিম্যানকে একটি অদ্ভুত জলঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িটার চতুর্দিকের ১২টা জানালা খুলে যেত। সেই জানালাগুলির ভিতর থেকে ছোট ছোট ১২টা ঘোড়সোয়ারের মূর্তি বেরিয়ে আসতো এবং সঙ্গে সঙ্গে বাজনা বেজে উঠতো। বাজনা শেষ হওয়ামাত্র মূর্তিগুলি আবার ভিতরে ঢুকে পড়তো এবং সঙ্গে সঙ্গে জানালাগুলিও বন্ধ হয়ে যেত।

বহুকাল পর্যন্ত সময়-নির্দেশক এই সকল ব্যবস্থাদি প্রচলিত থাকবার পর ইউরোপেই বোধ হয় সময়-নির্দেশক যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা সুরু হয়। সঠিক সময় নির্ধারণের জন্যে গতি-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে সর্বপ্রথম কার দ্বারা ঘড়ি উদ্ভাবিত হয়েছিল, তা জানবার উপায় নেই; তবে এই কথা জানা গেছে যে, ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে পোপ সিলভেস্টার (দ্বিতীয়) প্রথম যান্ত্রিক ঘড়ি নির্মাণ করিয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ঘড়ির প্রচলন হতে থাকে। ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্টমিনস্টারের পূর্বেকার ক্লক টাওয়ারের উপর একটি ঘড়ি স্থাপন করা হয়েছিল এবং ১২৯২ খৃষ্টাব্দে ক্যান্টারবারি ক্যাথিড্রেলেও একটি ঘড়ি স্থাপিত হয়। জ্যোতির্বিদ্যার কাজে ব্যবহারের জন্যে ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে সেণ্ট আলবান্সে একটি ঘড়ি স্থাপিত হয়েছিল। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ডোভার ক্যাসেলে যে ঘড়িটি স্থাপিত হয়েছিল, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তথাকার বিজ্ঞান-প্রদর্শনীতে সেটিকে চালু অবস্থাতেই দেখানো হয়।

এই সব ঘড়ি সারা দিনমানের সময় নির্দেশ করতো বটে, কিন্তু প্রায়ই সময়ের তারতম্য ঘটতো। মাঝে মাঝে জ্যোতিষ্কাদির অবস্থান অথবা সূর্যঘড়ি দেখে সেগুলিকে সংশোধন করে নিতে হতো, কিন্তু মেঘলা দিনে এভাবে সংশোধন করা কোন রকমেই সম্ভব হতো না। কাজেই সঠিকভাবে সময় নির্ণয়ের জন্যে এমন কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয়ে পড়লো, যাতে সময়ের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশগুলির গতির মাত্রা সর্বদা একই রকম থাকতে পারে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের চেষ্টায় ক্রমশঃ নানা রকম যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হতে লাগলো। তখনকার দিনে ঘড়ির পেণ্ডুলাম ছিল না এবং ঘড়ি একবার যেখানে স্থাপন করা হতো, বরাবর সেখানেই রাখতে হতো, স্থানান্তরিত করা চলতো না। ঘড়ির গতি উৎপাদনের জন্যে অনুভূমিক-ভাবে স্থাপিত মোটা একটা রোলারের গায়ে এক প্রান্ত আবদ্ধ একটা রজ্জু কয়েক পাক জড়াবার পর তার শেষ প্রান্তে একটা ভার ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। ভারের টানে রজ্জুর পাক খোলবার সঙ্গে সঙ্গে রোলারটি ঘুরে তৎসংলগ্ন চাকাগুলির গতি উৎপাদন করতো। নির্দিষ্ট হারে গতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে চতুর্দশ শতাব্দীতেই 'ভার্জ এসকপমেণ্ট' নামে একপ্রকার যান্ত্রিক কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত এই যান্ত্রিক কৌশলের কিছু কিছু উন্নতি সাধন করে তখনকার দিনে ঘড়ি নির্মিত হতো। এই সব ঘড়িকে বলা হতো 'ব্যালান্স ক্লক'। স্প্রিং এবং পেণ্ডুলাম না থাকলেও এই সব ঘড়ি মোটামুটি ভালই কাজ দিত বটে, কিন্তু তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিতে কিছু দিন পর পর সময়ের বেশ কিছুটা গোলযোগ দেখা যেত।

ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পর থেকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় - এরূপ ঘড়ি নির্মাণের চেষ্টা সুরু হয়। ঐ সময়েই বা আরও কিছু পূর্বে গতি উৎপাদনের জন্যে স্প্রিংয়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে গ্যালিলিও একদিন পিসা নগরীর ক্যাথিড্রেলের বারান্দায় পায়চারী করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়লো— সিলিং থেকে ঝুলনো একটা বাতির ঝাড় হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। কৌতূহলের বশে তিনি নিজের নাড়ী-স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেন—প্রত্যেক বারই দোলনের বিস্তার পূর্ণ হতে একই সময় লাগছে। এথেকেই তিনি দোলক বা পেণ্ডুলামের সমগতির সূত্র আবিষ্কার করেন। এর পর থেকেই ঘড়িতে পেণ্ডুলাম সংযোজনের ব্যবস্থা হয়। ব্যালান্স এসকেপমেণ্টের সঙ্গে পেণ্ডুলাম সংযোগ করে হয়গেন্স ঘড়ির প্রকৃত উন্নতি সাধন করেন। এই পেণ্ডুলাম ও এসকেপমেণ্টই হলো ঘড়ির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এসকেপমেণ্ট না রেখে ঘড়িতে দম দিলে চাকাগুলি দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দম ফুরিয়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে যাতে দম ফুরাতে না পারে, সেজন্যে পেণ্ডুলাম সংলগ্ন এসকেপমেণ্টের কাঁটা দুটি দোলনের

সঙ্গে সঙ্গে পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করে সর্বাধিক দ্রুতগতি-সম্পন্ন চাকাটির গতি নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বাধা সৃষ্টি করে তার গতি মন্দীভূত করে। কেবল তাই নয়, ওঠা-নামা করবার সময় প্রত্যেক বারেই পেণ্ডুলামকে সামান্য একটু ধাক্কা দিয়ে যায়। এর ফলে পেণ্ডুলামের দোলন কখনই বন্ধ হয় না, বরাবর একইভাবে দুলতে থাকে। এই হলো ঘড়ির মোটামুটি মূল পরিচলন-পদ্ধতি। যান্ত্রিক কৌশলের নানারকম উন্নতি সাধিত হলেও এই পদ্ধতিতেই যাবতীয় ঘড়ি পরিচালিত হয়ে থাকে।

এর পর হুক কর্তৃক অধিকতর নির্ভরযোগ্য অ্যাঙ্কর বা রিকয়েল এস্কেপ-মেণ্ট উদ্ভাবিত হয়। কিছুকালের মধ্যেই হেয়ার স্প্রিংয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যালেন্স হুইল এবং মেন স্প্রিংয়ের ঘূর্ণয়ক্ষম ব্যারেল উদ্ভাবিত হবার ফলে টাইমপিস, টেবিল ক্লক, পকেট ঘড়ি, ক্রোনোমিটার প্রভৃতি নির্মাণ করা সম্ভব হয়। আজ পর্যন্ত পেণ্ডুলাম ঘড়ির মধ্যে ঘণ্টা-বাদক ঘড়ি, বাজনদার ঘড়ি, দিন-তারিখ নির্দেশক ঘড়ি, এক দমে বছর-চলা ঘড়ি, ইলেকট্রিক ঘড়ি এবং পকেট ও রিষ্ট ওয়াচের মধ্যে যে কত রকমের ঘড়ি নির্মিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

—গ—

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। রবট কাকে বলে? এর কাজ কি?

এস. কে. বিশ্বাস, নদীয়া

প্রঃ ২। (ক) দহন কাকে বলে?
(খ) ব্লাড-প্রেসার কখন ও কি কারণে হয়?
(গ) আয়ন-বিনিময় কি? ইহার প্রয়োজনীয়তা কি?
(ঘ) স্পেয়ার-পার্টস্ সার্জারী কাকে বলে?

রঞ্জনা ব্যানার্জী, চিত্তরঞ্জন

প্রঃ ৩। সূর্যগ্রহণের সময় খালি চোখে তাকালে অন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেন?

কালীপদ মণ্ডল, হাটগাছা

প্রঃ ৪। প্রতি-বস্তু ও প্রতি-জগৎ বা বিপরীত বিশ্ব কি?

অলককুমার বসু, কলিকাতা-১২
ও
সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ী, মেদিনীপুর

উঃ ১। রবট (Robot) কথাটি এসেছে চেকোশ্লোভাকীয় শব্দ Robit থেকে—যার অর্থ হচ্ছে কাজ। রবট বলতে এখন আমরা বুঝি যান্ত্রিক মানুষ—অর্থাৎ এমন একটি যন্ত্র, যা মানুষের মতই অনেক কাজ করতে পারে এবং এই ভাবে তার শ্রম লাঘবও করে থাকে। এধরণের যন্ত্র-মানবের কথা মানুষ বহু দিন থেকেই কল্পনা করে এসেছে। পুরনো আমলের পুঁথি-পত্রে এই জাতীয় চিন্তাধারার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্র-মানবকে মানুষের কাজে লাগানো হয়েছে। এসব যন্ত্রের অতি প্রখর স্পর্শেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয় আছে—অর্থাৎ তারা বাইরে থেকে প্রদত্ত নির্দেশ গ্রহণ ও সে অনুযায়ী কাজ করতে পারে। পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নের সঠিক জবাবও এই সব যন্ত্র দিতে সক্ষম। ফটো-সেলের সাহায্যে দৃষ্টি সম্বন্ধে এদের আংশিকভাবে সচেতন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে কলকারখানায় এমন সব ব্যবস্থা করা গেছে, যাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। যন্ত্রপাতি চালান ও বন্ধ করা, কাঁচামাল উপযুক্ত পরিমাণে যন্ত্রের মধ্যে সরবরাহ করা, যন্ত্রসংক্রান্ত নানারূপ বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করা—এসবও স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলেছে। অঙ্ক কষবার ব্যাপারে যন্ত্র-মানব আজ মানুষের ক্ষমতাকেও অনেক ছাড়িয়ে গেছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গুণ, ভাগ করছে, বড় বড় সমীকরণ সমাধান করে দিচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে রবটের আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

উঃ ২ (ক) দহন হচ্ছে, কোন বস্তুর জ্বলন-প্রক্রিয়া। কিন্তু এই জ্বলনের জন্যে অক্সিজেনের মাধ্যম অপরিহার্য। তাই প্রকৃতপক্ষে দহনকে বলা যায় দাহ্যবস্তুর সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগ—যার ফলে আলো ও উত্তাপ (আগুন) উৎপন্ন ও বিকিরিত হয়ে থাকে।

(খ) যে কোন পাত্রে তরল পদার্থ থাকলেই তা পাত্রের গায়ে চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ সব দিকে সমান হয়ে থাকে। রক্তনালীর মধ্যস্থিত রক্তও তাই নালীতে চাপ প্রদান করে। একেই আমরা বলি ব্লাড-প্রেসার (রক্ত-চাপ)।

একথা সকলেরই জানা আছে যে, রক্ত নালীগুলির মধ্যে স্থির হয়ে নেই, প্রবাহিত হচ্ছে। রক্তের এই প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড যেন একটা পাম্প। সে একবার সঙ্কুচিত হয় এবং আবার প্রসারিত হয়। সঙ্কোচনের সময় রক্তনালীতে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং প্রসারণের সময় চাপ হ্রাস পায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই রক্ত-

চলাচল নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ফলে রক্তচাপের একটা সর্বোচ্চ মান (সঙ্কোচনজনিত) ও একটা সর্বনিম্ন মান (প্রসারণজনিত) পাওয়া যায়। সাধারণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এই দুই মান যথাক্রমে ১২০ মিঃ মিঃ ও ৮০ মিঃ মিঃ উঁচু স্তম্ভাকারে স্থাপিত পারদের চাপের সমান। তবে রক্তচাপ সকলের ক্ষেত্রে সমান নয়। আবার একই ব্যক্তির রক্তচাপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে চাপ অনেক কম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের রক্তচাপ পুরুষের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম। যাদের ওজন বয়সের অনুপাতে অত্যধিক, তাদের চাপও বেশী। ঘুমাবার সময় রক্তচাপ অনেক কম থাকে; কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম করলে বা মানসিক উত্তেজনায় তা বৃদ্ধি পায়।

(গ) সাধারণ অবস্থায় সকল পরমাণুই বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ থাকে। কারণ কেন্দ্রে অবস্থিত প্রোটনসমূহের মোট পজিটিভ বিদ্যুৎ ও কেন্দ্রের বাইরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনসমূহের মোট নেগেটিভ বিদ্যুৎ পরস্পরের সমান। কোন কারণে নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে একটি বা একাধিক ইলেকট্রন বা প্রোটন বিচ্যুত হলে পরমাণুটি বিদ্যুৎভাবাপন্ন হয়ে যায়। এই অবস্থায় পরমাণুকে বলা হয় আয়ন।

রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ অনেক ক্ষেত্রেই আয়নের দ্বারা গঠিত। খুব সহজ উদাহরণ হচ্ছে, সোডিয়াম ক্লোরাইড। দেখা গেছে এর অধিকাংশ পরমাণুই চেষ্টা করে, যেন তার বাইরের কক্ষে আটটি ইলেকট্রন থাকে। এটি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা স্থায়ী অবস্থা। সোডিয়াম পরমাণুতে বাইরের কক্ষে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে, আর ক্লোরিনের আছে সাতটি। ফলে সোডিয়াম তার বহিঃস্থ ইলেকট্রনটিকে ছেড়ে দেয় ও ক্লোরিন সেটি নিয়ে নেয়। এই ভাবে উভয়েই স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এদিকে সোডিয়াম একটি ইলেকট্রন হারিয়ে পজিটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী হয়ে গেছে আর ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী হয়েছে। এই পরস্পর বিরোধী বিদ্যুৎ-ধর্মসম্পন্ন আয়ন দুটি একে অপরকে আকর্ষণ করে ও সোডিয়াম ক্লোরাইডের অণু গঠন করে।

বিপরীত-ধর্মী আয়নের দ্বারা গঠিত এই জাতীয় অণু থেকে আয়নগুলি বিচ্ছিন্ন করা বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু এস্থলে পজিটিভ আয়নকে সরিয়ে সেখানে তার জায়গায় অন্য কোন পজিটিভ আয়ন বসিয়ে দেওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে নেগেটিভ আয়নের বদলে অপর কোন নেগেটিভ আয়ন স্থাপিত করা চলে। একেই বলে আয়ন-বিনিময়।

আয়ন-বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রয়োগ সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন বিজ্ঞানী ওয়ে মাটির আয়ন-বিনিময় ক্ষমতা লক্ষ্য করেন। মাটিতে সার ব্যবহারের কাজে এই ধর্ম বিশেষ সহায়তা করে। বর্তমানে নানাজাতীয় কৃত্রিম আয়ন-বিনিময়কারী পদার্থ প্রস্তুত এবং শিল্প ও অন্যান্য বহুস্থলে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সব ব্যবহারের

মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—জল বিশুদ্ধিকরণ, পাকস্থলীর পরিপাক প্রক্রিয়ায় সহায়তা, প্রোটিন ও অন্যান্য জৈব রাসায়নিক বস্তু সম্বন্ধে গবেষণায় সাহায্য—ইত্যাদি।

(ঘ) স্পেয়ার-পার্টস্ কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। বড় বড় যন্ত্রপাতির—তা কলকারখানাও হতে পারে বা মোটর গাড়ী ইত্যাদিও হতে পারে—অংশবিশেষ অনেক সময় নানাকারণে বিগড়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে গোটা যন্ত্রটাকে বাতিল করে না দিয়ে তার সেই অংশটুকু বদ্‌লে নিলেই আবার পুরাদমে কাজ চলতে পারে। দামী দামী যন্ত্রের ক্ষেত্রে যে সব অংশ অকেজো হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, অনেক সময়ে যন্ত্রের সঙ্গে সেই সব অংশও আলাদা করে সরবরাহ করা হয়। একেই বলে স্পেয়ার-পার্টস্।

মনুষ্যের শরীরও একটি অতি জটিল যন্ত্রবিশেষ—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একথাও সকলেই জানে যে, এই যন্ত্রেরও অনেক অংশ প্রায়ই বিকল হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে অপারেশন করে সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে অনুরূপ অন্য অংশ সেখানে লাগিয়ে নিলেই কাজ হতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম স্পেয়ার-পার্টস্ সার্জারী। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে, প্রতিস্থাপন করবার জন্যে শরীরের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অংশ পাওয়া যাবে কোথা থেকে? বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারলে সদ্যমৃত ব্যক্তির শরীর থেকে অক্ষত অংশ তুলে নিয়ে রেখে দেওয়া যেতে পারে—ভবিষ্যতে সেগুলি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে লাগিয়ে দেওয়া হবে। চক্ষু-ব্যাঙ্কের কথা অনেকেই শুনে থাকবেন। চোখের সামনের দিকের স্বচ্ছ অংশের নাম কর্ণিয়া। একে সংরক্ষণ করবার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই চক্ষু-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

উ: ৩। সূর্যের আলোর সঙ্গেই আমরা পরিচিত। কিন্তু সূর্য থেকে আলো ছাড়া আরও নানাজাতীয় রশ্মি বিকিরিত হয় ও পৃথিবীতে এসে পড়ে। আলো যে অংশ থেকে আসে, সাদা থালার মত সে অংশের নাম আলোকমণ্ডল। কিন্তু সূর্য প্রকৃতপক্ষে আরও অনেক বড়। আলোকমণ্ডলের পর আরও দুটি প্রধান অংশ আছে—বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল। এগুলি থেকেও বিকিরণ আসে। তবে আলোকমণ্ডল অপেক্ষা এই সব বিকিরণ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণতর। তাই আলোকমণ্ডলের অতি শক্তিশালী আলোকের জন্যে এদের প্রাধান্য সাধারণ সময়ে উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু গ্রহণের সময়ে আলোকমণ্ডল চন্দ্র কর্তৃক আবৃত হয়ে যায়। ফলে ছটামণ্ডল থেকে আগত রশ্মি তখন প্রবলাকারে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এরাই চোখে পড়লে চোখের ক্ষতি সাধন করে।

উ: ৪। যে কোন বস্তুরই ক্ষুদ্রতম অংশ হলো পরমাণু। এই পরমাণু আবার তিন রকম কণিকার দ্বারা গঠিত—ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন। এদের মধ্যে

ইলেকট্রন হলো নেগেটিভ, প্রোটন পজিটিভ ও নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ কণিকা। বিজ্ঞানীরা প্রথমে অঙ্ক কষে ও পরে পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়েছেন যে, এই তিন প্রকার কণিকারই একটি করে প্রতি-কণিকা আছে। ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে প্রতি-ইলেকট্রনের নাম দেওয়া হয়েছে পজিট্রন। এটি ভর এবং অন্যান্য সব দিক দিয়েই ইলেকট্রনের মত, কেবল ইলেকট্রনের যতটা নেগেটিভ বিদ্যুৎ আছে, পজিট্রনের ঠিক ততটা পজিটিভ বিদ্যুৎ আছে। বিখ্যাত পদার্থবিদ্ ডিরাক প্রথমে অঙ্ক কষে পজিট্রনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। পরে অ্যাণ্ডারসন তা গবেষণাগারে পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন। প্রোটন এবং নিউট্রনের ক্ষেত্রে প্রতি-কণিকাদ্বয় যথাক্রমে প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রন আবিষ্কার করেন চেম্বারলীন ও তাঁর সহকর্মী। প্রতি-প্রোটনও আর সব দিক দিয়ে প্রোটনের মত, শুধু নেগেটিভ বিদ্যুৎ-ধর্মী। প্রতি-নিউট্রনের ব্যাপারটা একটু জটিল। কারণ নিউট্রন বিদ্যুৎভাবাপন্ন কণিকা নয়।

এখন একটি পরমাণু যদি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের পরিবর্তে এদের প্রতি-কণিকা—যথাক্রমে পজিট্রন, প্রতি-প্রোটন ও প্রতি-নিউট্রনের দ্বারা গঠিত হয়, তবে আমরা যা পাব, তা পরমাণু নয়—প্রতি-পরমাণু। এই জাতীয় প্রতি-পরমাণু দিয়ে যে সব বস্তু গঠিত হয়, তাদেরই বলা হয় প্রতি-বস্তু। এর সহজতম উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে প্রতি-হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি প্রোটন ও তার চারদিকে ঘুরে বেড়ায় একটি ইলেকট্রন। প্রতি-হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে—কেন্দ্রে রয়েছে প্রতি-প্রোটন ও তার চারদিকে ঘুরছে একটি পজিট্রন।

দেখা গেছে—ইলেকট্রন ও পজিট্রন বা প্রোটন ও প্রতি-প্রোটন বা নিউট্রন ও প্রতি-নিউট্রন পরস্পরের কাছাকাছি আসলে বিস্ফোরণের ফলে পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলে ও শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাই বস্তু ও প্রতি-বস্তু যদি কখনও কাছাকাছি আসে, তারাও বিস্ফোরণ ঘটাবে সন্দেহ নেই। বিজ্ঞানীরা প্রতি-বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন মাত্র, বিশ্বের কোথাও তা আছে কিনা—তাঁদের জানা নেই। প্রতি-কণিকা একত্রিত করে প্রতি-বস্তু গঠন করা তাঁদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি। তবে উপরিউক্ত কারণে প্রতি-বস্তুর সন্ধান পেলে তাকে বস্তুর কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

বস্তু দিয়ে গঠিত সব কিছু নিয়ে হচ্ছে আমাদের জগৎ বা বিশ্ব। প্রতি-বস্তু দিয়ে গঠিত যদি কোন জগতের কল্পনা করা যায়, তবে সেটাই হবে প্রতি-জগৎ বা বিপরীত বিশ্ব।

দীপক বসু

বিবিধ

মহাকাশে মহাকাশচারীর প্রথম মৃত্যু

মস্কো থেকে টাস কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—সোভিয়েট ইউনিয়ন ২৩শে এপ্রিল সকালে মনুষ্য-চালিত মহাকাশযান 'সয়ুজ-১' মহাকাশে পাঠিয়েছে। মহাকাশচারীর নাম ভ্লাডিমির কোমারভ।

পরবর্তী সংবাদে জানা যায়—সোভিয়েট মহাকাশচারী তাঁর মহাকাশ পরিক্রমা শেষ করে ২৪শে এপ্রিল নেমে আসছিলেন। নামবার পথে মহাকাশযানের গতি হ্রাসের জন্যে একটি প্যারাসুট ব্যবহার করা হয়। মহাকাশযানটি যখন পৃথিবীর সাত কিলোমিটার উপরে তখন প্যারাসুটের দড়ি জড়িয়ে যায়। ফলে মহাকাশচারী ভ্লাডিমির কোমারভ মহাকাশেই মারা গিয়েছেন। মহাকাশে মহাকাশচারীর মৃত্যু এই প্রথম।

সার্ভেয়ার-৩ কর্তৃক চাঁদের ছবি প্রেরণ

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্ণিয়া) থেকে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—চালকবিহীন দ্বিতীয় মার্কিন মহাকাশযান সার্ভেয়ার-৩ অনায়াসে চাঁদের ঝঞ্ঝা-সাগরে গিয়ে নেমেছে। নামবার এক ঘণ্টার মধ্যেই সেখানকার টেলিভিশন-ছবি পাঠাতে সুরু করে।

সার্ভেয়ার-৩ ১১ই এপ্রিল কেপ কেনেডি থেকে যাত্রা করে। ৬৫ ঘণ্টায় ২১১০০০ মাইল পাড়ি দিয়ে ২০শে এপ্রিল ভোর ৪টায় (খ্রীঃ সঃ) চাঁদে পৌঁছায়।

অফিসারেরা বলেন, এখানকার নির্দেশ মহাকাশযানটি মেনে নিচ্ছে। তবে কিছুটা জ্বালানী-সমস্যা দেখা দিতে পারে। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

চাঁদের বুকে গিয়ে যাতে না আছড়ে পড়ে, সেজন্যে চাঁদের ৫২ মাইল দূরে থাকতেই সার্ভেয়ার-৩-এ ব্রেক-রকেটগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মহাকাশযানের গতিবেগ কমে গিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ৩০০ মাইল হলে উল্টা-গতি রকেট ব্যবস্থা চালু করা হয়।

অবতরণ পর্যন্ত এখানকার সব নির্দেশ সার্ভেয়ার-৩ যথাযথভাবে পালন করে। কিন্তু অবতরণের পর পরিচালন-শক্তির ব্যবহার বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তা পালিত হয় নি। শক্তির এই অপব্যবহার কেন তা খুঁটিয়ে দেখা

মহাকাশচারী সমেত মানবচালিত মহাকাশযানের ভার বহনে চাঁদ সক্ষম কিনা চাঁদের বুক খুঁড়ে সার্ভেয়ার-৩ তা যাচাই করে দেখবে।

থুম্বা থেকে মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণ

পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—১২ই মার্চ বিকালে থুম্বা রকেট ঘাঁটি থেকে দু'পর্যায়ের নাইক-আপেচে রকেট সোডিয়াম বাষ্প ও ল্যাংমুর যন্ত্র ভর্তি করে মহাকাশের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ল্যাংমুর খুব ভাল সঙ্কেত পাঠালেও সোডিয়াম বাষ্প রকেট-আধার থেকে বের হয় নি।

মহাকাশে সোডিয়াম বাষ্প ছড়িয়ে দিয়ে পরীক্ষা চালাবার চেষ্টা এই তৃতীয়বার ব্যর্থ হলো।

ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত পরবর্তী সংবাদে জানা যায় ১৯শে এপ্রিল বেলা ১১-৪৪ মিনিটের সময় থুম্বা উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে একটি দ্বি-স্তর রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণ

কেন্দ্রের পরীক্ষা সংক্রান্ত অধিকর্তা শ্রী জি. এস. জানান যে, এই দিনের রকেট উৎক্ষেপণ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

শীঘ্রই চাঁদে মানুষের পদার্পণ হতে পারে

ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—জড্‌রেল ব্যাঙ্ক মানমন্দিরের ডিরেক্টর সার লোভেল বলেন যে, রাশিয়া চাঁদে মানুষ পাঠাবার জন্যে একটি মহাকাশযান তৈরির কাজে ব্যস্ত আছে। ঐ মহাকাশযানটি শীঘ্রই চাঁদে পাড়ি দিতে পারে। সম্ভবতঃ মহাকাশযানটি চাঁদে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসবে।

সার লোভেল গ্রোসমণ্ট কলেজে বক্তৃতার সময় আরও বলেন যে, মস্কোর খবরের উপর ভিত্তি করেই তিনি এই কথা বলেছেন। চাঁদে মানুস পাঠাবার প্রতিযোগিতায় কে জিতবে—আমেরিকা না রাশিয়া—এ প্রশ্নের উত্তরে সার লোভেল কোন কথা বলেন নি।

হৃদরোগ নির্ণয়ে কম্পিউটার যন্ত্র উদ্ভাবন

সম্প্রতি ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—এমন এক কম্পিউটার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা হৃদ্‌রোগ আক্রমণের ৪০ মিনিট আগে ডাক্তারকে সতর্ক করে দিতে পারে। সম্প্রতি লণ্ডনের এক প্রদর্শনীতে এই যন্ত্রটি দেখানো হয়। যন্ত্রটির নাম হলো 'প্রি-এরেষ্টার'। রোগীর হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ঠিক চলছে কি না, তার নির্দেশ দেওয়াই যন্ত্রটির কাজ। হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বিকল হলেই যন্ত্রে বৈদ্যুতিক নির্দেশ ধরা পড়ে। এই যন্ত্র উদ্ভাবনে হৃদ্‌যন্ত্র-বিশেষজ্ঞদের যথেষ্ট উপকার হবে।

নুনমাটিতে জেটের জ্বালানী তেল উৎপাদন

গৌহাটির কাছে নুনমাটিতে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল শোধনাগারে জে. পি-৪ জেট প্রোপালসন তেল উৎপাদন ১লা এপ্রিল থেকে সুরু হয়েছে। এর ফলে প্রতিরক্ষার কাজে সুপারসনিক জেট বিমানের জ্বালানী উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করবে।

এই শোধানগারে বছরে ২৫ হাজার মেট্রিক টন জেটের জ্বালানী উৎপন্ন হবে। এতে ৬০ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় হবে।

সম্পূর্ণ প্রকল্পটির নক্সা করেছেন শোধনাগারের ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদেরা।

এপর্যন্ত দেশে জেট বিমানের জ্বালানী আমদানী করা হচ্ছিল। কিন্তু এখান থেকে গৌহাটি শোধনাগার অন্য দুটি রাষ্ট্রায়ত্ত শোধনাগারের সঙ্গে একযোগে জে. পি-৪ তেল উৎপন্ন করবে। ওই দুটি শোধনাগার হলো কোয়েলি ও বারুণী। সেখানে মার্চ মাস থেকে উৎপাদন সুরু হয়ে গেছে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়
অবধায়ক—শ্রীপার্বতীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রাম ও ডাকঘর—লাভপুর
জেলা—বীরভূম

২। দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
২৭, পার্ক অ্যাভেনিউ
টালা পার্ক, কলিকাতা-২

৩। শ্রীসূর্যকান্ত রায়
যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়
১৭০, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৪। সুখেন্দু সোম
ব্রজমোহন কলেজ
(পদার্থবিদ্যা বিভাগ)
বরিশাল, পূর্ব পাকিস্থান

৫। সৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য
৬২।২।বি, টালিগঞ্জ রোড
কলিকাতা—৩৩

৬। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর
বঙ্গলক্ষ্মী সোপ ওয়ার্কস্
২৭, অক্ষয়কুমার মুখার্জী রোড
কলিকাতা-৫০

৭। কল্যাণকুমার চক্রবর্তী
৩৬৪।২২, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড
নাকতলা, কলিকাতা-৪৭

৮। পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়
25, Russet Road,
Kendall Park, N. J. 08824,
U. S. A.

৯। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড,
কলিকাতা-২৯

১০। শ্রীপ্রভাতকুমার দত্ত
৩৬।বি, বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-২৫

১১। শ্রীঅনিল চক্রবর্তী
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ
কলিকাতা-১৩

১২। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঊনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানের সভাপতি ডক্টর দেবেন্দ্র মোহন বসু ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে উপবিষ্ট রয়েছেন যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | জুন, ১৯৬৭ | ষষ্ঠ সংখ্যা

উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের নিবেদন

গত ৫ই মে, ১৯৬৭, মনোরম পরিবেশে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসের অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ও পুস্তকাদি প্রকাশ, গ্রন্থাগার স্থাপন ও পাঠাগার পরিচালন, বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতাদির আয়োজন, বিজ্ঞান শিক্ষার আসর স্থাপন—প্রভৃতি বিবিধ ব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে গত উনিশ বছর যাবৎ পরিষদ নিরলসভাবে চেষ্টা করে আসছে। কেবল মাত্র বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষার ব্যবহার যে একান্ত আবশ্যক—এই সহজ কথাটি বিজ্ঞান পরিষদ তার জন্মকাল থেকেই প্রচার করে আসছে। সুখের বিষয় এই যে, এই বিষয়টি সম্প্রতি সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং অচিরেই মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করবার জন্যে নানা প্রকার চেষ্টার কথা শোনা যাচ্ছে। এই নৈতিক বিজয়ের মুহূর্তে পরিষদের দায়িত্ব ও অধিকার বহুলাংশে প্রশস্ততর হয়ে পড়েছে। কাজেই পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করবার জন্যে নতুন উদ্যমে অগ্রসর হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই এবারের অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত কার্যসূচী সংযোজিত হয়েছিল। 'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব' বিষয়ক একটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান ছিল এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এই আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণকারী কয়েক জনের বক্তব্য তাঁদের স্বলিখিত প্রবন্ধ হিসাবে এই সংখ্যাটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। আমরা আশা করি—পরিষদের সভ্য, সমর্থক ও জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পরিষদ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হবে। এই আশা নিয়েই পরিষদ-পরিকল্পিত কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিতকরণের সূচনার প্রতীক হিসাবে বর্তমান সংখ্যাটি বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হলো।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

উনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান

গত ৫ই মে শুক্রবার অপরাহ্ণে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বক্তৃতা-কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী সভায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ জয়ন্ত বসু তাঁর নিবেদনে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি পরিষদের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কার্যবিবরণী পেশ করেন। ডাঃ বসু বলেন যে, পরিষদের অনেক জনশিক্ষামূলক পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্যে পরিষদ তার অনেকগুলি যথোপযুক্তভাবে এখনও কার্যে রূপান্তরিত করতে পারে নি।

প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতি-ভূষণ ভট্টাচার্য বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষাই মাধ্যম হওয়া উচিত। তবে তিনি মনে করেন যে, সর্বস্তরে মাতৃভাষা করবার মত উপযোগী যথেষ্ট পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। শীঘ্রই সরকার বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্যে এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে বলে শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের শুভানুধ্যায়ী উপস্থিত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের এই ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে তিনি আবেদন জানান। এই প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য আরও বলেন যে, পাঠ্য-পুস্তকের ব্যাপারে ব্যবসায়ী মনোভাব পরিত্যাগ করে মাতৃভাষার প্রসার ও শিক্ষার সুবিধার জন্যে পুস্তক রচনার দিকে সকলকে মনোনিবেশ করতে হবে।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, বাংলা দেশে অবিলম্বে সর্বস্তরে বাংলাভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু হওয়া উচিত। তবে তিনি মনে করেন যে, প্রকৃত পক্ষে বইয়ের অভাবই আসল সমস্যা নয়, সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, সর্বস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা সেই ভাষাতেই পরীক্ষা দিতে পারবে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাবে—এই তাঁর ধারণা। কর্মসচিবের বিবরণীতে পরিষদের উন্নতির জন্যে যে সব সাহায্য চাওয়া হয়েছে, সে সবের প্রতি তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এরপর একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তু—'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব'। এতে অংশ গ্রহণ করেন অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডক্টর অমিয়কুমার বসু, অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী ও অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। এঁরা যথাক্রমে কৃষি, চিকিৎসা, ভেষজ, শিল্প এবং শিক্ষাক্ষেত্রে

দেশের বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণে অধ্যাপক দেবেন্দ্র মোহন বসু বলেন যে, তিনি বাংলাভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক বিবিধ আলোচনা শুনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। ভবিষ্যতে আরও এই ধরণের আলোচনা-সভার আয়োজন করবার জন্যে তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদকে অনুরোধ জানান।

পরিশেষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে সমবেত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ মৃণালকুমার দাশগুপ্ত।

দীপক বসু

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ঊনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় সুধিবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা-দিবস বার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাই। পরিষদের বিংশতিতম বর্ষের প্রারম্ভ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা পরিষদের প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আপনাদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আজ এই অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতিরূপে পেয়ে আমরা বিশেষ গৌরব বোধ করছি। তিনি একদিকে যেমন নিজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও সেই সঙ্গে বিজ্ঞানী-দের প্রেরণার উৎস, অন্যদিকে আমাদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর একটি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিজ্ঞানীর ভবিষ্যৎ গঠনেই শুধু নয়, ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী গঠনেও তাঁর অদম্য শক্তি নিয়োজিত। আমাদের পরিষদের তিনি একজন প্রতিষ্ঠা-কালীন সদস্য; পরিষদের বহু কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যের সঙ্গে জড়িত আছে তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ ও সক্রিয় সহযোগিতা। পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টাকে কিভাবে আরো সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা যায়, সেই সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান অভিমত শোনবার জন্যে আমরা আগ্রহান্বিত হয়ে আছি।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়কে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি-রূপে পেয়ে আমরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করছি। বিশেষ কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি যে এই সম্মেলনে যোগদান করে আমাদের অনুপ্রেরণা দান করেছেন, তার জন্যে আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। অধ্যাপক ভট্টাচার্য নিজে একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজনীতিজ্ঞ। তিনি নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, প্রগতির পথে আমাদের সমাজকে ত্বরান্বিত করতে হলে অনেক পুরনো দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করা দরকার, গতানুগতিকতার ধারা ত্যাগ করে দরকার নতুন অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার। উদাহরণ হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রের একটি সমস্যার বিষয় উল্লেখ করি। বিজ্ঞানের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ ও উদ্যম লগ্নীকরণের হার যে অনুপাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার তুলনায় কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রসার ও বিজ্ঞান-প্রয়োগের প্রচেষ্টাতে? যাই হোক, আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সকল সমস্যা সম্পর্কে

অবহিত হয়ে এইগুলির প্রতিকার সাধনে উত্তরোত্তর সচেষ্ট হবেন। সারা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় ও জনকল্যাণমূলক করবার ব্যাপারে বিজ্ঞান পরিষদের মত প্রতিষ্ঠান নতুন কি কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে, সরকারের জনশিক্ষামূলক প্রকল্পগুলিতে পরিষদ কেমনভাবে সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারে এবং অপরপক্ষে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টায় সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা কিভাবে ও কতখানি পাওয়া যেতে পারে, অধ্যাপক ভট্টাচার্য তাঁর ভাষণে এই সকল বিষয়ে আলোকপাত করে আমাদের কর্মপ্রণালীর ও সাফল্যের পথ নির্দেশ করবেন বলে আমরা আশা করছি।

আমরা জানি যে, আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীদের অনেকের মনে একটা হতাশা ও নৈরাশ্যের ভাব বিরাজ করছে। আমরা মনে করি যে, এই গ্লানি আমাদের সমাজের দুরবস্থারই প্রতিফলন। তবে আপাততঃ বিজ্ঞানীরা যতই হতাশাগ্রস্ত হন, মনে মনে তাঁরা চরম আশাবাদী। কারণ তাঁরা আশা করেন, তাঁদের গবেষণার মধ্য দিয়ে ক্রমশঃই তাঁরা চরম সত্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। আমরা বলবো, যে, তাঁদের এই আশাবাদের বলিষ্ঠতা শুধু গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, সমাজের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, একজন বিজ্ঞানী গঠন করতে সমাজের যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়ে থাকে। শিক্ষা কমিশনের বিবরণী অনুযায়ী স্নাতক শ্রেণীর বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রের জন্যে বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ ১১৬১ টাকা। বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ছাত্রদের সম্পর্কে ঐ বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে ছাত্র-পিছু প্রতি বৎসর ব্যয় হবে ৫০০০ টাকা। সমাজের এই সব ঋণ শোধ করবার দায়িত্ব কি বিজ্ঞানীর নেই? সমাজ-জীবনে বিজ্ঞানীর কর্তব্য সম্বন্ধে পর্যালোচনা করবার জন্যে বর্তমান অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব' বিষয়ক একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, অধ্যাপিকা অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী, ডক্টর অমিয়কুমার বসু ও অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় এই আলোচনায় যোগদান করবার স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের কথা এঁরা আলোচনা করবেন। আমরা আশা করি, আলোচনাটির ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা জানতে পারবো এবং গঠনমূলক অনেক প্রস্তাবের আমরা সন্ধান লাভ করবো। এই আলোচনার বিবরণী পরিষদের মুখপত্র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে।

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ

বিজ্ঞানধর্মী বর্তমান যুগে প্রগতির পথের ছাড়পত্র, বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের জ্ঞান ও তার যথাযথ প্রয়োগ এবং এই বিজ্ঞানকে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার মণিকোঠায় বা পাঠ্যপুস্তকের পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রাখলে চলবে না, সূর্যের আলোর মত তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে সমাজের সর্বস্তরে—কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, সকলের মধ্যে। সেজন্যে বিজ্ঞান ও তার প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং দেশের মানস-লোকে একটি বৈজ্ঞানিক চেতনার সৃষ্টি করা—এই হচ্ছে বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের এই যে আদর্শ, জনগণের নিজেদের ভাষার মাধ্যমেই কেবল তার সাফল্যলাভ সম্ভব। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কাল থেকেই সেজন্যে বিজ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে মাতৃ-

ভাষাকে পরিষদ বরণ করে নিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরেই মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে পথের নির্দেশ দিয়েছে। আনন্দের কথা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীগণ—সকলেই শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কার্য-বিবরণী

পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সিদ্ধির জন্যে নানাবিধ প্রচেষ্টার কথা আপনারা অবগত আছেন। সেগুলি সম্বন্ধে এবার আমি সংক্ষেপে কিছু বলবো।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা

পরিষদের অন্যতম কৃতিত্ব হচ্ছে, গত উনিশ বছর যাবৎ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক বিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ। কিঞ্চিৎ বিলম্বিত হলেও পত্রিকাটির গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের চেষ্টাও চলেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বহু মূল্যবান প্রবন্ধ, বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে পত্রিকাটির গত অক্টোবর সংখ্যাটি নব-কলেবরে এই প্রথম শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। সুখের বিষয়, এই শারদীয় সংখ্যাটি বিজ্ঞানশিক্ষার্থী ও বিজ্ঞানানুরাগীদের বিশেষ সমাদর লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগ পরিষদের নিকট থেকে শারদীয় সংখ্যাটির ১৪০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বিতরণের ব্যবস্থা করায় পরিষদ তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ।

তবে শুধু একটি বিশেষ সংখ্যাই নয়, বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞানের এই একমাত্র মাসিক পত্রিকাটির নিয়মিত সংখ্যার ১৫০০ বা ২০০০ কপি ক্রয় করে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পাঠাবার জন্যে আমরা রাজ্য-সরকারকে বিশেষ অনুরোধ করি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে যে, কয়েকটি পত্রিকা সম্পর্কে এরূপ সরকারী ব্যবস্থার প্রচলন বহুদিন থেকেই রয়েছে।

সরকারের নিকট আমাদের আর একটি নিবেদন আছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশের জন্যে ১৯৪৮ সাল থেকেই সরকার পরিষদকে বাৎসরিক মাত্র ৩৬০০ টাকার সাহায্য করে আসছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্যে পত্রিকা প্রকাশনের ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, অথচ সাধারণ পাঠকদের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে পত্রিকাটির মূল্য বৃদ্ধি করা সমীচীন বলে মনে হয় না। এই অবস্থায় পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশন আর্থিক কারণে ক্রমশঃই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আমাদের এই আবেদন যে, তাঁদের বাৎসরিক সাহায্যের পরিমাণ যথোপযুক্ত বৃদ্ধি করে তাঁরা এই জনশিক্ষামূলক পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ উজ্জীবিত করুন।

বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক

বিজ্ঞান বিষয়ক লোকরঞ্জক পুস্তক প্রকাশ ও সেগুলি যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে পরিবেশন করা পরিষদের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এযাবৎ পরিষদ কর্তৃক এরূপ মোট ২১ খানা পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে এই সব পুস্তক ব্যয়ানুপাতে অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে জন-সাধারণের মধ্যে পরিবেশিত হয়ে থাকে। সেটা সম্ভব হয় এই কারণে যে, পরিষদের পুস্তকগুলি প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যেই প্রকাশিত হয়; সেজন্যে আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিষদের বিশেষ কিছু থাকে না। দেশে বিজ্ঞান-

শিক্ষার প্রসার সাধনে পরিষদের এই প্রয়াসে রাজ্যসরকারের এরূপ শুভেচ্ছা ও সাহায্যের জন্যে সরকারকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

বাংলাভাষায় লোকরঞ্জক পুস্তকই শুধু নয়, বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্য ও পরিভাষা সম্বলিত একটি বিজ্ঞানকোষ প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার কথাও পরিষদ চিন্তা করছে। ঐ বিজ্ঞানকোষ ৫ বা ৬ খণ্ডে বিভক্ত হবে; পৃষ্ঠাসংখ্যা হবে মোট প্রায় ৩০০০। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা যখন স্বীকৃত, তখন এরূপ একখানা বিজ্ঞানকোষ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। এই পরিকল্পনাটি রূপায়ণে যে অর্থ, লোকবল, সংগঠন প্রভৃতির প্রয়োজন, সেই সব বিষয় এখন পরিষদ কর্তৃক আলোচিত হচ্ছে। এরূপ তথ্য-পুস্তক প্রকাশনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ-সাহায্যের যে উদার ঐতিহ্য রয়েছে, আমরা আশা করি, বিজ্ঞানকোষ প্রকাশনের পরিকল্পনা গৃহীত হলে আমরাও সেই ঐতিহ্যের ধারা থেকে বঞ্চিত হবো না।

যে কোন দেশের শিক্ষার বনিয়াদ গঠিত হয় দেশের বিদ্যালয়গুলিতে। আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের যে সব পাঠ্যপুস্তক প্রচলিত আছে, সেগুলির অধিকাংশই বেশ কিছুটা উন্নতির অপেক্ষা রাখে। পরিষদ কর্তৃক অতীতে বিজ্ঞানের কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। পরিষদের পরিচালনায় ও খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানের আদর্শ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করবার যে সম্ভাবনা রয়েছে, এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা বোধ হয় অসমীচীন হবে না।

গ্রন্থাগার ও পাঠাগার

বিজ্ঞানবিষয়ক বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে পরিষদ কর্তৃক একটি গ্রন্থাগার ও পাঠাগার বহুদিন যাবৎ পরিচালিত হচ্ছে। এই গ্রন্থাগারের জন্যে কলিকাতা পৌর সংস্থার শিক্ষাবিভাগ থেকে বাৎসরিক ১৫০০ টাকার সাহায্য আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত ৩ বছরের আর্থিক সাহায্য এখনো পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় নি। এই আর্থিক সঙ্কটের জন্যে এবং তাছাড়া স্থানাভাবের দরুণও পাঠাগারটির উন্নতিবিধানে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা যায় নি। যাই হোক, আমরা আশা করি, পরিষদের যে নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রস্তুতি চলেছে, সেই গৃহটি নির্মিত হলে সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পুস্তকসমন্বিত একটি গ্রন্থাগার ও আধুনিক ধরণের একটি পাঠাগার স্থাপন করা পরিষদের পক্ষে সম্ভব হবে। বিজ্ঞান বিষয়ক মূল্যবান পাঠ্যপুস্তকাদি সংগ্রহ করতে না পেরে অনেক মেধাবী দরিদ্র ছাত্রের উচ্চশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। এজন্যে পরিষদের গ্রন্থাগারের একটি পাঠ্যপুস্তক-বিভাগও খোলা হবে এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সর্বপ্রকার পাঠ্যপুস্তক তাতে থাকবে—এরূপ একটি পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে

বিজ্ঞান-প্রদর্শনী

পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান-প্রদর্শনীগুলির বিষয় আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন। শ্রদ্ধেয় অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত বছর ফেব্রুয়ারী মাসে যে প্রদর্শনীটি আয়োজিত হয়, কর্মসচিবের গত বছরের বার্ষিক বিবরণীতে সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে। পারিতোষিক ও মানপত্র বিতরণের জন্যে যে অনুষ্ঠানের কথা সেই বিবরণীতে ঘোষণা করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠান পরে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়েছে।

যাই হোক, এই ধরণের প্রদর্শনী বিশেষ জনপ্রিয় হলেও এদের জীবনকাল অত্যন্ত সীমিত। সেজন্যে পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে একটি স্থায়ী প্রদর্শনী ও সেই সঙ্গে একটি 'খেয়াল খুশী কেন্দ্র' স্থাপনের পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে।

ঐ খেয়াল-খুশী কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের হাতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় উৎসাহ লাভ করবে।

বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিতভাবে লোক-রঞ্জক বক্তৃতাদানের ব্যবস্থার জন্যে পরিষদের পরিকল্পিত গৃহে একটি বক্তৃতা-কক্ষও নির্মিত হবে। তবে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরা যদি পরিষদের নিকট না আসে, তাহলে পরিষদকেই তাদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হতে হবে এবং সেই কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গিয়েছে। স্কুল, কলেজ, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষামূলক লোকরঞ্জক বক্তৃতা দানের আয়োজন করা হয়েছে। ঐ সব বক্তৃতার বিষয়বস্তু হলো—অণু-পরমাণুর জগৎ, টেলিভিসন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহিনী, মহাকাশ অভিযান ইত্যাদি। বক্তৃতায় নতুন নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে এবং নতুন বক্তাদের বক্তৃতায় পারদর্শিতা করবার উদ্দেশ্যে প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় পরিষদের কার্যালয় কক্ষে একটি আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আলোচ্য বক্তৃতাগুলিকে অধিকতর মনোজ্ঞ করবার জন্যে স্লাইড সহযোগে আলোকচিত্র এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শনেরও ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান বছরে এই পর্যায়ের প্রথম বক্তৃতাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৮ই মার্চ; স্থান—বাগবাজার বহুমুখী বালিকা বিদ্যালয়। অত্যন্ত আনন্দের কথা, শহর কলকাতা বা শহরতলী থেকেই শুধু নয়, কলকাতার বাইরে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এইরূপ বক্তৃতার আয়োজন করবার জন্যে পরিষদকে অনুরোধ করা হচ্ছে। একথা আমরা জানি যে, কলকাতা থেকেও বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে বিজ্ঞান প্রচারের অধিকতর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কারণ রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলতে গেলে 'কেবল মুখেই যদি রক্তসঞ্চার হয়, তবে তাহাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।' কিন্তু ম্যাজিক লণ্ঠন, ফিল্ম প্রজেক্টর প্রভৃতি যন্ত্র-পাতিসহ যাতায়াতের অসুবিধার জন্যে কলকাতার বাইরে বক্তৃতার যথেষ্ট ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয় নি। যন্ত্রপাতি পরিবহনযোগ্য একখানা গাড়ী সংগ্রহ করবার ব্যাপারে আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে এই অত্যাবশ্যক কাজটি আমরা অচিরেই সুরু করতে পারবো।

পরলোকগত বিজ্ঞানী ও সুসাহিত্যিক রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রদত্ত দানের অর্থে পরিষদ কর্তৃক প্রতি বছর 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' নিয়মিতভাবে আয়োজিত হচ্ছে। বর্তমান বছরে এই বক্তৃতা দান করবেন শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বিষয়বস্তু: ভারতের গো-মহিষ ও তাদের পুষ্টি-সমস্যা। আমাদের কৃষি ও খাদ্যসমস্যার কথা স্মরণ করে ঐ বিষয়বস্তু নির্ধারিত হয়েছে। আগামী ১২ই মে, '৬৭ শুক্রবার অপরাহ্ন ৫-৩০টার সময় ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইন-ষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে উক্ত বক্তৃতাটির আয়োজন করা হচ্ছে। সেই সভায় যোগদান করবার জন্যে আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

নূতন দিগন্ত

আমাদের দেশের সমাজ-জীবনে আধুনিক যুগোপযোগী একটা পরিবর্তনের আগ্রহ আজ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের দৌলতে জ্ঞানের পরিধি যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই এক উন্নততর জীবনের জন্যে দেশবাসী উন্মুখ হয়ে উঠছে এবং তদনুরূপ সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্যে উত্তরোত্তর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করছে। এই যে এক নতুন দিগন্তের আজ আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান পরিষদের মত জনশিক্ষামূলক

প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও অধিকার বহুলাংশে প্রশস্ত হয়ে পড়ছে। এই সব দায়িত্বের কথা আমার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করেছি। আমরা আশা করি, আপনাদের আলোচনা ও সমালোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা দৃঢ়তর হবে। অপরপক্ষে মনে রাখতে হবে যে, এই পরিষদ মূলতঃ বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, আপনাদের সকলের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং আপনাদের শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতার উপর পরিষদের কিছুটা অধিকার আছে বললে বোধ করি অন্যায় হবে না।

আপনারাও যে পরিষদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন, তার প্রমাণ হচ্ছে—আপনারা ধৈর্য সহকারে কর্মসচিবের নিবেদন এতক্ষণ শুনেছেন। সেজন্যে আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি। ইতি

কলিকাতা জয়ন্ত বসু
৫ই মে, ১৯৬৭ কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

[ঊনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডক্টর অসীমা চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনদীয়াবিহারী অধিকারী, ডক্টর সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনের বক্তব্য বিষয় তাঁদের স্বলিখিত প্রবন্ধ হিসাবে প্রকাশিত হলো। —সঃ]

ভারতীয় সমাজ-জীবনে ভেষজ-বিজ্ঞানের ভূমিকা

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে ভেষজ-বিজ্ঞান সুপ্রাচীন কাল থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ জীবন-ধারণের তাগিদে যেমন শস্য উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল, তেমনি তারা, ব্যাধি ও মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে লতাগুল্ম ও বৃক্ষাদির মধ্যে খুঁজে বের করেছে নানাবিধ ভেষজ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রয়োগলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষ বহু বনৌষধির সন্ধান পেয়েছে। জনকল্যাণমূলক এই মহান ব্রত সাধনে ভারতবর্ষ যে এক সময়ে সারা বিশ্বে অন্যতম পুরোধার ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, প্রাচীন ভারতের মনীষীদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি সম্বলিত বিভিন্ন প্রামাণিক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থাবলী আজও তার সাক্ষ্য বহন করছে। চরক ও সুশ্রুত সংহিতার কাল থেকে বৌদ্ধযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছিল। এমন, একদিন ছিল, যখন ভেষজের ক্ষেত্রে ভারত যে কেবল স্বয়ম্ভরই ছিল তা নয়, পৃথিবীর পণ্যের বাজারেও ছিল ভারতের ভেষজ একটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানী দ্রব্য। ভারতীয় ভেষজ যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতো, স্বভাবতঃই তা ছিল বহু দেশের ঈর্ষা ও আতঙ্কের কারণ। বিশিষ্ট রোমান রাজনীতিবিদ প্লিনি তাই দুঃখ করে বলেছিলেন—ভেষজের পরিবর্তে রোম থেকে যে পরিমাণ সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে, তার ফলে রোমের অর্থনীতিতে দেখা দেবে এক গভীর সঙ্কট।

পরবর্তী কালে পরাধীন ভারতবর্ষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দুর্বার গতিশীলতার সঙ্গে আপন মানসিকতার নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারায় সেই গৌরবময় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে পারে নি। যে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি একদিন সারা বিশ্বে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করে তাকে যুগোপযোগী করতে না পারায় তার সার্বজনীনতা উত্তরোত্তর হ্রাস পেয়ে গেল। একটা সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আয়ুর্বেদ তাই আশানুরূপ প্রসার লাভ করতে পারে নি। কিন্তু ভেষজ-বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আদৌ থেমে যায় নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ জৈব রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং প্রধানতঃ যন্ত্র-বিজ্ঞানের সহায়তায় ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছে। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষ এই উন্নতির সম্যক অংশীদার হতে পারে নি।

ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে সত্য, কিন্তু এখনও পরনির্ভরশীলতার গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তাই ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় আজও রয়ে গেছে পুরনো ব্যবস্থার অবশেষ। তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হবার পরেও শিল্পক্ষেত্রে আমরা ঈপ্সিত লক্ষ্যের কাছাকাছিও পৌঁছুতে পারি নি। জাতীয় সম্পদের অসম বন্টনের ফলে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার অনিশ্চয়তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে সমাজ-জীবনে বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাবল্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শ্রমের তুলনায় উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে ক্ষয়-রোগাক্রান্ত জনসাধারণের এক বিরাট অংশ সমগ্র জাতিকে এক চরম অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত, অনিয়মিত জীবনধারার পরিণতি হিসাবে ভারতীয় জনসাধারণের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক কোন না কোন যকৃতের রোগ, বাত, আলসার, কোলাইটিস অথবা ক্রনিক অ্যামিবায়োসিসে ভুগছে। গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের প্রকোপ এখনও দূরীভূত হয় নি। কলেরা, বসন্ত এখনও প্রতি বছর কোন কোন স্থানে মহামারীরূপে দেখা দিচ্ছে। নানা প্রকার মনোবিকৃতিজনিত ব্যাধি ও উন্মাদরোগের প্রাবল্য ভারতীয় সমাজ-জীবনে উত্তরোত্তর বেড়েই যাচ্ছে। কুষ্ঠ, ধবল এবং নানাপ্রকার চর্মরোগীর সংখ্যাও কম নয়। এছাড়া মেনিন্‌জাইটিস, নিউমোনিয়া, ডায়াবেটিস, নানা ধরণের হৃদ্‌রোগ, ক্যান্সার এবং নানা ভাইরাসজনিত দুরারোগ্য ব্যাধি আমাদের সমাজে আজ অতি সাধারণ রোগে পর্যবসিত হয়েছে।

এই সব রোগ নিরাময়ের জন্যে আমরা প্রধানতঃ সংশ্লেষণজাত ঔষধই (Synthetic Drugs) ব্যবহার করে থাকি। শিল্পায়নে অনগ্রসরতার ফলে এই সব কৃত্রিম ঔষধের অধিকাংশই আমাদের বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। এর জন্যে ভারতকে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্থাৎ সোনা ব্যয় করতে হয়। তারই কয়েকটি ভেষজ ও সংশ্লেষণজাত ঔষধের তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

১নং পরিসংখ্যান সারণী

ভেষজ ঔষধ

ঔষধের নাম

১। ষ্ট্রিকনিন
২। রেসারপিন
৩। ক্যাফিন ও ক্যাফিন জাতীয় ঔষধ
৪। এফিড্রিন ও এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড
৫। স্যানটোনিন
৬। কুইনিন ও কুইনিন জাতীয় ঔষধ
৭। সিঙ্কোনা উপক্ষার (Cinchona alkaloids)
৮। আফিং উপক্ষার
৯। এমিটিন (Emetine)

১০। ডিজিটেলিসের গ্লাইকোসাইডস্ (Digitalis)
১১। আরগট উপক্ষার ও আরগট জাতীয় ঔষধ
১২। স্কোপোলামিন
১৩। ভিটামিন-পি
১৪। পেপেইন
১৫। কোকেন
১৬। অ্যাট্রোপিন সালফেট

সংশ্লেষণজাত ঔষধ ও অ্যান্টিবায়োটিক্স

১। পেনিসিলিন
২। ক্লোরামফেনিকল
৩। এরিথ্রোমাইসিন
৪। অক্সিটেট্রাসাইক্লিন
৫। স্ট্রেপটোমাইসিন
৬। টাইরোথ্রিসিন
৭। অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক্স

গন্ধকজাতীয় ঔষধ (Sulpha Drug)

১। থ্যালিল সালফাথায়াজল
২। „ সালফাডাইমেটিন
৩। সালফাসিটামাইড
৪। সালফআইসোঅক্সাজোল
৫। সালফাগোয়ানিডিন
৬। সালফানিলামাইড
৭। সালফাথায়াজল
৮। সালফাডায়াজিন
৯। সালফামেরাজিন
১০। অন্যান্য গন্ধক জাতীয় ঔষধ

যক্ষ্মা-প্রতিষেধক ঔষধ

১। পি. এ. এস. (প্যাস) ও তার লবণ
২। আই. এন. এইচ. (আইসোনিকোটিনিক হাইড্রাজাইড)

কুষ্ঠ-প্রতিষেধক ঔষধ

১। ডি. ডি. এস. এবং ডি. ডি. এস. জাতীয় ঔষধ (সালফোন জাতীয় ঔষধ)
২। থায়োএসিটাজোন

আমাশয়-প্রতিষেধক ঔষধ

১। আয়োডোক্লোরো এবং ডাই আয়োডো-হাইড্রক্সি কুইনোলিন
২। কারবারসোন

ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ

১। ক্লোরোকুইন এবং ক্লোরোকুইন ফসফেট
২। অ্যামোডায়াকুইন
৩। ডারাপ্রিন

ভিটামিন

১। ভিটামিন-এ
২। নিকোটিনিক অ্যাসিড এবং নিকোটিনামাইড
৩। ভিটামিন বি$_১$, বি$_২$, বি$_৬$, বি$_{১২}$
৪। ফোলিক অ্যাসিড
৫। ভিটামিন-সি
৬। „ কে
৭। „ ডি
৮। „ ই

ডায়াবেটিস-প্রতিষেধক ঔষধ

১। ইনসুলিন
২। কারবুটামাইড
৩। টলবুটামাইড
৪। ক্লোরোপ্রোপামাইড

অ্যানালজেসিক্স, অ্যান্টিপাইরেটিক্স প্রভৃতি যন্ত্রণানাশক ঔষধ

১। স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, অ্যাসপিরিন
২। সোডিয়াম স্যালিসাইলেট
৩। ফেনাসেটিন
৪। অ্যাসিডোপাইরিন
৫। ফিনাইল বিউটাজোন

অ্যানথেলমিনটিক্স

(ক্রিমি ও ক্রিমি-জাতীয় পোকা-বিনাশক ঔষধ)

১। পাইপেরাজিন, অ্যাডিপেট

ফাইলেরিয়া-প্রতিষেধক ঔষধ

১। ডাই-ইথাইল কার্বামাজিন সাইট্রেট

কার্ডিয়াক ষ্টেবিলাইজার

১। নিকেথামাইড

অ্যান্টিকোয়াগুলেন্টস্

১। অ্যাসিনোকুমানল
২। ইথাইল বিস-কুমাসিটেট

অ্যানাস্থেটিক্স
জ্ঞানলোপকারী রাসায়নিক দ্রব্য

১। ইথার
২। ক্লোরালহাইড্রেট
৩। ইথাইল ক্লোরাইড
৪। ক্লোরোফর্ম
৫। প্রোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড
৬। জাইলোকেইন
৭। ফেনোবারবিটোন ও ফেনোবারবিটোন সোডিয়াম

অ্যান্টিহিষ্টামিনিক্স

১। ডাইফিনাইল হাইড্রামিন হাইড্রোক্লোরাইড
২। বুক্লিজিন
৩। ক্লোরোসাইক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড
৪। মেক্লোজিন
৫। সাইক্লিজিন হাইড্রোক্লোরাইড
৬। মেপাইরামিন ম্যালিয়েট
৭। প্রোমেথাজিন ও প্রোমেথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড
৮। সিনোপেন

সিমপ্যাথোমিনেটিক্স ও অ্যান্টিরিউম্যাটিক্স

১। আইসোপ্রেনালিন সালফেট
২। মেফেনটাঁরমিন সালফেট
৩। ডাইমিথাইল অ্যাম্ফিটামিন

ট্র্যাঙ্কুইলাইজারস্

১। হাইড্রক্সিজিন হাইড্রোক্লোরাইড
২। মেপ্রোবামেট
৩। নিয়ালামাইড
৪। প্রোমাজিন
৫। ক্লোরোপ্রোমাজিন হাইড্রোক্লোরাইড

এর জন্যে প্রতি বছর আমাদের কি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হচ্ছে, নিম্নবর্ণিত ২নং পরিসংখ্যান সারণী থেকে তার কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

২নং পরিসংখ্যান সারণী

ঔষধের নাম			১৯৬৫-৬৬ সালে আমদানীজাত ঔষধের দাম
(ক) গন্ধক জাতীয় ঔষধ	...	...	১৩৬৮৭৪৯৯·০০ টাকা
(খ) অ্যান্টিবায়োটিক্স	...	...	২২৫৭১১৩০·০০ ,,
(গ) যক্ষা-প্রতিষেধক	...	...	৭৮৭৬৯৯·০০ ,,
(ঘ) ভিটামিন জাতীয় ঔষধ	...	...	৫৯৬৫৫৭২·০০ ,,
(ঙ) ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক	...	...	১৫৮৪৯৬৩·০০ ,,
(চ) ডায়াবেটিস-প্রতিষেধক	...	...	৯২৩৭০৮·০০ ,,

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির একপেশে চিন্তাধারার ফলে রোগ নিরাময়ে ভেষজ ঔষধের প্রচলন ক্রমে ক্রমে অবলুপ্ত হতে বসেছে এবং এখনও যে পরিমাণ ভেষজ আমরা ব্যবহার করে থাকি, তারও এক বৃহৎ অংশ কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে, যদিও এই সব ঔষধ নিষ্কাশনের জন্যে যথেষ্ট কাঁচামাল আমাদের দেশেই রয়েছে। নিম্নে বর্ণিত ৩নং আংশিক পরিসংখ্যান সারণী থেকে এই বিষয়ে একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায়।

৩নং পরিসংখ্যান সারণী

	ভেষজের নাম		১৯৬৫-৬৬ সালে আমদানীজাত ঔষধের মূল্য
(ক)	ক্যাফিন ও ক্যাফিন জাতীয় ঔষধ	...	৯৫৬৭৫৫০'০০ টাকা
(খ)	এফিড্রিন ও এফিড্রিন হাইড্রোক্লোরাইড	...	৭২২৫৪'০০ ,,
(গ)	কুইনিন ও কুইনিন জাতীয় ঔষধ এবং অন্যান্য সিঙ্কোনা উপক্ষার	...	১২৩১৬'০০ ,,
(ঘ)	আফিং এবং আফিং উপক্ষার	...	১৫৭০৭ ০০ ,,
(ঙ)	আরগট উপক্ষার	...	৬৩৯০৯০ ০০ ,,
(চ)	ভিটামিন-পি	...	১৫৫৭৬'০০ ,,
(ছ)	পেপেইন	...	১১৬১০'০০ ,,

এখানে সামান্য কয়েকটির হিসাব দেওয়া হলো এবং এর দাম প্রায় সাড়ে ছয় কোটি টাকা। অবশ্য তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে দশ কোটি (বর্তমান মুদ্রামান হ্রাসের জন্যে)। ভারতবর্ষ আজ এক গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। এই সঙ্কটের সমাধানকল্পে আমাদের এক আত্ম-নির্ভরশীল অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এর জন্যে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় কমিয়ে সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। এইরূপ অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে তাই ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করতে হবে। রোগ নিরাময়ে কৃত্রিম সংশ্লেষণজাত ঔষধের একচেটিয়া প্রয়োগের পরিবর্তে ভারতীয় ভেষজের ব্যাপক প্রচলনের দ্বারা আমাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটের আংশিক সমাধান করা যায়। ভারতবর্ষের বিস্তৃত বনরাজির লতা-গুল্ম ও বৃক্ষাদির অমূল্য খনি থেকে আজও বহু যুগান্তকারী ভেষজ আহরণ করবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে—শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা এই রত্নখনি থেকে রত্ন আহরণে ভারতব্যাপী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সম্ভাবনাকে সফল রূপ দেবার জন্যে এক সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত। তার জন্যে ভারতের যাঁরা ভাগ্যনির্ণায়ক, তাঁদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান যুগে যে সমস্ত কৃত্রিম ঔষধ রোগ নিরাময়ে অভাবনীয় বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, তাদের আবিষ্কারের মূলে রয়েছে ভেষজ-বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাই ভেষজ-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচলন ভাবীকালের বহু যুগান্তকারী কৃত্রিম ঔষধ আবিষ্কারের পথ খুলে দেবে, এরূপ আশা করা মোটেই অহেতুক

নয়। যে সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধ ভেষজ অপেক্ষা অধিকতর ক্রিয়াশীল এবং যে সমস্ত ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধের পরিবর্তে কোন যোগ্য ভেষজ আজও আবিষ্কৃত হয় নি, সে সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধ অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং এই সব ঔষধ যাতে আমাদের দেশেই তৈরি করা যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়ে আমরা বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় কিঞ্চিৎ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছি। সম্প্রতি প্রকাশিত পরিসংখ্যানে (ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকা, ২রা মে, ১৯৬৭) দেখা যায় যে, কিছুসংখ্যক কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদনে আমরা মোটামুটি আত্মনির্ভরশীল হতে পেরেছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পেনিসিলিন, ক্লোরামফেনিকল, ভিটামিন-এ ও বি$_{১২}$, নিয়াসিন, নিয়াসিন অ্যামাইড, ইনসুলিন, করটিকোষ্টেরয়েড শ্রেণীর প্রেড্‌নিসোন, প্রেড্‌-নিসোলোন, করটিসোন, হাইড্রোকরটিসোন, মিথাইলটেষ্টোষ্টেরোন, আই. এন. এইচ. এবং থিয়াসিটোনোন প্রভৃতি কৃত্রিম ঔষধ বর্তমানে বিদেশ থেকে খুব সামান্য পরিমাণেই আমদানী করতে হচ্ছে। কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদন শিল্পের সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভিক বছরে ও ১৯৪৮ সালে ভারতে যথাক্রমে ১০ ও ১২ কোটি টাকা মূল্যের কৃত্রিম ঔষধ উৎপন্ন হতো—তা ১৯৬৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৫ কোটি টাকায়। আশাব্যঞ্জক হলেও এই অগ্রগতি উপরিউক্ত ঔষধের ক্ষেত্রেই এখনও সীমাবদ্ধ। আরও বহুবিধ কৃত্রিম ঔষধ-শিল্পায়নের ক্ষেত্রে এখনও আমরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারি নি। এই সব কৃত্রিম ঔষধ উৎপাদনের সহায়ক হিসাবে উপযুক্ত রসায়ন শিল্পের প্রসারের একান্ত প্রয়োজন।

বহু গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেখা গেছে যে, অনেক কৃত্রিম ঔষধ সাময়িকভাবে অপূর্ব ফলদায়ক হলেও একই রোগীর উপর অধিক কাল প্রয়োগের ফলে রোগ প্রতিষেধক বা প্রতিরোধক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে অনেক ভেষজ-দ্রব্য কৃত্রিম ঔষধের তুলনায় সাময়িকভাবে কম ক্রিয়াশীল হলেও দীর্ঘস্থায়ী রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার অধি-কারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন ছোট চাঁদর ও বড় চাঁদর (১নং চিত্র)—এর ভেষজগুণ মানসিক ব্যাধি প্রশমনে অপূর্ব ফলদায়ক। সিঙ্কোনা গাছ থেকে নিষ্কাশিত ভেষজ আর এক জলন্ত প্রমাণ। এক সময়ে আমাদের দেশে সিঙ্কোনার ব্যাপক চাষ করা হতো এবং সিঙ্কোনাজাত ভেষজ-দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতাম। পরবর্তী কালে নতুন নতুন সংশ্লেষণজাত ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধক (Synthetic antimalarials) প্রস্তুতির ফলে সিঙ্কোনার কদর কমে গেল। আমাদের সিঙ্কোনার চাষ অনেক কমিয়ে দিতে হলো। কিন্তু বর্তমানে কৃত্রিম ম্যালেরিয়া-প্রতিষেধকের তুলনায় সিঙ্কোনা-জাত ভেষজের উৎকর্ষ প্রমাণিত হওয়ায় ভারতবর্ষে সিঙ্কোনা (২নং চিত্র) চাষের এক বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এছাড়া সিঙ্কোনা থেকে উপজাত দ্রব্য কুইনিডিন সালফেট দ্রবণ হিসাবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া নিয়মিত করবার কাজে বিশেষ ফলপ্রসূ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম ঔষধ অধিক ব্যবহারের ফলে রোগীর দেহে তীব্র বিষক্রিয়া (Toxic effect) ও অন্যান্য ক্ষতিকারক উপসর্গের সৃষ্টি হয়। গন্ধক জাতীয় বহু কৃত্রিম ঔষধ এই প্রকার দোষে দুষ্ট। ভেষজ-দ্রব্যে এই ধরণের ক্ষতিকারক প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না।

অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে, অতি পুরাতন অপাঙ্‌ক্তেয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে এমন বিস্ময়কর ভেষজের সন্ধান দিয়েছে, যার সমকক্ষ

কোন কৃত্রিম ঔষধ আজও আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় নি। তাই আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতির সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সর্বপ্রকার গোঁড়ামির উর্ধ্বে থেকে ব্যবহৃত ঔষধের মূল্যমান নির্ধারণ করা এবং এই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা-পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আধুনিকীকরণ এবং তা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে জৈব রসায়ন ও শারীরবিদ্যার সাহায্যপুষ্ট আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ তত্ত্বের নিবিড় সমন্বয় সাধন করা। তাই

১নং চিত্র
বড় চাঁদর

কাজ সঠিকভাবে পরিচালিত হলে দেখা যাবে যে, ভারতের সমাজ-জীবনে যে সব সাধারণ রোগ পরিলক্ষিত হয়, তা নিরাময়ে দেশীয় ভেষজ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম। আবার ভেষজ-দ্রব্যের মূল্যমান নির্ধারণের জন্যে প্রয়োজন, উপেক্ষিত আয়ুর্বেদজ্ঞ, জৈব রাসায়নিক, উদ্ভিদ ও শারীর-বিজ্ঞানী এবং আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের এক সুসংগঠিত সংস্থার নিরলস কর্মযজ্ঞের মাধ্যমেই কেবলমাত্র জনকল্যাণে ভেষজ-বিজ্ঞানের বিরাট সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। এইরূপ একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনের মাধ্যমে

ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত ভেষজের পূর্ণ মূল্যায়ন করবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের বিশাল বনসম্পদ থেকে বিধিবদ্ধ ব্যাপক অনুশীলনের দ্বারা নতুন নতুন ভেষজ আবিষ্কার করে ভারতীয় চিকিৎসা-পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। সকল উন্মেষে এই পরিকল্পনা বিশেষ সহায়ক হতে পারে। তাই ভেষজ-বিজ্ঞানের এইরূপ সংগঠিত প্রকল্পের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে ভারতবর্ষ একদিকে যেমন চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এবং উন্নততর পদ্ধতির সাহায্যে

২নং চিত্র
সিঙ্কোনা

ভেষজের বৃহদাকার উৎপাদনের জন্যে যে সব গাছগাছড়া থেকে এই সব ঔষধ নিষ্কাশিত করা হবে, তাদের ব্যাপক চাষের ব্যবস্থা করা। এর জন্যে যে বিশাল লোকশক্তির প্রয়োজন, তাতে ভারতের জনসংখ্যার এক বৃহৎ অংশের কর্ম-সংস্থান করা সম্ভব। তাছাড়া ভেষজ-বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত বহু বৈজ্ঞানিক প্রতিভার নিষ্কাশিত দেশীয় ভেষজ রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে, তেমনি যে বেকার সমস্যা আজ এক গভীর জাতীয় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে, তারও আংশিক সমাধান করতে সক্ষম।

এভাবেই জাতীয় জীবনে এবং সমাজকল্যাণ-কর কাজে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের কর্তব্য ও দায়িত্ব

যথেষ্টই আছে এবং তার সঙ্গে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সমবেত চেষ্টা এবং সহযোগিতারও প্রয়োজন রয়েছে। লেখিকার অভিমত এই যে, দেশের যাঁরা নেতা ও কর্ণধার, তাঁরা যদি অভিজ্ঞ, বহুদর্শী বিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং তাঁদের পরামর্শে কৃষি শিল্প বা ভেষজ ও সংশ্লেষণজাত ঔষধের শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন এবং তাদের প্রসারের চেষ্টা করেন, তাহলে দেশের প্রকট এবং গুরু-সমস্যার সমাধান কিছু হতে পারে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা সব সময়েই সাহায্য করতে প্রস্তুত, তাঁরা হাতে-কলমে কাজ করতে আগ্রহী, দেশের আহ্বানে তাঁরা আত্মোৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না, কিন্তু তাঁদের আমন্ত্রণ করছে কে?

সবশেষে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আমার ছাত্র ডাঃ প্রিয়লাল মজুমদার এবং ডাঃ সরলনাথ ঘোষকে, যাঁরা এই হস্তলিপির ব্যাপারে সহায়তা করেছেন।

বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব

আজকের সমাজ জীবনে সাধারণভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়াই প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক এই সময়ে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে তার হিসাব-নিকাশ করা সাহসিকতার পরিচায়ক। বিজ্ঞানীরা যে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, তা আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনেই প্রকাশ। বিজ্ঞানীদের পারিপার্শ্বিক সমাজ ও বৃহত্তর মানব সমাজ—এই দুইটির নিকট বিজ্ঞানীদের দায়িত্ব সাধারণ মানুষের সীমাবদ্ধ সামাজিক দায়িত্বের চেয়ে অনেক বেশী।

বিজ্ঞানীর আজ আর একান্তে একক সাধনার দিন নেই। একক সাধনায় সারা জীবনে একটি বিষয়ের চূড়ান্ত সমীক্ষা শেষ নাও হতে পারে এবং অন্য দেশে হয়তো সেই বিষয়টিই যৌথ দায়িত্বে সংঘবদ্ধভাবে বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাগা-ভাগি করে ২০ বছরের কাজ ২০ মাসেই চূড়ান্ত পর্যায়ে আসতে পারছে। তাছাড়া জগতে প্রথম হবার জন্যে সব দেশের মধ্যেই একটা প্রতিযোগি-তার আবহাওয়া বর্তমান। প্রথম হয়ে বাজী জেতবার দৌড়ে তাই সব দেশই ঐকান্তিক আগ্রহে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা অনেক পিছিয়ে আছেন। সংঘবদ্ধভাবে কাজে এগিয়ে যাবার সুযোগ ও সুবিধার অভাব এবং কার দান কত গুরুত্বপূর্ণ এবং কার স্থান কার নীচে বা উপরে হবে, এর সমাধানেই কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ঝিমিয়ে আসে। আসল কাজ অর্থাৎ যাতে দেশের সুনাম ও দশের উপকার হবে, সেটা হয়তো আরম্ভ করাই হয় না বা হলেও শেষ পর্যন্ত চলে না। এখানেই শেষ নয়—রেশারেশি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় গবেষণাগার, বিভিন্ন মন্ত্রকের গবেষণাগার ছাড়িয়ে শিল্পে পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টর পর্যন্ত যায়। শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের স্থান সমাজে কোথায়, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। তবে এটা ঠিক যে, পাবলিক সেক্টর, প্রাইভেট সেক্টরের উপরে।

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের টিঁকে থাকবার জন্যে সকলের সঙ্গে মিলেমিশেই এগিয়ে যেতে হবে। গবেষণা হোক বা উৎপাদন হোক, মান

নির্ণয়ই হোক বা স্থায়িত্ব-গুণ নির্ণয়ই হোক, সবগুলি কাজই একজনের পক্ষে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে সতর্কতার সঙ্গে তাড়াতাড়ি শেষ করা প্রায় অসম্ভব। অল্প সময়ে বিষয়বস্তুটির সব দিক থেকে পর্যালোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হলে কতকগুলি লোকের এক সঙ্গে যৌথ দায়িত্বেই কাজে হাত দিতে হয় এবং তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান করতে হয়। দায়িত্বের এখানেই শেষ নয়। শিল্পে মূল্য নিরূপণ একটা প্রধান কাজ এবং সেজন্যে বিশেষ সমীক্ষার প্রয়োজন। সাধারণতঃ দেখা যায়, বিজ্ঞানীর আত্মতৃপ্তি একটি জিনিষ তৈরির সঠিক উপায় নির্ধারণেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পের জন্যে উৎপাদন করতে হলে জানতে হবে, কত কম মূল্যের উপাদানে, কত কম পরিশ্রমে, কত কম সময়ে, কত কম পরিমাণ উপাদানে কত বেশী বিশুদ্ধ ও উচ্চ মানের দ্রব্য পাওয়া যাবে। আবার উৎপাদনের প্রক্রিয়া এমন হওয়া দরকার, যাতে বিশেষ ধরণের যন্ত্রাদি বাদেই অর্থাৎ বেশী মূলধন না খাটিয়েই কাজটি চালিয়ে যাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীকে আরও দেখতে হয় যে, প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন বাষ্প উঠে কাজের জায়গার আবহাওয়া বা কর্মীদের বিষাক্ত করছে কিনা। শিল্পে গবেষণা ও সমীক্ষার (Research & development) এজন্যে আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নেই।

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর দায়িত্ব পালন করা সহজ হয়, যদি তিনি সকলের সহযোগিতা আকর্ষণ করতে পারেন। সহকর্মীদের যেমন বিজ্ঞানীর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা দরকার, তেমনি পুঁজি-নিয়োগকারীরও সম্পূর্ণ আস্থা বিজ্ঞানীর উপর থাকা দরকার। বিজ্ঞানীরা অনেক সময় কতকগুলি জিনিষ অনুমান করতে পারেন, কিন্তু তার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ উপস্থিত করতে পারেন না। এমন জায়গায় খুব বেশী ব্যয়সাধ্য না হলে বিজ্ঞানীর অনুমানকেই প্রত্যক্ষ বলে ধরে নিলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লাভই হয়। সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে নতুন উদ্ভাবনেই হোক, উন্নততর প্রক্রিয়ার সন্ধানই হোক বা প্রক্রিয়ার সংখ্যা সাশ্রয়েই হোক, উন্নতিশীল শিল্পে বিজ্ঞানী, গবেষক ও সমীক্ষকের সংখ্যা বেড়েই চলে।

নতুন নতুন বিজ্ঞানীদের আর একটা বিশেষ দায়িত্ব হচ্ছে, বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার কাজে প্রশিক্ষণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সুরু থেকেই শিল্পে প্রশিক্ষণ বিজ্ঞান শিক্ষা বিশেষ করে ফলিত বিজ্ঞান শাখাগুলির ক্ষেত্রে একটা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে নেওয়া হয়েছে। এতে মনে হয় বুঝি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূরক হলো শিল্পে অল্পস্থায়ী এই হাতে-কলমে কাজ। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে এই অল্পস্থায়ী শিল্পে শিক্ষা বিশেষ কাজে আসে না। সেজন্যে শিল্পে নিযুক্ত হলে পুরাতন বিজ্ঞানীদের কাজ হয় নতুনদের ওখানকার কাজের ধারার সঙ্গে পরিচিত করা ও একক দায়িত্বের গবেষণা ও সমীক্ষার কাজে উদ্বুদ্ধ করা। Operational research-এর বিষয়ে হাতেখড়িও এখানেই আরম্ভ হয়।

শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিজ্ঞান-সভা ও আলোচনা-চক্র গড়ে তোলা বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের মধ্যে আসে—যেখানে ঐ সঙ্গে বিজ্ঞানী ছাড়া অন্যান্য কর্মীদেরও আলোচনায় যোগ দিতে দেওয়া হয় এবং দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে সজাগ করে দেওয়া হয়। সেখানে বিজ্ঞানীদের সামাজিক দায়িত্বও পালিত হয়। তাছাড়া শিল্পে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যাতে অসামাজিক কাজ না হতে পারে, তার দায়িত্বও বিজ্ঞানীদের উপরেই ন্যস্ত থাকে। বিজ্ঞানীদের সমবেত দৃষ্টি এদিকে থাকলে অসামাজিক কাজ

শিল্পে হতেই পারবে না। কর্তব্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করতে চাই।

বৃহত্তর সমাজের নিকট নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্যে শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা Indian Patent & Designs Act—দেশের ও দশের উন্নতির জন্যে, কালোপযোগী আমূল সংশোধনের জন্যে সরকারের দৃষ্টি বিভিন্ন সময়ে আকর্ষণ করে আসছেন। একদল বিশিষ্ট বিজ্ঞানী খাদ্য, ওষুধ ও রাসায়নিক ঔষধির সব Patent বাতিল করবার সুপারিশ করেন। তাঁদের মতে দেশের ভেষজ-বিজ্ঞানের উন্নতি এতে ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু সত্যি কি তাই? Patent Act-এর আওতায় আসে না, এমন বহু প্রয়োজনীয় ওষুধ ও রাসায়নিক দ্রব্য এখনও আমাদের দেশে তৈরি হয় না। কারণ যদিও পরীক্ষাগারে সেগুলি তৈরির প্রক্রিয়া বিজ্ঞানীদের জানা, কিন্তু ব্যবসায়িক ভিত্তিতে দেশের চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রক্রিয়া বা যন্ত্রাদির সমাবেশ এখনও অজানা বা কাঁচা উপাদান দেশে পাওয়া যায় না অথবা প্রয়োজনীয় বিশেষ ধরণের যন্ত্রাদি (Equipment) দেশে তৈরি হয় না। এই অবস্থায় Patent Act বাতিল করলে কিছু ব্যবসায়ী হয়তো সস্তায় কাঁচামাল আমদানী করে লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নিতে পারে বা দুই-একজন উদ্যমী উৎপাদনকারী দেশীয় কাঁচামালের সাহায্যে ২।৪টি দ্রব্যের উৎপাদন হাতে নিতে পারে। এতে ভেষজ শিল্পের দীর্ঘমেয়াদী উপকার হবে কি? এতেই কি আমাদের দেশের শিল্প পশ্চিমের এই জাতীয় শিল্প সংস্থার সমকক্ষ হবে?

শিল্পে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এতে দেশের ভেষজ শিল্পের উদ্যম ব্যাহত হবে। কেন না, এই শিল্পে গবেষণা ও সমীক্ষার কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানীর সংখ্যা এমনিতেই খুব কম এবং বৈজ্ঞানিকের গবেষণা ও সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা শিল্পে কেবল স্বীকৃতি লাভ করতে আরম্ভ করেছে। এই অবস্থায় সহজ লাভের পথ উন্মুক্ত হলে কষ্টকর ও সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমীক্ষার দীর্ঘমেয়াদী সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করতো। সৌভাগ্যের বিষয়, ভারত সরকারও কালোপযোগী পরিবর্তন করতে রাজী হয়ে একটি বিল উপস্থিত করেছেন, কিন্তু সেটা লোকসভায় পাশ করিয়ে নেবার সময় গত এক বছরের মধ্যেও হয়ে ওঠেনি।

এই বিল পাশ হলে খাদ্য, ওষুধ ও ঔষধির প্রস্তুত সংক্রান্ত Patent ষোল বছরের জায়গায় দশ বছর বলবৎ থাকবে। তিন বছরের মধ্যেই যদি Patent-ভুক্ত দ্রব্য Patent-গ্রহীতা বা তার পক্ষে কেউ ভারতবর্ষে তৈরি না করেন, তাহলে তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে (Automatic revocation)। Patent-গ্রহীতাকে ভারতীয় কাঁচামাল থেকে Patent-এ বর্ণিত পুরা প্রক্রিয়া এই দেশেই করতে হবে। এতে Patent-এর আড়ালে একচেটিয়া আমদানী বন্ধ হবে এবং দেশের শিল্পে বিদেশী মূলধন এবং বিজ্ঞানী ও শিক্ষিত কর্মীর নিয়োগ বাড়বে। বর্তমান Patent Act-এ বস্তু ও প্রক্রিয়া এমন গোলমেলে ভাবে জড়িয়ে আছে, যার জট ছাড়াবার জন্যে সব সময়েই ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ বিচার বিভাগের নির্দেশ নিতে হয়। নতুন বিলে শুধু প্রক্রিয়ার জন্যেই Patent হতে পারবে, বস্তুর জন্যে নয়। এতে সমীক্ষকদের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেবার সুযোগ বাড়বে এবং বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সফলতার জন্যে আর্থিক পুরস্কার পাবারও অধিকারী হবেন। এতে দেশের মধ্যে গবেষণার কাজ বেড়ে যাবে। অনেকে মনে করেন যে, আমাদের দেশের গবেষণাগারগুলিতে পৃথিবীর বাজারে বেচবার মত Patent এপর্যন্ত সম্ভব না হওয়াতেই গবেষণারত বিজ্ঞানীদের অক্ষমতা ঢাকা দেবার জন্যেই Patent তুলে দেবার কথা উঠেছে। হয়তো এর মধ্যে কিছু সত্য

আছে। এমন দুই-চারটি দেশ আছে যারা বিদেশী Patent এবং Know how কিনে তার উৎকর্ষ সাধন করে আবার মূল Patent-এর দেশেই বিক্রয় করছে। এমন কি, সাধারণভাবে Patent বিক্রয় করে France-এর বেশ মোটা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হয়।

এই বিল যাতে না পাশ হয়, তার জন্যে বিদেশী ভেষজ শিল্পের অধিপতিগণ ও তাঁদের ভারতীয় শাখা বা যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি একযোগে চেষ্টা আরম্ভ করেছেন। Manufacturing Chemists Association (U. S. A) তাঁদের দেশের সরকারের উপর চাপ দিচ্ছেন, যাতে এই বিল পাশ না হয়। ইংল্যাণ্ডে Patent Act সংশোধনের জন্যে তোড়জোড় চলেছে। সেখানেও আমেরিকার কোম্পানীগুলির সঙ্গে ওখানকার নিজস্ব কোম্পানীগুলির মতের মিল হচ্ছে না। আমাদের দেশের এই বিল পাশ হলে অন্যান্য অনেক দেশেই অনুরূপ সংশোধন আসতে পারে।

এছাড়াও বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুমান সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে তথ্য বিতরণ বিজ্ঞানীদের দায়িত্বের আওতায় আসে।

বিজ্ঞানীর খোলা মনের বিচারের অভাবে যাতে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিভ্রান্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে না পড়েন, সে দিকেও দৃষ্টি রাখা দরকার। খাদ্যপ্রাণ আবিষ্কার হবার পর থেকে বাংলাদেশে সেদ্ধ চাল সম্বন্ধে বিজ্ঞানী এবং অবাঙ্গালী ভারতীয়গণ একযোগে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট করবার অভিযোগ করেন। এই সম্বন্ধে বায়োকেমিষ্টদের বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধে বাঙালীদের এই প্রাচীন বদ অভ্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং বক্তৃতা দেওয়া হয়। কিন্তু গত মহাযুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার বিজ্ঞানীগণ কর্তৃক প্রমাণিত হয় যে, ধান সেদ্ধ করে চাল প্রস্তুত করবার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত। কারণ এতে চালের খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। আতপ চাল তৈরির পদ্ধতিতে চালের খাদ্যপ্রাণ অনেক বেশী নষ্ট হয়। এমন কি, সরকার এখন সমগ্র দেশে যাতে সেদ্ধ-চাল তৈরি হয়, তার ব্যবস্থা করেছেন। টিংচার ডিজিটেলিস্ নামক ওষুধটি আদর্শ অবস্থায় যত বেশী দিন থাকে, তত বেশী তার শক্তিক্রম নষ্ট হয়। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহু গবেষণা-পত্র ছাপা হয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধের মধ্যে আমেরিকার ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির ভাষণে বলা হয় যে, টিংচার ডিজিটেলিস-এর শক্তিক্রম কালক্রমে ক্রমশঃ নষ্ট না হয়ে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এর কারণ ঐ ভেষজের মধ্যে শক্তিক্রম দাবিয়ে রাখবার একটি জিনিষ থাকে, যা পরে নষ্ট হয়ে যায়। এতে শক্তিক্রম বেশী হলো বলে মনে হয়। আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্‌দের পূর্বাভাস একটি স্থায়ী হাস্যকৌতুকের নমুনা হিসাবে সাধারণ মানুষ মনে করে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' রেজেষ্ট্রি করবার পূর্বেই প্রফুল্লচন্দ্র 'ঈষ্টার্ণ সিরাপ' বাজারে ছাড়েন। বি. কে. পাল কোম্পানীর স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয় তাঁকে জানান যে, আপনার 'ঈষ্টার্ণ সিরাপ' ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা সিরাপের সমতুল্য নয়, কারণ আপনার সিরাপের রং সাদা কিন্তু ইংল্যাণ্ড থেকে আনা মালের রং হল্‌দে অথবা জরদা। এই অবস্থায় আপনার তৈরি জিনিষটি চিকিৎসকগণ নিকৃষ্ট মানের বলে মনে করছেন। আচার্য রায় তখন পাল মহাশয়কে বোঝান যে, টাট্‌কা তৈরি ওষুধের রং সাদা হয় ও বহুদিন রাখলে তার রং ধীরে ধীরে হল্‌দে হয়ে যায়। কিন্তু চিকিৎসকদের সহানুভূতি আকর্ষণ করবার জন্যে আচার্য রায়কে কৃত্রিম উপায়ে তার রং হলুদে পরিবর্তিত করে দিতে হয়। আচার্য রায় তাঁর বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকার এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের সাহায্যে সাধারণ চিকিৎসকদের ভুল

ধারণা দূর করতে চেষ্টা করেন এবং দশ বছরের মধ্যেই সফলকাম হন। দেশে এখনও লাল রঙের বোরিক তুলা বাজারে বিক্রয় হয়, যদিও তুলা বা বোরিক অ্যাসিড কোনটির রং লাল নয়। এই লাল রং করবার কারণ হচ্ছে, জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বোরিক তুলা সাদা হলে জনসাধারণ তাকে ভেজাল বা নিকৃষ্ট মানের মনে করে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক দেওয়া যায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করলে দেশের ও দশের উপকার করা হবে। বিজ্ঞানী ভিন্ন এই কাজ সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

কৃষি-বিজ্ঞানী হিসেবেই আমি এই আলোচনা-চক্রে যোগদান করছি। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হলে আপনারা অধিকতর লাভবান হতেন। কারণ, যদিও কৃষি-বিজ্ঞান বিভাগে কৃষি-রসায়ন বিষয়ে অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত আছি, তাহলেও বলতে সাহস পাচ্ছি না যে, কৃষি-বিজ্ঞানের মত জটিল বিষয়ে সামান্যও আলোকপাত করতে পারবো। অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত কৃষি-বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব বহুধা বিস্তৃত। ভারতের তিন-চতুর্থাংশের অধিক লোক কৃষির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, বাকী অংশও, বলাবাহুল্য পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারী মোট বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ ১৬০০০ কোটি টাকা, তার মধ্যে কৃষি-উৎপাদন খাতে বরাদ্দ হয়েছে ৫৪০০ কোটি টাকা। এই দুটি তথ্যের দ্বারাই কৃষি, তথা কৃষি-বিজ্ঞানীর দায়িত্বের পরিধি উপলব্ধি করা যাবে।

এডুকেশন কমিশন যে সুবৃহৎ রিপোর্টটি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পেশ করেছেন, তার কৃষিশিক্ষা সংক্রান্ত অধ্যায়ের ভূমিকায় যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রয়োজনীয় অংশের টানা অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়:

কৃষির উন্নতিকল্পে যা যা করণীয়, সে সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য সুস্পষ্ট। আগামী ১৫ বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্য-উৎপাদন দ্বিগুণ করতে হবে এবং পরবর্তী কালে উন্নতির হার উপযুক্তভাবে বজায় রাখতে হবে। আমরা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করবো, বৃষ্টির উপর কৃষির নির্ভরতা কমিয়ে ফেলবো, কৃষি-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নানা ধরণের উন্নততর বীজ প্রস্তুত করবো। এতদ্ব্যতীত বনজ সম্পদ এবং মৎস-সম্পদ এমনভাবে বৃদ্ধি করবো, যার ফলে বর্তমান গ্রামীণ জনসাধারণ উন্নততর সমাজ গঠনে অগ্রসর হতে পারে।

এই লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে একমাত্র বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব। এই জন্যে সেচ-ব্যবস্থা, সার-উৎপাদন ও তার উপযুক্ত প্রয়োগ, কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহার, উন্নততর বীজ ব্যবহার, কৃষকদের সুবিধাজনক পদ্ধতিতে ঋণদান, উৎপন্ন দ্রব্যের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থা, যানবাহন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু এগুলিই যথেষ্ট নয়—বস্তুতঃ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন উন্নত

ধরণের কৃষিসংক্রান্ত শিক্ষা ও গবেষণা-ব্যবস্থার। এসব ছাড়া কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন ত্বরান্বিত করা একেবারেই সম্ভব নয়। অন্যথায় অর্থের অপচয় অনিবার্য। এই অপচয় প্রতিরোধকল্পে কমিশনের সুপারিশ এই যে, অনতিবিলম্বে কয়েকটি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয় গঠন করা হোক এবং কৃষি-মহাবিদ্যালয়গুলির আশু উন্নতি বিধান করা হোক, যাতে যত শীঘ্র সম্ভব গবেষণা, অধ্যাপনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগের কাজ সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হতে পারে এবং উপযুক্ত ও মেধাবী ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক কৃষি-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হতে পারে।

কৃষি-বিজ্ঞানীর সামগ্রিক দায়িত্ব সম্পর্কে উদ্ধৃত অংশ থেকে আমরা একটি স্বল্পবিস্তর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সামনে রাখতে পারি। কিন্তু দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অধিকতর খাদ্যোৎপাদনই কৃষি-বিজ্ঞানীর আশু ও প্রধান দায়িত্ব বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। সুতরাং এই দিকে দৃষ্টি রেখেই কয়েকটি বক্তব্য রাখবার চেষ্টা করবো। বলাবাহুল্য, খাদ্যোৎপাদন এবং তার বৃদ্ধি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ও কর্মীর সহযোগিতায়ই সম্ভব। এখানে প্রধানতঃ কৃষি-বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়েই সমস্যার বিচার ও সমাধানের উল্লেখ করবো।

এডুকেশন কমিশন তাদের বিবরণীতে কৃষি সংক্রান্ত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার উপর অধিকতর জোর দিয়েছেন। এটা তো আশা করা যায়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে কৃষি-গবেষণার অবদান একটুও আশাপ্রদ নয়। দীর্ঘকাল ধরে বহু অর্থ ব্যয় হয়েছে উন্নত জাতের ধানের বীজ উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা-কার্যে, অথচ আমরা নিজস্ব দায়িত্বের কথা ভুলে গিয়ে বহিরাগত বীজের উৎকর্ষ নিয়ে মেতে উঠেছি। আমরা এতদিন কি করেছি—সেই নিয়ে তো কোন সতর্ক বাণী উচ্চারিত হচ্ছে না। গমের বেলায়ও ঐ একই অভিযোগ খাটে। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, বিজ্ঞানীরা কি সকল প্রকার জবাবদিহির বাইরে? এই বিফলতার কাহিনী সত্ত্বেও গবেষক ও বিজ্ঞানীরা কি তাঁদের দায়িত্ব পালন করছেন বলা যায়?

পূর্বেই বলেছি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যোৎপাদনই কৃষি-বিজ্ঞানীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। আমি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ধানই পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খাদ্যশস্য। সুতরাং ধানের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়েই সমধিক দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। খাদ্যোৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা নানাভাবে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের বর্তমান দৈনিক খাদ্যের পরিমাণ স্বাস্থ্যের পক্ষে যথেষ্ট না হলেও ঠিকমত খেতে জানলে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবার কোন কারণ নেই। ক্রমবর্ধমান লোক-সংখ্যার অনুপাতে খাদ্যোৎপাদনের হার যথেষ্ট অধিক হলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। লোক বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য। কৃষি উৎপাদনে ঘাট্তি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলেই আমাদের রপ্তানীর কোন উন্নতি হয় নি। দ্রব্য-মূল্য স্থিতিশীল করতে হলে কৃষি-উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই উপলব্ধি থেকেই চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মনে হয়, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং কৃষি-উৎপাদনে ঘাট্তি মুদ্রা অবমূল্যায়ণের অন্যতম কারণ। তা সত্ত্বেও চতুর্থ পরিকল্পনা রূপায়ণে অসুবিধা, ত্রুটি এবং অন্তরায় কি, এই বিচার না করেই ব্যয়ের ক্ষেত্রে নতুন ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে।

উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি আপাত চিন্তায় অবান্তর মনে হলেও উদ্দেশ্য নিয়েই অবতারণা করছি। যে ভাবেই হোক, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে আমাদের জীবনমান ও তৎসম্পর্কিত চিন্তাধারা প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। একথা বৈজ্ঞানিক

গবেষণা, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং পরিকল্পনায় যে যে বিষয়ের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের সম্পর্ক নিকটতর হতে বাধ্য।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে প্রধানতঃ দুটি পন্থা অবলম্বন করা যায়। প্রথমতঃ শস্যক্ষেত্রের বিস্তৃতি; দ্বিতীয়তঃ সার, উন্নতজাতের বীজ, জলসেচ এবং মাটির যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা ফলন বৃদ্ধি। প্রথমোক্ত সুযোগ ভারতবর্ষ কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ক্রমশঃই কমে আসছে। দ্বিতীয় উপায়ের সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে এবং আমরা এখনও তার সদ্ব্যবহার করি নি।

কৃষি-বিজ্ঞানী গবেষণার দ্বারা দেখেছেন যে, প্রতি কিলোগ্র্যাম নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস সার প্রয়োগে যথাক্রমে ১০-১১ ও ৬-৭ কিলোগ্র্যাম ফসল বাড়তে পারে। এই প্রকার গবেষণার একটি সর্ত রয়েছে—অর্থাৎ ফসল বাড়াবার জন্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট আছে, যথা—উপযুক্ত বীজ, মাটি ও জলসেচ। সেইরূপে জলসেচের সাহায্যে ফসল দ্বিগুণ করা সম্ভব—এই হারও নির্ভর করে জমির অন্যান্য গুণের মধ্যে আর্দ্রতা রক্ষার ক্ষমতা এবং উন্নত জাতের বীজ ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার ব্যবহারের উপর। মোট কথা, ফলন বৃদ্ধির উপাদানগুলি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কৃষি-বিজ্ঞানীর দায়িত্ব কেবলমাত্র গবেষণার ক্ষেত্রেই যদি সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে তাঁরা ঐ দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে পালন করেছেন বলা যায়, কারণ পরবর্তী কাজ অর্থাৎ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত। সেখানে যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, তাহলে কৃষি-বিজ্ঞানীকে অপরাধী করা চলে না। কিন্তু বক্তব্য এই যে, যে আদর্শ অবস্থার মাধ্যমে বিজ্ঞানী সাধারণতঃ গবেষণার ফল লাভ করেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তা অনেক সময়েই সম্পূর্ণ রূপায়িত করা সম্ভব নয়। তখন নতুন করে বিজ্ঞানীর উপর দায়িত্ব এসে পড়ে। অতএব যে সব সুযোগ-সুবিধা অথবা অসুবিধা রয়েছে, তারই মধ্যে কিভাবে কাজ করলে বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বাধিক ফল লাভ করা যায়, বিজ্ঞানীকে তারও পন্থা এবং নির্দেশ দিতে হবে। বরং বলা চলে যে, প্রথম থেকেই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানীর গবেষণা করা উচিত ছিল। এই সতর্ক উক্তি অন্যান্য গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

যে পরিমাণ সার দিলে, যে পরিমাণ জলসেচ প্রয়োগ করলে, যে পরিমাণ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করলে আমরা গবেষণালব্ধ ফল সম্পূর্ণ ভাবে লাভ করতে পারতাম, সে পরিমাণ সার, সেচের জল এবং বীজ আমাদের নেই এবং এও সত্যি কথা যে, আমাদের কোন্ কোন্ মাটি এরূপ উন্নত ধরণের চাষের উপযুক্ত, তা আমরা সঠিক জানি না। অথচ আশু ফল লাভের জন্যে বিলম্বিত গবেষণার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। সুতরাং যেটুকু সম্বল আছে, তার উপযুক্ত ব্যবহার করবার প্রচেষ্টাই শ্রেয়। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে পূর্ণতর গবেষণার সুযোগ গ্রহণ করা যাবে।

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির উপায়রূপে যে সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করবো, তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগীয় অধিকর্তা শ্রীআশুতোষ সান্যাল মহাশয়ের নিকট ঋণ স্বীকার করছি। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেয়ে এই সিদ্ধান্তগুলির বাস্তব প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি।

পশ্চিমবঙ্গে ৮০% ভূমিতে অর্থাৎ প্রায় ১.১৫ লক্ষ একর জমিতে ধান চাষ করা হয় এবং তার ৮৫% ভাগই আমন ধান। আমন ধান ৪-৬ মাস জমি অধিকার করে থাকে, যার জন্যে আমন জমি এক ফসলী হতে বাধ্য, বিশেষতঃ যেখানে বারিপাতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে জমি যেখানে বেলে, সেখানেও প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে আমন বীজ বপন করা

হয়, অথচ জমি ঐ জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বিগত কয়েক বছরে প্রতি জেলার খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ তুলনা করলে নজরে পড়ে যে, যে বছর সামগ্রিক ফলন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে (১৫%-২০%), তা কেবলমাত্র কয়েকটি জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রায় প্রতি জেলায়ই অল্প-বিস্তর বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বারিপাতের সময় ও পরিমাণ তুলনা করে দেখা গেল যে, ঐ বছর ঠিক পরিমাণ ও সুসময়ে বৃষ্টি হয়েছে। অতএব সার বা উন্নত বীজ ব্যতীত কেবলমাত্র জলের সদ্ব্যবহারের দ্বারাই কিয়দংশ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব। যথেষ্ট জল পেলে একটি ফসলের পরিবর্তে দুটি কিম্বা তিনটি ফসলও নেওয়া যায়। এই সংক্রান্ত দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

আমন ধান সাধারণতঃ জুলাই, অগাষ্ট বা সেপ্টেম্বরে বপন করা হয়। সুতরাং বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল চাষের জমিতে আউস ধান, পাট ইত্যাদির সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুতঃ যেখানেই আমনের পূর্বে ১০০ দিন জমি খালি পাওয়া যাবে, সেখানেই আউস রোপণ করা সম্ভব। বৃষ্টির জল কম থাকলে ডাঙ্গাজমির আউস বপন করা যায়, কিন্তু যথেষ্ট জল পেলে রোয়া আউস লাগানো সম্ভব। শেষোক্ত উপায়ে ফলন বৃদ্ধি অনিবার্য। ডাঙ্গাজমির আউস হিসাবে 'দুলার' জাতের ধান অতি উপযুক্ত। এই ধান প্রায় ৯০ দিনেই পেকে উঠে। রোয়া আউস বপন করা সম্ভব হলে জমি বাস্তব পক্ষে প্রায় ৭৫ দিন ব্যবহৃত হয়, কারণ বাকী ২০-২৫ দিন চারা অবস্থায় অন্যত্র অতিবাহিত হয়। আমনের পূর্বে আউস ধান থেকে যে খড় পাওয়া যাবে, তাকে অনায়াসে সবুজ অবস্থায়ই মাটির সঙ্গে চাষ করে দেওয়া যায় এবং এই পদ্ধতি পরবর্তী আমনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত হবে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, আউসের খড় অধিক দিন সংরক্ষণ করা যায় না, সুতরাং সবুজ অবস্থায়ই মাটিতে চাষ করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এই খড় অতিরিক্ত ফসল থেকে পাওয়া, সুতরাং গবাদি পশুর খাদ্যরূপে ব্যবহার করবার প্রশ্নই ওঠে না। এভাবে পাট চাষের সময়েও পত্রাদি সঞ্চিত হয়ে যে জৈব সার মৃত্তিকার সঙ্গে যুক্ত হয়, তাতে পরবর্তী ধানের ফলন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পাট বন্ধ করে ধানের ক্ষেত বিস্তার করবার প্রচার বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তিশীল নয়।

আপত্তি হতে পারে যে, আউস ও আমনের পর পর বপনের পদ্ধতিতে আমনের জন্যে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে না, অতএব ফলন হ্রাসের সম্ভাবনা রয়েছে। এখানেই বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফল প্রচলিত প্রথার ভুল প্রমাণ করছে। আমন ধান বিশেষ ঋতুতে বপন করবার প্রথা আবহমান-কাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অধ্যাপক সৌরীন্দ্রমোহন সরকার, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ এবং কৃষি-বিজ্ঞানী শ্রীআশুতোষ সান্যাল দেখিয়েছেন যে, এই ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। 'বোরো' ঋতুতেও তথাকথিত আমন ধান রোপণ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত আমন ধান 'লাটসাইল' বোরো ঋতুতে বপন করে প্রচুর ফলন বৃদ্ধি করা হয়েছে। চাকদহস্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কৃষি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা-কার্য এখনও চলছে—প্রতিবেশী ও অন্যান্য কৃষকগণও ঐ পদ্ধতি নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল ক্ষেত্রে পরিমিত জলের প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপরিউক্ত কৃষিকেন্দ্রে গভীর টিউব ওয়েলের সাহায্যে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো অনেকেই জানেন না যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১,৫৪০টি গভীর টিউব ওয়েল বসানো হয়েছিল। কিন্তু তন্মধ্যে মাত্র ৩৫০টি চালু, তাও সবকয়টি পূর্ণমাত্রায় নয়। এই প্রসঙ্গে কূপ ও পুষ্করিণী খননকার্য ত্বরান্বিত করবার প্রতি দৃষ্টি দিলে ভাল হয়। পরিমিত জল পেলে চারটি পর্যন্ত ফসল পাওয়া যেতে পারে—এরূপ নিবিড় চাষের নমুনা চাকদহ কৃষিকেন্দ্রে দেখানো হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (বিস্তারিত তথ্য কৃষি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় দ্রষ্টব্য, ক্রমিক সংখ্যা ১৯৬৫, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)

পাট	ডুলার (আউস)	ভাসামাণিক আমন	বোরো (লাটিসাইল)
২০।২—১৯।৬ (১১·৬৫ মণ/একর)	২৬।৬—৯।৯ (১৮·৬৫ মণ/একর)	১৫।৯—২২।১২ (৩৩·৪ মণ/একর) অথবা কলাই ২৬।৯—১৪।১২ (৬ মণ/একর)	২৮।১২—৩০।৫ (৬১·৬৫ মণ/একর)

লাটিসাইল ছাড়া অন্যান্য আমন ধান ব্যবহারে অধিকতর ফলন পাওয়া গেছে। এছাড়া অন্য প্রকার শস্য-আবর্তন পদ্ধতিও গ্রহণ করা যায়।

দেখা গেছে যে, উপযুক্ত জল ও সার প্রয়োগের দ্বারা সর্বসাকুল্যে ১৪০ মণ/একর ফসল পাওয়া যেতে পারে। যে পদ্ধতিতে এই ফলন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে, তাতে কোন প্রকার ব্যয়সাপেক্ষ যন্ত্রাদি বা অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয় নি। জল, উপযুক্ত বীজ ও প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করেই এই ফল পাওয়া গেছে—এমন কি, বহিরাগত শস্য-বীজও ব্যবহার করা হয় নি। অতএব সাধারণ কৃষক এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে করছেও।

ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্বরতা সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সবুজ সার এবং আউসের খড় কেবলমাত্র জৈব সারের কাজই করবে না, এদের সঙ্গে যুক্ত উদ্ভিদ-খাদ্য, যথা—নাইট্রোজেন, পটাশ এবং ফস্‌ফরাসও জমিতে ফিরে আসবে। কিন্তু যাতে কার্বন/নাইট্রোজেন অনুপাত ও ফস্‌ফরাস সুনির্দিষ্ট থাকে, তার জন্যে বাইরে থেকে একর প্রতি ১০-২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরাস খুবই কার্যকরী হবে। প্রায় ২৫-৩০ দিন লাগবে খড় পচতে ; সুতরাং যেখানে জমিতে খড় ইত্যাদি চাষ করবার সময় হবে না, সেখানে বাইরে পচিয়ে নেওয়া সমীচীন হবে।

উল্লিখিত গবেষণার দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আউস ও আমন একই জমিতে অনায়াসে নিতে পারি। খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাই যদি পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহলে অনায়াসে আমরা খাদ্যে স্বনির্ভর হতে পারি। এই পদ্ধতি অনুসারে নিম্নলিখিত সময়-তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

আউস ধান		আমন ধান
বপনকাল	ফলনকাল	বপনকাল
১৫।৩	১।৬	১৫।৭—২৫।৭
১৫।৪	১।৭	১।৮—৭।৭
১৫।৫	২০।৮	২৩।৮—৩০।৮

প্রথমোক্ত দুটি ক্ষেত্রে আউসের খড় জমিতে চাষ করা সম্ভব হবে, কিন্তু শেষোক্ত ক্ষেত্রে বাইরে পচানো দরকার হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থেকে দেখা যায় যে, উক্ত সময়-তালিকাভুক্ত মার্চ-এপ্রিল মাসের বপনকার্য সমগ্র জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলি-গুড়ি এবং পশ্চিম দিনাজপুরের কোথাও কোথাও অনুসরণ করা যায়। এছাড়া মে মাস পর্যন্ত বপন সময় বাড়িয়ে দিয়ে হুগলী, ২৪ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের কোথায়ও কোথায়ও বৃষ্টির জলের সাহায্যেই আউস ধান বপন করা সম্ভব। সেচের বন্দোবস্ত থাকলে সর্বত্র এই পদ্ধতি প্রচলন করা সম্ভব। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশই বর্তমানে এক ফসলী, বিশেষ করে যেখানে আমন

বপন করা হচ্ছে। সেখানে অনায়াসে আমনের পূর্বে আউসের প্রচলন সম্ভব।

আউসের বীজ প্রায়ই দুষ্প্রাপ্য, কারণ আউস প্রধানতঃ কৃষকদের খাদ্যের জন্যেই উৎপাদন করা হয়। তাছাড়া আউস ধানের বীজের একটি অসুবিধা রয়েছে। সামান্য জল পেলেই এই ধানের বীজ অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং ফসল তোলবার সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক করবার ব্যবস্থা থাকা দরকার, অন্যথায় আগামী বছরের জন্যে সেগুলিকে বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। আউস বীজের প্রয়োজন কালে যাতে মূল্যবান সময় নষ্ট না হয়, সেজন্যে কৃষকদের নিকট থেকে আমনের পরিবর্তে সমপরিমাণ আউস ধান সময়মত বিনিময় করা বাঞ্ছনীয়। এই সব কারণে মনে হয় যে, অপেক্ষাকৃত শুষ্ক অঞ্চল, যেমন—নদীয়া, মুর্শিদাবাদ এবং পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলি থেকে আউস ধান সংগ্রহ করা সমীচীন হবে।

আউস/আমন পদ্ধতি সর্বত্র প্রচলিত হলে (কোন কোন অঞ্চলে বর্তমানে চালু আছে) কৃষকদের উপর কাজের চাপ স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যাতে কৃষক-মজুরদের অভাবে কাজ বন্ধ না থাকে সেজন্যে অন্য ব্যবস্থা, বিশেষ করে যান্ত্রিক সহায়তা অবলম্বনের কথা ভাবতে হবে। এই সম্পর্কে ছোট ছোট বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইরূপ যন্ত্রাদি আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যায় নয়। এই প্রসঙ্গে জাপান থেকে 'পাওয়ার টিলার' আমদানী করবার পরামর্শ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কৃষকদের স্বল্প মূল্যে অথবা ভাড়া প্রথায় ব্যবহারের জন্যে এই সব যন্ত্রাদি অনায়াসে দেওয়া যেতে পারে। ১৫।২০ একর জমির জন্যে একটি ছোট যন্ত্রই যথেষ্ট। প্রয়োজনমত ঐ যন্ত্রই ধান মাড়াইয়ের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। এই দিকে আমাদের যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

খাদ্যাদি ফসল সংগ্রহের ব্যাপারে জাপান এবং রাশিয়া যে পদ্ধতি গ্রহণ করে, সেরূপ ব্যবস্থার কথাও এই প্রসঙ্গে চিন্তা করা যায়। ফসল সংগ্রহের একটি উপযুক্ত এবং নির্দিষ্ট তারিখ দিয়ে যদি কৃষকদের জানানো হয় যে, ঐ তারিখের মধ্যে ফসল জমা দিলে দ্বিগুণ মূল্য পাওয়া যাবে এবং পরে দিলে আনুপাতিকভাবে মূল্য হ্রাস পাবে, তাহলে কৃষক ও মজুরগণ অধিকতর পরিশ্রম করবার উৎসাহ লাভ করবে। ঐ সব দেশে এই ব্যবস্থায় সংগ্রহ-কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে; সুতরাং আমরাও অনুরূপ কৃতকার্যতা আশা করতে পারি। বলা বাহুল্য জমি যদি কৃষকের নিজস্ব না হয়, তাহলে তাদের মনে এই উৎসাহ ও প্রেরণা আসতে পারে না।

উপরে যে কার্যক্রমের মোটামুটি একটি কাঠামো উপস্থিত করা হলো, তাকে কার্যকরী করতে হলে স্বভাবতঃই উপযুক্ত কর্মীর প্রয়োজন। কেবল তাই নয়, প্রয়োজনমত বর্তমান অবস্থার এখানে-ওখানে পরিবর্তন করতে হলে বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন কর্মী সংগ্রহ করা উচিত। বর্তমান সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তন বিষয়ে এখানে আলোচনা অবান্তর। তা সত্ত্বেও সাধারণ-ভাবে বলা যায় যে, জেলায় জেলায় কৃষি-সংক্রান্ত অফিসার ও কর্মীদের সরাসরি কৃষি বিভাগের অধীনে রাখাই বাঞ্ছনীয়, নতুবা কাজ ত্বরান্বিত করবার পথে বাধা উপস্থিত হতে পারে। এছাড়া কৃষি-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মহাধি-করণের বাইরে বিভিন্ন এলাকার ভারপ্রাপ্ত করে পাঠিয়ে দিলে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রসার-কার্য ফলপ্রসূ হবে।

প্রসঙ্গতঃ খাদ্যোৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত কয়েকটি বিষয়ের অবতারণা করা সঙ্গত মনে করি। বৈজ্ঞানিক প্রথায় খাদ্যোৎ-পাদনের ব্যাপারে এগুলির সংযোগ ক্ষীণ হলেও

এটুকু স্বীকার করতে হবে এবং বোঝবারও প্রয়োজন রয়েছে যে, খাদ্যোৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হলেই খাদ্যাভাব এবং তৎসংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান সুনিশ্চিত হবে না। খাদ্যের সঙ্গে যতদিন কূটনৈতিক কিম্বা রাজনৈতিক উত্থান-পতন জড়িয়ে থাকবে, ততদিন অধিকতর খাদ্যোৎপাদনই একমাত্র সমস্যা নয়। উদ্বৃত্ত প্রদেশেও দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া দেখেছি, সে যে কেবল সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থার অভাব এবং চোরা কারবারীদের দৌরাত্ম্যজনিত, তার প্রমাণ রয়েছে। এই দুর্ব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণ প্রশাসনিক। বলা যায় যে, বণ্টন ব্যবস্থা যদি ঠিক হতো, তাহলে আমাদের বর্তমান অভাব এত বেশী মারাত্মক হতো না, যার জন্যে বাইরে থেকে ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে খাদ্য আমদানী করতে হচ্ছে। আমার দৃঢ় মত এই যে, যতদিন পর্যন্ত আমরা অনাবশ্যক আমদানী বন্ধ করতে না পারি, ততদিন পর্যন্ত কোন প্রকার উৎপাদন বৃদ্ধির কাজই ঠিকমত প্রচলন করা যাবে না অথবা করলেও নিরর্থক হতে বাধ্য। যদি খাদ্য আমদানী একান্তই আবশ্যক হয়, তাহলে উপযুক্ত ক্রয়মূল্য দিয়েই যেন আমদানী করা হয়, অন্যথায় স্বনির্ভরতার প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে। বণ্টন ব্যবস্থায় গলদ থাকবার আর একটি হানিকর পরিণাম এই যে, একটি বিশেষ শ্রেণী লাভবান হচ্ছে এবং সেজন্যেই মূল্যস্ফীতি রোধ করা যাচ্ছে না।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিখাতে বরাদ্দের একটি বৃহৎ অংশই ব্যয়িত হবে কৃষি-উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে, অথচ তার সুফল সমস্ত কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে না। সারের মোটা অংশ ব্যবহৃত হবে রপ্তানীযোগ্য ফসলের জন্যে। বাকী যেটুকু খাদ্যোৎপাদনের জন্যে ব্যয়িত হবে, তাও যাবে অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কৃষকদের হাতে, যারা বেশী জমি চাষ করে, কিন্তু নিজের হাতে নয়; অর্থাৎ তাদের উৎসাহ অন্যত্র। অতএব যারা সার, জলসেচ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধাগুলি উপযুক্তভাবে গ্রহণ করতে পারতো, তারাই হবে বঞ্চিত। সেচের জল অর্ধেকেরও কম ব্যবহৃত হয়, তার কারণ যে অর্ধেকের নিজেদের জমি নেই, তারা আর্থিক অক্ষমতার জন্যে জল ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে জলের অনবরত অপচয় ঘটছে, অথচ কৃষকের জমিতে পৌঁছাবার জন্যে প্রয়োজনীয় খাল বা নালা তৈরি হচ্ছে না। বর্ষাকালে বহুব্যয়ে প্রস্তুত বাঁধের বাড়তি জল না ছেড়ে দিলে বাঁধ রক্ষা পায় না, অথচ কৃষকের তখন ঐ জলের প্রয়োজন নেই। সেই জল যদি পুষ্করিণী ইত্যাদিতে সংরক্ষিত করা যেতো, তাহলে প্রয়োজনের সময়ে ব্যবহার করা সম্ভব হতো। অন্য দিকে বাঁধের জল প্রত্যাহার করবার অব্যবহিত পূর্বে যথেষ্ট জল অপ্রয়োজনীয়ভাবে নষ্ট হয়, সেই জলও সঞ্চিত রাখবার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়। কোথাও কোথাও পাম্পের বন্দোবস্ত থাকলে জলের অপচয় লাঘব করা যায়।

বর্তমান কৃষিঋণ ব্যবস্থায় ধনী কৃষকই উপকৃত হচ্ছে, অথচ যার ঋণের প্রয়োজন সর্বাধিক সেই থাকলো বঞ্চিত হয়ে। শুধু তাই নয়, তারা অন্যত্র অধিক সুদে ঋণ করতে বাধ্য হয় এবং ক্রমশঃ জমি তুলে দেয় ধনী কৃষকদের হাতে অথবা ফসল তুলে দেয় জোতদার এবং মজুতদারের হাতে, যার জন্যে ফসল জমা হচ্ছে তাদের ঘরে। এই প্রথায় ক্রমশঃ কৃষি-মজুরের অবস্থার সামগ্রিক অবনতি ঘটছে। এই দুরবস্থার অবসান ঘটাতে হলে মূলগত ভূমিসংস্কার প্রয়োজন। অন্যথায় খাদ্যোৎপাদনের কোনরূপ ব্যাপক ব্যবস্থাই কার্যকরী হতে পারবে না।

শাক-সব্জী, ফল মূল ও হাঁস-মুরগী পালন খাদ্য-ব্যবস্থার যে কোন সামগ্রিক পরিকল্পনার অনিবার্য অংশ। এই সব ব্যবস্থা সাধারণতঃ খুব বেশী ব্যয়বহুল নয় এবং প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি

জানাও খুব শ্রমসাধ্য নয়। দুগ্ধ উৎপাদন আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বর্তমানে আমাদের বহু অপ্রয়োজনীয় গবাদি পশু রয়েছে। সেগুলি দরিদ্র কৃষকের পক্ষে নিরতিশয় ভারবহ হয়ে পড়ছে। দুঃখের বিষয় যে, ধর্মীয় বাধা সৃষ্টির দ্বারা এই ভার লাঘবের পথ দুরতিক্রম্য করে তোলা হয়েছে। গোড়ায়ই গলদ রয়েছে, সুতরাং এখন কঠিন হস্তে এর প্রতিকার না করলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

উদ্ভিদ-হর্মোন—অক্সিন

প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়

সাধারণভাবে প্রাণীজ হর্মোন আমাদের কাছে যতটা পরিচিত, উদ্ভিদের হর্মোন ততটা নয়। আসলে উদ্ভিদ-হর্মোনের উপর বিস্তৃত গবেষণার ইতিহাস বেশী দিনের নয়, বোধ হয় মাত্র অর্ধশতাব্দীর। বিগত ৪০-৫০ বছরে উদ্ভিদের হর্মোন সম্বন্ধে গবেষণা হয়েছে প্রচুর—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারে। এর ফলে হাতে এসেছে গবেষণালব্ধ অসীম ক্ষমতা, যার সার্থক প্রয়োগে স্বাধীন ভারতে একটি স্বয়ংনির্ভর বলিষ্ঠ কৃষি-ব্যবস্থা গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইতিহাস—উদ্ভিদ-জীবনের বিচিত্রমুখী প্রকাশ যে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে উদ্ভিদেরই কোষে প্রবাহিত কিছু রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা—এই কথা প্রাচীন ভারতীয়দের অজানা ছিল না। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারুইনের লেখা 'The Power of Movements in plants' বইটিতে বর্ণিত ছোট-খাটো পরীক্ষাগুলি উদ্ভিদদেহে এই ধরণের রাসায়নিক উত্তেজক পদার্থের উপস্থিতির কথাই নির্দেশ করে।

জার্মান বিজ্ঞানী জুলিয়াস ম্যাক্সও (১৮৮০, '৮২) উদ্ভিদদেহে হর্মোনের উপস্থিতির বিষয় অবহিত ছিলেন বলেই জানা যায়। অবশ্য এই জাতীয় রাসায়নিক পদার্থের হর্মোন নামকরণ করেন সর্বপ্রথম ফিটিং (১৯০৯)।

উদ্ভিদের হর্মোন—উদ্ভিদের কোষে সচরাচর নানা প্রকারের হর্মোন উৎপন্ন হয়ে থাকে; যথা—জিবারেলিন (Gibberellins), কাইনেটিন (Kinetin), ডরমিন (Dormin), অ্যানথেসিন (Anthesin)*, অক্সিন (Auxins) ইত্যাদি।

উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন হর্মোনের মধ্যে অক্সিন একটি বহু আলোচিত নাম। সাধারণভাবে অক্সিন বলতে বোঝায় উদ্ভিদকোষের সেই জাতীয় রাসায়নিক জৈব পদার্থকে, যার অত্যন্ত লঘু দ্রবণ অতি সামান্য পরিমাণে[১] উদ্ভিদ-অঙ্গের বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করে এবং উদ্ভিদের অনেক শারীরবৃত্তিক কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত করে।

অক্সিন তৈরির কেন্দ্র—উদ্ভিদদেহে অক্সিন তৈরির প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলি হলো—কচি পাতা, মুকুল, ফুল, পুষ্পমঞ্জরী এবং পুষ্পবৃন্তিকা ভ্যান ওভারবিক এবং বনার (১৯৩৮) বলেন

* কোন কোন সোভিয়েট বিজ্ঞানী উদ্ভিদ-কোষে অ্যানথেসিনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

১। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—আনারস গাছের কাণ্ডের শীর্ষভাগ থেকে (প্রতি কিলোগ্র্যামে) অক্সিন নিষ্কাশিত করলে পাওয়া যাবে মাত্র ০.০০৬ মিলিগ্র্যাম।

যে, উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগের তন্তুতেও নাকি অল্প পরিমাণে অক্সিন উৎপন্ন হয়ে থাকে।

উদ্ভিদকোষে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন অক্সিনের অন্যতম—ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole acetic acid or IAA) তৈরি হয়ে থাকে অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপ্টোফেন (Tryptophane) থেকে। ট্রিপ্টোফেন থেকে প্রথমে হয় ইন্ডোলঅ্যাসিট্যালডিহাইড (Indoleacetaldehyde); পরে এথেকেই তৈরি হয় ইনডোল-অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই রূপান্তরের মধ্যবর্তী বিক্রিয়াগুলিকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এনজাইম, তাপমাত্রা এবং জিঙ্ক বা দস্তা।

জার্মেনী থেকে Eike Libbert জানিয়েছেন যে, মটর গাছের কাণ্ড থেকে ৫৮টি বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা ট্রিপ্টোফেনকে ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করতে সক্ষম।

বিভিন্ন ধরণের অক্সিন—১৯৩৪ সালে ক্যোল et al জৈব উৎস থেকে অক্সিনধর্মী তিনটি রাসায়নিক পদার্থ বিশুদ্ধ স্ফটিকাকারে নিষ্কাশিত করেন। এগুলি হলো—অক্সিন-এ (Auxin. a : C_{18} H_{32} O_5), অক্সিন-বি (Auxin b : $C_{18}H_{30}O_4$) এবং হেটারো-অক্সিন (Heteroauxin : ($C_{10}H_9O_2N$)। এদের রাসায়নিক নাম হলো যথাক্রমে—অক্সেনট্রিয়োলিক অ্যাসিড (Auxentriolic acid), অক্সেনোলোনিক অ্যাসিড (Auxenolonic acid) এবং ইনডোল ৩-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (Indole 3-acetic acid)। উদ্ভিদদেহে স্বাভবিকভাবে উৎপন্ন অক্সিনের মধ্যে ইনডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA) প্রধান।

উদ্ভিদদেহে অক্সিনের প্রবাহ—অন্যান্য হর্মোনের মত অক্সিনও উৎপত্তিস্থল থেকে কর্মস্থলে বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী পরিবাহিত হয়। অক্সিনের এই প্রবাহ সচরাচর উদ্ভিদের উপরিভাগ থেকে নিম্নভাগে হয়ে থাকে বলে ধারণা করেন ওয়েন্ট এবং হোয়াইট (১৯৩৯)। মাটিতে কিম্বা উদ্ভিদের গোড়ায় অক্সিন প্রয়োগ করলে তা শোষিত হয় এবং বায়ুমোচনের স্রোতে (Transpiration stream) অক্সিনের অণুগুলি উদ্ভিদের উপরিভাগে চালিত হয় (হিচ্‌কক্ এবং জিমার-ম্যান, ১৯৩৫, '৩৮; কেরী ১৯৪৫)। অক্সিনের এই বিশেষ প্রবাহের কোন কারণ জানা যায় নি। শুধুমাত্র দেখা গেছে, উদ্ভিদের কোষগুলিই এই প্রবাহের সময় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে জীবন্ত থাকে।

ক্লার্ক (১৯৩৮) বলেন যে, উদ্ভিদের তন্তুসমূহে বৈদ্যুতিক বিভবের (Electrical potential) বৈষম্যই এর কারণ। এই তথ্যের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় নি।

উদ্ভিদ জীবনে অক্সিনের প্রভাব—উদ্ভিদদেহে অক্সিনের প্রভাব পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয় যই গাছে (Avena sativa, Linn. ইং—Oat plant. বাং—যই)। ঘাস পরিবারের (Graminae) অন্যান্য সদস্যদের মতই যই গাছ যখন মাটি ফুঁড়ে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়, তরুণ ভ্রূণমুকুলের অগ্রভাগ (Stem tip) তখন প্রথম কচিপাতা এবং মুকুলাবরণী (Coleoptile) দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। ১৯২৫ সালে স্তোডিং দেখলেন, মুকুলাবরণী সমেত ভ্রূণমুকুলের শীর্ষভাগের কয়েক মিলিমিটার নীচের অংশটি কেটে অপসারিত করলে গাছটির বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাহত হয়। তিনি আরও লক্ষ্য করলেন যে, কর্তিত অংশটি (সেই গাছের বা অন্য কোন যই গাছের) যদি আবার যথাস্থানে প্রতিস্থাপিত করা যায়, তাহলে গাছটি আবার স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে। এথেকে তিনি ধারণা করেন—নিশ্চয়ই কোন উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ ভ্রূণমুকুলটির শীর্ষদেশ থেকে নিঃসৃত হয়ে মুকুলাবরণীর মাধ্যমে শিশু-উদ্ভিদটির নিম্নাংশে প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে।

ওয়েন্ট ও (১৯২৮,-'৩৫) অনুরূপ একটি পরীক্ষা করেন। যই গাছের মুকুলাবরণী সমেত কর্তিত অগ্রভাগটি নিয়ে তিনি ৩% অ্যাগারের চৌকা একটি পাত্‌লা ব্লকের উপর রাখলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে অ্যাগারের সেই ব্লকটি শুধু যই গাছটির কর্তিতাংশে প্রতিস্থাপিত করে দেখলেন, গাছটির বৃদ্ধি আগের মতই হতে লাগলো। কিন্তু ঐ অংশে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ অ্যাগারের ব্লক চাপিয়ে কোন ফল পাওয়া গেল না। এই পরীক্ষা করে ওয়েন্ট সিদ্ধান্ত করলেন যে, যই গাছের কর্তিত অগ্রভাগ থেকে নিশ্চয়ই সেই উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থটি অ্যাগারের ব্লকে এসে জমেছিল, যার জন্যে অ্যাগারের ব্লকটি কর্তিত অংশে প্রতিস্থাপিত করায় ভ্রূণমুকুলটির বৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে সহায়তা করা ছাড়াও অক্সিন উদ্ভিদের কার্বোহাইড্রেট বিপাকে সহায়তা করে থাকে। উদ্ভিদের পাতায় এবং কাণ্ডে অক্সিন প্রয়োগ করে মিচেল এবং হোয়াইটহেড (১৯৪০) দেখিয়েছেন যে, অক্সিন উদ্ভিদকোষে শ্বেতসারের (Starch) আর্দ্রবিশ্লেষণে (Hydrolysis) সহায়তা করে। থাইম্যান (১৯৪১) মনে করেন, উদ্ভিদের শ্বাসকার্যও অনেকাংশে অক্সিন কর্তৃক প্রভাবিত হয়। অক্সিন কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং কোষ-প্রাচীরের গায়ে সেলুলোজ অণুর অতিরিক্ত আস্তরণ ফেলে।

অক্সিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড—জীবনের বহুমুখী বিচিত্র প্রকাশকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে কোষস্থ দুই ধরণের নিউক্লিক অ্যাসিড। এরা হলো—ডি. এন. এ. (DNA : Deoxyribonucleic acid) ও আর. এন. এ. (RNA : Ribonucleic acid)।

আমরা জানি, জীবনের সঙ্গে প্রোটিনের সম্বন্ধ নিবিড়। উদ্ভিদকোষের ডি. এন. এ. তিন রকমের আর. এন. এ'র সহায়তায় প্রোটিন সংশ্লেষণ করে থাকে। এস. পি. সেন মটর গাছের কাণ্ডে ইণ্ডোল-অক্সিন প্রয়োগ করে আর. এন. এ. অণুর দ্রুত সংশ্লেষণ লক্ষ্য করেছেন; আর নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ নিঃসন্দেহে উদ্ভিদের বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত।

অক্সিন কিভাবে কাজ করে—অক্সিন উদ্ভিদ-কোষের বিভিন্ন এনজাইমের প্রোটিন অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রিয়া করে থাকে। স্কুগ et al (১৯৪২) বলেন যে, অক্সিন অণুর গঠন সম্ভবতঃ এনজাইমের প্রোটিন অণুর সঙ্গে যুক্ত হবার পক্ষে অনুকূল।

উদ্ভিদের অন্যান্য হর্মোনের সঙ্গে অক্সিনের সম্পর্ক—এস. এন. মাথুর দেখেছেন যে, মটর গাছের মুকুলের (অন্ধকারে বর্ধিত) বৃদ্ধিকে অক্সিন বাধা দিয়ে থাকে (Growth of the bud of etiolated Pisum seedlings) আর কাইনেটিন (Kinetin) সেই বাধা অপসারিত করতে সক্ষম; অর্থাৎ উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে অক্সিন ও কাইনেটিনের যোগসাজস থাকা অসম্ভব নয়। দেখা গেছে, জিবারেলিন (Gibberellic acid or G. A.) অক্সিনের ক্রিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আরও দেখা গেছে, কতকগুলি ভিটামিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিন ভাল কাজ দিয়ে থাকে।

আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থায় অক্সিনের ভূমিকা—অক্সিনধর্মী কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ সম্প্রতি কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এই সব যৌগিক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য দেখা গেলেও আণবিক গঠনের দিক থেকে তারা বহুলাংশে অভিন্ন। আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থায় নানাভাবে অক্সিনকে কাজে লাগিয়ে সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

অক্সিন—২, ৪—ডাইক্লোরোফেনক্সি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2,4-Dichlorophenoxyacetic acid or 2, 4-D) কিম্বা আইসোপ্রোপাইলফিনাইল-কার্বামেট (Isopropylphenylcarbamate)-এর

০·১% দ্রবণ কৃষিক্ষেত্রে ছড়িয়ে ঘাস ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত আগাছা সহজেই নির্মূল করা সম্ভব। টাফাজিন (Tafazine) দিয়েও আগাছা মারা যাচ্ছে। মেনডক (Mendok: 2, 3-Dichloroisobutyrate) এবং ডালাপন (Dalapon: Sodium 2, 2—Dichloropropionate) এই ব্যাপারে সুফল দিতে পারে বলে মনে করেন—এইচ. ওয়াই. মোহনরাম এবং পি. এন. রুস্তাগী।

উদ্ভিদের কাটিংয়ের (Cuttings) সাহায্যে বংশবৃদ্ধি করানো একটি সুপ্রাচীন পদ্ধতি। কাটিংয়ে যত তাড়াতাড়ি শিকড় গজাবে, মাটিতে তত তাড়াতাড়ি উদ্ভিদটি ধরে যাবে। ন্যাপথালিন অ্যাসিটামাইড (Napthaleneacetamide), ইণ্ডোলবিউটারিক অ্যাসিড (Indolebutyric acid) প্রভৃতি অক্সিন কাটিংয়ে যথাস্থানে প্রয়োগ করে সত্বর শিকড় গজানো সম্ভব।

আলফা-ন্যাপথালিন অ্যাসিড (α-Napthaleneacetic acid), ২. ৪-ডাইক্লোরোফেনক্সি-অ্যাসেটিক অ্যাসিড (2, 4-D) প্রভৃতি অক্সিন আনারস গাছে প্রয়োজনানুযায়ী প্রয়োগ করে গাছটিকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পুষ্পিত করা সম্ভব হয়েছে। লিয়োপোল্ড এবং থাইম্যান (১৯৪৯) পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, আলফা-ন্যাপথালিনঅ্যাসেটিক অ্যাসিডের লঘু দ্রবণ যেমন বার্লি গাছে সত্বর ফুল ফোটায়, বেশী ঘন দ্রবণ প্রয়োগ করলে তেমনি উল্টো ফল হবারই সম্ভাবনা।

কলা, আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি ফল দ্রুত পাকাবার জন্যেও 2, 4-D জাতীয় কয়েকটি অক্সিন খুব ভাল কাজ দেয়। আলু সঞ্চয় করে রাখবার সময় যাতে মুকুলিত না হয়, অক্সিন-ন্যাপথালিনঅ্যাসেটিক অ্যাসিডের মিথাইল এষ্টার প্রয়োগ করে সে ব্যবস্থা অনায়াসে করা যায়।

পাকা ফল পাড়বার আগেই গাছ থেকে মাটিতে পড়ে থেঁৎলে গিয়ে যাতে নষ্ট না হয়—সে ব্যবস্থাও অক্সিন দিয়ে করা যায়। গার্ডনার (১৯৪০) বলেন, ন্যাপথালিন-অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন অ্যাসিটামাইড পাকা ফল পাড়বার সপ্তাহখানেক আগে গাছের আপেলগুলির উপর ছিটিয়ে দিলে আপনা থেকেই ফল আর মাটিতে পড়ে নষ্ট হবে না।

পরাগসংযোগ না হলেও 2, 4-D জাতীয় অক্সিন প্রয়োগ করে টোম্যাটোর ফুল থেকে ফল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। গাসটাপসন (১৯৩৬) দেখিয়েছেন— ইনডোলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইনডোলপ্রোপ্রায়োনিক অ্যাসিড (Indoleproprionic acid) প্রভৃতি অক্সিন লাউ, টোম্যাটো, ষ্ট্রবেরী প্রভৃতির অনিষিক্ত ফুলের গর্ভমুণ্ডে প্রয়োগ করে অপুংজনিত ফল (Parthenocarpic fruits) উৎপাদন করা সম্ভব।

আবার প্রতিটি গাছ থেকে তুলা আহরণের কষ্ট স্বীকার না করে, তুলা তোলবার সময় হলে ক্ষেতে তুলা গাছের উপর অক্সিন ছড়িয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে—তুলা সব আপনা থেকেই ঝরে পড়বে।

কটকে Central Rice Research Institute-এ কে. এস. মূর্তি এবং নরসিং রাও পরীক্ষা করে দেখেছেন, ইনডোলঅ্যাসেটিক অ্যাসিড বা ন্যাপথালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (NAA) লঘু দ্রবণ (I ppm.) ধান গাছের উপর ছড়িয়ে ধানের উৎপাদন শতকরা ১০ থেকে ২৫ ভাগ বাড়ানো সম্ভব। পাট গাছের উপর IAA, NAA এবং ইনডোলবিউটারিক অ্যাসিড (IBA) প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, এই সব হর্মোন ক্যাম্বিয়ামের (Cambium) উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। পাটের উৎপাদনও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে—এমন কি, পাটের আঁশের গুণাগুণও কিছু কিছু প্রভাবিত হয়েছে। তবে নাইট্রোজেন-

সমৃদ্ধ সারের সঙ্গে এই জাতীয় হর্মোন প্রয়োগ করে আরও বেশী সুফল পাওয়া গেছে।

আসামের Tocklai Experimental Station-এ ডি. এন. বড়ুয়া চা গাছের কাটিং-এ ইনডোল-৩-বিউটারিক অ্যাসিড (20-100 ppm.) প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, এর দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিকড় গজানো সম্ভব। আম, পেয়ারা, তুঁত (Mulberry) গাছের কাটিংয়ে এভাবে অক্সিন প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এস. এম. সরকারের গবেষণাগারে কচুরীপানা (Water Hyacinth)[২] থেকে হর্মোন (যার মধ্যে অক্সিনও রয়েছে) নিষ্কাশিত করা গেছে এবং ধান ও পাট গাছের গঠন ও বিপাকীয় তন্ত্রের (Metabolic system) উপর তার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এন. দাস এবং কে. এস. সিং লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের উপর ন্যাপথালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) প্রয়োগ করে (40-60 ppm.) বীজহীন ফল তৈরির ব্যাপারে কৃতকার্য হয়েছেন।

উদ্ভিদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও অক্সিনের ব্যবহার ফলপ্রদ হয়েছে। ভাইরাস ঘটিত রোগের প্রাবল্য (যেমন—তামাক গাছের Tobacco Mossaic Virus বা TMV-র কথাই ধরা যাক) 2, 4-D জাতীয় অক্সিন প্রয়োগ করে কিছুটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

এ তো গেল অক্সিনের সামান্য কয়েকটি কাজের কথা। এছাড়া অক্সিন যে আরও কতভাবে কৃষিকার্যে মানুষের কাজে লাগছে, তা বলে শেষ করা যায় না। অক্সিনের অসাধারণ ক্ষমতাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে হলে এখন প্রধানতঃ দুটি বিষয়ে আমাদের গবেষণা চালাতে হবে—এক—অক্সিন সম্বন্ধে যে সব তথ্য এখনও অজানা, সেগুলিকে জানতে হবে। দুই—এরই সঙ্গে সঙ্গে উপায় উদ্ভাবন করবার চেষ্টা করতে হবে, কি ভাবে কম খরচে অক্সিনের বহুল ব্যবহার করা যেতে পারে।

[বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে উদ্ভিদ-হর্মোনের উপর যে আন্তর্জাতিক আলোচনা-চক্র সম্প্রতি (২৩-২৮শে জানুয়ারী '৬৭) কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তাথেকে এই প্রবন্ধের অনেক উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, এজন্যে লেখক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস. এম. সরকার মহাশয়ের উৎসাহ ও সাহায্যের জন্যে লেখক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।]

২। Eichhornia crassipes Mort, Solms.

স্কিজোফ্রেনিয়া ও বংশানুক্রম

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেরই ধারণা যে, সর্বপ্রকার মানসিক রোগ পরিবেশের প্রভাবেই সৃষ্ট হয়। রোগের আবির্ভাবের মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব তাঁরা আদৌ স্বীকার করেন না। তথ্যকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তাঁদের এই ধারণা সহজে মেনে নেওয়া যায় না। Huntingtor's Chorea নামে এক প্রকার মারাত্মক মানসিক রোগ আছে, যা অবিসংবাদিতভাবে বংশগত রোগ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। আবার ক্রোমোসোম ও বিপাক-বিশৃঙ্খলার ফলে সন্তান-সন্ততির মধ্যে যে মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা যায়, তাও বংশগত রোগ বলে স্বীকৃত হয়েছে। মানসিক রোগের চিকিৎসকেরা এই সব রোগের চিকিৎসা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকেন।

বংশানুক্রম ও পরিবেশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মানুষের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য। কোন বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ বংশগত বা সম্পূর্ণ পরিবেশের অধীন বলে স্বীকার করা যায় না, বরং উভয়ের যুগ্ম প্রভাব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের গায়ের রং বংশানুক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও পরিবেশের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পুরীতে গিয়ে কিছুদিন থাকলে, গায়ের রং কালো হয়ে যায়, আবার কলকাতায় ফিরে এলে ফর্সা হয়ে ওঠে। গায়ের রঙের ন্যায় মানুষের দৈহিক উচ্চতাও বংশানুক্রম ও পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। মানুষের মানসিক কার্যকলাপও সেই রকম।

বর্তমান প্রসঙ্গে স্কিজোফ্রেনিয়া নামক মানসিক রোগের উৎপত্তিতে বংশানুক্রমের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে এই রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায় এক শতাংশ। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগকে 'বিভক্তমনা' বা 'বিভক্ত ব্যক্তিত্ব' হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়। মধ্যবয়স্কদের অপেক্ষা অল্পবয়স্ক যুবক-যুবতীদের মধ্যে এই রোগের হার বেশী। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বিভিন্ন ধরণের লক্ষণ দেখা যায়। হাবার মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকা, বাস্তব জ্ঞানবর্জিত অবস্থায় থাকা প্রভৃতি সাধারণ স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর বৈশিষ্ট্য। অনেক সময় রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে কোন এক বিশেষ অবস্থায় নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকতে বা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যদি কেউ তার সেই অবস্থা পরিবর্তন করবার চেষ্টা করে, তবে সে রেগে ওঠে এবং বাধা দেয়। কিন্তু যেই তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তৎক্ষণাৎ সে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে বা দাঁড়িয়ে থাকে—এমন কি, কখন কখন সকলের সামনে নগ্ন অবস্থায় থাকতেও সঙ্কোচ বোধ করে না। তাদের কথায় ও কার্যে অস্বাভাবিক অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। যদি রোগীকে কোন দুঃসংবাদ দেওয়া যায়, তবে সে তখন ফিক্‌ফিক করে হেসে ওঠে। আবার এক শ্রেণীর স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী আছে, যারা সব সময় অহেতুক ভয় ও সন্দেহের মধ্যে বাস করে। এই রকমের রোগী ভাবে—তাকে মেরে ফেলবার জন্যে তার ভাতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বা তার পিছনে গুণ্ডা লাগানো হয়েছে—ইত্যাদি। লক্ষণের শ্রেণীবিভাগ করে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগকে সাধারণতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়। মাঝে মাঝে বিভিন্ন শ্রেণীর লক্ষণ একই রোগীর মধ্যে বিভিন্ন

সময়ে প্রকাশ পায়; ফলে মানসিক রোগের চিকিৎসকের পক্ষে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর শ্রেণী-বিভাগ করা সময়বিশেষে কঠিন হয়ে পড়ে।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন বিপাক বিশৃঙ্খলার ফলে, কেউ বলেন মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয়ের ফলে এই রোগের উৎপত্তি হয়ে থাকে। আবার কেউ পরিবেশকে এবং কেউ বংশানুক্রমকে দায়ী করেন। যে কোন শারীরিক ব্যাধির ন্যায় স্কিজোফ্রেনিয়া মানসিক রোগ এত সাধারণ যে, অনেকে এই রোগকে বংশগত বলে স্বীকার করতে চান না। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব পূর্ণভাবে না থাকলেও আংশিকভাবে যে আছে, যমজ সন্তান পরীক্ষার সাহায্যে তার পরিচয় পাওয়া গেছে।

যমজ সন্তান দুই প্রকার—এককোষী যমজ (Monozygotic twin) ও দ্বিকোষী যমজ (Dizygotic twin)। কোষ-বিভাজনের প্রাক্কালে নিষিক্ত ডিম্ব (Fertilized ovum) দুভাগে বিভক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ক্রমান্বয়ে কোষ-বিভাজনে দুটি সন্তানে পরিণত হয়। এই দুটি সন্তানকে এককোষী যমজ বলে। দুটিই তারা ছেলে, অথবা মেয়ে হয়ে থাকে। একই নিষিক্ত ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয় বলে তারা একই উপাদানে তৈরি। অপর পক্ষে দ্বিকোষী যমজ সন্তান পৃথক দুটি নিষিক্ত ডিম্ব থেকে উৎপন্ন হয় বলে তাদের বংশানুক্রম সম্পূর্ণ আলাদা। তারা দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ে অথবা একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে একই সঙ্গে জন্ম-গ্রহণ করলে নিসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, তারা দ্বিকোষী যমজ সন্তান। সাধারণ ভাষায় এককোষী ও দ্বিকোষী যমজকে যথাক্রমে সদৃশ যমজ (Identical twin) ও অসদৃশ যমজ (Non-identical twin) বলা হয়। সদৃশ যমজ সন্তান-দ্বয়ের মধ্যে রক্তশ্রেণী, আঙুলের ছাপ, গায়ের রং, চোখের মণির রং প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের যেমন আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়, অসদৃশ যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে তেমন মিল দেখা যায় না।

বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত সদৃশ যমজ ও একই পরিবেশে প্রতিপালিত অসদৃশ যমজের সাহায্যে প্রজনন-বিজ্ঞানীরা কোন বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করে থাকেন। বিভিন্ন পরিবেশে সদৃশ যমজ সন্তানদ্বয়ের কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা গেলে তা পরিবেশের পার্থক্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার একই পরিবেশে অসদৃশ যমজ সন্তানদ্বয়ের কোন বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যকে দুটি ভিন্ন বংশানুক্রমের পার্থক্য বলে গ্রহণ করা হয়।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী ও জাপানের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, একই পরিবেশে প্রতিপালিত দুজন সদৃশ যমজ সন্তানের স্কিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ৮০%, কিন্তু অসদৃশ যমজের ক্ষেত্রে মাত্র ১৩%। স্কিজোফ্রেনিয়ার কারণ হিসেবে যদি একমাত্র পরিবেশকে দায়ী করা হয়, তাহলে একই পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে শতকরা সাতাশীটি অসদৃশ যমজ সন্তানের মধ্যে একজন রোগাক্রান্ত ও অপর জন নীরোগ হয় কেন? আবার বংশানুক্রমের প্রভাবকে যদি পুরাপুরিভাবে স্বীকার করা হয়, তাহলে শতকরা কুড়িটি সদৃশ যমজ সন্তানের মধ্যে একজনের রোগের লক্ষণ দেখা যায় এবং অপর জনের মধ্যে দেখা যায় না কেন? তুলনামূলক-ভাবে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, স্কিজোফ্রেনিয়া উৎপত্তির মূলে বংশানুক্রমের প্রভাব যত বেশী, পরিবেশের প্রভাব তত নয়।

একজন প্রজনন-বিজ্ঞানী শুধুমাত্র সদৃশ যমজ সন্তানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, যে ক্ষেত্রে সদৃশ যমজের দুজন স্কিজোফ্রেনিয়া মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে, তাদের পরিবারের আত্মীয়-

স্বজনদের মধ্যে বেশী সংখ্যক রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দেখা যায়, কিন্তু যে ক্ষেত্রে মাত্র একজন রোগাক্রান্ত ও অপর জন নীরোগ হয়ে থাকে, তাদের পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগী কম দেখা যায়। এই তথ্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্কিজোফ্রেনিয়ার উৎপত্তিতে বংশানুক্রমের বিশেষ প্রভাব আছে।

কালমান (Kallmann) নামে আর একজন প্রজনন-বিজ্ঞানী একই পরিবেশে ও ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত সদৃশ যমজ সন্তানদের দুই দলে ভাগ করে দেখেছেন যে, দুজন যমজ সন্তান রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রথম ক্ষেত্রে ৮৬% এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ৭৮%। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সদৃশ যমজ সন্তানদের দুজন একই বা ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত হলেও দুটি সম্ভাবনার হারের পার্থক্য খুব বেশী নয়।

প্রজনন-বিজ্ঞানীদের গবেষণা শুধুমাত্র যমজ সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা বিভিন্ন পরিবার বিশ্লেষণ করে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। আগেই বলা হয়েছে যে, জনসাধারণের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব শতকরা প্রায় একজনের মধ্যে দেখা যায়। স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যত বেশী রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, সুস্থ ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অত দেখা যায় না এবং তার হার শতকরা একজন অপেক্ষা অনেক বেশী। আমেরিকার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রোগগ্রস্ত ব্যক্তির ভাইবোন, পিতামাতা ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে স্কিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত হবার হার যথাক্রমে ১৪.২%, ১০.৩% ও ১৬.৪%।

প্রজনন-তাত্ত্বিক পরামর্শে (Genetic counseling) উপরিউক্ত তথ্য কাজে লাগানো হয়। পিতামাতার মধ্যে যে কোন একজন স্কিজোফ্রেনিয়া রোগগ্রস্ত হলে তাঁদের যে কোন সন্তান ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা এক ষষ্ঠাংশ এবং কালমানের হিসেব অনুযায়ী পিতামাতা উভয়েই রোগগ্রস্ত হলে তাদের অর্ধেক সন্তানসন্ততির রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের প্রকৃত উত্তরাধিকার সূত্র এখনও পরিষ্কারভাবে জানা যায় নি এবং জটিল বলেই অনেকের ধারণা। কালমানের অনুমান, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগ প্রচ্ছন্ন জিন-এর (Recessive gene) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যারা এই রোগের দুটি প্রচ্ছন্ন জিন বহন করে, তারা রোগগ্রস্ত হয়ে থাকে; কিন্তু যারা একটি জিন বহন করে, তাদের মধ্যে অল্পমাত্রায় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাঁর অনুমান কতদূর সত্য, তা বলা শক্ত। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে যে, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তিতে ক্রোমোসোম বিশৃঙ্খলার কারণও জড়িত আছে।

যাহোক যমজ সন্তান পরীক্ষা ও পরিবার সমীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, স্কিজোফ্রেনিয়া রোগের উৎপত্তির মূলে প্রতিকূল পরিবেশ ছাড়াও বংশানুক্রমের যে বিশেষ প্রভাব আছে, তা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না।

পরমাণু-কেন্দ্রীনের গঠন ও সম্ভাব্য চিত্র

শ্রীকল্যাণকুমার গোস্বামী

খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব থেকেই বস্তু এবং তার গঠন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল। ভারতীয় ঋষি কণাদ বলেছিলেন যে, প্রত্যেক পদার্থকেই ভাগ করে চললে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসবে, যখন আর তাকে কোন-মতেই ভাগ করা সম্ভব হবে না। গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাসেরও মত ছিল যে, সকল বস্তুই অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি এবং এই ক্ষুদ্র কণাকে আর ভেঙে ছোট করা সম্ভব নয়। ডিমোক্রিটাস মূল কণার নাম দেন অ্যাটম অর্থাৎ অবিভাজ্য। কিন্তু বিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিষ্টটল এই মতের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে, বস্তুর কোন ক্ষুদ্রতম কণা থাকতে পারে না। পদার্থের গঠন সম্বন্ধে নতুন করে ভাবনার সূত্রপাত হলো বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটনের আমল থেকে। নিউটন বললেন—প্রত্যেক বস্তুই এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র নিরেট ও শক্ত মৌলিক কণার দ্বারা গঠিত। পরমাণু-বিজ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন জন ডালটন ১৮১০ সালে। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক মৌলিক পদার্থ কতকগুলি পরমাণু বা অবিভাজ্য মৌলিক কণার '। একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির ওজন ও ধর্ম এক এবং পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুই ৯২ প্রকার মৌলিক পদার্থের দ্বারা গঠিত; কারণ পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ আছে। ডালটনের পরমাণু-বাদকে কিছুটা পরিবর্তন করে মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ হিসাবে অণুর কল্পনা করা হয়েছে। বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ—যার মধ্যে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম বর্তমান, তাকে বলা হয় সেই বস্তুর অণু। এই অণুকেও আবার ভাঙলে পাওয়া যায় পরমাণু এবং একটি অণু একাধিক পরমাণুর সংযোগে গঠিত হতে পারে। পরমাণুর দুটি অংশ—অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ। আমরা পরমাণুর অন্তর্ভাগ অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রীনের গঠনাকৃতি ও চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

১৮৬০ সালেও বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন তাঁর এক ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে বলে-ছিলেন যে, অ্যাটম ভাঙা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু এই ধারণার অবসান হলো ১৮৯৭ সালে, যখন সার জে. জে. টমসন ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। টমসনের আবিষ্কার থেকে জানা গেল যে, সকল বস্তুতেই ইলেকট্রন আছে, অর্থাৎ ইলেকট্রন সকল বস্তুর পরমাণুর উপাদান। এর ওজন একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় ১৮৩৬ ভাগের একভাগ মাত্র এবং এই কণাটি ঋণাত্মক তড়িতাধানে আহিত। একটি সম্পূর্ণ পরমাণু তড়িৎ-শূন্য। কাজেই পরমাণুর মধ্যে নিশ্চয়ই আর কোন কণা আছে, যা ধনাত্মক তড়িতাধানে আহিত। টমসন এই কণার নাম দেন প্রোটন। কিন্তু পদার্থের পরমাণুতে কয়টি ইলেকট্রন, কয়টি প্রোটন আছে এবং পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনগুলি কিভাবে সজ্জিত আছে, সে প্রশ্নই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুললো। টমসন বললেন যে, ইলেকট্রন এবং প্রোটনগুলি পর পর এক-একটা খোসায় (Shell) সাজানো আছে, ঠিক যেন পেঁয়াজের খোসার মত। কিন্তু রাদারফোর্ড বিভিন্ন ধাতব পাতের মধ্য দিয়ে আলফা কণাকে (একটি আলফা কণা প্রোটনের

চার গুণ ভারী এবং দুই একক ধনাত্মক তড়িতাধানে আহিত) চালাবার পরীক্ষায় দেখলেন যে, কণাগুলি ধাতব পাতের চারদিকে ছিটকে পড়ছে। ধাতুর পরমাণুর মধ্যেকার প্রোটন যদি ছাড়াছাড়িভাবে থাকে, তবে তো তার পক্ষে ভারী আলফা কণাকে ধাক্কা দেওয়া সম্ভব নয়! হলো যে, পরমাণুর কেন্দ্রীন নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত এবং নিউট্রনের ভর প্রোটনের চেয়ে সামান্য কিছু বেশী। ইলেকট্রন, পজিট্রন ও নিউট্রিনো প্রভৃতি কণা কেন্দ্রীনের ভিতর থাকতে পারে না। পরমাণুর কেন্দ্রীন ভাঙ্গবার ফলেই তাথেকে ইলেকট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো ইত্যাদি কণাগুলি বেরুতে থাকে—ঠিক যেমন বন্দুকের গুলি ছুঁড়লে তাথেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরোয়।
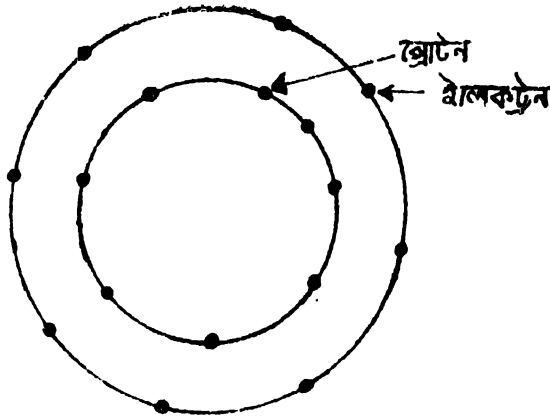
১নং চিত্র
টমসন-কল্পিত পরমাণুর চিত্র
প্রোটন ও ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় ঘুরছে।

রাদারফোর্ড সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রোটনগুলি পরমাণুর কেন্দ্রে একটা পিণ্ডের মত হয়ে রয়েছে। ইলেকট্রনগুলি এই কেন্দ্রীনের চারদিকে ঘুরছে—ঠিক যেন সূর্যের চারদিকে গ্রহগুলি পাক খাচ্ছে। পরমাণুর গঠনের এই চিত্র অবলম্বন করে অধ্যাপক বোর হাইড্রোজেন বর্ণালীর বিশেষত্ব মোটামুটি-ভাবে ব্যাখ্যা করে দিলেন এবং তখন থেকেই পরমাণুর গঠনের এই চিত্র সঠিক বলে ধরা হয়েছে।

রাদারফোর্ড আরও বললেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রীন ইলেকট্রন ও প্রোটন দিয়ে গঠিত; কিন্তু কতকগুলি পরীক্ষার ফলাফল রাদারফোর্ডের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিল। ঠিক এই সময়ে আবিষ্কৃত হলো নিউট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো প্রভৃতি মৌলিক কণা। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত

বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা দেখা যায় যে, পরমাণুর কেন্দ্রীনের মধ্যেকার আধান কেন্দ্রীনের সমস্ত আয়তনের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে নেই। প্রত্যেক কেন্দ্রীনের মধ্যে ফলের শাঁসের মত একটা অংশ থাকে, যার মধ্যে আধানের ঘনত্ব সমান, কিন্তু বাইরের খোসার মত অংশে আধানের ঘনত্ব ক্রমশঃ কমতে থাকে। সব রকমের কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রেই এই খোসার মত অংশটি প্রায় ২.৪×১০^{-১৩} সে. মি. চওড়া। সুবিধার জন্যে $১০^{-১৩}$ সে. মি.-কে ধরা হয় এক ফের্মি। দেখা গেছে যে, পরমাণুর কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধ কেন্দ্রীনের ভর-সংখ্যা অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যার সমষ্টির ঘনমূলের সংখ্যা যত, প্রায় তত ফের্মি।

হাল্কা কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রে ভিতরকার শাঁসের মত অংশটি প্রায় থাকে না বললেই চলে এবং সে ক্ষেত্রে খোসার মত অংশটির বেধই হলো কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধ। ভর-সংখ্যা যত বাড়তে থাকে, কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধও তত বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীনের ঘনত্বের কথা শুনলেও একেবারে অবাক হয়ে যেতে হয় বিভিন্ন পরমাণু থেকে ইলেকট্রনগুলি বাদ দিয়ে যদি ১ ঘনসেণ্টিমিটার কেন্দ্রীন এক জায়গায় করা যায়, তবে তার ওজন হবে প্রায় ২৪০০ লক্ষ টন।

প্রত্যেক কেন্দ্রীন নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরি। বিজ্ঞানীরা তাই পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কেন্দ্রীনের মধ্যেকার নিউট্রন ও প্রোটনের ভরের যোগফল বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে পাওয়া কেন্দ্রীনের ভরের সঙ্গে সমান হয় কিনা। যেমন একটি আলফা কণার দুটি নিউট্রনের ভর ২×১·০০৭৬০ পারমাণবিক ভর এবং দুটি প্রোটনের ভর ২×১·০০৮৯৯ পারমাণবিক ভর। কাজেই সে দিক থেকে আলফা কণার মোট ওজন হওয়া উচিত ৪·০৩৩১৮ পারমাণবিক ভর। কিন্তু পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে, এর ভর ৪·০০২৭৯ পারমাণবিক ভর মাত্র। বাকী ·০৩০৩৯ পারমাণবিক ভরটুকু কোথায় হারিয়ে গেল! এই হারিয়ে যাওয়া ভরকে বিজ্ঞানীরা খুঁজতে লাগলেন এবং অবশেষে এর সন্ধানও পেলেন। হারিয়ে যাওয়া ভরটুকু আইনষ্টাইনের $E=mc^2$ সূত্র অনুসারে শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে এবং এই শক্তিই আলফা কণার দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনকে বেঁধে রেখেছে, যাতে এরা সহজে পরস্পরের কাছ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে না যায়। ·০৩০৩৯ পারমাণবিক ভর সমান হচ্ছে প্রায় ২৮০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি। কাজেই প্রত্যেক কণার বন্ধন শক্তি হচ্ছে প্রায় ৭০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি। বিভিন্ন কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি প্রায় এক হলেও কিছু তফাৎ আছে। ৪নং চিত্রের লেখচিত্র থেকেই এটা বোঝা যাবে। চিত্র থেকে দেখা যায় যে, ৫৬ ভর সংখ্যাবিশিষ্ট লোহার কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রেই প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তি সবচেয়ে বেশী। ৫৬ ভর সংখ্যার নীচের কেন্দ্রীনগুলির ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তিও বেড়ে যায়। কিন্তু ৫৬-এর পরের কেন্দ্রীনগুলির

ইলেকট্রন
ইলেকট্রন
ইলেকট্রন
নিউক্লিয়াস
প্রোটন

২নং চিত্র

রাদারফোর্ড-কল্পিত পরমাণুর চিত্র

কেন্দ্রীনের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় ঘুরছে।

ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি কণার বন্ধন শক্তিও কমে যায়।

পরমাণুর কেন্দ্রীন কেন এত সুদৃঢ় থাকবে—বিজ্ঞানীদের কাছে এটি এক চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। কেন্দ্রীনে আছে আধান-নিরপেক্ষ নিউট্রন আর ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটন। তাদের মধ্যে আকর্ষণের জন্যে এই বাঁধন হতে পারে না। বরং সম-আধানে আহিত প্রোটন-গুলির মধ্যে বিকর্ষণ হবে এবং তার জন্যে প্রোটনগুলিরই কেন্দ্রীন থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার কথা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত—কেন্দ্রীনের বাঁধন খুব দৃঢ়। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এমন একটা শক্তির কল্পনা করলেন, যে শক্তি কেন্দ্রীনের মধ্যেকার কণাগুলিকে আটকে রেখেছে এবং এই শক্তির পরিমান সমদূরত্বের কুলম্ব-বিকর্ষণ বলের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু এই শক্তির প্রকৃতিই বা কি রকম? এটা কি মহাকর্ষ বল হতে পারে? না, তা হতে পারে না। কারণ নিউট্রন বা প্রোটনের মত ক্ষুদ্র ভরবিশিষ্ট বস্তুর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল নগণ্য। কোন বিজ্ঞানীই এসম্বন্ধে সঠিক কিছু বলতে পারছিলেন না। অবশেষে জাপানের বিজ্ঞানী ওকাওয়া এই শক্তির সন্ধান করতে গিয়ে একরকম নতুন কণার সন্ধান পেলেন। এই কণার নাম হলো মেসন। এর ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের ভরের মাঝামাঝি এবং আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের আধানের সমান, কিন্তু ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুই-ই হতে পারে। ওকাওয়া বললেন যে, এই মেসন কেন্দ্রীনের মধ্যেকার প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করছে, শক্তির আদান-প্রদান চলছে, সেই জন্যেই কেন্দ্রীন এত দৃঢ় রয়েছে। এই ঘটনাটাকে একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে কিছুটা বোঝানো যেতে পারে। দুটি লোক যখন টেনিস খেলছে, বলটা এক ব্যাট থেকে আর এক ব্যাটে খুব তাড়াতাড়ি যাতায়াত করছে। এই সময় ধরে নেওয়া যায় যে, ব্যাট দুটি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে বিনিময় বলের কোন উদাহরণ নেই। ব্যাট ও বলের উদাহরণটাও একেবারে ঠিক হলো না, কারণ বিনিময় বল কেবলমাত্র অতি নিকটে অবস্থিত দুটি বস্তুর মধ্যে থাকতে পারে। দূরত্ব যদি এক ফের্মি বা $১০^{-১৩}$ সেঃ মিঃ-এর কম হয়, তবে এই বিনিময় বা ক্ষুদ্র দূরত্বে আকর্ষণ বল হবে

৩নং চিত্র
শাঁস বা কোর-এর মত অংশে আধান-ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী এবং পরে ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

প্রচণ্ড এবং তা এই দূরত্বের কুলম্ব-বিকর্ষণ শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যদি দূরত্ব আড়াই ফের্মি বা তার কাছাকাছি হয়, তখন এই আকর্ষণ বল নগণ্য হয়ে পড়ে।

আমরা দেখলাম যে, পরমাণুর কেন্দ্রীন মোটামুটি নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে তৈরি। কিন্তু নিউট্রন ও প্রোটনগুলি তার মধ্যে কিভাবে রয়েছে, এবং হুইলার। তরল পদার্থের মধ্যে যেমন অণুগুলি পরস্পর আণবিক বলের দ্বারা জোড় বেঁধে থাকে এবং প্রত্যেকে ছুটাছুটি করে বেড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে নিউট্রন ও প্রোটনগুলি যেন ক্ষুদ্র দূরত্ব বলের দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে এবং ছুটে বেড়াচ্ছে। কেন্দ্রীনের এই চিত্রের দ্বারা কেন্দ্রীন বিভাজনকে (Nuclear fission) অতি সহজেই
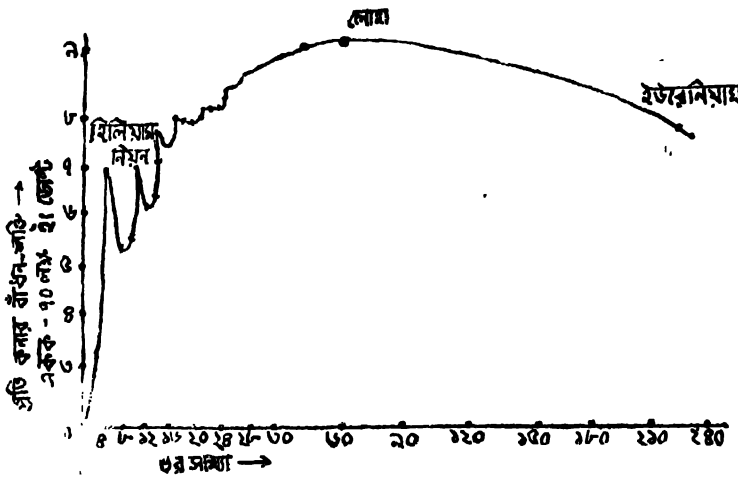
৪নং চিত্র

ভরসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকণার বন্ধন শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং লোহার ক্ষেত্রে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি সবচেয়ে বেশী। কিন্তু লোহার পরবর্তী মৌলিক পদার্থগুলির ক্ষেত্রে ভরসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি কণার বন্ধন শক্তি ক্রমশঃ কমতে থাকে।

সে সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নি। বিজ্ঞানীরা এই সম্বন্ধে বিভিন্ন চিত্র কল্পনা করতে লাগলেন। কখনও পরমাণুর কেন্দ্রীনকে এক ফোঁটা তরল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কখনও বা বলা হয়েছে, নিউট্রন ও প্রোটনগুলি কেন্দ্রীনের মধ্যে খোসার মত সাজানো রয়েছে। কিন্তু কোন একটা চিত্রই কেন্দ্রীনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহারকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে নি। যেমন প্রথমে ধরা যাক কেন্দ্রীনের তরল বিন্দু চিত্র। এই চিত্র প্রথমে গ্রহণ করেন বিজ্ঞানী বোর ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা জানি কোন তরলের উপরিতলে অবস্থিত অণুগুলি চারদিকের অণুগুলির দ্বারা আকর্ষিত হতে পারে না, কেবল তরলের ভিতরকার অণুগুলির দ্বারা আকর্ষিত হয়। কাজেই উপরিতলে অবস্থিত অণুগুলি তরলের ভিতর দিকে আকৃষ্ট হয়। আণবিক বলের দ্বারা সৃষ্ট এই বলকে পৃষ্ঠটান বলে। এই বলের দরুণ একবিন্দু তরল সব সময় সবচেয়ে কম পৃষ্ঠতল ধারণ করবার চেষ্টা করে এবং প্রকৃত পক্ষে এর আকার হয় গোলকের মত। কেন্দ্রীনের

উপরিতলে অবস্থিত নিউট্রন ও প্রোটনগুলিও একই প্রকার পৃষ্ঠটানের দ্বারা আকৃষ্ট হয় এবং তাই স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু কেন্দ্রীনের আকার গোলকের মত থাকে। বোর এবং হুইলার অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, সব পরমাণুর কেন্দ্রীনের ভর সংখ্যা ১১০-এর নীচে তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীনের মধ্যে মোট প্রোটন-প্রোটন বিকর্ষণ-জনিত বল মোট পৃষ্ঠটানের চেয়ে কম থাকে। কাছাকাছি প্রোটন সংখ্যাবিশিষ্ট কোন পরমাণু-কেন্দ্রীন পাওয়া সম্ভব নয় এবং এথেকেই বোঝা যায় যে, কেন পর্যায় সারণীতে (Periodic table) ইউরেনিয়ামের পরে আর কোন স্থায়ী মৌলিক পদার্থ নেই। ৯০ বা তার বেশী প্রোটন-বিশিষ্ট যে কোন কেন্দ্রীনকে যদি আর একটা শক্তিশালী কণার দ্বারা আঘাত করা যায়, তবে কেন্দ্রীনটি উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তা আর
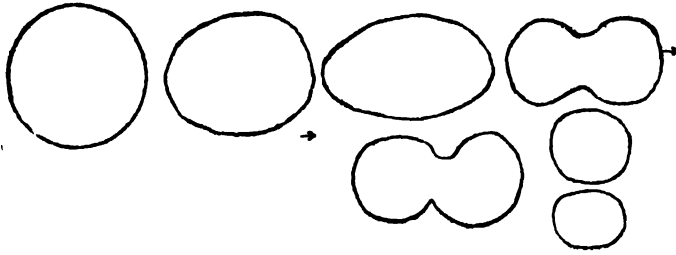
৫নং চিত্র
কেন্দ্রীনের বিভাজন

কাজেই এই সব পরমাণু কেন্দ্রীন স্বাভাবিক অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে গোলকাকার ধারণ করতে পারে। আবার যদি দুটি পরমাণুর কেন্দ্রীন, যাদের মোট ভর সংখ্যা ১১০-এর কম, জুড়ে দেওয়া যায় তবে তারা দিব্যি একটা কেন্দ্রীনে পরিণত হয়ে থাকে, ঠিক যেমন দুটি খুব ছোট্ট তরলবিন্দু জুড়ে গিয়ে একটা বিন্দুতে পরিণত হয়। কিন্তু পরমাণু-কেন্দ্রীনের ভর-সংখ্যা ১১০-এর চেয়ে যত বেশী হবে, ততই মোট বিকর্ষণ বল আকর্ষণ বলের চেয়ে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। কারণ তখন প্রোটনের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এই অবস্থায় পরমাণু-কেন্দ্রীনকে স্থায়ী হতে হলে তার আকার আর ঠিক গোল থাকলে চলবে না, একটু চ্যাপ্টা হতে হবে। যখন কেন্দ্রীনের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা ১০০-এর কাছাকাছি চলে যাবে, তখন কেন্দ্রীনের আকার এত চ্যাপ্টা হয়ে যাবে যে, সেটা তখন ভেঙে দুই টুক্‌রা হয়ে যাবে। অর্থাৎ ১০০ বা তার

স্থায়ী থাকে না, ভেঙে দুই টুক্‌রা হয়ে যায়। বাইরে থেকে কোন কারণে শক্তি পেয়ে কেন্দ্রীন যখন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তখন কেন্দ্রীনের মধ্যেকার নিউট্রন ও প্রোটনগুলিও উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। কেন্দ্রীনের এই উত্তেজিত অবস্থাকে অবশ্য তরলবিন্দু চিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক বোরের তত্ত্ব অনুসারে পরমাণুর কেন্দ্রের চারদিকে ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন খোসায় বা স্তরে পাক খাচ্ছে এবং প্রথম খোসায় ২টি, ২য় খোসায় ৮টি, ৩য় খোসায় মোট ১৮টি ইলেকট্রন থাকতে পারে। যে সকল পরমাণুর কেন্দ্রীনের চারদিকের এই খোসাগুলি ইলেকট্রন দিয়ে পূর্ণ থাকে, সেগুলি খুব স্থায়ী এবং নিষ্ক্রিয় হয় অর্থাৎ অন্য কোন পরমাণুর সঙ্গে সহজে বিক্রিয়া ঘটায় না। ঠিক সেই রকম দেখা গেছে যে, ২০টি প্রোটনবিশিষ্ট পরমাণু-কেন্দ্রীন খুব স্থায়ী এবং এরকম কেন্দ্রীনবিশিষ্ট অনেক-গুলি স্থায়ী মৌলিক পদার্থ আছে। আরও

দেখা গেল যে, ২,৮,২০,৫০,৮২,১২৬ প্রোটন বা নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীন খুব স্থায়ী এবং এই রকম কেন্দ্রীনবিশিষ্ট বহু মৌলিক পদার্থ দেখা যায়; অর্থাৎ যে শক্তি কেন্দ্রীনের কণাগুলিকে একত্র করে রাখে, সেই বন্ধন শক্তি ২,৮,৫০ ইত্যাদি প্রোটন বা নিউট্রনযুক্ত কেন্দ্রীনের ক্ষেত্রে খুব বেশী এবং তাই এরা এত হয়। ৬নং চিত্রের লেখচিত্র থেকে ব্যাপারটা পরিস্কার বোঝা যাবে।

ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে ৫১ ও ৮৩ নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট ক্রিপটন ও জেনন কেন্দ্রীন গঠিত হয়। কিন্তু তৈরি হবার একটু পরেই উভয়েই একটা করে নিউট্রন ত্যাগ করে ৫০ ও ৮২ নিউট্রন সংখ্যাবিশিষ্ট কেন্দ্রীনে পরিণত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, পরমাণু-কেন্দ্রীনগুলির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে ২,৮,৫০,৮২,১২৬ প্রোটন বা নিউট্রনবিশিষ্ট কেন্দ্রীনে পরিণত হবার। পদার্থ-বিজ্ঞানে এই সংখ্যাগুলিকে বলে ম্যাজিক সংখ্যা। এথেকে বোঝা গেল যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে কেন্দ্রীন-কণা অর্থাৎ নিউট্রন ও প্রোটনগুলি বিভিন্ন স্তরে রয়েছে এবং এক একটা স্তর কতকগুলি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন বা নিউট্রনের দ্বারা পূর্ণ হয়।

এখন দরকার হয়ে পড়লো গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করা যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে নিউট্রন এবং প্রোটনের খোসাগুলি যথাক্রমে ২,৮,৫০,৮২,১২৬ নিউট্রন ও প্রোটনের দ্বারা পূর্ণ হবে। পরমাণুর মধ্যে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের স্তরের সঙ্গে কেন্দ্রীনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান নিউট্রন ও প্রোটনের স্তরের কতকগুলি তফাৎ আছে। পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণকারী কুলম্ব বল অনুভব করে, কারণ ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটনগুলি রয়েছে পরমাণুর কেন্দ্রে। কিন্তু কেন্দ্রীনের মধ্যে সেরকম কোন কেন্দ্র আকর্ষণকারী বল ক্রিয়া করে না, যার জন্যে গাণিতিক সূত্র তৈরি করা খুব অসুবিধাজনক হয়ে পড়লো। কিন্তু একটা কায়দা করে বিজ্ঞানীরা এই অসুবিধাটাকে দূর করে ফেললেন। আমরা জানি, কেন্দ্রীনে নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে, প্রোটন ও প্রোটনের মধ্যে এবং প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে ক্ষুদ্র দূরত্ব আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। কিন্তু একটা কণাকে কেন্দ্রীনের মধ্যেকার সমস্ত কণাগুলিই আকর্ষণ করতে পারে না, মাত্র কাছাকাছি কয়েকটা কণা তাকে আকর্ষণ করতে পারে। এটা খুব স্বাভাবিক, কারণ দূরত্ব একটু বেশী হয়ে পড়লেই ক্ষুদ্র দূরত্ব আকর্ষণ

নিকেল
২৮প্রো:
স্ট্রনসিয়াম
৫০নি:
টিন
৫০প্রো:
সিরিয়াম
৮২নি:
৫০ ১০০ ১৫০ ২০০
কেন্দ্রীন কনার সংখ্যা—

৬নং চিত্র

বল খুব কমে যায়—দূরের কণাগুলির পক্ষে একটা কণাকে আকর্ষণ করা সম্ভব হয় না। কাজেই ধরা যায় যে, কেন্দ্রীনের মধ্যে থাকাকালীন প্রত্যেক কণাগুলি মোটামুটি একই পরিমাণ বল অনুভব করে। এই সাধারণ বল আবার এমন একটা প্রকৃতির হবে, যেন ঠিক কেন্দ্রীনের ব্যাসার্ধের বাইরে বল একেবারে শূন্য হয়ে যায়। এই রকম একটা বলকে ধরে বিজ্ঞানীরা তাঁদের সূত্র খাড়া করলেন এবং তার সমাধান করে এমন কতকগুলি সম্ভাব্য খোসা বা স্তর পেলেন, যাদের নির্দিষ্ট শক্তি একটা সূত্রের সাহায্যে লেখা যায় $\epsilon=\{2(n-1)+l\}\frac{h}{2\pi}w$। এখানে n, l ছুটি খুবই পরিচিত চিহ্ন। n, l কে বলা হয় যথাক্রমে মূল কোয়ান্টাম সংখ্যা ও অর্বিটাল অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম কোয়ান্টাম সংখ্যা। h হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে নিউট্রন ও প্রোটনগুলি কেবলমাত্র $\epsilon=0,\ 1\frac{h}{2\pi}w,\ 2\frac{h}{2\pi}w$ ইত্যাদি শক্তিবিশিষ্ট স্তরে থাকতে পারে—মাঝের কোন স্তরে থাকতে পারে না। আবার উপরের সূত্র থেকে দেখা যায় যে n ও l-এর একজোড়া বিশেষ মানের জন্যেই কেবলমাত্র $\epsilon=0,\ 1\frac{h}{2\pi}w, 2\frac{h}{2\pi}w\ \cdots$ ইত্যাদি শক্তিস্তর পাওয়া যায়। প্রোটন ও নিউট্রন প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট স্তরে পাক খাচ্ছে, আবার এদের প্রত্যেকের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, এরা যেন নিজের অক্ষের চারদিকেও পাক খাচ্ছে। এই গতির পরিমাপ করা হয় কৌণিক ভ্রামক দিয়ে, যার একক হলো $\frac{h}{2\pi}$। বিভিন্ন খোসায় পাক খাবার জন্যে কণাগুলির গতির মাপ করা হয় সংখ্যা l দিয়ে এবং কণাগুলির নিজের অক্ষের চারদিকের গতির মাপ করা হয় সংখ্যা s দিয়ে। এদের পরিমাণ হবে যথাক্রমে $\frac{lh}{2\pi}$ ও $\frac{sh}{2\pi}$ — নিউট্রন ও প্রোটনের ক্ষেত্রে $s=\frac{1}{2}$ হয়। l, s ইত্যাদি সংখ্যাগুলি দিয়ে কণাগুলির অবস্থার উল্লেখ করা যায় এবং পাউলির সূত্র অনুসারে ছুটি কণার অবস্থা কখনও এক রকম হতে পারে না। এই সকল বিভিন্ন উপাত্ত থেকে বিভিন্ন শক্তিস্তরের মধ্যেকার প্রোটন-নিউট্রন সংখ্যা কত হবে, তা বলা যায়। পরবর্তী কালে মিসেস মেয়ার, হাক্সেল, জেনসন ও সুয়েস খোসাতত্ত্ব সম্বন্ধে আর একটা নতুন মত দিলেন। তাঁরা বললেন যে, কণাগুলির স্তরের চারদিকে ঘোরবার ফলে যে গতি $\left(\frac{lh}{2\pi}\right)$ ও নিজের অক্ষের চারদিকে ঘোরবার ফলে যে গতি $\left(\frac{sh}{2\pi}\right)$ তাদের মধ্যে ক্রিয়ার ফলে পূর্বোক্ত খোসাগুলি আবার কয়েকটা খোসায় ভেঙে যায়; অর্থাৎ আরও কিছু প্রোটন ও নিউট্রনের জায়গা তাঁরা করে দিলেন। এই তত্ত্বের সাহায্যে ম্যাজিক সংখ্যাগুলিকে পুরাপুরিভাবে ব্যাখ্যা করা গেল।

পরমাণুর মধ্যে কেন্দ্রীনের চারদিকে কেবলমাত্র ইলেকট্রনের খোসা রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীনের ভিতর প্রোটন এবং নিউট্রনের আলাদা খোসা রয়েছে। নিউট্রন-প্রোটনের মধ্যে ক্ষুদ্র দূরত্ব আকর্ষণ বলের জন্যে তাদের স্তরগুলিও একে অপরকে প্রভাবিত করবে। বিজ্ঞানী ফের্মি অবশ্য দেখিয়েছেন যে, এই প্রভাব সত্ত্বেও নিউট্রন এবং প্রোটনগুলি তাদের খোসা থেকে বেরিয়ে যাবে না বরং নিজেদের খোসায় ঘুরতে থাকবে। কেন্দ্রীনের উত্তেজিত অবস্থাকেও এই চিত্রের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

পরমাণু-কেন্দ্রীন একপ্রকার অতি ঘন এবং অস্বচ্ছ বস্তুর দ্বারা গঠিত; কাজেই একটা দ্রুত নিউট্রন কণার পক্ষেও কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বরং নিউট্রন কণাটি কেন্দ্রীনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে শোষিত হয়ে যাবে। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, নিউট্রন কণা কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় সম্পূর্ণভাবে শোষিত হয় না বরং অনেক ক্ষেত্রে ছুটে বেরিয়ে যায়। তরঙ্গ বল-বিদ্যা অনুসারে আমরা একটা গতিশীল কণাকে গতিশীল তরঙ্গ বলেও ভাবতে পারি এবং এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে কণার ভরবেগের উপর। কাজেই আমরা উপরের ঘটনাকে ভাবতে পারি যে, নিউট্রন তরঙ্গ কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক যেমন একখণ্ড কাচের মধ্য দিয়ে আলোক তরঙ্গ প্রতিসৃত হয়ে বেরিয়ে যায়। দেখা গেছে যে, আলোকের প্রতিসরণের সাধারণ নিয়মগুলিও নিউট্রন তরঙ্গ কেন্দ্রীনের মধ্য দিয়ে প্রতিসৃত হবার সময় মেনে চলে। কিন্তু ঘষা কাচ যেমন কিছু পরিমাণ আলোক শুষে নেয়, তেমনি কেন্দ্রীনও কতকগুলি নিউট্রন তরঙ্গকে শুষে নেয় অর্থাৎ বেরুতে দেয় না। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা পরমাণু-কেন্দ্রীনকে ঘষা কাচ বা যে কোন স্ফটিকের তৈরি একটা বলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীনের এই চিত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং এর সাহায্যে নিউট্রনের অনেক ব্যবহারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কেন্দ্রীনের আকার যে পুরাপুরি গোলকাকৃতি নয় বরং একটু ডিম্বাকৃতি, তাও কেন্দ্রীনের এই চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

এই আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, পরমাণু-কেন্দ্রীনের সঠিক চিত্র এখনও আমরা পাই নি। প্রত্যেক চিত্রই কেন্দ্রীনের কিছু কিছু ব্যবহারকে হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীনকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে একটি চিত্রের সন্ধান আজও বিজ্ঞানীরা করে চলেছেন। এ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা অনেক কিছুই করেছেন বা করছেন। কিন্তু আরও অনেক কিছু করবার বাকী আছে।*

---

*বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যালয়ে ২৪শে মার্চের সাপ্তাহিক অধিবেশনে পঠিত।

এপোক্সি রেজিন

এপোক্সি রেজিন নামে ইদানীং এক রকম অদ্ভুত আঠার কথা জানা গেছে, যা দুটি টিউবের মধ্যে ভর্তি করা থাকে। এই আঠা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান জানিয়েছেন—এই দুটি টিউবের পদার্থ সমপরিমাণে একত্রে মিশ্রিত করলে সেটা এমন শক্ত আঠার মত কাজ করে যে, মাত্র এক ফোঁটার মত এই জিনিষের সঙ্গে একটা হুক ধরিয়ে দিলে শুকিয়ে যাবার পর তাতে অনায়াসে একটা গাড়ী ঝুলিয়ে রাখা যায়।

এই আঠার নাম দেওয়া হয়েছে—এপোক্সি রেজিন। জিনিষটা পলিমার কেমিষ্ট্রির অবদান এবং রাসায়নিক আঠা জাতীয় পদার্থ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দুটি পদার্থকে পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগাবার কাজে এপোক্সি রেজিন এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এতদিন গৃহস্থালীর কাজে এবং শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ কাজে জৈব উপাদান থেকে তৈরি নানা রকম আঠা ব্যবহৃত হতো। এখন এই নতুন এপোক্সি রেজিন নানাবিধ নির্মাণকার্যে

—এমন কি, আমেরিকান সুপারসনিক এরোপ্লেনের জটিল অংশসমূহ সংযোজনের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। রাসায়নিক উপায়ে বা ওয়েল্ডিং প্রক্রিয়ায় ধাতব পদার্থাদি জোড়া লাগাবার ব্যাপারে ১৯৫০ সাল থেকে এই গোষ্ঠীভুক্ত শতাধিক নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে এবং কতকগুলি পুরাতন আঠা জাতীয় পদার্থেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। যাহোক, এপোক্সি রেজিনের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এই অদ্ভুত পদার্থটি সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের আবু সিম্বেলের প্রাচীন ন্যুবিয়ান মন্দিরগুলিকে নীল নদের জলস্ফীতি থেকে রক্ষা করবার ব্যাপারেও সহায়তা করেছে।

কিন্তু এই অদ্ভুত নামের পদার্থটি কি এবং তার সাহায্যে আবু সিম্বেলের মন্দিরগুলির রক্ষার ব্যবস্থাই বা কিভাবে হলো?

এই নামটি এসেছে এপোক্সি গোষ্ঠীর রাসায়নিক সঙ্কেতের গ্রীক বর্ণনা থেকে। O —এটা হলো

```
  O
 / \
C   C
```
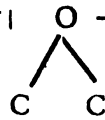
কার্বনের উপর অক্সিজেন, যাকে সাধারণ গ্রীক ভাষায় বললে বোঝায়—এপোক্সি। তেল অথবা কয়লা থেকে যে মাধ্যমিক রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাথেকে এপোক্সি রেজিন তৈরি করাই বোধ হয় সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। Epichlorohydrin ও Bisphenol-A—এই পদার্থ দুটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রক্রিয়ায় একত্রে পরিপক্ক করবার পর এই এপোক্সি রেজিন উৎপন্ন হয়।

প্রথমে ১৯৩৮ সালে সুইজারল্যাণ্ডের পি. ক্যাষ্টান এবং ইউনাইটেড ষ্টেটস্-এর ডাঃ এস. গ্রিনলি তরল রেজিনকে শক্ত রেজিনে পরিবর্তিত করবার উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু যুদ্ধের পরবর্তী কাল পর্যন্ত এই ব্যাপারটা রাসায়নিক 'ম্যাজিকে'র পর্যায়েই থেকে যায়।

এপোক্সি রেজিন এক প্রকার তরল পদার্থ (থার্মোপ্লাষ্টিক) এবং এক জায়গায় রেখে দিলে বরাবর প্রায় তরল অবস্থাতেই থাকে। কিন্তু তথাকথিত 'শক্তকারক' (Hardener) কোন পদার্থ যোগ করলে প্রায় দশ ঘণ্টার মধ্যে বিগলনে অক্ষম এমন এক কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, যা বরাবর সেই অবস্থাতেই থাকে। এপোক্সি প্রকৃত প্রস্তাবে এপোক্সি রেজিন ও শক্তকারক জেল (Gel)-এর মিশ্রণে তৈরি এক প্রকার থার্মোসেটিং রেজিন। মিশ্রণের সময় পদার্থটা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু একবার শক্ত হয়ে গেলে উত্তাপ প্রয়োগেও আর গলে যায় না—এই কঠিন অবস্থা বরাবর অব্যাহত থাকে। যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যস্থলে এই রেজিন রেখে চাপ প্রয়োগ করলে পদার্থ দুটি ওয়েল্ডিং-এর মত পরস্পরের সঙ্গে অবিভাজ্যরূপে জুড়ে যায়।

এথেকেই আবু সিম্বেলের ব্যাপারটা এসে পড়েছে। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ ও কৃত্রিম নাসের হ্রদ সৃষ্টির ফলে নীল নদের যে জলস্ফীতি হবে, তাথেকে আবু সিম্বেলের প্রাচীন মন্দির-গুলিকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা ও পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ফরাসী পরিকল্পনায়—আর একটি ছোট বাঁধ নির্মাণ করে মন্দিরগুলিকে রক্ষা করবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বৃটিশ প্রস্তাবে বলা হয়েছিল—মন্দিরগুলি যেমন আছে ঠিক তেমন ভাবেই পরিস্রুত জলের মধ্যে রেখে জলের নীচে গ্যালারী তৈরি করে সেখান থেকে দেখবার ব্যবস্থা করা হোক। ইটালীয়ানরা প্রস্তাব করেন, মন্দিরগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে খণ্ডিত অংশগুলিকে জ্যাকের সাহায্যে উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেবার পর পুনঃস্থাপিত করাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা।

অবশেষে যান্ত্রিক, আর্থিক ও সৌকুমার্যের দিক থেকে বিবেচনা করে স্থির হলো—বেলে পাথরের সেই তিন হাজার বছরের পুরাতন দ্বিতীয় র্যামেসিস এবং তাঁর রাণী নেফারটারির মন্দিরগুলিকে বিভিন্ন

খণ্ডে কেটে সেই বিরাট খণ্ডগুলি নাসের হ্রদের ভবিষ্যৎ জলপৃষ্ঠ থেকে ২২১ ফুট উঁচু জায়গায় সরিয়ে নেবার পর পুনরায় জুড়ে দিয়ে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিই করা হবে।

এই সব কাজের ভার অর্পণ করা হয় একটি আন্তর্জাতিক নির্মাণকারী সংস্থার উপর। তাঁরা পশ্চিম জার্মেনীর একটি কনষ্ট্রাকসন কোম্পানীর পরিচালনাধীনে এই কাজ সম্পন্ন করবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে যে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছিল, তাথেকে এই মনুমেন্টগুলিকে রক্ষা করবার জন্যে তাঁরা ১৯৬৩ সালের প্রথম থেকেই ১২০০ ফুট বাঁধ নির্মাণ করেন। বিশাল মূর্তিগুলির উন্মুক্ত অংশ রক্ষা করবার জন্যে হাজার হাজার টন বালি এনে ঢেকে দেওয়া হয়। দুই ফুট থেকে আড়াই ফুটের দেয়াল ও ছাদ ছাড়া মনুমেন্টের চতুর্দিকে স্তরে

৩০০০ বছরেরও বেশী পুরাতন মিশরীয় সম্রাট দ্বিতীয় র‍্যামেসিসের প্রস্তরমূর্তি। প্রস্তরমূর্তির মস্তকের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দুটি করে ছিদ্র করে তার মধ্যে ইস্পাতের দণ্ড ঢুকিয়ে সেগুলিকে শক্ত করে এঁটে ধরবার জন্যে ছিদ্রের মধ্যে এপোক্সি রেজিন ঢেলে দেওয়া হয়েছে।

স্তরে সজ্জিত উপরিভাগের মাটি এবং ৫০০০,০০০ ঘনফুট নীরেট চুনাপাথর মন্দিরগাত্র থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে এই মনুমেন্টের চত্বরের ছাদ সরিয়ে ফেলবার পর সর্বপ্রথম এই বিশাল মূর্তিগুলিকে উন্মুক্ত আলোতে দেখা যায়।

মূর্তিগুলি বিশাল আকৃতির হলেও এতই ভঙ্গুর যে, যে পদ্ধতিতে সেগুলিকে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সে ব্যবস্থায় কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারণ নুবিয়ান পাথরে প্রচুর কোয়ার্টস্ মিশ্রিত রয়েছে এবং সেগুলি অনুভূমিক-ভাবে চুন জাতীয় পদার্থের দ্বারা স্তরে স্তরে গ্রথিত। কাজেই তার বন্ধন-শক্তি খুবই দুর্বল। নানা রকমের পরীক্ষার পর ইঞ্জিনিয়ারেরা ৩৬ টন ওজনের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ডের উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দেড় ইঞ্চি থেকে পৌণে দুই ইঞ্চি ব্যাসের দুটি করে ছিদ্র করে তার মধ্যে ইস্পাতের দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে ছিদ্রের মধ্যে Araldit Epoxyhard নামে এপোক্সি রেজিন ঢেলে দেন—লৌহদণ্ডগুলিকে শক্ত করে এঁটে ধরবার জন্যে। জেনারেল মিলসমূহের আমেরিকান ফার্ম কর্তৃক এই এপোক্সি রেজিনের কার্যকরী ফর্মূলা তৈরি করা হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা ধরে এই এপোক্সি রেজিন জমাট বাঁধবার পর এই ৩০০০ প্রস্তরখণ্ড বিরাট আকারের ক্রেনের সাহায্যে স্থানান্তরিত করা হয়। বিভিন্ন দেশের অনেক লোক এই অদ্ভুত কাজ সম্পাদনে সহায়তা করেছেন। এই নতুন নিরাপদ স্থানে এখন এই আঠার সাহায্যে বালি পাথরের ফাটলগুলি বন্ধ করা, প্রস্তরখণ্ডগুলিকে জোড়া লাগানো এবং মন্দির পুনর্গঠন—ইত্যাদি কাজ চলেছে। মাত্র কয়েক দশক পূর্বে উদ্ভাবিত আধুনিক রসায়নশাস্ত্রের অবদান তিন হাজার বছর পূর্বেকার এই অপূর্ব ভাস্কর্য সংরক্ষণের কাজ সম্ভব করে তুলেছে।

দ্বিতীয় র‍্যামেসিস এবং তার রাণী নেফারটরির প্রস্তরমূর্তিকে এই এপোক্সি রেজিন কত কাল অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইঞ্জিনীয়াররা বলেন—মনুমেন্টের চেয়েও দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। একজন বলেছেন—হাজার হাজার বছর পূর্বে যখন এই মূর্তিগুলি একটা গোটা পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছিল, তখনকার চেয়েও বর্তমান অবস্থায় এগুলি অধিকতর মজবুত এবং শক্ত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

করে দেখ

রং নেই তবুও রং দেখা

সাদা কাগজের একখানা গোলাকার চাকৃতির গায়ে কালো কালিতে ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে চোখের সামনে সেটাকে জোরে ঘোরাতে থাকলে বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখা যাবে।
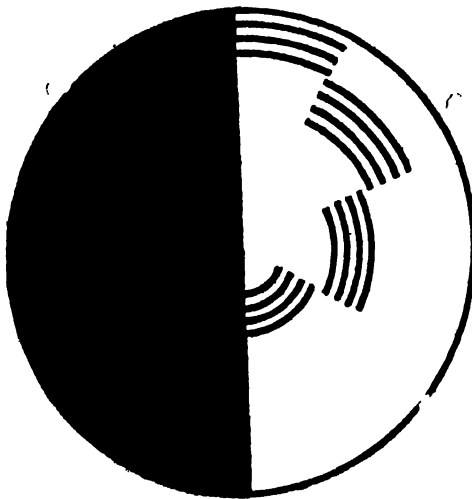
পরীক্ষাটা কিভাবে করতে হবে—বলছি। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। তারপর সাদা কাগজের উপর কালো কালি দিয়ে কম্পাসের সাহায্যে একটি বৃত্ত এঁকে

নাও। বৃত্তের অর্ধেকটা কালো করে দিতে হবে। সাদা দিকটায় ছবির মত করে পর পর ধাপে ধাপে কতকগুলি বৃত্তাংশ এঁকে কাগজখানাকে গোল করে কেটে নিয়ে কার্ডবোর্ডের একটা চাক্‌তির উপর এঁটে দাও এবং চাক্‌তিটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা সরু ছিদ্র করে ছিদ্রের মধ্যে বেশ বড় একটা আলপিন ঢুকিয়ে দাও। এবার আলপিনটাকে ধরে চাক্‌তিখানাকে চোখের সামনে ঘোরাতে থাকলেই বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙের কতকগুলি বৃত্তাকার রেখা দেখতে পাবে। উল্টো দিকে ঘোরালে বর্ণ-রেখাগুলির অবস্থানও উল্টে যাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গুস্তভ ফেক্‌নার নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী এই রকমের একটি চাক্‌তি তৈরি করে সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত ব্যাপারটি লক্ষ্য করেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা একে বলেন Subjective colour। আজ পর্যন্ত তাঁরা এই ব্যাপারটির প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি।

—গ—

বায়ু ও জীবন

আমরা অনবরতই যার মধ্যে চলাফেরা করি, যা সারা পৃথিবীকে ঘিরে উপরে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো, তাকেই আমরা বায়ু বলে জানি। বায়ু দেখা যায় না, কিন্তু এর অস্তিত্ব নানাভাবে অনুভব করি সব সময়েই। বাতাসে গাছের পাতা নড়লে, গায়ে ঠাণ্ডা বা গরম বাতাস লাগলে কিংবা জানালা বা দরজার পর্দা হাওয়ায় দুল্‌লে আমরা বুঝি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। এই বায়ু পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যে পৃথিবী ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

আজ যে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছি, তা সম্ভব হয়েছে বায়ুর জন্যেই। প্রাচীন কালে গ্রীকরা বায়ুকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন। অবশ্য ভারতেও পঞ্চভূতের মধ্যে একটাকে বায়ু বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই ধারণা বদ্‌লে দিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বায়ুতে সন্ধান পাওয়া গেল কার্বন ডাইঅক্সাইডের। তার প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বছর পরে পাওয়া গেল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন। তারপর জানা গেল যে, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনই হচ্ছে বায়ুর প্রধান উপাদান। বায়ুর $\frac{1}{5}$ ভাগ হচ্ছে অক্সিজেন ও ভাগ হচ্ছে নাইট্রোজেন। এছাড়া বায়ুর মধ্যে কিছু কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, কিছু বিরল গ্যাস (আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম প্রভৃতি), হাইড্রোজেন, ওজোন ইত্যাদি আছে। এদের

পরিমাণ মোট পরিমাণের এক-শ' ভাগের এক ভাগেরও কম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওজোন হচ্ছে অক্সিজেনেরই একটা বিশিষ্ট রূপ।

বায়ু চলাচলের সঙ্গে আমাদের স্বাস্থ্যের খুবই নিকট সম্বন্ধ। আগেই বলা হয়েছে যে, বায়ুমণ্ডল না থাকলে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের কোনও অস্তিত্ব সম্ভব হতো না।

জীবনধারণের জন্যে অক্সিজেনের একান্ত প্রয়োজন। বায়ুতে অক্সিজেনের অস্তিত্ব না থাকলে জীবজন্তু বাঁচতে পারতো না। অক্সিজেন শ্বাসকার্যের সহায়ক। আমরা শ্বাস গ্রহণের সঙ্গে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্যাস টেনে নিয়ে থাকি আর নিশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দিই। আবদ্ধ কোনও ঘরে শ্বাসকার্য চালালে ক্রমে ঘরের বায়ুর অক্সিজেন কমতে আরম্ভ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়তে থাকে। ক্রমশঃ বদ্ধ ঘরের বায়ুর অক্সিজেন ফুরিয়ে গিয়ে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রভৃতি গ্যাসে ঘর ভরে যায়।

শ্বাসকার্যের মাধ্যমে অক্সিজেন ভিতরে গিয়ে রক্তকে পরিশুদ্ধ করে। বায়ু আমাদের প্রাণস্বরূপ। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বাঁচতে পারে বটে; কিন্তু বায়ু ছাড়া মানুষ চার মিনিটের বেশী বাঁচতে পারে না।

রক্তের মধ্যে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে। আবার নাইট্রোজেনই হচ্ছে বায়ুর প্রধান উপাদান। শ্বাসকার্যের সময়ে রক্ত প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন বায়ু থেকে টেনে নেয় এবং সমান পরিমাণ পুরনো নাইট্রোজেন বায়ুতে ছেড়ে দেয়। বায়ুতে বেশী পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকবার জন্যে অক্সিজেনের তীব্রতা খুব প্রকট হতে পারে না। বায়ুতে নাইট্রোজেন না থাকলে জীবজন্তুর শ্বাসকার্য খুব তাড়াতাড়ি ও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যেত। ফলে তাদের পক্ষে বেশীক্ষণ বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠতো। অপর পক্ষে আবার বায়ুতে অক্সিজেন কম থাকলেও আমাদের প্রয়োজন মিটতো না।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায়, বায়ু ততই পাত্‌লা হতে থাকে। দশ-বারো হাজার ফুট উঁচুতে বায়ু খুবই কমে যায়। ফলে সেখানে শ্বাসকার্য ঠিকমত চলে না। ক্রমশঃ আরও উঁচুতে শ্বাসকার্য চালানোই যায় না। তাই উঁচু পাহাড়ে ওঠবার সময় সঙ্গে করে অক্সিজেন নিয়ে যেতে হয়। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেও অক্সিজেনের ভাঁড়ার থাকে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানতে পেরেছেন যে, চাঁদে বায়ু নেই। সেজন্যেই চাঁদের বুকে বসবাস করা একটা বিরাট সমস্যা। চাঁদের বুকে বাস করবার জন্যে কৃত্রিম উপায়ে আবহাওয়া তৈরির জন্যে জোর গবেষণা চলছে।

তাহলে বোঝা গেল যে, জীবজগতে বাঁচবার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ মুক্ত বায়ু দরকার। যে সব ঘরে ভালভাবে বায়ু চলাচল করে না, সে সব ঘরে বাস করলে নানারকম কঠিন ব্যাধি হতে পারে। এমন কি, বায়ু চলাচলহীন বদ্ধ ঘরে মানুষের মৃত্যুও ঘটতে

পারে। মুক্ত বায়ু সেবন করলে দেহের ও মনের বল বাড়ে—দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

বায়ু আবার বিভিন্ন রোগ বীজাণুর বাহকের কাজও করে। রোগের জীবাণু বায়ুতে ভেসে এক দেহ থেকে অন্য দেহে শ্বাসকার্যের মাধমে ঢুকে গিয়ে বিস্তার লাভ করে। সহর বা কলকারখানার অঞ্চলে ধূলা, ধোঁয়া, নর্দমার পচানির গন্ধ বায়ুকে দূষিত করে তোলে। এগুলি দেহে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে। তাই উপযুক্ত শ্বাসকার্যের জন্যে উপযুক্ত জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মত বাসগৃহ তৈরি করা হয়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই শ্বাসকার্যের সময় বায়ু থেকে অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দেয়। তাছাড়া প্রকৃতিতে সব সময়েই বিভিন্নভাবে প্রচুর কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে। এই অবস্থা প্রকৃতিতে যদি ক্রমাগতই চলতে থাকে, তাহলে এক সময় অক্সিজেন একেবারেই বায়ু থেকে শেষ হয়ে যাবে; ফলে জীবজগতের অস্তিত্বও লুপ্ত হবে। কিন্তু বায়ুতে অক্সিজেন শেষ হয় না। গাছের পাতার সবুজ রংকে ক্লোরোফিল বলা হয়। গাছপালা সূর্যের আলো ও ক্লোরোফিল দিয়ে বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ভেঙ্গে দেয়। ভেঙ্গে কার্বন গ্রহণ করে দেহের পুষ্টি-সাধন করে এবং অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই অক্সিজেনই বায়ুতে গিয়ে মেশে। কাজেই বায়ুর অক্সিজেন নিঃশেষিত হতে পারে না অর্থাৎ বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সমতা রক্ষা পায়। কার্বন ডাইঅক্সাইডের অভাবে গাছপালার বাঁচা যেমন দায় হতো, তেমনি আবার গাছপালা না থাকলে পৃথিবীতে অক্সিজেন কমে আসতো এবং প্রাণীদের বেঁচে থাকাও দায় হতো

তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, বায়ুর উপরেই জীবন নির্ভর করে। আমরা এই বায়ুর সমুদ্রের মধ্যে বাস করছি। ব্যবহারিক জীবনে অনেক জিনিষের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ করা হয়ে থাকে, কিন্তু বায়ুর উপর সকলের সমান অধিকার।

শ্রীশ্যামসুন্দর দে

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) জোনাকী পোকা জীবিত থাকাকালে তাহাদের গাত্র হইতে আলো নির্গত হয়, কিন্তু মরিয়া গেলে হয় না কেন?

(খ) জনসাধারণ কালো ছাতা ব্যবহার করে, কিন্তু ট্র্যাফিক পুলিশ সাদা ছাতা ব্যবহার করে কেন?

কিরণশঙ্কর সোম, বর্ধমান

উঃ ১। (ক) জোনাকী পোকা মরে গেলেই তার দেহ থেকে আর আলো নির্গত হতে পারে না—এই ধারণা ভুল। জোনাকীর আলো বিকিরণকারী যন্ত্রটি থাকে তার শরীরের পশ্চাৎ দিকে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জোনাকী মরে গেলে তার শরীরের ঐ অংশটি চূর্ণ করে তাতে জল ছিটিয়ে দিলেই তাথেকে আলো বিকিরিত হতে থাকে। বিশেষভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে চূর্ণগুলিকে দুই-তিন বছর পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখা যেতে পারে। তবে মৃত জোনাকীর দেহ থেকে সরাসরি আলোর বিচ্ছুরণ অবশ্য বিশেষ দেখা যায় না। জীবিত অবস্থায় জোনাকী ইচ্ছামত আলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্যে যে জোনাকীর স্নায়ুতন্ত্র দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আলো জ্বালবার জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সরবরাহ করাই এই স্নায়ুযন্ত্রের কাজ বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। জোনাকী মরে গেলে স্নায়ুযন্ত্র বিকল হয়ে যায়। ফলে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিকমত হতে পারে না। মৃত জোনাকীর দেহ থেকে আলো নির্গত না হবার কারণ এই বলে মনে হয়।

(খ) মানুষ ছাতা ব্যবহার করে দুই কারণে—রোদ' ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাবার জন্যে। বৃষ্টির ক্ষেত্রে ছাতার রং সাদা বা কালো যাই হোক না কেন, কিছু এসে যায় না। কিন্তু রোদ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ছাতা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সাদা হওয়া উচিত। কারণ যে জিনিষ যত কালো, সে তত বেশী আলোক ও উত্তাপ-তরঙ্গ গ্রহণ ও বিকিরণ করে থাকে। ফলে কালো ছাতা সূর্যরশ্মি থেকে অধিকতর উত্তাপ গ্রহণ ও বিকিরণ করতে বাধ্য। তাই এগুলি ব্যবহারকারীরাও অত্যধিক উত্তাপ অনুভব করে থাকেন। পক্ষান্তরে সাদা জিনিষের উপর আলোক ও উত্তাপ-রশ্মি পড়লে তার প্রায় সবটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়। ফলে সাদা ছাতা ব্যবহারকারী ছাতার নীচে অপেক্ষাকৃত অনেক কম উত্তাপ অনুভব করেন। তাই সাদা ছাতা ব্যবহার করাই বিজ্ঞানসম্মত। যে কোন কারণেই হোক, সাধারণ

মানুষ বহুকাল থেকেই কালো ছাতা ব্যবহার করছে। সম্ভবতঃ এ নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবেন নি। তাই গতানুগতিকভাবে কালোই চলে আসছে।

তাছাড়া ট্র্যাফিক পুলিশের সাদা ছাতা ব্যবহারের কারণ হয়তো এই যে, ট্র্যাফিক পুলিশকে রাস্তায় চলন্ত যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ক'রতে হয়। সাদা জিনিষ সামান্য আলোতেও দূর থেকে নজরে পড়ে, কিন্তু কালো জিনিষ আলোর মধ্যেও দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাতে পারে। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যেই সম্ভবতঃ সাদা ছাতা ব্যবহার করা হয়।

দীপক বসু

বিবিধ

ষষ্ঠ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

১২ই মে, '৬৭ শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫-৩০ মিনিটে ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত ষষ্ঠ বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল—"ভারতের গো-মহিষ ও তাদের পুষ্টি সমস্যা"। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে সোভিয়েট দূতাবাসের পুস্তক উপহার

গত ১২ই মে, '৬৭ শুক্রবার ৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডস্থ সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর বক্তৃতা-কক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে কলিকাতাস্থিত সোভিয়েট দূতাবাসের ভাইস-কন্সাল ও সাংস্কৃতিক শাখার প্রধান শ্রীফেলিক্স যুর্লভ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারের জন্যে বিজ্ঞান বিষয়ক অনেকগুলি গ্রন্থ উপহার দেন। পরিষদের পক্ষ থেকে উপহার গ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুর্লভ বিজ্ঞান পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলীর প্রশংসা করে বলেন যে, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান যে কোন দেশের পক্ষেই অত্যাবশ্যক। এই জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে তাঁর দেশের পক্ষ থেকে যে সামান্য উপহার তিনি দিচ্ছেন, সেটা তাঁর দেশের মানুষের শুভেচ্ছার প্রতীক। তিনি আশা করেন যে, এই ধরণের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ়তর হবে। শ্রীযুর্লভ বাংলা ভাষায় তাঁর ভাষণ দেন।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, সোভিয়েট দূতাবাস তাঁদের পুস্তক উপহারের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের

প্রতি যে সমর্থন প্রকাশ করেছেন, তার জন্যে তিনি আনন্দিত। যে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিজ্ঞানের আজ দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটছে, সেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার সর্বস্তরেই মাতৃভাষার প্রচলন রয়েছে। এটাও সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে তার উল্লেখ করে অধ্যাপক বসু বলেন যে, পরস্পরকে জানা ও বোঝবার জন্যে এই ধরণের প্রচেষ্টা যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ জয়ন্ত বসু সোভিয়েট দূতাবাসকে তাঁদের সৌহার্দ্যসূচক

বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু শ্রীফেলিক্স ঘুর্লোভের নিকট থেকে বিজ্ঞান পরিষদের গ্রন্থাগারে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত পুস্তকগুলি গ্রহণ করছেন।

হবে যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান একান্ত আবশ্যক। পরিষদকে সোভিয়েট প্রকাশিত পুস্তক উপহারের অনুষ্ঠানটি সেদিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীঘুর্লভ গত পাঁচ বছরের অধ্যবসায়ে বাংলা ভাষাকে যে সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন, উপহারের জন্যে পরিষদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীঘুর্লভ যে তাঁর কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, সে জন্যে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। অসীমা চট্টোপাধ্যায়
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

২। নদীয়াবিহারী অধিকারী
১৬৯, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

৩। সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৯

৪। প্রবীরকুমার মুখোপাধ্যায়
১৩, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

অরুণকুমার রায় চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা-৯

৬। কল্যাণকুমার গোস্বামী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর
ছাত্রাবাস
১, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

৭। শ্রীশ্যামসুন্দর দে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাস
১, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

৮। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫/১ নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড
কলিকাতা-১

৯। দীপক বসু
অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | জুলাই, ১৯৬৭ | সপ্তম সংখ্যা

বৈজ্ঞানিকের সামাজিক দায়িত্ব

অমিয়কুমার বসু

প্রায়ই প্রশ্ন ওঠে যে, চিকিৎসক সম্প্রদায়কে বৈজ্ঞানিক আখ্যা দেওয়া যায় কিনা। এই কথার মধ্যে কিছু সত্য নিহিত আছে। চিকিৎসা-বিদ্যার ইতিহাস আলোচনা করিলেই আমরা এই বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিব।

চিকিৎসার ইতিহাসকে প্রধানতঃ তিনটি যুগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) চিকিৎসা-বিদ্যা, (২) চিকিৎসা-ব্যবসায় ও (৩) চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

চিকিৎসা-বিদ্যা কথাটি আমি ঐতিহাসিক অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। হাজার হাজার বৎসর আগে রোগ নিরাময়ের পদ্ধতি ঠিক বিদ্যার আকারে ছিল না। কিন্তু 'বিদ্যা' শব্দটি আমি যাদুবিদ্যার কথা মনে রাখিয়াই ব্যবহার করিয়াছি ঐ যুগে রোগীকে খাটে করিয়া কিংবা খাঁচায় পুরিয়া হাটে-বাজারে যেখানে বহুলোকের সমাগম হয়, সেখানে রাখা হইত। উদ্দেশ্যঃ যদি উপস্থিত কেহ তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিছু উপায় বাত্‌লাইয়া দিতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে ক্রমে ঝাড়ফুঁক, তাবিজ-মাদুলী, শিকড়-বাকড় ও মন্ত্রতন্ত্রের উদ্ভব হইল। তারই সঙ্গে তদানীন্তন ধর্মবিদ্যার সমন্বয়ে নানা প্রকারের এক-একটি 'রোগ ভগবান' সৃষ্টি হইল এবং রোগ নিরাময়ের জন্য ঐ সব ভগবানের পূজা ও রোগ নিবারণের পদ্ধতি চালু হইল। এই ধারণা অনুসারেই আমি যাদু-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যাকে একই স্তরে স্থান দিয়াছি।

বহুশত বৎসর পরে চিকিৎসা-ব্যবসায়ের যুগ আসিল। এই যুগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে চিকিৎসা-বিদ্যা অনেকটা বৈজ্ঞানিক

স্তরে উপনীত হইল। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার কল্যাণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি থাকিলেও এই বিদ্যা চিকিৎসা-ব্যবসায়ে পরিণত হইল। প্রথম যুগের যাদুবিদ্যারও নিবারণ হইল না। ফলে দেখা গেল, প্রথম যুগের মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের জগাখিচুড়ী। তাই Molecular Biology পড়িয়াও আমরা মাদুলি, তাবিজ, শান্তি-স্বস্ত্যয়নের বাঁধন কাটাইয়া উঠিতে পারিলাম না। সমাজ-ব্যবস্থাই প্রধানতঃ ইহার জন্য দায়ী। রোগ যত বেশী, ডাক্তারের ব্যাঙ্কের টাকাও তত ভারী। রোগ ও মৃত্যুর ভয়ে সমাজ চিকিৎসককে তাঁহার জ্ঞান অনুযায়ী প্রাপ্য স্থানের অনেক উর্ধ্বে স্থান করিয়া দিল। ফল হইল এই যে, ডাক্তার বৈজ্ঞানিক হইবার সুযোগ পাইল না। চিকিৎসক সম্প্রদায় তাই সাধারণতঃ আত্মকেন্দ্রিক ও পরিবর্তন-বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন হইয়া উঠিল। আমাদের অধিকাংশই এখন এই যুগের মধ্য দিয়া চলিয়াছি তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে—চিকিৎসকেরা কি বৈজ্ঞানিক?

আশার কথা এই যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের যুগ সুরু হইয়াছে। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে এখন চিকিৎসাকে ব্যবসায় হিসাবে গণ্য না করিয়া বিজ্ঞান হিসাবে দেখিবার কথা চিন্তা করিতেছেন। আমরা চিকিৎসকেরাও আজ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূজারী হইতে চলিয়াছি এবং এই বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে যুগ-যুগার্জিত ঔদাসীন্য পরিহার করিতে সুরু করিয়াছি। ইহা নিঃসন্দেহে এক শুভ লক্ষণ। সমাজ কিন্তু এখনও অগ্রসরমান এই চিন্তার মুখে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে অসামান্য অগ্রগতি হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় এই অপরিসীম সম্ভার অবহেলিত। বৈজ্ঞানিকের সাধনার ফল জনসাধারণের ভোগে লাগিতেছে না। অথচ ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা না করিয়া সুবিধাবাদী শ্রেণীভিত্তিক সমাজ, হয় কতকগুলি মূল্যহীন মিথ্যা ধারণা ছড়াইয়া কিম্বা বকধার্মিকের গাম্ভীর্যের মুখোস আটিয়া জনসাধারণের সঙ্গে হীন প্রতারণা করিতেছে। তাই 'Noble profession', 'Suffering humanity', 'Service to poor is service to God'—এই সব অবাস্তব কথার এত ছড়াছড়ি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অসীম দুঃখ এই যে, বিজ্ঞানের দান সমাজ-কল্যাণে ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে না। রোগের জন্য ঔষধ আছে—রোগীর জন্য নাই—অসহনীয় এই পরিস্থিতির অবসান চাই।

গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারাও বহুরূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'বিজ্ঞান কেবলমাত্র বিজ্ঞানের জন্য'—এই কথার প্রতিধ্বনি আমরা শুনিয়াছি। শুনিয়াছি রাজনীতি বৈজ্ঞানিকের অস্পৃশ্য। বর্তমানে অবশ্য এই চিন্তাধারা বহুলাংশে পরিবর্তিত হইয়া বাস্তবানুগ ও সমাজভিত্তিক হইয়াছে। বহু রাষ্ট্র বিজ্ঞানকে সমাজ-জীবনের একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে স্থান দিয়াছে। বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্যও অনুকূল সামাজিক পরিস্থিতি দেশ ও জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্তাপদ্ধতির অনুশাসন প্রয়োজন। এই মাপকাঠিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইখানেই বিজ্ঞান, সমাজ ও রাজনীতি একত্রীভূত হইয়াছে। এখানে একে অন্যের পরিপূরক। বৈজ্ঞানিকের সামাজিক দায়িত্ববোধ এই চিন্তাধারার মাধ্যমেই স্ফুরিত হইতে পারে।

বর্তমানে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে চিকিৎসা-ব্যবস্থা সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়; যথা—(১) সকলের জন্য বিনা খরচায়, (২) নানাপ্রকারের বীমার মাধ্যমে এবং (৩) ব্যক্তিগত অর্থের বিনিময়ে—যেমন আমরা বাজারে ভালমন্দ পণ্য ক্রয় করিয়া থাকি।

ভারতবর্ষে এই তিন প্রকারের ব্যবস্থাই কম-বেশী চালু আছে। বিনা খরচে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তাহা শতকরা ৯০ ভাগের জন্য। কিন্তু আমরা জানি, ইহার মধ্যে বিপুল অংশেরই বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা হয় না এবং বর্তমান পদ্ধতিতে হইতেও পারে না। বীমার মাধ্যমে শতকরা একাংশেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই—যাহা আছে, তাহাও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত নহে। বাকী শতকরা ৬-৭ অংশ যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা ব্যক্তিগত অর্থের সাহায্যে সুচিকিৎসার অধিকারী।

আমাদের দেশে চিকিৎসার কথা ভাবিতে হইলে শতকরা এই ৯০ ভাগের কথাই বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ইহাদের আর্থিক সঙ্গতি এমন নয় যে, জনস্বাস্থ্য বীমা পরিকল্পনার জন্য যে অতি সামান্য প্রিমিয়াম প্রয়োজন—তাহাও তাহারা জমা করিতে পারেন। এই বৃহৎ জন-সমষ্টির জন্য বিনা পয়সায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। আমাদের বর্তমান সমাজের ঐ পরিমাণ অর্থ নাই এবং বর্তমানের সমাজ-ব্যবস্থায় তাহা সম্ভবও নয়। আমরা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করি যে, কেবলমাত্র সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমেই বিজ্ঞানের অসীম দান সামগ্রিকভাবে জনস্বার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক চেষ্টার মাধ্যমে চিকিৎসার দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে। অনেকের ধারণা ডাক্তার, রোগী ও পরিবারের সুসমন্বয়ের মাধ্যমেই সুচিকিৎসা হইতে পারে। যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ লোকের কোনও চিকিৎসকই নাই, সেখানে এই কথা অতি অবাস্তব। বর্তমানে চিকিৎসাকে পণ্য সামগ্রীতে পরিণত করিবার জন্য চিকিৎসকের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের মনোবৃত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে।

আমরা যাহারা জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়াছি, তাঁহাদের বিশ্বাস, এই বিপুল সঙ্গতিহীন গ্রামীণ সমাজকে যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সাধারণভাবে দুইটি কথা আমাদের জানিতে হইবে।

প্রথমত :—শুধুমাত্র রোগের চিকিৎসা করিয়া কোন জাতিকে শক্তিশালী করা যায় না। রোগ নিবারণই প্রথম পথ এবং তাহার প্রথম নির্দেশ —পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান ও বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যবিধির আচরণ পদ্ধতি। দ্বিতীয়তঃ—এই অবস্থা বাস্তবে পরিণত করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা আমাদের বর্তমান সমাজ দিতে অক্ষম। এই অর্থ ভিক্ষা করিয়া পাওয়া যায় না। ইহা একমাত্র আমূল ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমেই সৃষ্টি হইতে পারে। তাই আমরা এক কথায় বলি "জনস্বাস্থ্য সমস্যা, ভূমি-সংস্কার সমস্যা।" মনুষ্য-শক্তিকেই অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত করিতে হইবে এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি স্থায়ী শিল্পোন্নয়নের পথিকৃৎ হইবে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ইংল্যাণ্ড তো National Health Service করিয়াছে, কিন্তু ভূমি-সংস্কার করে নাই। ইতিহাসের যে কোন ছাত্রই এই তথ্যও জানেন যে, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ বিভিন্ন জাতিকে শত শত বৎসর পদানত করিয়া ইংল্যাণ্ড যে প্রভূত ধনসম্পদের মালিক হয়, তাহারই সাহায্যে এবং দুই শত বৎসরের শিল্পোন্নতির অধিকারী হইবার ফলেই ইংল্যাণ্ড আজ N. H. S. চালু করিতে সক্ষম হইয়াছে। আমাদের সে সুযোগ নাই, ইচ্ছাও নাই।

লাতিন আমেরিকার দুই শত বৎসরের দুঃখ ভোগ ও লাঞ্ছনার কথা যাহারা বিশদভাবে জানেন, তাহাদের আর নূতন করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই যে, কিভাবে আমেরিকায় প্রাথমিক পুঁজি গঠনের কাজ সুরু হয়। তাহার সঙ্গে ছিল ব্যাপক দাসপ্রথা এবং দুই শত বৎসরের শিল্পোন্নতির সমন্বয়। মার্কিন মুলুকের

জৌলুষ দেখিয়া আত্মহারা না হইয়া তাহার সর্বাত্মক ডলার বন্ধনের বীভৎস নগ্নরূপ এবং আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে পদানত করিয়া রাখিবার ঘৃণ্য প্রচেষ্টার কথাও যেন আমরা স্মরণে রাখি। আমরা নিশ্চয়ই উহার সহিত রাখীবন্ধন করিব না। এত সম্পদ, এত ঐশ্বর্যের সমাবেশ, তবুও ঐ দুইটি দেশে সকলের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। কথাটি অনেকের কাছে নূতন ঠেকিলেও নির্ভেজাল সত্য। তাই আমরা চাই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন—সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজের রূপান্তর এবং ইহা হইলেই আমাদের দেশে শিক্ষা, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া যাইবে। এই সামগ্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ও রূপায়ণে সাহায্য করাই সকলের, বিশেষতঃ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বিশেষ সামাজিক দায়িত্ব। তখন আমরা চিকিৎসকেরাও চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হইতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীতে পরিণত হইব এবং আপনারা সত্যকারের বৈজ্ঞানিকেরাও আর প্রশ্ন করিবেন না—চিকিৎসকেরা কি বৈজ্ঞানিক ?*

---

*বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উনবিংশতিতম প্রতিষ্ঠা-দিবসে "বিজ্ঞানীর সামাজিক দায়িত্ব" শীর্ষক আলোচনা-চক্রে পঠিত।

মৌমাছির ভাষা

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়

ও

শ্রীমতী অলোকা রায়

মানুষ সামাজিক জীব, দশজনকে নিয়ে তার কাজ কারবার। দশজনের মধ্যে পরস্পরের সহযোগিতা ও আদান-প্রদানে সমাজ গড়ে উঠেছে। কতকগুলি শব্দের সাহায্যে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি, তাই হচ্ছে ভাষা। সাধারণভাবে মনে করা হয়, এই ভাষা হচ্ছে শুধু কতকগুলি শব্দের (তা স্বরযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারণ করেই হোক বা লিখেই হোক) বিশেষ বিশেষ ব্যবহার। কিন্তু শব্দের ব্যবহারই সব কিছু নয়। কোন রকম শব্দের ব্যবহার না করে শুধু বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আন্দোলিত করে বা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী করে আমরা মনের ভাব খানিকটা প্রকাশ করতে পারি। মূকেরা এভাবেই তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। আমরা শব্দ উচ্চারণ করে যখন মনের ভাব প্রকাশ করতে চাই, তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে তার একটা সুস্পষ্ট রূপ দিতে চেষ্টা করি। জীবজগতে কিন্তু মানুষই একমাত্র সামাজিক জীব নয়। মানুষ ছাড়া সামাজিক প্রাণীদের মধ্যে বিশেষ করে মৌমাছি ও পিঁপড়ের নাম করা যায়। এরা দল বেঁধে বাস করে। একটি মৌচাকে কম-বেশী পঞ্চাশ হাজার মৌমাছি বাস করতে পারে। বিভিন্ন জাতের কয়েক রকম পিঁপড়ের বাসায় ৭।৮ হাজারেরও বেশী পিঁপড়ে একত্রে বাস করে। আফ্রিকার বহু অঞ্চলে এক-একটা উইঢিবির উচ্চতা ষোল ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এরকম একটা উইঢিবিতে বিশ লক্ষেরও বেশী উই বাস করতে পারে। সামাজিক জীব মৌমাছি ও পিঁপড়ের বাসায় কাজের অন্ত নেই। খাবার যোগাড় করা, চাক

বা বাসা তৈরি করা, বাচ্চাদের খাওয়ানো, বাসা পাহারা দেওয়া, প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষেত্রে তাপাঙ্ক ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা—প্রভৃতি নানা রকমের কাজ করতে হয়। তাছাড়া সেখানে শ্রমের বিভাগও রয়েছে। সব মৌমাছি বা পিঁপড়ে সব রকম কাজ করে না। এতগুলি প্রাণীর এত রকম কাজ সুশৃঙ্খলভাবে করতে হলে নিজেদের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়ার ভাব অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে যাকে আমরা ভাষা বলি, তার অন্ততঃ কিছুটা ব্যবহার কোন না কোন রূপে থাকা প্রয়োজন। কিন্তু আছে কি? কীট-পতঙ্গের চরিত্র ও স্বভাব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা বলেন—ভাষা বলতে যদি এক শ্রেণীর প্রাণীদের ভিতর সংবাদ বিনিময় বোঝায়, তবে তার সীমিত ব্যবহার মৌমাছি ও পিঁপড়েদের ভিতর রয়েছে। অন্ততঃ তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে। শুধু সমাজাশ্রিত মৌমাছি ও পিঁপড়েদের ভিতরই নয়, দেখা গেছে—কোন কোন জাতের অসামাজিক পতঙ্গের ভিতরও দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরিবেশনের ভাষা রয়েছে। এক রহস্যময় ভাষার আকর্ষণে দূরদূরান্তর থেকে কীট-পতঙ্গ ছুটে আসে।

মৌমাছির ভাষার ধরণটা কিরূপ এবং সে ভাষা কি কাজে লাগানো হয়, বর্তমান প্রসঙ্গে সে বিষয়েই কিছু আলোচনা করা হবে।

মৌমাছির নাচ

নৃত্যপটিয়সীর হাতের মুদ্রা, চোখের ভঙ্গিমা আর পায়ের গতিছন্দে যে ভাব প্রকাশিত হয়, তা রসিকজন বুঝে নেন। অষ্ট্রিয়ার জীব-বিজ্ঞানের এক অধ্যাপক এরকমই একজন নৃত্য-রসিক; তবে তাঁর কাজকারবার মৌমাছিদের নাচ নিয়ে। অধ্যাপক বলেন, কর্মী মৌমাছিরা অবস্থা-বিশেষে চাকের উপর নৃত্য করে এবং তাদের চাক-বন্ধুরা ছন্দোবদ্ধ নাচের ভিতর সুস্পষ্ট অর্থ খুঁজে পায়। এই নাচ হলো বার্তাবহ নাচ।

অধ্যাপক তাঁর আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করতেই সর্বত্র খবর ছড়িয়ে পড়লো। শুধু জীব-বিজ্ঞানী বা জীব-বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কাছেই নয়, বিজ্ঞানী নন অথচ চিন্তাশীল ও কৌতূহলী জনগণের মধ্যেও অধ্যাপকের এই আবিষ্কার বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে। স্থূল অর্থে দেখতে গেলে এই আবিষ্কার মানুষের সমাজ বা জীবনকে প্রভাবিত করে নি, যেমন অন্যান্য বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছে। তবু বিজ্ঞানীরা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অষ্ট্রিয়ার অধ্যাপকের এই আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর এক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই আবিষ্কার মানুষের চিন্তাজগতে এক নবদিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে অষ্ট্রিয়ার নাগরিক ভন ফ্রিশ মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে জীব-বিজ্ঞানীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি হিটলারের অনুচর নাৎসীদের কোপে পড়ে বিতাড়নের মুখে পড়েন। কিন্তু খাদ্য-সরবরাহ দপ্তরের বিচারে তাঁর গবেষণার বিষয় এত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয় যে, তিনি সাময়িকভাবে রেহাই পান। ঠিক হয়, যুদ্ধ থেমে গেলে যা হয় করা যাবে। যুদ্ধের সময় জার্মেনী যে বোমায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, তা কারোর অজানা নয়। ভন ফ্রিশের প্রাগের গবেষণাগার ও গ্রন্থাগার বোমার আঘাতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধের পর তিনি জার্মেনী ছেড়ে অষ্ট্রিয়ায় চলে আসেন এবং আল্‌প্‌সের কোন এক পার্বত্য অঞ্চলে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মৌমাছি নিয়ে গবেষণা চালাবার উদ্দেশ্যে একটি ছোট গবেষণাগার স্থাপন করেন। মৌমাছি সম্বন্ধে চমকপ্রদ ও যুগান্তকারী গবেষণা, যা তাঁকে জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে—তা তিনি এখানেই করেন। অবশ্য প্রথম

জীবনে তিনি যে গবেষণা করেন তাও অবহেলার নয়। একটি গবেষণা হলো মৌমাছিদের বর্ণ-সচেতনতার উপর। তাঁর আগে মৌমাছি নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতেন, তাঁদের ধারণা ছিল, মৌমাছিরা সম্পূর্ণ বর্ণান্ধ (Colour blind)। ভন ফ্রিশ দেখান যে, এই মতটি সত্য নয়। মৌমাছির চোখ অনেক রং ধরতে পারে, যদিও তাদের চোখ লাল রং ধরবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধ।

এবার ভন ফ্রিশের প্রধান আবিষ্কারের কথায় আসা যাক। মৌমাছিদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের অন্ততঃ কিছুটা যে ব্যবস্থা রয়েছে, তা তিনি অতি সহজ পরীক্ষার সাহায্যেই জ্ঞাত হলেন। বিভিন্ন কাঠের বাক্স তৈরি করে তাতে মৌমাছি পুষতে আরম্ভ করলেন। কাঠের বাক্সে মৌমাছিরা চাক তৈরি করলো। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। মধুর জন্যে এভাবেই অনেকে মৌমাছি প্রতিপালন করে থাকেন। অধ্যাপক ফ্রিশ প্রথমে অষ্ট্রিয়ার এক বিশেষ জাতের কালো মৌমাছি নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। পরীক্ষার জন্যে তিনি চাকের কাছেই বিশেষ ধরণের পাত্রে চিনির সিরাপ রেখে দিতেন। দেখা গেল, রাখা মাত্রই মৌমাছিরা সিরাপের খোঁজ পাচ্ছে না। খোঁজ পেতে দু-এক দিন কেটে গেল। অবশেষে একটা মৌমাছি সিরাপের পাত্রে এসে বসলো এবং কিছু পরেই চাকে ফিরে গেল। মৌমাছিটা চাকে ফিরে যাবার পর থেকেই দু-চারটি মৌমাছি সিরাপের পাত্রে এসে বসে এবং চাকে ফিরে যায়। মৌমাছির সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কয়েক শ'য়ে দাঁড়ালো। সিরাপ ফুরিয়ে এলে মৌমাছির সংখ্যা কমে এলো এবং সিরাপ সম্পূর্ণ ফুরিয়ে গেলে পাত্রে আর মৌমাছি এলো না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বহুবার পরীক্ষা করে একই রকম ফল পাওয়া গেল। পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো, মৌমাছিরা খাবারের খোঁজ পেলে চাকের মৌমাছিদের খবর দেয়। তা না হলে যে সিরাপ এতটা সময় মৌমাছিদের অজ্ঞাত ছিল, দু-একটি মৌমাছি তার খবর জেনে চাকে ফিরে যাবার ঘণ্টাখানেক বা ঐ রকম সময়ের মধ্যে এত মৌমাজি জানতে পারলো কেমন করে? খাবার খুঁজে বেড়ানো মৌমাছিরা কেমন করে চাকের মৌমাছিদের খাবারের খোঁজ ও তার অবস্থানের কথা জানায়?

আর একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন তিনি। যে মৌমাছি প্রথমে খাদ্যের খোঁজ পায়, সে চাকে ফিরে গিয়ে কি করে—তার উপর নজর রাখা দরকার। মৌচাকের বাক্সের একটা ধার কাচ দিয়ে তৈরি করা হলো। চাকের কাছেই মৌমাছির খাবার রেখে দেওয়া হলো। যে মৌমাছি প্রথমে খাবারের পাত্রে এসে বসলো, তার গা রঙের ফোঁটা দিয়ে চিহ্নিত করা হলো, যাতে চাকে ফিরে যাবার পর হাজার হাজার মৌমাছির মধ্যে সে হারিয়ে না যায়। প্রোফেসর ফ্রিশ লক্ষ্য করলেন যে, মৌমাছিটি চাকে নেমেই চাকের খাড়া তলে (Vertical surface) পর্যায়ক্রমে একবার ডাইনে ও আর একবার বাঁয়ে বৃত্তাকার পথ রচনা করে চলতে থাকে (চিত্র ১)। এই ছন্দিত পথ পরিক্রমণের নাম দেওয়া হয়েছে বৃত্ত নাচ। মৌমাছিটির এই নাচ কাছাকাছি অন্যান্য মৌমাছিদের আকৃষ্ট করে। তারা উত্তেজিত হয়ে নৃত্যরত মৌমাছিটির কাছে এসে জড়ো হয়। তারপর তারা চাক থেকে বের হয়ে পড়ে খাবারের পাত্রের খোঁজে। বাগানে যদি কয়েক রকম মধুগন্ধী ফুল ফোটে, তবে নৃত্যরত মৌমাছিটির গায়ে যে ফুলের গন্ধ লেগে থাকে, চাক থেকে বেরিয়ে-পড়া মৌমাছিগুলি প্রথম ঠিক সেই ফুলেই মধুর খোঁজ করে। প্রথম মৌমাছিটিই যে শুধু চাকে গিয়ে নাচে তা নয়, যে মৌমাছিগুলি প্রথম মৌমাছির নাচ অনুসরণ করে চাক থেকে বেরিয়ে পড়েছিল, তারাও চাকে ফিরে এসে নাচ সুরু করে এবং তাদের নাচের মর্ম গ্রহণ করে

আরও মৌমাছি চাক থেকে বেরিয়ে পড়ে। এভাবে চাক থেকে বেরিয়ে-পড়া মৌমাছির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। অধ্যাপক আরও লক্ষ্য করলেন, উৎস স্থলে খাদ্যসম্ভার যত বেশী থাকে, সংবাদ নিবেদকদের নাচ ততই বেগবান, প্রাণবন্ত ও স্থায়ী হয়। বাগানে একসঙ্গে যদি কয়েক জাতীয় ফুল ফোটে এবং খাবার অন্বেষণকারী মৌমাছিরা যদি বিভিন্ন গাছে বসে, তবে যে সব মৌমাছি সুমিষ্ট রসে সবচেয়ে বেশী সম্পদশালী ভ্রাম্যমান মৌমাছিরা যদি চাকে এসে চক্রাকারে নাচতে থাকে, তবে অন্যান্য মৌমাছিরা বুঝতে পারে, তারা মধুর খোঁজ পেয়েছে। মধুর পরিমাণটা মোটামুটি কি রকম এবং ফুলগুলি চিনে বের করবার জন্যে গন্ধের নিশানাটা কি, তাও তারা বুঝতে পারে। মধুর উৎস যদি চাক থেকে দূরে না হয়, তবে সব দিক খুঁজে খুঁজে গন্ধবাহী পথটা বের করা মুস্কিল হবার কথা নয়। কিন্তু মধুর উৎস যদি খুব দূরে থাকে, তবে মৌমাছিরা খাবারের
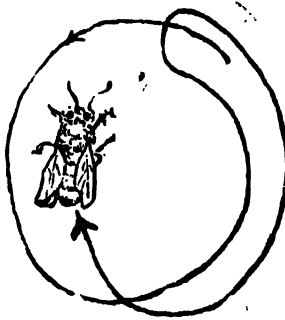
চিত্র নং-১
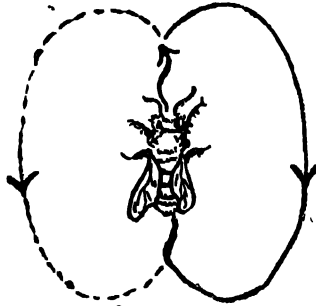
চিত্র নং-২

ফুল গাছ থেকে আসে—তারাই চাকে ফিরে গিয়ে সবচেয়ে প্রাণবন্ত নাচ নাচতে থাকে। চাকের অধিকাংশ মৌমাছি ঐ গাছেই মধুর সন্ধানে যায়। মধুপান বা সংগ্রহের জন্যে মধুর পরিমাণ যত কমতে থাকে, ঐ গাছ থেকে ফিরে-আসা মৌমাছিদের নাচ ততই স্তিমিত হয়ে আসে, শেষে একেবারে থেমে যায়। বোঝা গেল, খাবারের খোঁজে খোঁজে চাক থেকে কয়েক মাইল দূরেও চলে যেতে পারে। চাকের মৌমাছিদের অত দূরের খাবারের খোঁজ কেমন করে দেওয়া হয়? শুধু গন্ধ ধরে ধরে অত দূরের মধুগন্ধী ফুলের সমারোহ খুঁজে বের করা সোজা কথা নয়। চতুর্দিক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হলে অনেক শ্রম ও সময়ের দরকার। সংবাদ-

দাতা মৌমাছিরা অন্যভাবে পথের নিশানা জানিয়ে দেয়।

আগেই বলেছি, অধ্যাপক অষ্ট্রির কালো মৌমাছি নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন, চাক থেকে খাদ্য ৮৪ মিটার বা তারও বেশী দূরে থাকলেই সংবাদদাতা নতুন ছন্দে নাচতে সুরু করে। ২নং চিত্রে এই নৃত্যছন্দের ছবি দেওয়া হলো। এই নাচের নাম লেজ দোলানো নাচ (Tail wagging dance)। সংবাদদাতা মৌমাছি চাকের খাড়া তলে বসেই তার দেহের নিম্নাংশ ডাইনে-বাঁয়ে দ্রুত নাড়াতে নাড়াতে সোজা পথে সামনের দিকে একটু এগিয়ে যায় (২নং ছবিতে সোজা পথটি ঢেউ খেলানো ভাবে দেখানো হয়েছে, লেজ নাড়াবার ইঙ্গিত হিসাবে। আসলে পথটি একেবারে সোজা।)। তারপর মৌমাছিটি একপাশে ঘুরে প্রায় অর্ধবৃত্তাকার পথ রচনা করে ঠিক নাচ সুরু করবার বিন্দুতে ফিরে আসে। তারপর আবার পিছনের দিকটা দোলাতে দোলাতে চলবার সোজা পথটুকু পার হয়ে বিপরীত দিকে ঘুরে অর্ধবৃত্তাকার পথ রচনা করে আবার নাচ সুরু করবার বিন্দুতে ফিরে আসে। এভাবে নাচের একটি পূর্ণচক্র রচনা করা হয়। মৌমাছিটি কিন্তু থামে না—ক্রমাগত চক্র রচনা করে চলে। নৃত্যরত মৌমাছিকে অনুসরণ করবার পর কাছাকছি জায়গার মৌমাছিরা চাক থেকে খাদ্যের দিকে উড়ে যায় এবং কিছুটা পরেই খাবারের স্থানে এসে পৌঁছায়। অধ্যাপক ফ্রিশ দেখলেন, সংবাদদাতা মৌমাছির নাচের চক্র রচনার হারের সঙ্গে খাবারের দূরত্বের একটা সম্পর্ক রয়েছে; যেমন—খাদ্যের দূরত্ব ১০০ মিটার হলে মৌমাছিরা পনেরো সেকেণ্ডে দশ বার চক্র রচনা করে আর দূরত্ব ৩০০০ মিটার হলে ঐ সময়ে চক্র রচনা করে মাত্র তিনবার। এথেকে সিদ্ধান্ত হলো, সংবাদদাতা মৌমাছি পিছন দোলানো নাচ নাচলেই চাকের মৌমাছিরা বুঝতে পারে, খাবার একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে রয়েছে এবং চক্র রচনার হার থেকে তারা দূরত্ব সম্বন্ধে আরও খানিকটা নির্দেশ পায়। বৃত্তাকার নাচের মত খাদ্যসম্ভারের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে নাচের সজীবতা এবং সংবাদদাতা মৌমাছি যে ফুলের গন্ধ মেখে আসে তাও জানিয়ে দেয়, কোন্ জাতীয় ফুলের উপর গিয়ে বসতে হবে।

কিন্তু দূরত্ব জ্ঞাপনই সব কথা নয়, এমন কি—অবস্থান জানানোও প্রধান কথা নয়। খাবার কোন্ দিকে? পূব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ, ডাইন-বাঁ—কত দিকে তার অবস্থান হতে পারে। মধুর অবস্থানের নিশানা যদি জানানো না হয়, তবে মৌমাছিদের দিকে দিকে ছুটতে হবে। তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করলেন যে, সংবাদদাতা মৌমাছিরা তাদের চাক-বন্ধুদের মধুর অবস্থানের দিকের কথাও জানায়। একটা ছোট এবং সাধারণ পরীক্ষার কথা বলা যাক। পরীক্ষাটি এরকম :—

মৌচাক থেকে বেশ খানিকটা দূরে (ধরা যাক ৪০০ মিটার) একটি পাত্রে ফুলের গন্ধ মেশানো মধু বা সিরাপ রেখে দেওয়া হলো। তারপর চারটি পাত্রে খাবার না দিয়ে শুধু ফুলের গন্ধ মাখিয়ে নেওয়া হলো। পাত্র চারটির দুটিকে রাখা হলো—যে দিকে খাবার রয়েছে সেই-দিকে—একটি চাকের খুব কাছে (ধরা যাক, ৭/৮ মিটার দূরে) এবং অন্যটিকে খাবারের খুব দূরে (ধরা যাক চাক থেকে ৩৮০ মিটার দূরে)। আর বাকী দুটা রাখা হলো খাবারের বিপরীত দিকে ঐ রকম দূরত্বেই—মানে বিপরীত দিকে যথাক্রমে ৭/৮ মিটার ও ৩৮০ মিটার দূরে। দেখা গেল, খালি পাত্রগুলির মধ্যে যে পাত্রটি খাবারের দিকে এবং খাবারের কাছাকাছি, সেই পাত্রে প্রচুর মৌমাছি এসে বসেছে। যে পাত্রটি খাবারের দিকে কিন্তু

চাকের খুব কাছাকাছি, তাতেও গুটিকতক মৌমাছি বসেছে। কিন্তু বিপরীত দিকের পাত্র-গুলিতে বলতে গেলে কোন মৌমাছিই বসছে না। বোঝা গেল, সংবাদদাতা মৌমাছিরা দূরত্বের খবর তো দেয়ই, দিকের খবরও দেয়। শুধু দূরত্বের খবরই যদি দিত, তাহলে মৌমাছিরা চারদিকেই ছড়িয়ে পড়তো এবং বিপরীত দিকের পাত্রেও বহু মৌমাছি এসে বসতো।

কি করে দিকের খবর দেওয়া হয়? বহু পরীক্ষা করে যে রহস্য উদ্ঘাটিত হলো, তা পরীক্ষার রোমাঞ্চকেও ছাড়িয়ে যায়। নিরীক্ষার বর্ণনার স্থান এখানে নেই। তবে মূল সিদ্ধান্ত, যা অবিসংবাদী সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে, তা হলো এই :—

ভন ফ্রিশ লক্ষ্য করেছিলেন যে, সংবাদদাতা মৌমাছিরা পিছন দিক দোলানো নাচের সরল পথটি রচনা করবার সময় সর্বদা একই দিকে যায় না। সরল পথটি চাকের খাড়া তলের খাড়া রেখার উপর বা নীচের দিকের ডান অথবা বাঁ দিকে হতে পারে; অর্থাৎ চাকের খাড়া তলের খাড়া রেখার সঙ্গে বিভিন্ন কোণ করে পথটি রচিত হতে পারে। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, সরল পথটি খাড়া রেখার সঙ্গে যে কোণ রচনা করছে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে খাদ্যের অবস্থানের দিকের উপর। খাদ্যবস্তুর অবস্থানের দিক পরি-বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরল পথটির দিকও পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, মৌমাছিরা খাদ্যের অবস্থানের দিক ঠিক করবার জন্যে সূর্যের অবস্থানের সাহায্য নেয়। চাক থেকে খাবারের দিকে উড়ে যাবার সময় সংবাদ-দাতা মৌমাছি লক্ষ্য করে, সূর্যের দিক তার চলবার পথের দিকের সঙ্গে কত ডিগ্রী কোণ করে অবস্থান করছে, অর্থাৎ তার চলবার পথের সঙ্গে সূর্যের কৌণিক দূরত্ব কত। মৌমাছিরা চাকে ফিরে এসে চাকের খাড়া দিকের উপর সূর্যের দিকটি উপস্থাপিত করে' (খাড়া রেখার উপরের দিকটা হয় সূর্যের দিক) চলবার পথের কোণ রচনা করে নাচতে থাকে। চলবার পথটি সূর্যের অবস্থানের দিকের সঙ্গে যত ডিগ্রী কোণ রচনা করেছিল, মৌমাছি তার দেহটি চাকের খাড়া রেখার সঙ্গে তত ডিগ্রী ঘুরিয়ে শরীরের পিছন দিক দোলানো নাচের সরল পথটি রচনা করে; অর্থাৎ খাদ্য-নির্দেশক পথটি সূর্যের দিকের সঙ্গে যত ডিগ্রী কোণ রচনা করে অবস্থান করে, নাচের সরল পথটিও চাকের খাড়া রেখার সঙ্গে তত ডিগ্রী কোণ করে আত্ম-প্রকাশ করে। খাদ্য-নির্দেশক পথটি যদি সূর্যের সঙ্গে ৬৫° কোণ করে থাকে, তবে নাচের সরল পথটিও খাড়া রেখার সঙ্গে ৬৫° কোণ করবে। আর তা যদি সূর্য-নির্দেশক পথের সঙ্গে ১২০° কোণ রচনা করে, তবে নাচের সোজা পথটিও খাড়া রেখার সঙ্গে ১২০° কোণ রচনা করবে। খাদ্য-নির্দেশক পথটি যদি সোজা সূর্যের দিকে থাকে, তবে নাচের সরল পথটিও ঠিক খাড়াভাবে চলবে। ৩নং চিত্রে সমস্ত বিষয়টি পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। যে করেই হোক সংবাদদাতার চাকের বন্ধুরা এই কৌণিক রহস্য বুঝে নিয়ে চাক থেকে এমনভাবে বের হয়, যাতে তাদের উড়ে যাবার পথ সূর্য-নির্দেশক দিক রেখার সঙ্গে সংবাদ-দাতা নির্দেশিত কোণ রচনা করে। তার অর্থ হচ্ছে—তারা সোজা খাবারের দিকে উড়ে যায়। সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নাচের দিকেরও পরিবর্তন হয়। খাদ্যের অবস্থান স্থল অপরিবর্তিত থাকলেও বেলা দশটায় সংবাদদাতা মৌমাছিরা যে কোণে নাচবে, বেলা বারোটার সময় সে কোণে নাচবে না।

বিভিন্ন জাতের রকমারি মৌমাছি দেখা যায়। তাদের ভাষার মধ্যেও কি পার্থক্য আছে? অধ্যাপক ফ্রিশ দেখালেন, নানা জাতের

মৌমাছির ভাষার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যে নাচের ছন্দে ও রূপে সংবাদদাতা মৌমাছিরা খাদ্যের সঠিক অবস্থানের খবর দেয়, তা সব জাতের মৌমাছির এক রকম নয়।

ইটালীর হলদে মৌমাছি ও অষ্ট্রিয়ার কালো মৌমাছি একই গণভুক্ত দুটি প্রজাতি (Species)। চাঁপা ৪-এর মত। এই নাচের সময়েও চক্র রচনার হারের সঙ্গে দূরত্বের সম্পর্ক থাকে। ৪-এর খোলা জায়গাটি খাবারের দিকে মুখ করে থাকে। খাদ্যের দূরত্ব ৩৬-৩৭ মিটারের মত হলেই কাস্তে নাচ সুরু হয় পিছনের দিক দোলানো নাচে; কিন্তু চক্র রচনার হার থাকে
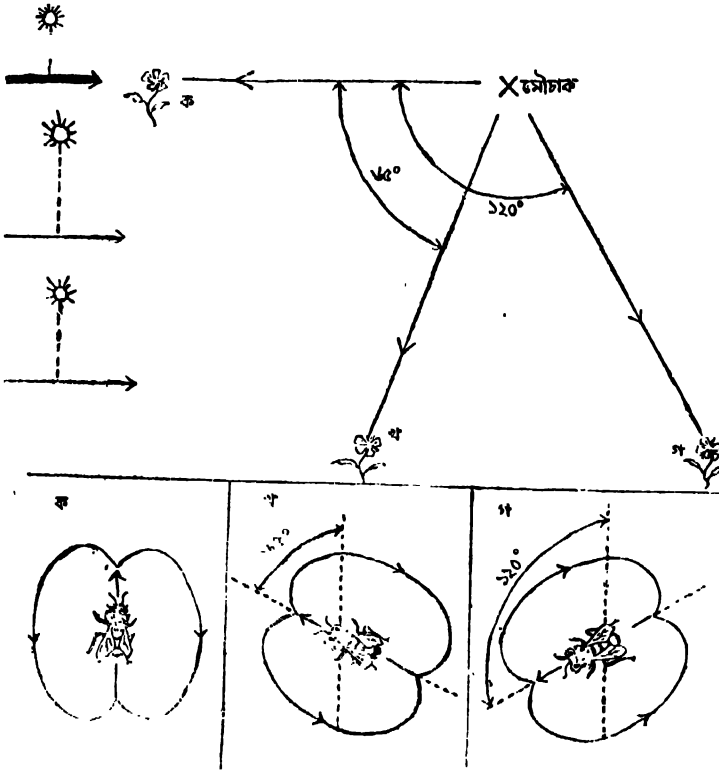
৩নং চিত্র

ইটালীর হলদে মৌমাছির নাচের তিনটি রূপ আছে। এরা অষ্ট্রিয়ার কালো মৌমাছির মত চাকের খাড়া তলেই নাচে। বৃত্তাকার নাচের সীমা হচ্ছে চাক থেকে ৯-১০ মিটারের মধ্যে; কিন্তু বৃত্তাকার নাচের সীমা পার হলেই পিছনের দিক দোলানো নাচ সুরু হয় না। সুরু হয়—যাকে বলে কাস্তে নাচ (Sickle dance—৩নং চিত্র)। নাচের পথের আকার কম। একই দূরত্ব জানাবার জন্যে ইটালীর হলদে মৌমাছি অষ্ট্রিয়ার মৌমাছিদের চেয়ে কম হারে চক্র রচনা করে।

ইটালীর হলদে মৌমাছি ও অষ্ট্রিয়ার কালো মৌমাছি এক গণভুক্ত হওয়ায় দুটি প্রজাতি মিলে বর্ণসঙ্কর মৌমাছির সৃষ্টি হতে পারে। বর্ণসঙ্কর মৌমাছিদের মধ্যে রঙের দিক থেকে যাদের দেহ ইটালীর মৌমাছির মত হলদে,

তাদের নাচের ধরণ প্রায় ইটালীয় বিশুদ্ধ হলদে মৌমাছিদের মতই। আর যাদের রং অষ্ট্রিয়ার মৌমাছিদের মত কালো, তাদের নাচের ছন্দ অনেকটা অষ্ট্রিয়ার কালো মৌমাছিদের মত।

পিছনের দিক দোলানো নাচ সুরু করে। আগেই বলেছি, অষ্ট্রিয়ার মৌমাছির বৃত্ত নাচের সীমা হচ্ছে চাক থেকে ৮৪ মিটার দূরে—এর পরেই এরা পিছনের দিক দোলানো নাচ সুরু করে। একই দূরত্ব জ্ঞাপন করতে পিছনের দিক দোলানো
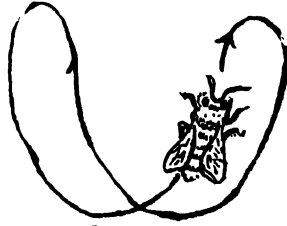
চিত্র নং-৫
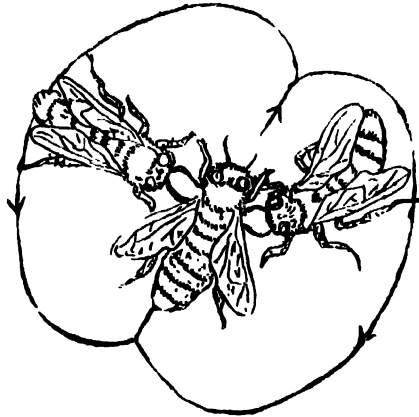
চিত্র নং-৬

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তিন জাতের মৌমাছি হলো—ভারতীয় মৌমাছি, বড় মৌমাছি (Giant honey bee) ও ক্ষুদে (Dwarf) মৌমাছি। ভারতীয় মৌমাছিদের দেখতে অনেকটা অষ্ট্রিয়ার মৌমাছির মতই এবং তাদের মতই অন্ধকারে (যেমন গাছের কোটরে) চাক বাঁধে। এরাও চাকের খাড়া তলে বৃত্ত নাচ এবং পিছনের দিক দোলানো—দুই নাচই নাচে। তবে এদের বৃত্ত নাচের সীমা চাক থেকে মাত্র তিন মিটার দূরে। খাদ্যবস্তুর দূরত্ব তিন মিটারের বেশী হলেই এরা নাচের সময় ভারতীয় মৌমাছিরা অষ্ট্রিয়ার মৌমাছিদের চেয়ে অনেক কম হারে চক্র রচনা করে।

বড় মৌমাছিরাও চাকের খাড়া তলেই নাচে এবং এরাও বৃত্ত এবং পিছনের দিক দোলানো—দু-রকম নাচই নাচে। এদের বৃত্ত নাচের সীমা হচ্ছে চাক থেকে পাঁচ মিটার দূরে। তার পরেই পিছনের দিক দোলানো নাচ সুরু করে। নাচের হার ইটালীয় মৌমাছিদের মত।

ক্ষুদে মৌমাছিরা আকারে এত ছোট যে,

সাধারণ চোখে তাদের ডানা গজানো পিঁপড়ে বলেই মনে হয়। এরা খোলা জায়গায় ছোট গাছের ডালে ছোট ছোট চাক তৈরি করে। চাকগুলি গাছ থেকে ঝুলে থাকে। চাক খোলা জায়গায় থাকায় চাক থেকে সূর্য দেখা যায়। সূর্য দেখা যায় বলে সংবাদদাতা মৌমাছি যখন নাচে, তখন সূর্যের দিকে নজর রেখেই নাচে অর্থাৎ চাকের খাড়া তলের খাড়া রেখার সঙ্গে কোণ রচনা করে নাচের প্রয়োজন হয় না। চাকের উপরের দিকের কানায় কতকগুলি মৌমাছি গাদাগাদি করে বসে তাদের দেহ দিয়ে একটি অনুভূমিক তলের সৃষ্টি করে। সংবাদদাতা মৌমাছি এমনভাবে ঘুরিয়ে নেয়, যাতে সূর্যকে ঠিক সে পাশে সে ভাবেই দেখতে পায়। কাজেই নাচের সরল পথটুকু অতিক্রম করবার সময় তার মুখ থাকে ঠিক খাদ্যের দিকে। তার চাকের বন্ধুরা নাচের সরল পথের দিকে লক্ষ্য করেই উড়ে যায় এবং খাদ্যের উৎসে এসে পৌঁছায়।

বিভিন্ন জাতির মৌমাছির বৃত্ত নাচ ও লেজ দোলানো নাচের সীমা (চিত্র নং ৪) দেখানো হয়েছে। বৃত্তচাপ দিয়ে বৃত্ত নাচের শেষ সীমা আর ঢেউ খেলানো রেখা দিয়ে লেজ দোলানো নাচ বোঝানো হয়েছে। ভারতীয় বড় এবং ক্ষুদে মৌমাছিদের লেজ দোলানো নাচ চাকের খুব কাছাকাছি থেকে সুরু হওয়ায় তারা চাকের কাছের খাদ্যের অবস্থানের খবর অনেক বেশী নির্ভুলভাবে দিতে পারে।

ভারতীয় অতিকায় ও ক্ষুদে মৌমাছি

ইটালিয় মৌমাছি

অষ্ট্রিয়ার মৌমাছি

মৌচাক X

১০-১৫ ফুট

১২০ ফুট

২৭॥ ফুট
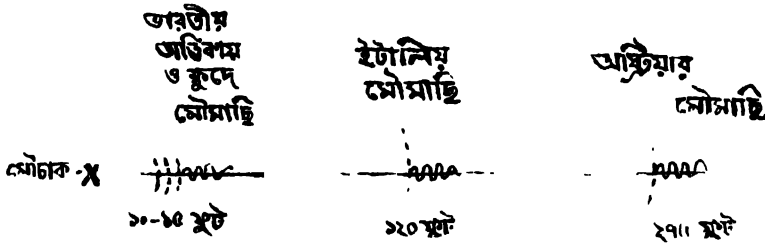
৪নং চিত্র

বৃত্ত নাচ থেকে লেজ দোলানো নাচ

খাবারের খোঁজ নিয়ে এসে তার চাকের বন্ধুদের দেহ-সৃষ্ট অনুভূমিক তলে এসে বসে এবং সেখানেই নাচতে সুরু করে। বৃত্ত নাচ এবং পিছনের দিক দোলানো নাচ—দু-রকমই নাচে। বৃত্ত নাচের সীমা চাক থেকে ৪-৫ মিটার দূরে। খাবারের দূরত্ব তার বেশী হলেই পিছন দোলানো নাচ সুরু হয়। লেজ দোলানো নাচের সময় এমন ভাবে সংবাদদাতা মৌমাছি নাচতে সুরু করে, যাতে নাচের সোজা পথটুকু সোজাসুজি খাদ্যের দিকে মুখ করে থাকে। খাদ্যের দিকে উড়ে যাবার সময় সংবাদদাতা মৌমাছি সূর্যকে যে ভাবে যে পাশে দেখে, লেজ দোলানো নাচের সরল পথটি রচনা করবার সময় দেহকে

প্রসঙ্গতঃ ট্রিগুনা (Triguna) নামে খুব ছোট এক জাতীয় হুলবিহীন মাছির কথা বলা যেতে পারে এদের সঙ্গে মৌমাছিদের সম্পর্কটা অতি দূরের। বাসার ব্যবস্থাও মৌমাছিদের মত পরিপাটি নয়। এরা কোন রকম নাচই নাচতে পারে না। যদি কোন ভ্রাম্যমান ট্রিগুনা মৌমাছি মধুগন্ধী ফুলের প্রাচুর্যের খবর পায়, তবে চাকে গিয়ে প্রবল উত্তেজনার সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে এবং ইচ্ছা করেই অন্যান্য মৌমাছিদের সঙ্গে ধাকাধাক্কি সুরু করে দেয়। তাতে চাকের মৌমাছিরা

তার গায়ের সুগন্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গন্ধের উৎসের দিকে বেরিয়ে পড়ে। প্রথমে কাছাকাছি জায়গায় খোঁজ না পেলে দূরে দূরে খোঁজের পালা চলে। তাদের না আছে দূরত্ব জানাবার ভাষা, না আছে দিক জানাবার ভাষা—যা আছে তা শুধু ধাক্কাধাক্কি করে গন্ধ জানাবার ভাষা। তাই খাদ্য দূরে থাকলে তারা একে একে এবং অতি ধীরে ধীরে সেখানে পৌঁছাতে পারে। এরা যেন মৌমাছিদের ভাষা বিবর্তনের প্রথম ধাপটি ধরে রেখেছে।

মৌমাছিদের এই যে ভাষা, তা কি জন্মসূত্রে পাওয়া? তাদের নাচ কি সহজাত বুদ্ধিপ্রসূত—না মানুষের মতই তাদের ভাষা দেখে শুনে শিখে? এই প্রশ্নের উত্তর ফ্রিশ দিয়েছেন।

তিনি কোন মৌচাক থেকে কিছুটা মৌকুঠুরী (Honey Comb) সরিয়ে নিলেন। মৌকুঠুরীগুলিতে শুধু বাচ্চা মৌমাছিরাই ছিল। বাচ্চা মৌমাছিগুলিকে ধাড়ী মৌমাছিদের কাছ থেকে সরিয়ে এনে পৃথকভাবে প্রতিপালন করা হলো। পূর্ণ এবং কর্মক্ষম অবস্থায় পৌঁছাবার পর মৌমাছিগুলিকে আবার চাকে আনা হলো। চাকে ফিরিয়ে আনবার পর মুহূর্তেই দেখা গেল, নতুন মৌমাছিগুলি তাদের জাতভাইদের নাচ শুধু পুরাপুরি বোঝাই নয়, তারা সে নৃত্যের ছন্দে নাচতেও পারে। তাদের নাচের কলাকৌশল জন্মসূত্রেই বাঁধা—তা আয়ত্ত করতে কোন রকম শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

অধ্যাপক ফ্রিশ মৌমাছির নাচের ভাষার যে বিচিত্র কথা বলেছেন, তাতে বহু বিজ্ঞানী কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং কয়েকজন বিজ্ঞানী মৌমাছির ভাষা নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। এমনি একজন বিজ্ঞানী বিশেষ কারণে কৌতূহলী হয়ে সংবাদদাতা মৌমাছির লেজ দোলানো নাচের সময় টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করেন। টেপ-রেকর্ডার মৌমাছির নাচের এক নতুন তথ্য পরিবেশন করলো। বিজ্ঞানী সবিস্ময়ে দেখলেন, সংবাদদাতা মৌমাছিরা লেজ দোলানো নাচের সরল পথটুকু রচনা করবার সময় এক বিচিত্র শব্দ উৎপন্ন করছে। ঘুরে ফিরে যতবার সোজা পথটুকু অতিক্রম করছে, ততবারই শব্দ করছে—যেন নৃত্যের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গীতের তরঙ্গ চলছে! বিজ্ঞানী ভাবলেন, এই ধ্বনির কি কোন অর্থ আছে?

খাদ্যসম্ভার চাক থেকে বিভিন্ন দূরত্বে রেখে দিয়ে পরীক্ষা সুরু করা হলো। সংবাদদাতা মৌমাছিরা যথারীতি চাকে ফিরে এসে নাচ সুরু করতেই তাদের শব্দের টেপ রেকর্ড গ্রহণ করা হলো। এভাবে শব্দের টেপ রেকর্ড করবার পর তা বিশেষ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে তার চরিত্র উদ্ঘাটন করা হলো। দেখা গেল, মৌমাছিরা লেজ দোলানো নাচের সরল পথটুকু অতিক্রম করবার সময় একটানা স্পন্দিত শব্দ করে। নাচের প্রতি চক্রেই একবার করে এরকম স্পন্দিত শব্দ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই লেজ দোলানো নাচের সময় সৃষ্টি হচ্ছে স্পন্দিত শব্দের মালা। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, শব্দের গড় স্থায়িত্বের সঙ্গে খাদ্যবস্তুর দূরত্বের একটি সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। খাদ্যের দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয়, তবে শব্দের স্থায়িত্বও মোটামুটি দ্বিগুণ হয়ে যায়। আবার দূরত্ব যদি অর্ধেক হয়, তবে শব্দের স্থায়িত্বও অর্ধেক হয়ে যায়। দূরত্ব যত বেশী, শব্দের স্থায়িত্বও তত বেশী, দূরত্ব যত কম, শব্দের স্থায়িত্বও তত কম। বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করলেন যে, সংবাদদাতা মৌমাছিরা নাচের প্রতিটি চক্রে এই শব্দ করে' তার অনুসরণকারীকে খাদ্যের দূরত্ব জ্ঞাপন করে। তাঁর মত হচ্ছে, মৌমাছিরা চাকের খাড়া রেখার সঙ্গে যে কোণ রচনা করে নাচে, তা খাদ্যবস্তুর দিক নির্ণয় করে ঠিকই, কিন্তু দূরত্ব জানাবার জন্যে তারা শব্দের সৃষ্টি করে। মৌমাছিদের ভাষা একেবারে শব্দহীন নয়।

টেপ রেকর্ড করে মৌচাকের মৌমাছিদের অন্ততঃ দশ রকম শব্দের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই শব্দের কিছু কিছু যে বিশেষ অর্থ বহন করে এবং তাদের বিশেষ বিশেষ কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, তার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

মৌচাকের কাছে কোন অনধিকারী (যেমন অন্য কোন পোকা বা পতঙ্গ) এগিয়ে এলে চাকের প্রহরী মৌমাছিরা সামনের দিকে ঝুঁকে দু-তিন সেকেণ্ড পর পর এক ধরণের শব্দ করতে থাকে। মৌচাকে ঝাঁকুনি দিলে এক সঙ্গে শত শত মৌমাছি শব্দ করে ওঠে। শত শত মৌমাছি একই সঙ্গে একই রকম শব্দ করলে তা তীক্ষ্ম ও ক্ষণস্থায়ী গুঞ্জন বলে মনে হয়। প্রহরী মৌমাছিদের এই শব্দে (সতর্ক ধ্বনি?) সাড়া দেয় কর্মী মৌমাছিরা। সমস্ত কর্মী মৌমাছি আধ সেকেণ্ড পর পর অতি মৃদু বীপ্ বীপ্ শব্দ করতে থাকে। এই মৃদু বীপ্ বীপ্ শব্দ বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলে। কর্মী মৌমাছিদের বীপ্ বীপ্ ধ্বনিতে প্রহরী মৌমাছিদের উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে আসে।

রাণী মৌমাছিরা চাকে দু-রকম শব্দ করে। একটি শব্দকে বলা হয় টুটিং (Tooting) আর একটিকে বলা হয় কোয়াকিং (Quacking)। টুটিংয়ের শব্দ প্রথমে একটানা সেকেণ্ডখানেক হয়। তারপর থেকে থেকে আরও ক্ষণ-ভাবে শব্দ হতে থাকে। টুটিংয়ের মূল শব্দের কম্পনাঙ্ক সেকেণ্ডে ৫০০-এর মত। কোয়াকিংয়ের মূল শব্দের কম্পনাঙ্ক আরও কম, তাছাড়া এতে শব্দটা বিলম্বিত হয়ে ওঠে না। মূল কথা, টুটিং ও কোয়াকিংয়ের চরিত্র ও গুণ আলাদা। রাণী মৌমাছিরা এই শব্দ দুটি তাদের পরিবেশ অনুযায়ী ব্যবহার করে।

মৌচাকের রাণী-কুঠুরীগুলিতে একসঙ্গে অনেকগুলি রাণী পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। কিন্তু একটি চাকে একসঙ্গে একটির বেশী রাণী থাকতে পারে না। একটি রাণী পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়ে সকলের আগে কুঠুরী থেকে বের হয়ে আসে। নড়াচড়ার ক্ষমতা পেলেই রাণী মৌমাছি রাণীর কুঠুরীগুলির কাছে গিয়ে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলে এবং তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বীদের হুল ফুটিয়ে হত্যা করতে সুরু করে—সবগুলি প্রতিদ্বন্দ্বীকে খতম করে ফেলতে চায়, তবে কর্মী মৌমাছিরা তা করতে দেয় না। কয়েকটি কুঠুরী তারা আগলে রাখে—রাণী মৌমাছিকে ওদিকে যেতেই দেয় না। মুক্ত রাণী তখন টুটিংয়ের শব্দ করতে থাকে। রাতদিন এই শব্দ চলতে থাকে। মৌচাকের দশ ফুট দূর থেকেও এই শব্দ শোনা যায়। এদিকে অন্যান্য রাণী মৌমাছিরা পরিপুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করে। তারা বেরিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করতে থাকে, কিন্তু কর্মী মৌমাছিরা তাদের বের হতে দেয় না। এদিকে মুক্ত রাণীর টুটিং চলতে থাকে। বন্দী রাণীরা তখন নীচু পর্দায় শব্দ করতে আরম্ভ করে—যাকে বলা হয় কোয়াকিং। কর্মী মৌমাছিরা তখন বন্দী রাণীদের মুক্ত করতে সুরু করে, তবে একটি একটি করে—একবারে সব নয়। দ্বিতীয় রাণী মুক্তি পেলেই প্রথম রাণীর সঙ্গে মরণপণ যুদ্ধ আরম্ভ করে। একটি খতম হয়ে গেলে আর একটি রাণীকে মুক্ত করা হয়, আর তার সঙ্গে হয় বিজয়িনীর যুদ্ধ। আবার একটা খতম হয়ে যায়। আবার একজন রাণীকে ছাড়া হয়। এভাবে চলতে চলতে শেষে একটি রাণী টিকে থাকে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে (অসিলেটর) টুটিং এবং কোয়াকিংয়ের অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করা সম্ভব। বন্দী রাণী মৌমাছির চাকে নকল টুটিংয়ের শব্দ করে দেখা গেছে, নকল শব্দের উত্তরে বন্দী মৌমাছিরা

কোয়াকিং শব্দ করে ওঠে। কিন্তু চাকে কোয়াকিং শব্দ করলে রাণী মৌমাছি চুপ করেই থাকে

ব্যাপারটি দাঁড়ালো এই—রাণীর শব্দ তার উপস্থিতি ঘোষণা করে এবং সেই ঘোষণা শুনতে পেয়ে বন্দী রাণীরা কোয়াকিংয়ের শব্দ করে ওঠে। টুটিং এবং কোয়কিংয়ের শব্দ শুনে কর্মীরা তাদের দৈনন্দিন কাজ সুরু করে দেয়। তাদের কাজ হলো একটি একটি করে রাণীদের মুক্ত করে দেওয়া।

কাজেই দেখা গেল, টুটিং এবং কোয়াকিংয়ের শব্দ মৌচাকে বিশেষ অর্থ বহন করে। মৌচাকে মৌমাছিরা যে সব শব্দ করে, তার অন্ততঃ কতকগুলি যখন সন্দেহাতীতভাবে অর্থবাহী, তখন তারা নাচের সময় যে শব্দ করে, তাও যে অর্থবাহী হতে পারে, সে কথা ভাবতে বাধা নেই। আর সে শব্দের স্থায়িত্বের সঙ্গে খাদ্যের দূরত্বের যখন একটা সরাসরি এবং ব্যতিক্রমহীন সম্পর্ক রয়েছে, তখন তা যে খাদ্যবস্তুর দূরত্ব জানাবার জন্যেই সংবাদদাতা মৌমাছিরা সৃষ্টি করে থাকে, তা ধরে নেওয়া যায়।

যাঁরা সংবাদদাতা মৌমাছির নৃত্যকালীন শব্দকে খাদ্যবস্তুর দূরত্বজ্ঞাপক বলে মনে করেন, তাঁদের কথা মেনে নিলেও একথা মনে রাখতে হবে, দূরত্ব জ্ঞাপনের বিষয়ে অধ্যাপক ফ্রিশ যা বলেছেন, তাও ভিত্তিহীন নয়। হয়তো নাচের চক্র রচনার হার এবং নৃত্যকালীন শব্দের স্থায়িত্ব—উভয় মিলেই দূরত্ব সম্বন্ধে পরিপূর্ণ সংবাদ দেয়।

এই শব্দ মৌমাছিরা কেমন করে সৃষ্টি করে আর কেমন করেই বা তা শুনতে পায়? শব্দের সৃষ্টি সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিতরূপে কিছু বলা সম্ভব হয় নি। প্রথমে মনে হয়েছিল, অতি দ্রুতহারে লেজ দোলাবার জন্যেই শব্দের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এখন এই ধারণা ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরীক্ষা-নির্ভর যুক্তির ভার যে দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তা হলো এই—নাচের সময় মৌমাছির ডানার কম্পনেই এই শব্দের সৃষ্টি হয়। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ডানা কেটে ছোট করলে শব্দের কম্পনাঙ্ক এবং তীব্রতা কমে যায়। ডানা কেটে যত ছোট করা যায় শব্দের গুণগত পরিবর্তনও তত বেশী হয়।

মৌমাছির শব্দানুভূতির উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, শব্দ যদি বাইরের বাতাসে করা হয়, তবে মৌমাছি সে শব্দে সাড়া দিতে পারে না। যদি অসিলেটর কর্তৃক সৃষ্ট টুটিংয়ের শব্দ চাকের সঙ্গে সংলগ্ন কোন কম্পনকের (Vibrator) মাধ্যমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, তবে বন্দী রাণী মৌমাছি তাতে সাড়া দিতে পারে। কম্পনক যদি চাকের খুব কাছে ঝুলিয়ে দেওয়া যায়, তবুও বন্দী রাণী তাতে কোন সাড়া দিতে পারে না। অসিলেটর কর্তৃক সৃষ্ট টুটিংয়ের শব্দ সম্বন্ধে রাণী মৌমাছি অচেতন থাকে। আরও অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে—যে চাকে বা অন্য যে বস্তুতে মৌমাছি দাঁড়ায়, শব্দ সরাসরিভাবে তাতে কম্পনের সৃষ্টি না করতে পারলে মৌমাছি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকে। তাই মনে হয়, মৌমাছিরা পা দিয়ে শব্দ অনুভব করে। শুধু তাই নয়, মৌমাছির শুঁড়ও যে শব্দ গ্রহণ করতে পারে, তারও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। মনে হয় সংবাদদাতা মৌমাছিরা নৃত্যরত অবস্থায় যখন শব্দ করে, তখন অনুসরণকারীরা তার বুকের দিকে শুঁড় লাগিয়ে সে শব্দ ধরে। পা ও শুঁড় দিয়ে শব্দ গ্রহণের দু-রকম ব্যবস্থা থাকলে মৌমাছিদের বিস্তর সুবিধা হবার কথা। মৌচাকে সর্বদা নানা হট্টগোল চলে। অনুসরণকারী মৌমাছিদের পায়ে সে সব গণ্ডগোল যেতেই থাকে। তাতে সংবাদদাতার পক্ষনিঃসৃত

(কণ্ঠনিঃসৃত নয়) শব্দ শুনতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাদের শুঁড় তো সংবাদদাতার দেহ ছুঁয়েই থাকে। (৬নং চিত্র)

তবে আগেই বলা হয়েছে, মৌমাছির এই নৃত্যকালীন শব্দের সব কিছু এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নি। নিঃসন্দেহে বলা যায়, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গবেষণা আরও বহু তথ্য উদ্ঘাটন করবে এবং তার ভিত্তিতে হয়তো আমরা এই শব্দের একটা সম্পূর্ণ নির্ভুল তত্ত্বের সন্ধান পাবো।

সমাজ-কল্যাণে বিজ্ঞান

শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানী সত্যের পূজারী। সৌন্দর্যের পূজারী কবির ক্ষেত্র ভাবলোক, বিজ্ঞানীর ক্ষেত্র বাস্তব জগৎ। কবি যে রূপে মুগ্ধ, বিজ্ঞানী সেই রূপকে করেন বিশ্লেষণ, জানতে চান এই রূপের অন্তরালের রহস্য, প্রমাণ করেন যে, দার্শনিক ধারণার জটিল জালে এই রহস্য আবৃত নয়। এই রহস্য শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। যে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে দার্শনিকের কাছে বিস্ময়কর ছিল, আধুনিক বিজ্ঞান সেই বিস্ময়ের সমাধান করে নিয়ম ও সংখ্যার মাধ্যমে সুসম সামঞ্জস্য এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে দূরীভূত হয়েছে শতাব্দীর কুসংস্কার, আত্মনিরোধী কূপমণ্ডুকতা ও নিরুপায় অদৃষ্টবাদিতা। ধর্মের তমসা হয়েছে অপসারিত।

বৈজ্ঞানিক কল্পনালোকে বাস করেন না। বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব পৃথিবীর কল্যাণ সাধন, মানুষের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে নিয়োগ করে জীবনযাত্রার উন্নত মান, রোগের নিরাময়তা ও দীর্ঘ জীবনের আশীর্বাদ আহরণ করা। মানব-গোষ্ঠীর সেবায় অনুপ্রাণিত হয়েই লুই পাস্তুর স্ফটিকের রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত্যাগ করে রেশমগুটির উন্নয়ন ও জলাতঙ্ক রোগের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হন। এই সমাজ-কল্যাণের চেতনাই পারমাণবিক বিস্ফোরণের আবিষ্কারক ওপেনহাইমারকে নানা বিপর্যয়ে আবর্তিত করেছিল।

বিজ্ঞানী ধর্মবিরোধী বা নাস্তিক নয়। বিশ্বের পরম সত্য অনুসন্ধানই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম। বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব তমসার মধ্যে জ্যোতির প্রকাশ। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, মানুষ যা কিছু করে বা যা কিছুর জন্যে বেঁচে থাকে, তা কারণতত্ত্বের অধীন। রক্ষণশীল মানুষের মন সাধারণতঃ তা মানতে চায় না।

যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে সমাজ-কল্যাণের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কবিগুরু মন্তব্য করেছিলেন —"যন্ত্রবিস্তার উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ বিধানের অনুকূল—প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে সুবিধা সৃষ্টি করে, তার সুচিন্তিত সদ্ব্যবহার করাই তো কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করবার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাস্ত, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন করে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। নতুন নতুন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে

আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।" (বিশ্বভারতী, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৯৩২)

প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টির জন্যে বিজ্ঞানের প্রসার প্রয়োজন। বিজ্ঞানের অনুশীলন বস্তুতান্ত্রিকতার প্রসারণ করে বলে বিতর্ক উপস্থিত করা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি ব্যতীত কোনও জাতির অর্থনৈতিক মানদণ্ডের উন্নতি হতে পারে না। ব্যবসায়িক জগতে আমেরিকার বিপুল সমৃদ্ধি এর প্রমাণ। শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্যে বিজ্ঞানের বহুমুখী প্রতিভার সাহায্য আবশ্যক। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ইউরোপ বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার কাজে অফুরন্ত সাহায্য করে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রতিদানের আশায়। তবে পুঁজিবাদী দেশের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের তুলনা করলে দেখা যায়, পুঁজিবাদী দেশগুলির সকল প্রচেষ্টাই ব্যবসায়ভিত্তিক এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের লক্ষ্য দেশহিতকরী। দরিদ্র, অনুন্নত দেশে ভবিষ্যৎ সুফলের আশা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যয়সঙ্কোচের প্রশ্ন আসে। সেই কারণে কোনও অভূতপূর্ব নতুন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থনিয়োগ যুক্তিসঙ্গত নয়—বরং যে বিষয়ে তাৎপর্য প্রমাণিত, সেই সব বিষয়ে অর্থব্যয় বিধেয়। আমেরিকা কিংবা ইউরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জের সমতুলনায় পরমাণু-বিজ্ঞান অথবা মহাকাশে অভিযান-উদ্যোগের গবেষণায় অর্থব্যয় আমাদের দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। উন্নত দেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ জ্ঞান আহরণ করে দেশের বৈজ্ঞানিকদের সাহায্যে কার্যকরী করতে পারলে ব্যয় সংক্ষেপ হয়।

সীমিত আয়ে ন্যায্য হিসাব ও সুবিবেচনায় দেশের নিজস্ব সম্পদ অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরিচালনায় উপযুক্ত শিল্পে নিযুক্ত করে এমনই শিল্পসম্ভার উৎপাদন প্রয়োজন, যা প্রচুর পরিমাণে দেশ-বিদেশের বিপণীতে গ্রহণযোগ্য। এই ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হলে অর্থব্যয় অপরিহার্য। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা যতদিন না হয়, ততদিন কোন দূরপ্রসারী ব্যয়বহুল গবেষণা কিংবা বেশী মূলধন-নির্ভর দীর্ঘমেয়াদী ভারী শিল্পে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। একথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানী জ্ঞানের উপাসক। ব্যবসায়িক প্রয়োজন ভিন্নও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক আকর্ষণীয় ক্ষেত্র আছে। বৈজ্ঞানিক যখন প্রকৃতির রূপ জানতে চেষ্টা করেন, বিশ্বের অগণিত অলিখিত আইনকে রূপ দেবার সাধনা করেন, সেই গবেষণায় আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ বা ব্যবসায়িক প্রয়োজন মেটে না। আবার দেশরক্ষার ভিত্তিতে যে বিষয়ে গবেষণা সকল স্বাধীন দেশেই আদৃত হয়, তার ফলে অর্থনৈতিক সুসার হয় না। যতদিন না মানুষের মনোভাব অহিংস-ধর্মে অনুপ্রাণিত হবে, মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে, পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংসের ভীতি থেকে রাষ্ট্রসকল ত্রাণ পাবে, ততদিন দেশরক্ষার প্রচেষ্টায় অর্থব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে। জ্ঞানভাণ্ডারের আদান-প্রদানের দ্বারাই সমগ্র বিশ্বে সুসমঞ্জস এক সামাজিক বোধ ও বিশ্বমানবপ্রীতি স্থাপন সম্ভব। এই মননের ধারা স্থাপিত হলে দেশরক্ষার ভিত্তিতে যে প্রচুর অর্থ উপস্থিত ব্যয় হয়, তা লোকহিতকর কার্যে নিয়োগ করা সম্ভব হবে।

কোন্ গবেষণার সাহায্যে জাতি ও সমাজের কতটা কল্যাণ সাধন হবে অর্থাৎ গবেষণায় অর্থব্যয়ের বিনিময়ে দেশের বিশেষ উপকার কি সাধিত হবে, তার নির্দেশ পূর্বেই বিবেচনা বিধেয়। গবেষণার ক্ষেত্র সুনির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ফলিত গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন আবিষ্কার অথবা পুরাতন আবিষ্কারের উপর নতুন আলোকপাতের প্রভাব জনগণের বিশেষ কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করা যাবে কি না,

পূর্বাহ্নে তা নির্ণয় সর্বদা সম্ভব নয়। ডায়নামো আবিষ্কারের কাজে ফ্যারাডে বিজ্ঞানের ঔৎসুক্য নিয়েই অগ্রসর হয়েছিলেন, ব্যবসায়গত মূল্যমানের বোধ বা ধারণা তখন তাঁর ছিল না। অতএব বৈজ্ঞানিকের কার্য-সামর্থ্য নির্ণয় করেই গবেষণার জন্যে অর্থ-সাহায্য নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানীর লভ্যাংশ শিল্পের উন্নতিকল্পে গবেষণার ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে, যাতে শিল্পের সম্প্রসারণ হয় এবং স্বাস্থ্য, শ্রী রক্ষা ও খাদ্য সংগ্রহের সুব্যবস্থার পন্থা উদ্ভাবিত হয়।

আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, জনগণের স্থূল প্রয়োজন মেটানো এবং খাদ্য, আশ্রয়, শিক্ষা ও জীবিকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। দেশ দরিদ্র, শিল্প-বাণিজ্য অনুন্নত, আধুনিক শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, লোকসংখ্যার অনুপাতে দেশে খাদ্য-উৎপাদনও কম। বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সব অভাবই দূর করা সম্ভব। গত বিশ বছর পাঁচশালা পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা চলেছে। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাথেকে কৃষির জন্যে জলসেচের ব্যবস্থারও কিঞ্চিৎ সুব্যবস্থা হয়েছে। জমির ফলনশক্তি বৃদ্ধির জন্যে রাসায়নিক কৃষিসারের কারখানাও স্থাপিত হয়েছে। যন্ত্রপাতি তৈরির জন্যে লোহার প্রয়োজন। লৌহ ও ইস্পাতের উৎপাদনও বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সাধারণের জীবনযাত্রার মানও কিছু উন্নত হয়েছে। শনৈঃ শনৈঃ যেমন পর্বত লঙ্ঘন সম্ভব, আশা করা যায়, বিজ্ঞানের দৌলতে সর্ব-বিষয়েই আমাদের দেশ ক্রমশঃ উন্নত হবে। কিন্তু প্রগতিশীল জগতে স্থান পেতে হলে যত শীঘ্র অগ্রসর হওয়া উচিত, সামর্থ্যের অভাবে তা হওয়া সম্ভব নয়। তবে আগ্রহ ও উদ্যম থাকলে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ পঙ্গুও অতিক্রম করতে পারে। বাধা দুরতিক্রম্য হলেও অনতিক্রম্য নয়—সুব্যবস্থা ও দূরদৃষ্টিসাপেক্ষ।

প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ ও বৈজ্ঞানিক নামকরণ

রমেন দেবনাথ

জলে, স্থলে, আকাশে, বাতাসে—সর্বত্রই প্রাণীর অস্তিত্ব বিদ্যমান। সতত সঞ্চরমান এই যে প্রাণী—এরা সংখ্যায় যেমন অগণিত, বিস্তারেও তেমনি অসীম। পৃথিবীর লোকসংখ্যার তুলনায় এদের সংখ্যা শত সহস্র গুণ বেশী। এককোষী আদ্যপ্রাণী থেকে সুরু করে বহুকোষী স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত এদের অনেক বিভাগ আছে এবং প্রত্যেক বিভাগে বহুসংখ্যক প্রাণী আছে। এই প্রাণীরা আবার ভিন্ন ভিন্ন গণ (Genus) এবং প্রজাতিতে (Species) বিভক্ত। একই প্রাণীর বহুসংখ্যক গণ এবং প্রজাতি থাকে। মশা বললে সাধারণতঃ আমরা এক রকম মশাকেই বুঝি; কিন্তু মশারও একাধিক গণ (কিউলেক্স, অ্যানোফিলিস ইত্যাদি) এবং প্রত্যেক গণের অন্তর্গত অনেক প্রজাতি আছে। প্রজাপতির ভিতর শুধু একরকমের প্রজাপতিই নেই—এদেরও বহু গণ এবং প্রজাতি আছে। অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও তাই। বিজ্ঞানীদের মতে অমেরুদণ্ডী এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে ৯৯ লক্ষেরও বেশী প্রজাতি আছে। একটি প্রজাতির অন্তর্গত প্রাণীদের সংখ্যা অগণিত। পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতি শুধুমাত্র একটি প্রজাতির অন্তর্গত

—তাহলে ২৯ লক্ষ প্রজাতির অন্তর্গত প্রাণীর সংখ্যা যে কত হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। এই অসংখ্য প্রাণীদের সম্পর্কে কিছু জানতে হলে যা প্রথমে দরকার—তা হলো এদের শ্রেণীবিভাগ। এমন বিশৃঙ্খলভাবে এরা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যে, শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি ছাড়া এদের চেনা খুবই কঠিন। শ্রেণীবিভাগের ফলে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বের করা যায় এবং প্রাথমিক প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ফলেই যে নানা রকম উন্নত ধরণের প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে, তারও একটা হদিস পাওয়া যায়। এই শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি থেকেই জীবজন্তুর বৈজ্ঞানিক নামকরণ সম্পর্কেও জানা যায়।

শ্রেণীবিভাগের ইতিহাস

জীববিদ্যার জনক অ্যারিষ্টটল সর্বপ্রথম প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেন। তিনি প্রাণীদের দুই ভাগে ভাগ করেন—মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী। মেরুদণ্ডী প্রাণীকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

(১) জরায়ুজ (Viviparous)—অর্থাৎ যারা বাচ্চা প্রসব করে; যেমন—স্তন্যপায়ী প্রাণী।

(২) ডিম্বজ (Oviparous)—অর্থাৎ যাদের জন্ম ডিম থেকে হয়; যেমন—মাছ, উভচর, সরীসৃপ এবং পাখী।

অ্যারিষ্টটলের পর জীবজগতের শ্রেণীবিভাগের কাজে হাত দেন জন রে। প্রজাতি (Species) সম্পর্কে সর্বপ্রথম তিনিই ধারণা করেন এবং প্রজাতি নামটি তাঁরই দেওয়া।

জীবজগতের উন্নত ধরণের শ্রেণীবিভাগ এবং এদের বৈজ্ঞানিক নামকরণের জন্যে আজকের বিজ্ঞানী সমাজ যাঁর কাছে ঋণী—তিনি হলেন সুইডেনের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস। লিনিয়াসের শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি অনুসরণ করেই বর্তমান জীবজন্তুর নামকরণ এবং শ্রেণীবিভাগ হয়ে থাকে। এজন্যে লিনিয়াসকে শ্রেণীবিভাগের জনক বলা হয়।

আধুনিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অনেক পর্ব এবং শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

শ্রেণীবিভাগের প্রধান উপকরণ—প্রজাতি

প্রজাতি (Species) হচ্ছে অনেকগুলি একরকম প্রাণীর সমষ্টি—যাদের আকৃতি এবং প্রকৃতিমূলক লক্ষণগুলি একই—যারা একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত। যাদের মধ্যে পারস্পরিক যৌন-সম্বন্ধ আছে এবং যাদের ক্রোমোসোম-সংখ্যা একই। বাঘ আর সিংহ ভিন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত—কারণ এদের আকৃতিগত লক্ষণ এক নয়, এদের ভিতর যৌন-সম্বন্ধ নেই এবং এদের ক্রোমোসোম-সংখ্যাও ভিন্ন। সমগ্র মানবজাতি একই প্রজাতির অন্তর্গত—তাদের আকৃতি মূলতঃ একই—তাদের ভিতর পারস্পরিক যৌন-সম্পর্ক আছে এবং সমগ্র মানুষের ক্রোমোসোম-সংখ্যা একই অর্থাৎ ৪৬। জন রে সর্বপ্রথম প্রজাতি সম্পর্কে ধারণা করেন এবং প্রজাতির উপর নির্ভর করেই শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করেন। প্রজাতি হলো শ্রেণীবিভাগের প্রধান উপকরণ বা মূল ভিত্তি। জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ এই প্রজাতি থেকেই সুরু হয় এবং স্তরে স্তরে অগ্রসর হয়ে সর্বশেষ বিভাগে গিয়ে শেষ হয়।

শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি এবং শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন স্তর

গঠনমূলক সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য—এই দুটি লক্ষণের উপর নির্ভর করেই প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এছাড়া শারীরবৃত্ত (Physiology), সুপ্রজননবিদ্যা (Genetics), কোষবিদ্যা (Cytology), প্রত্নজীববিদ্যা (Palaeontology), ভ্রূণবিদ্যা (Embryology)—প্রভৃতির উপরও নির্ভর করতে

হয়। শ্রেণীবিভাগের ফলে প্রাণীদের অনেকগুলি স্তরে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে সাতটি হলো প্রধান স্তর এবং এই স্তরের বিন্যাস লিনিয়াসই করে গেছেন। স্তরগুলির নাম নীচে দেওয়া হলো—

রাজ্য (Kingdom)
পর্ব (Phylum)
শ্রেণী (Class)
বর্গ (Order)
গোত্র (Family)
গণ (Genus)
প্রজাতি (Species)

কতকগুলি প্রজাতি মিলে তৈরি হয় একটি গণ, অনেকগুলি গণ মিলে তৈরি করে গোত্র, গোত্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় বর্গ, অনেকগুলি বর্গের সমষ্টিতে তৈরি হয় শ্রেণী, শ্রেণীর সমষ্টিতে হয় পর্ব এবং সমস্ত পর্ব মিলে তৈরি হয় প্রাণীরাজ্য। সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা—এরা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। কিন্তু এই তিনটি প্রজাতি মিলে তৈরি হয় একটি গণ। এই তিনটি প্রজাতি যেমন একই গণের অন্তর্ভুক্ত, তেমনি কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি অন্য আর একটি গণের অন্তর্গত। এই ভাবে অনেকগুলি গণ মিলে তৈরি হয় একটি গোত্র এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, চিতা, শিয়াল, ভালুক, নেকড়ে, ভোঁদড় ইত্যাদি মাংসাশী প্রাণীর বিভিন্ন গোত্র মিলে তৈরি হয় মাংসাশী প্রাণীর বর্গ (Carnivora)।

আবার মাংসভুক, পতঙ্গভুক (Insectivora), তীক্ষ্ণদন্তী প্রাণী (Rodentia) খুরওয়ালা প্রাণী (Lengulata), শুঁড়ওয়ালা প্রাণী (Proboscidea), মানুষ, শিম্পাঞ্জী, গরিলাজাতীয় প্রাণী (Primate)—ইত্যাদি অনেক বর্গ মিলে তৈরি হয় স্তন্যপায়ী প্রাণীর শ্রেণী। স্তন্যপায়ী পাখী, সরীসৃপ, উভচর, মৎস্য ইত্যাদি শ্রেণীর সমষ্টিতে তৈরি হয় কর্ডাটা পর্ব (Phylum chordata)। কর্ডাটা, অ্যামিবাজাতীয় আদ্যপ্রাণী (Protozoa), কেঁচোজাতীয় অঙ্গুরীমাল প্রাণী (Annelida), চিংড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা ইত্যাদি জাতীয় সন্ধিপদ প্রাণী (Arthropoda)—এসব প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন পর্ব মিলে তৈরি হয় প্রাণীরাজ্যের। নীচে মানুষ এবং আণুবীক্ষণিক ম্যালেরিয়া জীবাণুর বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হলো।

মানুষ

রাজ্য—প্রাণী
পর্ব—কর্ডাটা
শ্রেণী—স্তন্যপায়ী (Mammal)
বর্গ—প্রাইমেট (Primate)
গোত্র—হোমিনিডি (Hominidae)
গণ—হোমো (Homo)
প্রজাতি—সেপিয়েন্স (Sapiens)

ম্যালেরিয়া জীবাণু

রাজ্য—প্রাণী
পর্ব—আদ্যপ্রাণী (Protozoa)
শ্রেণী—স্পোরোজোয়া (Sporozoa)
বর্গ—হিমোস্পোরিডিয়া (Hæmosporidea)
গোত্র—প্লাজ্‌মোডিডি (Plasmodidae)
গণ—প্লাজ্‌মোডিয়াম (Plasmodium)
প্রজাতি—ভাইভেক্স (Vivex)

প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামকরণ

আমাদের সকলেরই একাধিক নাম থাকে—ডাক নাম ও রাশ নাম। কিন্তু নাম যাই থাক, সে নামেই আমরা সর্বত্র পরিচিত। একবার নামকরণ হয়ে গেলে সেই নাম আর পাল্টাবার দরকার হয় না। কোন ব্যক্তি পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ালেও তার নাম অপরিবর্তিতই থেকে যায়। কিন্তু জীবজন্তুর

বেলায় তা নয়। একই প্রাণীর এক এক জায়গায় পৃথক পৃথক নাম ; কারণ স্থানীয় নাম ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের জাতীয় পাখীর (National Bird) নাম বাংলাদেশে ময়ুর, বিহার প্রদেশে মোর, উত্তর প্রদেশে মঞ্জুর, ইউরোপে পি-কক Pea-cock), আবার হয়তো জার্মেনী, ফ্রান্সে অন্য স্থানীয় নাম।

কিন্তু আসলে পাখী একটিই। একই প্রাণীর এই রকম বিভিন্ন স্থানীয় নাম থাকায় কোন নির্দিষ্ট প্রাণীকে স্থানীয় নামে সকলের পক্ষে চেনা খুবই মুস্কিল। সুতরাং প্রাণীর এমন একটি নাম রাখা দরকার, যে নামে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাণীটিকে চেনা যায়। লিনিয়াস ঐ রকম নাম চালু করেন। তিনি ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন—তা হলো দ্বিনামবিশিষ্ট নামকরণ (Binomial nomenclature) ; অর্থাৎ যে কোন একটি প্রাণীর দুটি নাম থাকবে, একটি হলো গণ-নাম (Generic name) এবং অন্যটি প্রজাতি-নাম (Specific name)। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম হলো—হোমো সেপিয়েন্স (Homo sapiens), ময়ুরের নাম পেভো ক্রিষ্টেটাস (Pava cristatus) ; এস্থলে হোমো এবং পেভো হচ্ছে যথাক্রমে মানুষ এবং ময়ুরের গণ-নাম ; আর সেপিয়েন্স ও ক্রিষ্টেটাস হচ্ছে এদের প্রজাতি নাম। এই ভাবে দুটি নাম নিয়ে প্রাণীদের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করা হয়। সেজন্যে এই ধরণের নামকরণকে দ্বিনামবিশিষ্ট নামকরণ বলা হয়। সুতরাং ময়ুর বা অন্য যে কোন প্রাণী ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় নামে পরিচিত হলেও এদের বৈজ্ঞানিক নাম একটিই এবং সেই নামেই প্রাণীটি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক প্রাণিবিদ্যা মহাসভা (International Congress of Zoology) জীবজন্তুর বৈজ্ঞানিক নামকরণের জন্যে একটি স্থায়ী নামকরণ কমিটি গঠন করেন। লিনিয়াসের নামকরণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে ঐ কমিটি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জীবজন্তুর নামকরণের জন্যে কতকগুলি নিয়মকানুন প্রবর্তন করে। নিম্নে কয়েকটি নিয়ম দেওয়া হলো।

১। প্রাণীদের দ্বিনাম-বিশিষ্ট নামকরণ হবে।

২। প্রাণীদের নামকরণ ল্যাটিন বা ল্যাটিনাইজ্‌ড্‌ ভাষায় হবে।

৩। গণ-নাম এক বচনের বিশেষ্য শব্দের হওয়া উচিত এবং ইংরেজী বড় হাতের অক্ষর দিয়ে তা আরম্ভ করতে হবে।

৪। প্রজাতি-নাম এক বা একাধিক শব্দেরও হতে পারে, তবে তা গণ-শব্দের বিশেষণ হতে হবে এবং নামের আদ্য অক্ষর ইংরেজী ছোট হাতের হবে।

৫। কোন ক্ষেত্রেই দুটি গণের এক নাম হবে না।

৬। কোন প্রাণীর একবার নামকরণ হয়ে গেলে, সেই নাম আর পাল্টানো যাবে না (অবশ্য নামকরণ পদ্ধতি যদি ঠিক থাকে)। একে নামকরণের অগ্রাধিকার নিয়ম (Law of priority) বলা হয়।

প্রাণিজগৎ অনেকগুলি পর্ব নিয়ে তৈরি, তার মধ্যে দশটি পর্বই প্রধান। বিবর্তন অনুযায়ী পর্বগুলি সাজালে সমস্ত প্রাণিজগৎকে একটি বিশাল বৃক্ষের মত মনে হয়। বৃক্ষের প্রধান কাণ্ড থেকে যেমন বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এবং তাথেকে পাতা বেরোয়—তেমনি প্রাণীরাজ্য, পর্ব, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা এবং পাতা (প্রজাতি) দিয়ে তৈরি।

পৃথিবীতে যত রকমের প্রাণী আছে, তার চার ভাগের তিন ভাগই সন্ধিপদ প্রাণীদের দ্বারা ভর্তি। সন্ধিপদ প্রাণীর মধ্যে আবার সবচেয়ে

বেশী সংখ্যা হলো পতঙ্গের। কীট-পতঙ্গের ভিতর আবার সংখ্যার দিক দিয়ে প্রথম স্থান হলো গুবরেপোকা, কাচপোকা ইত্যাদি কঠিন-পক্ষ পতঙ্গ বা বীট্‌লের এবং দ্বিতীয় স্থান হলো প্রজাপতির। শুনতে অবাক লাগে যে, শুধুমাত্র বীট্‌ল্‌-এর প্রজাতির সংখ্যাই হচ্ছে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীর (সন্ধিপদ প্রাণী ছাড়া) প্রজাতির চেয়ে অনেক বেশী।

হিমায়ন-পদ্ধতি

মিহিরকুমার কুণ্ডু

বিগত কয়েক দশকের মধ্যে হিমায়ন বা নিম্ন তাপমাত্রা[১] উৎপাদন পদ্ধতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ক্ষেপণাস্ত্র ও রকেটে তরল অক্সিজেন ও তরল নাইট্রোজেনের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে এত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বায়ু আজকাল অনেক বেশী পরিমাণে তরলিত করা হচ্ছে। তরল বায়ু থেকে তরল অক্সিজেন ও তরল নাইট্রোজেনও অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পৃথক করা সম্ভব হচ্ছে। মহাকাশ-বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে তরল হাইড্রোজেনের উৎপাদনও অবিশ্বাস্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, আর বৃদ্ধি পেয়েছে তরল হিলিয়ামের ব্যবহার। তাছাড়া তরল হাইড্রোজেন, তরল হিলিয়াম প্রভৃতি অনেক সহজে ও সুলভে পরিবহন করা সম্ভব। বস্তুতঃ পরিবহনের সুবিধার জন্যে প্রাকৃতিক গ্যাসও (মূলতঃ মিথেন) তরল করা হচ্ছে। হিমায়ন-পদ্ধতির বিপুল সম্ভাবনার বিষয় বহুদিন ধরেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এর ফলে অত্যল্প তাপমাত্রা উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতির কলা-কৌশল ও তাপরোধক ক্ষমতার বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে। যথা—

পদার্থ থেকে তাপনিষ্কাশন ক্ষমতার উপর তাপমাত্রার হ্রাস নির্ভরশীল। ৭টি উপায়ে তাপ নিষ্কাশন করা যেতে পারে।

(১) জল বা বরফে লবণ মিশ্রিতকরণ

(২) পেলটিয়ার পদ্ধতির প্রয়োগ

(৩) উপশোষণজনিত শৈত্যের সদ্ব্যবহার

(৪) তাপনিরোধক অবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্রের অপসারণ

(৫) তরল পদার্থের বাষ্পীভবন (কাসকেড পদ্ধতি)

(৬) জুল-টমসন নীতির প্রয়োগ (লিণ্ডে এবং হ্যাম্পসন শিল্পে প্রথম রূপায়িত করেন)।

(৭) তাপনিরোধক অবস্থায় গ্যাসের প্রসরণ ও প্রসারিত গ্যাসের সাহায্যে কার্য সম্পাদন (ক্লড পদ্ধতি)

১নং পদ্ধতির সাহায্যে হিমমিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে তাপমাত্রা -৬৫° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

২নং পদ্ধতি বিজ্ঞানী পেলটিয়ারের অনুসন্ধানের ফল। পেলটিয়ার লক্ষ্য করেন, তড়িৎ-প্রবাহ কোন সন্ধিস্থল দিয়ে বিসমাথ থেকে অ্যান্টিমনি ধাতুর দিকে প্রবাহিত হলে সন্ধিস্থলটি কিছু শীতল হয়।

দেখা গেছে, চারকোল অনেক গ্যাস উপশোষণ করে। চাপ হ্রাস করলে এই উপ-

১। আলোচ্য প্রবন্ধে তাপমাত্রা বলতে -১৩০° সেন্টিগ্রেড বা -২০০° ফারেনহাইট অপেক্ষা নিম্নের তাপমাত্রা বোঝাবে।

শোষিত গ্যাস চারকোল থেকে নির্গত হয়। গ্যাস নির্গমনের সময় তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। শৈত্য উৎপাদনে ৩নং পদ্ধতি এই পর্যবেক্ষণের ফল। বস্তুতঃ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে এফ. সাইমন এই পদ্ধতি প্রয়োগে সামান্য পরিমাণ হিলিয়াম তরল করতে সক্ষম হন।

৪নং পদ্ধতি অর্থাৎ তাপনিরোধক অবস্থায় চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারণ করে অত্যল্প তাপমাত্রা উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা পি. ডেবাই এবং ডাবলিউ. এফ. জিয়াগ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ব্যক্ত করেন। পদার্থের অণুগুলি যথেচ্ছ বিচরণ করতে চায়। অণুগুলির এই বিশৃঙ্খলভাবে বিচরণ করবার প্রবণতাকে বিজ্ঞানীরা এনট্রপির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। যথেচ্ছ বিচরণ করবার প্রবণতা যার যত বেশী, তার এনট্রপিও তত বেশী। চুম্বকধর্মী পদার্থের এনট্রপি আবার দ্বিবিধ কারণে হতে পারে—আংশিক অণুসমূহের গতিশক্তিজনিত আর আংশিক এদের চৌম্বক ধর্মের দরুণ। এখন পদার্থটিকে যদি কোন চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত করা যায়, তাহলে চৌম্বক ধর্মের দরুণ এর অণুগুলি সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হবে; ফলে পদার্থটির এনট্রপি হ্রাস পাবে। এবার পদার্থটিকে তাপনিরোধক পাত্রে স্থাপন করে চৌম্বক ক্ষেত্র সরিয়ে নেওয়া হলো। ফলে পদার্থের চৌম্বক ধর্মজনিত এনট্রপি বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তাপনিরোধক অবস্থায় পদার্থের সামগ্রিক এনট্রপির কোন পরিবর্তন হবে না। স্বভাবতঃই পদার্থের গতিশক্তিজনিত এনট্রপি হ্রাস পাবে। কিন্তু গতিশক্তি আবার অণুগুলির তাপমাত্রার সমানুপাতিক। ফলে তাপমাত্রা হ্রাস পাবে। চৌম্বক ধর্মজনিত এনট্রপির ভূমিকা কেবলমাত্র নিম্ন তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য। এই জন্যে চৌম্বক-ধর্মী পদার্থ প্রথমে তরল হিলিয়ামের সাহায্যে প্রায় ১° কেলভিনে[২] শীতল করা হয়। সামান্য পরিমাণ গ্যাসের সাহায্যে তরল হিলিয়াম ও পদার্থের মধ্যে তাপীয় সংযোগ রক্ষিত হয়। অতঃপর উচ্চ শক্তিসম্পন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়। উৎপন্ন তাপ পরিবেষ্টনকারী গ্যাসের সাহায্যে সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর পদার্থটিকে তাপ নিরুদ্ধ করে চৌম্বক ক্ষেত্র অপসারিত করা হয়। এইভাবে তাপমাত্রা ০.০২° থেকে ০.০১° কেলভিন পর্যন্ত হ্রাস করা যায়।

১-৩নং পদ্ধতির মধ্যে কোনটাই শিল্প-পদ্ধতির উপযুক্ত নয়। ৪নং পদ্ধতির সাহায্যে যদিও তাপমাত্রা প্রায় পরম শূন্য পর্যন্ত হ্রাস করা যায়, তথাপি তা শুধু গবেষণার পক্ষে উপযোগী।

নিম্ন তাপমাত্রা উৎপাদনকল্পে বস্তুতঃ ৫ ও ৭নং পদ্ধতি শিল্পে প্রচলিত। ৫নং পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে ১ম তরলটি (যার স্ফুটনাঙ্ক নিম্নতম), যে পদার্থকে হিমায়িত করতে হবে, তাথেকে তাপ নিষ্কাশন করে স্বয়ং বাষ্পীভূত হয়। এই নিষ্কাশিত তাপ আবার ১ম তরলটি ২য় তরলকে (যার স্ফুটনাঙ্ক ১ম তরল থেকে বেশী, কিন্তু ৩য় তরল থেকে কম) প্রদান করে স্বয়ং আবার শীতল হয়। হিমায়ন-ক্ষম পদার্থ থেকে তাপ এইভাবে এক তরল থেকে অন্য তরলে বাহিত হতে থাকে এবং অবশেষে উচ্চতম স্ফুটনাঙ্কের তরলে পৌঁছায়। উচ্চতম স্ফুটনাঙ্কের তরলটি আবার শোষিত তাপ জল বা বাতাসে ছেড়ে দিয়ে পূর্বেকার শীতল অবস্থায় ফিরে আসে। হিমায়নক্ষম পদার্থ থেকে তাপ-নিষ্কাশন প্রক্রিয়া এইভাবে বারংবার চলতে থাকে। গ্যাস তরলীকরণের এই পদ্ধতি কাস্কেড পদ্ধতি নামে পরিচিত। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আর. পিকটেট সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেন। পদ্ধতিটির সাহায্যে তাপমাত্রা -২১০° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব। বায়ু (স্ফুটনাঙ্ক -১৯৩° সেন্টিগ্রেড) ও প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন,

---

২। ০ কেলভিন (K)—২৭৩+°সেন্টিগ্রেড (C)

স্ফুটনাঙ্ক -১৬১'৩° সেণ্টিগ্রেড) তরলিত করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৬নং পদ্ধতি বিজ্ঞানী জুল ও উইলিয়াম টমসনের গবেষণার পরিণতি। ১৮৫২ ও উইলিয়াম টমসন (পরবর্তী কালে লর্ড কেলভিন নামে সমধিক খ্যাত) লক্ষ্য করেন, উচ্চ চাপে পিষ্ট গ্যাসকে যদি কোন সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে নিম্ন চাপে প্রসারিত করা যায়, তাহলে গ্যাসটি কিছু শীতল হয়। এই শৈত্যের পরিমাণ খুবই সামান্য ; যথা—বায়ুর ক্ষেত্রে জুল-টমসন শৈত্যের পরিমাণ (° সেণ্টিগ্রেডে)

$$\frac{\text{চাপের পার্থক্য}}{৪} \times \left(\frac{২৭৩}{T}\right)^{২}$$

T—প্রসরণের প্রাক্কালে গ্যাসের পরম তাপমাত্রা

চাপ, বায়ুচাপে মাপা হয়। ১ বায়ুচাপ =১৪'৭ পাউণ্ড প্রতি বর্গইঞ্চিতে

মনে করা যাক, প্রসরণের প্রাক্কালে বায়ুর তাপমাত্রা=0°C বা ২৭৩°K

প্রসরণের প্রাক্কালে বায়ুর চাপ =১০০ বায়ুচাপ

প্রসরণের পরে বায়ুর চাপ=১ বায়ুচাপ

$$\therefore \text{শৈত্যের পরিমাণ} \quad \frac{১০০-১}{৪} \times \left(\frac{২৭৩}{২৭৩}\right)^{২}$$

$$=২৪'৭৫°C$$

তাহলে দেখা যাচ্ছে ১০০ বায়ুচাপ থেকে ১ বায়ুচাপে প্রসরণের ফলে বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় মাত্র ২৪'৭৫°C, কিন্তু বায়ু তরল করতে হলে তাপমাত্রা -১৯৩°C-এর কম হতে হবে। স্পষ্টতঃই এই তাপমাত্রার হ্রাস বায়ুকে তরলিত করতে যথেষ্ট নয়। কিন্তু এই শৈত্যের প্রভাব পুঞ্জীভূত করা যেতে পারে। এর জন্যে প্রয়োজন উপযুক্ত তাপবিনিময়কারী যন্ত্রের। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—কোন তামার নলের মধ্য দিয়ে উচ্চ চাপসম্পন্ন গ্যাস প্রবাহের সময় এই শীতল বায়ু যদি নলের বহির্ভাগ দিয়ে পাঠানো যায়, তাহলে অভ্যন্তরস্থ উচ্চ চাপে পিষ্ট বায়ু বা গ্যাস প্রসরণের পূর্বেই শীতল হবে। অতঃপর সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রসরণের ফলে জুল-টমসন শৈত্য প্রভাবে তা আরও শীতল হবে। বহুবার এই প্রক্রিয়ার পুনরাবর্তন করা যেতে পারে। এই ভাবে অবশেষে গ্যাস এত শীতল হবে যে, তা তরলিত হতে আরম্ভ করবে। এই প্রক্রিয়ার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রসরণের পূর্বেই গ্যাস ক্রমান্বয়ে অধিকতর শীতল হতে থাকে। ফলে জুল-টমসন প্রভাবজনিত শৈত্যের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। জার্মেনীর লিণ্ডে এবং ইংল্যাণ্ডের হাম্পসন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এইভাবে বায়ুকে তরলিত করেন। বায়ু প্রথমে ধূলাবালি প্রভৃতি অপদ্রব্য থেকে বিশুদ্ধ করে ২০০ বায়ুচাপে সঙ্কুচিত করা হয়। সঙ্কোচনের ফলে উৎপন্ন তাপ ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে অপসারিত করা হয়। উচ্চ চাপসম্পন্ন বায়ু থেকে এর পর জলকণা ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিদূরিত করে বায়ুকে কোন সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রসারিত করা হয়। এর ফলে বায়ু শীতল হয়। এই শীতল বায়ু এর পর নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নবাগত বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়। ফলে নবাগত বায়ু প্রসরণের পূর্বে শীতল হয়। অতঃপর প্রসরণের ফলে জুল-টমসন শৈত্য প্রভাবে অধিকতর শীতল হয়। এই প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। পরিশেষে বায়ুর তাপমাত্রা এত হ্রাস পায় যে, তা তরলে পরিণত হয়।

সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপে প্রসারিত হলে গ্যাস শীতল হয়। কিন্তু কেন? এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উচ্চ চাপে পিষ্ট গ্যাসীয় অণুগুলি পরস্পর খুব সন্নিকটে থাকে, ফলে এদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু নিম্নচাপে প্রসরণের কালে গ্যাসীয় অণুগুলি পরস্পর বহু দূরে সরে যায়। স্বভাবতঃই এই আকর্ষণী শক্তির ব্যূহ অতিক্রম

করতে কিছু শক্তি ব্যয়িত হয়। এই শক্তি অণুগুলি পায় গ্যাসের গতিশক্তি থেকে। কিন্তু গ্যাসীয় অণুর গতিশক্তি গ্যাসের তাপমাত্রার সঙ্গে সমানুপাতিক। সুতরাং গ্যাসের গতিশক্তি হ্রাসের সঙ্গে এর তাপমাত্রাও হ্রাস পায় এবং তার ফলে গ্যাস শীতল হয়।

জুল-টমসন নীতির প্রয়োগে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের ন্যায় গ্যাসও তরলিত করা যায়। এদের উপর জুল-টমসন নীতির প্রথম প্রয়োগ কিন্তু ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় জুল-টমসন প্রসরণে এগুলি অত্যন্ত বিচিত্র ব্যবহার করে। শীতল হওয়া দূরে থাক, বরং ঈষৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা দেখলেন, এদের অণুগুলির পরস্পরের মধ্যে টান প্রায় নগণ্য। এদের মধ্যে বৈরীভাবই প্রবল, ফলে একে অপরকে ক্রমশঃ দূরে ঠেলে দিতে চায়। এই বাধা দুরতিক্রমণীয় মনে হলেও মৌলিক নয়। জুল-টনসন প্রসরণের পূর্বেই হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামকে যদি যথাক্রমে ১৯৩° K ও ৩৫° K তাপমাত্রায় শীতল করা যায়, তাহলে এদের আপাত অস্বাভাবিক ব্যবহার স্বাভাবিক হয়। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের এই প্রাক-শীতলীকরণ যথাক্রমে তরল বায়ু (স্ফুটনাঙ্ক ৮০° K) এবং তরল হাইড্রোজেনের (স্ফুটনাঙ্ক ২০° K) সাহায্যে করা হয়। লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউটসনে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ডেওয়ার সর্বপ্রথম এইভাবে হাইড্রোজেন তরলিত করেন। পরে ট্যাভার্স ডেওয়ার উদ্ভাবিত যন্ত্রের উন্নতিসাধন করে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রেজেন তরলিত করেন। পরবর্তী কালে নার্নস্ট, ক্যামেরলিং, ওনস্, মাইসনার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা হাইড্রোজেন তরলীকরণ যন্ত্রের অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে প্রাক-শীতলিত করে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ক্যামেরলিং, ওনস্ জুল-টমসন শৈত্যপ্রভাবে হিলিয়াম তরলিত করেন। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের ন্যায় গ্যাস তরলিত করতে একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে, গ্যাস যেন অবাঞ্ছিত পদার্থ, যথা—জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। তা না হলে প্রয়োজনীয় নিম্ন তাপমাত্রায় এগুলি জমে গিয়ে গ্যাসের প্রবহন বিঘ্নিত করতে পারে ; বিশেষতঃ প্রসরণ ভাল্বের মুখ বন্ধ হয়ে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন প্রভৃতি পদার্থ রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগে সহজে বিদূরিত করা যায়। কিন্তু নাইট্রোজেন অপসারিত করা একটি দুরূহ সমস্যা। এটা অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় গ্যাস, সুতরাং রাসায়নিক পদ্ধতি এখানে অসহায়।

ক্যাপিৎসা কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন খুব সুন্দরভাবে দূর করা যায়। গ্যাস প্রথমে পর্যায়ক্রমে দুটি তাপ-বিনিময়কারী প্রকোষ্ঠ ও দুটি তরল বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে শীতল করা হয়। এরপর এই শীতল গ্যাস সরাসরি তরল হাইড্রোজেনের (যদি হিমায়নক্ষম গ্যাসটি হাইড্রোজেন হয়) মধ্যে পাঠানো হয়। কিন্তু হিমায়নক্ষম গ্যাসটি যদি হিলিয়াম হয়, তাহলে শীতল গ্যাস সরাসরি তরল হিলিয়ামের মধ্যে পাঠানো হয়। ফলে গ্যাস তরলিত হয় এবং সমপরিমাণ হাইড্রোজেন (অথবা হিলিয়াম) বাষ্পীভূত হয়। তরল হাইড্রোজেন বা হিলিয়ামের সঙ্গে অবাঞ্ছিত পদার্থও জমে যায়, এদের পৃথক করে নেওয়া হয়। বাষ্পীভূত হাইড্রোজেন বা হিলিয়াম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। একে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ায় শীতল করে প্রায় ১৫০ বায়ুচাপে জুল-টমসন নীতির প্রয়োগে প্রসারিত করা হয় এবং এভাবে তা তরলিত হয়। ক্যাপিৎসার পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে প্রথমবার বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন (বা হিলিয়াম) ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু প্রক্রিয়া একবার

চালু হয়ে গেলে সাধারণ হাইড্রোজেন অনায়াসে ব্যবহার করা যায়।

৭নং পদ্ধতি সর্বশেষে আলোচিত হলেও এটি সম্ভবতঃ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট। এই পদ্ধতিতে তাপমাত্রার হ্রাস দুই ভাবে করা হয়। প্রথমতঃ উচ্চচাপে পিষ্ট গ্যাস (প্রায় ২০০ বায়ুচাপ) কোন তাপনিরোধক পাত্রে (যে পাত্র থেকে তাপ বাইরে যেতে পারে না বা যে পাত্রে তাপ বাইরে থেকে ভিতরে আসতে পারে না) প্রসারিত করা হয় এবং অতঃপর প্রসারিত গ্যাসের সাহায্যে কোন কাজ করানো হয়, যেমন—কোন পিস্টন চালিত করা হয়। বাইরে থেকে কোন তাপ আসতে না পারায় গ্যাসের প্রসরণজনিত এবং কৃত কার্যের দরুণ প্রয়োজনীয় শক্তি গ্যাসের গতিশক্তি থেকে ব্যয়িত হয়। ফলে গ্যাসের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। কার্যক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে আগত গ্যাসকে দুটি পথে প্রবাহিত করা হয়। এর মধ্যে একটি পথে ধাবিত গ্যাস উল্লিখিত উপায়ে শীতল করা হয়। অতঃপর এই শীতল গ্যাস দ্বিতীয় পথে ধাবিত গ্যাসকে শীতল করে। এভাবে শীতলিত দ্বিতীয় পথে ধাবিত গ্যাস জুল-টমসন নীতির প্রয়োগে প্রসারিত করা হয়। ফলে গ্যাসটি আরো শীতল হয়। এই প্রক্রিয়া কয়েকবার পুনরাবৃত্ত হলে গ্যাস অবশেষে তরল হতে আরম্ভ করে। এই পদ্ধতির একটি বিশেষ সুবিধা এই যে, গ্যাসের প্রাথমিক তাপমাত্রা কম এবং গ্যাসটি উচ্চ চাপ-সম্পন্ন হওয়ায় এর উপর জুল-টমসন শৈত্যের প্রভাবও অধিকতর কার্যকরী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্লড এই পদ্ধতি প্রথম শিল্পে রূপায়িত করেন। এই জন্যে পদ্ধতিটি ক্লড পদ্ধতি নামেও প্ররিচিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে সকল গ্যাসই তরল করা যায়।

বিজ্ঞানীদের সুদীর্ঘ, অক্লান্ত গবেষণার ফলে হিমায়ন-পদ্ধতি আজ অনেক উন্নত হয়েছে এবং তার ফলে আজকাল অনেক সমস্যার সহজ সমাধান সম্ভব হয়েছে। অত্যুচ্চ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি এখন আর কোন সমস্যাই নয়। কম উদ্বায়ী গ্যাসে পূর্ণ কোন পাত্র অপেক্ষাকৃত বেশী উদ্বায়ী তরলিত গ্যাস দিয়ে পরিবেষ্টন করলে পাত্রের অভ্যন্তরস্থ গ্যাস জমে কঠিন হয়ে যায় এবং উচ্চ ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হয়। অভ্যন্তরস্থ গ্যাস বায়ু হলে হিমায়করূপে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করা যেতে পারে। চারকোল ব্যবহার করে প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যোপযোগী করা যেতে পারে। চারকোলের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে, এই বস্তুটি বিভিন্ন গ্যাস অন্তর্ধারণ করতে পারে এবং তাপ-মাত্রা যত কম হয় এই অন্তর্ধৃতির ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ চারকোল প্রয়োগে এবং হিমায়ক-রূপে তরল হাইড্রোজেন ব্যবহার করে ০·০০০০০৫৮ মিলিমিটার চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন গ্যাস বিশুদ্ধ ও বিশোধিত করতেও তরল বায়ু ব্যবহার করা হয়। ক্যালরিমিতিতেও তরল গ্যাস প্রযুক্ত হয়েছে। এধরণের ক্যালরি-মিটারের একটি সুবিধা এই যে, অতি সামান্য তাপমাত্রা বৃদ্ধিতেও প্রচুর গ্যাস নির্গত হয়, ফলে অতি নগণ্য তাপ, যেমন—০·০০৩ ক্যালরি[৩] পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব। তরল গ্যাসের সাহায্যে অকল্পনীয় নিম্ন তাপমাত্রার উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় গবেষণার এক বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এত নিম্ন তাপমাত্রায় পদার্থের ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফল হয়েছে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আশ্চর্যের বিষয়, জীবকোষ, জীবাণু ও বীজের কর্মক্ষমতার উপর এত নিম্ন তাপমাত্রার কোন প্রভাব নেই। এদের কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকে, যদিও সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

৩। ১ গ্রাম ভরসম্পন্ন জলের তাপমাত্রা ১° সেন্টিগ্রেড (বস্তুতঃ ১৪·৭° থেকে ১৫·৭° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত) বৃদ্ধি করতে যে পরিমাণ তাপ প্রয়োজন, সেই পরিমাণ তাপকে ১ ক্যালরি বলা হয়।

তাপমাত্রা স্বাভাবিক হলে পুনরায় কর্মচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। অথচ অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপ-মাত্রা এদের পক্ষে মারাত্মক।

মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে, মানুষের কল্যাণ সাধনে, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের দান অপরিসীম। কিন্তু এখানেই বিজ্ঞানের কল্যাণ-শক্তি নিঃশেষিত নয়। অতীতের সাফল্য ভবিষ্যতের বৃহত্তর সাফল্য সাধনের এক আন্তরিক অনুপ্রেরণা, এক দৃঢ় সংকল্পের দ্যোতনা মাত্র।

সঞ্চয়ন

হোভারক্র্যাফ্‌ট কৌশলের বিভিন্ন প্রয়োগ

জলে ও স্থলে সাবলীল গতিতে চলতে পারে, এমন একটি যানের কথা চৌদ্দ বছর আগে বৃটেনের ক্রিষ্টোফার ককেরেল নামে এক ব্যক্তির মাথায় আসে। এই ঘটনাটি বর্তমানের হোভার-ক্র্যাফ্‌ট নামে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে।

বৃটেন ও পৃথিবীর অন্যত্র এই 'এয়ার-কুশন ভেহিকল'-এর উন্নয়ন অব্যাহত গতিতে চলেছে। আশা করা যায়, এর উন্নয়ন আরও বহু বছর ধরে চলবে—কেন না, এই নতুন ধরণের পরিবহন ব্যবস্থা নতুন চিন্তার জন্ম দিয়েছে।

হোভারক্র্যাফ্‌টের একটি বড় সুবিধার দিক হলো এই যে, এই যানের তলায় যে বায়ুর ঝালর ব্যবহৃত হয়, তার ঘর্ষণজনিত বাধা অন্য যে কোন স্থানে ব্যবহৃত চাকার ঘর্ষণজনিত বাধার তুলনায় নগণ্য। এজন্তেই যানটির এগিয়ে যেতে খুব কম শক্তিই ব্যয়িত হয়।

যাত্রীবহন ও ফেরীর উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে বৃটেন ১২৫ টন ওজনের একটি হোভার লাইনার তৈরির প্ল্যান করেছে। হাল্কা ধাতুতে তৈরি ও জলের জেট চালিত একটি ১০০০ টন যানের কথাও বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করছেন।

এয়ার-কুশনের কৌশল ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করছেন। তাঁরা একটি হোভার ট্রেন তৈরির কথা চিন্তা করছেন, যা ঘণ্টায় ৩০০ মাইল বেগে ছুটতে পারবে।

সম্প্রতি লণ্ডনে একটি ষ্টোরের দর্শকদের এমন আরামকেদারায় বসতে দেওয়া হয়, যা বাতাসের পর্দার উপর ভর করে চলাফেরা করতে পারে। গ্লাসগোর ন্যাশন্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং লেবরেটরি এর জন্মদাতা। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'এয়ার-বিয়ারিং'। লেদ, মিলিং ও গ্রাইণ্ডিং মেসিন ও অন্যান্য মেসিন টুলে তাঁরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করছেন। এয়ার-বিয়ারিং যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে তাদের দীর্ঘস্থায়ী করে।

এয়ার-কুশন পদ্ধতির আর এক প্রয়োগ—হোভার বেড। লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অব অর্থো-পিডিক্স-এর ডাক্তারেরা দেখেছেন, আগুনে পুড়ে গেছে, এমন রোগীকে গরম বাতাসের কুশনে ভাসিয়ে রাখা যায়। এতে রোগীর ক্ষতস্থান শুধু দ্রুত আরোগ্য লাভই করে না, রোগী ড্রেসিং-এর কষ্ট থেকেও অব্যাহতি পায়।

স্থলপথে ভারী মাল বহন করা সব দেশেই এক সমস্যা। বিশেষ বিশেষ রাস্তা ছাড়া ভারী মালসহ যান চলাচল সম্ভব হয় না। সেতুগুলিকেও এই উদ্দেশ্যে বিশেষ মজবুত করে তৈরি করতে

হয়। এতে বহু টাকা ব্যয় হয়ে যায়। হোভারক্র্যাফ্ট পদ্ধতি এই সমস্যার সমাধান করেছে।

নতুন ধরণের বৃটিশ পরিবহন, যাকে বলা যায় রাস্তার হোভারক্র্যাফ্ট, সেতুগুলি উড়ে পার হয়ে যায়।

ভিকার্স কোম্পানি এই ধরণের এই প্রথম পরিবহন যানটি তৈরি করেন সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি জেনারেটিং বোর্ডের ভারী ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের জন্যে। ৪৮ চাকার ট্রেলারটিকে একটি রবার ঝালরের উপর বসানো হয়, ঠিক যেমন করা হয় হোভারক্র্যাফ্টের বেলায়। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬০ হাজার পাউণ্ড।

যখন কোন মালবাহী যান এরূপ সেতুর কাছে আসে, যা ভারী মাল বহনে সক্ষম নয়, তখন তার সঙ্গে একটি ঝালর যুক্ত করা হয় এবং চারটি রোল্স্ রয়েস ইঞ্জিন ও কমপ্রেসর থেকে তাতে বাতাস ভর্তি করে দেওয়া হয়। এতে যে এয়ার-কুশন তৈরি হয় তা চাকা থেকে চাপ সরিয়ে নেয় ও অনেক বেশী জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। গাড়ীটি অতি সহজেই সেতু পার হয়ে যায় এবং তখন ঝালরটি আবার খুলে নেওয়া হয়।

এই ভাবে অপেক্ষাকৃত কম মজবুত সেতুও অনেক বেশী মালের চাপ সহ্য করতে পারে। যেমন, যে সেতু সাধারণভাবে ১১০ টন পর্যন্ত মালের ভার সহনে সক্ষম এয়ার-কুশনযুক্ত ২১৫ টন ওজনের ট্রেলার তার উপর দিয়ে চলে গেলে সেতুর কোন ক্ষতি হয় না।

জীবাণুবাহক কীট-পতঙ্গের বিরুদ্ধে অভিযান

সুবিধা পেলেই মশা, মাছি, উকুন, ছারপোকা, আরশোলা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ মানুষকে দংশন করতে ছাড়ে না। বড় বড় জন্তু-জানোয়ারের তুলনায় এরাই হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। এরাই তাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করে থাকে। জন্তুটি যত বড়, ক্ষতির আশঙ্কাও তাথেকে ততখানি কম; যেমন—হাতীর সঙ্গে মশা, মাছি, ছারপোকা, উকুন, আরশোলার তুলনা করলে দেখা যায়, হাতী মানুষ মারে খুব কমই। এই বিশালকায় জন্তুটি মানুষকে ভয় পায়। কিন্তু পোকা-মাকড়ের জন্যে সমগ্র পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ মানুষ যে মারা যায়, তার কোন হিসাব-নিকাশ নেই। এরা মানুষকে ভয় পায় না; এরা হচ্ছে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, প্লেগ, ডেঙ্গুজ্বর এবং এমন বহু রোগের বাহন, যে সকল রোগের নামই এখন পর্যন্ত জানা যায় নি।

এদের জন্যে মৃত্যুর হার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের দেশসমূহে সবচেয়ে বেশী হলেও কীট-পতঙ্গবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যে নেই, তা নয়। যেমন আমেরিকার নিউজার্সি রাজ্যে ১৯৫৯ সালে এক প্রকার ঘুমরোগ দেখা দেয় ও বিশেষ আতঙ্কের সঞ্চার করে। এক ধরণের দুষ্প্রাপ্য মশাই ছিল এই রোগের কারণ। এনসেফালাইটিস রোগে ঐ বছরে ২৪৩১ জন আক্রান্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই সংখ্যা হয়তো অনেকখানি অসম্পূর্ণ।

আমেরিকার বহু এলাকায়ই আর এক ধরণের কীট-পতঙ্গবাহিত মারাত্মক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে। একে বলা হয় রকিমাউন্টেন স্পটেড ফিভার, এতে প্রবল জ্বর হয়। এই জ্বরের বীজাণুর বাহক হলো ছারপোকা ও নানা-ধরণের এঁটুলি।

এই এঁটুলির কামড়ে পোলিওর মত এক প্রকার রোগ হয়। এতে পোলিও রোগের মতই অঙ্গবিশেষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকেরা অনেক সময়েই এই দুই

প্রকার পক্ষাঘাত রোগ সম্পর্কে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। এঁটুলির দংশনে যে পক্ষাঘাত রোগ দেখা দেয়, তা ঐ পোকাটি সরিয়ে নেবার পরেই সেরে যায়। ঐ পোকার দংশনে জ্বরও হয়ে থাকে। আমেরিকায় এই জ্বরকে বলা হয় কলোরাডো টিক্ ফিভার।

কীট-পতঙ্গের দংশনে মৃত্যুর খবর মিশরের জনৈক সম্রাটের কবরের উপর লিপিবদ্ধ আছে। তা ৪৭০০ বছর আগেকার কথা। তারও আগে কীট-পতঙ্গের দংশনে কারোর মৃত্যু ঘটেছে কি না, তার কোন ইতিহাস নেই। মিশরের ঐ সম্রাট ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। জাহাজ থেকে নামবার সময় একটি ভীমরুল তাকে আক্রমণ করে ও তার গায়ে হুল ফুটিয়ে দেয়। হুল ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের মৃত্যু ঘটে।

মৌমাছির হুলের বিষাক্ততা সাপের কামড়ের চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু মৌমাছির হুলে বিষের পরিমাণ তুলনায় অনেক কম। তারও জ্বালা হয়, তবে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটে না। মৌমাছি যারা পালন করেন, তারা মৌমাছির ২০০টি দংশনও সহ্য করতে পারেন। কিন্তু কোন কোন লোকের পক্ষে সামান্য কয়েকটি দংশনও মারাত্মক হতে পারে। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ক ডিরেক্টর ডাঃ ডব্লিউ-বোয়ের এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই সকল কীট-পতঙ্গের কামড় বা হুল ফোটানোর মধ্যে যে বিষ থাকে, সেই বিষক্রিয়ায়ই যে তাদের মৃত্যু ঘটে, তা নয়, বরং ঐ বিষের মধ্যে যে প্রোটিন রয়েছে, তা এলার্জিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

এই প্রতিক্রিয়া মৌমাছি ছাড়া মাছি এবং আফ্রিকার এক ধরণের রক্তভোজী পোকাও আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকার কামড়েও হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এসম্পর্কে যারা খুবই স্পর্শকাতর, তাদের জন্যে চিকিৎসকেরা কয়েকটি ওষুধের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রতিষেধক ওষুধ ঐ সব কীট-পতঙ্গ বা তাদের বিষ থেকে তৈরি হয়ে থাকে। তাদের ঐ ওষুধের ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। ফলে সেই দংশিত স্থানটুকু অসাড় হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে কামড়ালেও তেমন ভয় থাকে না। যারা এই বিষয়ে এলার্জিক, তারা একটি কামড়ে তো অস্থির হয়ে পড়েনই এবং কয়েক মাস পরে কামড়ালেও হাঁপানি রোগে ভুগতে পারেন অথবা শকে তাঁদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

কোন কোন চিকিৎসক বলেছেন যে, এই প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করেন না যে, কীট-পতঙ্গের দংশনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই কারণেই মৃত্যু ঘটে। ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গের হুল অতি ক্ষুদ্র, তার জন্যেই এসব ক্ষেত্রে তাদের দংশনের উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে চিকিৎসকেরা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হবার দরুণ বা অন্য কারণে মৃত্যু ঘটেছে বলে রায় দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে কীট-পতঙ্গবাহিত রোগ এবং তাদের দংশনের ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। তবে কীট-পতঙ্গ একেবারে নিশ্চিহ্ন না করলে তাদের দংশন বা হুল ফোটানো থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এও তো অসম্ভব। সুতরাং মানুষের এক্ষেত্রে কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির বাহন হচ্ছে নানা ধরণের রক্তশোষক জীব। মশা, মাছির মাধ্যমে এই সকল সংক্রামক ব্যাধির প্রসার ঘটে থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাই এই সকল রোগের আক্রমণ ও প্রসার রোধ করবার প্রধান উপায়।

বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি সাম্প্রতিক অধ্যায়ঃ কোয়াসার

অত্রি মুখোপাধ্যায়

[এই পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে অগাষ্ট মাসের ভিতরে রচিত। গ্রন্থপঞ্জীগুলিতে অনেক স্থানে তৈরি হচ্ছে বা ছাপা হচ্ছে, এমন নিবন্ধেরও উল্লেখ আছে। যাতে তৈরি হবার সময়টি ধরা যায়, তার জন্যে এসব উল্লেখের পাশে সেই নিবন্ধটিরও উল্লেখ করা হলো, যার মধ্যে এসব নিবন্ধের অল্পবিস্তর বর্ণনা পাওয়া গেছে। আরেকটি কথা, প্রদত্ত গ্রন্থপঞ্জীকে পাঠক বাহুল্য বলে মনে করবেন না, কারণ কোয়াসার সম্পর্কে এত বেশী এবং এত বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে যে, সৎ প্রমাণপঞ্জীর উল্লেখের অভাবে কোন জিনিষই গ্রাহ্য বলে মনে করা চলে না।]

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানে যে সব আবিষ্কার হয়েছে, সম্ভবতঃ কোয়াসার সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ, বৈপ্লবিক এবং ইঙ্গিতবহ। একদিকে এই সকল মহাকাশচারীর আবিষ্কার যেমন জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণায় সন্দেহ আরোপ করেছে, স্থিরতত্ত্বের মূলে হেনেছে প্রবল অভিঘাত, তেমনি অপর দিকে এর রহস্যের অন্তরালে বয়ে এনেছে বিশ্ববিজ্ঞানের দুরূহতম রহস্যের মীমাংসার আশ্বাস। সাম্প্রতিক (১৯৬০)[১] এই আবিষ্কার তাত্ত্বিক অপেক্ষবাদবিশারদ গোষ্ঠী, জ্যোতিঃ-পদার্থ-বিজ্ঞানী মহল এবং পৃথিবীর প্রখ্যাত পর্যবেক্ষণাগারগুলিতে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। বর্তমান প্রবন্ধে কোয়াসার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার একটি মোটামুটি পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হবে।

বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যতিকরণ পদ্ধতির অনুপ্রবেশের ফলে মহাকাশে বেতার উৎসগুলির স্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য হয়েছে। দার্শ দূরেক্ষণ যন্ত্রে বিশ্লেষণ সংক্রান্ত অসুবিধাগুলি বেতার দূরেক্ষণেও বর্তমান থাকায় এবং দার্শ দূরেক্ষণের বিশ্লেষণী-ক্ষমতার সমতুল ক্ষমতা বেতার দূরেক্ষণে লাভ করবার অসম্ভাব্যতায় সাধারণতঃ বেতার দূরেক্ষণের ব্যবহার ততটা ফলপ্রসূ হয় নি। ব্যতিকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি বেতার দূরেক্ষণ কাজে লাগিয়ে এই অসুবিধা যে শুধু দূরীভূত হয়েছে তাই নয়, মহাকাশ সংক্রান্ত অনেক রহস্যের নিষ্পত্তিও হয়েছে। এই পদ্ধতির ফলে মহাকাশে বেতার উৎসের অবস্থান চাপের ১″-৩″ পর্যন্ত সূক্ষ্মতার সঙ্গে পরিমিত হয়েছে।

এই সব বেতার উৎস সংক্রান্ত গবেষণার সুবিধার্থে প্রথমে স-স্থান এই সব উৎসকে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং এই তালিকাই উত্তরসূরীদের পথ দেখিয়ে থাকে। বেতার-ব্যতিকরণ দূরবীক্ষণের সাহায্যে কেম্ব্রিজের মুলার্ড বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরে রাইল, অ্যাডগি, স্যাকস্যাফ্ট্, ম্যাক আদাম, বলডুইন, আর্চার ও বেনেট কর্তৃক সম্পাদিত ৪৭০টি উৎসের তালিকা ৩সি[২,৩] বেতার প্রভব গবেষণায় প্রভূত উপকার সাধন করেছে। উত্তর গোলার্ধের এই ৩সি তালিকা ছাড়াও সম্প্রতি ৫০০০ প্রভব নিয়ে ৪সি তালিকা[৪,৫] পিলকিংগটন, স্কট এবং গাওয়ের দ্বারা সঙ্কলিত হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। দক্ষিণ গোলার্ধে সিডনীস্থিত কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল

রিসার্চ অর্গ্যানিজেশনের ২১০ফুট ঘূর্ণনক্ষম বেতার দূরেক্ষণের সাহায্যে মিল্‌স, স্লী, হিল প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দ্বারা সঙ্কলিত ২২১০টি প্রভবের[৬,৭,৮] এবং বোল্‌টন, গার্ডনার এবং ম্যাককে সম্পাদিত আরো কিছু প্রভবের তালিকা[৯] প্রস্তুত হয়েছে। প্যাসাডেনায় ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির (ক্যালটেক) মফেট ও মল্‌টবি কৃত সি টি এ তালিকা[১০] এবং জড্রেল ব্যাঙ্কে নাফিল্ড্‌ রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি অবজার্ভেটরীর অ্যালেন, অ্যাণ্ডারসন, কনওয়ে, পামার, রেডিশ ও রওসানকৃত নিরীক্ষাগুলিও[১১] উল্লেখযোগ্য।

বেতার প্রভবগুলির অবস্থান নির্ণয়ের পরের ধাপ বিভিন্ন মানমন্দিরে রক্ষিত অ্যামেরিকান ন্যাশন্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি স্কাই সার্ভের উপরে এদের অবস্থান সূচিত করা। মাউন্ট প্যালোমারে ৪৮ ইঞ্চি স্মিথ ক্যামেরার সাহায্যে কৃত এই সার্ভে উত্তর বিষুবলম্ব-৩৩° পর্যন্ত সমস্ত আকাশ জুড়ে করা। ৯৪০ জোড়া ফটোপ্লেট আছে। একটি লাল আলোয় অপরটি নীলে।[১২]

বেতার প্রভবের সঙ্গে উক্ত সার্ভের কোন জ্যোতিষ্কের অবস্থান সাযুজ্য পাওয়া গেলে দ্রষ্টব্য অংশটুকু সম্পর্কে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বেতার প্রভব সম্পর্কে পূর্ণ ধারণার পক্ষে শেষোক্ত অনুসন্ধান অপরিহার্য। বেতার প্রভবগুলির কোন বিশেষ দার্শ বৈশিষ্ট্যের সম্ভাবনার জন্যেই শুধু নয়, প্রভবগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের প্রয়োজনই এই অনুসন্ধানে গুরুত্ব আরোপ করবে। প্রভবগুলির পরম দ্যুতি ও আড়াআড়ি আকৃতিও এই দূরত্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করা যায় না। বেতার বিজ্ঞান প্রভূত পরিমাণে উন্নতি লাভ করলেও বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই শৈশব অবস্থায় এসব জানবার পথ খুব নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে নি। পারমাণবিক উদ্‌যান বিকিরিত ভ্যান ডু হাল্‌স্‌ট-২১ সেমি বর্ণালীরেখার ডপ্‌লার অপসরণ তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিমাপযোগ্য বলে মনে হতে পারে, কিন্তু বেতার অঞ্চলের এই উজ্জ্বলতম রেখাটিকে পর্যন্ত দূরতর নীহারিকার ক্ষেত্রে পাওয়া দুষ্কর। বেতার বর্ণালীর অন্য কোন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম নেই, পরিবর্তে যার ব্যবহার সমান ফল দান করে। এই বিচারে দার্শ অংশটুকু সম্পর্কে অনুসন্ধান অত্যাবশ্যক।

সাথী দৃশ্যাংশটুকুর অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার বর্ণালী গ্রহণ। কখনো কখনো এর জ্যোতি এত ক্ষীণ যে, বর্ণালী গ্রহণের জন্যে ২০০ ইঞ্চি দূরেক্ষণ ব্যবহার সত্ত্বেও কয়েক ঘণ্টার জন্যে প্লেটে আলোক সম্পাতের প্রয়োজন হয়। অতঃপর বর্ণালীরেখার লাল অপসরণ নির্ণয় করা সহজসাধ্য।

পূর্বোক্ত সনাক্তকরণে একটি ত্রুটি অত্যন্ত মারাত্মক। প্রভবগুলি সঠিক বা সঙ্কীর্ণ ভুলের মধ্যে নির্ণীত না হলে যে কোন মুহূর্তে ভুল সনাক্তকরণের সম্ভাবনা। বেতার ব্যতিকরণ দূরেক্ষণ প্রভবগুলির অবস্থান ১″-৩″ পর্যন্ত সঠিকভাবে নির্ণয়ে সাহায্য করেছে। সবচেয়ে ভাল বেতার দূরেক্ষণে যে ক্ষেত্র সীমিত করে, তার বিস্তৃতির মধ্যে কয়েক শত জ্যোতিষ্ক থাকতে পারে, কিন্তু বেতার ব্যতিকরণ দূরেক্ষণের এই সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা কম হওয়ায় সনাক্তকরণ প্রায়শঃই নির্ভুল হয়ে থাকে।

কিছুদিন পূর্বে অবস্থান সংক্রান্ত নির্ভুলতা মোটামুটি চাপের ০′.৫ থেকে ২′-এর মধ্যে ছিল। অবস্থান নির্ণয়ের দ্বারা যে ক্ষেত্র সীমিত হলো, তাতে দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কটি যদি বিশেষ ধরণের অদ্ভুত ব্যবহার প্রদর্শন না করে, তাহলে প্রায় ক্ষেত্রেই বিতর্কাতীত সনাক্তকরণ সম্ভব হয় না। নির্ভুলতার মান উন্নয়নের প্রয়োজনে কয়েক শত উজ্জ্বলতর প্রভবের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের পরিমাপের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। ব্যতিকরণ

পদ্ধতি অনুসরণ করে কেম্ব্রিজের শ্রীমতী ক্লার্ক[১৩] এবং ক্যালিফোর্নিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির গবেষক গোষ্ঠী[১৪,১৫,১৬] মোটামুটি বিষুবাংশের ±১০" এবং বিষুবলম্বের ±১০"-৪০"-এর মত নির্ভুলতা লাভ করতে পেরেছেন। ম্যানচেস্টারের রয়াল রেডার এস্টাব্লিশমেন্টের অ্যাডগি সম্প্রতি ১০০টি প্রভবের অবস্থান কয়েক ইঞ্চি চাপের নির্ভুলতাসহ নির্ণয় করেছেন।[১৭] এসব ক্ষেত্রে সনাক্ত প্রায় নির্ভুলই হয়েছে।

পুর্বোল্লিখিত কলাকৌশলের সুক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণসহ উন্নতি সাধন করে একটি মাত্র বেতার দুরেক্ষণের দ্বারা চন্দ্র কর্তৃক সমাবৃত প্রভবগুলির অবস্থান নিখুঁতভাবে নির্ণীত হওয়া সম্ভব। বেতার তরঙ্গের পক্ষে চন্দ্রের কিনারা সুনির্দিষ্ট হিসেবে ব্যবহার করায় যে কোন আপতিত তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের অপবর্তন ঘটে। বেতার দুরেক্ষণের সাহায্যে বেতার প্রভবের এই চান্দ্র সমাবরণ পর্যবেক্ষণ করে সঙ্কেত গ্রাহকে অপবর্তন ধরণটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অপবর্তন ছাঁচ থেকে প্রভবটি কোন্ মুহূর্তে চন্দ্রের দ্বারা সমাবৃত হয়েছে, তা জানা সম্ভব। এই অভিজ্ঞান থেকে চান্দ্র কক্ষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞাত ধারণা ব্যবহার করে আমরা প্রভবটির অবস্থান গণনা করতে পারি। এই প্রক্রিয়ার ফল শুধু নিখুঁত অবস্থানলব্ধিই নয়, এথেকে প্রভবের সাংগঠনিক খবরাখবরও পাওয়া সম্ভব। এতে হ্যাজার্ড, ম্যাককে এবং নিকলসন প্রভৃতি[১৮,১৯] অ্যাডগির মতই নির্ভুলতায় পৌঁচেছেন। এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল সিডনিস্থিত কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড রিসার্চ অরগ্যানিজেশনের ২১০ ফুট পার্কস বেতার দুরেক্ষণের দ্বারা।

সাধারণতঃ এসব সনাক্তকরণে কিছু বেতার প্রভবকে আমাদের বা অন্যান্য নীহারিকার গরম তারকাদের চারপাশে আয়নিত গ্যাস অঞ্চল হিসেবে পাওয়া গেছে। ৩সি তালিকার কথাই ধরা যাক। এতে অধিকাংশ বেতার প্রভবই নীহারিকা বহিঃস্থ। এর ১০০ উজ্জ্বলতম প্রভবের মধ্যে ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৫৭টিকে সনাক্ত করা গেছে। এই ৫৭টির মধ্যে ৪০টি অন্য নীহারিকা অল্পবিস্তর অদ্ভুত ধরণের। ২টি আমাদের নীহারিকারই নতুন তারকার ধ্বংসাবশেষ, দুটি নীহারিকাস্থিত আয়নিত উদ্‌যানের উষ্ণ মেঘ। ১৩টি অন্যান্যদের তুলনায় পৃথক ধরণের। বাকী যে ৪৩টি প্রভব সনাক্তকরণের অপেক্ষায় ছিল, তাদের মধ্যে অন্যূন ৩০টি নীহারিকা বিষুবরেখার ১০°-র মধ্যে ধূলিমেঘের দ্বারা প্রচ্ছন্ন অঞ্চলে অবস্থিত।[১২]

বাকী ১৩টি প্রভবের স্বাতন্ত্র্যগুলি লক্ষণীয়। এযাবৎ কোন বেতার প্রভবের সঙ্গে নাক্ষত্রিক ধরণের কোন দৃশ্যাংশ থাকতে দেখা যায় নি, এই প্রভবগুলিতে কিন্তু তাই দেখা গেল। এসব প্রভবের বর্ণালীতে পুরনো নোভা বা সাদা বামন তারকা বর্ণালীর মিল আছে।[২০] প্রথমে ভাবা হয়েছিল, এই সব প্রভব নীহারিকার অন্তর্ভুক্ত বহু উদ্দিষ্ট বেতার নক্ষত্র। কিন্তু উত্তর-অনুসন্ধানে ধরা পড়লো, এরা তারকার মত দেখতে এবং আচরণে অনেকটা নীহারিকার মত হলেও আসলে দুটির কোনটাই নয়, যে জন্যে এদের নাম দেওয়া হয়েছে কোয়াসি স্টেলার রেডিও সোর্স। এই ১৩টি প্রভবের একটি (৩সি ২৭৩) হার্ভার্ড আলোকচিত্রে একটি মোটামুটি উজ্জ্বল তারকা হিসাবে গত বাহাত্তর বছর ধরে চিহ্নিত ছিল।

দৃষ্টিসীমার অঞ্চলে এই উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলি ছোট ফুটকির মত দেখা যায়।[৪৩] এদের চারপাশে নীহারিকাবৎ একটি পাত্‌লা আবরণ আছে। '৬৩-তে ম্যাথুজ এবং স্যাণ্ডেজ ৩সি ৪৮ ও ৩সি ২৭৩ প্রভব দুটির সঙ্গে যুক্ত এরকম আকারহীন মেঘের সন্ধান পেয়েছেন। এদের বিকিরিত বেতার শক্তি কোটি কোটি তারকার

সম্মেলনে সৃষ্ট যে কোন নীহারিকার শক্তি প্রাচুর্যের সঙ্গে তুলনীয়, অথচ আপাত দ্যুতি এদের খুব বেশী নয়। চোখে পড়বার মত ক্ষীণতম দ্যুতি থেকে ১৩ মান পর্যন্ত উঠেছে[২১]। তবে যতক্ষণ না ওদের আসল দূরত্ব সঠিক-ভাবে বের করা যাচ্ছে, ততক্ষণ ওদের পরম দ্যুতি (মৌলিক দ্যুতি?) বলা সম্ভব নয়। তবে যে দূরত্বেই ওরা যাক না কেন, ন্যূনতম ক্ষেত্রে এই দীপ্তি সূর্যের কয়েক কোটি গুণ বেশী। চূড়ান্ত ক্ষেত্রে সূর্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ (একশতটি বিরাট নীহারিকার শক্তিপুঞ্জের সমতুল্য) বেশী।[২৯]

কোয়াসারগুলি বেতার নক্ষত্র, প্রাথমিক এবং ভাস্ত, এই ধারণার অবসান ঘটলো পূর্বোক্ত বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে। বর্ণালী-ছত্রে কতকগুলি অপরিচিত চওড়া রেখা পাওয়া গিয়েছিল এবং বিভিন্ন প্রভবে এই বর্ণালী বিভিন্ন ধরণের বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল। ওক ৩সি ২৭৩ প্রভবটির অবিচ্ছিন্ন বর্ণালীটি পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই ধরণের বর্ণালীর নিঃসন্দেহে ব্ল্যাক-বডি বিকিরণের সঙ্গে তাদাত্ম্য নেই। ৩সি ২৭৩টিতে পারমাণবিক উদ্‌যান রেখা পাওয়া গেছে, কিন্তু ৩সি ৪৮-এ নয়। উপ-নাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলির বর্ণালীতে সাধারণ কোন মিলের হদিশ না পাওয়াতে পরীক্ষক মহলে একটু বিহ্বলতার সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু '৬৩-তে বর্তমানে মাউন্ট প্যালোমার মানমন্দিরে কর্মরত ডাচ জ্যোতির্বিদ মার্টেন স্মিথ[২২] দেখালেন যে, ওদের মধ্যে কিছু রেখা পরিচিত বামার রেখা হলেও হতে পারে। তবে তার জন্যে বর্ণালীতে ০'১৫৮ মানের লাল অপসরণ অনুপ্রবিষ্ট করতে হয়। এই অপসরণ যদি সত্য সত্যই ডপ্‌লারের নিয়ম অনুযায়ী ঘটে থাকে, তবে এই অপসরণ ৩সি ২৭৩-কে আমাদের কাছ থেকে আলোর গতিবেগের এক দশমাংশাধিক বেগে সরে যাচ্ছে। এই মহাদৌড়বেগ থেকে হাবলের সমীকরণ ব্যবহার করে যে দূরত্ব পাওয়া গেল, তাতে ৩সি ২৭৩ আমাদের কাছ থেকে ৫০০ মেগাপারসেক দূরত্বে অবস্থিত। ঠিক একই ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে ম্যাথুজ এবং গ্রীনস্টাইন[২৩] যুগ্মভাবে ৩সি ৪৮ প্রভবটির বর্ণালীতে $Z = d\lambda/\lambda =$ ০'৩৬৭৫ লাল অপসরণ অনুপ্রবিষ্ট করে বর্ণালী রেখাগুলিকে সনাক্ত করেন। এই অপসরণের ইঙ্গিত: ১১০০ মেগাপারসেক দূরত্ব। পরবর্তী কালে নিম্নোক্ত প্রভবগুলির[২৪,২৫] বর্ণালীও সনাক্ত করা গেল, প্রয়োজনানুভূত Z গুলিও উল্লেখ করছি।

৩সি ২৭৩ বি	০'১৫৮
,, ৪৮	০'৩৬৭৫
,, ২৭৯	০'৫৩৬
,, ৩৪৫[২৬]	০'৫৯৪
,, ৩৮০	০'৬৯১
,, ৯[২৭]	২'০১২
সি টি এ ১০২	১'০৩৭
৩সি ২৫৪	০'৭৩৪
,, ২৪৫	১'০২৯
.. ২৮৭	১'০৫৫

হাবলের নীতির সত্যতায় এবং এক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের যুক্তিতে আপাতত আমাদের বিশ্বাস যুক্ত করে এই ছক পরীক্ষা করলে বলতেই হয়, উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলি মহাকাশের গহনতম প্রদেশের অধিবাসী অর্থাৎ সেই সঙ্গে সুদূরতম অতীতেরও এবং সুদূরতম অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও যখন এদের আলো ও বেতার বিকিরণ এসে পৃথিবীতে পড়ছে, তখন এরা হয়তো বিশ্বের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কও বটে। তবে 'হয়তো' কথাটা যোগ করে একটু তর্কের অবকাশ রাখছি এই কারণে যে, জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে ঈষৎ ক্ষুব্ধ এবং সম্ভবতঃ এটাও ঠিক যে, খুব শীঘ্র

এই তর্কের অবসান ঘটবার আশা নেই। এই সম্পর্কে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন।

কোয়াসার সম্পর্কিত রহস্য আরও দানা বাঁধলো '৬৩-তে, যখন ম্যাথুজ এবং স্যাণ্ডেজ[২৮] আবিষ্কার করলেন ৩সি ২৭৩ প্রভবটির বিকিরিত দার্শ বিকিরণ পরিমাণে কালমাত্রায় স্থির থাকছে না, এক বছরের মত সময়ে এটা পরিবর্তিত হচ্ছে। পরে যখন এসম্পর্কে আরও বিশদ অনুসন্ধান করা হয়েছে, তখন এই ঘটনা সমর্থিত হওয়া ছাড়া আরও অনেক তথ্য ধরা পড়েছে। স্মিথ ও হফ্‌লীট দাবী করেছেন,[২৯] প্রভবটির আলোক বিকিরণে আকস্মিক পরিবর্তনও মাঝে মাঝে ঘটছে, তবে এর পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নি। দার্শ দ্যুতি প্রায় ৬০% পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ে থাকে[৩০]। অবশ্যই এই তথ্যগুলি সম্পর্কে এখনও ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ম্যাক-ডোনাল্ড মানমন্দিরের ডিরেক্টর এবং টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হালটন জে. স্মিথ অন্যত্র এই একই প্রভবটির পরিবর্তন কাল কয়েক বছর বলে উল্লেখ করেছেন[৩১]। আবার কেম্ব্রিজে ক্যাভেণ্ডিস লেবরেটরীর ম্যুলার্ড রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি অবজার্ভে-টরীর সহযোগী ডিরেক্টর জে. আর. সেক্সস্মাফ্‌ট্‌ বলেছেন, গড় হিসেবে এই প্রভবটির দার্শ দ্যুতি পরিবর্তন ৫০% পর্যন্ত[১২]। এই দার্শ পরিবর্তনের কাল ৩ সি ২৭৩-এর ক্ষেত্রে ১৩ বছর[৩০]। আরও অন্যান্য উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবের ক্ষেত্রেও এই ধরণের দার্শ পরিবর্তন দেখা গেছে। ৩ সি ৩৪৫ প্রভবটির ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক কালের মধ্যে দার্শ ও বর্ণালীমূলক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়[৩২,৩৩]। এই প্রভবটির বেলায় প্রায় ২০ দিনে ০·৪ মান দ্যুতি বৃদ্ধি ঘটেছে[৩৪]। '৬৬-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত আরও দুটি উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবের এধরণের দার্শ দ্যুতি পরিবর্তনের খবর পাওয়া গেছে। এগুলি হলো ৩ সি ২৭৩ বি ও ৩ সি ২৭৯। ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটির দার্শ বিকিরণে শতাব্দীতে প্রায় ০·২ মান হারে ধীর হ্রাস ঘটছে[২৯]। মুখ্য পরিবর্তনগুলি প্রায় ১০ বছর কাল স্থায়ী[২৯] এবং আলোর ঝলকানি কয়েকদিন ধরে বজায় থাকে[২৯]। ৩×১০[১১] সাইকল্‌স্‌/সেকেণ্ড কম্পাঙ্কেও এই প্রভবটির বিকিরণে মাস-কালের মধ্যেও একটা বড় রকমের পরিবর্তন থাকলেও থাকতে পারে[৩৫]। ৩সি ২৭৩ বি প্রভবটির দার্শ পরিবর্তন বছর এবং মাস-কালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে[৩১]। ৩ সি ২৭৯ প্রভবটির বেলায় দার্শ দ্যুতি ৯ বছরে ~ ১ মান মত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে[৩৬]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, বেতার প্রভব ৩সি ৮৪-তে (সেফার্ট গ্যালাক্সি, NGC1275) হয়েল ও বারবিজ যে দার্শ জ্যোতি পরিবর্তনের আশা করছিলেন[৩৭], সুখের কথা এই প্রবন্ধে একাধিক বার উল্লিখিতব্য বারবার ও তাঁর সহকর্মীদের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায়[৩৮] তার সম্ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে।

৩ সি ২৭৩, ৩ সি ২৭৩ বি, ৩ সি ২৭৯ ও ৩সি ৩৪৫—এই সব উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভব-গুলির বেতার বিকিরণেও কালমাত্রায় পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে। ৮·০ জি সি/সে এবং ১৬·৫ জি সি/সে. কম্পাঙ্ক দুটিতে '৬৫-এর মে মাসে ডেন্ট যে নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন, তারই ফলে এটি জানা গেছে। ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটির ৮·০ জি সি/সে কম্পাঙ্কে বেতার ফ্লাক্স ঘনত্বে ৩ বছরে ৪২% বৃদ্ধি[৩৯], ১৬·৫ জি সি/সে কম্পাঙ্কে ফ্লাক্স ঘনত্বে ১ বছরে ~ ৩৫% বৃদ্ধি[৩৯], ৩·৪ মিলিমিটার[৪০] এবং ১ মিমি[৪১] তরঙ্গদৈর্ঘ্য অঞ্চলে ফ্লাক্স ঘনত্বের বেশ লক্ষণীয় পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ৩সি ২৭৯ প্রভবটির ৮·০ জি সি/সে কম্পাঙ্কে ২ বছরে ফ্লাক্স ঘনত্বের ৪৮% হ্রাস এবং ১৬·৫ জি সি/সে কম্পাঙ্কে ঘনত্বের পরিবর্তন দেখা গেছে।[৩৯] ৩সি ৩৪৫ প্রভবটিতে ৮·০ ও ১৬·৫ জি সি/সে কম্পাঙ্ক দুটিতেও পরিবর্তন লক্ষণীয়[৩৯]। ৮·০ জি সি/সে কম্পাঙ্কে ২ বছরে ঘনত্ব ৩৬% কমে

গেছে[৩৯]। অন্যান্য প্রভবের বেলায় কি ঘটছে জানি না, তবে স্যাণ্ডেজের পরীক্ষানুযায়ী বিভিন্ন কম্পাঙ্কে অন্ততঃ অতিবেগুনী, নীল এবং লাল— এই তিন তরঙ্গাঞ্চলে ৩ সি ২৭৩ প্রভবটির দ্যুতি পরিবর্তন ঘটছে একই ভঙ্গীতে এবং একই বিস্তার নিয়ে[৪২]। ৩সি ৩৪৫ প্রভবটিতে লাল উজানী অঞ্চলে কোন পরিবর্তন ঘটছে কিনা আমার জানা নেই। উল্লিখিত কম্পাঙ্ক ছাড়া অন্য কম্পাঙ্কেও প্রভবগুলির পরিবর্তন থাকতে পারে।

CTA 102 উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবটির বেতার পরিবর্তন নিয়ে এখনো সন্দেহ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নি। এই প্রসঙ্গ একটু পরেই আসছে।

প্রভবগুলির এই দ্যুতি পরিবর্তন ঊর্ধ্বতম সরাসরি (লিনিয়ার) আকার নির্ধারণ করবার একটি পথ খুলে দিয়েছে। ইতিপূর্বে দ্যুতি-পরিবর্তক তারকাগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। সাধারণতঃ এই দ্যুতি পরিবর্তন তারকাগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থার খবরাখবর দিয়ে থাকে। উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলির ক্ষেত্রেও যদি আলোর পরিবর্তন প্রভবের আভ্যন্তরীণ অবস্থাই প্রতিফলিত করে থাকে, তাহলে দার্শ পরিবর্তন কাল থেকে দার্শ বিকিরণকারী অংশটির আকার নির্ণয় করা সম্ভব। ধরা যাক, কোন প্রভবে দার্শ বিকিরণের পরিবর্তন কাল ১ বছরের মত; সুতরাং কেন্দ্র থেকে সঙ্কেতবাহী তরঙ্গের পৃষ্ঠদেশে পৌঁছুতে এই সময়টুকুর মধ্যেই সমস্ত পথটি অতিক্রম করতে হবে। আলোর বেগকে (৩×১০^{১০} সে মি/সে) সঙ্গত কারণেই সর্বোচ্চ গতিবেগ ধরে নিয়ে দেখা যাবে, প্রভবটির আকার ৯×১০^{১৭} সেমি অর্থাৎ ১ আলোক-বছরের বেশী হতে পারে না। সুতরাং ৩ সি ২৭৩ প্রভবটির সংশ্লিষ্ট দার্শ অংশটির সরাসরি আকার ব্যাসে ১ পার্সেক (৩.১৮×১০^{১৮} সেমি) অপেক্ষা কম। এইখানে স্মর্তব্য এই যে, নীহারিকাগুলি সাধারণ আকারে কিলোপার্সেকের মত হয়ে থাকবে; সুতরাং নোভিকভ[৪৩] যেমন উল্লেখ করেছেন কোয়াসারগুলি দৃশ্য অঞ্চলে ছোট ফুটকির মত অতি স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেবে। সে কথা যাক—এখন দেখা যাক, এই পরিবর্তন ১ আলোক-বছর অপেক্ষা বৃহৎ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হওয়া কেন অসম্ভব। সে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দূর অংশ থেকে আগত আলো কাছের অংশের তুলনায় ১ বছর পরে এসে পৌঁছাতো; অর্থাৎ প্রভবের এক অংশ যখন শিখর মানে, অপরটি তখন অবমে থাকছে; অর্থাৎ পরিবর্তন আদৌ দৃষ্টিগোচর হতো না। প্রভব যখন জ্যোতির সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখাচ্ছে, তখন এক দোলনকালে আলো যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, প্রভবের আড়াআড়ি আকার ততটুকু থেকে ছোট হওয়া প্রয়োজন। সিয়ামা ৩ সি ২৭৩ প্রভবটিতে এই উচ্চতম আকার ১০ আলোক-বছর বলে উল্লেখ করেছেন[৩০]। অবশ্য এই উচ্চসীমার মধ্যে অনেক মানই গ্রাহ্য, কিন্তু কয়েকটি কারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উচ্চ সীমার যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে সিয়ামার উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: 'As this (অর্থাৎ উচ্চ সীমার কাছাকাছি থাকা) would make 3C 273 even more remarkable'.[৩০]

এ তো গেল সংশ্লিষ্ট দার্শ অঞ্চলের আকারের কথা। ঠিক উপরিউক্ত পন্থা অবলম্বন করেই বেতার পরিবর্তনের হিসাব থেকে উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবের বেতার বিকিরণকারী অঞ্চলটিরও ঊর্ধ্বতম আকার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এই একই বেতার বিকিরণকারী অঞ্চলগুলির কৌণিক ব্যাসের একটি অবম মানও আমরা স্থির করতে পারি। একথা জানা যে, যদি বেতার কম্পাঙ্কে কোন প্রভবের বাহ্যিক জ্যোতি অত্যন্ত বেশী হয় এর কার্যকরী তাপাঙ্ক বেতারগুঞ্জন বিকিরণকারী ইলেকট্রনগুলির মত মান পরিগ্রহ

করতে পারে। এই ঘটনা ঘটলে প্রভব তার নিজস্ব বিকিরণের কাছেই অস্বচ্ছ হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে বাহ্যিক জ্যোতি কম হলে খুব কম সংখ্যক ইলেকট্রনই বেতারগুঞ্জন ছড়াবে এবং এই গুঞ্জন উপরিভাগে পৌঁছে সহজেই মুক্তিলাভ করবে। এদের পথে পুনঃশোষিত হবার সম্ভাবনা কম। প্রভবের বর্ণালী সমীক্ষা অর্থাৎ কি ভাবে কম্পাঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে তীব্রতার পরিবর্তন ঘটছে, তা দেখে বলা যায় স্ব-বিশোষণ ঘটছে কি না। অস্বচ্ছ প্রভবকে সহজেই চেনা যায়। প্রভব যদি সত্যই স্বচ্ছ হয়, তবে আমরা সহজেই বাহ্যিক জ্যোতির একটি উচ্চতম মান আরোপ করে নিতে পারবো। তার কারণ বিকিরণকারী ইলেকট্রনগুলির কার্যকরী তাপাঙ্ক বের করবার উপায় আমাদের জানা। আবার বাহ্যিক জ্যোতি আনুষঙ্গিক মোট আপাত জ্যোতি এবং যে কৌণিক ব্যাসার্ধের মধ্যে এই মোট জ্যোতির বিন্যাস ঘটেছে, তার মানের উপর নির্ভরশীল। মোট আপাত জ্যোতি নির্ধারণ করা সম্ভব, সুতরাং এথেকে আমরা উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবটির বেতার বিকিরণ অঞ্চলের একটি সম্ভাব্য অবম কৌণিক ব্যাস পেয়ে যাচ্ছি।

এখন বোঝা যেতে পারে, পূর্বোল্লিখিত CTA 102 উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবটির বেতার পরিবর্তনে কেন সন্দেহের অবকাশ রয়ে গেছে। '৬৫-এর ফেব্রুয়ারী মাসে রুশ বেতার জ্যোতির্বিদ জি. বি. সোলোমিটস্কি[৪৪] সি টি এ ১০২ প্রভবটির বেতার পরিবর্তন কাল ১০০ দিনের মত বলে নির্দেশ করেছিলেন। আবার অন্ততঃ ১০০০ মেগা/সে কম্পাঙ্ক পর্যন্ত প্রভবটি স্বচ্ছ। এই দুই মিলে প্রভবটির বেতার বিকিরণকারী অঞ্চলটির ন্যূনতম কৌণিক ব্যাস চাপের '০০১" বলে নির্দেশ করছে। নির্ধারিত এই অবম কৌণিক ব্যাস এবং দ্যুতি পরিবর্তন থেকে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ সরাসরি আকার—এই দুই থেকে প্রভবটির দূরত্বের যে উচ্চ সীমা অর্থাৎ ৬×১০^৯ আলোক-বছর পাওয়া যায়, তা হাবল নীতি অনুসৃত (এই প্রবন্ধের ২ বিভাগে) দূরত্ব অর্থাৎ $১০^{১০}$ আলোক-বছর অপেক্ষা বহুগুণ কম। এই দুই দূরত্বের মধ্যে স্বাজাত্যের অভাব অনেকেই নানা ভাবে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে নিঃসন্দেহে এসব ব্যাখ্যার প্রত্যেকটিই অতিমাত্রায় কৃত্রিম। স্বভাবতঃই মল্টবি এবং মফেট সোলোমিট্স্কি প্রদত্ত দ্যুতি পরিবর্তনের তথ্যে সন্দেহ আরোপ করেছেন।[৪৫] এই প্রভবটির পুরনো নথিপত্র সমীক্ষা করেও (এমন কি সোলোমিট্স্কি ব্যবহৃত কম্পাঙ্কেও) এঁরা এর কোন রকম বেতার দ্যুতি পরিবর্তনের হদিশ পান নি। তবে মল্টবি এবং মফেটের রেকর্ডগুলি সোলোমিট্স্কি প্রমুখ জ্যোতির্বেত্তাদের নিরীক্ষার কয়েক বছর পূর্বেকার এবং হতে পারে সি টি এ ১০২ প্রভবটি পরিবর্তন খুব সম্প্রতিই সুরু করেছে। অবশ্যই এর পক্ষে এখনও যথেষ্ট প্রমাণ আসে নি, যার জন্যে এই প্রভবটির বেতার পরিবর্তন সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে পূর্বে কিছু বলা হয় নি।

কিন্তু এই যে স্বাজাত্যের অভাব, তাকে একটু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে; অর্থাৎ বলতে চাই আমরা ২ বিভাগে কোয়াসারের ক্ষেত্রে হাবল নীতি প্রয়োগের যাথার্থ্য সম্পর্কে যে সন্দেহের মাত্র ইঙ্গিত দিয়েছিলাম, এখানেও তারই ছায়া পড়ছে। এরূপ ভাববার কারণ, ৮০ জি সি/সে কম্পাঙ্কে ৩ সি ২৭৩ প্রভবের বেতার-তীব্রতায় গত তিন বছরে যে ৪০% ধীর বৃদ্ধি ঘটেছে, তার পরিবর্তন কাল যদি দার্ঘ পরিবর্তন কাল অর্থাৎ ১৩ বছরের সমতুল্য হয়, তাহলে প্রভবটির বর্ণালীতে স্ব-বিশোষণের অনস্তিত্বের অর্থ, আমাদের কাছ থেকে প্রভবটির দূরত্ব মাত্র কয়েক মিলিয়ন আলোক-বছর অথচ হাবল নীতি অনুসৃত দূরত্ব দাঁড়াচ্ছে ১৫×১০^৮ আলোক-বছর। এখানে ৩ সি ২৭৩-এর বেতার দ্যুতির তথ্যকে সন্দেহ

করে এই স্বাজাত্যের অভাবকে এড়িয়ে যাবার কোন রকম অবকাশই নেই। স্বীকার করছি, এই প্রভবটির ক্ষেত্রে তাদাত্ম্যের অভাবের গণ্ডী অপেক্ষাকৃত কম এবং এই পরিবর্তনগুলির একটি সম্ভাব্য উৎস† অনুমানমূলক একটি ব্যাখ্যাতে হয়তো এর কারণ দর্শানোও সম্ভব হবে অদূর ভবিষ্যতে। তবুও সন্দেহ থেকেই যায়, হাবল নীতি কোয়াসারগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না।

বলা বাহুল্য, বেতার প্রভবগুলির আকার ও জ্যোতির্বিন্যাসের যাবতীয় প্রত্যয়ই এসেছে বেতার ব্যতিকরণ দূরেক্ষণ থেকে। বেতার প্রভবের সম্পূর্ণ জ্যোতির্বিন্যাসের রূপটি ধরা পড়বে আকাশ-তার দুটির আপেক্ষিক দূরত্ব এবং দিকগুলি পরিবর্তন করে; কারণ যে কোন এরিয়েল স্পেসিং-এ পাওয়া ব্যতিকরণ রেখাবলীর বিস্তার মান "ফুরিয়ার ট্রান্সফরম অব দ্য স্ট্রীপ ডিভিসন অব রেডিও ব্রাইটনেসের" একটি উপাংশ মাত্র নির্দেশ করে। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে যে বিস্তৃত সমীক্ষা চলেছে[১০] সেখানে 'Out to 1557 wavelengths এবং জড্রেল ব্যাঙ্কে Out to 61.100 wavelengths' স্পেসিং ব্যবহৃত হয়েছে।[১১]

এই চরম ব্যবধানে প্রায় সমস্ত বেতার প্রভবই মোটামুটি বিশ্লিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রভবগুলির কৌণিক ব্যাস একটি বিস্তীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সঞ্চারমান হলেও গড় হিসাবে চাপের ১'-এ আছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর—এই বেতার প্রভবগুলির সত্তর শতাংশের অধিক প্রভবই যুগ্ম বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছে। কৌণিক ব্যাসের এই স্থূল মান এবং দূরত্ব (হাবল নীতি অনুসৃত) একত্রে ব্যবহার করে যে সব সরাসরি আকার পাওয়া গেছে, হ্যানবারি ব্রাউন এবং পামার[৪৬] তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় একটিকে ২৫ কিলোপার্সেক স্থূল ব্যাসার্ধসম্পন্ন দুটি স্বতন্ত্র অংশের যুগ্ম সমষ্টি বলে একটি ব্যাখ্যার প্রস্তাব করেছেন। অংশ দুটির মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১০০ কিলোপার্সেকের মত। এদের মধ্যে যেটির ব্যাস ২৫ কিলোপার্সেক, সেটিকেই দার্শ অংশ বলে সনাক্ত করা হয়েছে, অপরটি থেকে দৃশ্য আলো নির্গত হচ্ছে না বললেই চলে। বেতার প্রভবের এই বিশেষ রূপটির কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে কথা থাক, আপাততঃ আমাদের দ্রষ্টব্য, উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলির স্থূল বা শিখরের কৌণিক আকার কতটুকু এবং উল্লিখিত সাধারণ বেতার প্রভবগুলির মত কোন্ কোন্ উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলি যুগ্ম?

প্রথমটির সমাধানের জন্যে ম্যালভার্ণে রয়্যাল রেডার এস্টাব্লিসমেন্টের বারবার এবং জড্রেল ব্যাঙ্কে নাফিল্ড রেডিও অ্যাষ্ট্রোনমি লেবরেটরীর ডোনাল্ডসন, মিলে এবং স্মিথের '৬৫-এর মে এবং জুন মাসের কাজটি উল্লেখযোগ্য।[৩৮] রয়্যাল রেডার এস্টাব্লিসমেন্টের ৮২ ফুট রেডার দূরেক্ষণ (এতে ৬০৪০০০ তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত কার্যকরী বেস লাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল) এবং জড্রেল ব্যাঙ্কের মার্ক-১, ২৫০ ফুট বেতার দূরেক্ষণের দ্বারা ১৪২২ মেগা/সে কম্পাঙ্কে কার্যকর উচ্চ বিশ্লেষণী শক্তিসম্পন্ন ব্যতিকরণ পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি বিশেষ উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবের আকার নির্ধারণ করেছেন। প্রভবগুলি হলো ৩ সি ৮৩, ৩ সি ২৭৩, ৩ সি ২৭৯, ৩ সি ৩৪৫ এবং ৩ সি ৩৮০; তার মধ্যে প্রথমটি ছাড়া সবগুলিই উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভব। যন্ত্রটি এবং এর ব্যবহার সম্পর্কে অ্যাডগি অন্যত্র[৪৭] আলোচনা করেছেন। ৩ সি ২৭৩ বি এবং

† অনুমানটি সম্ভবতঃ এই যে, নীচু কম্পাঙ্কে অস্বচ্ছ একটি ঘন কেন্দ্রকের মধ্যে এই পরিবর্তনগুলি ঘটছে। অবশ্য যদি নীচু কম্পাঙ্কে আলোর মোটা অংশ প্রভবের মুখ্য অংশ থেকে এসে থাকে, তাহলে দৃষ্ট বেতার বর্ণালীতে এই অস্বচ্ছতা ধরা পড়বে না।

৩ সি ৩৮০ প্রভব ছুটিকে সব আওয়ার অ্যাঙ্গলেই দেখা গিয়েছিল এবং ঐ সময়ে এরা দিগন্তের উপরিভাগেই ছিল। আর ছুটি প্রভবকে (যন্ত্রটি ব্যবহারের জন্তে যথেষ্ট সময় না পাওয়ায়) বেশীক্ষণ লক্ষ্য করা যায় নি।

যে সব আওয়ার অ্যাঙ্গলে প্রভবগুলি দেখা গিয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে উল্লিখিত পাঁচটি প্রভব অত্যন্ত স্পষ্ট ব্যতিকরণ রেখাবলী দেখিয়েছে। এর অর্থ, প্রতিটি প্রভবের ক্ষেত্রেই ১৪২২ মেগা/সে কম্পাঙ্কে বিকিরণের একটা মোটা অংশ আসছে অন্যূন ০'১" অব আর্ক বিশিষ্ট এক বা একাধিক অংশ থেকে। এর অর্থ, ওই অঞ্চল সূর্য থেকে ৩২০ কিলোপার্সেক দূরে অবস্থিত।[৫৩]

১৪২১ মেগা/সে কম্পাঙ্কে প্রভবগুলির আকার অবশ্যই অপেক্ষাকৃত নিম্ন কম্পাঙ্কে লব্ধ আকারের চেয়ে ছোট। ১৫৯ মেগা/সে কম্পাঙ্কে অ্যালেন, অ্যাণ্ডারসন, কনওয়ে, পামার, রেডিস ও রওসন-কৃত নিরীক্ষায়[১১] ৩ সি ২৭৩-এর আকার চাপের প্রায় ২০" এবং ৯৬০ মেগা/সে কম্পাঙ্কে মল্‌ট্রবি এবং মফেট-কৃত নিরীক্ষায়[১০] ওই একই প্রভবের আকার চাপের ২৪" অপেক্ষা কম প্রমাণিত হয়েছে। ৩ সি ২৭৯, ৩ সি ৩৪৫ ও ৩ সি ২৮০—এই প্রভব তিনটির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই এই ছুই কম্পাঙ্কে লব্ধ আকার (d) যথাক্রমে ২৩"<d <৪৭", d<৩৬"; ~ ১০", d<৪২" ও ৫"<d <১১", d<২৪"। দৃষ্টীয়, বেতার এবং অন্যান্য কম্পাঙ্কে বিকিরণের পরিবর্তন থেকে যে সব আকার পাওয়া গেছে, তাদের সাধারণ ইঙ্গিত খুব সম্ভব কোয়াসারগুলির একটি কম্পোজিট মডেলের। খুব সম্ভব প্রত্যেক কোয়াসারের অপেক্ষাকৃত ঘন ৩ আলোক-বছর ব্যাসের একটি কেন্দ্রক আছে, যেখান থেকে উচ্চ কম্পাঙ্কের বিকিরণ, যেমন—অতিবেগুনী আলো নির্গত হচ্ছে।* একে ঘিরে অন্ততঃ কুড়ি আলোক-বছরের একটি অপেক্ষাকৃত লঘু অঞ্চল, যেখানে দার্শ বিকিরণ উৎপন্ন হচ্ছে।† এর চারপাশে আবার অন্ততঃ কয়েক হাজার লক্ষ আলোক-বছরের মত ব্যাসের আরও লঘু একটি অঞ্চল রয়েছে এবং বেতার তরঙ্গের উৎস হয়তো এখানেই।[৪৮]

এখানে মনে রাখতে হবে, কোয়াসারগুলির গঠন সম্পর্কে এটি একটি খসড়া মাত্র, পরিবর্তনের হিসাব থেকে যার একটি অস্পষ্ট রূপ মাত্র পাওয়া সম্ভব। আসলে এদের গঠন নিয়ে এখনও তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলছে।

কোয়াসার গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে একটি চরম চমক এবং এই চমকের অধিকাংশ ভাগই বোধ হয় তার আকারের খবরাখবরে প্রাপ্তব্য। কেন না, যেমনটি প্রথম অংশে বলেছি, প্রায় ১০০ দৈত্যাকার নীহারিকার সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ নিশ্চিতভাবে ১০ আলোক-বছরের কম পরিসর থেকে নির্গত হচ্ছে এবং বিস্ময়ের দ্বিতীয় ভাগ আসছে, এই বিরাট শক্তিপুঞ্জ পরিবর্তিত হচ্ছে কি ভাবে—এই অনুত্তর প্রশ্ন থেকে।

কোয়াসারগুলি যুগ্ম জ্যোতিষ্ক কি না[১৮,১৯] এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। এই প্রসঙ্গে হ্যাজার্ড, মাককে এবং শিমেন্স[৯] ও হজেন্স[৫০]-এর কাজ ছুটি উল্লেখযোগ্য। ৩ সি ২৭৩ প্রভবটি নিশ্চিতভাবে যুগ্ম। এতে ছুটি উপবৃত্তাকার অংশ প্রায় ১৯'৫" অব আর্ক দ্বারা বিচ্ছিন্ন[৪৯,৫০]। এর অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বস্তুটিই দার্শ অংশ। অ্যাডগি বলছেন, ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটির ক্ষেত্রে ব্যতিকরণ রেখাবলীর বিস্তার-মানটি আওয়ার অ্যাঙ্গল নির্ভর অর্থাৎ আওয়ার অ্যাঙ্গলের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। এর অর্থ—প্রভবটি পূর্বোক্ত ০'১" অব আর্ক ব্যাসবিশিষ্ট ছুটি উপাংশের দ্বারা

---

* এখানেই বর্ণালীতে দার্শ অবিচ্ছিন্নতা-(Optical continuum) মূলক কিছুটা বিকিরণেরও উৎপত্তি।[৪৮]

† দার্শ (দার্শ অবিচ্ছিন্নতা-মূলক) বিকিরণেরও উৎস এখানে।[৪৮]

গঠিত।[৫১,৫২] জড্রেল ব্যাঙ্কের পরীক্ষা থেকেও এই রকমের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, অর্থাৎ ডোনাল্ডসন, মিলে এবং স্মিথের ১৪২২ মেগা/সে কম্পাঙ্কের পরীক্ষা থেকে। যদিও অন্যত্র হাণ্টার (জুনিয়র), সোফিয়া এবং ফ্লেচার[৫৩] এই ০'১" অব আর্ক মানটি স্বীকার এবং ব্যবহার করেছেন, তা খুব সম্ভব তৎকালীন নিখুঁততর মানের অভাবেই। কেন না, এই প্রভবটি কোন কোন পজিশন অ্যাঙ্গলে যথেষ্ট বিশ্লিষ্ট হয় নি বলে মনে করবার কারণ আছে। সে যাই হোক, এই উপাংশ দুটির মধ্যে কৌণিক ব্যবধান ০'৪" অব আর্ক।[৩৮] ৩ সি ৩৮০ উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবটির ক্ষেত্রেও বেশ ভাল রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। যদিও ঔজ্জ্বল্যে ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটি অপেক্ষা এর প্রভব অনেকটা মৃদু, তবু এক্ষেত্রে পরিবর্তন এত তাৎপর্যপূর্ণ যে, মনে হয় এর গঠন আরও জটিল।[৩৮] ৩ সি ৩৪৫-এ এই ধরণের গঠন থাকলেও থাকতে পারে, তবে এর ক্ষেত্রে এবং ৩ সি ২৭৯-এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বলা সম্ভব নয়।

পূর্বে বেতার প্রভবগুলির দ্যুতি কালমাত্রায় পরিবর্তিত হবার যে কথা বলা হয়েছে, আকারের উচ্চ সীমা নির্ধারণ করবার ব্যাপারে সহায়তা করা ছাড়াও এর অন্য আর একটি ইঙ্গিত হলো এই যে, প্রভবগুলি থেকে যে বিকিরণ আসছে, তা আসলে খুব স্বল্প আকারের উপাংশের দ্বারা গঠিত প্রভব থেকেই আসছে। স্পষ্টতঃই আওয়ার অ্যাঙ্গলের সঙ্গে ব্যতিকরণ রেখাবলীর বিস্তার-মানের পরিবর্তনে সে কথা সমর্থিত হচ্ছে।

লাল অপসরণ যে বিশ্বের সাধারণ সম্প্রসারণের ফলে ঘটছে, এই অনুমান করে এই সব কৌণিক ব্যাস (০'১" অব আর্ক) এবং হাবল নীতি অনুসৃত দুরত্ব থেকে প্রভবগুলির সরাসরি আকার বের করা যেতে পারে। ৩ সি ২৭৩ বি, ৩ সি ২৭৯, ৩ সি ৩৪৫ ও ৩ সি ৩৮০ প্রভবগুলির সরাসরি আকার তাহলে দাঁড়ায় যথাক্রমে: $\leqslant$১৭২ পার্সেক, $\leqslant$৩৩৪ পার্সেক, $\leqslant$৩৪০ পার্সেক ও $\geqslant$৪'৪ × ১০[৮] পার্সেক।

কালমাত্রায় এই সব প্রভবের ক্ষেত্রে দ্যুতি পরিবর্তন থেকে প্রাপ্ত সরাসরি আকারের উচ্চ সীমার সঙ্গে এসব মানের কোন স্বাজাত্য আছে কি না লক্ষণীয়।

সাধারণ্যে বেতার প্রভবগুলির অবস্থান নিরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটি বিশেষ কম্পাঙ্কে তাদের আপেক্ষিক বেতার তীব্রতাও পরিমিত হয়ে থাকে। আরও অন্যান্য কম্পাঙ্কে এই মান গ্রহণ করে বেতার বর্ণালী (Log S—Log ν, S = ফ্লাক্স ঘনত্ব, ν = কম্পাঙ্ক) গড়ে তোলা হয়। উদ্‌যান ও OH র‍্যাডিকালগুলির জন্যে কয়েকটি কৃষ্ণ রেখা ব্যতীত এই ধরণের বর্ণালী প্রায়শঃই অবিচ্ছিন্ন। সাধারণতঃ এই বর্ণালী একটি বিশেষ নিয়মানুগ। ৩৮ থেকে ১৪০০ এম. পি./সে কম্পাঙ্কের অঞ্চলে এই নিয়ম $S \propto \nu^{-\alpha}$, ঘাত α, বর্ণালী সূচকের মান বিভিন্ন প্রভব অনুযায়ী ভিন্ন, তবে এই বিভিন্নতার ধরণ গসীয়। স্থূল মান ০'৭৬ এবং চ্যুতি ০'১৪।[৫৪]

শতকরা ১৫ ভাগ বেতার প্রভবই কিন্তু এই ধরণের সরল নিয়মের মধ্যে পড়ে না। Log S-Log ν রেখের বক্রতা কোন কোন সময়ে উচ্চ কম্পাঙ্কে ফ্লাক্সের অপেক্ষাকৃত অনাধিক্যই চিহ্নিত করে। সম্ভবতঃ এই ঘটনা বিকিরণকারী অপেক্ষবাদানুগ ইলেকট্রনগুলির শক্তিব্যয়ের সঙ্গে অথবা নীচু কম্পাঙ্কে হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত। শেষোক্ত এই ঘটনা অর্থাৎ প্রভবের বর্ণালীতে নীচু কম্পাঙ্কের অঞ্চলে 'কাট-অফ'-এর সঙ্গে অত্যুচ্চ ঔজ্জ্বল্য তাপাঙ্ক অর্থাৎ ছোট কৌণিক আকারের কোন সম্পর্ক থেকে থাকবে, মনে হয় ঔজ্জ্বল্য তাপমান যখন অপেক্ষবাদানুগ ইলেকট্রনগুলির পরম তাপাঙ্ক অতিক্রম করে যায়, সেই সময়কার স্ব-বিশোষণই এর জন্যে দায়ী।[৫৫,৫৬] স্বল্প ক্ষেত্রেই ফ্লাক্স অপেক্ষাকৃত

নীচু কম্পাঙ্কে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ এও হতে পারে যে, সে ক্ষেত্রে প্রভব দুটি স্বতন্ত্র বর্ণালী-সূচক বিশিষ্ট অংশের যুগ্ম সমষ্টি। এক্ষেত্রে নীচু বর্ণালী-সূচক উচ্চ তাপাঙ্ক অঞ্চলে এবং উচ্চ মানের বর্ণালী-সূচক নিম্ন কম্পাঙ্ক অঞ্চলে প্রভুত্ব করবে; অর্থাৎ এখানেও প্রভবের গঠনে যুগ্মতার ইঙ্গিত। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি[৫৭] এই বর্ণালী-সূচকের সঙ্গে প্রভবের পরম বেতার দ্যুতির একটি সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছেন। দার্শ বিজ্ঞানে সুবিখ্যাত 'কালার ডায়াগ্রাম'-এর সঙ্গে এই সম্পর্কের ধারাটির তুলনা চলতে পারে। অবশ্য এই সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল, অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল প্রভবগুলির ঝোঁক আছে ফ্ল্যাট বর্ণালীর প্রতি। এই সম্পর্কের বিচার এখনও চলছে।

সম্প্রতি ডেন্ট ও হাডক[৫৮,৫৯] এক বিশেষ শ্রেণীর বেতার প্রভবের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরা উপরিউক্ত দুটি নিয়মের কোনটাতেই পড়ে না। খুব বেশী কম্পাঙ্কে এদের ফ্লাক্স বাড়তে সুরু করে দেয়। এই বৃদ্ধির সূচনা সাধারণতঃ ৩০০০ মেগা/সে থেকে হয়। নীচু কম্পাঙ্ক বর্ণালীর ঋজু সামান্যীকরণে (স্ট্রেট এক্সট্রাপোলেশন) সূচিত যে তাত্ত্বিক ফ্লাক্স, দৃষ্ট ফ্লাক্স তা অতিক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এই ধরণের প্রভব ধরা পড়েছে সব সমেত সাতটি (ফেব্রুয়ারী, '৬৬ অবধি)। বারবার প্রভৃতির পরীক্ষায় যে সব বিশেষ ধরণের প্রভবের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, সেগুলি এই ধরণের প্রভব। বারবার প্রভৃতির গবেষণা[৩৮] থেকে মনে হচ্ছে, ডেন্ট ও হাডক কর্তৃক আলোচিত অদ্ভুত বর্ণালী খুব কম কৌণিক আকারবিশিষ্ট প্রভবগুলির ক্ষেত্রেও দেখা যাবে।

উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলি তারকার মত দেখতে হওয়ায় স্বভাবতঃই এগুলিকে আমাদের নীহারিকাভুক্ত বলে আশা করা হয়েছিল এবং তাই যথাসময়ে এদের লক্ষণীয় বা পরিমাপযোগ্য 'প্রপার মোশন' আছে কি না, সে বিষয়েও যথোচিত অনুসন্ধান চলেছে। জেফ্রীজ ৩ সি ২৭৩ বি প্রভবটির মোটামুটিভাবে ±০'০০২৫ সেকেণ্ড/বছর বলে নির্দেশ করেছেন।[৬০] প্রপার মোশন অনুযায়ী ৩ সি ২৭৩ প্রভবটি আমাদের নীহারিকার ঠিক বাইরে থাকবার কথা। ৩ সি ২৭৩ বি-এর বেতার অংশের ০'১" অব আর্ক কৌণিক ব্যাস যে ৩২০ কিলোপার্সেক দূরত্বের ইঙ্গিত করেছে, তাতে এর প্রপার মোশন ~ ০'০০১৫"/বছর হওয়া উচিত।[৫৩]

এযাবৎ কোয়াসারগুলিকে চেনা গেছে—(১) সাথী দৃশ্যাংশের অস্তিত্ব, (২) নীচু কম্পাঙ্কে বর্ণালী-মূলক 'কাট অফ'-এর অস্তিত্ব[৫৬] এবং (৩) তাদের অত্যন্ত কম কৌণিক আকারের[৬১,৬২] প্রমাণের ভিত্তিতে।* অ্যালান স্যাণ্ডেজ কোয়াসার সনাক্ত করবার কাজে ব্যাপৃত থাকাকালীন কোয়াসার চেনবার আরও একটি পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। সেটি আর কিছুই নয়, কোয়াসারগুলি অত্যধিক পরিমাণে অতিবেগুনী আলো বিকিরণ করে বলে খুব নীলাভ দেখায়,‡ এবং এই পন্থাতে লক্ষ্য ছিল অস্বাভাবিক নীলাভ তারকার মত জ্যোতিষ্কগুলিকে আবিষ্কার করা।[৬৩] একই ফটোপ্লেটে ৩২০০-৩৯০০ অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অঞ্চলে একটি এবং ৩৯০০-৫০০০ অ্যাংস্ট্রম তরঙ্গদৈর্ঘ্যাঞ্চলে (এই দুই চিত্র গ্রহণের মধ্যে প্লেটটিকে একটু সরিয়ে দিতে হবে) আর একটি আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। যেগুলি

---

* মনে রাখতে হবে ৩ সি তালিকায় যে অধিকাংশ সংখ্যক কম বেতার কৌণিক আকারের প্রভব পাওয়া গিয়েছিল, তাদের সবাই উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভব হিসাবে ধরা পড়েছে।[২১]

‡ আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে ৩ সি ২ উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবটি ১৯৬১ সালে রক্তিমাভ ছিল, '৬৫-তে সেটাই আবার নীলাভ হয়ে গেছে।[১২]

সাধারণ তারকা, ফটোপাতে তাদের ছবি থাকছে দুটি একই প্রভার, কিন্তু উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবের ক্ষেত্রে অতিবেগুনী আলোর ছবিটি অত্যন্ত জোরালো হবে। তখনই উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভব সনাক্ত করা সহজসাধ্য হয়ে পড়ে।

এই পন্থা যতখানি বিশ্বাসযোগ্য হবে বলে মনে করা হয়েছিল, আসলে কিন্তু ততটা ফলপ্রদ হলো না। কারণ এমন অনেক জ্যোতিষ্ক অতিবেগুনী আলোয় অত্যন্ত জোরালো ছবি দিল, যাদের আদৌ কোন বেতার বিকিরণ নেই, অর্থাৎ যারা উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভবগুলির আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারলো না। এসব জ্যোতিষ্ক[৬৪,৬৫] অবশ্য জ্যোতিঃপদার্থ-বিজ্ঞানের আর একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার। তবে (১), (২) ও (৩)-এর ভিত্তিতে উপনাক্ষত্রিক বেতার প্রভব বলে সন্দেহভাজন জ্যোতিষ্ক আসলে ঠিক তাই কিনা, সেটা যাচাই করে দেখবার পক্ষে এই 'অতিবেগুনী আলোর আধিক্য' অত্যন্ত উপকারী।

কিছু কিছু কোয়াসারে বিস্ফোরণ ঘটেছে, এমন নজীরও পাওয়া গেছে।[১২]

উপসংহারে আমি ঈলের ইভান্সটন বায়ো-ম্যাগনেটিক রিসার্চ ফাউণ্ডেসনের ডাঃ জে. এস. বার্নথির সাম্প্রতিক গবেষণাটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[৬৬] কোয়াসার কি? ডাঃ বার্নথির আশঙ্কার প্রতিধ্বনিতে জিজ্ঞাস্য: কোয়াসার কি বাস্তব, না কেবলি দৃষ্টিভ্রম?

একমাত্র মহাকাল এর মীমাংসা করবে। তবে কোয়াসার যদি বাস্তব না হয়ে দৃষ্টিভ্রমই হয়, তাহলে কিছু মাত্র বিস্মিত হবার কারণ নেই। এই ধরণের দৃষ্টিভ্রম আমাদের নীহারিকার বহিঃস্থ কোন লেন্স জাতীয় নীহারিকার জন্যে ঘটতে পারা অসম্ভব নয়। দ্বিতীয় নীহারিকার চৌম্বক ক্ষেত্র এই লেন্স-ধর্মীতার জন্যে দায়ী, মনে হয় এরকম নীহারিকার অন্য পাশে অবস্থিত কোন ভীষণভাবে বিস্ফোরিত কেন্দ্রকবিশিষ্ট নীহারিকার আলো আসবার পথে এই ক্ষেত্রে বেঁকে গিয়ে এরকমের দার্শ ধাঁধা সৃষ্টি করছে। এই নীহারিকা মাধ্যমের অন্যতম ধর্ম প্রতিবিম্বে ঔজ্জ্বল্য বর্ধন করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, সেফার্ট নীহারিকার আলো একটি বৃহৎ উপবৃত্তাকার নীহারিকা-লেন্সের দ্বারা বেপথু হলে এমন একটি দার্শ বিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা—এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দার্শ প্রতিবিম্বগুলি বর্ণালীছত্রের বিপুল লাল অপসরণ, পরম দ্যুতি, বেগুনীপারের আলোকাধিক্য, ঔজ্জ্বল্যের অনিয়মিত পরিবর্তন এবং শক্তিশালী বেতার বিকিরণ—ইত্যাদি কোয়াসারের যাবতীয় ধর্মাধর্ম ব্যাখ্যাত করছে।

কোয়াসার বাস্তব বা দৃষ্টিভ্রম যাই হোক না কেন, তাতে তার রহস্যের, ইঙ্গিতের এবং বৈপ্লবিক ধরণের কিছু আসে যায় না। কেন না, বিশ্বছবি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রতিবিম্বগুলি যে আশার সঞ্চার করেছে, তা যথেষ্ট।

১ কোলিয়ারস এন্সাইক্লোপীডিয়ায় আলান লেভি ও র‍্যালফ মিলার লিখেছেন—১৯৬৩ সালে বেতার দূরেক্ষণের দ্বারা কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়। এই উক্তি ভুল। আসলে ১৯৬০ সালে ৩সি তালিকায় শক্তিশালী বেতার উৎস সনাক্তকরণের সময় কোয়াসার আবিষ্কৃত হয়েছে।[২১]

২ Edge, Shakeshait, McAdam, Baldwin, Archer: Memoirs R A S 68, 37 ('59)

৩ Bennet: Memoirs R. A. S. 68, 163 ('62)

৪ Pilkington & Scott: Memoirs R. A. S. (in press) [১২-তে উল্লিখিত]

৫ Gower (in preparation) [১২-তে উল্লিখিত]

৬ Mills, Slee & Hill : Aust J. Ph : 11 360 ('58)

৭ Ibid : Aust J. Ph : 13, 676 ('60)

৮ Ibid : Aust J. Ph : 14 497 ('61)

৯ Bolton, Gardner & McKay : Aust J. Ph : 17 340 ('64)

১০ Moffet & Maltby : Astrophy. J. Suppl 7, No. 67 ('62)

১১ Allen, Anderson, Conway, Palmer, Reddish & Rowson : M. N. 124, 477 (62)

১২ Shakeshaft : Sci. Prog. 63 515 ('65)

১৩ Clarke M. N. 127, 405 ('64)

১৪ Read : AJ. 138, 1 ('63)

১৫ Fomalont. Matthews, Morris & Wyndham A. J 69, 772 ('64)

১৬ Wyndham & Read. A. J. 70, 70, 120, ('65)

১৭ Adgie : Nature 204 1028 ('64) [ইনি আরও প্রস্তুত করছেন]

১৮ Hazard et al : Nature 202, 227 ('64)

১৯ Veron : A. J. 141, 1284 ('65)

২০ McNally : Sci. Prog. (Oxford) 52, 207 ('64)

২১ Smith : ncyclopedia Americana : Vol. 23 (International Edn, 1966)

২২ Schmidt : Nature 197, 1040 ('63)

২৩ Greenstein & Matthews : Nature 197, 1041 ('63)

২৪ Schmidt & Matthews : A. J. 139 781 ('64)

২৫ Schmidt : A. J. 141, 1295 ('65)

২৬ Burbidge : A. J. 142, 1674 ('65)

২৭ কোলরাডো, ডেনভারে মে '৬৫ কন্‌ফারেন্সে বিবৃত

২৮ Matthews & Sandage : A. J. 138 30 ('63)

২৯ Smith & Hoffleit : Nature 198, 650 ('63)

৩০ Sciama : Sci. Journ, Nov. ('65)

৩১ Smith : Quasistellar Radio Sources & Gravitational Collapse (Chicago, '65). Robinson Ed.

৩২ Goldsmith & Kinman : A. J. 142, 1693 ('65)

৩৩ Burbidge & Burbidge : A. J. 143, 271 ('65)

৩৪ Wampler : Conf. Obs. Asp. Cosm. (Miami, '65)

৩৫ Low & Johnson ; A. J. 141, 336 ('65)

৩৬ Brubidge & Reosenburg ; A. J. 142, 1673 ('65)

৩৭ Hoyle, Burbidge & Sargent : Nature. 209, 5025 ('66)

৩৮ Barber, Donaldson, Miley & Smith : Ibid

৩৯ Dent : Conf. Obs. Asp. Cosm. (Miami '65)

৪০ Epstein : A. J. 142, 1285 ('65)

৪১ Low ; A. J. 142, 1287 ('65)

৪২ Sandage : A. J. 139, 416 ('64)

৪৩ Zel' Dorich & Novikov : Uspekhi Fizicheskikh Naux 86, 3-4

৪৪ Sholomitsky : Sov, Astro, A. J. 9, 516 ('65)

৪৫ Maltby & Moffet : A. J. 142, 409 ('65)

৪৬ Allen, Hanbury-Brown & Palmer : M. N. 125 ('57)

৪৭ Adgie & C : Nature 208. 275 ('65)

৪৮ Greenstein & Schmidt : A. J. 140, 1 ('64) (এঁরা ৩ সি ৪৮ ও ৩ সি ২৭৩ প্রভব দুটির গঠন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তুলনামূলক একটি ছবি পাবার জন্যে পাঠক এটি দেখতে পারেন)

৪৯ Hazard, Mckay & Shimmens : Nature 197, 1037 ('63)

৫০ Hughes : Nature. 207, 179 ('65)

৫১ cf. Rees & Sciama : Nature 208 371 ('65)

৫২ cf. Palmer : Conf. Obs. Asp. Cosm. (Miami '65)

৫৩ Hunter (Jr), Sofia & Fletcher : Nature 210, 5034 ('66)

৫৪ Kellermann : A.J. 140, 969, ('64)

৫৫ Slish : Nature 199, 682 ('63)

৫৬ Williams : Nature 200, 56 ('63)

৫৭ Heescher : Publ. a. s. Paci. 72, 358 ('60)

৫৮ Dent & Haddox : Nature 205, 487 ('65)

৫৯ Dent & Haddok , Quasistellar Radio Source & Gravitational Collapse

৬০ Jeffreys : Quasistellar Radio Source & Gravitational Collpse (Chicago '65) p 219

৬১ Hewish, Scott & Wills : Nature 203, 1214 ('64)

৬২ Anderson, Donaldson, Palmer & Rowson : Nature 205, 375 ('65)

৬৩ Ryle & Sandage : A. J. 139, 419 ('64)

৬৪ Sandage : A.J. 141, 1560 ('65)

৬৫ Kinman : A. J. 142, 1241 ('65) (৬৪-এর বক্তব্যের বিরুদ্ধালোচনার জন্যে)

৬৬ Aron. Arbor Mich-এর আমেরিকান অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির একটি সভায় বার্নথি তাঁর কাজের বিবরণ দিয়েছিলেন ; খবরটির জন্যে পাঠক Sc. News Letter 81 : 117, Aug'21 ('65) দেখতে পারেন।

[এই প্রবন্ধ রচনার সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন, সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ, সাহা ইনস্টিটিউটের ডাঃ জয়ন্ত বসু, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসার ডাঃ অরুণেন্দু সরকার, মাক্কাচুয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত বন্ধু অধ্যাপক ডাঃ শম্ভুচরণ বণিক এবং বন্ধুবর অমল সোম। এঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি]

বিজ্ঞান-সংবাদ

রক্ত পরিষ্কারে কৃত্রিম মূত্রাশয়

সম্প্রতি কৃত্রিম মূত্রাশয়ের একটি উন্নততর সংস্করণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত হয়েছে। ফলে মানুষের প্রাণরক্ষাকারী এই ব্যবস্থাটির কার্যকারিতা আরও বেড়েছে এবং রোগীদের পক্ষে ব্যাপকভাবে এই ব্যবস্থার সাহায্য পাওয়াও সম্ভব হয়েছে।

কৃত্রিম মূত্রাশয় আসলে একটি যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর দেহের রক্ত পরিষ্কার করা হয়। মূত্রাশয়ের অন্যতম প্রধান কাজ রক্ত পরিষ্কার করা। যে সকল রোগীর মূত্রাশয় ব্যাধিগ্রস্ত হবার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদন করতে পারে না, এই যন্ত্রটি তাদের সে কাজে সহায়তা করে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে যে সব কৃত্রিম মূত্রাশয় যন্ত্রের বহুল প্রচলন রয়েছে, তাতে কীল ডায়ালাইজারের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ৪০ ও ১৫ ইঞ্চি এবং সাধারণ একজন রোগীর রক্ত পরিষ্কার করতে এর ১২ ঘণ্টা থেকে ১৬ ঘণ্টা সময় লাগে।

নতুন যে ডায়ালাইজারটি উদ্ভাবন করা হয়েছে, সেটি মাত্র ৮ ঘণ্টা থেকে ১০ ঘণ্টায় রক্ত পরিষ্কারের কাজ করে এবং আয়তনেও অনেক ছোট। এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ১৫ ও ৮ ইঞ্চি। এর ওজনও কীল ডায়ালাইজারের এক চতুর্থাংশ। এর নির্মাণ-ব্যয়ও কীল ইউনিটের অর্ধেক।

কীল ইউনিটটি চালু করতে যেখানে প্রায় ২০০ ঘনসেন্টিমিটার রক্তের প্রয়োজন হতো, নতুন ইউনিটটির জন্যে সেখানে প্রয়োজন হয় মাত্র ৭০ ঘনসেন্টিমিটার রক্ত।

কৃত্রিম মূত্রাশয় যন্ত্রটি রোগীর বিছানার পাশে রাখা হয়। রোগীর দেহ থেকে রক্ত টেনে নিয়ে এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করে পুনরায় তা রোগীর দেহের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়। এই প্রক্রিয়ায় রোগী কোনরূপ দৈহিক যন্ত্রণা বোধ করে না। তবে অনেকগুলি নলের সাহায্যে রোগীর দেহের রক্তবাহী নালীর সঙ্গে যন্ত্রটির যোগসাধন করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার রোগী সাময়িকভাবে এই ধরণের যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে রোগমুক্ত হয়ে থাকে, আবার কিছুসংখ্যক রোগীকে স্থায়ীভাবে এই যন্ত্রের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়।

মহাকাশের উল্কাজাত পদার্থ সম্পর্কে গবেষণা

মহাকাশ থেকে পাওয়া একটি উল্কাজাত পদার্থ সম্প্রতি বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং মার্কিন বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন নিনিঙ্গারাইট।

আরিজোনার অন্তর্গত সেডোনিয়ার ডাঃ এইচ. এইচ নিনিঙ্গারের সম্মানে এই নামকরণ করা হয়েছে।

উল্কাকণার গবেষণায় এই মার্কিন বিজ্ঞানীর দান অসামান্য। এই প্রস্তরবৎ বা ধাতব পদার্থগুলি মহাকাশ থেকে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। পৃথিবীতে প্রাপ্ত যে কোন পদার্থ অপেক্ষা এগুলি অধিকতর প্রাচীন। মূল যে পদার্থ দিয়ে সৌরজগৎ গঠিত, এরা তার অংশবিশেষ হতে পারে। কাজেই সৌরজগতের উৎপত্তির কিছু হদিস পাওয়া যেতে পারে এথেকে।

এই নতুন পদার্থটি লোহা, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ও গন্ধকের সংমিশ্রণে প্রস্তুত আয়রন ম্যাগ্‌নেসিয়াম সালফাইড।

বিশ্লেষণের কাজটি করেছেন ডাঃ কেনেথ স্নেৎসিঙ্গার এবং ডাঃ ক্লস কীল। এঁরা ক্যালিফোর্ণিয়ার সানফ্র্যান্সিস্কোর সন্নিকটে এম্‌স্ রিসার্চ সেন্টারে ভূ-রসায়ন বিজ্ঞানী। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এই কেন্দ্রটির পরিচালনা করে।

উল্কাকণায় এই ধাতুটির উপস্থিতি এর আগে আরও তিনজন বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেছেন। এঁদের মধ্যে আমেরিকার ডাঃ কার্ট ফ্রেড্রিকসন ও সুইডেনের ডাঃ ফ্রান্স উইকম্যান একযোগে কাজ করেছিলেন এবং জার্মেনীর ডাঃ পল র‍্যামডর একাকী গবেষণা করেছিলেন।

পৃথিবীর উল্কাকণা সংগ্রহে নিনিঙ্গারাইটের যত প্রকার নমুনা আছে, ডাঃ স্নেৎসিঙ্গার ও ডাঃ কীল তার সবগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। এই সমস্ত নমুনার অংশবিশেষ তাঁরা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করেছেন। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র পদার্থকে বহু সহস্র গুণ বর্ধিত করে দেখায়। তাঁরা বলেন যে, পরীক্ষায় দেখা গেছে, বিজ্ঞানের নতুন শাখা 'মহাকাশ ভূতত্ত্ব' সম্পর্কে এই উল্কাজাত পদার্থটির এক বিশেষ তাৎপর্য আছে।

জলের ভাইরাস দূরীকরণে রাসায়নিক পদার্থ

তিন জন মার্কিন রসায়নবিদ এমন একটি পদার্থ আবিষ্কার করেছেন, যা জলের মধ্য থেকে ভাইরাস দূর করতে পারে। এটি রঞ্জন জাতীয় একটি পদার্থ। ভাইরাসবাহিত যে সকল সংক্রামক রোগের কারণ জল, সেই সব রোগ নিরাময়ে এই পদার্থটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। বিশেষ করে উন্নতিশীল দেশগুলিতে এটি কাজে লাগবে। কারণ, দেখা গেছে, এই সব দেশে ভাইরাসবাহিত অনেক ব্যাধির মূল হলো অবিশুদ্ধ পানীয় জল। প্লাষ্টিক, রং ও ওষুধপত্র তৈরি করতে যে সব রাসায়নিক পদার্থ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই রঞ্জন জাতীয় পদার্থটি তাদেরই অনুরূপ।

হৃদ্‌রোগ প্রশমনে আহারের ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রে ৮১৪ জন মধ্যবয়স্ক লোকের একটি দলকে গত নয় বছর ধরে খাদ্য সম্পর্কে অতি কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখবার ফলে দেখা গেছে, এদের মধ্যে হৃদ্‌রোগ বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছে। অ্যান্টি-করোনারী ক্লাব নিউইয়র্কে এই স্বাস্থ্য-সমীক্ষাটি পরিচালনা করেছিলেন। তাদের যে আহার্যবস্তু দেওয়া হতো, তা উদ্ভিজ্জ তৈল ও অম্লজাতীয় পদার্থসমৃদ্ধ এবং তাতে জান্তব চর্বির পরিমাণ কম। আইস ক্রীম, শক্ত পনীর ও কেক-প্যাষ্ট্রি এই আহার্য তালিকায় ছিল না। খাঁটি দুধের পরিবর্তে তাদের মাঠা-তোলা দুধ দেওয়া হয়েছে এবং মাখনের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে মার্গারিন ও উদ্ভিজ্জ তৈল।

সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করবার বৃহত্তম কারখানা

আমেরিকার দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করবার যে কারখানাটি স্থাপিত হবে, তাতে বেসরকারী সংস্থাসমূহও সহযোগিতা করবেন। এটি হবে এবিষয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম কারখানা এবং ঐ কারখানায় প্রতি দিন ১৫ কোটি গ্যালন সমুদ্রের জলকে লবণমুক্ত করে পানীয় জলে পরিণত করা হবে। বিশুদ্ধ জল উৎপাদন ছাড়াও ঐ কারখানায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হবে। ঐ কারখানায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-শক্তি দুটি রিয়্যাক্টরের সাহায্যে উৎপাদন করা হবে।

বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে অস্থি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা

বিশেষ ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত বিদ্যুৎ-শক্তি প্রয়োগ করে যে অস্থি বাড়ানো যেতে

পারে—আমেরিকার বিজ্ঞানীরা তা প্রমাণ করেছেন। দুর্ঘটনার ফলে হাড় ভেঙ্গে গেলে অনেক সময় অপারেশন করে তা অপসারণ করতে হয় এবং সেই জায়গায় কৃত্রিম হাড় লাগাতে হয়। ঐ সকল সাধারণতঃ ধাতু দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এবং তা ক্ষয়ে যায়। এই নতুন ব্যবস্থায় আর কৃত্রিম হাড় লাগাবার প্রয়োজন হবে না, বিদ্যুৎ-শক্তি প্রয়োগ করে রোগীর দেহের হাড় বাড়িয়ে শূন্য স্থানটি পুরণ করা যাবে। কৃত্রিম অস্থি লাগাবার যে সব অসুবিধা আছে, তাও অপসারিত হবে।

শিশুর দোলনায় তাপ নিয়ন্ত্রণকারী চাঁদোয়া

শিশুর দোলনায় ব্যবহারের জন্যে এক প্রকার স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের চাঁদোয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর সঙ্গে তাপ সৃষ্টি করবার জন্যে একটি স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ইউনিট থাকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা গবেষণার ফলে লক্ষ্য করেছেন যে, দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ অনেক শিশুর ক্ষেত্রেই একটা সমস্যা। এই নতুন চাঁদোয়ার তাপ সৃষ্টি করবার ইউনিটটি একটি ছোট যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই যন্ত্রটি শিশুর ত্বকের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এইরূপে নবোদ্ভাবিত চাঁদোয়া শিশুর নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে তাপ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

টেলিফোনে ডাক্তার ও নার্সদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার ও নার্সেরা এখন এক নতুন ও সুবিধাজনক পদ্ধতিতে ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন অগ্রগতির কথা অতি দ্রুত জানতে পারেন। এজন্যে তাঁদের কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। শুধু একটি টেলিফোনের নম্বর ডায়াল করলেই হলো। তাহলেই তাঁরা সাম্প্রতিক চিকিৎসা-পদ্ধতি সম্পর্কে বক্তৃতা ও আলোচনা শুনতে পাবেন। ২১টি হাসপাতাল এই কর্মসূচীতে অংশ নিয়েছে। এই সব হাসপাতালের চিকিৎসকেরা একটি 'টেলি-লেকচার সার্ভিসে' মিলিত হয়ে আলোচনা করবার সময় তার টেপ রেকর্ড গৃহীত হয়। টেলিফোনে নির্দিষ্ট সংখ্যা ডায়াল করলেই ঐ টেপ রেকর্ডারে গৃহীত আলোচনা শোনা যায়।

মাছের গুঁড়া দিয়ে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরির কারখানা

মাছের গুঁড়ায় প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য প্রস্তুত করবার কারখানা নির্মাণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমেরিকার বেসরকারী ক্ষেত্রের শিল্পপতিদের নিকট প্রস্তাব করেছেন। ঐ ধরণের পরীক্ষামূলক কারখানায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০ টন মাছের গুঁড়া তৈরি হবে। বর্তমানে আমেরিকার একটি ছোট কারখানায় এই গুঁড়া তৈরি হয়। এই গন্ধ ও বর্ণহীন গুঁড়ার মধ্যে আছে শতকরা ৭৫ ভাগ প্রোটিন, তাছাড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী অন্যান্য ধাতব উপকরণ এবং নানা প্রকার ভিটামিন। বুভুক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্যসূচীতে এই পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ঐ ধরণের আরও একটি কারখানা কোন উন্নতিশীল রাষ্ট্রে স্থাপন করবার জন্যে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

জীবাণু চাষীর সাহায্যে আসবে

মাটিতে যে জীবাণু থাকে, তারা গাছকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন সরবরাহের ব্যাপারে চাষীর কাজে আসতে পারে। সাধারণভাবে চাষী ক্ষেতে সার ছড়িয়ে গাছকে নাইট্রোজেন জোগায়। মাটির এই ক্ষুদ্র বাসিন্দারা যদি কোন পদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবে গাছপালাকে নাইট্রোজেন জোগাতে পারে, তাহলে সার ব্যবহার বাবদ চাষীর খরচ

অনেক কমে যাবে। একটি বৃটিশ ফার্ম (সয়েল ফার্টিলিটী ডান্‌স লিমিটেড) ঠিক এমনি এক পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন।

এই পদ্ধতিতে শতকরা ২৯ ভাগ নাইট্রোজেন-যুক্ত অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয় এবং তা ২ থেকে ৪ ইঞ্চি মাটির নীচে চলে গিয়ে কাদা-মাটির সঙ্গে মিশে যায়। মাটির অনেক নীচে চলে যায় বলে এতে অঙ্কুরের কোন ক্ষতি হয় না। শীতের সময় তো কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকেই না।

মাটির মধ্যে যে জীবাণু থাকে, তারা অ্যামো-নিয়াকে নাইট্রেটে পরিণত করে, কিন্তু এর জন্যে মাটি যথেষ্ট পরিমাণে গরম থাকা চাই। শীতের সময় জীবাণুগুলি কোন কাজ করে না—নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে; অর্থাৎ যদি নভেম্বরের মাঝা-মাঝি থেকে মার্চের মাঝামাঝি পর্যন্ত ক্ষেতে এই অ্যামোনিয়া প্রয়োগ করা হয়, তাহলে তা অবিকৃত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায় ৪০° ফাঃ না হয়। তারপর জীবাণুগুলির কাজ সুরু হয় এবং প্রচুর পরিমাণে নাইট্রেট পাওয়া যায়। ঠিক সেই সময়েই গাছপালার পক্ষে তার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। এভাবে শীতের সময় একবার মাত্র অ্যামোনিয়াম প্রয়োগ করে বসন্তের দিনে তা থেকে কাজ পাওয়া যায়।

অ্যাকোয়াস অ্যামোনিয়া (জলীয় পদার্থ) ট্র্যাক্টরের সাহায্যে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যায়। টাইন ও ডিস্‌কগুলি যখন মাটি ভাঙ্গে, তখন ইঞ্জেকসন টিউবগুলির সাহায্যে জলীয় অ্যামোনিয়া মাটিতে ঢুকে যায়। ফলে ব্যয় অনেক কম হয়। প্রতি ইউনিটে ২ পেন্স বা ১ একরে প্রায় ১ পাউণ্ডের মত খরচ কম পড়ে। গুঁড়া বা শক্ত সার ব্যবহারের জন্যে যে সব ষ্টোরেজ ট্যাঙ্ক, পরিবহন ইত্যাদির প্রয়োজন, এতে তার কিছুই লাগে না বলে ব্যয় অনেক কম হয়।

পুস্তক পরিচয়

লেখা দেখে লোক চেনা—কামাখ্যাপ্রসাদ রায়। ত্রয়ী প্রকাশনী—১/৮৩, নাকতলা; কলিকাতা-৪৭; মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিভিন্ন লোকের হাতের লেখার ষ্টাইল বা ধরণ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। হস্তাক্ষরের নমুনা দেখে লেখকের প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় কিনা, এসম্বন্ধে অনেকেরই একটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। মনোবিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—হাতের লেখার ধরণ থেকে লেখকের প্রকৃতি সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য উন্মাদ বা নাবালকের লেখা, পেন্সিলের লেখা, লাইন-টানা কাগজে লেখা, কালি চুপ্‌সে-যাওয়া লেখা, নতুন নিবের লেখা এবং আরও কিছু কিছু লেখা দেখে মানুষের প্রকৃতি বিচার করা চলে না। তাছাড়া লেখাটা স্ত্রী কি পুরুষের এবং তাদের বয়স ইত্যাদিও জানা দরকার। মোটের উপর হস্তলিপি-বিজ্ঞানীরা হস্তলিপির কতকগুলি বৈশিষ্ট্যকে বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থার পরিচায়ক হিসাবে ধরে নিয়েই অগ্রসর হয়ে থাকেন।

আলোচ্য পুস্তকখানির লেখক অনেক দিন থেকেই বাংলা হস্তলিপি সম্বন্ধে এসব বিষয়ে অনুসন্ধান-কার্যে ব্যাপৃত আছেন। অনুসন্ধান-লব্ধ ফলের একদিক সম্বন্ধে পুস্তকখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। অনুসন্ধানী পাঠক মাত্রেই বইখানি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে—শ্রীঅবনীভূষণ ঘোষ। প্রকাশক—শ্রীভবেশ বিশ্বাস ; ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ; কলিকাতা-৯ ; পৃঃ—২০০ ; মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

মানুষমাত্রেই সংস্কারের প্রভাবাধীন। কত রকমের সংস্কার যে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার ইয়ত্তা নেই। সংস্কারবশে মানুষ ভাল-মন্দ অনেক কিছুই করে থাকে। কতকগুলি সংস্কার অবশ্য মানুষকে কল্যাণের পথেও এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু অনেকের মনে এমন কতকগুলি যুক্তিহীন অন্ধসংস্কার ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে যে, সেগুলি পদে পদে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং চিন্তাধারাকেও কলুষিত করে দেয় কার্য-কারণ নির্ধারক বিচারভিত্তিক বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন সব ব্যাপারে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা আজও বড় কম নয়। আমাদের দেশে ভূত-প্রেত, তন্ত্র-মন্ত্র, আভিচারিক ক্রিয়াকলাপ, দেব-দেবীর ভর—এমন কি, তাবিজ, কবচ, বাণমারা, নলচালা, বাটিচালা প্রভৃতি ব্যাপারে বিশ্বাসী লোকের অভাব নেই। এসব অন্ধবিশ্বাসের ফলে কতভাবে যে কত লোকের অনিষ্ট সাধিত হয়ে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই। এসব অলৌকিক ব্যাপার যে কোন বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—মানসিক দুর্বলতা, বিচার বুদ্ধির অভাব, চিরাচরিত কার্য-পদ্ধতির উপর আসক্তি, আপ্তবাক্য, দৃষ্টিভ্রম, শ্রুতি-বিভ্রম প্রভৃতি নানা কারণে বাস্তব বলে প্রতিভাত হয়, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক সে কথাই যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

শ্রুতিপারের শব্দ—ডক্টর অমিয়কুমার মজুমদার। প্রকাশক শ্রীশান্তিরঞ্জন চক্রবর্তী। লিপিকা ; ৩১/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ ; মূল্য—২ টাকা।

আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ-তরঙ্গের বাইরে অতি উচ্চ কম্পনাঙ্কের শব্দ-তরঙ্গকে বলা হয় সুপারসনিক বা আল্ট্রাসনিক্স। এই উঁচু পর্দার শব্দ আমরা শুনতে পাই না। বিংশ-শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রুতিপারের শব্দ সম্পর্কে গবেষণা সুরু হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ডুবো-জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয়ের জন্যে সুপার-সনিক্সের ব্যবহারিক প্রয়োগের চেষ্টা চলে' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে চিকিৎসা, শিল্প ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন কাজে সুপার-সনিক্সের ব্যবহার হতে থাকে। বর্তমানে এর ব্যবহারিক প্রয়োগ আরও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হচ্ছে।

পুস্তকখানিতে লেখক শ্রুতিগোচর শব্দ থেকে আরম্ভ করে শ্রুতিপারের শব্দ উৎপাদনের ব্যবস্থা এবং তার সাহায্যে রোগনির্ণয়, বীজাণু ধ্বংস, অস্ত্রবিহীন অস্ত্রোপচার, কংক্রিট ও ধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থ ফাটল নির্ণয়, নিরাপত্তার ব্যবস্থা, ধোঁয়া ও ধূলি নিষ্কাশন, ধোলাইয়ের কাজ, অন্ধদের পথ চলার ব্যবস্থা—এমন কি, চুরি ও দুর্ঘটনা নিবারণ—প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যাপারে সুপার-সনিক্সের ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বইখানি পড়ে পাঠকেরা শ্রুতিপারের শব্দ সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারবেন।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা
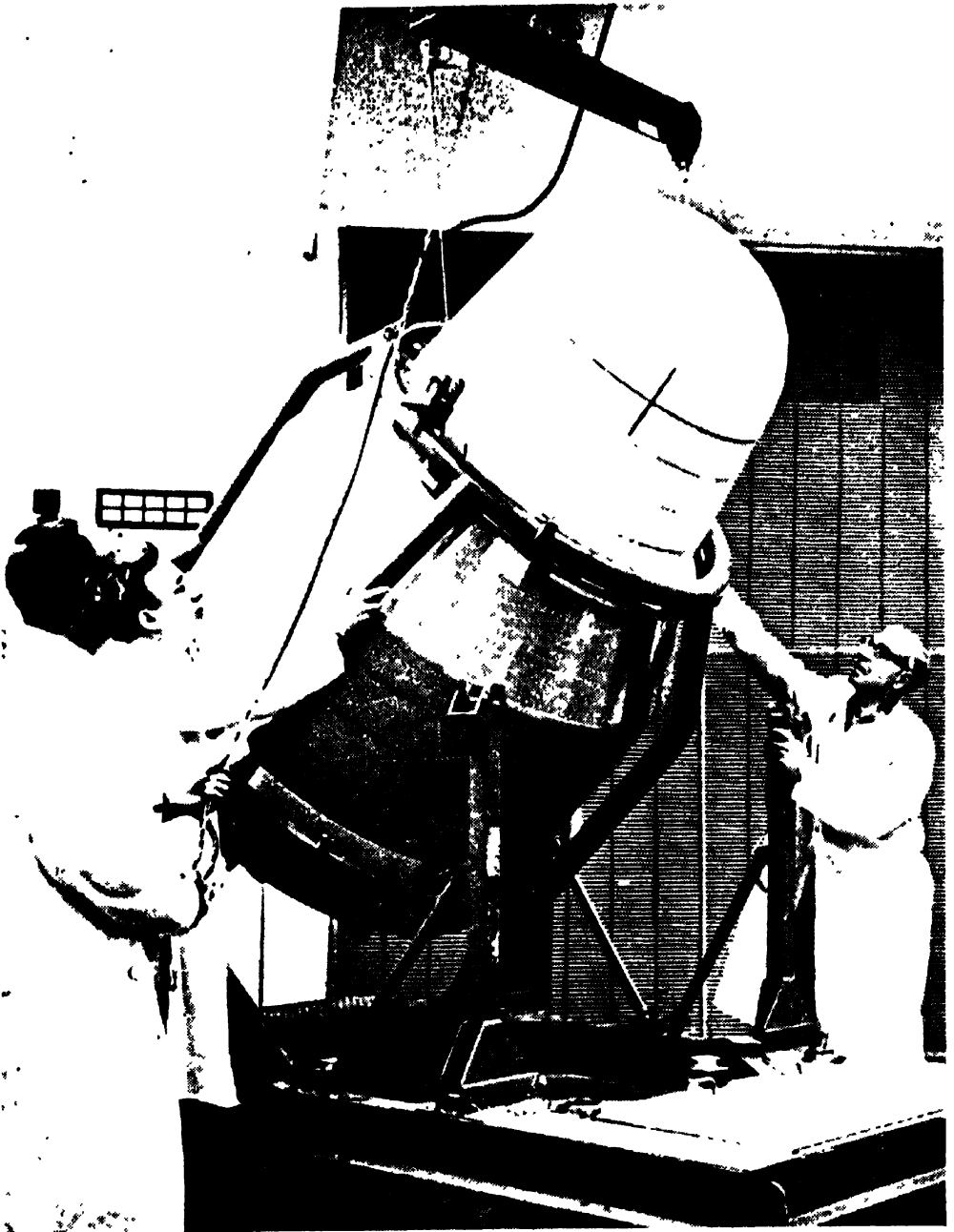
মহাকাশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দীর্ঘকাল থাকবার ফলে জীবন-ক্রিয়ার কিরূপ পরিবর্তন ঘটে, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে জীবন্ত এককোষী প্রাণী, কীট-পতঙ্গ ও ছোট ছোট উদ্ভিদসহ এরূপ একটি কৃত্রিম উপগ্রহ কেপ কেনেডি থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

করে দেখ

সূচ জলে ভাসাবার কৌশল

পূর্বে তোমাদের কাছে জল এবং অন্যান্য তরল পদার্থের তলটান (Surface tension) সম্পর্কিত কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলেছি। এবারে সে রকম অতি সাধারণ একটা পরীক্ষার কথা বলছি। তোমরা অনেকেই হয়তো এই পরীক্ষাটা করে দেখেছ, তবুও সহজ ব্যবস্থায় কি ভাবে করা যায়, সে কথাটাই জানিয়ে দিচ্ছি।

যে কোন তরল পদার্থের উপরিতলে সূক্ষ্ম একটা পর্দার মত আস্তরণ থাকে। এই পর্দাটা তরল পদার্থের উপরিতলকে যেন বেশ জোর করে টেনে রাখে। একেই বলা হয় তলটান।
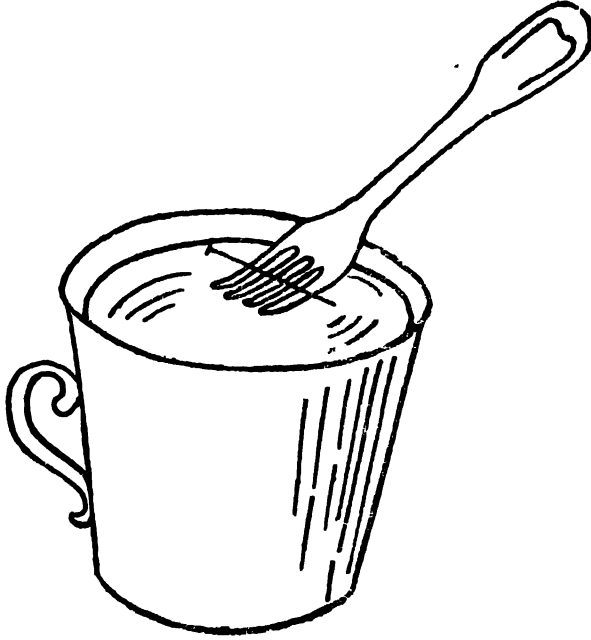
একটা সূচ বেশ ভাল করে শুকিয়ে নাও। তারপর ছবির মত করে সূচটাকে একটা টেবিলের কাঁটার উপর রেখে জলভর্তি একটা পাত্রের মধ্যে কাঁটাটাকে ডুবিয়ে দাও। কাঁটাটা জলের নীচে যেতেই সূচটা জলের উপর ভেসে থাকবে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে—জলের উপরিতলটা যেন সূচটার ভারে খানিকটা নীচের দিকে বেঁকে গেছে। একটি ক্ষুরের ফলা দিয়েও ঠিক এরকমের পরীক্ষা করতে পার। খুব সতর্কতার সঙ্গে কাঁটাটাকে ডুবিয়ে দিতে পারলে প্রত্যেক বারেই সাফল্য লাভ করবে।

—গ—

বাংলার জীবজন্তু

পশ্চিম বাংলার মোট অরণ্যভূমির পরিমাণ ৫১৭৩ বর্গমাইল ; অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার মোট আয়তনের ⅙ ভাগ। এর মধ্যে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বনের পরিমাণ ৩৮৯৪ বর্গমাইল। অবশিষ্ট বন বেসরকারী হলেও তা সরকারী অরণ্য আইন অনুসারে নিয়ন্ত্রিত। বাংলার এই বিস্তৃত বনাঞ্চলে আছে অসংখ্য বন্য প্রাণী। চেহারায়, চাল-চলনে—সবাই আলাদা। এই বন্য প্রাণী আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই সব প্রাণীর চামড়া, লোম, দাঁত ইত্যাদি বিক্রয় করে প্রচুর আয় হয়।

বাংলার বনে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর বাস। এস্থলে তাদের সকলের পরিচয় দেবার অবকাশ নেই ; কাজেই শুধু কয়েকটি প্রাণীর কথাই উল্লেখ করবো।

বাংলার জীবজন্তুর কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে বিখ্যাত রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের কথা। এই বাঘ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন এবং উত্তর বাংলার তরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে অনেক দেখা যায়। এই বাঘ সাধারণতঃ নয় থেকে দশ ফুট লম্বা হয়। তবে বারো ফুট লম্বা বাঘও দেখা গেছে। লেজ সাধারণতঃ তিন ফুট লম্বা। উচ্চতা তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট আর ওজন গড়ে সাড়ে পাঁচ মণ। গায়ের রং উজ্জ্বল পিঙ্গল ; তার সঙ্গে খানিকটা কপিশ আভা দেখা যায়। গোটা দেহের উপর আড়াআড়িভাবে কালো ডোরা কাটা। পেটের দিকটা সাদা। লেজের উপর চক্রাকার অনেকগুলি কালো দাগ। কানের বাইরের অংশ কালো। কানের ভিতরে একটি প্রশস্ত সাদা ছাপ।

বাংলার এই বাঘের প্রধান খাদ্য বন্যবরাহ, নানান জাতের হরিণ, সজারু, ময়াল-সাপ প্রভৃতি। সুযোগ পেলে এরা গৃহপালিত পশু এবং মানুষ শিকার করে থাকে। কোন পশু শিকার করলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাধারণতঃ ২।৩ দিন ধরে নিহত পশুটির কাছাকাছি থাকে।

এই বাঘ সাধারণতঃ একাকী বিচরণ করে। কখনও কখনও বাঘ ও বাঘিনীকে একসঙ্গে দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ মানুষের কোন অনিষ্ট করে না, তবে কোন রকমে উত্যক্ত বা আহত হলে ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে। একবার রক্তের স্বাদ পেলে, খাদ্যের জন্যে মানুষ হত্যা করা এদের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। নরখাদক বাঘ অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ও চতুর হয়ে থাকে।

বাঘিনী পনেরো সপ্তাহ গর্ভধারণ করে এক সঙ্গে দুই থেকে চারটি শাবক প্রসব করে। শাবকেরা যতদিন পর্যন্ত নিজেরা শিকার ধরতে সক্ষম না হয়, ততদিন মায়ের সঙ্গে থাকে। তারপর তারা স্বাধীনভাবে বনে বিচরণ করে।

আজকাল যত রকমের ভূচর স্তন্যপায়ী প্রাণী দেখা যায়, তাদের মধ্যে হাতীই আয়তনে বৃহত্তম। পুরুষ হাতীর কাঁধ পর্যন্ত উচ্চতা ৯ ফুট। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, হাতীর উচ্চতা তার সামনের পদতলের পরিধির ঠিক দ্বিগুণ হয়ে থাকে। একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতীর ওজন সাধারণতঃ চার টন। সে তুলনায় একটি স্ত্রী হাতীর গড়পড়তা ওজন মাত্র আড়াই টন। পুরুষ হাতীর সাধারণতঃ ২টি, কদাচিৎ ১টি গজদন্ত থাকে। যে হাতীর একটিমাত্র গজদন্ত থাকে, তাকে 'গনেশ' হাতী বলা হয়। আবার যে হাতীর গজদন্ত বরাবর অঙ্কুরাবস্থায় থাকে—কখনও বাড়ে না, তাকে 'মাকনা' হাতী বলা হয়।

গজদন্ত আট ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। একজোড়া গজদন্ত ওজনে প্রায় ৩০ সের পর্যন্ত হতে পারে। কখনও কখনও ওজন এর চেয়ে বেশীও হয়। সব পুরুষ ও স্ত্রী হাতীর সামনের পায়ে ৫টি ও পিছনের পায়ে ৪টি নখ থাকে। হাতীর গায়ের রং ধূসরাভ কালো। কান, কপাল ও বুকে প্রায়ই কতকগুলি মাংসের মত রঙের দাগ দেখা যায়।

উঁচু গাছের বন অথবা উঁচু ঘাসের বনই সাধারণতঃ হাতীর বিচরণ-ক্ষেত্র। এদের সবচেয়ে প্রিয় বিচরণ-ক্ষেত্র হচ্ছে বাঁশ, পুরুণ্ডি এবং বুনো কলাগাছ সমাকীর্ণ জঙ্গল। এরা ইতস্ততঃ বিচরণ করে। তৃণ, বিভিন্ন লতা-গুল্ম, উদ্ভিদের পাতা, ডালপালা, কলা, চালতা, ডুমুর ও অন্যান্য ফল এদের খাদ্য। পূর্ণবয়স্ক একটি হাতী সারাদিনে প্রায় আট মণ উদ্ভিজ্জ দ্রব্য উদরস্থ করে। হাতী অত্যন্ত চঞ্চল—মধ্যাহ্নে আর মধ্যরাত্রে মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হয়ে বিশ্রাম নেয়। বাকী সময়টা চরে বেড়ায়।

স্নান ও জলকেলী করা হাতীদের অতি প্রিয় অভ্যাস। কর্দমাক্ত জলাভূমিতে এরা মনের আনন্দে গড়াগড়ি দেয়। শুঁড় দিয়ে শুক্‌নো মাটি ও জল তুলে নিজ দেহে ছড়ায়। হাতী সাধারণতঃ দিনে দু-বার জল পান করে। এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হাতী সচরাচর দল থেকে কতকটা দূরে থাকে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে দলের সঙ্গে মিলিত হয়।

স্ত্রী হাতী ২০ মাস গর্ভধারণ করবার পর এক সঙ্গে একটিমাত্র শাবক প্রসব করে। জন্মাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই শাবক হাঁটতে সক্ষম হয়। ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শাবক মায়ের দুধ পান করে। তারপর ঘাস খাওয়া সুরু করে। ২৫ বছর বয়সে হাতী পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উত্তর বাংলার হিমালয়ের পাদদেশের বনে হাতী আছে অনেক।

গণ্ডারও আছে আমাদের এই পশ্চিম বাংলায়। একশৃঙ্গ গণ্ডার দেখতে পাওয়া যাবে জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্কোষ, বালা, তোর্সা এবং মূর্তি নদীর পার্শ্ববর্তী

জঙ্গলে। এসব গণ্ডার দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে দশ ফুট। লেজের দৈর্ঘ্য প্রায় আড়াই ফুট। গায়ের রং কৃষ্ণাভ ধূসর।

পুরুষ ও স্ত্রী উভয় গণ্ডারেরই একটি স্থায়ী শৃঙ্গ থাকে। শৃঙ্গ এক ফুট পর্যন্ত লম্বা এবং ওজনে প্রায় তিন সের পর্যন্ত হয়। ধীরে ধীরে গণ্ডারের শৃঙ্গ বাড়তে থাকে। কোন কারণে নষ্ট হলে আবার সেখানে নতুন শৃঙ্গ গজায়।

গণ্ডারের গায়ের চামড়ায় কতকগুলি গভীর ও সুস্পষ্ট ভাঁজ থাকে। দেহের পাশের চামড়ায় বড় বড় গুটিকা থাকে। গণ্ডারের দেহ গুরুভার এবং গলা ছোট। মাথাটি নৌকার মত আকৃতিবিশিষ্ট। পা তিনটি আঙ্গুলবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ও স্থূল।

নদীনালা, জলা, নলবন বা ঐ রকম ঘাসবনে গণ্ডারেরা বাস করে। জলাভূমিতে গড়াগড়ি দিতে এরা খুব ভালবাসে। প্রত্যহ একটি নির্দিষ্ট স্থানে এরা মলত্যাগ করে। মলত্যাগের স্থানে এরা পিছন দিকে হেঁটে যায়। এদের এই স্বভাবের সুযোগ নিয়ে গুপ্ত শিকারীরা ঐ সময় তাদের হত্যা করে।

গণ্ডার সাধারণতঃ নিরীহ প্রাণী। কিন্তু কোন কারণে বিরক্ত হলে এরা শত্রুকে প্রবলবেগে আক্রমণ করে। এদের দৃষ্টিশক্তি তেমন প্রখর নয়। গণ্ডারের প্রধান খাদ্য তৃণ। সকাল, সন্ধ্যা ও প্রায় সারারাত ধরে এরা আহার করে এবং দিনের অধিকাংশ সময় কর্দমাক্ত জলাভূমিতে পড়ে থাকে এবং ঘুমায়। গণ্ডার সাধারণতঃ একাকী ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রী গণ্ডার ১৮ মাস গর্ভধারণ করবার পর একসঙ্গে একটিমাত্র শাবক প্রসব করে।

বাংলা দেশের একটি বিচিত্র-দর্শন প্রাণী হচ্ছে বজ্রকীট বা বনরুই। রুই মাছের মত বড় বড় আঁশে এদের সর্বশরীর ঢাকা বলেই এরূপ নাম হয়েছে। সুন্দর সাজানো আঁশ—মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত আঁশগুলি বর্মের মত এদের দেহকে রক্ষা করে। এদের দেখা যায় হিমালয়ের ঢালু জায়গায় ও উত্তর বঙ্গের জলাভূমিতে। এরা গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা এবং রাত্রিবেলায় ঘুরে বেড়ায়।

একটি বনরুই দুই থেকে আড়াই ফুট আন্দাজ লম্বা হয়ে থাকে। লেজটিও লম্বায় প্রায় দেড়ফুট। গায়ের আঁশের গোড়ার দিকে ফ্যাকাশে কালো রঙের গুটিকয়েক লোম থাকে। সামনের পা দুখানিকে এরা উল্টোদিকে ভাঁজ করে চলে। এদের হাঁটবার ভঙ্গী অদ্ভুত। হাঁটবার সময় পিঠটি ধনুকের মত বেঁকে যায় এবং লেজটি উঁচু করে রাখে। মাঝে মাঝে পিছনের পায়ে ভর করে দাঁড়ায়। এদের পায়ে বঁড়শির মত বাঁকা ধারালো নখ থাকে। এদের জিভ্‌টি আঠালো, ঐ জিভের সাহায্যে বনরুই ছোটখাটো কীট-পতঙ্গ মুখে টেনে নিয়ে খায়। এদের দাঁত নেই।

বনরুই মাটি খুঁড়ে গর্ত করে বাসা তৈরি করে। দিনের বেলায় ঐ বাসার মধ্যে ঘুমায়। ঘুমাবার সময় মাটি দিয়ে বাসার মুখটি বন্ধ করে দেয়। স্ত্রী ও পুরুষ বনরুই বাচ্চাদের নিয়ে একই বাসায় বসবাস করে। বাচ্চা বড় হয়ে গেলে আলাদা ভাবে থাকে। এরা গাছে চড়তে ওস্তাদ। সামনের পায়ের নখ দিয়ে এরা গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে থাকে।

বনরুইয়ের প্রিয় খাদ্য হচ্ছে পিঁপড়ে, উইপোকা, পিঁপড়ের ডিম প্রভৃতি। এরা জিভ্ দিয়ে চেটে জলপান করে। সারাদিন বাসায় ঘুমিয়ে রাত্রে এরা খাবারের খোঁজে বেরোয়। স্ত্রী-বনরুই প্রতিবারে একটি করে বাচ্চা প্রসব করে। ভয় পেলে এরা বুকের মধ্যে মাথা ও পা গুঁজে লেজটিকে গুটিয়ে চুপ করে পড়ে থাকে। তখন মনে হয়—যেন একটি বল পড়ে আছে।

ভারতীয় বাইসন বা গৌর দেখতে পাওয়া যায় তরাই ও ডুয়ার্সের বৃহৎ জঙ্গলগুলিতে। পূর্ণবয়স্ক গৌরের গায়ের রং ঘোর কালো। দেখতে অনেকটা মোষের মত। প্রায় সাড়ে নয় ফুট লম্বা ও সাড়ে পাঁচ ফুট আন্দাজ উঁচু এবং ওজনে প্রায় ২৫-২৬ মণ। পায়ের ক্ষুর ও লেজ গরু বা মোষের মত। স্ত্রী গৌর পুরুষের চেয়ে আয়তনে ছোট।

পুরুষ ও স্ত্রী গৌর—উভয়েরই মাথায় ২টি করে শিং থাকে। এক একটি শিং ২০ থেকে ২৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। শিং অর্ধচন্দ্রাকার, মসৃণ, সূক্ষ্মাগ্র ও শূন্যগর্ভ। গৌরের দেহের তুলনায় পা ও ক্ষুরগুলি ছোট।

গৌরের প্রধান খাদ্য তৃণ ও বাঁশের অঙ্কুর। এরা সাধারণতঃ সকালে ও সন্ধ্যায় চরতে বেরোয়। পার্বত্য জায়গা এরা বেশী পছন্দ করে। পর্বতে আরোহণেও পটু। গৌর ভীরু প্রকৃতির প্রাণী। এদের ঘ্রাণ ও শ্রবণ শক্তি অতি প্রবল।

অজগর বা ময়াল সাপ সুন্দরবন, উত্তর বঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্সের জঙ্গলে অল্পবিস্তর দেখা যায়। এই সাপ লম্বায় ২০ ফুট বা তারও বেশী হয়ে থাকে। ছোট চোখ, গায়ের আঁশ ছোট ও মসৃণ। পিঠের রং পীতাভ পিঙ্গল। পিঠের মধ্য-রেখার উপর এক সারি বড় বড় রক্তাভ পিঙ্গল বর্ণের ছাপ থাকে। ছাপগুলির বেড় কালো। দেহের উভয় পাশে ছোট আকারের এরূপ একটি সারি ছাপ আছে। মাথা ও ঘাড়ের উপর একটি বল্লমাকার পিঙ্গল চিহ্ন দেখা যায়। দেহের তলদেশ পীতাভ এবং দু-পাশে তিলক আঁকা।

সাধারণতঃ নদী বা জলাশয়ের কাছাকাছি বড় বড় অজগর বাস করে। এরা বিভিন্ন পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণী ধরে উদরসাৎ করে। মুখ দিয়ে কামড়ে শিকার ধরে। ধরেই লেজ দিয়ে জড়িয়ে প্রচণ্ড চাপে প্রাণীটিকে মেরে ফেলে। তারপর

ধীরে ধীরে গিলে খায়। এরা গাছে উঠতে পটু। বহুক্ষণ ধরে এদের জলে পড়ে থাকতে দেখা যায়। একবার পেটভরে খেয়ে নিলে অজগর অনেক দিন পর্যন্ত কিছু খায় না। অজগরের চামড়া অতি মূল্যবান। এই চামড়া দিয়ে জুতা, ব্যাগ প্রভৃতি সৌখিন দ্রব্য তৈরি হয়।

সম্বর এক শ্রেণীর হরিণ। পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য অঞ্চলের বনে এদের বাস। দৈর্ঘ্যে এক একটি সম্বর প্রায় ছয়-সাত ফুট হয়ে থাকে। মাটি থেকে কাঁধের উচ্চতা প্রায় সাড়ে চার ফুট। লেজটি প্রায় এক ফুট লম্বা। কান ছুটিও লম্বায় কম নয়—সাত-আট ইঞ্চি হবে. আর ওজন প্রায় সাড়ে সাত মণ। বাংলা দেশে যে কয় রকমের হরিণ পাওয়া যায়, সম্বর তাদের মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড়।

সম্বরের শিঙে শাখা-প্রশাখা নিয়ে সাধারণতঃ তিনটি শীষ থাকে। সম্বরের লোম রুক্ষ ও ঝাঁকড়া। পুরুষদের গায়ের রং গাঢ় ধূসর। স্ত্রী ও বাচ্চাদের গায়ের রং খানিকটা পিঙ্গল। এরা উঁচু গাছে ভরা জঙ্গল, শুক্‌নো এবং পাহাড়ী জায়গা বেশী পছন্দ করে। অতি প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যার একটু আগে সম্বর চরতে বেরোয়। রাতেও চরে বেড়ায়। বিভিন্ন গাছের পাতা, ছাল ইত্যাদি খেয়ে উদরপূর্তি করে। বিভিন্ন রকম বন্যফল ও ঘাস এদের খাদ্য। তবে প্রিয় খাদ্য হচ্ছে হরিতকী, বহেড়া ও আমলকী। দিনের বেলায় সম্বর গভীর জঙ্গলের মধ্যে কোন ছায়াশীতল স্থানে বিশ্রাম নেয়।

উত্তর বাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার বড় বড় নদ-নদী ও বিলের ধারে বড় পানকৌড়ি পাখী দেখা যায়। এরা লম্বায় প্রায় ৩৩ ইঞ্চি। ঠোঁটটি প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা, ডানা লম্বায় এক ফুট। ডানায় ১৪টি বড় পালক থাকে। উপরের ঠোঁটের ডগা নীচের দিকে বঁড়শির মত বাঁকানো পায়ের নখগুলিও বাঁকানো।

পানকৌড়ির চোখ ও ঠোঁটের মধ্যবর্তী স্থান, মুখের সম্মুখ ভাগ ও গলা সাদা। পিঠ ও বড় পালকগুলি বাদ দিলে ডানার রং কাঁসার রঙের মত। এদের পায়ের রং কালো। পালকের ডগার রং কালো।

এরা নদীর ধারে জলাভূমিতে অথবা পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের উপর প্রধানতঃ কাঠি দিয়ে বাসা তৈরি করে। তার উপর তৃণ ও অন্যান্য আগাছার আবরণ দেয়। বাসায় সাধারণতঃ চার-পাঁচটি ডিম দেখা যায়। বাচ্চাগুলি মায়ের মুখের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে গলনালীস্থ থলি থেকে মাছ টেনে নিয়ে খায়।

আকাশে ওড়বার সময় পানকৌড়ি সরল রেখায় সারবেঁধে চলে। তখন ওদের পা ছুটি পিছনে ঋজুভাবে প্রসারিত থাকে। জলে নামবার সময় সর্বপ্রথম

লেজটিকে জলে স্পর্শ করায়। জলে ভেসে বেড়াবার সময় এদের বুক—এমন কি, গলা পর্যন্ত জলে ডুবে থাকে। এরা দ্রুত উড়তে পারে এবং সাঁতারও কাটতে পারে। তাছাড়া বহুক্ষণ জলে ডুবে থাকতে পারে। এরা ডুব দিয়ে সাঁতার কেটে মাছ শিকার করে। চীন দেশে জেলেরা অনেকে পোষা পানকৌড়ির সাহায্যে মাছ শিকার করে থাকে।

ভারতের জাতীয় পাখী ময়ূর। আমাদের পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও বাঁকুড়া জেলায় ময়ূর দেখতে পাওয়া যায়।

লেজ বাদে ময়ূরের দেহ প্রায় চার ফুট লম্বা। লেজটি লম্বায় প্রায় দেহের সমান। লেজে মোট আঠারোটি পালক আছে। ডানা দুটি বেশ লম্বা। ঠোঁট শক্ত এবং একটু বাঁকা। ওজন কম-বেশী পাঁচ কিলোগ্র্যাম। ময়ূরের চেয়ে ময়ূরী আকারে কিছুটা ছোট। পুরুষ ময়ূরের মাথায় থাকে শিখা। সেজন্যে ময়ূরের অপর নাম শিখী। ময়ূর ও ময়ূরীর রঙে কিছুটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য ভালভাবে না দেখলে বোঝা যায় না।

নদীর ধারের বনের আশেপাশে যেখানে পাহাড় আছে, সে সব বনে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ময়ূর ঘুরে বেড়ায় খুব সতর্ক ভাবে। হিংস্র জন্তু, বিশেষ করে বাঘ দেখলে এরা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং সোরগোল করতে থাকে। ফলে মানুষ ও নিরীহ পশু-পাখীরা সাবধান হবার সুযোগ পায়। এরা ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে জোরে ছুটতে পারে ,তবে উড়তে পারে কম।

সকাল ও সন্ধ্যায় ময়ূর মাঠে চরতে বেরোয়। উত্যক্ত হলে উড়ে গিয়ে উঁচু গাছের ডালে বসে। জঙ্গলের কাছে ধান অথবা অন্য কোন শস্যক্ষেত্র থাকলে ওরা সেখানে চরে বেড়ায়। ওদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে বিভিন্ন শস্য। তবে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ ও ছোটখাটো সরীসৃপও এরা খায়। ময়ূর রাত্রিবেলায় ঘন পাতায় ঢাকা গাছের ডালে বসে থাকে। নদী-নালার কাছে ঘন ঘাস বা লতাগুল্মে ঢাকা জমিতে ময়ূর বাসা তৈরি করে। এই বাসায় এবং কখনও বা বড় গাছের কোটরে ময়ূরী ডিম পাড়ে। যখন মেঘ দেখা দেয় এবং বৃষ্টি পড়ে, ময়ূর তখন পেখম মেলে নাচে।

অমরনাথ রায়

শিশু বিজ্ঞানী

ছোট ছোট ভাই-বোনেরা, তোমাদেরও যে একটা বিজ্ঞানী মন আছে, সে কথাটা কি ভে:ব দেখেছ? কথাটা শুনে হয়তো বিস্মিত হয়ে ভাবছ, আমরা আবার বিজ্ঞানী হলাম কবে! তবে কথাটা খুলেই বলি। বিজ্ঞান বস্তুটি কি? আমাদের বাইরের যে জগৎ, তার সঙ্গে পরিচিত হওয়াই হলো বিজ্ঞান। জগতের বহু জিনিষ দৃশ্য, আবার বহু জিনিষ অদৃশ্য। কারোর আবেদন কানের কাছে, কারোর বা নাকের কাছে অথবা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কাছে। এদের মাপজোখ, গুণাবলী, একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম গঠন ইত্যাদি বিজ্ঞানের সন্ধানের বস্তু। বাইরের বস্তুর সঙ্গে আমাদের দেহের কি সম্পর্ক, আবার দেহের সঙ্গে অদৃশ্য মনের কি সম্পর্ক—এও বিজ্ঞানের সন্ধানের বিষয়।

এখন দেখ, সত্যই তোমরা বিজ্ঞানী কিনা। যখন সবে চলতে শিখেছ হাত-পায়ের উপর ভর করে, তখন যা পেতে মুখে পুরে দিতে, মাটির উপর আছাড় মারতে, লাল টক্‌টকে রঙের দিকে ছুটে যেতে, কেউ গান গাইলে কান খাড়া করে শুনতে, চীৎকার শুনলে চমকে উঠতে। এই যে বস্তুটি কঠিন না কোমল, খাদ্য না অখাদ্য, আছাড় মারলে ভাঙ্গে কি না—বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় লাভের এই যে সহজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এটাও বিজ্ঞান। তাহলে বুঝেছ নিশ্চয়, আমি ঠিকই বলেছি?

এখন স্কুলের পড়া তৈরির চাপে ওসব পরীক্ষা হয়তো ছেড়ে দিয়েছ। আবার সুরু কর। পরীক্ষায় পাশের দরকার আছে, স্কুলের পাঠ্য-পুস্তক পাঠেরও প্রয়োজন আছে--তাছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। তাকে বলা হয় 'হবি'। একটি ঘটনার কথা বলছি। গত মহাযুদ্ধে বহু ইংরেজ, আমেরিকান যুবক ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সৈন্য বিভাগের বিভিন্ন কাজে। এঁদের একজনের নাম এরিক নিউবি। তাঁর খেয়াল হলো গঙ্গাকে দেখবেন। একখানা নৌকা কিনে হরিদ্বার, ঋষিকেশ থেকে আরম্ভ করে ঐ নৌকায় চলে গেলেন সাগরদ্বীপ পর্যন্ত। দুই পারের সহর, নগর, তীর্থস্থান, পল্লী, কত রকমের মানুষ—এদের সকলের পরিচয় নিতে নিতে গঙ্গার দীর্ঘ জলপথ অতিক্রম করলেন। এই জন্যে দরকার হয়েছে সাহস, ধৈর্য, শ্রম, সংযম এবং অর্থ। সহ্য করতে হয়েছে অনেক কষ্ট। এও হবি, চমৎকার হবি। এইরূপ হবি যাঁদের আছে, তাঁরা ভূগোলের স্রষ্টা, তাঁরা আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করেন।

আর একটি হবির কথা বলছি, যেটা ইচ্ছা করলে হয়তো তোমরাও করতে পার। সেটি হলো, কাচ ভেঙ্গে ছোট করে গোল করা এবং ঘষে ঘষে লেন্সে পরিণত করা। আজকাল

লেন্স কিনতেই পাওয়া যায়। বৃদ্ধদের চশমার কাচ হলো আতসী কাচ (Magnifying glass)। এগুলো ঘষে ছোট করা। এই ধরণের ছবি থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল জীবাণু-বিদ্যা। যিনি এটা করেছিলেন তাঁর কোন পরীক্ষা পাশ করাও সম্ভব হয় নি। তাঁর বাবার ছিল বাস্কেট তৈরির ব্যবসায়, আর তিনি (লুইয়েনহোয়েক) অল্প বয়সেই হলেন শুক্‌নো খাদ্যের ষ্টোর-কিপার। তিনি কাচ ঘষে ঘষে চার শয়ের উপর লেন্স তৈরি করলেন। এই লেন্সে ধরা দিল এক অদৃশ্য জগৎ। আজকাল ডাক্তারের কাছে গেলেই শুনবে নানা প্রকার জীবাণুর নাম। জীবাণু আমাদের দেহের মধ্যে ঢুকে যে বহু প্রকারের ব্যাধির সৃষ্টি করে—তা আজ সর্বজনস্বীকৃত। এর স্রষ্টা ঐ অর্ধশিক্ষিত লুইয়েন-হোয়েক। হল্যাণ্ডবাসী ঐ যুবক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির নিকট তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে চিঠি লেখেন। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনি লিখতে জানতেন না। তিনি চিঠির মধ্যে নিজের শরীর, বাড়ী ও প্রতিবেশীর কথা লিখেছিলেন—সর্বশেষে তাঁর আবিষ্কারের কথা। রয়েল সোসাইটির পণ্ডিত ব্যক্তিরা চিঠি পড়ে হেসেই খুন। চিঠি পড়া যখন শেষ হলো তখন কিন্তু আর হাসি নয়, বিস্ময় ও সম্ভ্রম সকলের দৃষ্টিতে। তোমরাও এরকম তোমাদের টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ তৈরি করতে পার।

আর একটি আবিষ্কারের কথা বলছি—যার মূলে ছিল শুধু পর্যবেক্ষণ, গণিতের কোন তাত্ত্বিক বিচার নয়। জাপানের নাবিকদের মধ্যে বেরিবেরিতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছিল। কর্তৃপক্ষ ভেবে আকুল। ডাঃ টাকাকি হুকুম দিলেন, খাদ্য পাল্টাও। সাদা কলেছাটা চালের পরিবর্তে অন্য খাদ্য দেওয়া হলো (১৮৮৪)। তার পর থেকে বেরিবেরিতে আক্রান্তের সংখ্যা কমে গেল। বোঝা গেল—খাদ্যের সঙ্গে বেরিবেরির সম্বন্ধ আছে, কিন্তু কি সম্বন্ধ তা বোঝা গেল না। তখন ইন্দোনেশিয়ায়ও বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব ছিল। খৃষ্টিয়ান আইকম্যান নামক এক যুবক সার্জন এলেন ওখানে নিযুক্ত হয়ে ১৮৮৩ সালে। তিনি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কিছুই বের করতে পারলেন না। ওখানকার জেলের ছিল একটা পোলট্রি, তাতে মুরগী পোষা হতো। সেগুলি ঝড়ো কাকের মত হয়ে গিয়েছিল, ইতিমধ্যে আবার বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তিনি পোলট্রি রক্ষককে জিজ্ঞেস করলেন, মুরগীগুলিকে কি খাবার দেওয়া হচ্ছিল এবং এখনই বা কি দেওয়া হচ্ছে? রক্ষক অপরাধীর মত বললে, হুজুর এই কয়মাস ভাল সাদা চাল দেওয়া হচ্ছিল, এখন আকাড়া সস্তা মোটা চাল দেওয়া হচ্ছে। সার্জনের চোখের সামনে যেন আলো জ্বলে উঠলো, তিনি যেন পথের সন্ধান পেলেন। ১৯২৯ সালে তিনি (৬৯ বছর বয়সে) বেরিবেরি নিবারণের পন্থা আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

তোমরাও একটা খাঁচায় ইঁদুর, একটা কাচের পাত্রে জল নিয়ে তার মধ্যে কই, খলসে মাছ ছেড়ে খাদ্য ও আলো দিয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা করতে পার। আমাদের

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' সম্পাদক মহাশয় একজন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী, একথা নিশ্চয়ই তোমরা জান। না জানলে জেনে রাখ। তাঁর মূল্যবান উপদেশ তোমরা ইচ্ছা করলেই পেতে পার। এই সকল 'হবির' মারফৎ তোমাদের মধ্যে যে ক্ষুদ্র শিশু বিজ্ঞানীটি আছে, তাকে বাঁচিয়ে রাখ সুদিনের জন্যে। যেদিন সুযোগ-সুবিধা আসবে, সেদিন যেন তাকে কাজে লাগিয়ে বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত করতে পার।

ভারত সরকার একটি Science Talent Search Scheme করেছেন বিজ্ঞানানুরাগী ছাত্রদের বিজ্ঞান পড়বার সুযোগ করে দেবার জন্যে। মুদ্রিত ফরমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মারফৎ ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে দরখাস্ত করতে হয়। ৩০০ নম্বরের পরীক্ষা। Science Aptitude Test—১৬০ নম্বর, একটি রচনা (বিজ্ঞান বিষয়ক) ৫০ নম্বর, A Project Report on Scientific Topics—২৫ নম্বর, Interview ৬৫ নম্বর। ১৯৬৪ সালে যে প্রতিযোগিতা হয়, তাতে 'Petroleum and its Products' সম্বন্ধে লিখেছিলেন সেণ্ট্ লরেন্সের (বালীগঞ্জ) এস. রায় এবং কে. এস. বেদাচলম (মহবুব মাল্টিপারপাস, সেকেন্দ্রাবাদ), 'X-Rays and Its Applications in the Service of Man' সম্বন্ধে লিখেছিলেন হাজারিবাগ সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সি. জি. রোজারিও এবং S. C. M. V. Higher Secondary School, Indore-এর কান্তিলাল জৈন (এঁরা সকলেই পুরস্কার বিজয়ী)।

একটা কিছু পরিকল্পনা নিয়ে তাকে বাস্তবে রূপ দেবার মধ্যে খাটুনি অনেক, কিছু স্থান এবং অর্থেরও দরকার। আবার কলকাতা ও আশেপাশের লোকের পক্ষে এই দুটাই আছে—এমন লোক বেশী নেই। যাঁদের দুটিই আছে, তাঁরা ঐ দুটি বাড়াবার 'হবি'তেই মত্ত, বিজ্ঞান বা জ্ঞান নিয়ে ততটা ব্যস্ত নন। যেখানে দুটারই যোগাযোগ ঘটে, সে তো মণিকাঞ্চন যোগ। তাঁরা কিছু করবেনই যদি ঠিকমত পরিচালিত হন। এখন দুটি পরিকল্পনার (Projects) নমুনা দিচ্ছি। প্রথমটি হলো যোয়ার গাছের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ও পরগাছা নিয়ে। এই প্রোজেক্টকারী হলেন Ravinder Kumar Zutshi (Commercial Higher Secondary School, Daryaganj, Delhi-6)। সমস্যাটি হলো যোয়ার গাছের পাতার উপর পাতাফড়িং (Pyrilla perpusilla) যে ডিম পাড়ে, তার সংখ্যাগত অবস্থা ও ফলাফল। পনেরটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা। পত্রফলকের তলা, উপর, কিনারা ও বোঁটায় কোথায় কতটি ডিম পেড়েছে। তলার পাতার থেকে সুরু করে একেবারে উপরের খাড়া কচি পাতা পর্যন্ত তল্লাস করে ডিমের সংখ্যা টুকে রাখা হতে লাগলো। একটি চার্ট তৈরি করে প্রথমেই উপর থেকে নীচের দিকে গাছগুলির নম্বর লেখা হলো এবং অনুভূমিক লাইনে পাতার নম্বর এবং প্রতি নম্বরে আবার পাতার বিভিন্ন অংশের নাম লেখা হলো। তারপর গাছের নম্বর বরাবর পাতার নম্বরের তলায় ডিমের সংখ্যা লিখে একটি পূর্ণাঙ্গ চার্ট তৈরি

করা হলো। এথেকে সিদ্ধান্ত হলো যে, নীচের দিকেই উপদ্রবটা বেশী। এর সঙ্গে ঐ ফড়িঙের বর্ণনা ও চিত্র বিভিন্ন অংশের চিত্র, ডিমের বর্ণনা ইত্যাদি। স্তম্ভলেখর সাহায্যে আক্রমণের আনুপাতিক তুলনাও দিয়েছিল। এই কাজে কোন্ কোন্ বই, পত্রিকা প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছে, তার একটি তালিকাও সংযোজিত ছিল। কুমারী মঞ্জু পুরীর (Presentation Convent High School, Subhash Chandra Road, Delhi-6) Project হলো 'Identification of Dyes used in the manufacture of writing inks by Paper-Chromatography'। একটি রচনা লেখবার সময় কলম থেকে শ্রীমতী পুরীর কিছু কালি কাগজের উপর পড়ে যায়। কাগজটাকে রক্ষা করবার জন্যে তৎক্ষণাৎ ব্লটিং চাপা দেন এবং কালি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ব্লটিং শুষে নেয়। কালিটি ছিল রয়েল ব্লু, কিন্তু ব্লটিং-এর কিনারায় দেখা গেল, ভায়োলেটের আভা। যে জায়গায় বেশী শুষেছে, সেখানে এক রং, অন্যত্র আরেক রং, এর হেতু কি। এই জন্যে তাকে Chromatography-এর বই পড়তে হয়েছে, বার বার কালি ফেলে বিভিন্ন-ভাবে শুষিয়ে পরীক্ষা করতে হয়েছে বিভিন্ন ধরণের কালি নিয়ে। কুমারী রীতা আঢ্যের (South Eastern Rly. Higher Secondary School, খড়্গপুর) Problem ছিল To hatch out fowl eggs artificially। অবশ্য Incubator-এ বহুদিন যাবৎই ডিম ফোটানো হচ্ছে, কিন্তু এই পরিকল্পনা শ্রীমতীর নিজস্ব। তড়িৎ-শক্তি তিনি ব্যবহার করেছেন এবং কোন ধরণের সারকিটে কি ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা ও হিসাব দিয়েছেন। তোমরাও এই সব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখবে, পুরস্কার লাভের চেষ্টা করবে। অর্থ ছাড়া তো বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব নয়, কাজেই আর্থিক পুরস্কারের দরকার আছে বৈকি—বিশেষতঃ বিজ্ঞান-অনুরাগী গরীব ছাত্রদের পক্ষে। বিজ্ঞানে অনুরাগ জন্মালে সব জুটে যাবে, এই আশা রেখে এগোও। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে প্রচুর টাকা আয় করবো—এই আশায় বিজ্ঞান পড়লে হবে না, জানবার পিপাসা নিয়ে পড়লেই কেবল জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) হৃদ্‌রোগ কি? এসম্বন্ধে বিস্তারিত জানান।

(খ) বর্ণালী বিশ্লেষণ কি? এর সাহায্যে কোন পদার্থের অবস্থিতি এবং ধর্মাধর্ম কিভাবে জানা যায়?

(গ) একটি নলের ভিতরের অতটুকু বাতাসের চাপ ও বাইরের অত বাতাসের চাপ সমান কেন?

মনন সেন, কলিকাতা-৪৭

প্রঃ ২। (ক) আকাশের রং নীল কেন?

(খ) ঝড়ের পূর্বমুহূর্তে আকাশের রং লাল হয় কেন?

(গ) কেনই বা ঐ সময়ের আবহাওয়ায় গুমোটভাব পরিলক্ষিত হয়?

শিবেন্দু দে, কলিকাতা-১২

উঃ ১। (ক) নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, হৃদ্‌রোগ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের রোগবিশেষ। হৃৎপিণ্ডই আমাদের শরীরের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। এর প্রধান কাজ রক্তসঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা। পুরাকালের মিশরীয় মমীদের শরীরে হৃদ্‌রোগের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। তৎকালীন গ্রীসদেশীয় চিকিৎসকগণ হৃৎপিণ্ডের কার্যকলাপের নানারূপ গণ্ডগোল লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু ভালভাবে বুঝতে পারেন নি। তখনকার দিনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে কারও মৃত্যু হলে হৃৎপিণ্ডে বা রক্তনালীতে কীট-পতঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করা হতো। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম হার্ভে কর্তৃক হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে হৃদ্‌রোগ সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারা যায়। হৃদ্‌পিণ্ড আমাদের শরীরের একটি জটিল অংশ। ফলে এর রোগও নানারূপ হতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেসব রোগের পরিচয় পেয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো।

রিউম্যাটিক জ্বর—এক্ষেত্রে সমগ্র হৃৎপিণ্ডটি আক্রান্ত হয়, বিশেষ করে এতে যে সব কপাটিকা আছে, তাদের মধ্যে বাঁ-দিকেরগুলি। প্রকৃত কারণ এখনও অজানা। তবে ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জাতীয় জীবাণুর উপস্থিতি সন্দেহ করা হয়।

কার্ডিওভাস্‌কিউলার সিফিলিস—এই রোগ প্রধানতঃ হৃৎপিণ্ডের অ্যায়োর্টা নামক

রক্তনালীকে আক্রমণ করে। এর ফলে রক্তনালীটি স্ফীত হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে অথবা সংশ্লিষ্ট কপাটিকা বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব।

আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস—এটি হৃদ্‌রোগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। হৃৎপিণ্ড নিজে যে মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত, তার মধ্যে রক্ত সরবরাহকারী নালীর নাম করোনারী। এই রোগে আক্রান্ত হলে করোনারী কিঞ্চিৎ সরু অথবা সম্পূর্ণ বন্ধও হয়ে যেতে পারে। অনেক সময়ে কিছুটা রক্ত জমাট বেঁধে করোনারী রক্তনালীকে বন্ধ করে দেয়—একেই বলে করোনারী থ্রম্বোসিস। বুকে এই সময়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়। এই রোগ বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে। এতকাল আমাদের ধারণা ছিল যে, কোলেস্টেরল বা ঐ ধরণের চর্বিজাতীয় পদার্থই পলির আকারে পড়ে রক্তনালীকে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু রুশদেশীয় বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মনে করেন যে, রক্ত থেকে প্রোটিন জাতীয় বস্তুর দ্বারা রক্তনালী বন্ধ হয়ে থাকে। এই বিষয়ে জোর গবেষণা চলেছে।

(খ) সূর্যের আলোতে যে সাতটি রং আছে—যা রামধনুতে দেখা যায়—তার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। রংগুলি হচ্ছে—বেগুনী, ঘন নীল, নীল, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল। এরই নাম বর্ণালী। এক এক রঙের আলো এক এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের হয়ে থাকে। বর্ণালী বিশ্লেষণ দুই রকম প্রক্রিয়ায় হয়—শোষণ প্রক্রিয়া ও বিকিরণ প্রক্রিয়া।

কোন তরল বা গ্যাসীয় পদার্থের মধ্য দিয়ে আলো যাবার সময়ে কোন কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষিত হয়ে যেতে পারে। বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এই শোষণ বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। আবার একই পদার্থের বিভিন্ন অবস্থায়ও (যেমন ঘনত্ব) শোষণ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। ফলে পদার্থের মধ্য দিয়ে আসবার পর সেই আলোর বর্ণালী দেখলে তাতে শোষণের চিহ্ন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে কোন্ পদার্থের কি অবস্থায়, 'শোষণ-বর্ণালী' কিরূপ হবে, তার সঙ্গে পরিচিত আছেন। তাই অজানা কোন পদার্থের স্বরূপ তার বর্ণালী দেখে বলে দিতে পারেন।

অনুরূপভাবে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থকে উত্তাপ দিয়ে উত্তেজিত করলে এক এক ক্ষেত্রে এক এক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরিত হয়ে থাকে। গবেষণাগারে বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করে এই বিকিরণ বর্ণালীর সঙ্গেও বিজ্ঞানীরা আজ পরিচিত। ফলে দূরবর্তী কোন জ্যোতিষ্ক থেকে আগত আলোকমালার বর্ণালী দেখেই তাঁরা বলে দিতে পারেন—জ্যোতিষ্কটি কি কি উপাদানে গঠিত।

(গ) 'চাপ' কথাটির সংজ্ঞা হচ্ছে—প্রতি একক বর্গক্ষেত্রের উপর প্রযুক্ত বল। ধরা যাক, এক বর্গসেন্টিমিটার। এই পরিমিত স্থানের উপর স্বভাবতঃই বায়ুর

চাপ সর্বত্র সমান হবে—তা সরু নলের মধ্যেই হোক বা অন্য যে কোন জায়গাতেই হোক।

উঃ ২। (ক) আকাশের রং নির্ভর করে সূর্যের আলো ও বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণার উপর। আমরা জানি, সূর্যের আলোকে সাতটি রং আছে। এরা হচ্ছে বেগুনী, ঘননীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এই সব রং বিভিন্ন অনুপাতে সূর্যের সাদা আলোর মধ্যে লুকিয়ে আছে। রামধনুতে এদের আলাদাভাবে দেখা যায়। সূর্যের আলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে এসে সেখানকার ধূলিকণার দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়। আমরা বিচ্ছুরিত আলোক পেয়ে থাকি। বিচ্ছুরণ নির্ভর করে আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং ধূলিকণার আকৃতির উপর। অঙ্ক কষে দেখা গেছে—এই বিচ্ছুরিত আলোকের মধ্যে নীলের অংশই সর্বাধিক পরিমাণে থাকা উচিত। তাই ভূপৃষ্ঠে বসে মহাশূন্যের দিকে তাকালে আমরা নীল দেখি এবং সেটাকেই বলি আকাশ। বস্তুতঃ যদি ধূলিকণা না থাকতো, তাহলে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ ঘটতো না। ফলে আকাশটাকে আমরা ঘন কৃষ্ণবর্ণ দেখতে পেতাম। তার ভিতর জ্বল জ্বল করতো ছোট বড় অগণিত নক্ষত্র। যে সব মহাকাশযাত্রী বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে উপরে গেছেন, তাঁরা আকাশের এরূপ বর্ণনাই দিয়েছেন।

(খ) আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের রং পরিবর্তিত হয়। উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, বাতাসের ধূলিকণাই হচ্ছে আকাশের রঙের জন্যে দায়ী। আলোর এই বিচ্ছুরণ নির্ভর করে কণিকার আকৃতির উপর। স্বাভাবিক কারণেই আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে ভাসমান ধূলিকণার আকৃতি-প্রকৃতিও বিভিন্ন রকম হবে। ফলে আকাশের রংও পরিবর্তিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এই কারণেই ঝড়ের পূর্বমুহূর্তে কখনও কখনও আকাশের রং লাল হতে দেখা যায়।

(গ) ঝড়ের পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ বাতাস বন্ধ হয়ে গিয়ে অত্যধিক গরম অনুভূত হয়—চারদিকে একটা গুমোটভাব ধারণ করে। তখন ভূপৃষ্ঠের গরম বাতাস পরিচলন প্রক্রিয়ায় উপরে উঠে যায়। ফলে সেখানে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতির রাজ্যে শূন্যতার স্থান নেই। শূন্যতা পূরণ করাই হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম। তাই এই অবস্থায় চারদিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উপরিউক্ত শূন্যস্থানের দিকে প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসতে থাকে। একেই আমরা বলি ঝড় উঠলো।

বিবিধ

নতুন ধরণের সেতু

এমন জায়গায়ও সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হয়, যেখানে উপকরণগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। প্রধানতঃ এই প্রয়োজন মেটাতে যুদ্ধের সময় এবং শান্তির সময়ও এমন সেতুর পরিকল্পনা করা হলো, যার টুকরাগুলি এত ছোট যে, মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলে এবং সেগুলি জোড়া দিলে এমন শক্তিশালী সেতু তৈরি করা যায়, যা বহু টন ওজনের গাড়ীর ভার সহ্য করতে পারে।

২৫ বছর আগে এই ধরণের সেতু নির্মাণ করেন একজন ইংরেজ—সার ডোনাল্ড বেইলী। তাঁর নামেই এই সেতুর নামকরণ করা হয়েছে বেইলী ব্রীজ।

পেরুর সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে এরকম ৩৬টি বেইলী ব্রীজ ব্যবহৃত হবে। এই সেতুগুলি ১০০ থেকে ২০০ ফুট দীর্ঘ হয়ে থাকে। যে সব জঙ্গলে প্রবেশ দুঃসাধ্য এবং যেখানে বিমানই একমাত্র পরিবহনের ব্যবস্থা, সেখানে একজন মাত্র ফোরম্যান কয়েকজন সহকারীর সাহায্যে এমন সেতু গড়ে তুলতে পারেন।

সার ডোনাল্ডের পদ্ধতিতে প্রথমে একই রকমের অনেকগুলি প্যানেল তৈরি করা হয়। তারপর সেগুলি জুড়ে সেতুর জন্যে প্রয়োজনীয় দুটি প্রধান গার্ডার তৈরি করা হয়। তারপর ক্রশ পীসগুলি জুড়ে জুড়ে সেতুর প্রধান কাঠামোটি বানানো হয়।

শিক্ষাহীন শ্রমিককে সেতু তৈরির কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি অংশ এমন-ভাবে তৈরি যে, সাধারণ তিন টনের ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া চলে এবং যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই যথাস্থানে স্থাপন করা চলে। এই কারনে যেখানে ভারী মেকানিক্যাল গীয়ার লভ্য নয়, সেখানেও এই সেতু নির্মাণ সম্ভব।

অংশগুলি জোড়া লাগাবার পর সেতুটিকে রোলারের সাহায্যে স্থাপন করা হয়।

নদীর খাত খুব প্রশস্ত হলে বেইলী সেতুর ইউনিটগুলিকে জুড়ে প্রথমে দুই দিকের টাওয়ার বানিয়ে নেওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে তারের দড়ি ঝুলিয়ে ঝুলন্ত সেতু তৈরি করে নেওয়া চলে। এভাবে ৪০০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ ঝুলন্ত সেতু নির্মাণ করা সম্ভব।

গভীর খাদবহুল পার্বত্য অঞ্চলে বেইলী সেতুর চেয়ে সহজ উপায়ে সেতু তৈরির উপায় বোধ হয় আর নেই।

ভ্রম সংশোধন :—জুন '৬৭ সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠার ২য় কলমে 'ঈষ্টার্ণ সিরাপ'-এর স্থলে 'ঈষ্টন সিরাপ' হবে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। অমিয়কুমার বসু
১১।৫।১, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

২। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়
ও
শ্রীমতী অলোকা রায়
১১।৭, কালিচরণ ঘোষ রোড
সিঁথি
কলিকাতা-৫০

৩। রমেন দেবনাথ
(প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)
রাণীগঞ্জ কলেজ
বর্ধমান

৪। শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৯।৬, ব্রড ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৯

৫। মিহিরকুমার কুণ্ডু
১৭।এইচ, জেনিন্স রোড
লিলুয়া, হাওড়া

৬। শ্রীঅত্রি মুখোপাধ্যায়
রাধাবাজার
নবদ্বীপ, নদীয়া

৭। শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়
১।৬৮, আজাদগড়
কলিকাতা-৪০

৮। শ্রীঅমরনাথ রায়
N. B/T-99
Unit-A
New Traffic Settlement
P. O. Kharagpur
Midnapur

৯। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৬৭ | অষ্টম সংখ্যা

লেসার

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

লেসার (LASER) কথাটি আজকাল বিজ্ঞানী-অবিজ্ঞানী অনেকের মুখেই শুনতে পাওয়া যায়, যদিও এ-সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা বিশেষজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য কারো আছে কিনা সন্দেহ। আসলে লেসার কথাটি কোন ভাষাগত শব্দ নয়। একটি অভিনব ও বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-ব্যঞ্জক ইংরেজি বাক্যকে সহজে প্রকাশ করবার জন্যে ঐ বাক্যের প্রধান শব্দগুলির প্রথম অক্ষর পর পর সাজিয়ে বিজ্ঞানীরা লেসার কথাটি সৃষ্টি করেছেন। এই প্রক্রিয়া নির্দেশক ইংরেজি বাক্যটি হলো: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation—অর্থাৎ সাঙ্কেতিকভাবে Laser। এই প্রক্রিয়াটিকে বাংলা করে বলতে পারা যায়—'উদ্দীপিত বিকিরণের ফলে আলোকরশ্মির পরিবর্ধন'। এথেকে পাঠক-পাঠিকারা হয়তো কিছুই বুঝতে পারবেন না, কিন্তু এটি হলো আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অপূর্ব আবিষ্কার। সম্প্রতি লেসার রশ্মি অবলম্বনে বিজ্ঞানীরা অসাধারণ শক্তিশালী যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেছেন, যার ব্যবহার হবে পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা এবং দেশ থেকে দেশান্তরে নিক্ষিপ্ত মারণ যন্ত্রের (IBM—Intercontinental Ballistic Missile) প্রতিরক্ষাকল্পে। জীবনযাত্রার অন্যবিধ ক্ষেত্রেও এর বহুল প্রয়োগ ও প্রয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

লেসারের অগ্রজাত একটি অনুরূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মেসার (MASER) সম্বন্ধে খবর হয়তো অনেকেই রাখেন। লেসারের মত মেসারও একটি সাঙ্কেতিক সংক্ষিপ্ত কৃত্রিম শব্দ। ইংরেজি বাক্য—"Microwave Amplifica-

tion by Stimulated Emission of Radiation", এর প্রধান শব্দগুলির প্রথম অক্ষর পর পর সাজিয়ে এর উৎপত্তি। দূর-দূরান্তরে খবর চলাচলের যন্ত্রে (Radiotelescope, Space satellite) গ্রাহক অংশে মেসারের বহুল ব্যবহার চলেছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসাবে লেসার এবং মেসারের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। এই তত্ত্ব বুঝতে হলে আলোকরশ্মির প্রকৃতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোড়ার কথা বলতে হয়।

আলোক হলো এক প্রকারের শক্তি। তাপ শক্তিও হচ্ছে আলোক শক্তির অন্তর্গত। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীমাত্রই জানে যে, এই আলোকশক্তি চলাচল করে তরঙ্গরূপে বা কণিকারূপে। আলোকতরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা কম্পন সংখ্যার (Frequency) তারতম্যে, অপর পক্ষে আলোক-কণিকার শক্তিমাত্রার তারতম্যে আলোকের বহু প্রকার ভেদ করা হয়। যে এককের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন, তাকে বলা হয় অ্যাংষ্ট্রম (Angstrom বা সংক্ষেপে Å)। এক অ্যাংষ্ট্রম-এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাত্র ১০^{-৮} cm, অর্থাৎ এক সেন্টিমিটারের দশকোটি ভাগের এক ভাগমাত্র। ১০ সেন্টিমিটারে হয় চার ইঞ্চি। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত যে সব আলোক-তরঙ্গের পরিচয় পেয়েছেন তাদের দৈর্ঘ্য নিম্নতম 0·001 cm. থেকে সুরু করে উচ্চতম ৩০০ মিটার (এক মিটার=১০০ সেন্টিমিটার) অবধি পরিমিত হয়েছে। এক মিটার ৩ ফুটেরও কিছু অধিক। এসব আলোক-তরঙ্গ বিরাজ করে বিশ্বভুবন ছেয়ে। এই আলোক-তরঙ্গের সমুদ্রে আমরা আছি নিমজ্জিত হয়ে। এসব আলোক-তরঙ্গের প্রকৃতি জানা গেছে ম্যাক্সওয়েল ও হার্টজ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে। প্রমাণ হয়েছে যে, আলোক শক্তি হচ্ছে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তিরই রূপান্তর বিশেষ। উভয় শক্তির গতিবেগের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখা যায় না। প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বা ৩০ কোটি মিটার। বিশ্বজগতের কোন বস্তুই এত প্রচণ্ড বেগে চলতে পারে না। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা কম্পন-সংখ্যার প্রভেদ সত্ত্বেও সকল প্রকার আলোকরশ্মির গতিবেগ এক। এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এই কারণে বিজ্ঞানীরা আলো চলার বেগকে বিজ্ঞানের একটি ধ্রুবক (Constant) হিসাবে গণ্য করেন। কিন্তু গতিবেগের ঐক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বা কম্পন-সংখ্যার আলোকরশ্মির শক্তির পরিমাণ বিভিন্ন হয়। কম্পন-সংখ্যা যত বাড়ে বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কমতে থাকে, আলোকরশ্মির শক্তিও তত বাড়তে থাকে। কম্পন-সংখ্যা বলতে বোঝায় এক সেকেণ্ডে আলোকরশ্মি যতটা পথ অতিক্রম করে, ঐ দূরত্বটা কয়টা পূর্ণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ঢাকা পড়তে পারে। অর্থাৎ আলোর গতিবেগ হচ্ছে তার কম্পন-সংখ্যা ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের গুণক। অপর পক্ষে কোন আলোক রশ্মির কম্পন-সংখ্যা=আলোর গতিবেগ/ঐ রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। বিজ্ঞানীদের পরিচিত সকল দৈর্ঘ্যের বা কম্পন-সংখ্যার আলোক রশ্মিকে বা সম্পূর্ণ বর্ণালীকে কম্পন-সংখ্যা বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পরিমাপে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা :—

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)	গামা রশ্মি (-γrays)	X-রশ্মি (X-rays)
বেগুনীপারের রশ্মি (Ultra-violet rays)	দৃশ্যালোক (Visible rays)	লাল-ইতর রশ্মি (Infra-red rays)
মাইক্রোতরঙ্গ (Microwaves)	রেডিও তরঙ্গ (Radio waves)	

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি ——————→ ←——————কম্পন সংখ্যার বৃদ্ধি

আলোকরশ্মির এই বিস্তৃত বর্ণালীর মধ্যে অধিকাংশই আমাদের দৃষ্টিশক্তির অনুভূতিতে ধরা পড়ে না। তাদের জানা গেছে বিজ্ঞানের পরীক্ষা প্রমাণে। এই বর্ণালীর শুধু একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই আমাদের চোখে পড়লে আমাদের মধ্যে আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে। একেই দৃশ্য আলোক (Visible light) বলা হয়। এখন সংক্ষেপে এসব বিভিন্ন জাতির আলোকের পরিচয় দেব।

মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ০·০০১—০·১Å। এরা খুব শক্তিশালী; সর্বত্র চলাচল করতে পারে; কোন পদার্থই এদের বাধা দিতে পারে না। এর প্রভাবে জীবকোষে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটতে পারে (Biological mutation)।

গামা রশ্মি (γ-rays) :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ০·১Å—১·৪Å। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এজাতীয় রশ্মি বিকিরিত হয়। পরমাণুকেন্দ্রের বিভাজনে এদের উৎপত্তি হয়। এরাও খুব শক্তিশালী। পরমাণু-বোমা ও হাইড্রোজেন-বোমার বিস্ফোরণে যে ধ্বংসলীলা ও অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়, গামা রশ্মি হচ্ছে তার একটি প্রধান কারণ। কর্কট (Cancer) রোগের চিকিৎসায় এদের ব্যবহার আছে।

রঞ্জেন রশ্মি (X-rays):—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১·০—৫০০Å। এরা রক্তমাংস ভেদ করে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। এই কারণে দেহের হাড় পরীক্ষার জন্যে চিকিৎসকেরা X-রশ্মির ব্যবহার করেন। দেহের অভ্যন্তরে কোথাও অর্বুদ বা ক্ষত ইত্যাদির অস্তিত্ব নিরূপণেও এর ব্যবহার হয়। কর্কট রোগের চিকিৎসার জন্যেও এর ব্যবহার আছে। ধাতুশিল্পে ও অন্যবিধ শিল্পকার্যে X-রশ্মির ব্যবহার বেড়ে চলেছে।

বেগুনীপারের (Ultraviolet) রশ্মি :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৫০০—৪০০০Å। এসব রশ্মি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশেষ কার্যকরী। বেশী রোদে সদা-সর্বদা চলাফেরা করলে গায়ের রং যে কালচে হয়, তার কারণ হলো সূর্যকিরণে দেহের ত্বকের উপর সূর্যকিরণের অন্তর্গত বেগুনীপারের রশ্মির প্রতিক্রিয়া। কয়েক প্রকার রোগের চিকিৎসায় এই জাতীয় রশ্মির ব্যবহার আছে।

দৃশ্য আলোক (Visible light) :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৪,০০০—৭,৫০০ Å। বেগুনী, ঘন নীল, নীল, হরিৎ, পীত, কমলা ও লোহিত—এই সাতটি রঙের আলো আমরা দেখতে পাই। এই সাতটি রঙের আলোর সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয় সাদা রঙের আলো।

লাল-ইতর বা অবলোহিত (Infra-red) রশ্মি :—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৭,৪০০—১০০,০০০Å। এসব রশ্মি থেকে আমাদের তাপের অনুভূতি জন্মে।

রেডিও তরঙ্গ :—এদের দৈর্ঘ্য ১০⁹Å (১০ সেণ্টিমিটার)—৩×১০¹²Å (৩০০ মিটার)। এদের মাধ্যমে আমরা রেডিওবার্তা শুনতে পাই। রেডিও তরঙ্গ ও অবলোহিত তরঙ্গের মাঝামাঝি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গগুলিকে বলা হয় মাইক্রোতরঙ্গ। রেডিও, বেতারবার্তা, রেডার, টেলিভিশন ও সুদূর নীহারিকা ও গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে এদের প্রয়োগ চলছে।

এখন আমরা লেসার সম্বন্ধে আলোচনা করবো। লেসারের প্রক্রিয়া ও কার্যপ্রণালী বুঝতে হলে আলোকরশ্মির উৎপত্তি ও শক্তির কণিকাবাদ সম্পর্কে প্রথমে কিছু জানা দরকার হবে।

প্লাঙ্ক ও আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে, তাপ ও আলোর শক্তি অবস্থাবিশেষে কণিকাধর্ম অবলম্বনপূর্বক চলাচল করে। পরবর্তী-কালে (১৯১৩) বিজ্ঞানী বয়র (Bohr) পরমাণুর গঠনকৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে কি করে আলো-কণিকায় (Quantum of light) বিকিরণ ঘটে, তার ব্যাখ্যা দেন। বয়রের পরমাণুবাদের বিশেষত্ব হলো এই যে, পরমাণুকেন্দ্রের বহিঃ-প্রকোষ্ঠে যে সব ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে

বেড়ায়, তাদের কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গমনকালে আলোক-কণিকার বিকিরণ বা শোষণ ঘটে। কেন্দ্র থেকে কক্ষের দূরত্ব যত বাড়ে, কক্ষস্থ ইলেকট্রনের শক্তিও তদনুসারে বাড়তে থাকে। তাই যখন কোন দূরস্থিত কক্ষ থেকে কেন্দ্রের নিকটস্থ কক্ষে কোন ইলেকট্রন গমন করে, তখনই একটি শক্তিকণিকা (Quantum) রূপে আলোকের বিকিরণ ঘটে। উভয়কক্ষের মধ্যে ইলেকট্রনের শক্তির যে প্রভেদ, বিকিরিত আলোক-কণিকার শক্তির মাত্রা হয় তারই সমান। সেরূপ বাইরে থেকে শক্তি শোষণ করে যখন কেন্দ্রের নিকটস্থ কক্ষ থেকে কোন ইলেকট্রন কোন দূরস্থিত কক্ষে চলে যায়, তখন সেই শোষিত আলোক-কণিকার শক্তি হয় উভয় কক্ষনির্দিষ্ট শক্তিমাত্রার প্রভেদের সমান।

লেসারের প্রক্রিয়া বুঝতে হলে আলোক-শক্তির কণিকাবাদ সম্বন্ধে এসব গোড়ার কথা জানা আবশ্যক। লেসার রশ্মির উৎপত্তির সঙ্গে প্রতিপ্রভার (Fluorescene) উৎপত্তির অনেক সাদৃশ্য আছে। এখন প্রতিপ্রভ বাতি (Fluorescent lamp) খুব চলতি হয়েছে। ঘরবাড়ী আলোকিত করবার জন্যে এবং যাবতীয় উৎসবাদিতে এর অবারিত ব্যবহার চলেছে। একপ্রকার পদার্থ আছে, যাদের উপর আলো পড়লে তাদের অণু-পরমাণু আলোক শক্তি শোষণ করে অধিকতর শক্তিমান হয়। বিজ্ঞানীদের ভাষায় অণু-পরমাণুগুলি এভাবে শক্তি শোষণের ফলে কোন একটি উচ্চশক্তির স্তরে অবস্থান করে। পরে যখন এই শোষিত শক্তির কয়েক অংশ বিকিরণ করে অণু-পরমাণুগুলি আবার শক্তি-সোপানের কোন একটি নিম্নস্তরে নেমে আসে। ঐ বিকিরিত আলোক শক্তির কম্পন-সংখ্যা শোষিত শক্তির কম্পন সংখ্যা থেকে কম হয়। এই হলো প্রতিপ্রভা আলোকের বৈশিষ্ট্য। প্রতিপ্রভা বাতির কাচের নলের ভিতরের পৃষ্ঠে বেরিলিয়াম অক্সাইড (BeO) পদার্থের একটি প্রলেপ থাকে। নলের ভিতরকার ক্ষীণ চাপের নিয়ন গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎ-ক্ষরণ (Electric discharge) চলতে থাকলে ঐ গ্যাস থেকে যে বেগুনীপারের রশ্মি উৎপত্তি হয়, তাকে শোষণ করে বেরিলিয়াম পরমাণু শক্তিমান হয় অর্থাৎ শক্তি সোপানের উর্ধ্বস্তরে উঠে যায়। পরে নিম্নস্তরে নেমে এলে তা সাদা আলো বিকিরণ করে।

কিন্তু প্রতিপ্রভা থেকে লেসারের কিছু প্রভেদ আছে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

(১) লেসারের সকল আলোকরশ্মির কম্পন-সংখ্যা সমান (Monochromatic) অর্থাৎ লেসারের আলোক-তরঙ্গের কম্পন-সংখ্যার সমতার সৃষ্টি হয়।

(২) লেসারের সকল আলোক রশ্মি সমান্তরাল-ভাবে একদিকে বিকিরিত হয়; অর্থাৎ সকল বিকিরিত আলোক-তরঙ্গ একই দশা (Phase) রক্ষা করে চলে। এতে তরঙ্গগুলির অবয়বের সমতা রক্ষিত হয়। সকল তরঙ্গের শীর্ষ সমান্তরাল-ভাবে অগ্রসর হয়।

লেসার রশ্মিতে সকল আলোক-তরঙ্গ সমান্তরালভাবে অবয়বের সমতা রক্ষা করে চলার দরুণ আলোকের শক্তির মাত্রা প্রবল হয় এবং ছড়িয়ে যায় না। তাই এদের সহজে লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা যায়।

লেসারের অনেক প্রকার ভেদ আছে। এখানে প্রধানতঃ চুনি লেসারের (Ruby Laser) কথা বলা হবে। কারণ, এর প্রয়োগ হচ্ছে সব চেয়ে বেশী। চুনি লেসারে একটি কৃত্রিম চুনি পাথরের দণ্ড ব্যবহৃত হয়। দণ্ডটির আকার সরু চুঙ্গীর মত। এর দুই প্রান্ত পালিশ করা থাকে এবং তার উপর জমানো রূপার আস্তরণ (Silver mirror) থাকে। এক প্রান্তের আস্তরণ খুব পুরু এবং অন্য প্রান্তের আস্তরণ খুব পাতলা করা হয়। এই চুনি পাথরের দণ্ডকে জড়িয়ে থাকে একটি স্ক্রুর মত পেঁচানো কাচের নল।

ঐ নলে অল্প চাপের ঝিনন (Xenon) গ্যাস থাকে। একে বলা হয় ঝিনন চমকবাতি (Xenon flash lamp)। এসব বাতি সাধারণতঃ ছবি তোলবার জন্য ক্যামেরার সঙ্গে লাগানো হয়। এই বাতির ঝিনন গ্যাসের ভিতর যখন বিদ্যুৎ-ক্ষরণ ঘটে, তখন ঐ বাতি থেকে পীতাভ হরিৎবর্ণের আলো উৎপন্ন হয়ে ঐ চুনির দণ্ডের উপর পড়ে। চুনির দণ্ডের ক্রোমিয়াম ধাতুর আয়ন ঐ আলো শোষণ করে উচ্চতর শক্তির অবস্থায় উন্নীত হয়। কিন্তু উচ্চতর স্তরে স্থায়ী মধ্যবর্তী শক্তিস্তর থেকে নিম্নতম স্থিতিশীল স্তরে নেমে আসবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। [ক্রোমিয়াম পরমাণু থেকে যখন ইলেকট্রন বেরিয়ে যায়, তখন তা আয়নে পরিবর্তিত হয়, চুনিপাথরে যে ক্রোমিয়াম আয়ন থাকে, তাতে প্রতি ক্রোমিয়াম পরমাণুতে ৩টি করে ইলেকট্রন কম থাকে; এই কারণে ক্রোমিয়াম আয়নের রাসায়নিক সঙ্কেত হলো Cr^{+3}]। এরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত সম্ভাবনাকে কার্যকরী করতে হলে উদ্দীপকের দরকার হয়। এক্ষেত্রে একটি আলো-কণিকা (Photon),
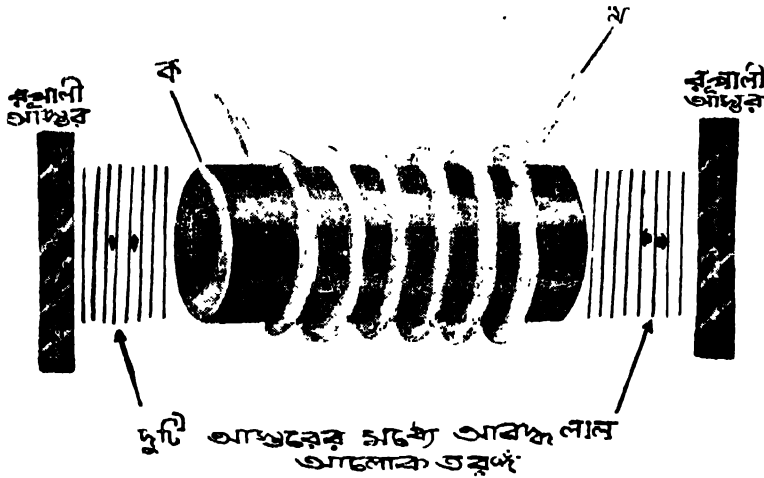
ক—চুনিপাথর, খ—ঝিননপূর্ণ চমকবাতি। চুনি লেসারের রেখাচিত্র। চিত্রে চুনিপাথর, আস্তরণ ও পেঁচানো চমকবাতি দেখা যাচ্ছে।

তারা ক্ষণস্থায়ী এবং অবিলম্বে নিম্নতম স্থিতিশীল শক্তির অবস্থায় ফিরে আসে। এর ফলে যে আলোর সৃষ্টি হয়, তা হলো প্রতিপ্রভা আলোক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ক্রোমিয়াম আয়না উচ্চতর শক্তিস্তর থেকে একটি মধ্যবর্তী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষণস্থায়ী শক্তির অবস্থায় এসে অবস্থান করে। এদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। যখন এদের সংখ্যা নিম্নতম স্থিতিশীল স্তরে অবস্থিত ক্রোমিয়াম আয়নের সংখ্যার চেয়ে বেড়ে যায়, তখন ক্রোমিয়াম আয়নগুলির আপাতযার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ৬৯৪৩Å, এরূপ উদ্দীপকের কাজ করে। আপাতস্থায়ী মধ্যবর্তী স্তর থেকে স্থিতিশীল নিম্নতম স্তরে নেমে এলে ক্রোমিয়াম আয়ন ঐ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক বিকিরণ করে। লাল রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৬৯৪৩Å। এরূপ উদ্দীপনার কাজকে ইংরেজিতে Trigger action (জাগরণ) বলা হয়। রসায়ন-বিজ্ঞানে যাকে সহায়ক (Catalyst) বলে, এটা অনেকটা তারই অনুরূপ। ঝিনন বাতির আলোকে উদ্ভাসিত চুনি পাথরের আভ্যন্তরীণ ক্রোমিয়াম আয়নের উদ্দীপক ফোটন

আকস্মিকভাবে কোন একটি ক্রোমিয়াম আয়নের মধ্যবর্তী স্তর থেকে নিম্নতম স্থিতিশীল অবস্থায় পরিণত হবার ফলে সৃষ্টি হতে পারে। এই উদ্দীপক ফোটনটি তখন সহায়ক হিসাবে অন্যবিধ ক্রোমিয়াম আয়নের পরিণতি ঘটায়। এরূপে বহু একজাতীয় ফোটনের উৎপত্তি হয়। এরাও পুনরায় সহায়কের কাজ করে। এসব ফোটন চুনি দণ্ডের অভ্যন্তরে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সরলভাবে চলাচল করে, উভয় প্রান্তের রূপার আস্তরণ থেকে প্রতিফলিত হয়। যখন এদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়, তখন পাতলা আস্তরণ দেওয়া প্রান্ত থেকে এরা হঠাৎ সমান্তরাল লাল রশ্মিরূপে সমাবয়বে (Same phase) বেরিয়ে পড়ে। একেই বলা হয় চুনি লেসারের রশ্মি। এটা উদ্দীপ্ত ক্রোমিয়াম আয়নের বিকিরণের ফল। সমান্তরাল ও সমাবয়ব হবার দরুণ এদের সমবেত শক্তিমাত্রা প্রবল হয়। লেন্সের সাহায্যে তাদের সহজে কেন্দ্রীভূত করে বিশেষ কার্যকরী করা যায়।

চুনি পাথরের দণ্ডের বদলে যদি স্বল্প চাপের হিলিয়াম-নিয়ন গ্যাস ভর্তি কাচের নল ব্যবহার করা হয়, তবে গ্যাস-লেসারের সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্ম মাত্রায় ইউরোপিয়াম, নিওডিমিয়াম বা ইউ-রেনিয়াম ধাতুঘটিত পদার্থের মিশ্রণে তৈরি কাচের দণ্ডও চুনি দণ্ডের পরিবর্তে লেসারের জন্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন কি, কাচের বদলে প্লাষ্টিকের দণ্ডও এই কাজে উপযোগী। কিন্তু এসব লেসার থেকে যে আলোক রশ্মি পাওয়া যায়, তা সব অদৃশ্য আলোক—লাল-ইতর (Infra red) বর্ণ-চিত্রের গণ্ডীতে এদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অবস্থান। একমাত্র চুনি-লেসার থেকেই দৃশ্যালোক পাওয়া যায়। গ্যাস লেসার চালাবার জন্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা ক্ষরণ ব্যবহার করা হয়।

আর এক প্রকার লেসার আছে, যাকে অনুবিদ্ধ (Injection) লেসার বলা হয়। এদের নির্মাণের জন্যে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (Gallium arsenide) ব্যবহার করা হয়। সিলিকনের মত গ্যালিয়াম আর্সেনাইড একটি ক্ষীণপরিচালক (Semiconductor)। সূক্ষ্ম মাত্রায় দস্তা বা টেলুরিয়াম মিশিয়ে গ্যালিয়াম-আর্সেনাইডকে এদের বিপরীত বিদ্যুৎ-ধর্মী (Diode) করা যায়। তখন এরা শুধু একমুখী বিদ্যুৎ-পরিচালক হয়। অনুবিদ্ধ লেসারের প্রক্রিয়া জটিল। সুতরাং এসম্বন্ধে আর বিশেষ আলোচনা এই প্রবন্ধে সঙ্গত হবে না।

এখন লেসার রশ্মির ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

প্রতিরক্ষা ও অন্যবিধ সামরিক ব্যবস্থায়, দূর-দূরান্তরে খবর চলাচলের যন্ত্র উদ্ভাবন, সূক্ষ্ম যন্ত্রশিল্পে, বিবিধ কঠিন রোগে অস্ত্রচিকিৎসার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক লেসার রশ্মির বহুল বিস্ময়কর ব্যবহার নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বিস্তারিত পরীক্ষা চলছে।

পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, দেশ থেকে দেশান্তরে পরিচালনশীল মারণ অস্ত্রের (Inter-continental ballistic missile) প্রতিরোধ-কল্পে লেসার রশ্মি প্রয়োগের কলাকৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক গাড়ীকে এবং জলের ভিতর সাবমেরিনকে অচল করবার জন্যে এর ব্যবহার নিয়ে বহু পরীক্ষা চলছে। আগেই বলা হয়েছে যে, লেসার রশ্মিকে খুব স্বল্পপরিসর স্থানে সহজে কেন্দ্রীভূত ও শক্তি-সম্পন্ন করে প্রয়োগের সুবিধাই হচ্ছে এর বৈশিষ্ট্য। ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, হাইড্রোজেন বোমা, পরমাণু বোমা, মিসাইল প্রভৃতি মারণাত্মক মারণাস্ত্রের দুর্বল সন্ধিস্থানে বা মর্মস্থানে বিদ্ধ করে এদের অকেজো করাই হচ্ছে লেসার রশ্মি প্রয়োগের উদ্দেশ্য। কোন সঙ্কীর্ণ স্থানে লেসার রশ্মি কেন্দ্রী-ভূত হলে সেখানে এত তাপের উৎপত্তি হয় যে, তার মান সৌরমণ্ডলের উপরিভাগের তাপ-

মানকেও বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়। সূর্যমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমান হচ্ছে ৬-৭ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। লেসার রশ্মি যে কিরূপ অসাধারণ শক্তিশালী হতে পারে, এথেকে তার ধারণা করা যায়। একটি ইস্পাতের পাতের উপর কোন স্থানে এই রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়লে, ঐস্থানের ইস্পাত খানিকটা বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায়। এই কারণে এর সামরিক ব্যবহারের বহু প্রচেষ্টা চলছে প্রবল উদ্যমে। গভীর জলের তলায় সাবমেরিন চলাচলের পথে কোন বিপত্তি থাকলে তার আবিষ্কার করবার জন্যে লেসার রশ্মি প্রয়োগের প্রচেষ্টা চলছে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিরাপদে খবর পরিবহনের জন্যে লাল-ইতর লেসার রশ্মি ব্যবহার ও শত্রু-পক্ষের কামান এবং মর্টার বাহিনীর স্থান নিরূপণ করবার গবেষণা চলছে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগে।

সর্বোপরি মহাকাশে শূন্যদেশে দূরত্ব নির্ণয় এবং পরিবহনের কাজে লেসার রশ্মি এবং চন্দ্র-মণ্ডলে অভিযানকারী আকাশপোতের পক্ষে খবর সংগ্রহের জন্যে চুনি লেসারের বিশেষ উপ-যোগিতা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেছেন। কেন না, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মত কোন গ্যাস মহাকাশের উর্ধ্বদেশে থাকতে পারে না। জানা আছে যে, জলীয় বাষ্প ও গ্যাসীয় পদার্থ লেসার রশ্মির শোষক হিসাবে কাজ করে। এসব পদার্থের বর্তমানে লেসার রশ্মির দৌড় বেশী দূর চলতে পারে না।

সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিতে এবং অন্যবিধ সূক্ষ্ম নিখুঁত কারিগরী শিল্পকাজে লেসারের ব্যবহারে বিশেষ সুবিধা দেখা যায়। লোহা বা ইস্পাতের বীমে সরু ছিদ্র করতে, দুটি ইস্পাতের পাতে সূক্ষ্ম জোড়া লাগাতে, চুনি, নীলা বা হীরক প্রভৃতি মূল্যবান পাথরে সরু ছিদ্র করতে লেসার ব্যবহারে সবচেয়ে বেশী ভাল ফল পাওয়া যায়। দুটি ০.০০৪ ইঞ্চি × ০.০০৫ ইঞ্চি তামার তার লেসার রশ্মির প্রয়োগে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সহজে মুহূর্তের মধ্যে জোড়া যায়। সকল প্রকার উচ্চ গলনাঙ্কের ধাতু লেসার রশ্মিতে বাষ্পীভূত হয়ে যায় নিমেষের মধ্যে। বিদ্যুৎ প্রতিরোধক ভঙ্গুর পদার্থসমূহ (চীনামাটির তৈরি জিনিষ) কাটতে বা তাদের মধ্যে সরু ছিদ্র করতে লেসার রশ্মি বিশেষ উপযোগী।

দৃশ্য আলোক ও রঞ্জেন রশ্মির বিশ্লেষণের জন্যে গ্রেটিং নির্মাণে লেসার রশ্মি ব্যবহার করে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। টেলিভিশনের শব্দ এবং চিত্রের নিশানা বা নিদর্শন বহনের জন্যে লেসার রশ্মি ব্যবহারের পরীক্ষা চলছে। ভবিষ্যতে টেলিফোনেও লেসার রশ্মির সাহায্যে কথাবার্তা চলবে এরূপ আশা করা যায়।

লেসার রশ্মির ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। কেন্দ্রীভূত লেসার রশ্মিতে এত তাপের সৃষ্টি হয় যে, তা গায়ে লাগলে চামড়া পুড়ে যায় এবং চোখে পড়লে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও লেসার রশ্মির ব্যবহার দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন অক্ষিপটের (Retina) পুনঃসংযোজন। মাত্র ১/১০০০ সেকেণ্ডের মধ্যে চিকিৎসার কাজ শেষ হয়ে যায়। রোগী বুঝতেই পারে না যে, কখন তার চিকিৎসা সুরু হলো এবং কখন তা শেষ হলো। এইপ্রকারের চিকিৎসায় চিকিৎসিত স্থানটিকে ঔষধ প্রয়োগে অনুভূতিবিহীন করে রাখবার কোন প্রয়োজন হয় না। অর্বুদ নষ্ট করবার জন্যেও লেসার রশ্মির প্রয়োগ চলছে। সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য যে, কর্কট রোগে লেসার ব্যবহারের পরীক্ষায় সুফল পাবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। লেসার রশ্মির প্রয়োগে ক্যান্সার কোষগুলি অবিলম্বে বিনষ্ট হয়, অথচ

পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোষগুলির ক্ষতি হয় না। কেননা, লেসার রশ্মি কেন্দ্রীভূত করে নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োগ করা যায়।

মহাকাশের সুদূর নীহারিকার অন্তর্গত কোন গ্রহ-উপগ্রহে মানুষের মত বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব আছে কিনা জানবার চেষ্টা চলছে বর্তমানে রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে, রেডিও তরঙ্গের নিশানা নিয়ে। এই প্রচেষ্টায় লেসার রশ্মি প্রয়োগের প্রস্তাব হচ্ছে।

লেসার রশ্মির আবিষ্কার ও প্রয়োগের অভিনব কাহিনী এখানেই সাঙ্গ করি। লেসারের আবিষ্কারে প্রয়োগ-বিজ্ঞানের এক নতুন অভিযানের পথ উন্মুক্ত হচ্ছে, তার অপূর্ব সম্ভাবনা নিয়ে। এসব সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করবার কাজে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পাঠক-পাঠিকারা কেউ কেউ অংশ গ্রহণ করে বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করে তুলবেন—এরূপ আশা করতে পারি কি?

ক্রোমোসোম, ডি-এন-এ ও জিন

অরুণকুমার রায়চৌধুরী

উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের অসংখ্য প্রজাতির (Species) আকৃতি, প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্যের কথা চিন্তা করলে বিস্ময় জেগে ওঠে। প্রকৃতির রাজত্বে দেখা যায়, একদিকে প্রজাতির বিভিন্নতা, অন্যদিকে প্রতিটি প্রজাতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করবার চেষ্টা। স্মরণাতীত কাল থেকে প্রতি প্রজাতি স্বকীয় সত্ত্বা অক্ষুন্ন রেখে অবিচ্ছিন্নভাবে অনুরূপ প্রজাতি সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষ থেকে মানুষ, গরু থেকে গরু, ধান গাছ থেকে ধান হওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। প্রশ্ন জাগতে পারে—কেন আম গাছে জাম, কাঁঠাল, আপেল, আঙ্গুর, কাঁচকলা ফলে না? কেন হাঁসের ডিম থেকে, মুরগী, বক, শালিক, কোকিল, ময়না হয় না? গাছপালা, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের মধ্যে এমন কি পদার্থ আছে, যা সমান প্রজাতি থেকে সমান প্রজাতি এবং ভিন্ন প্রজাতি থেকে ভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়? জৈবরসায়নের গবেষণায় আজ বিজ্ঞানীরা এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রজাতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মূলে আছে এক প্রকার জৈবরাসায়নিক পদার্থ—নাম তার ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (Deoxyribonucleic acid)। সংক্ষেপে বলা হয়—ডি-এন-এ (DNA)।

পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের শারীরিক সম্বন্ধ দুটি জননকোষ (Gametic cell) দ্বারা সীমাবদ্ধ। দুটি জনন কোষের সমন্বয়ে যে একটি দেহকোষ (Somatic cell) উৎপন্ন হয়, তা ক্রমাগত বিভাজনের ফলে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয় এবং তাদের সমষ্টি নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পূর্ণাঙ্গ জীব। সুতরাং এই কোষের মধ্যে এমন কিছু জৈবরাসায়নিক পদার্থ সুপ্ত অবস্থায় আছে, যার ফলে সন্তানদের মধ্যে পিতামাতার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ ও গাছপালা প্রভৃতির দেহকোষের কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে লম্বা লম্বা সুতার মত কতকগুলি জৈব পদার্থ পড়ে থাকে। ফিউলজেন (Feulgen) নামক এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কোষকে রঞ্জিত করা হলে, তাদের পরিষ্কার চেহারা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে। এগুলিকে ক্রোমোসোম বলে। প্রজাতি বিশেষে দেহকোষে ক্রোমোসোম

সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। মানুষে ৪৬, কুকুরে ৭৮, ধানে ২৪, কড়াইশুঁটীতে ১৪ ও ড্রসোফিলা মাছিতে ৮টি ক্রোমোসোম থাকে।

রাসায়নিক উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, ক্রোমোসোমগুলি প্রধানতঃ ডি-এন-এ ও প্রোটিনের দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদ ও প্রাণীর অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের রূপদান করতে উভয়ই সক্ষম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই দুটি পদার্থের মধ্যে কোন্‌টি বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যাক্টিরিয়া ও ভাইরাসের গবেষণায় সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ডি-এন-এ বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রবাহিত হয়, সুতরাং ডি-এন-এ-কে বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল উপাদান বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের ক্রমিক সজ্জায় গড়ে ওঠে পলি-নিউক্লিওটাইডের একটি শৃঙ্খল এবং এরকম দুটি পলি-নিউক্লিওটাইডের শৃঙ্খল ঘোরানো সিঁড়ির ন্যায় পরস্পরকে জড়িয়ে ডি-এন-এ-র একটি জটিল ও অতিকায় অণু সৃষ্টি করে। প্রতিটি নিউক্লিওটাইড অণুতে থাকে শর্করা, ফস্‌ফেট জাতীয় লবণ এবং অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন ও সাইটোসিন—এই চার প্রকার জৈব ক্ষারের যে কোন একটি। জৈব ক্ষারের প্রকারভেদে নিউক্লিওটাইডের প্রকারভেদ হয়। ডি-এন-এ-র একটি শৃঙ্খলে দশ হাজারের কাছাকাছি নিউক্লিওটাইড থাকে; সুতরাং চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের মধ্যে $৪^{১০,০০০}$ ধরণের গঠন-বিন্যাস হতে পারে। মোট নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা, চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের অনুপাত ও তাদের গঠন বিন্যাসের উপর ডি-এন-এ অণুর স্বাতন্ত্র্য (Individuality) নির্ভর করে। ডি-এন-এ অণুর স্বাতন্ত্র্যের তারতম্যে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়। চার প্রকার নিউক্লিওটাইডের গঠন বিন্যাসের পার্থক্যই বিভিন্ন মানুষের পার্থক্যের কারণ। এককোষী যমজ সন্তানের (Monozygotic twin) বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে মিল দেখা যায়, তার কারণ উভয় সন্তানের ডি-এন-এ অণুর মধ্যে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম প্রায় এক রকম।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তন্তু নির্মাণে অসংখ্য প্রকার প্রোটিনের প্রয়োজন। আমরা যে সব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি, তা পরিপাকের ফলে বিভিন্ন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয়। কুড়ি প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিডের অস্তিত্ব সাধারণতঃ দেখা যায় এবং তারা বিভিন্ন সংখ্যায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে। ডায়াবেটিস রোগের উৎপত্তির মূলে শরীরে যে ইনসুলিনের অভাব ঘটে, সেই ইনসুলিনটি একটি প্রোটিন এবং এটি তেরো প্রকারের একান্নটি অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা গঠিত। যে কোন প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও সজ্জাক্রম সুনির্দিষ্ট। অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা ও সজ্জাক্রমের পরিবর্তনে বিভিন্ন ধর্মী প্রোটিনের সৃষ্টি হয়।

প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম ডি-এন-এ-র নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রমের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই দুটি সজ্জাক্রমের মধ্যে এক আশ্চর্য রকম সম্বন্ধ খুঁজে পাওয়া যায়। ডি-এন-এ শৃঙ্খলের তিনটি নিউক্লিওটাইড প্রোটিন শৃঙ্খলের একটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্দিষ্ট করে। চার প্রকার নিউক্লিওটাইড থেকে তিনটি নিউক্লিওটাইডের সংযোজনে মোট ৬৪ প্রকার বিন্যাসের গঠন হতে পারে এবং তাদের মধ্যে মাত্র ২০টি বিন্যাস ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্ধারিত করে। যেমন, ডি-এন-এ শৃঙ্খলে তিনটি অ্যাডেনিন নিউক্লিওটাইডের বিন্যাস, প্রোটিন শৃঙ্খলে ফেনিল এলেনিন অ্যামিনো অ্যাসিডকে নির্ধারিত করে।

কোষ-বিভাজনের ফলে একটি কোষ যখন দুটি কোষে বিভক্ত হয়, সেই সময় নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রতিটি ক্রোমোসোম লম্বালম্বিভাবে চিরে

গিয়ে যে দুটি ক্রোমোসোম গঠন করে, সেগুলিকে ক্রোমাটিড বলে এবং তারা দুটি কোষে পৃথক হয়ে যায়। আবার সেই সঙ্গে ডি-এন-এ অণুর জড়ানো শৃঙ্খল দুটি খুলে যায় এবং তারা কোষের অভ্যন্তর থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মাল-মশলা সংগ্রহ করে দুটি অনুরূপ দ্বি-শৃঙ্খল বিশিষ্ট ডি-এন-এ অণুর সৃষ্টি করে। ডি-এন-এ অণুর একটি শৃঙ্খলকে ক্রোমাটিড বলে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরিমাপের দিক দিয়ে বিচার করলে. দুটির মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যায়। ডি-এন-এ শৃঙ্খলের তুলনায় সম্পূর্ণ বর্ধিত ক্রোমাটিড প্রায় ১০০ গুণ মোটা এবং দৈর্ঘ্যে দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। ক্রোমোসোম ও ডি-এন-এ অণুর অনুকৃতি গঠনে পারস্পরিক সম্বন্ধটা কিরূপ এবং ক্রোমোসোমের মধ্যে ডি-এন-এর সন্নিবেশ বা কি প্রকার, সে সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে এখনও জানা যায় নি।

উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন জিন। জিনগুলি ক্রোমোসোমের মাধ্যমে সন্তান-সন্ততির দেহকোষে সঞ্চারিত হয়। জিনের রাসায়নিক পদার্থ ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছিল না। যেহেতু ডি-এন-এ-কে বংশগত বৈশিষ্ট্যের একমাত্র বাহক বলে গণ্য করা হয়, সেহেতু জিনের রাসায়নিক উপাদান ডি-এন-এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ডি-এন-এ শৃঙ্খলের যে কোন অংশ একটি প্রোটিন অণু সৃষ্টি করতে সক্ষম, সেই অংশকে জিন বলে গ্রহণ করা হয়। জিন যে প্রোটিন সৃষ্টি করে, সেই প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম, জিনের অন্তস্থিত নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ডি-এন-এ শৃঙ্খলের বিভিন্ন অংশে নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম বিভিন্ন। এই কারণে ডি-এন-এ শৃঙ্খলের কোন একটি অংশ জৈব-রসায়নের দিক দিয়ে অপর একটি অংশ থেকে পৃথক। সুতরাং বিশেষ জিন ডি-এন-এ শৃঙ্খলের বিশেষ অংশকে নির্ধারিত করে। কিন্তু একটা জিন কত সংখ্যক নিউক্লিওটাইডের দ্বারা গঠিত বা বিভিন্ন জিন বিভিন্ন সংখ্যক নিউক্লিওটাইডের দ্বারা গঠিত কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি। তবে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যার তারতম্যে যখন বিভিন্ন ধর্মী প্রোটিনের উৎপত্তি ঘটে, তখন প্রতিটি জিন সমসংখ্যক নিউক্লিওটাইডের দ্বারা গঠিত নয় বলে অনুমান করা যেতে পারে।

একটি ডি-এন-এ অণু থেকে অনুরূপ দুটি ডি-এন-এ অণুর সৃষ্টিকালে মাঝে মাঝে ত্রুটি-বিচ্যুতিতে ডি-এন-এ শৃঙ্খলের কোন অংশের নিউক্লিওটাইডের সজ্জাক্রম পরিবর্তিত হয়ে পড়ে। ফলে ঐ বিশেষ অংশের সঠিক অনুলিপি (Replication) তৈরিতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং ভিন্ন অনুলিপি সৃষ্টি হয়ে নতুন জিনের উদ্ভব হয়। এই নতুন জিনের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে পরিব্যক্তি (Mutation) বলে। পরিব্যক্তির সাহায্যে জিনের রাসায়নিক পদার্থের (নিউক্লিওটাইডের) গঠন-বিন্যাস ও কার্যকলাপ বুঝতে পারা যায়। জিনের পরিব্যক্তিতে প্রোটিন শৃঙ্খলে নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি হয়, ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জাক্রম পরিবর্তিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিনের ধর্মও পাল্টে যায়। মানুষের রক্তে যে গোলাকৃতির হিমোগ্লোবিন থাকে, তা প্রোটিন দিয়ে তৈরি। হিমোগ্লোবিনের কাজ হলো, ফুস্‌ফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে শরীরের বিভিন্ন কোষে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে ফুস্‌ফুসে নিয়ে আসা। একটি হিমোগ্লোবিন অণু দুটি অংশে গঠিত—প্রতি অংশে উনিশ প্রকারের প্রায় তিন শত অ্যামিনো অ্যাসিড পর পর সংযুক্ত থাকে। জিন পরিব্যক্তির ফলে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমিক সজ্জায় এক স্থানের গ্লুটামিক অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিবর্তে ভ্যালিন অ্যামিনো অ্যাসিড

সৃষ্টি হওয়ায় রক্তে বাঁকাচোরা ও লম্বাকৃতি হিমোগ্লোবিনের অস্তিত্ব দেখা যায়। অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলে এই সামান্য রদবদলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ধারণ করবার ক্ষমতা লোপ পায় এবং মানুষের বহিঃপ্রকৃতিতে তার প্রতিফলন দেখা যায়। যাদের রক্তে এই ধরণের অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন থাকে, তাদের বংশগত অ্যানিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রের মত সন্তান পিতামাতার নিকট থেকে চোখ, মুখ, নাক কিছুই পায় না। পিতামাতার জননকোষের সংমিশ্রণে যে নবজাতকের সৃষ্টি হয়, সেই জননকোষে গায়ের রং, কোঁকড়ানো চুল, কালো চোখ, সঙ্গীত প্রতিভা, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির অস্তিত্ব কিছুই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে জননকোষের মধ্যে যে ক্রোমোসোম থাকে, ক্রোমোসোমের মধ্যে যে জিনসমষ্টি (অর্থাৎ ডি-এন-এ) থাকে, সন্তান তাই লাভ করে এবং শরীর গঠনকালে তারা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে রূপদান করে। আবার শরীর গঠন কালে বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে তৈরি হয় না, অর্থাৎ প্রথমে গায়ের রং, পরে চোখের মণির রং, তারপরে রক্তশ্রেণী—এই ভাবে সৃষ্টি হয় না। সব জিনের সমষ্টিগত প্রভাব শরীর গঠনকালে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। যেমনি চুপ্‌সে-যাওয়া বেলুনের গায়ে যে লেখা থাকে তা প্রথমে ভালভাবে পড়া যায় না, কিন্তু বেলুনকে যতই ফোলানো যায়, ততই লেখার অক্ষরগুলি ফুটে ওঠে, তেমনি সন্তান যে জিনসমষ্টি পিতা-মাতা থেকে লাভ করে, তা প্রথমেই প্রকাশ হয়ে পড়ে না, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জিনের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে ব্যক্তি যে জিনসমষ্টি লাভ করে, তা অন্য ব্যক্তির জিন-সমষ্টি থেকে পৃথক। এই জিনসমষ্টি অথবা ডি-এন-এ অণুর নিউক্লিওটাইডের গঠন-বিন্যাসের পার্থক্যই একজনকে প্রতিভাবান ও অপরজনকে সাধারণ, একজনকে সুস্থ ও অপরজনকে রোগগ্রস্ত করে।

ওয়েভিকল

প্রবীর সেনগুপ্ত

আলোর সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। অন্ধকার ঘরে কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতেই বা ইলেকট্রিক লাইটের সুইচটা টিপে দিতেই সমস্ত ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, দেখা গেল ঘরের সমস্ত বস্তুকে। আবার ঐ আলোকিত ঘরে চোখ বন্ধ করে থাকলে কিন্তু কিছুই দেখা যাবে না। সুতরাং কোন বস্তুকে দেখবার জন্যে দুটি জিনিষের দরকার—একটি চোখ, আর একটি হলো আলো। চোখের দর্শন অনুভূতিকে জাগ্রত করবার বাহ্যিক কারণ বা উত্তেজক হলো আলো। চোখ সম্পর্কে কোন আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

আলো কি? আলো কি দেখা যায়? এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় আলো কিভাবেই বা চলাফেরা করে? সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র এরা বহুদূরে অবস্থিত। অত দূর

থেকে আলো কি ভাবে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়? আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দী থেকে। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব আজও তাঁরা দিতে পারেন নি।

আলো কি? আলো এক প্রকার শক্তি। আর শক্তিমাত্রেই অদৃশ্য, তাই আলোও অদৃশ্য। আলোর গতিপথে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তু যখন ঐ অদৃশ্য আলোর দ্বারা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—তখনই আমরা আলোর উপস্থিতি অনুভব করি।

দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, আলোর গতিপথ সরলরৈখিক। কারণ সরলরেখায় না চললে আলোর উৎসের সামনে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে বস্তুটির ছায়া দেখা দিত না বা গ্রহণের সময় মহাশূন্যে পৃথিবী বা চন্দ্রের ছায়া পড়তো না। আলোর এই প্রকৃতি সম্বন্ধে ভালভাবে না জেনেও এই সরলরৈখিক গতির সাহায্যে সাধারণ আলোক সম্পর্কিত ঘটনাবলী—যেমন, প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা করা গেল। আলোর এই সরলরৈখিক গতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে নিউটন সপ্তদশ শতাব্দীতে আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোর কণিকাবাদ (Corpuscular theory of light) প্রবর্তন করেন।

তিনি বললেন, আলো হলো কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার সমষ্টি। আলোর উৎস থেকে এই কণিকাগুলি যখন প্রচণ্ড বেগে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তার কিছু অংশ আমাদের চোখে এসে আঘাত করলে ঐ আলোকিত বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দর্শনানুভূতি জাগ্রত হয়। এ তো গেল স্বয়ম্প্রভ (Luminous) বস্তু দেখবার কথা, নিষ্প্রভ (Non-luminous) বস্তুর ক্ষেত্রে ঐ কণিকাগুলি এসে আগে নিষ্প্রভ বস্তুকে আঘাত করে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে লাগলে আমরা তাকে দেখতে পাই। নিউটন তাঁর এই কণিকাবাদ এবং স্ব-আবিষ্কৃত বলবিদ্যার (Mechanics) সূত্রগুলির সাহায্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, বিচ্ছুরণ, ছায়ার উৎপত্তি প্রভৃতির ব্যাখ্যা দিলেন। প্রতিসরণের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার ফলে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল যে, ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ লঘু মাধ্যমে আলোর বেগের চেয়ে বেশী; অর্থাৎ বায়ু থেকে কাচের ভিতর দিয়ে আলো গেলে বাতাসে আলোর বেগের চেয়ে কাচে আলোর বেগ বেশী হবে।

১৬৭৮ সালে হায়গেন বললেন, আলো আসলে তরঙ্গাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং আলোক-তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে লাগলে আমরা কোন বস্তুকে দেখতে পাই। আলোর এই তরঙ্গবাদের (Wave theory of light) দ্বারা প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ব্যাখ্যা করলেন এবং দেখালেন যে, ঘন মাধ্যমে আলোর বেগ লঘু মাধ্যমে আলোর বেগের চেয়ে কম।

এই অবস্থায় কোন্‌টা ঠিক, তাই নিয়ে বিতর্ক চলতে লাগলো। এদিকে আলোর ব্যতিচার (Interference of light) ও আলোর অববর্তনের (Diffraction of light) ব্যাখ্যা কোন তত্ত্বের দ্বারাই পাওয়া গেল না। কোন বস্তুতে এসে আলো বাধাপ্রাপ্ত হলে আলোকরশ্মি ঐ বস্তুকে ঘেঁষে একটু বেঁকে যায়। সংক্ষেপে এটাই হলো আলোর অববর্তন। এর দ্বারা বোঝা গেল, আলোর গতিপথ ঠিক সরলরৈখিক নয়, প্রায় সরলরৈখিক। নিউটনের বিপুল প্রভাবের জন্যে তৎকালীন বিজ্ঞানীরা কণিকাবাদের দ্বারা আলোক সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হলেন।

এদিকে আবার তরঙ্গবাদের ক্ষেত্রে প্রথমেই একটা অসুবিধা দেখা দিল। তরঙ্গের বিস্তারের জন্যে একটা জড় (Material) মাধ্যম দরকার।

পৃথিবীপৃষ্ঠের কয়েক শত মাইল উপর পর্যন্ত রয়েছে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর। তারপরেই তো মহাশূন্য। তবে কি আলো সূর্য বা চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আসবার সময় মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে এসেছে? কিন্তু আলো তরঙ্গ হলে তার বিস্তারের জন্যে মাধ্যম চাই। তাই হায়গেন বললেন, পৃথিবী থেকে মহাশূন্য পর্যন্ত বিস্তৃত এক মাধ্যম আছে—তার নাম ইথার। আবার শব্দ-তরঙ্গ ও অন্যান্য স্থিতিস্থাপক বস্তুর ধর্ম থেকে পাওয়া গেছে যে, তরঙ্গের বিস্তারের জন্যে একটা অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম দরকার। সুতরাং ইথার নিশ্চয়ই অবিচ্ছিন্ন স্থিতিস্থাপক মাধ্যম। স্থিতিস্থাপক মাধ্যম হলে তরঙ্গের বিস্তারের সময় তাতে শক্তির কোন অংশের শোষণ প্রায় হয় না বললেই চলে। তাই হায়গেন বললেন, ইথার সর্বত্র বিরাজমান। আলো এর মধ্য দিয়ে অনুদৈর্ঘ্যের (Longitudinal) তরঙ্গাকারে আসে, সুতরাং ধরা হলো। ইথারের প্রকৃতি গ্যাসের ন্যায়। কারণ অনুদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সাধারণতঃ গ্যাসের মধ্য দিয়ে বিস্তার লাভ করে। তিনি তাঁর এই মতবাদের দ্বারা আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলেও আলোর সরলরৈখিক গতির ব্যাখ্যা করতে পারলেন না এবং ছায়ার উৎপত্তিরও কারণ দেখাতে পারলেন না। তাই কণিকাবাদ ও তরঙ্গবাদের মধ্যেকার বিতর্কের অবসান হলো না। আবার ১৬৭০ সালেই হায়গেন দেখেছিলেন যে, আইসল্যাণ্ড স্পার নামক স্ফটিকের মধ্য দিয়ে একটা আলোকরশ্মি গেলে বেরিয়ে আসবার সময় সেটা দুটি রশ্মিতে পরিণত হয়। এর নাম আলোকের Double Refraction। এর কোন ব্যাখ্যা তরঙ্গবাদের দ্বারা করা গেল না।

১৮০১ সালে হঠাৎ বৈজ্ঞানিক টমাস ইয়ং তরঙ্গবাদের সাহায্যে আলোর ব্যতিচারের সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি নিউটন্স্ রিং-এর (Newton's ring) উৎপত্তির কারণও তরঙ্গবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করলেন। নিউটন্স্ রিং হলো একটা আলোক সম্পর্কিত ঘটনা, যেটি নিউটন প্রথম দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর কণিকাবাদের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এর ফলে বিজ্ঞানীরা তরঙ্গবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত করা গেল, ঘন (Denser) মাধ্যমে আলোর বেগ লঘু মাধ্যমে আলোর বেগের চেয়ে কম। বস্তুতঃ ফুঁকো (Foucault) পরে পরীক্ষার সাহায্যে এটা প্রমাণ করেছিলেন। কিন্তু ল্যাপ্লাস এদিকে কণিকাবাদের দ্বারা Double refraction-এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়ে বিতর্ক জিইয়ে রাখলেন।

এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা Aberration of light-এর ক্ষেত্রে উভয় তত্ত্বকে প্রয়োগ করে দেখছিলেন। সহজভাবে বললে—অ্যাবারেশন হলো এক প্রকার দৃষ্টিবিভ্রম। পৃথিবীর গতি ও আলোর গতির মিলিত ফল হিসেবে কোন নক্ষত্র আসলে যে স্থানে রয়েছে, সেই স্থানে তাকে দেখা যায় না। নক্ষত্রের অবস্থানের এই আপাত পরিবর্তনই হলো অ্যাবারেশন। বৈজ্ঞানিক ব্র্যাড্লি কণিকাবাদের সাহায্যে অ্যাবারেশনের সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। ইয়ং ১৮০৪ সালে ইথারকে স্থির ধরে নিয়ে অ্যাবারেশনের যে ব্যাখ্যা দিলেন, তা ব্র্যাড্লির ব্যাখ্যা এবং পরীক্ষালব্ধ ফলের সঙ্গে মিলে গেল। কাজেই বিতর্কের অবসান তো হলোই না, বরং নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হলো ইথারকে নিয়ে—ইথার স্থির, না গতিশীল। ইথার স্থির না হলে অ্যাবারেশনের ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। কিন্তু যদি ইথার স্থির হয়, তাহলে ইথারের আপেক্ষিকতায় কোন বস্তুর গতি নির্ণয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল এবং এই গতিকে চরম বা নিরপেক্ষ (Absolute) গতি বলা যায়। সেই দিক দিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে লাগলেন।

এদিকে তরঙ্গবাদের সাহায্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অববর্তন, ব্যতিচারের সকল ব্যাখ্যা করায় তরঙ্গবাদ আস্তে আস্তে জয়ের পথে এগিয়ে চললো এবং স্বভাবতঃই ইথার—যার উপস্থিতির কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না—সেটাও প্রতিভাত হতে লাগলো। বাধা এলো আলোর Double refraction, তথা সমবর্তন (Polarisation) থেকে। এই সময় ১৮১৪ সালে বৈজ্ঞানিক ফ্রেনেল (Fresnel) আলো-কে ইথারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তির্যক তরঙ্গ (Transverse wave) ধরে নিয়ে আলোর সমবর্তনের ব্যাখ্যা দিলেন। এমন কি, খুব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ধরে তিনি তার নতুন তরঙ্গবাদের সাহায্যে আলোর সরলরৈখিক গতিরও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিলেন। এতে তরঙ্গবাদের জয়জয়কার পড়ে গেলেও ইথারকে নিয়ে নতুন সমস্যা দেখা দিল।

আলো-কে ইথারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তির্যক তরঙ্গ ধরবার ফলে ইথারের গ্যাস মডেলকে বাতিল করে কঠিন স্থিতিস্থাপক মাধ্যম ধরতে হলো, কারণ গ্যাসের মধ্যে তির্যক তরঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে না। কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমে তির্যক তরঙ্গের বেগ,

$$C = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

E হলো মাধ্যমের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক এবং ρ হলো তার ঘনত্ব। ইথারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোর বেগ,

$$C = 3 \times 10^{10} \text{ সে. মি/সেকেণ্ড,}$$

সুতরাং ইথারের স্থিতিস্থাপকতা E খুবই বেশী এবং সেই সঙ্গে তার ঘনত্ব ρ খুবই কম। সাধারণতঃ কোন কঠিন পদার্থের স্থিতিস্থাপকতা বেশী হলে তার ঘনত্বও বেশী হয়। সুতরাং ইথারকে সাধারণ কঠিন পদার্থের অনুরূপ বস্তু ধরা যায় না। আবার প্রশ্ন দেখা দিল—গ্রহ-উপগ্রহগুলি যখন কঠিন ইথারের মধ্য দিয়ে ঘোরে, তখন তারা কোন বাধা পায় না কেন? যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ইথারকে খুব উচ্চ স্থিতিস্থাপকতা ও খুব কম ঘনত্ববিশিষ্ট জেলির মত এক প্রকার পদার্থ বলে ধরে নেওয়া হলো।

কণিকাবাদ ও তরঙ্গবাদের মধ্যেকার লড়াই শেষ পর্যন্ত এসে 'ইথার বিতর্কে' দাঁড়ালো। ইথার স্থির না গতিশীল, তাই নিয়ে গবেষণা চলতে লাগলো। বিজ্ঞানীরা বললেন—ইথার স্থির হলে ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী যখন কোন আলোর উৎসের অভিমুখে অথবা উৎসের উল্টো দিকে ঘোরে, তখন ইথার মাধ্যমের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বর্ণের আলোকের প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় প্রতিসরাঙ্কের কোন পরিবর্তন না পাওয়ায় স্থির ইথারের সিদ্ধান্তে সন্দেহ দেখা দিল। কিন্তু ফ্রেনেল এক আশ্চর্যভাবে এই সমস্যার সমাধান করে ইথারকে বাঁচালেন—তরঙ্গবাদকে বাঁচালেন।

তিনি বললেন, সব স্থানের ইথার সমান ঘন নয়। অপেক্ষাকৃত ঘন ইথারের কিছু অংশ পৃথিবী তার গতির দিকে কিছুটা টেনে নিয়ে যাবার ফলে আলোর প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি।

টুর্ম্যালিন স্ফটিক বা অন্যান্য স্ফটিকের ক্ষেত্রে আলোর Double refraction-এর ঘটনা থেকেই ফ্রেনেল সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আলোক-তরঙ্গ তির্যক। বিজ্ঞানীরা কিন্তু এটা মানতে রাজী ছিলেন না, তাঁরা আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ খুঁজছিলেন। এমন সময়ে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল এমন এক নতুন ইথার তত্ত্বের অবতারণা করলেন, যাতে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে, আলোক-তরঙ্গ তির্যক। এই তত্ত্বের সাহায্যে তিনি আলোক সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সব ঘটনা এবং আলোর সমবর্তনকে আরও সুন্দরভাবে নতুন করে ব্যাখ্যা করলেন। সেই তত্ত্বের কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

ফ্যারাডে আগেই দেখেছিলেন যে, কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সমবর্তন-তল (Plane of polarisation) ঘুরে যায়। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল যে, আলোর নিশ্চয়ই কোন তড়িৎ-চুম্বকীয় ধর্ম আছে। ম্যাক্সওয়েল Displacement current সম্বন্ধে গবেষণা করতে গয়ে তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এমন কতকগুলি সমীকরণ পেলেন, যেগুলি থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, যে কোন তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেই তরঙ্গ তির্যক তরঙ্গ এবং একটা নির্দিষ্ট গতিতে চলে। বস্তুতঃ তিনি দেখালেন যে, এই গতি আলোর গতির সমান। এই ঘটনা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন—আলো হলো আসলে তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। ইথার মাধ্যমে পরস্পর সমকোণে অবস্থিত তড়িৎ ও চৌম্বক প্রাবল্যের (Electric and Magnetic Intensity) মধ্যে পরিবর্তী (Alternating) তড়িৎ-প্রবাহ চলাচলের ফলেই আলোক-তরঙ্গের উৎপত্তি হয় এবং এই তড়িৎ-চৌম্বক আলোক-তরঙ্গ তড়িৎ ও চৌম্বক প্রাবল্যের সমকোণে সঞ্চালিত হয়। অতএব আলোক-তরঙ্গ তির্যক। ম্যাক্সওয়েলের এই তাত্ত্বিক ধারণার পরীক্ষা-মূলক প্রমাণ দেন হার্ৎজ ১৮৮০ সালে।

কিন্তু ইথার স্থির না গতিশীল, আংশিক স্থির, না আংশিক প্রবহমান—এই প্রশ্নের সমাধান তো হলো না! লোরেঞ্জ তাঁর ইলেকট্রনিক তত্ত্বের দ্বারা বুঝিয়ে দিলেন ইথার স্থির। ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর গতিবেগ নির্ণয়ের জন্যে মাইকেলসন-মর্লির পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো—ইথার স্থির নয়। লোরেঞ্জ বললেন, পৃথিবীর গতির জন্যে পরীক্ষার যন্ত্র স্থির ইথারের আপেক্ষিকতায় পৃথিবীর দিকে ছোট হয়ে যাওয়ায় মাইকেলশন-মর্লির পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নি। এইভাবে তিনি প্রমাণ করলেন, ইথার স্থির এবং সর্বত্র বিরাজমান। পদার্থের ভিতরকার অণু-পরমাণুর আভ্যন্তরীণ কম্পনের ফলেই আলোর উৎপত্তি হয় এবং এই তরঙ্গই তির্যকভাবে স্থির ইথারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বললেন, একটা মাত্র ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, এরূপ একটা তত্ত্ব কোন মতেই গ্রহণ করা যায় না, তাই বিতর্ক চলতেই লাগলো। অবশেষে ১৯০৫ সালে এলেন অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। তিনি তাঁর নতুন তত্ত্ব প্রচার করে এই ইথার বিতর্কের ছেদ টানলেন।

তিনি বললেন, ইথারের আপেক্ষিকতায় কোন বস্তুর গতি—কথাটি অর্থহীন। আসলে—একের আপেক্ষিকতায় অন্যের গতি—কথাটাই ঠিক। এইভাবে তিনি ইথারের কোন উল্লেখ না করে তাকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে যে নতুন যুগান্তকারী বৈপ্লবিক তত্ত্বের অবতারণা করলেন—তার নাম আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ (Einstein's theory of Relativity)। এইভাবে প্রায় দেড় শতাধিক বছরের ইথার বিতর্কের অবসান হলেও, আলো কি—সে প্রশ্নের সমাধান হলো না। ফটো-ইলেকট্রিক এফেক্ট নামক একটা আলোক-সংক্রান্ত ঘটনার ব্যাখ্যা তরঙ্গবাদ দিয়ে হচ্ছিল না। ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আলোর যে নব-কণাবাদ প্রচার করেন, সেই তত্ত্ব প্রয়োগ করেন আইনষ্টাইন Photo-electric effect ব্যাখ্যার জন্যে। ঐ একই সময়ে তিনি তাঁর আপেক্ষিকতাবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। অলোর এই নব-কণাবাদ (Quantum or Photon theory of Light) দিয়ে ফটো-ইলেট্রিক এফেক্টকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন আইনষ্টাইন। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আলোর নব-কণাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই নব-কণাবাদ অনুযায়ী ধরা হলো আলোর ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা আছে, (এরা কিন্তু সেই নিউটনের কণা নয়) এরা হলো

ফোটন বা কোয়ান্টাম। ঐ ফোটনগুলির ভিতরে শক্তির ঝাঁক (Bundle of energy or Packet of energy) রয়েছে। ফোটনে নিহিত মোট শক্তির পরিমাণ,

$$E = hf,$$

h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, এর মান হলো 6.6×10^{-27} erg. second or 6.6×10^{-34} Joule. sec. (1 Joule $= 10^{7}$ ergs)

f হলো আলোর বিকিরণের কম্পাঙ্ক। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আলো হলো ফোটনের বর্ষণ (Shower of Photon)। কোন উৎস থেকে আলো বেরিয়ে আসবার সময় এই সব অসংখ্য ফোটন আলোর উৎসের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এই নব-কণাবাদের দ্বারা আলোক সম্পর্কিত ঘটনা—কম্পটন এফেক্ট, রামন এফেক্ট প্রভৃতিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা গেল—এখানে তরঙ্গবাদ অচল। কিন্তু নব-কণাবাদ আলোর ব্যতিচার, অববর্তন, সমবর্তন প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে অপারগ—সেখানে তরঙ্গবাদ অপরিহার্য। এই হলো আলোর দ্বৈত প্রকৃতি। তাই একে বলা যায় ওয়েভিকল (WAVICLE) অর্থাৎ একাধারে Wave আর Particle। আলোর অন্ধকার এখনও কাটে নি। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন। আমরা সেই দিনটির দিকে তাকিয়ে আছি, যে দিন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব দিয়ে আলোক সম্পর্কিত সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারবো। তখন নিশ্চয়ই আলোর এই দ্বৈত চরিত্র (Dualistic character) অর্থাৎ ওয়েভিকলের দরকার হবে না।

অপচায়িত মানবশক্তি ঃ বিপথগামী কিশোর

অমলকুমার মৈত্র

আমাদের দেশে আজ যখন প্রকল্প-পরিকল্পনার ছড়াছড়ি, দেশ গড়বার কাজ যখন দ্রুততর হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, মানবশক্তির প্রাচুর্য যখন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তখনই কিন্তু আমরা এই শক্তি-সম্ভাবনার একটা বিরাট অংশকে অপচয়ের হাত থেকে উদ্ধারের কোন স্থির, সুষ্ঠু পরিকল্পনার আশ্রয় নেই নি। এটা আশ্চর্যের কথা হলেও, অত্যন্ত দুঃখজনক সত্য।

আজকের আলোচনায় যাদের কথা বলবো, যে শক্তির অপচয়ের দিকে চিন্তাশীল সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো, তারা সমাজের সেই অংশ. যারা সামাজিক বিধি-নিষেধের আওতায় নিজেদের আবদ্ধ রাখতে অপারগ। আর যারা অন্যান্য বহুমুখী ব্যক্তিত্ব সমস্যায় নিজেদের সামলাতে না পারায় মানসিক রোগগ্রস্ত বা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসমর্থ। সমাজের চোখে এই সব বিপথগামী বা ব্যক্তিত্ব-সমস্যা জর্জরিত শিশু ও কিশোরদের অবহেলার মাধ্যমে আমরা মানব-শক্তির একটা বিরাট অংশের অপচয়ের ব্যবস্থা অজ্ঞাতসারেই করে দিয়েছি। একটা সুষ্ঠু, সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অপচয় রোধের সামগ্রিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব। প্রকৃত অবস্থা পর্যালোচনা, বাস্তবকে সামনে রেখে এই অপচীয়-মান শক্তি উদ্ধারের আশায় বিস্তারিত ব্যবস্থা করতে হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণে অবশ্য আর একটা একান্ত প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক লাভের কথাও মনে রাখতে হবে—এই লাভ সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার, এই লাভ পারিবারিক

অবস্থাকে উন্নত ও সুন্দর করবার—সর্বোপরি এই লাভ ব্যক্তি-মানসের।

কৈশোর বয়ঃসন্ধিক্ষণ। এই সময়ে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে দেহ ও মনে। শৈশবের আত্যন্তিক নির্ভরতায় আপাতঃ ছেদ আসে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে, পরিবার বহির্ভূত জীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়—বিদ্যালয়ে, শিক্ষক ও সহপাঠীদের সঙ্গে, খেলার আসরে বয়সীদের সঙ্গে। জৈবিক পরিবর্তনের ঢেউ আর সেই সঙ্গে মানসিক জগতেও আসে বিপ্লব। কৈশোর উদ্দাম, চঞ্চল। অসম্ভবকে সম্ভব করবার, অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার এক উদগ্র আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে। আর নিষেধ অমান্য করা তার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, জরুরী। বাঁধন ছেঁড়বার নেশা তাকে পেয়ে বসে। সে সব কিছুই যাচাই করে দেখতে চায়, পরখ করতে চায়। এর মধ্যেই এক দিকে যেমন বড় হবার, অপর দিকে তেমন বয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে নিহিত। তাল ঠিক রেখে অভিজ্ঞতার পরিধি যখন বাড়িয়ে চলে, তখন স্বাভাবিক অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। আবার যখন বেতাল হয়ে পড়ে, প্রলোভন তাকে পেয়ে বসে, তখন তার মধ্যে সুরু হয় প্রবৃত্তি ও সমাজ-বোধের টানাপোড়েন। নানারকম ব্যক্তিত্ব-সমস্যার উদ্ভব হয়।

শৈশবে যে বাবা-মার স্নেহাশ্রয়ী এবং একান্ত নির্ভরশীল, সেই শিশুই কৈশোরে দৈহিক পরিবর্তনে ও মানসিক দ্রুত বিবর্তনে হঠাৎ আবিষ্কার করে যে, সে কেমন যেন খাপছাড়া। কেমন যেন বেমানান ভাবে বেড়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বরের লালিত্য ও মিষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে, তার আশা, কল্পনা, অধিকার বোধও বেখাপ্পা ঠেকছে। বড়দের বিধি-নিষেধে সে বিব্রত, বিড়ম্বিত। 'ছুটি'র ফটিকের মতই তার চপলতা বড়দের কাছে জ্যাকামি আর দায়িত্ব গ্রহণের উৎসাহ জ্যাঠামি :

"বিশেষতঃ তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো আধো কথাও জ্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রেই প্রগল্‌ভতা।...শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।"

একদিকে ঘরের মধ্যে এই বিড়ম্বিত জীবন, অন্যদিকে বাইরের ডাক, প্রলোভন। এরই সঙ্গে যোগ দেয় স্বাভাবিক কর্তৃত্ব অমান্য করবার ঝোঁক। সমস্যা বেড়ে চলে।

কৈশোর পরিবর্তনধর্মী ও পরিবর্তনমুখী। এই পরিবর্তনমুখীনতা কাজে লাগাতে পারলে তার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার জন্যে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত গড়ে তুলতে পারলে আপাতঃ বিরোধী আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য ও অর্থ এনে দিতে পারলে সোনা ফলে। কিশোর আপন উৎসাহে, উদ্যমে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে, সুন্দরভাবে সামাজিক হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে মানুষ তার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

অন্যদিকে যদি আমরা বড়রা কিশোরের অসামান্য দৈহিক শক্তির কল্পনা, মানসিক অধৈর্য, অসাম্যতা ও আকাঙ্ক্ষার আতিশয্য অনুভবে সহৃদয় না হতে পারি, আর এই স্বাভাবিক অস্বাভাবিকতা যদি আমাদের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়, অসহ্য হয়, বড়দের ব্যবহারিক মানে যদি তাকে বিড়ম্বিত করি, তাকে যদি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে না পারি, দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করি, তাহলে অনিবার্যভাবে সে অসুখী হয়ে উঠবে, খুঁজে ফিরবে কোন এক পরিবেশ, গোষ্ঠী, যেখানে সে একান্তভাবে গ্রহণযোগ্য। তার উৎসাহ এবং অনুসন্ধিৎসা যে অপরাধ-বৃত্তিতে রূপান্তরিত হবে, তাতে আশ্চর্য কি! আর যদি তার মধ্যের এই

অসাম্যতা বড়োদের বুড়োমির ফলে স্ববিরোধে রূপান্তরিত হয়, যদি তার পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বহিঃ-প্রকাশের পথ খুঁজে না পায়, তাহলে বহুতর মানসিক অসামঞ্জস্যতায় ভোগে কিশোর। তার স্বাভাবিক গড়ে ওঠবার কাজ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। সে এক অস্বাভাবিক সমস্যা-জর্জরিত কিশোরে পরিণত হয়।

অবশ্যই কিশোরের অপরাধপ্রবণতা বা মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রেই এত সরলীকৃত নয়। এই অবস্থা বহুবিধ কারণ ও শক্তি-সংঘাতের ফল। জন্মসূত্রে কিছুটা, কিছুটা দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা-অক্ষমতার উপর স্বতঃই নির্ভরশীল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সমস্যা-জর্জরিত কিশোর বহুলাংশেই পরিবেশের বলি। এই পরিবেশ—পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। পরিবেশ যদি তার প্রতি রূঢ় হয়, তার মানসিক চাহিদার যদি পূর্তি না ঘটে, তাহলে এই বেড়ে ওঠবার সময় তার ব্যক্তিত্ব-বিবর্তন স্বাভাবিক হয় না। সেই ছাঁদের দোষেই তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা।

কিশোরদের বহুমুখী ব্যক্তিত্ব-সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী একান্ত প্রয়োজনীয়। যে কিশোর ইতিমধ্যেই ব্যক্তিত্ব-সমস্যায় জর্জরিত, তার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকল্পনার প্রয়োজন আরও বেশী। তাকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করতে, একটা সুস্থ আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে, পরিপূর্ণ মানুষে গড়ে তুলতে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। এই বিশ্বাসই কলিকাতার বিশিষ্ট গবেষণা সংস্থা সামাজিক ও মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিষদকে ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে শীলায়ন (=শীল+আয়ন) প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করে। তখন থেকে শীলায়ন প্রতিটি শিশু ও কিশোরের ব্যক্তি-বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে, স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে তাদের ব্যক্তিত্ব-সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে চলেছেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই শীলায়ন পথিকৃৎ এবং যতদূর জানি, আমাদের দেশে এই ধরণের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। তাই শীলায়নের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শীলায়নের বহির্বিভাগে প্রতিটি শিশু ও কিশোরের আজন্ম ব্যক্তিগত ইতিহাস গ্রহণ, দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা-অক্ষমতার পরিমাপ এবং বিস্তারিত মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে ব্যবস্থাদি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। বহির্বিভাগের নির্দেশের উপরই নির্ভর করে, একটি শিশু বা কিশোরকে শীলায়নের আবাসিক হিসাবে রাখা হবে কি না। ব্যক্তিমানসিকতার পরিবর্তন-প্রচেষ্টার প্রথম ধাপ হিসাবে শিশু বা কিশোর যে পরিবেশের বলি, সেই পরিবেশ থেকে আবাসিক অবস্থায় নিরপেক্ষ পরিবেশে স্থানান্তরিত করা হয়। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু ও কিশোর মনোবিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী ও মানসিক চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে শীলায়ন এক উপযুক্ত আবাসিক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান। এখানে খেলা ও কাজের মাধ্যমে তাদের বিশেষ মানসিক চাহিদা পূরণের সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন আনবার ব্যবস্থা হয়। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উপযোগী নাট্য চরিত্র চিত্রণ ও বিশেষভাবে পরিচালিত (Psychodrama) নাটকের অভিনয়ে সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করে প্রত্যেক আবাসিক ছাত্রই। গোষ্ঠীতে ও প্রয়োজনে এককভাবে মনোবিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার এবং বিশেষ ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনবোধে ওষুধপত্রের ও অধুনা উদ্ভাবিত বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে যে, কখনই সব ছেলেকে একই ছাঁচে ফেলবার চেষ্টা হয় না। সব সময়েই কিশোরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। তার কল্পনাশক্তির বিকাশ ও পরিপূর্ণভাবে

ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শিক্ষা, বৃত্তি নির্ণয়, কারিগরি কাজে ব্যুৎপত্তি, সঙ্গীত, শিল্প, অভিনয়, খেলাধূলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ এখানকার কর্মসূচীর অঙ্গ।

প্রতিভার বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার, সহনশীলতা, গোষ্ঠীচেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সুস্থ আশাবাদের সঞ্চার এবং স্ব-শক্তি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে শীলায়নের কর্মী ও উদ্যোক্তারা অত্যন্ত আগ্রহী। এছাড়া তাঁরা চান, প্রত্যেক কিশোরের মধ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তুলতে এবং সেই সঙ্গে প্রাত্যহিক জীবনে তাদের যথাসাধ্য স্বনির্ভর করতে। একটি শিশু বা কিশোরের দৈনন্দিন জীবনের কোন একটা ছোট্ট মুহূর্তও অজ্ঞাতে শেষ হয়ে যায় না। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, সে কাজই হোক আর খেলাই হোক—তার অজ্ঞাতে চলে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের পালা। এই তীক্ষ্ণ ও একাগ্র পর্যবেক্ষণের উপরেই গড়ে ওঠে মনোবিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী।

সামাজিক নিরাপত্তার খাতিরে ও সমাজ-কল্যাণে শীলায়নে আজ যে পরীক্ষার সুরু ও প্রাথমিকভাবে কার্যকরী, সেই পরীক্ষারও প্রসার ঘটা দরকার সমাজের প্রয়োজনেই। এই ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। কারণ, প্রকৃত প্রস্তাবে প্রত্যেক বিপথগামী অথবা মানসিক সমস্যা-জর্জরিত শিশু ও কিশোর কোন না কোন পর্যায়ে অবহেলিত। এই অবহেলার দোষে আমরা প্রত্যেকেই । তাদের শক্তি সম্ভাবনার উপযুক্ত উপলব্ধির আশু প্রয়োজন, আর প্রয়োজন তাদের ব্যক্তিত্ব-সমস্যা সমাধানে মনস্তত্ত্ব ও সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক এক বৃহত্তর সামগ্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী করবার। এই পরিকল্পনা কল্যাণকামী রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রোটিনের উৎস-সন্ধানে

শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী

বর্তমানে বিংশ শতাব্দীতে জনসংখ্যা এত দ্রুত-গতিতে বেড়ে যাচ্ছে যে, এখন সকলেই ম্যালথাসের বক্তব্যের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল—"খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির হারের চেয়ে জনসংখ্যা আরও দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাবে"। এই সত্য উপলব্ধি করেই বহু পত্র-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে এই আশু খাদ্যসঙ্কট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। খাদ্যকে যদি ক্যালরি মূল্যের নিক্তিতে বসিয়ে বিচার করা হয় তবে দেখা যাবে যে, আগামী এক শত বছরের মধ্যে আমাদের খাদ্যের কোন ঘাট্‌তি হবে না। কথাটা একটু স্পষ্ট করেই ব্যাখ্যা করা যাক। যদি পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২.৫ বিলিয়ন হয়, তবে তার বার্ষিক ক্যালরির চাহিদা হবে ২৭.২ $\times$ ১০^{১৪} কিলোক্যালরি এবং এই পরিমাণ চাহিদা ১.৫২৫ $\times$ ১০^{১২} পাউণ্ড চিনির সাহায্যেই মেটানো সম্ভব। আমেরিকায় প্রায় ১,৮৬৬,০০০ একর জমিতে আলু চাষ করা হয়ে থাকে এবং উৎপন্ন আলুর পরিমাণ প্রায় ২৬.৩১ $\times$ ১০^{৯} পাউণ্ড, যা প্রায় ৫.৬ $\times$ ১০^{৯} পাউণ্ড চিনির সমান।

সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর লোকের ক্যালরির চাহিদা প্রায় ৫০০ মিলিয়ন একর জমিতে আলুর চাষ করেই মেটানো যেতে পারে। সমীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর প্রায় ২১ বিলিয়ন একর জমি উর্বর। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীর সামগ্রিক খাদ্যমূল্য মেটানো সম্ভব প্রায় ২.৫% চাষযোগ্য জমিতে শুধু আলু উৎপাদন করে। এরচেয়েও কম জমির দরকার হবে যদি শর্করা উৎপাদনকারী অত্যুৎকৃষ্ট সঙ্কর আখ আলুর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কিন্তু উপরিউক্ত যুক্তি কার্যকরী নয়, কারণ মানুষ শুধু উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কার্বোহাইড্রেট অর্থাৎ আলুর শ্বেতসার খেয়ে থাকতে পারে না।

কোষের বৃদ্ধি, অল্পবয়স্কদের পুষ্টিসাধন এবং প্রাপ্তবয়স্কদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে প্রোটিনের প্রয়োজন। ধরা হয়েছে যে, ৬৫ গ্র্যাম প্রোটিন প্রতিটি লোকের দরকার। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যার প্রোটিনের চাহিদা হচ্ছে প্রায় ৮৯৪ × ১০⁹ পাউণ্ড। মানবজাতির ক্যালরির চাহিদা ৫০০ মিলিয়ন একর জমির আলুর সাহায্যে মেটানো সম্ভব, কিন্তু এই আলুতে যত প্রোটিন থাকে, তার সাহায্যে মাত্র ৩১% লোকের প্রোটিনের চাহিদা মেটানো যায়। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক প্রোটিনের চাহিদা যদি আলু দিয়ে মেটানো হয়, তবে প্রায় ১৫ বিলিয়ন একর (কর্ষণযোগ্য ভূমির ৭৫%) জমিতে এই শস্য এক বছরে উৎপাদন করতে হবে। শুধু তাই নয়, এছাড়া আরও কতকগুলি অসুবিধার মধ্যে প্রধান যেটি, সেটি হলো সর্বনিম্ন প্রোটিনের চাহিদা মেটাবার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৭ থেকে ৮ পাউণ্ড আলু প্রত্যহ খেতে হবে এবং তার জন্যে ভোজনবিলাসীদের উপর বেশ কিছুটা অত্যাচার হওয়াই সম্ভব। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যকে যদি ক্যালরির চাহিদা হিসাবে বিচার করা হয়, তবে তা মেটানো সম্ভব, যদি অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে কোন দৈনিক খাদ্যবস্তুর সঙ্গে আলু, চিনি প্রভৃতি একটু বেশী করে খাওয়া যায়। ক্যালরির চাহিদা মেটানো সম্ভব, কিন্তু তাতে তো প্রোটিনের চাহিদা মিটবে না এবং এই প্রোটিনের অভাব যদিও বা এই বংশে কোন ক্ষতি নাও করে, কিন্তু তার পরবর্তী বংশে এর কুফল দেখা যাবেই। এর ফলে মানুষের দুর্বলতা, অক্ষমতা, চিন্তাশক্তি হ্রাস এবং দৈহিক উচ্চতা হ্রাস প্রাপ্ত হবে। ভারতবর্ষে এই সমস্ত কুফল বর্তমানে খুবই প্রকট। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্যকে যদি প্রোটিনের পরিমাণ দিয়ে বিচার করা হয়, তবেই দেখা যাবে যে, পৃথিবীতে বর্তমানে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং ভারতবর্ষে তা প্রায় বহু বছর আগেই আরম্ভ হয়েছে। অতএব প্রোটিনের অভাব মেটানো যায় কেমন করে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করাই হলো এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মানুষকে তার প্রোটিনের অভাব মেটাবার জন্যে এমন কোন খাদ্যবস্তুর উপর নির্ভর করতে হবে, যাতে প্রোটিনের একত্রিত সমাবেশ খুব বেশী পরিমাণে বিদ্যমান এবং সে তা দুই প্রকার খাদ্য থেকে গ্রহণ করতে পারে। একটা হলো উদ্ভিজ্জ খাদ্য এবং আরেকটা হলো প্রাণিজ খাদ্য। ধরা যাক, মানুষ কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকেই তার প্রোটিনের অভাব মেটাতে চায়; সুতরাং তাকে তা কোন শস্য থেকে আহরণ করতে হবে এবং এর মধ্যে যার কথা প্রথমেই মনে হবে, সেটা হলো সয়াবীন, যাতে ৩৩%-৩৫% প্রোটিন থাকে। অতএব আলুকে অব্যাহতি দিয়ে অধিক প্রোটিনসম্পন্ন সয়াবীনের চাষ করা অনেক কার্যকরী হয়ে দাঁড়াবে। এর চেয়েও বেশী পরিমাণ প্রোটিন প্রতি একরে তৈরি করা সম্ভব, যদি খুব উন্নত ধরণের সঙ্কর আখের চাষ করা হয়। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রেই প্রোটিনের পরিমাণ এত অল্প যে, প্রত্যেক

লোককে প্রায় অসম্ভব পরিমাণ (প্রত্যহ ৩২ পাউণ্ড টাট্‌কা আখ) খেতে হবে। সুতরাং মানুষকে তার প্রোটিনের চাহিদা মেটাবার জন্যে এর চেয়ে আরও উন্নত ধরণের প্রোটিনের উৎসের অন্বেষণ করতে হবে। আর এই জন্যেই পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা মাংসকেই তাদের উপযুক্ত প্রোটিন খাদ্যের উৎস বলে ধরে নিয়েছে। তারা অবশ্য খাদ্যশস্যের মধ্যে গমকে প্রাধান্য দিয়েছে—শুধু গমের পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন হবার জন্যে, তার গন্ধ বা স্বাদের জন্যে নয়। কারণ খাদ্যশস্যের মধ্যে গমে সবচেয়ে বেশী প্রোটিন থাকে।

যেহেতু পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের পছন্দসই প্রোটিন হলো মাংস, সুতরাং এথেকে এটা মনে করা যেতে পারে যে, যেহেতু জনসংখ্যা বাড়ছে, সেহেতু মাংসের উৎপাদনও বাড়াতে হবে। যদি এটা লোকসংখ্যার হারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাড়তে সক্ষম না হয়, (সমীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, মাংস উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে কমে গেছে) তবে মানবজাতির প্রোটিনের সমস্যা মেটানো তখনই সম্ভব, যখন মানুষ তার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে, অর্থাৎ যদি সে শুধুমাত্র প্রাণীকেই তার প্রধান প্রোটিনের উৎস হিসাবে গ্রহণ না করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করে। কিন্তু কোন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি না হলে এটা অনেকের পক্ষেই প্রায় সম্ভব নয়। সুতরাং যদি মাংসকেই প্রাধান্য দেওয়া যায়, তবে তার উৎপাদনের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে এবং সেটা করতে হলে যার প্রয়োজন সর্বাধিক, সেটা হলো চারণভূমি। সেখান থেকে প্রাণীরা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ভক্ষণ করে তাকে প্রাণিজ প্রোটিনে রূপান্তরিত করতে পারে। এই বিরাট চারণভূমিতে প্রাণীর উপযুক্ত শস্যাদিও রোপণ করতে হবে এবং দেখা গেছে যে, এক হেক্টর জমিতে যতটা আলু বা গম উৎপন্ন হয়, তার সমান ক্যালরিবিশিষ্ট মাংস উৎপাদনের জন্যে পশুখাদ্যের চাষ করতে বহুগুণ বেশী জমির প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের প্রাণিজ প্রোটিনে রূপান্তর মাত্র ২০% ফলপ্রদ। অতএব যদি বর্তমান কালের মত মানুষের জন্মের হার বাড়তে থাকে, তবে অবশ্যই তাকে খাদ্যাভ্যাস পাল্টাতে হবে অর্থাৎ তার খাদ্যের প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের সাহায্যে বৃদ্ধি করতে হবে।

সুতরাং এই আশু সমস্যা সমাধানের জন্যে কতকগুলি কার্যসূচীর অবতারণা করা যেতে পারে :

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সীমিত করা ;

(২) কর্ষণযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা ;

(৩) গড় ফলন বৃদ্ধি করা ;

(৪) গতানুগতিক চাষের বিকল্প চাষের ব্যবহার অর্থাৎ অ্যাল্‌গি জাতীয় উদ্ভিদের চাষ করা ;

(৫) বিকল্প প্রোটিনের উৎস অনুসন্ধান করা।

প্রথম কথা হলো সংখ্যাবৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলতে হবে। এই ব্যাপারে অনেক যুক্তি-তর্কের অবতারণা হবে এবং এই সম্বন্ধে বলবারও কিছু নেই। সরকারীভাবে যদি এই সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করা হয়, তবে তা কতদূর কার্যকরী হবে, তাতেও সন্দেহ আছে। কারণ এতে নৈতিক এবং ধর্মীয় আলোড়ন হবার সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয় কথা হলো, কর্ষণযোগ্য ভূমি বাড়ানো। কিন্তু এটাও সম্ভব নয় ; কারণ জমির পরিমাণ যা আছে, তা বাড়ানো বাতুলতার নামান্তর। তবে যে সব জমি বহুদিন যাবৎ অব্যবহার্য হয়ে পড়ে আছে, তাকে নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে

আবাদী জমিতে পরিণত করা ও জলসেচের দ্বারা উর্বর করা যেতে পারে এবং সেটাও যে খুব সহজসাধ্য, তা মনে হয় না।

তৃতীয় যুক্তি হলো, মোটামুটি শস্যের উৎপাদন বাড়ানো, যাতে সমানুপাতিকভাবে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের পরিমাণ প্রতি একরে বাড়ানো সম্ভব, কিন্তু তাতে যে প্রোটিন পাওয়া যাবে, তা হবে খুব নিম্নস্তরের। কারণ এটা ধ্রুব সত্য যে, কম পরিমাণ জায়গায় বেশী গাছ রোপণ করলে গাছের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রাত্যহিক প্রোটিনের দাবী মেটাবার জন্যে এই নিম্নস্তরের প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে খেতে হবে এবং সে ক্ষেত্রে হজম করবার ক্ষমতার কথাও বিবেচনা করে দেখতে হবে। উৎকৃষ্ট ধরণের বীজ ব্যবহার করেও ফসলের উৎপাদন শতকরা ১০-১৫ ভাগের বেশী বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থাও খুব কার্যকরী হবে না।

বর্তমান শতাব্দীর অনেকেই (বিশেষ করে জাপানীরা) মনে করছেন যে, খাদ্যসঙ্কট মেটানো সম্ভব, যদি প্রচুর পরিমাণ সবুজ অ্যালগির চাষ করা হয়। এই সমস্ত উদ্ভিদ জলাশয়ে, ক্ষুদ্র পাত্রে এবং যে সব জায়গায় চাষের কোন প্রশ্নই ওঠে না, যেমন—পর্বতের উপরে, প্রস্তরময় সমতলভূমিতে এবং মরুভূমিতেও জন্মানো যেতে পারে। এরা আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে প্রথমে কার্বোহাইড্রেট তৈরি করে এবং পরে এই কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং যদি প্রচুর পরিমাণে এগুলির চাষ করতে হয়, তবে যথেষ্ট কার্বন ডাইঅক্সাইড লাগবে, কিন্তু এই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সুতরাং কেবলমাত্র এই অ্যালগির উৎপাদন খাদ্যসমস্যা সমাধানে সক্ষম নয়।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রোটিনের উৎপাদন সবচেয়ে কম এবং চর্বি ও কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। সুতরাং যদি এই পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেটকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করা যায়, তবেই প্রোটিনের সমস্যার সমাধান সম্ভব। যেহেতু প্রাণীরা এই রূপান্তরণে সক্ষম নয়, সেহেতু অন্য কোন জীবের অনুসন্ধান করতে হবে, যারা এই কার্বোহাইড্রেট, অজৈব নাইট্রোজেন ও কিছু লবণ থেকে প্রোটিনের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরি করতে সক্ষম। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যে প্রয়োজনীয় (Essential) অ্যামিনো অ্যাসিড হবে, তা বলাই বাহুল্য।

এই ব্যাপারে জীবাণুর ভূমিকা অগ্রগণ্য। যদি তা নাও করা সম্ভব হয়, তবে জীবাণুর পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি খনিজ তৈল থেকেও ঈষ্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বর্তমানে ফলপ্রসূ হয়েছে। সুতরাং এই ঈষ্ট এবং অন্যান্য জীবাণু যদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে শুকিয়ে গুঁড়া করে চাল, ডাল ও গমের সঙ্গে মিশিয়ে প্রকারান্তরে খেতে বাধ্য করা যায়, তবে সমস্যার অনেকটা সুরাহা হয়। তা না হলে এই সব জীবাণু গৃহপালিত পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তাতে চারণভূমির সমস্যা এবং উৎকৃষ্ট জাতের পশুর সমস্যা মিটবে। এক একর জমিতে উৎপন্ন শস্য গবাদি পশুকে খাওয়ালে এবং ঐ শস্য থেকে উৎপন্ন কার্বোহাইড্রেট জীবাণুকে খাওয়ালে কি পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া সম্ভব, তা নিয়ে দেখানো হলো:

এক একর জমিতে উৎপন্ন শস্য

৬৩৬০ পাউণ্ড

↓ ২৬১ পাউণ্ড প্রোটিন থাকে

↓ ২০১৬ পাউণ্ড শ্বেতসার বর্তমান ↓ ২৩৩৭ পাউণ্ড গ্লুকোজের সমপরিমাণ ↓ জীবাণুর সাহায্যে রূপান্তরীকরণ ↓ ১১৮.৫ পাউণ্ড জীবাণু-কোষ ↓ ২১৯ পাউণ্ড প্রোটিন থাকে

↓ গবাদি পশুকে খাওয়ানো হলো ↓ ১২.২৭ পাউণ্ড প্রাণিজ প্রোটিন তৈরি হবে।

↓ + ←

৫৪০ পাউণ্ড প্রোটিনের সমান ←—এইটি না ঐটি ?
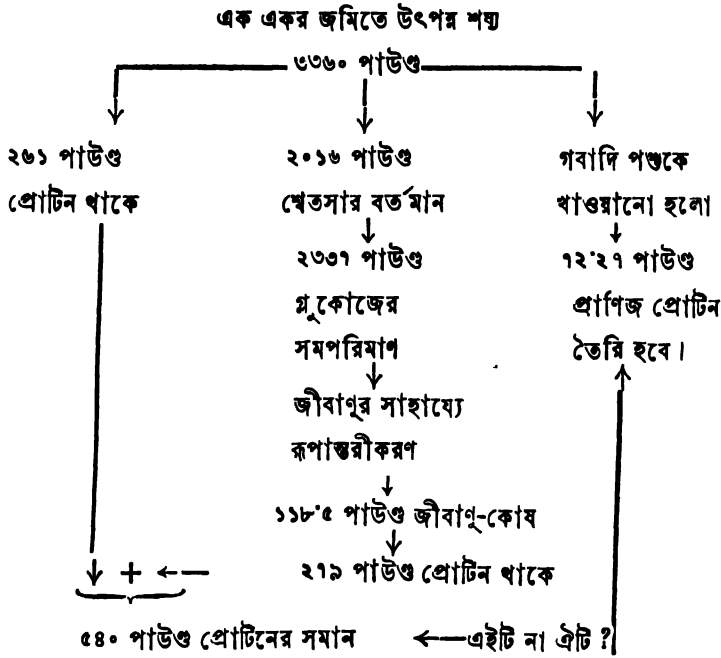
উপরিউক্ত বক্তব্যগুলি ভারতবর্ষে কতদূর প্রযোজ্য এবং কিভাবে প্রযোজ্য, তা আলোচনা করা যাক। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে কৃষিতে নিয়োজিত আছে ৩২ কোটি ৮০ লক্ষ একর জমি। এর মধ্যে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ একর বছরে একাধিকবার চাষ হয়। কৃষি-ব্যবস্থা বহুলাংশে বৃষ্টিপাতের উপরই একমাত্র (৭৫% জমি) নির্ভরশীল। সুতরাং অনাবৃষ্টি এবং অল্প-বৃষ্টি হলে কৃষি-ব্যবস্থা এক চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। এই জন্যে দরকার সুষ্ঠু সেচ-ব্যবস্থা। বাঁধ তৈরি করা এবং নলকূপ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা এখানে আছে, কিন্তু এই ব্যবস্থাও বর্তমান যুগপোযোগী নয়। যে সব জায়গায় ২০০ মাইলের মধ্যে কোন নদী আছে, সেখানে যদি পাইপ লাইন বসিয়ে সরাসরি নদী থেকে জমিতে জমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়, তবেই অনেক উপকার হবে। আমেরিকায় এইভাবে পাইপ লাইন বসিয়ে নদী থেকে জল সংগ্রহ করে প্রায় ৪০০ মাইল জায়গায় জল সরবরাহের সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশেও এটা করা সম্ভব কিনা, তা সরকার এবং বিশেষজ্ঞগণ চিন্তা করে দেখতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত গড় ফলন বৃদ্ধি করবার দিকে এবং এর জন্যে দরকার উন্নত ধরণের বীজের ব্যবহার। ভারতের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে নির্বাচন ও প্রজননের দ্বারা এরূপ বীজ সৃষ্টি করতে হবে এবং যতদিন তা করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্যন্ত বিদেশ থেকে ভাল বীজ আমদানী করা উচিত।

এখানকার বেশীর ভাগ লোকই গরীব এবং মাছ ও মাংস উৎপাদনের পরিমাণ খুবই কম।

সুতরাং এখানকার অধিবাসীর এক বিরাট অংশ এই প্রাণিজ প্রোটিন খাদ্য থেকে বঞ্চিত। তাই এদের খাদ্য তালিকায় প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম থাকায় প্রোটিন ঘাটতিজনিত নানারকম উপসর্গ দেখা দেওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। শুধু কি তাই? এখানে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন রকম খাদ্য-তালিকা। কোন জাতি বা সম্প্রদায় শুধুই নিরামিষাশী, আমিষজাতীয় খাদ্য তাদের অস্পৃশ্য। আবার আমিষভোজীদের মধ্যে মাছই যাদের প্রধান লক্ষ্য (বাঙ্গালীরা), তারাও সাধারণতঃ সামুদ্রিক মাছ পছন্দ করে না। এই যে বাছ-বিচার এটা যে রসনার তৃপ্তির জন্যে, তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রোটিনের সমস্যা সমাধান যে একটা জটিল সমস্যা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

যারা শুধু নিরামিষাশী, তাদের প্রোটিনের উৎস সাধারণতঃ দুধ, ডাল, গম, চাল ও শাকসব্জি। দুধ এখানে যে পরিমাণে পাওয়া যায়, তাতে প্রাত্যহিক প্রোটিনের চাহিদার কিছুটা মেটানো যায় মাত্র। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরই অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল না থাকায় ঐ পরিমাণ দুধ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। তাই দুধের পরিমাণ বাড়াতে হলে গবাদি পশুর উপর নজর দিতে হবে। ভারতবর্ষে এই সমস্ত প্রাণীর স্বাস্থ্য ও জাত উৎকৃষ্ট নয়। এদের খাদ্য বলতে আমরা শুধু ঘাস, খড় ও খইল ইত্যাদি পদার্থই বুঝি। কিন্তু এই সব জিনিষেরও দুষ্প্রাপ্যতাহেতু এদের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এদের যদি ঈষ্ট, অ্যাল্‌গি প্রভৃতি শুকিয়ে গুঁড়া করে খেতে দেওয়া হয়, তবে এদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে এবং দুধের পরিমাণও বাড়বে। যে সমস্ত কারখানায় অ্যালকোহল তৈরি হয়, সেখান থেকে ঈষ্ট সংগ্রহ করা বোধহয় খুব অসুবিধা হবে না। যতদিন পর্যন্ত এই গোজাতীয় প্রাণীর খাদ্যের সুরাহা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এদেশের দুগ্ধ-সমস্যার সুরাহা হবে না। সুতরাং নিরামিষাশীদের প্রোটিন বাকী খাদ্য থেকেই গ্রহণ করতে হবে। তাই এদের প্রোটিনের সমস্যা মেটাতে গেলে প্রথমেই স্বাদের কথা ভুলতে হবে। ডালে প্রোটিনের উৎস অ্যামিনো অ্যাসিড কিছুটা আছে, তাই ডালটা বেশী খাওয়া ভাল এবং সয়াবীনের ডাল খাওয়া অবশ্যই উচিত। চাল যতই পাওয়া যাক না কেন, ভাত দুবেলা খাওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। একবেলা ভাত এবং একবেলা গম খাওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত—কেন না, গমে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে। আর ভাত খেতে হবে ফেন না গড়িয়েই। কারণ এতে প্রোটিন ও ভিটামিনের অপচয়ের হাত এড়ানো সম্ভব। সুতরাং এইভাবে নিরামিষ-ভোজীদের প্রোটিনের চাহিদা কিছুটা মেটানো সম্ভব।

আমিষভোজীদের প্রধান খাদ্য হলো মাছ ও মাংস। সকল প্রাণীর মাংস আবার সকলেই খায় না। ভারতবাসীদের খাদ্যতালিকা নির্দিষ্ট হয়েছে ধর্মীয় মনোভাব ও স্বাদের উপর ভিত্তি করেই। তাই এদেশে মাংস বলতে ছাগ ও কুক্কুট মাংসই বোঝায়। সুতরাং এই দুই প্রকার জীবের সাহায্যে মাংসের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। পুকুরে বা নদীতে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়, তাতেও মাছের চাহিদা মেটে না। অতএব সামুদ্রিক মাছের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। ভারত মহাসাগরে যা মাছ আছে, তাতে আমাদের প্রোটিনের সমস্যা আগামী এক শত বছরের জন্যে মেটানো সম্ভব। কিন্তু এই মাছ ধরবার জন্যে সরকারের সচেষ্ট হতে হবে। বাজারে যদি সামুদ্রিক মাছের চালান বাড়ানো যায়, তবে অনেকেই কম পয়সায় মাছ খাওয়ার (যে কোন জাতীয় মাছ হউক না কেন) প্রলোভন ছাড়তে পারবে না এবং আশা করা যায়, এই ভাবেই আস্তে আস্তে সামুদ্রিক মাছের প্রচলন চালু হতে পারে।

অতএব ভারতের প্রোটিন-সমস্যা পর্যালোচনা করে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করাই একমাত্র সমাধান বলে বিবেচনা করা যেতে পারে :—

১। একবেলা ভাত (ফেন না গড়িয়েই) এবং একবেলা রুটি খেতে হবে;

২। সয়াবীনের ডাল খাওয়া প্রচলন করতে হবে;

৩। শিশুখাদ্য হিসাবে তণ্ডুলজাতীয় মূল খাদ্যের সঙ্গে চীনাবাদাম বা ছোলা, সয়াবীন, গুঁড়া দুধ অথবা মাছের নির্যাস মিশিয়ে খুব উন্নত ধরণের প্রোটিন খাদ্য প্রস্তুত করবার ব্যাপারে মনোনিবেশ করা যেতে পারে;

৪। পাউরুটি, আটা ও ডাল প্রভৃতি খাদ্যের সঙ্গে ঈষ্ট মিশিয়ে এদের পুষ্টিকারিতা আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৫। খাদ্যের বাজারে সামুদ্রিক টাট্‌কা মাছের বহুল প্রচলন না হলে এই মাছ শুকিয়ে গুঁড়া করে অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে;

৬। মাছ, কয়েক প্রকার ডাল, চীনাবাদাম বা ছোলা, সয়াবীন প্রভৃতি খাদ্যের প্রোটিন নিয়ে এক প্রকার প্রোটিন নির্যাস তৈরি করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

এই সব কিছুই করা সম্ভব; কিন্তু তার জন্যে চাই সরকারের সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতা এবং গবেষকদের ঐকান্তিক ধৈর্য, চেষ্টা ও পরিশ্রম।

সঞ্চয়ন

পরমায়ু বাড়াবার উপায়

অনেকের ধারণা, বার্ধক্যই মানুষকে একেবারে অশক্ত ও অক্ষম করে দেয়—বার্ধক্যের এই হলো অনিবার্য পরিণতি। কিন্তু এযুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, জরা-গ্রস্ত অবস্থা প্রতিরোধ করা যায়, এটা বয়স বৃদ্ধির অনিবার্য পরিণতি নয়। তাই আশা করা যায়, এমন দিন হয়তো আসবে, যখন বার্ধক্যে উপনীত হলেও অক্ষমতার চিহ্নমাত্রও কারো মধ্যে দেখা যাবে না।

এক্ষেত্রে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতি দ্রুত-গতিতেই এগিয়ে চলেছে। কোন কোন শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে আজ যারা শিশু, তারা এবং তাদের পিতামাতাদের একটি বড় অংশ ৮০ বা ৯০ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ বর্তমানে গড়পড়তা যে পরমায়ু, তার চেয়েও দশ বছর বেশী বাঁচবার আশা করতে পারে।

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকান জেরিয়াট্রিক্স সোসাইটির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডাঃ এডোয়ার্ড বরজ বলেছেন—শতায়ু হবার আশা প্রায় সকলেই করতে পারবে, এমন দিন শীঘ্রই আসছে। তবে তিনি এই প্রসঙ্গে কেবলমাত্র শতায়ু হওয়া এবং অস্তিত্ব বজায় রাখবার উপরেই নয়, মানুষের যত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে বেঁচে থাকবার উপরেই জোর দিয়েছেন।

যে সকল চিকিৎসক বয়োবৃদ্ধিজনিত জরাগ্রস্ত অবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, তাঁদের অভিমত —রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষ গড়ে এক-শ' বছর বেঁচে থাকতে পারে, এরকম ওষুধপত্র ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে।

কিন্তু শতবর্ষ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছেন, এরকম লোক খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তার

কারণ দেখানো হয়েছে যে, শতবর্ষ পরমায়ু পেতে হলে কতকগুলি নিয়ম পালন করা বিশেষ প্রয়োজন। এজন্যে পরিমিত ও যথোপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হবে—যেমন উপযুক্ত বিশ্রাম নিতে হবে, তেমনি আবার ব্যায়ামও করতে হবে।

পরমায়ুর বৃদ্ধি সংক্রান্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞান খুব বেশী দিনের নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তবে ঐ সময়ে বৃদ্ধের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় এই বিষয়ে আগ্রহও অনেক কমে গেছে। যেমন বর্ত্তমান শতাব্দীর সুরুতে গড়পড়তা একজন আমেরিকান পঞ্চাশ বছরের বেশী বাঁচবার আশা করতে পারতেন না।

তারপর গড়পড়তা পরমায়ু ৬৫ বছর পর্যন্ত বেড়ে গেল। এটি মাত্র এক পুরুষ আগের কথা। কিন্তু যারা বৃদ্ধের পর্যায়ে এসে পা দিলেন, তাদের সংখ্যা সাধারণ চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আর যাঁরা বার্ধক্যজনিত জরাগ্রস্ত অবস্থাকে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখেন না, তাঁরা বলে থাকেন—কি আর করা যায়—লোকটির বয়স হয়েছিল, মরে গেছে। এ তো বার্ধক্যের অনিবার্য পরিণতি। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার দিনে একথা প্রযোজ্য না হলেও জনসাধারণ প্রায় এই রকমের ধারণাই পোষণ করে থাকে।

বার্ধক্যের দরুণ মৃত্যু হয়েছে, এরকম মাত্র একটি লোকের সন্ধান পাওয়ার জন্যে বহু বিজ্ঞানী বহু চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হন নি। দেহটি অতিমাত্রায় জরাজীর্ণ হয়ে গেছে, কেবলমাত্র এই কারণেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, এরকম সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মৃত্যুর সন্ধান তাঁরা পান নি। বয়সই মানুষের মৃত্যুর কারণ হয় না—মানুষ মরে রোগে ও দুর্ঘটনায়। সুতরাং ভেষজ-বিজ্ঞান রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে যত এগিয়ে যাবে, মানুষের পরমায়ু ততই বেড়ে যাবে। তবে মানুষের কতদিন পর্যন্ত বাঁচা সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর আজও মেলে নি। বহুকালের ধারণা, মানুষ ১২৫ থেকে ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে।

এত দীর্ঘকাল বাঁচবার কি কোন সার্থকতা আছে? শক্তি-সামর্থ্য হারিয়ে সঙ্গীহীন নিরানন্দ জীবনযাপন, শেষের দিনের অনিবার্য পরিণতির জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া এই সুদীর্ঘ পরমায়ুর আর কি কোন অর্থ আছে?

বর্তমানে এই বিষয়ে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিণত বয়সেও মানুষ তার শক্তি সামর্থ্য বজায় রাখতে পারে।

এই বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের ফলে জানা গেছে, স্বাস্থ্যের অবনতির কারণ হিসাবে শুধু যে বয়সকেই দায়ী করা হয়ে থাকে, তা ঠিক নয়। আসলে রোগই তার কারণ। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেহের ধমনীসমূহের শক্ত হয়ে যাবার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এতকাল সকলেই বলে এসেছে যে, বয়স হলে এটি হবেই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গেছে, দেহের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিলেই রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগ নিরাময়ের দ্বারা পরমায়ু বাড়ানো বলতে এই কথা বোঝায় না যে, মানুষের আমৃত্যু তরুণ দেহটি অটুট থাকবে—তার কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না।

কোন একটি কারণের জন্যে যদি সমগ্র দেহে জরা দেখা দেয়, তবে তার হদিস বিজ্ঞান এখনও পায় নি। বংশানুক্রম বা হেরিডিটির এই ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ সন্তান দেহের বিপাক বা মেটাবলিজম সংক্রান্ত গুণাগুণ পায় বাপমায়ের কাছ থেকে, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই বিপাককে প্রভাবিত করতে পারে। যেমন—কতকগুলি ইঁদুরকে অন্য ইঁদুরের তুলনায় একটি ঠাণ্ডা ঘরে রাখবার পর দেখা যায়—যাদের ঠাণ্ডা ঘরে রাখা হয়েছিল, তারা অল্প

ইঁদুরের তুলনায় বেশী দিন বেঁচেছে। গরম ঘরে যারা ছিল, তাদের বিপাক বা মেটাবলিজমের ক্রিয়া হ্রাস পাওয়ার ফলেই ওই রকম হয়ে থাকে।

এই ব্যাপারে সূর্যালোকের যে বিশেষ ভূমিকা আছে, তাও উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন কোন গাছগাছড়া সূর্যালোকে বেশীক্ষণ থাকলে তাড়াতাড়ি মরে যায়। কারণ এর ফলে ঐ সকল গাছের মেটাবলিজমের ক্রিয়া বেড়ে যায়। মানুষের সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য কি না, তা আজও জানা যায় নি। তবে ত্বকের উপর সূর্যালোকের প্রতিকূল ক্রিয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ত্বক তাতে শুকিয়ে যায়, বলিচিহ্নিত হয়।

মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গেই বার্ধক্য আসে না, একটু একটু করে এক-একটি অঙ্গকে বার্ধক্য আক্রমণ করে। কোথায় আক্রমণ হবে, তা নির্ভর করে প্রত্যেকের দেহের ধাতের উপর। দেহ-কোষের সঙ্গে এই ধাতের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ।

ইতিমধ্যেই বহু রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে বলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই জনগণের পরমায়ু বেড়ে গেছে। এক্ষেত্রে যখন আরও উন্নতি হবে এবং জরাগ্রস্ত অবস্থার কারণ সম্পর্কে মানুষ যখন আরও জানতে ও বুঝতে পারবে, তখন তা নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্য নিয়েই মানুষ শত বছরেরও বেশী বাঁচতে পারবে।

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ

পারমাণবিক শক্তি বা তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের ব্যাপারটি এখন আর বীক্ষণাগারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বর্তমানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতেও এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

পৃথিবীর বহু উন্নতিশীল দেশে শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ-মাংস প্রভৃতি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য বহু পরিমাণে পচে নষ্ট হয়ে যায়। এই অভিনব খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা বিশ্বের খাদ্যাভাবগ্রস্ত অঞ্চলের খাদ্যাভাব মেটাবার ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে। প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের অভাব নানা অপুষ্টিজনিত রোগের কারণ হয়ে থাকে বলে এই সকল খাদ্যবস্তুর অপচয় খুবই দুঃখজনক।

পৃথিবীর যে সকল রাষ্ট্র কারিগরী-বিজ্ঞানে খুবই উন্নত, সে সকল দেশে পারমাণবিক শক্তি বা তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে মাছ-মাংস, তরিতরকারী, ফলমূল প্রভৃতি সহজ পচনশীল দ্রব্যসমূহ বীজাণুমুক্ত করে বহুকাল ধরেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। এজন্যে নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে এই সকল খাদ্যবস্তু এখন দূর-দূরান্তরে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। এই সকল খাদ্যবস্তুর বাজার সম্প্রসারণের সম্ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছে। যেমন শেলমাছ আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে প্রেরণ করা হচ্ছে। দুই প্রান্তের মধ্যে ব্যবধান ৩০০০ মাইল।

যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন দশ বছর আগে পরীক্ষামূলকভাবে একাজে হাত দেয়। প্রধানতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাহিনীকে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাদ্য সরবরাহের সমস্যা সমাধানই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্যা সুদীর্ঘ কালের। এখন তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে স্বাদ বজায় রেখে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেবল সৈন্য বিভাগেরই নয়, অসামরিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যে সব দেশে বুভুক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে, সে সব দেশেও বিশেষ কাজে লাগবে।

যে সব বীজাণু খাদ্যবস্তু নষ্ট করে পচিয়ে দেয়, সামান্য তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রয়োগ করে তাদের নির্মূল করে দেওয়াই হচ্ছে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের

পারমাণবিক পদ্ধতি। রেডিও-আইসোটোপ বা ইলেকট্রন অ্যাকসিলারেটর এই তেজস্ক্রিয় শক্তি জুগিয়ে থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যবস্তু তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে না এবং যিনি ঐ সব খাদ্যবস্তু গ্রহণ করেন, তারও তেজস্ক্রিয় শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হবার কোন আশঙ্কা থাকে না। খাদ্যবস্তু যে সব বীজাণুর জন্যে পচে যায়, সেই সব বীজাণু নাশের জন্যে যথেষ্ট তেজস্ক্রিয় শক্তিপ্রয়োগ করতে হয়। তাহলেও এমন পরিমাণ তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রয়োগ করা হয় না, যার ফলে খাদ্যবস্তুর স্বাদ নষ্ট হতে পারে অথবা তাদের আকৃতি-প্রকৃতি বদ্‌লে যেতে পারে অথবা ওসব খাদ্য গ্রহণকারীদের কোন রকম ক্ষতি হতে পারে।

তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে মাছের পচনশীলতা নিবারণ করবার পরীক্ষা এতকাল গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৬৬ সাল থেকে এই পদ্ধতি ব্যবসায়ীরাও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করছেন এবং ক্রমেই এই পদ্ধতি প্রসার লাভ করছে। ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যের গ্লুচেষ্টার থেকে ওয়াশিংটনের সিয়াটেলের দূরত্ব ৩০০০ হাজার মাইল। গ্লুচেষ্টার থেকে বরফ দিয়ে ঢেকে হ্যাডক মাছ সিয়াটেলে পাঠানো হয়, তাতে ১১ দিন পর্যন্ত ঐ সকল মাছ ভালই থাকে। কিন্তু তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে বীজাণুমুক্ত করে বরফ দিয়ে ঢেকে পাঠালে এই মাছ ১৭ দিন পর্যন্ত টাট্‌কা থাকে।

আমেরিকার পূর্ব উপকূলের রাজ্যসমূহে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। ঐ সব রাজ্য থেকে বহু স্থানে মাছের চালান দেওয়া হয়। বর্তমানে মাছের ব্যবসায়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

তবে নানা রকমের নরম জাতীয় ফল এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ সকল ফলের উপর অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রয়োগ না করলে তাদের পচনশীলতা নিবারণ করাই ছিল কঠিন। বর্তমানে গবেষণার ফলে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই নতুন প্রক্রিয়ায় এই সব ফল কিছুক্ষণ গরম জলে রেখে এবং পূর্বে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রয়োগ করা হতো তার অর্ধেক প্রয়োগ করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে। ঐ প্রক্রিয়ায় এদের পচন নিবারণ তো হয়ই এবং প্রকৃতি ও স্বাদ সম্পূর্ণ বজায় থাকে। চেরীফল সংরক্ষণ ব্যাপারেও এই প্রক্রিয়া প্রযোজ্য।

আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। হনলুলুর হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে গবেষণার ফলে যে নতুন প্রক্রিয়াদি উদ্ভাবিত হয়েছে, তাতে সদ্যতোলা পেঁপে পূর্বের তুলনায় আরও চার-পাচ দিন বেশী সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে এখন এর বাজার জাপান এবং অন্যান্য অঞ্চলে সম্প্রসারিত হতে পারবে।

গেনসভিলের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়েও আম সংরক্ষণ সম্পর্কে গবেষণার ফলে তেজস্ক্রিয় শক্তি প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে। সহজেই পচে যায় বলে বিদেশে এই ফল রপ্তানী করবার বিষয়টি ছিল একটি বড় রকমের সমস্যা।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও ভাসা ও একেবারে পাকা টোমাটো নিয়ে গবেষণা চালানো হয়। দু-বছরের গবেষণার ফলে এই ফল সংরক্ষণের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে আট থেকে পনেরো দিন পর্যন্ত পাকা টোমাটো টাট্‌কা থাকবে—স্বাদের কোন তারতম্য হবে না। এই পদ্ধতি উদ্ভাবিত হবার আগে শক্ত ও কাঁচা টোমাটো বাগান থেকে তুলে নিয়ে বাইরে চালান দেওয়া হতো এবং গুদামে থেকে ঐ টোমাটো-গুলি পাকতো। ঐ সকল টোমাটো ভাল জাতের হতো না—স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতো। সম্প্রতি তেজস্ক্রিয় শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও

অনেক উন্নতি হয়েছে—নতুন ধরণের বারোটি যন্ত্র নির্মিত হয়েছে অথবা তাদের নির্মাণ-কার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এর মধ্যে তিনটি অতি ছোট ধরণের, যেখানে সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। মাছ যেখানে ধরা হবে, সেখানেই জাহাজ বা নৌকার উপর বসিয়ে ঐ সকল যন্ত্রকে কাজে লাগানো যাবে।

নৌকায় ও জাহাজে যে সকল তেজস্ক্রিয় শক্তি-উৎপাদনকারী যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাদের ক্ষমতা জমিতে প্রতিষ্ঠিত কারখানায় তুলনায় অনেক কম।

সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্যে তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে শোধিত সামান্য পরিমাণে খাদ্যবস্তু সরবরাহ সম্পর্কে পরীক্ষা অনেক দিন থেকেই চলছে। ১৯৬৬ সালেই প্রথম ঐ বাহিনীর জন্যে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে শোধিত খাদ্য সরবরাহ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এখন পর্যন্ত মানুষের জন্যে তেজস্ক্রিয় শক্তির সাহায্যে শোধিত খাদ্যবস্তুর মাত্র কয়েকটিই অনুমোদন করেছেন। আশা করা যাচ্ছে কড, হ্যাডক, পার্চ প্রভৃতি মাছ সম্পর্কেও তাঁরা শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ষ্ট্রবেরী নামে সরস ফল সম্পর্কে তাঁদের মতামত অনতিবিলম্বেই জানাবেন। এই পদ্ধতিতে ফলগুলি প্রায় দু-সপ্তাহ টাট্‌কা থাকে।

ভাইরাস

রোগ-বীজাণুর মধ্যে ভাইরাস হলো ক্ষুদ্রতম এবং সবচেয়ে মারাত্মক। এদের নির্মূল করাও খুব কঠিন। কারণ ওষুধপত্রের ক্রিয়াও ভাইরাস প্রতিরোধ করে থাকে। ভাইরাস থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে একমাত্র প্রতিষেধক ব্যবস্থা টিকার আশ্রয় নওয়া ছাড়া অন্য পথ নেই। তবে সব রকম ভাইরাসের ক্ষেত্রেই যে টিকা প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে তা নয়, টিকা দিলে ভাইরাসবাহিত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হলেও সেই রোগ তেমন মারাত্মক হয় না।

ভাইরাসবাহিত রোগের সঙ্গে লড়াই করা দু-দিক থেকে কঠিন। প্রথমতঃ ভাইরাস সম্পূর্ণ জীবন্ত নয়। ভাইরাসকে একটি অতি ক্ষুদ্র সেল বা কোষের মত মনে হলেও সাধারণ জীবের মত এরা খেতেও পারে না বা শ্বাস নিতেও পারে না। জীবদেহে যে সব রাসায়নিক রূপান্তর ঘটে, তাও ভাইরাসের দেহে ঘটে না।

সুতরাং স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠবে—পেনিসিলিন দিয়ে যেভাবে জীবাণুর মৃত্যু ঘটানো হয়, সেভাবে ওষুধের সাহায্যে ভাইরাসেরও কি মৃত্যু ঘটানো যায়? এর উত্তর হলো—যায় না, অন্ততঃ এখন পর্যন্তও নয়।

ভাইরাস রোগপ্রবণ কোষে ক্রিয়াশীল হয় এবং ঐ কোষটিই হয়ে থাকে ভাইরাস আক্রমণের অনুকূল ক্ষেত্র। তবে যে কোষটি ভাইরাস কর্তৃক সংক্রামিত হয়, তার মধ্যে তার অস্তিত্বই শুধু বজায় থাকে না, সে এই কোষটির অঙ্গীভূত হয়ে যায়—কোষের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এ হলো প্রথম সমস্যা।

দ্বিতীয় সমস্যা হলো—এর পৃথক সত্ত্বা থাকে না বলে ভাইরাসকে ধ্বংস করতে হলে সেল বা কোষটিকে ধ্বংস করতে হয়। সুতরাং কোন ওষুধ যদি সংক্রামিত কোষগুলিকে ধ্বংস করে, তাহলে সেই ওষুধটি যে সব কোষে সংক্রামিত হয় নি, তাদেরও ধ্বংস করবে।

ভাইরাস যদি জীবন্ত কিছু না হয় তবে সেগুলি কি? কি তার স্বরূপ?

কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের কেলাসিত হওয়া একটি বিশেষ গুণ। কোন কোন ভাইরাসও কোন কোন সময়ে কেলাসিত হয়ে থাকে। ভাইরাস নানা আকৃতিরই হয়ে থাকে। অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসের আকৃতি হলো একটি জীবাণুর দশ হাজার ভাগের একভাগ। আর এদের মধ্যে যে সব ভাইরাসের আকৃতি বৃহৎ, তারা প্রায় এক-একটি জৈব অণুর সমান হয়ে থাকে। তাহলেও ভাইরাস কেবলমাত্র অণু নয়, জীবন্ত প্রাণীর আচরণের সঙ্গে এদের আচরণের কিছুটা সাদৃশ্যও দেখা যায়।

তবে যদি কেউ প্রশ্ন করেন—তাহলে ভাইরাস কি বস্তু? তার উত্তরে বলতে হয়—ভাইরাস ভাইরাসই। এর অর্থ, অন্য কথা দিয়ে এর স্বরূপ বোঝানো যেতে পারে না। এর বাস এক ভিন্ন জগতে—প্রাণী-জগৎ ও নিষ্প্রাণ জগতের মাঝখানে—জীবধর্মীও বটে আবার অজীবধর্মীও বটে।

নিউক্লিক অ্যাসিডে তৈরি কতকগুলি জিন দিয়ে ভাইরাসের দেহ গঠিত। এর উপরে আছে প্রোটিনের আচ্ছাদন। এটি তার আত্মরক্ষার আবরণ।

গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গেছে, এর আবরণটি সরিয়ে নিলেও রোগ সংক্রমণের শক্তি নষ্ট হয় না। সুতরাং যে সকল ভাইরাসের আবরণ খসে গেছে, তারা যদি ঠিকমত অর্থাৎ তাদের উপযোগী প্রোটিন পেয়ে যায়, তবে সেই প্রোটিনের আবরণ তারা পুনরায় গ্রহণ করতে পারে। এরা পরাশ্রয়ী ও পরভুক। কিন্তু ঠিক ঠিক আশ্রয়টি খুঁজে পাওয়াই তাদের পক্ষে কঠিন। কারণ যাদের দেহের বিষ বা টক্সিন নষ্ট করার ক্ষমতা নেই অর্থাৎ যাদের মধ্যে কোন অ্যান্টিবডি নেই, সংক্রমণ করবার উপযুক্ত এরকমের কোষ তাদের খুঁজতে হয়। প্রোটিনের বর্ম পরিহিত থাকবার দরুণ এই অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস বেশ কিছু সময় সংক্রমণযোগ্য কোষের খোঁজে ভেসে ভেসে বেড়াতে পারে।

সংক্রমণযোগ্য কোন কোষের সন্ধান পাওয়া মাত্র ভাইরাস ঐ কোষের বাইরের আবরণের সঙ্গে লেগে যায় অথবা ঐ কোষটিই তাকে আত্মসাৎ করে নেয়। তারপর আর ভাইরাসকে দেখা যায় না। কোন কোন সময়ে তার প্রোটিনের আবরণটি বাইরে পড়ে থাকে, কোন সময়ে বা তাও থাকে না।

কিন্তু কিছু কাল পরেই বোঝা যায় যে, ঐ কোষটি ভাইরাসকে বন্দী করে নি বরং ভাইরাসই কোষকে বন্দী করছে এবং আত্মসাৎ করছে। ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে কোষের স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায় এবং সে প্রোটিনের আবরণসহ ভাইরাস তৈরি করতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে কোষটিতে সংখ্যায় এত বেশী ভাইরাস তৈরি হয় যে, পরিশেষে কোষটি ফেটে পড়ে এবং তাথেকে পরিণত ভাইরাস-সমূহ বেরিয়ে আসে। ঐ সব অন্যান্য কোষকে সংক্রামিত করে। ভাইরাসের এই পর্যায়টি সম্পন্ন হতে আধ ঘন্টার বেশী সময় লাগে না।

এই আধঘন্টা সময়ের মধ্যে যে কি কি ঘটে, তার পূর্ণ বিবরণ এখনও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় নি। মনে হয়—ভাইরাস কোষটিকে আত্মসাৎ করবার সময় ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড কোষটির নিউক্লিক অ্যাসিডের সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। একই রকমের জিনিষের সঙ্গে এই মিলনের ফলে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে; অর্থাৎ কোষটিতে জিন-এর সংখ্যা বেড়ে যায়।

ভাইরাসের এই দান কোষটি কেন গ্রহণ করে? কেনই বা জিনগুলিকে গ্রহণ করে? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আজও পাওয়া যায় নি। হয়তো বা ভাইরাসের এই দানকে কোষটির প্রত্যাখ্যান করবার ক্ষমতা নেই।

জিন জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার।

জীবকোষের কেন্দ্রীনের মধ্যে থাকে ক্রোমোসোম। বিভিন্ন জাতীয় জীবের দেহকোষে বিভিন্ন নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম রয়েছে। এই ক্রোমোসোমের সংখ্যা ও গঠনের তারতম্যেই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীর পার্থক্য ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। আবার অতি সূক্ষ্ম দানার মত কতকগুলি জিন মিলে এক-একটি সূত্রাকার ক্রোমোসোম গঠিত হয়। এর প্রত্যেকটি জিনে দেহ ও মনের এক-একটি বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। এই রকম বিভিন্ন জিনের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য মিলিত হয়ে সমষ্টিগতভাবে এক-এক জীবের এক-এক রকম আকৃতি-প্রকৃতি গঠিত হয়ে থাকে।

তবে জিন পৈতৃক সূত্রে অথবা ভাইরাস থেকে যে ভাবেই পাওয়া যাক না কেন, ঐ সব জিন যখন ভাইরাস তৈরির আদেশ দেয়, তখন কোষকে তাও মেনে নিতে হয়। তার নিজের প্রোটোপ্লাজম দিয়েই ভাইরাস তৈরি করতে হয়—এটি হয় তার পক্ষে আত্মহত্যার সামিল।

তবে এই ব্যাপারে একটা সান্ত্বনাও আছে। যথেষ্ট পরিমাণে ভাইরাস তৈরির সঙ্গে সঙ্গে দেহে অ্যাণ্টিবডিও তৈরি হয়। সব কিছু ঠিকমত চললে এই অ্যাণ্টিবডি আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেয়। তবে সৌভাগ্যের কথা এই যে, মানবদেহের গাঁথুনী খুবই মজবুত। অসংখ্য সংক্রামক বীজাণু ও ভাইরাস প্রতিদিন প্রতিটি লোককে আক্রমণ করছে বটে, তবু সে তুলনায় রোগীর সংখ্যা খুবই কম।

রোগ-জীবাণুর কবল থেকে একেবারে পালিয়ে যাবার পথ নেই। কারণ মানুষের পক্ষে একেবারে বীজাণু ও ভাইরাসমুক্ত স্থানে বাস করে সুদীর্ঘ পরমায়ু লাভ করা অসম্ভব। তবে এই ক্ষুদ্র জীবাণুর জগৎ সম্পর্কে সে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে। এই জ্ঞানই হয়তো মানুষকে তার পরমায়ু বাড়াবার পথের সন্ধান দিবে এবং রোগ একেবারে নির্মূল করবার উপায়ও উদ্ভাবিত হবে।

শিক্ষা ও আচরণের উপর অপুষ্টির প্রতিক্রিয়া

দেহের বৃদ্ধি, প্রজননশক্তি এবং কর্মক্ষমতার উপর অপুষ্টি ও খাদ্যাভাবের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব নিয়ে গত এক-শ' বছর ধরে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। তাহলেও দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পক্ষে যেমন, স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষেও তেমনি যে অপুষ্টি এবং খাদ্যাভাব বিশেষ ক্ষতিকারক হয়ে থাকে, মাত্র দশ বছর হয় তা স্বীকৃত হয়েছে।

পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে বেশীর ভাগ ছেলেমেয়েই উপযুক্ত খাদ্য পায় না। ফলে তাদের দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। অপুষ্টির ফলে তাদের জানবার ও শেখবার ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হলে পৃথিবীর শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতার ব্যবধান বেড়ে চলবে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রতি ২৪ ঘণ্টায় গড়ে ১৮০০০০ হারে বেড়ে চলেছে—খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ সেই হারে বাড়ছে না। ফলে ১৯৬১ সালে যে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ নতুন শিশু জন্মাবে, তাদের অর্ধেকেরও বেশী প্রথম তিন বছর অপুষ্টিতে ভুগবে।

পশু এবং মানুষের মনে রাখবার ক্ষমতা আছে, এজন্যে তারা যে অবস্থায়ই পড়ুক না কেন, তার সঙ্গে তারা খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এই বিষয়টি জীববিদ্যার দিক থেকে খুবই

তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ কি করে শেখে এবং মনে রাখে—সেই প্রক্রিয়াটি জানবার জন্যে গত কয়েক বছর ধরেই বিশেষ চেষ্টা হচ্ছে।

স্মৃতিশক্তির শারীরগত ভিত্তি অর্থাৎ দেহের কোন রকম রাসায়নিক অথবা স্নায়বিক ক্রিয়ার পরিবর্তন এর পিছনে আছে কি না, সে বিষয়ে পরীক্ষা চলছে। রাসায়নিক পরিবর্তনের কোন রকম সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নি। স্মৃতিশক্তির মিকানিজম বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণার ফলে যখন আরও তথ্য সংগৃহীত হবে, তখন এই সকল তথ্য স্নায়ুতন্ত্র বা নার্ভাস সিষ্টেমের বিকাশের ও শিক্ষালাভের প্রক্রিয়ার উপর অপুষ্টির প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানে অনেকখানি আলোকপাত করতে পারে।

এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে অধিকাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা গবেষণাগারে পশুর মাধ্যমে চালানো হয়েছে। ঐ সব গবেষণার ফলে একথা সুস্পষ্ট-ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুকালে অপুষ্টি দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত করে' শিক্ষালাভের ক্ষমতা হ্রাস করে দেয় এবং আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা দেয়।

তবে পশুর ক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তাহলেও পশুদের জীবন পর্যালোচনা করে যে সব বিষয় জানা গেছে, মানুষের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যেমন, ইঁদুর এবং শূকরের বাচ্চা মায়ের পেটে থাকবার সময়ে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে উপযুক্ত খাদ্য না পেলে তাদেব শিক্ষার শক্তি হ্রাস পায়, এদের পরবর্তী জীবনে আচরণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। অপুষ্টিজনিত এই সব ত্রুটি মানবশিশুর ক্ষেত্রেও দেখা গেছে।

পুষ্টি-বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, যে সকল শিশু শিশুকালে উপযুক্ত খাদ্য পায় নি, তাদের তুলনায় যারা প্রথম বয়সে তা পেয়েছে, ভাল খেয়েছে ও থেকেছে, তারা অনেক বেশী বুদ্ধিমান—বুদ্ধিগত যোগ্যতা তাদের অনেক বেশী। আর শিশুকালে যারা অপুষ্টিতে ভুগেছে, পরবর্তী জীবনে তাদের মধ্যে আচরণগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। এদের মধ্যে দেখা গেছে, কর্মে উদ্যোগ-হীনতা ও প্রেরণার অভাব এবং অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য।

পশুদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শিশুকালে অপুষ্টির ফলে তাদের যে ক্ষতি হয়ে থাকে, পরবর্তী জীবনে যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করলেও তা আর পূরণ হয় না।

মস্তিষ্কের বিকাশ ও বৃদ্ধি ঘটে শিশুকালে; সুতরাং শিশুকালে উপযুক্ত খাদ্য না পেলে অপুষ্টির ফলে এই বৃদ্ধি ব্যাহত হবেই। মানুষের মস্তিষ্কের শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি তাদের তিন বছরের মধ্যেই হয়ে যায়—বাকী ২০ ভাগের বৃদ্ধি ঘটে পরবর্তী জীবনে। এক্ষেত্রে যে সব পরীক্ষা চালানো হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, শিশুকালে যারা অপুষ্টিতে ভুগেছে, তাদের মস্তকের পরিধি হ্রাস পেয়েছে এবং বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষায়ও তারা ভাল ফল করতে পারে নি।

শিশুরা তাদের জীবনের প্রথম তিন বছর যথোপযুক্ত খাদ্য না পেলে অপুষ্টির ফলে তাদের শিক্ষার শক্তি যে হ্রাস পায়, তার যথেষ্ট প্রমাণ এবং সঙ্গত কারণ থাকলেও শিশুর পরিবেশ, সামাজিক ও প্রজনন সংক্রান্ত বিষয়ের তথ্যাদির আলোকে এই সমস্যাটি পর্যালোচিত হয় নি। এজন্যেই এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারটি খুবই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষের শিক্ষা ও আচরণের উপর অপুষ্টির প্রভাব পর্যালোচনা করতে হলে এমন অনেক জটিল বিষয় আছে, যে সব জানা ও বোঝা খুবই

প্রয়োজন। যেমন শিশুর সমস্ত পরিবেশটি এমন হতে পারে যে, তা কোন না কোন ভাবে তার শেখবার প্রবণতা বা শক্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

তবে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশের এবং শিক্ষা ও আচরণের উপর পুষ্টির প্রতিক্রিয়া পুরাপুরি বুঝতে হলে এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রের বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের উদ্যোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।

উন্নত কৃষি ও খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির পথে অন্তরায়

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃষিতে উন্নত দেশগুলিতে যাঁহারা কৃষিকাজ করেন এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শিক্ষিত—এমন কি, উচ্চশিক্ষিত। দেশের ও বিদেশের গবেষণার ফলে যে সকল বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী বা খাদ্যশস্য উৎপাদন-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহারা সে সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন এবং নিজেদের জমির আকৃতি-প্রকৃতি ও কৃষির স্থানীয় পরিবেশ ইত্যাদি অনুসারে সেই সকল প্রণালী অনুসরণ করেন। ইহার উপর তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী কেবল প্রচার করিবার জন্য নহে—উপযুক্তভাবে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত কর্মচারীবর্গ আছেন। সুতরাং ঐ সকল কৃষিতে উন্নত দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ খাদ্যশস্যেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশে প্রধানতঃ কি দেখিতে পাই? আমাদের দেশে যাঁহারা কৃষিকাজে নিযুক্ত আছেন এবং খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে নিযুক্ত আছেন, প্রথমতঃ তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই নিরক্ষর। চাষ-আবাদের হিসাব-নিকাশ বা চাষ-আবাদের আয়ব্যয়ের হিসাবও রাখিতে জানেন না বা সঠিক বলিতে পারেন না। অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সরকার যে সকল প্রচার পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশ করেন, নিরক্ষরতাহেতু অধিকাংশ কৃষক তাহা পড়িতেও পারেন না, অপ্রয়োজনীয় কাগজ হিসাবে তাহা গণ্য করেন। ইঁহাদের মধ্যে অল্পাংশ যাঁহারা লিখিতে পারেন এবং ঐ সকল প্রচার পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি পড়িতে পারেন, তাঁহারাও উহা সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন না বা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের জমিতে প্রচারিত বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী প্রয়োগ করেন না। কৃষিতে উন্নত বিদেশের মত কৃষকদিগকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত কর্মচারীবৃন্দও নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের অধিকাংশই বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী সম্বন্ধে তেমন বিজ্ঞ নহেন। আমার মনে হয়, এই নিরক্ষরতাই কৃষির উন্নতি ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পথে প্রধান অন্তরায়। এই অন্তরায় দূর করিতে না পারিলে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি সুদূরপরাহত

দ্বিতীয় প্রধান অন্তরায় হইতেছে, আমাদের দেশের নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের সহিত তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হিমালয়তুল্য ব্যবধান। শিক্ষিত সমাজের সহিত নিরক্ষর কৃষক সম্প্রদায়ের সামাজিক বিশেষ কোন যোগসূত্র নাই। শিক্ষিত সমাজ কৃষিকে এখনও অসম্মানজনক পেশা বলিয়া গণ্য করেন। এই হিমালয়তুল্য ব্যবধান দূর করিতে না পারিলে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক

কৃষির প্রবর্তন সুদূরপরাহত এই ব্যবধান দূর করা আশু প্রয়োজন।

আরও ছোট, বড় বহু অন্তরায় আছে। তাহাদের বিবরণ বলিয়া এই প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে Exploitation of farmers—অর্থাৎ নিজেদের স্বার্থে কৃষকদের পরিশ্রমলব্ধ ফল কাজে লাগান বা শোষণ করা। মনে হয় উপরিউক্ত দুইটি অন্তরায় দূর করিতে পারিলে ইহারও অনেকটা অবসান হইবে।

বর্তমান সময়ে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সংখ্যায় কৃষক-সন্তানগণ স্থানীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন। ঠিক কি উদ্দেশ্যে কৃষক সম্প্রদায় অধিকতর সংখ্যায় তাঁহাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাইতেছেন কিংবা তাঁহাদের সন্তানগণ কি উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহা বলা খুবই কঠিন। কৃষক সম্প্রদায় কিংবা তাঁহাদের সন্তানগণ তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সম্মান লাভ করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষার জন্য অনুরাগী হইয়াছেন, না কৃষক-সন্তানগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জনের পর তাঁহাদের জায়গা-জমিতে ফিরিয়া আসিবেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা অর্জনের ফলে উহাতে উন্নত কৃষি-প্রণালী প্রবর্তন করিবেন? কিন্তু ইহার ফল দেখিয়া মনে হয় যে, কৃষক সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের সন্তানগণ শিক্ষিত হইয়া শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে উপযুক্ত সম্মান লাভের আশাই পোষণ করিতেছেন। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, কৃষক-সন্তানগণ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কয়েক শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াও নিজেদের জায়গা-জমিতে ফিরিয়া যাইতেছেন না। তাঁহারা দেশে কিংবা বিদেশে কলকারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং এইরূপ প্রতিষ্ঠানে নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছেন। যাঁহারা স্কুল ফাইন্যাল বা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন একটিও উদাহরণ নাই, যিনি নিজের জায়গা-জমিতে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অগ্রজদিগের সহিত একসঙ্গে চাষ-আবাদ করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চতর শিক্ষালাভ করিয়া তথাকথিত সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত আছেন; আবার অনেকে স্কুল ফাইন্যাল কিংবা উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদেশে তথাকথিত সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত আছেন। ইহার ফলে স্থানীয় কৃষি পূর্বেকার মত নিরক্ষর কৃষক-সমাজের উপর ন্যস্ত আছে। তাহাদের সন্তানদের অনুপস্থিতির জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়া শ্রমিক নিযুক্ত করিতে হইতেছে।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমান শিক্ষা প্রসারের ফলেও স্থানীয় কৃষি যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে—বরং তিমির গাঢ়তর হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বর্তমান শিক্ষা-প্রণালী সাধারণতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের সন্তানগণকে শিক্ষা শেষে মাটি হইতে—এমন কি, গ্রাম হইতেও বিচ্ছিন্ন করিতেছে। সুতরাং তাঁহাদের জন্য এমন পরিবেশ, এমন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষান্তে তাহারা গ্রামেই অবস্থান করিয়া নিজেদের ক্ষেত-খামারে নিজেদের অর্জিত শিক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিক কৃষি-প্রণালী প্রয়োগ করিতে পারেন। এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা মোটেই দুরূহ নহে। অল্প শিক্ষিত ছাত্র বা যুবকদিগের জন্য কত রকমের কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কৃষি-শিক্ষার জন্য হইতে পারে না কি? ইচ্ছা থাকিলেই হইতে পারে।

দ্বিতীয় অন্তরায়টি অর্থাৎ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত কৃষক সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ দূর করিতে হইলে শিক্ষিত সমাজের যুবকগণকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে প্রথমেই দেখাইতে হইবে, অন্যান্য পেশার ন্যায়

কৃষিও লাভজনক দেখাইতে হইবে যে, গ্রামের মধ্যে থাকিয়া ৩০-৪০ বিঘা জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ-আবাদ করিলে একজন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত যুবক অনায়াসে তাঁহার পরিবারবর্গ প্রতিপালন করিতে পারেন। অজস্র অর্থব্যয়ে কৃষিবিভাগ অনেক রকমের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি যে লাভজনক, তাহা দেখাইবার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই। সেই জন্য স্বতঃই মনে হয়, তাঁহাদের নিজেদের এই পরিকল্পনায় কোন বিশ্বাস নাই; অর্থাৎ কৃষিকাজ যে অন্যান্য পেশার ন্যায় লাভজনক হইতে পারে, তাঁহারা তাহা বিশ্বাস করেন না। ইহার সমর্থনে বলা যাইতে পারে যে, কৃষি বিভাগে যাঁহারা কাজ করিয়াছেন এবং এখনও করেন এবং যাঁহারা 'Go back to the land' অর্থাৎ 'জমিতে কিরিয়া যাও' শ্লোগান প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি তাঁহার কোন সন্তানকে কৃষিকাজে নিযুক্ত করিয়াছেন। শিক্ষিত যুবকগণ আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতি পেশা গ্রহণ করেন, কিন্তু কৃষিকে পেশা বলিয়া গ্রহণ করেন না। কারণ কৃষি যে একটি লাভজনক পেশা এবং ইহার দ্বারা মোটামুটি সম্মানজনকভাবে জীবিকা অর্জন করা যায়, তাহা আজ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই। দেশের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে ইহা প্রমাণ করিবার দায়িত্ব সরকারের উপরই নির্ভর করে। 'জমিতে ফিরিয়া যাও' শ্লোগান শুনিয়া অনেক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবক কৃষিকাজে নিজেদের নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সর্বহারা হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহা নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি।

বহু অকেজো পরিকল্পনায় গৌরী সেনের টাকা অজস্র ব্যয় হইতেছে। কৃষি বিভাগের কর্মচারীগণের নাম ও সংখ্যা দেখিলে ভ্যাবাচাকা লাগে—সেখানে টাকার অপচয় ছাড়া আর তেমন কিছু দেখা যায় না; অথচ কৃষির উন্নতির মূলে যে সকল অন্তরায় আছে, তাহা দূর করিবার জন্য কোন পরিকল্পনাই নাই। গৌরী সেনের টাকায় অনেক কর্মচারী কৃষি বিষয়ে উন্নত অনেক দেশ পর্যটন করিয়া আসিয়াছেন। ফল কি হইয়াছে? সেই জন্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অতি দুঃখে অনেক ক্ষেত্রে অনেক বার বলিয়াছেন যে, বিদেশে কৃষি শিক্ষালাভ করিবার জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা "ন দেবায় ন ধর্মায়" গিয়াছে। প্রায় ৩০-'৫ বৎসর পূর্বে ফরিদপুরে (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) "কৃষি ব্যবসায় ও বাঙ্গালী যুবকের অন্ন সমস্যা" শীর্ষক ভাষণে বলিয়াছিলেন—"বিলাতে শিক্ষা লাভ করে সে শিক্ষা দ্বারা এ দেশের কৃষির কোন উন্নতি করা চলে না। বিলাতে প্রত্যেক ভদ্রলোক কৃষক ১০০ কিম্বা ২০০ একর জমি নিয়ে চাষবাস করে থাকেন। আমাদের দেশের চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড জমি প্রায়েরই ১ বা ১।।০ একর জমির বেশী হবে না এবং তারা নিরক্ষর। এজন্য বিলাতী চাষের প্রণালী ও আদর্শ এখানে চালানো যায় না। দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা না করে কেবল বিলাতী শিক্ষা আমদানী করলে তা ফলবতী হয় না। এ দেশের মধ্যেই যে সব জায়গায় যে সব চাষআবাদ উন্নত প্রণালীতে হচ্ছে সে সকল জায়গা থেকে তা' শিখে এসে, কয়েকটি গ্রাম নিয়ে বিভিন্ন কেন্দ্র করে সেইভাবে ফসল উৎপাদন করে আমাদের চাষীদিগকে দেখাতে পারলেই দেশের কৃষিকাজের প্রকৃত উন্নতি হবে। এ জন্য বিলাতে যাবার কোন আবশ্যকতা নাই।"

আচার্যদেবের এই সাবধান-বাণী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। তাই আজ দেশের এই দুরবস্থা, এক মুষ্টি অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে হইতেছে।

মঙ্গল, শুক্রগ্রহ ও চন্দ্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ তার দুটি চোখ দিয়ে আকাশের গ্রহ, তারকা, নক্ষত্রমণ্ডলী পর্যবেক্ষণ করে এসেছে। তাদের সেই দৃষ্টি আবহমণ্ডলের দ্বারা সীমায়িত ও অবরুদ্ধ। ফলে পৃথিবী থেকে যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহ-তারকা সম্পর্কে কোন তথ্য সংগৃহীত হলেও তা ত্রুটিহীন ও সম্পূর্ণ হয় নি।

তাহলেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাদের প্রত্যেকটির ভর বা মাস কতটুকু, কি পরিমাণ গতিতে তারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তাদের কার কতগুলি চাঁদ আছে এবং তাদের গড়-পড়তা তাপমাত্রা কি পরিমাণ, তা তাঁরা জানতে পেরেছেন। কিন্তু গ্রহসমূহের আবহাওয়া ও পরিবেশ, তাদের উপরিভাগে কি আছে—ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পৃথিবী থেকে সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত মহাকাশযানকে গ্রহান্তরে পাঠিয়েই মাত্র এই সকল তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যেই প্রথম মেরিনার শ্রেণীর মনুষ্যবিহীন মহাকাযান মহাকাশে প্রেরিত হয়।

ভবিষ্যতে ভয়েজ শ্রেণীর আরও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত মহাকাশযান গ্রহলোকে প্রেরিত হবে। তখন ঐ আরোহীশূন্য মহাকাশযান ঐ সকল গ্রহে অবস্থান করে তাদের উপরিভাগের অবস্থা সম্পর্কেই শুধু তথ্য পরিবেশন করবে না, সৃষ্টি-রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে এরকম তথ্যেরও সন্ধান দেবে। সৌর পরিবার এবং প্রাণ সৃষ্টির উৎসেরও সন্ধান দেবে এই সকল উপগ্রহ।

মেরিনার-২ এই ধরণেরই একটি সার্থক কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি ১৯৬২ সালে শুক্র গ্রহাভিমুখে প্রেরিত হয়। শুক্রগ্রহের সূর্যালোকিত এবং সূর্যালোক বঞ্চিত অন্ধকার দিকের তাপমাত্রা যে ৬০০ ডিগ্রী থেকে ৮০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মধ্যে ওঠানামা করে, এই তথ্য এই কৃত্রিম উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে জানা গেছে। এছাড়া চৌম্বক শক্তির মাত্রা সম্পর্কেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। মহাকাশ এবং উপগ্রহের নিকটবর্তী এলাকার চৌম্বক শক্তির মধ্যে মাত্রার দিক থেকে কোন তারতম্য দেখা যায় না। এতে এই কথাই বোঝা যায় যে, শুক্রগ্রহের মধ্যে যদি চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে থাকে, তবে তা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের তুলনায় শতকরা দশ ভাগেরও কম।

মেরিনার-২-এর সাহায্যে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে আরও জানা গেছে যে, শুক্রগ্রহের মধ্যভাগের তুলনায় এর প্রান্তিক এলাকায় তাপমাত্রা অনেক কম। এই তথ্য থেকে আভাষ পাওয়া যায় যে, ঐ গ্রহের উপরি-ভাগ বেশ গরম এবং সেখানকার আকাশে ঠাণ্ডা মেঘ রয়েছে। ঐ গ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধে যে একটি শীতল স্থান রয়েছে, তারও সন্ধান কৃত্রিম উপগ্রহটি দিয়েছে। হয়তো সেই স্থানটি খুব উঁচু অথবা ঝড়ের ফলেও সেই স্থানটির তাপমাত্রা নীচে নেমে যেতে পারে।

মেরিনার-২ শুক্রগ্রহের নিকটবর্তী কোন স্থানে কোন উল্কাকণা এবং পৃথিবীর সন্নিকটস্থ ভ্যান অ্যালেন বলয়ের মত কোন চৌম্বক ক্ষেত্রের বা কোন বিদ্যুতায়িত কণার সন্ধান পায় নি। এই উপগ্রহের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রের ভর পৃথিবীর ০·৮১৪৮৫ গুণ বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এর পরে মেরিনার-৪-এর সাহায্যেও বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এটি মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাসে। গত আড়াই বছর ধরে এটি মহাকাশের ১০০ কোটি মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করেছে। ১৯৬৫ সালে এটি মঙ্গলগ্রহের অতি কাছে গিয়েও খবরাখবর নিয়ে আসে। সূর্যকে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে, আর ২১ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরে থেকে পৃথিবীর সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ রক্ষা করে।

মেরিনার-৪-এর স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা মঙ্গল-গ্রহের উপরিভাগের টেলিভিশন ছবিও নিয়েছে। ঐ সকল ছবি চাঁদের উপরিভাগের ছবির মতই। ঐ গ্রহের ছবি এর আগে আর নেওয়া হয় নি। মঙ্গলগ্রহ এই পৃথিবীর চেয়েও প্রাচীন, আর সেখানকার আবহাওয়া পৃথিবীর চেয়েও অনেক বেশী শুষ্ক।

মেরিনার-৪-এর সাহায্যে আর যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মঙ্গলগ্রহের চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিমাণ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের শতকরা একভাগের অর্ধেক ও নয়, তার চেয়ে কম। এর অর্থ এই যে, মঙ্গলগ্রহ আর পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে প্রায় একই সময় লাগে বলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত স্থান জুড়ে যে রকম তরল পদার্থ রয়েছে, সেই রকম তরল পদার্থ মঙ্গলগ্রহে নেই।

মেরিনার-৪-এর সাহায্যে মঙ্গলগ্রহের আব-হাওয়ার ঘনত্বের আভাসও পাওয়া গেছে। পৃথিবীর তুলনায় ঐ গ্রহের আবহমণ্ডলের ঘনত্ব ২০০ গুণ কম। আর গ্রহটির উপরিভাগে বাতাসের চাপ সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তাতে মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে বহু প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে এবং মঙ্গলগ্রহে মহাকাশযানে অবতরণ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।

মেরিনার-৪ মহাকাশের গভীরে সৌরমণ্ডলী থেকে যত দূরে গেছে, অত দূরে আর কোন মহাকাশযান যেতে পারে নি। কেবল তাই নয় —সূর্যের করোনা বা আলোকচ্ছটার মধ্যে গিয়ে সেখান থেকেও বেতার-বার্তা পৃথিবীতে পাঠিয়েছে।

মেরিনার শ্রেণীর আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ জুন মাসেই শুক্রগ্রহাভিমুখে প্রেরণ করা হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে—মেরিনার-ভেনাস ১৯৬৭। অক্টোবর মাস পর্যন্ত এটি যাতে শুক্রগ্রহের যে দিকটি অন্ধকারে আবৃত, সেই দিকের ২০০০ মাইলের কাছাকাছি পর্যন্ত যেতে পারে, সেই ভাবেই এটি ছাড়া হয়েছে।

শুক্রগ্রহের ঊর্ধ্বাকাশে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর সন্ধান পাওয়া গেলে তারই সাহায্যে সেখানকার তাপমাত্রার পরিমাণ যে কতখানি, তারও একটা আঁচ করা যেতে পারে। শুক্রগ্রহের কাছাকাছি মহাকাশের বিভিন্ন স্তরে আবহমণ্ডলের ঘনত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এই সব তথ্য শুক্রগ্রহের ব্যাস নিরূপণের পক্ষে সহায়ক হবে।

মেরিনার-ভেনাস যখন মহাকাশে চলতে থাকবে, মেরিনার-৪ তখনও মহাকাশে চালু থাকলে বিজ্ঞানীরা সূর্য এবং সৌরঝঞ্ঝা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পেতে পারেন। মেরিনার-ভেনাস আর মেরিনার-৪-এর মধ্যে থাকবে কোটি কোটি মাইলের ব্যবধান, কিন্তু একই সময়ে একই সঙ্গে ঐ দুটির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে সূর্য ও সৌরঝঞ্ঝা সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে।

মেরিনার-ভেনাস যখন শুক্রাভিমুখে যাবে, তখন মেরিনার-৪ থাকবে পৃথিবীর অন্তদিকে। তবে সূর্য সম্পর্কে পৃথিবী, মেরিনার-ভেনাস এবং মেরিনার ৪ একই রেখা বরাবর অবস্থান করবে। তখন আন্তর্গ্রহ এলাকার চৌম্বক ক্ষেত্র এবং

বিদ্যুতান্বিত কণিকা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের সুযোগ উপস্থিত হবে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, শুক্রগ্রহটি মেঘাবৃত এবং সেখানকার তাপমাত্রা এত বেশী ও আবহাওয়া এত শুষ্ক যে, পৃথিবীতে যে ধরণের প্রাণী রয়েছে, সে ধরণের কোন প্রাণীর পক্ষে সেখানে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এই গ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ৫৪০ পাউণ্ড ওজনের মেরিনার-৫ নামে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণের পরিকল্পনা করেছেন। পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহের দূরত্ব ২১ কোটি ২৫ লক্ষ মাইল। ১৪ই জুন ঐ উপগ্রহটি শুক্রগ্রহাভিমুখে যাত্রা করে এবং আশা করা যায় ১৯শে অক্টোবর পর্যন্ত শুক্রগ্রহের কাছাকাছি যাবে। তখন তাদের মধ্যে ব্যবধান থাকবে ২০০০ হাজার মাইল।

শুক্রগ্রহের প্রকৃতি, পরিবেশ এবং এর উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই এটি ছাড়া হয়েছে। বিজ্ঞানীদের কাছে এই গ্রহের মেঘাবরণের ব্যাপারটি রহস্যজনক। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত যাত্রীবিহীন মহাকাশযানের এই গ্রহে অবতরণের পূর্বে এই গ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। ১৯৭০ সালের শেষের দিকে স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযানকে যাতে ধীরে ধীরে শুক্রে অবতরণ করানো যায় এবং ১৯৭২ সালে যাতে আরও উন্নত ধরণের মহাকাশ-যান শুক্রগ্রহে প্রেরণ করা যেতে পারে, তারই প্রস্তুতি হিসাবে মেরিনার-৫-কে ঐ গ্রহাভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছে।

যাবার পথে মেরিনার-৫ মহাকাশে তেজস্ক্রিয়া, সৌরঝঞ্ঝা, আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্র এবং তাদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে। তবে এই সময়ে উর্ধ্বাকাশে অতিবেগুনী আলোতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা চালানো হবে। এই দুটি পরমাণু থেকে কি পরিমাণে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে, তার হিসাব নেওয়া হবে আলট্রাভায়োলেট ফটোমিটারের সাহায্যে এবং এই তথ্য শুক্রগ্রহের আবহাওয়ার ঘনত্বের উপর আলোকপাত করবে। শুক্রগ্রহের মেঘপুঞ্জ এবং তাপমাত্রা সম্পর্কেও তথ্যাদি সংগৃহীত হবে।

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তাঁদের আলোকচিত্র গ্রহণের জন্যে অরবিটার-৪ নামে যে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে গত ৪ঠা মে ফ্লোরিডার কেপ-কেনেডি থেকে চন্দ্রাভিমুখে প্রেরণ করা হয়েছিল, সেটি ৮ই মে চাঁদের কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছে এবং ১১ই মে থেকে চাঁদের দক্ষিণ মেরু এলাকার ছবি তুলতে সুরু করে। অরবিটার শ্রেণীর কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে চাঁদের সামনের দিকের শতকরা ৯৯ ভাগের এবং পিছনের দিকের শতকরা ৭৫ ভাগের ছবি তোলা হয়েছে। এর আগে পৃথিবী থেকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে চাঁদের যে সকল ছবি তোলা হয়েছে, তাদের তুলনায় এই সব ছবি এক-শ গুণ বেশী স্পষ্ট। তবে লেন্সের আচ্ছাদনের উপর বাষ্প জমে যাওয়ায় সাময়িকভাবে অরবিটার-৪-এর ক্যামেরায় ছবি তোলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শীঘ্রই এই ত্রুটি সারানো হয়। তারপর পুনরায় ছবি তোলা হয় এবং ২৬শে মে থেকে ঐ সব ছবি ভূপৃষ্ঠস্থ কেন্দ্রে পাঠানো সুরু হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার গোল্ডস্টোন কেন্দ্রে ১লা জুন পর্যন্ত ৩২৬টি ছবি পাঠানো হয়েছে এবং এর ছবি তোলার কাজ শেষ হয়েছে। এখন এটিকে চাঁদের মহাকর্ষ-শক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হবে।

লেসার রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল ক্যান্সার ইনষ্টিটিউট মেরিল্যাণ্ডের বেথেসডার ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব হেল্‌থে লেসার রশ্মির সাহায্যে ঐ রোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে অতি শক্তিশালী লেসার রশ্মির সাহায্যে মানবদেহের টিউমারসমূহ পুড়িয়ে নষ্ট করা হবে। তবে প্রথমতঃ গবেণোগারের নিম্নস্তরের প্রাণীর দেহে পরীক্ষামূলকভাবে রশ্মি প্রয়োগ করা হবে এবং তাতে কৃতকার্য হলেই ঐ রশ্মি মানবদেহের ঐ রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হবে।

ক্যান্সার সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার

পশ্চিম জার্মেনীর হাইডেলবার্গের পরীক্ষামূলক ক্যান্সার গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা এমন একটি পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন, যেটি শরীরের সুস্থ কোষগুলির কোন ক্ষতি সাধন না করে বিষাক্ত টিউমারগুলিকে ধ্বংস করতে পারে। এই পদার্থ টির নাম পিউরিল হিস্টামিন। প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ডক্টর হান্স লেতরের মতে, এখনই এসম্বন্ধে কিছু সঠিক বলা না গেলেও এই ক্যান্সার ধ্বংসকারী পদার্থটি সম্বন্ধে আশা করা যায় যে, একটি রাসায়নিক ভেষজ হিসেবে এটি ক্যান্সারের চিকিৎসায় নিঃসন্দেহে একটি শক্তিশালী অস্ত্র বলে গণ্য হবে।

খনি শ্রমিকের নিরাপত্তার জন্যে নতুন ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা

মাইনারস্‌ ল্যাম্প বা খনি শ্রমিকের বাতির শিখা হয়তো শীঘ্রই একেবারে অদৃশ্য হবে। বৃটেনের খনির মধ্যে এই বাতিটি গত ১৫০ বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

ফায়ার ড্যাম্প বা খনিজ দাহ্য বাষ্পবিশেষ (মিথেন গ্যাস) যা বহু বছর ধরে শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল—তার পরিমাণ স্বয়ংক্রিয় উপায়ে পরিমাপের জন্যে একটি ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা (Electronic device) উদ্ভাবন করেছেন ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানী তাঁদের স্ট্যাফোর্ড কারখানায়।

প্রচলিত সেফ্‌টি ল্যাম্প একটি শিখার উপর নির্ভর করেই কাজ করে থাকে, ফায়ার ড্যাম্প দেখা দিলে শিখার উপরিভাগ নীল হয়ে ওঠে। নতুন ব্যবস্থায় ফায়ার ড্যাম্পের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেলেই আলো জ্বলে উঠবে।

এই ইলেক্‌ট্রনিক ব্যবস্থাটি গ্যাস, তেল ও রসায়ন কারখানাতেও ব্যবহার করা যাবে।

অল্প খরচে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার ব্যবস্থা

প্রতিদিন ১০০ কোটি গ্যালন লবণমুক্ত জল উৎপন্ন হতে পারে, এরকম কারখানা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত স্থাপন করা সম্ভব হবে। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে মাত্র ১৫ কোটি গ্যালন লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার ব্যবস্থা আছে। যে পরিমাণ জল মানুষ প্রতিদিন ব্যবহার করে, তার তুলনায় এই জলের পরিমাণ অতি সামান্য। সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করবার সবচেয়ে বড় কারখানায়ই প্রতিদিন মাত্র ৫০ লক্ষ গ্যালন পানীয় জল উৎপন্ন হয়ে থাকে। যে সব রাষ্ট্র জলসম্পদে সমৃদ্ধ, সেই সব দেশে যে পরিমাণ খরচে জল পাওয়া যায়, তার তুলনায় অনেক বেশী খরচে লবণমুক্ত জল উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

যে সব কারখানায় এই প্রকার জল উৎপাদনের খরচ সবচেয়ে কম, সেই সব কারখানায়ও প্রতি হাজার গ্যালন লবণমুক্ত জল উৎপাদনে খরচ পড়ে এক ডলার। তবে দশ বছর আগে এতে যা খরচ পড়তো, তার তুলনায় বর্তমানে খরচের পরিমাণ পাঁচ গুণ কমে গেছে।

সম্প্রতি ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত শান্তির জন্যে জল সম্মেলনে, পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে কম খরচে লবণাক্ত জলকে পানীয় জলে পরিণত করবার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে।

এই পদ্ধতিতে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে বাষ্পে পরিণত করবার পর সেই বাষ্পকে ঘনীভূত করা হলে বিশুদ্ধ শীতল জল পাওয়া যাবে।

আমেরিকার আভ্যন্তরীণ দপ্তরের লবণাক্ত জল বিভাগের ডিরেক্টর জে. এ. হান্টারের পরিকল্পনা অনুযায়ী অদূর ভবিষ্যতে পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের সাহায্যে প্রতিদিন সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে ১ কোটি গ্যালন পানীয় জল উৎপাদনের ব্যবস্থা হবে। প্রতি হাজার গ্যালন জল উৎপাদনে খরচ পড়বে মাত্র ৫০ সেন্ট।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন তৈরি হবে ১০ কোটি গ্যালন আর প্রতি হাজার গ্যালন পিছু খরচ পড়বে ২২ সেন্ট।

১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন উৎপাদন করা হবে ১০০ কোটি গ্যালন এবং প্রতি ১০০০ গ্যালন পিছু খরচ পড়বে ১০ সেন্ট মাত্র।

মিঃ হান্টার এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই বিষয়ে আরও কয়েকটি পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

মহাকাশের রহস্য-সন্ধানে নতুন ক্যামেরা

মহাকাশের বহুদূর পর্যন্ত ছবি তুলতে পারে, এমন একটি নতুন ধরণের ক্যামেরার কাজ বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

এই ক্যামেরা চন্দ্র, বুধ ও ছায়াপথের ছবি তুলতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ছবিগুলি দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের প্লিমাথের বৃটিশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে দেখানো হয়।

লণ্ডনের নিকটবর্তী হাটফিল্ড কলেজ অব টেক্‌নোলজির মিঃ জে. সি. ডি. মার্শের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে এই ক্যামেরা প্রথম যুক্ত করা হয়। তিনি বলেন, এই ক্যামেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

অংশতঃ অস্ত্রচিকিৎসায় এক্স-রে কাজের জন্যে উদ্ভাবিত এই ক্যামেরা এত হাল্কা ও সংবেদনশীল যে, খাঁটি অন্ধকারেও ছবি তুলতে পারে।

এই ক্যামেরায় তোলা ছায়াপথের ছবিতে এমন সব জিনিষ ধরা পড়েছে, যা অন্যভাবে ধরা পড়া সম্ভব ছিল না।

মিঃ মার্শ বলেন, ২৪ ইঞ্চি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যুক্ত হলে এই ক্যামেরা ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যালোমারে স্থাপিত পৃথিবীর বৃহত্তম (২০০ ইঞ্চি) দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মতই সংবেদনশীল হবে।

মহাকাশচারীদের মাধ্যমে চন্দ্রলোক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ

ফ্লোরিডার কেপকেনেডিতে তিন জন মহাকাশযাত্রী সহ এপোলো-১ মহাকাশযানটি আগুন লাগবার ফলে ধ্বংস হওয়ায় আমেরিকার চন্দ্রলোকে মনুষ্যবাহী মহাকাশযান প্রেরণের পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ বেশ কিছুটা ব্যাহত হয়। তাহলেও চাঁদে অবতরণের পর মহাকাশযাত্রীরা যে সব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান করবেন বলে স্থির হয়েছে, সে সব কাজ এগিয়ে চলেছে।

মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশযান থেকে

অবতরণের পর কাজ হবে, চাঁদের উপরিভাগে পাথর, ধুলাবালি এবং অন্যান্য যে সকল উপকরণ তাঁরা পাবেন, ৫০ পাউণ্ড ওজনের সে সকল উপকরণ বিজ্ঞানীদের দিয়ে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করাবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে নিয়ে আসা।

তবে গবেষণাগারে এই সব উপকরণের পর্যালোচনা ও পরীক্ষার ফলে বিশেষ কিছু জানা যাবে কিনা, এই সব তথ্যানুসন্ধান কোন আলোকপাত করবে কি না, সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা না গেলেও বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যাবে বলে আশা করছেন। এই জটিল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতে হচ্ছে। এই উদ্যোগ বিশেষ ফলপ্রদ হবে বলেই তাঁদের ধারণা। তাঁরা মনে করেন, মহাকাশযাত্রীরা চাঁদ থেকে যে সব উপকরণ নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন, সে সব বিশ্লেষণ করে তারা কেবলমাত্র চাঁদের গঠন-প্রণালীই নয়, সে সব তথ্য এই পৃথিবীর, সমগ্র সৌরজগৎ—এমন কি, ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্তনের উপরেও আলোকপাত করবে।

চাঁদে কোন আবহমণ্ডল বা কোন প্রকার আবহাওয়া নেই। তারই জন্যে এই বিশ্ব-বিবর্তনের ইতিহাস চাঁদের এক টুক্‌রা পাথর বা মাটির মধ্যে বিধৃত রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর উপকরণ-সমূহে তার সন্ধান পাওয়া যায় না। কাজটি খুবই জটিল। বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে যাঁরা বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁদের দ্বারাই এই তথ্যানুশীলন ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ করানো হবে বলে স্থির হয়েছে।

চাঁদের নানা উপকরণ ও নিদর্শনসমূহ যখন পাওয়া যাবে, তখন ঐ সব উপকরণের উপর ১২২ রকমের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো হবে বলে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞানের মহাকাশ সংস্থা স্থির করেছেন।

বিজ্ঞানীরা চাঁদ থেকে সংগৃহীত উপকরণের খানিকটা বিভিন্ন রসায়নে দ্রবীভূত করে তাপ প্রয়োগ করে বা হিমায়িত করে এবং বিভিন্ন পরিমাণ তেজস্ক্রিয়ার মধ্যে রেখে এদের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখবেন; অর্থাৎ সব রকমের পরীক্ষাই চালানো হবে। বিজ্ঞানীরা এসব পদার্থের প্রাকৃতিক গুণ জানবার চেষ্টা করবেন। এদের মধ্যে ধাতব পদার্থের পরিমাণ এবং তাদের পারমাণবিক গঠন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্যও তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবেন। এছাড়া বিজ্ঞানীরা এই সব উপকরণকে জৈব রসায়নের দিক থেকেও বিশ্লেষণ করবেন।

কতকগুলি উপকরণ চাঁদ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা মাত্রই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সে সব উপকরণের পরীক্ষা টেক্সাসের হিউষ্টন-স্থিত মনুষ্যবাহী মহাকাশযান কেন্দ্রের লুনার রিসিভার লেবরেটরীতে চালানো হবে। তাছাড়া পৃথিবীর আবহমণ্ডলের প্রভাব এবং অন্যান্য প্রভাব যাতে এই সব উপকরণের উপর না পড়ে, তারই জন্যে এদের সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য বাক্সে রাখা হবে। এই বাক্সগুলি হবে লম্বায় ১৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ১১.৫ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৮ ইঞ্চি।

মহাকাশযাত্রীদের চাঁদে গিয়ে অবশ্যই অসংখ্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে। যেমন—মহাকাশ-যান থেকে অবতরণের পরেই প্রথমতঃ তাদের কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি চাঁদে নামাতে হবে। এই সব যন্ত্রের মধ্যে আছে বেতার-বার্তা প্রেরক যন্ত্র, চন্দ্রের ভূকম্পনের মাত্রা নিরূপক যন্ত্র, চন্দ্রের আভ্যন্তরীণ চৌম্বক ক্ষেত্র নিরূপণের যন্ত্র প্রভৃতি।

রেডিও ট্র্যান্সমিটার বা বেতার-বার্তা প্রেরক যন্ত্রটি মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে চলে আসবার পরেও ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে বার্তা প্রেরণ করবে। চাঁদে ভূকম্পনের মাত্রা

নিরূপণের যন্ত্রটি কম্পন সম্পর্কে তথ্য পৃথিবীতে পাঠাবে। এই সব তথ্য চাঁদের অভ্যন্তর সম্পর্কে জানবার পক্ষে অনেকখানি সহায়ক হবে। চন্দ্রপৃষ্ঠে আঘাত করবার ফলে যে কম্পন সৃষ্টি হবে, তাও ঐ যন্ত্রটি রেকর্ড করবে। পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার-নির্দেশে কোন প্রোজেকটাইল ছাড়া হলে চাঁদের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে বিষয়েও ঐ যন্ত্রটি তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। আর একটি যন্ত্র চাঁদের আভ্যন্তরীণ চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। সৌর-ঝটিকার ফলে যে সব কণা চাঁদে এসে পৌঁছায় এবং চাঁদে এর যে সব প্রতিক্রিয়া হয়, সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে আর একটি যন্ত্র।

আশা করা যাচ্ছে, ১৯৭০ সালের পূর্বেই মহাকাশচারীরা প্রথম চন্দ্রলোকে যাত্রা করবেন এবং তাঁরা সেখান থেকে বহু তথ্য নিয়েই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

নারকেলের কথা

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকৃতির রাজ্যে নারকেল একটি অতি আশ্চর্য ফল। নারকেল তাই পৃথিবীর বহু দেশেই অত্যন্ত প্রিয় এবং অপরিহার্য। বিশেষ করে যে সব অঞ্চলে নারকেল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেখানে মানুষের খাদ্য ও রুজি-রোজগারের কাজে এর প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শেস করা যায় না। নারকেল সাধারণতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ফল। পৃথিবীর বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি-রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী নারকেল উৎপন্ন হয়। যে সব অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় ৮০° ডিগ্রী ফারেনহাইটের কাছাকাছি, সে সব অঞ্চলই নারকেল উৎপাদনে অগ্রণী। এছাড়া সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলেও যথেষ্ট নারকেল উৎপন্ন হয়ে থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই আশ্চর্য ফলটি সবচেয়ে বেশী উৎপন্ন হয় বলে তথাকার অধিবাসীদের কাছে এই ফলটি বিশেষ প্রিয়। নারকেল গাছের একটি সুবিধা এই যে, এর প্রত্যেকটি অংশই প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। খাদ্য হিসাবে এর জল, শাঁস ও শাঁসনিঃসৃত তেল অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য পদার্থ। নারকেল গাছের পাতা ঘরের চাল বা ছাউনির কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতার মধ্যের কাঠি আমাদের দেশে ঝাঁটা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নারকেল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাড়ীর খুঁটি, বসবার আসন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া নারকেলের মালার সাহায্যে বহু জিনিষও প্রস্তুত হয়ে থাকে, বিশেসতঃ হুঁকা এবং নানা রকমের খেলনা। শুকনো পাতা জ্বালানীরূপেও ব্যবহৃত হয়। কাঁচা নারকেলও অতি প্রয়োজনীয়। কাঁচা নারকেলকে ডাব বলা হয়। ডাবের জল অত্যন্ত উপকারী দেহের পক্ষে। নারকেলকে তাই একটি সম্পূর্ণ খাদ্য বলা হয়।

খুব সম্ভব মালয় বা ইন্দোনেশিয়াই নারকেল গাছের প্রথম উৎপত্তি স্থল। নারকেলের ইংরেজী প্রতিশব্দটি সম্ভবতঃ পর্তুগীজ ভাষা থেকে উৎপন্ন—যার মানে বানর। সম্ভবতঃ নারকেলের আকার বানরের মাথার খুলির মত হওয়াতেই ওই শব্দের উৎপত্তি।

নারকেল সাধারণতঃ নোনা আর গরম

জায়গাতেই বেশী পরিমাণে জন্মায়, একথা আগেই বলেছি। সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় আশী লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে নারকেলের চাষ হয়ে থাকে। সাধারণভাবে নারকেলের শাঁসের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, নারকেল তেল উৎপাদনের জন্যে। নীচের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, পৃথিবীতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জেই সবচেয়ে বেশি নারকেলের চাষ হয়ে থাকে। এর পরেই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষ ও ইন্দোনেশিয়া।

দেশ	একর (দশ লক্ষের হিসাবে)	শাঁস (এক হাজার টন হিসাবে)
ফিলিপাইন	২·৫০	১৩০০
ভারত	১·৬১	২৬০
ইন্দোনেশিয়া	১·৫৩	৫০০
সিংহল	১·১০	২৮০
মালয়েশিয়া	·৭০	১৭০
অন্যান্য	·৮০	৮০০
মোট	৮·২৪	৩,৩১০

ভারতে সাধারণতঃ প্রায় সর্বত্রই নারকেল গাছ দেখা গেলেও বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলের কেরালা প্রদেশেই বেশী পরিমাণে নারিকেল গাছ জন্মায়। সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে নারকেল অধিক সংখ্যায় জন্মায় আর এই গাছ খুব লম্বা হয়ে থাকে। দক্ষিণ ভারতের সাধারণ মানুষের জীবনে তাই নারকেল ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে।

নারকেল গাছ বহুদেশে প্রত্যেক সাধারণ মানুষের বাড়ীতেই দেখা যায়। বহু জায়গাতে ঠিক নিয়মসম্মতভাবে নারকেলের চাষ করা হয় না। নারকেল গাছের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, অযত্নেও এই গাছের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ঝুনা বা পাকা নারকেলের মধ্য থেকেই চারা গাছ বেরিয়ে থাকে। যত্ন করে বসালে নারকেল থেকে ভাল গাছ জন্মাতে পারে।

পৃথিবীর সর্বত্রই বর্তমানে নারকেলের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। নারকেল তেলই এই চাহিদার প্রধান কারণ। নারকেল তেলের সাহায্যে সাবান ও অন্যান্য সুগন্ধি তেল তৈরি করা হয়। এছাড়া অন্যান্য বহু প্রয়োজনেও এর ব্যবহার হয়। গদি, দড়ি ইত্যাদি তৈরির কাজে নারকেলের ছোবড়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সমগ্র পৃথিবীতে বর্তমানে নারকেল তেলের উৎপাদন প্রায় ২২ লক্ষ টন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রায় শতকরা ত্রিশ জন অধিবাসীই খাদ্য হিসাবে নারকেলের উপর নির্ভরশীল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বহু অধিবাসী নারকেলের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

সারা পৃথিবীতেই নারকেলের তেল ও শাঁসে প্রচুর চাহিদা থাকায় এর ব্যাপক আমদানী ও রপ্তানী দেখা যায়। নীচের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জই সবচেয়ে বেশী তেল ও শাঁস রপ্তানী করে। ভারতে প্রচুর নারকেল উৎপন্ন হলেও রপ্তানী খুব কম বললেই চলে।

দেশ	শাঁস (হাজার টন হিসাবে)	তেল (হাজার টন হিসাবে)
ফিলিপাইন	১০০০·০০	৮০·২
ইন্দোনেশিয়া	২৯৫·০১	০·১
মালয়	১০০·০১	৪৭·২
মোজাম্বিক	৬১·০২	৪·০
অন্যান্য	১৮০·০৩	৩৫·০
মোট	১৬৩৬·০৭	১৬৬·৫

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমদানীকারী দেশ। যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ টন শাঁস ও তেল আমদানী করে। এছাড়া পশ্চিম জার্মেনীও প্রায় আড়াই লক্ষ টন শাঁস ও তেল আমদানী করে থাকে। এই আমদানীর সবটাই ব্যবহৃত হয় কারখানায় সাবান ও অন্যান্য জিনিস তৈরির কাজে।

ভারতও প্রচুর পরিমাণে শাঁস আমদানী করে থাকে প্রতি বছরেই। এর বেশীর ভাগই তেল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

এক সময় নারকেল অত্যন্ত লাভজনকই ছিল। বর্তমানে রবার, কফি ও কলা চাষের তুলনায় নারকেল চাষে খরচ অনেক বেশী। নারকেল চাষে সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, যে জমিতে অন্য চাষ সম্ভব নয়. সেখানে নারকেল চাষ করা চলে। নারকেল চাষে সবচেয়ে বড় অসুবিধা, এর ফলনের সময়। অন্ততঃ আট বছরের আগে কোন নারকেল গাছে ফলন হয় না। এই কারণে উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে। নারকেল চাষে তাই নানা ভাবে খরচের তারতম্য হয়। সব গাছে একই সংখ্যায় ফলন হয় না। কোন কোন নারকেল গাছে বছরে প্রায় দু-শ' ফল ফলতে পারে। অবশ্য এই সংখ্যা সাধারণ ফলনের তুলনায় ঢের বেশী। সাধারণতঃ ফিলিপাইনেই একটি গাছে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ফলন হয়। গড়পড়তা প্রায় চল্লিশটি নারকেল হয়ে থাকে এখানে। সেই তুলনায় ভারতে এই সংখ্যা অনেকাংশে কমই বলা চলে। ভারতে এই সংখ্যা প্রায় ত্রিশটির মত।

বহু দেশেই ডাব একটি প্রিয় খাদ্য। এই ডাব খাদ্যহিসাবে ব্যবহারের ফলে নারকেলের উৎপাদন আনুপাতিক হারে কম হয়ে থাকে। ভারতে বিশেষভাবে ডাবের ব্যবহার অত্যধিক। এই কারণে প্রচুর উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও এর মূল্যমান কমের দিকে নয়। ভারতে নারকেল চাষের আর একটি অসুবিধা এই যে, কোন বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করা হয় না। এদিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নারকেল চাষে সবচেয়ে সুবিধাজনক জমি সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল। নারকেল গাছ লবণাক্ত মাটি বা জল সহজেই গ্রহণ করতে সক্ষম। অবশ্য নারকেল গাছের গোড়ায় বেশী জল না জমে থাকা দরকার। জলের সরবরাহ এমন হওয়া চাই যাতে নারকেল গাছের শিকড় সর্বদাই জল গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। প্রচণ্ড গরম ও অনাবৃষ্টির মধ্যেও নারকেল গাছ বেঁচে থাকতে পারে। নারকেল গাছের বড় শত্রু ইঁদুর ও গণ্ডারে পোকা। চারাগাছ ও নারকেল ইঁদুরের প্রিয় খাদ্য। দক্ষিণ ভারতের কেরালা আর ফিলিপাইনের নারকেল গাছে এক ধরণের রোগও গাছের প্রচুর ক্ষতি করে থাকে। এই রোগের আক্রমণে গাছের পাতা ক্রমশঃ হলুদ বর্ণের হয়ে পড়ে। এই রোগের আক্রমণ ঘটলে গাছটি ক্রমশঃ শুকিয়ে আসতে থাকে, অবশেষে মরে যায়। এই রোগ থেকে নারকেল গাছকে বাঁচাবার সঠিক পন্থা এখনও জানা যায় নি।

যাই হোক, নারকেল যে, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় ফল, এতে সন্দেহ নেই। মানুষের এই পরম উপকারী গাছটির প্রতি তাই যথেষ্ট যত্নবান হলে অনেক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ভারতের মত দেশে তাই আরও বেশী সংখ্যায় নারকেল চাষ প্রয়োজন। প্রচুর সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ব্যাপারে আগ্রহ সঞ্চার না হওয়া অত্যন্ত দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬৭

২০শ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা

ফ্রাঙ্কফুর্ট ইউনিভারসিটির অর্থোপেডিক ক্লিনিকের ডাক্তার ও যন্ত্র-বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় বিকলাঙ্গ শিশুদের জন্যে এই নকল হাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এই নকল হাত স্বাভাবিক হাতের মতই সব কাজ করতে পারে। শক্তি যোগাবার জন্যে শিশুর পিঠের উপর একটি ইলেক্ট্রো-হাইড্রলিক-যন্ত্র বাঁধা থাকে।

করে দেখ

রাং-ঝাল

তোমরা ইচ্ছা করলে তামা, পিতল, টিন ও লোহার পাত্‌লা চাদরের তৈরি সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি ভেঙ্গে গেলে বা ফুটো হয়ে গেলে অনায়াসে বাড়ীতে বসে জুড়ে নিতে পার। এর জন্যে ঝালাইকরের কাছে যাবার দরকার হয় না। ঝালাইয়ের কাজ তেমন কিছু কঠিন নয়। জোড়া-মুখটি খুব শক্ত না হলেও কাজ চালাবার মত হবে অর্থাৎ ছিদ্র বা ফাটল বন্ধ হবে এবং বাতিল করা পাত্রটি আরো ছ'মাস-একবছর টিকবে। তবে একটি কথা সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে—ঝালাই হয়ে যাবার পর কখনো যেন জোড়ার মুখে অধিক উত্তাপ প্রয়োগ করা না হয়। তাহলে জোড় খুলে গিয়ে পাত্রটি পূর্বের অবস্থায় এসে দাঁড়াবে।

ইংরেজীতে এই প্রকার জোড়া দেবার পদ্ধতিকে বলা হয় সল্‌ডারিং (Soldering)—আর বাংলায় বলা হয় রাং-ঝাল। রাং-ঝাল অনেক প্রকারে করা যায়। তোমাদের সহজ পদ্ধতির কথাই বলছি, যা করতে তোমাদের কোন বেগ পেতে হবে না। এই পদ্ধতিতে জোড়া দেবার জন্যে নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন :—

(১) ইলেকট্রিক সলডারিং আয়রন, বাংলায় যাকে বলে তাতাল। একে সাধারণতঃ বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়ে থাকে। যেমন—ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ও হিটার। এর মধ্যেই তাপ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা থাকে। তোমাদের অনেকের বাড়ীতেই ইলেকট্রিক ইস্ত্রি ও হিটার ব্যবহার করা হয়। সুতরাং কোন অসুবিধা নেই। ছবির (ইলেকট্রিক আয়রনের) প্লাগটি যথাস্থানে লাগিয়ে দাও। দেখবে, দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যেই ওর অগ্রভাগ উত্তপ্ত হয়ে গেছে। এবার প্লাগটি খুলে নাও। এরপর আয়রনের উত্তপ্ত অগ্রভাগটি জোড়ার মুখে প্রয়োগ করলে ঐ স্থানটিও উত্তপ্ত হবে। এমনি করেই ঝালাই বা জোড়া দেওয়া হয়ে থাকে। প্রণালী পরে বলছি। ইলেকট্রিক সলডারিং আয়রন যে কোন কারিগরি দোকানেই কিনতে পাওয়া যাবে। ইলেকট্রিক সলডারিং আয়রনের অভাবে সাধারণ তাতাল আগুনে গরম করে নিয়েও কাজ চালাতে পারা যায়।

(২) এমারি পেপার বা এমারি ক্লথ, যার মধ্যে কাচের মিহি চূর্ণ আঠার সাহায্যে লাগানো হয়ে থাকে। এর সাহায্যে জোড়ের মুখটি ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে। সব সময় মনে রাখবে, জোড়ার মুখে তৈলজাতীয় কোন পদার্থ, ধূলা-বালি, কালি, ময়লা ইত্যাদি থাকলে জোড় ভাল হবে না। এমারি কাগজও কারিগরি দোকান অর্থাৎ যে কোন বড় লোহা-লক্করের দোকানে কিনতে পাওয়া যাবে। 0নং অথবা ১নং এমারি ক্লথ হলেই চলবে।
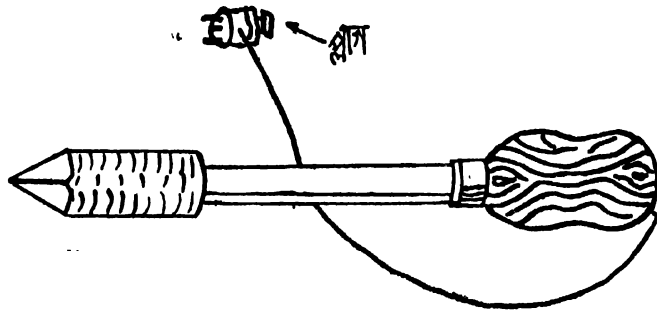
ইলেকট্রিক সলডারিং আয়রন

(৩) সলডার—জোড়া লাগাবার স্থানে যে মূল বা মিশ্র ধাতুকে গলিয়ে ঝালাই করা হয়ে থাকে, তাকেই সলডার বলে। সীসা, টিন বা রাং মিশিয়ে একে তৈরি করা হয়। এজন্যেই এর অপর নাম রাং-ঝাল। ইলেকট্রিক আয়রনের তাপে সলডার জোড়ার মুখে খুব সহজেই গলে যায় এবং ঠাণ্ডা হবার পর উক্ত গলিত সলডারই উভয় পাতের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এটাও কারিগরি দোকানেই কিনতে পাবে।

(৪) ফ্লাক্স—তোমরা বোধ হয় জান; উত্তপ্ত স্থানে বায়বীয় অক্সিজেন (Atmoshpheric Oxygen) এসে প্রবেশ করে। অক্সিজেন আমাদের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য গ্যাস, কিন্তু উত্তপ্ত জোড়ার স্থানের শত্রু। কারণ বায়ুস্থিত অক্সিজেন জোড়ার মুখে প্রবেশ করে ধাতুর অক্সিডেশন ঘটায়, ফলে ধাতু অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়ে জোড়ার মুখে একটি সূক্ষ্ম আবরণের (Layer) সৃষ্টি করে। এছাড়া সলডারও উত্তপ্ত হয়ে অক্সিজেনের সংস্পর্শে মিশে অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়ে যায়। জোড়া দেবার সময় সলডার এই সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে ধাতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারে না। ফলে ঝালাই কমজোরী হয়ে যায়। এই সব অসুবিধা দূর করে নিখুঁতভাবে কাজ করবার জন্যে ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়। এটি সলডারকে জোড়ার মুখে উত্তমরূপে গলে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে

বিভিন্ন প্রকার ধাতুর ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ফ্লাক্স বা অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়; যেমন—

(ক) তামা ও পিতলের বেলায়ঃ—স্যালঅ্যামোনিয়াক (Sal-Ammoniac) বা নিশাদল।

(খ) লোহার বেলায়—সোহাগা (Borax)।

(গ) টিন্ড্ আয়রনের বেলায়—রজিন (Rosin)।

(ঘ) দস্তার বেলায়—জিঙ্ক ক্লোরাইড (Zinc Chloride)।

(ঙ) সীসা ও টিনের বেলায়—রজিন অথবা মিষ্টি তেল (Sweet oil)।

সাধারণতঃ ইলেকট্রিক সংক্রান্ত কাজে রজিন ব্যবহার করাই শ্রেয়। উপরিউক্ত ফ্লাক্স বা অ্যাসিডগুলি যে কোন বড় কারিগরি দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যদি অ্যাসিড সংগ্রহ করতে না পার, তাহলে রজিন বা সোহাগা খানিকটা কিনে এনে রেখে দেবে। তাতেই কাজ চলে যাবে।

প্রণালী—এবার ভাঙ্গা বা ফুটা হয়ে যাওয়া অংশটি কি করে জোড়া দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে বলছি।

প্রথমতঃ জোড়ার মুখটি খুব ভাল করে এমারি পেপারের সাহায্যে ঘষে ঘষে পরিস্কার করে নেবে। তারপর ইলেকট্রিক সলডারিং আয়রনের প্লাগটি সুইচবোর্ডে লাগিয়ে দেবে। লক্ষ্য রাখবে, সেটা যেন খুব বেশী উত্তপ্ত না হয়। যথোপযুক্ত গরম হবার পর প্লাগটি খুলে নেবে। এরপর ধাতু অনুযায়ী যে ফ্লাক্স ব্যবহার করবে, তার মধ্যে উত্তপ্ত তাতালের অগ্রভাগটি একটু স্পর্শ করিয়ে সলডারের মধ্যে চেপে ধরলেই তা গলে তাতালের মুখে লেগে যাবে। অতঃপর ঐ অগ্রভাগটি জোড়ার মুখে ঘষলেই ঐ অংশটি গরম হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গলিত সলডারও ঐ স্থানে লেগে যাবে। এই সময়ে যদি মনে কর, সল্ডার গলে ঠিকমত প্রবাহিত হচ্ছে না, তাহলে মধ্যে মধ্যে ফ্লাক্স বা অ্যাসিড প্রয়োগ করা দরকার। তাতালের অগ্রভাগটিও মাঝে মাঝে অ্যাসিড বা অন্য কোন ফ্লাক্সের মধ্যে একটু চেপে ধরা নিয়ম। সলডারিং আয়রন যাতে বেশী গরম না হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ উত্তাপের উপরেই নির্ভর করে উত্তম জোড়। উত্তপ্ত থাকাকালীন তাতালের তাপ এমন হওয়া উচিত, যাতে স্পর্শ করা মাত্র সলডার গলে যথাস্থানে ছড়িয়ে যায়। আবার কম উত্তাপে সলডার গলে প্রবাহিত তো হবেই না, উপরন্তু জোড়ার মুখটিতে ছোট ছোট গর্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

নিয়মিত কয়েক দিন অভ্যাস করলে এটা খুবই সহজ কাজ বলে মনে হবে।

সুনীল সরকার

টেলিভিশন ও বেয়ার্ড

মানুষের আশার যেমন শেষ নেই, তেমনি সফলতারও সীমা আছে বলে সে স্বীকার করে নিতে রাজী নয়। মানুষ কখনই একটি বিশেষ আবিষ্কারকে তার শেষ আবিষ্কার বলে মেনে নেয় নি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার কথাও সে চিন্তা করতে পারে নি কোন দিন, বরং একটা আবিষ্কারকে আর একটা বৃহত্তর আবিষ্কারের সূত্র বা সোপান হিসাবেই গণ্য করে এসেছে এবং তাকে ভিত্তি করেই সে এগিয়ে গেছে নতুন উৎসাহে, প্রবলতর আগ্রহে। সে জন্যেই মানুষের সমাজ, শিল্প, বিজ্ঞান কোন কিছুই আজও স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয় নি। এখনো সে এগিয়ে চলেছে আরো সাফল্য, আরো পূর্ণতার দিকে। ক্যামেরার কথাই ধরা যাক, মানুষ তার প্রিয়জনের স্মৃতিকে ধরে রাখবার আগ্রহে আবিষ্কার করলো ক্যামেরা। কিন্তু ক্যামেরার ছবি চলাফেরা করে না। এই নিশ্চল ছবিকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি বলেই সে উদ্ভাবন করেছিল চলমান নির্বাক ছবির, যাকে আমরা বলি চলচ্চিত্র। তারপর সেই ছবিতে সে যোগ করেছে ভাষা—নির্বাক ছবি হয়েছে সবাক। এর পাশাপাশি সমান পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে বেতার বা রেডিও—মানুষের অবসর সময়ের সঙ্গী। কিন্তু এতেও দেখা দিল একটি ত্রুটি। যে গুণী ব্যক্তিটি তাঁর সঙ্গীত ও অভিনয়ের দ্বারা আমাদের খুসী করছেন, তাঁর কেবল কণ্ঠস্বর শুনেই কি আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে? তাঁকে চাক্ষুষ দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে না? এরই তাগিদে মানুষ আবিষ্কার করেছে টেলিভিশন—যা এই বেতার ও চলচ্চিত্রেরই একটি অপূর্ব সংমিশ্রণ বলা যেতে পারে। এর দ্বারা আমরা যে শুধু কণ্ঠ ও অভিনয় শিল্পীকেই চাক্ষুষ দেখতে পাই তা নয়, খেলাধুলা এবং অন্যান্য বহু শিক্ষামূলক জিনিষও এর মাধ্যমে আজকাল প্রচারিত হচ্ছে। পৃথিবীর সব সভ্য দেশেই টেলিভিশন একটি জনপ্রিয় জিনিষ।

চলচ্চিত্র, ক্যামেরা প্রভৃতি অন্যান্য অনেক জিনিষের মত টেলিভিশনও কেবলমাত্র একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্বের জন্যই বর্তমান রূপ পায় নি। একজন এর মূলনীতি আবিষ্কার করেছেন, তারই উপর গবেষণা করে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন একাধিক ব্যক্তি। তবে একটা জিনিষের মূলসূত্র আবিষ্কারের কৃতিত্ব যে বিজ্ঞানীর, সাধারণতঃ তাঁকেই সেই জিনিষের আবিষ্কারক বলে মেনে নেওয়া হয়। টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এই গৌরব দেওয়া হয় স্কটল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী জন লোগী বেয়ার্ডকে।

মনের জোর ও আত্মবিশ্বাস থাকলে মানুষ কিভাবে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে

শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারে, বেয়ার্ডের জীবনকাহিনী তারই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। প্রায় সারাটা জীবন দারিদ্র্য ও নানা বিরূপ অবস্থার সঙ্গে তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। ১৮৮৮ সালে তাঁর জন্ম। বেয়ার্ডের বাবা ছিলেন একজন ধর্মযাজক। মনে মনে তাঁর হয়তো ইচ্ছা ছিল, ছেলে তাঁর পেশাই গ্রহণ করবে, কিন্তু তিনি দেখতেন বালক জন্ সারাদিন ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়েই ব্যস্ত। তাই স্থানীয় স্কুলে লেখাপড়া শেষ করবার পর ছেলেকে তিনি ভর্তি করে দিলেন রয়্যাল টেকনিক্যাল স্কুলে, তারপর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানকার পাঠ শেষ করে বেয়ার্ড শিক্ষানবীশ হিসেবে প্রবেশ করলেন একটা মোটরের কারখানায়। শিক্ষানবীশ থাকবার সময় তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। প্রায় সারাদিনই তাঁর কেটে যেত সেখানে, খাওয়াও ঠিক সময়ে জুটতো না। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে দেরী হলো না, তাঁর স্বাস্থ্য এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লো, যা পরবর্তী জীবনে কখনই পুনরুদ্ধার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে এর ফলে একটা অমূল্য জিনিষ বেয়ার্ড লাভ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে, কঠোর পরিশ্রম করবার ধৈর্য্য ও মনোবল। কারখানার শিক্ষানবিশী সমাপ্ত করে একটি বৈদ্যুতিক কারখানায় তিনি চাকুরী নিলেন। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে কিছুদিন পরেই সে কাজ তাঁকে ছেড়ে দিতে হলো। বেয়ার্ড বুঝতে পারলেন, এই স্বাস্থ্য নিয়ে কোথাও চাকুরী করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। তাই তিনি বাড়ীতে বসেই কিছু কিছু গবেষণা করবেন বলে স্থির করলেন।

এই সময়ে বেতারের মাধ্যমে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ছবি পাঠাবার জন্যে কয়েকজন বিজ্ঞানী চেষ্টা করছিলেন। এই বিষয়ে জার্মেনীর ওয়েলার ও নিপ্‌কো এবং ইংল্যাণ্ডের সুইণ্টন কিছুটা অগ্রসরও হয়েছিলেন। এঁদের অসমাপ্ত কাজের সূত্র ধরে বেয়ার্ড নতুন করে সুরু করলেন তাঁর পরীক্ষা। কিন্তু তাতেও দেখা দিল একটি বাধা—অর্থাভাব; চাকুরী না থাকায় গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি কেনা তো দূরের কথা, তাঁর পক্ষে তখন দু-বেলা অন্নসংস্থান করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। অর্থের অভাব, ভগ্নস্বাস্থ্য, উপযুক্ত যন্ত্রপাতির স্বল্পতা—ইত্যাদি অনেক অসুবিধাই ছিল; কিন্তু সব কিছুর উর্ধ্বে ছিল বেয়ার্ডের অটুট আত্মবিশ্বাস ও প্রচণ্ড অধ্যবসায়। এরই জোরে একদিন তিনি সফল্য লাভ করলেন—পাশের ঘরে পর্দায় ফুটে উঠলো গবেষণাগারে স্থাপিত একটি বস্তুর প্রতিচ্ছবি—কিছুটা অস্বচ্ছ, কিন্তু ছবির প্রান্তগুলি স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত।

উচ্চাভিলাষী বেয়ার্ড শুধু এটুকুতে সন্তুষ্ট না থেকে প্রতিফলিত ছবিটি আরো উন্নত করবার জন্যে গবেষণা চালাতে লাগলেন। গবেষণা করবার জন্যে চাই উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি; সুতরাং অর্থের অভাব আরো প্রকট হয়ে দেখা দিল। নিজের সহরে অর্থ সংস্থানের আর কোন আশা না দেখে তিনি সব যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে এলেন

লণ্ডন সহরে। ভেবেছিলেন সেখানকার বৈজ্ঞানিক মহলের কাছে কিছু সাহায্য পাবেন। কিন্তু এর ফলে ক্ষতি ছাড়া লাভ হলো না; কারণ নিজের সহরে যদিও বা দু-বেলা অন্ন জুটছিল কোনরকমে, লণ্ডনের অপরিচিত মহলে এসে তাও বন্ধ হবার উপক্রম হলো। কিন্তু অধ্যবসায়ী বেয়ার্ড সব কিছু অসুবিধা অগ্রাহ্য করে চালিয়ে গেলেন তাঁর গবেষণা।

দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রম করে অবশেষে বেয়ার্ড সফল হলেন। স্থির বস্তু থেকে বেশ কিছু দূরে পর্দায় ফুটে উঠলো তার ছবি—পরিষ্কার, স্বাভাবিক। এই সময়কার একটি মজার ঘটনার কথা বেয়ার্ড নিজে উল্লেখ করেছেন। গবেষণাগারে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের ছবি পাশের ঘরে পর্দায় ফুটে ওঠে কিনা, তা দেখবার জন্যে প্রয়োজন একজন লোকের। বেয়ার্ড তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে সামনে দেখতে পেলেন এক ছোকরাকে, পাশের চায়ের দোকানে কাজ করে। অনেক করে বুঝিয়ে বেয়ার্ড তাকে নিয়ে এলেন উপরে। গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে তিনি ছুটে গেলেন পাশের ঘরে। কিন্তু একি? পুরা একটি মানুষের ছবি তো দূরের কথা, পর্দাতে একটি আচড়ও পড়ে নি। বেয়ার্ড হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। তাহলে কি এত দিনের সব পরিশ্রম তাঁর বৃথা হয়ে গেল? বিষণ্ণ চিত্তে ঘরে ফিরে এসে কিন্তু বেয়ার্ড হতভম্ব। তিনি দেখলেন, গবেষণাগারের বিরাট আকৃতির সব যন্ত্রপাতি দেখে ভয় পেয়ে ছোকরা দরজার কাছে সরে গেছে এবং বেয়ার্ড না এসে পড়লে দরজা খুলে সে পালিয়েও যেত। তিনি অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু সে আর কিছুতেই সেই বিদ্ঘুটে যন্ত্রগুলির সামনে যেতে চাইলো না। শেষ পর্যন্ত তাকে মোটা টাকার লোভ দেখাতে তবেই সে রাজী হলো তার ছবি তুলতে দিতে। এই ঘটনার উল্লেখ করে বেয়ার্ড পরবর্তী কালে এক জায়গায় লিখেছেন, পৃথিবীতে প্রথম যার ছবি টেলিভিশনে পাঠানো হয়, স্বেচ্ছায় সে আসে নি, মোটা টাকার ঘুষ দিয়ে তাকে রাজী করানো হয়েছিল।

এর পরের ইতিহাস বেয়ার্ডের নিরবচ্ছিন্ন গৌরবের কাহিনী। ১৯২৬ সালে টেলিভিশনের মাধ্যমে সাদা-কালো ছবি পাঠাবার ব্যাপারে সফল হবার পর বেয়ার্ড আরো গবেষণা চালাতে লাগলেন এবং ১৯৪১ সালে টেলিভিশনে রঙ্গীন ছবি প্রেরণেও সাফল্য অর্জন করলেন। তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতেই বিলেতে প্রথম নিয়মিত টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার সুরু হয়, ১৯৩৬ সালে। ১৯৬৭ সালে বেয়ার্ডের মৃত্যু হয়।

বেয়ার্ডের আবিষ্কৃত পদ্ধতির সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। এর জন্যে যে তিনটি যন্ত্র প্রধান, সেগুলি হচ্ছে নিয়ন বাতি, স্ক্যানিং ডিস্ক এবং আইকোনোস্কোপ। শেষের এই যন্ত্রটি ফটো-ইলেকট্রিক সেলেরই উন্নত সংস্করণ। এর গায়ে অনেকগুলি ফটো-ইলেকট্রিক সেল লাগানো থাকে এবং আলো পড়লেই এথেকে বৈদ্যুতিক

কারেণ্ট উৎপন্ন হয়। স্ক্যানিং ডিস্ক যন্ত্রটা গোল চাক্তির মত। এর গায়ে চারদিকে অনেকগুলি ছিদ্র এমনভাবে সাজানো থাকে, যাতে সেটা একবার ঘোরালে সামনে রাখা কোন ছবি বা দৃশ্যের প্রত্যেকটা অংশ একবার করে সেই ছিদ্রগুলির মুখে আসে। এটি টেলিভিশনের প্রেরক-যন্ত্রে রাখা হয়। আমরা জানি, ছোট ছোট অসংখ্য বিন্দু নিয়ে তৈরি হয় একটি ছবি। এই বিন্দুগুলির ঘনত্বই আমাদের চোখে সেই ছবির ধারণা ফুটিয়ে তোলে। প্রেরক-যন্ত্রে রাখা চাক্তিটার ভিতর দিয়ে পাঠানো তীব্র আর্ক ল্যাম্পের আলো কোন ছবির গায়ে গিয়ে পড়ে এবং প্রতিফলিত রশ্মি আইকোনোস্কোপে লেগে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। ছবিটির উপরকার বিভিন্ন বিন্দুর ঘনত্ব অনুযায়ী তা থেকে প্রতিফলিত আলোর ঔজ্জ্বল্য কম-বেশী হয়, ফলে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের আকৃতিও ছোট-বড় হয়ে থাকে। এই তরঙ্গকে বর্ধিত করে পাঠানো হয় গ্রাহক-যন্ত্রে। সেখানে প্রথমে নিয়ন গ্যাসপূর্ণ একটি ভাল্‌ভ্‌ এবং পরে স্ক্যানিং ডিস্কের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে ছবিটি ফেলা হয় গ্রাহক-যন্ত্রের একটি পর্দায়। তখনই ছবিটি পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

মিনতি সেন

ঝিঁঝিপোকা

ঝিঁঝিপোকা তোমরা হয়তো অনেকেই দেখে থাকবে। আমাদের দেশের অতি পরিচিত ঝিঁঝিপোকার কথাই বলছি। কারণ বিভিন্ন দেশে অনেক রকমের ঝিঁঝিপোকা দেখা যায়। আমাদের দেশের কয়েক রকমের ঝিঁঝিপোকার মধ্যে এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি লম্বা বেশ পরিপুষ্ট সবুজ রঙের ঝিঁঝিপোকার কথাই বলছি। এই জাতের ঝিঁঝি-পোকা পূর্বাঞ্চলেই বেশী দেখা যায়। অন্যান্য জাতের ঝিঁঝিপোকা কদাচিৎ নজরে পড়ে।

শীতের অবসানে বসন্তের সুরু থেকেই এই সবুজ রঙের ঝিঁঝিপোকার আবির্ভাব ঘটতে থাকে। এরা আকারে বেশ বড় হলেও সহজে বড় একটা চোখে পড়ে না; কারণ এদের গায়ের রং পাতার রঙের সঙ্গে বেমালুম মিশে থাকে—কেবল তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ শোনা যায় মাত্র। মাঝে মাঝে কিছুক্ষণ বিরতির পর হাজার হাজার ঝিঁঝিপোকা ঐকতানে বাজনা সুরু করে দেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢেউয়ের মত ওঠা-নামা করে ঐকতান চলতে থাকে। একটানা রিরি শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। যেখানেই যাওয়া যাক, ঝিঁঝিপোকার ঐকতানে বাজনা শোনা যাবেই। প্রথমে একটি পোকা কিট্‌কিট্‌ করে আওয়াজ তোলে, পাঁচ-সাত সেকেণ্ডের মধ্যেই

একদিক থেকে ক্রমশঃ সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বাজনা সুরু হয়ে যায়। একটানা ঘণ্টা দেড়েক পর্যন্ত চলে। তারপর কিছুক্ষণের জন্মে বিরতি। আবার একটি তুটি করে আগের মতই বাজনা সুরু করে দেয়। মাঝে মাঝে ক্বচিৎ কখনও দু-একটি পোকার তাল কেটে যায়। এরূপ অবস্থা ঘটলে সমগ্র অঞ্চলের বাজনা বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই পুনরায় তালমাফিক বাজনা চলতে থাকে। কান বলতে যা বোঝায়, এদের তেমন কোন শ্রবণেন্দ্রিয় না থাকলেও শব্দের অনুভূতি কিন্তু এদের খুবই প্রবল। কারণ পরস্পর পরস্পরের আওয়াজ শুনতে না পেলে ঐকতানে বাজনা সম্ভব হতো না। তাছাড়া আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, এরা মানুষের গান-বাজনায়ও আকৃষ্ট হয়ে থাকে। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই এদের বাজনা বন্ধ হয়ে যায়। সে সময়ে বা রাত্রি বেলায় কেউ গুন গুন করে গান গাইলে, সুর করে ছড়া কাটলে বা কোন বাজনা বাজালে এরা বন-জঙ্গল থেকে উড়ে এসে গায়ে, মাথায় বসে। পূর্বাঞ্চলে অনেক স্থলেই ছেলে-মেয়েরা সন্ধ্যার প্রাকালে বাড়ীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়ে দু-হাতে দু-খানা নারকেলের মালা ঠুকে ঠুকে সুর করে ঝিঁঝিপোকার ছড়া কেটে থাকে। অন্ধকার রাত্রিতে কীট-পতঙ্গ যেমন বাতির আলোয় আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে, এরাও তেমনি গান-বাজনার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসে তাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। অন্ধকারে পথ চিনে আর স্বস্থানে ফিরে যেতে পারে না।

তোমরা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছ—ব্যাঙেরা বর্ষার দিনে কোন জলাভূমিতে সমবেত হয়ে কোরাসে গান গাইতে থাকে। সেটা তাদের প্রজনন ঋতু। এই সময়েই তারা ডিম পাড়ে। ঝিঁঝিপোকারাও সে রকম—এই সময়টাই তাদের প্রজনন ঋতু। পুরুষ ঝিঁঝিপোকারাই শব্দ উৎপন্ন করতে পারে। স্ত্রী-ঝিঁঝিপোকা মোটেই শব্দ করে না। এজন্যে ওদের বলা হয় বোবা-ঝিঁঝি। আগেই বলেছি—অনেক রকমের ঝিঁঝিপোকা আছে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য আছে। কোন কোন জাতের ঝিঁঝিপোকা কীড়া অবস্থায় দীর্ঘকাল মাটির নীচে কাটায়, যেমন—কেউ কেউ ১৭ বছর, কেউবা ১৩ বছর আবার কেউ কেউ এক বছর কীড়া অবস্থায় মাটির নীচে থাকে। আমাদের দেশের এই সবুজ রঙের ঝিঁঝিপোকার কীড়া প্রায় বছরখানেকের মত মাটির নীচে থাকবার পর পরিণত অবস্থায় উপনীত হবার সময় উপরে উঠে আসে। প্রজনন ঋতুতে স্ত্রী-ঝিঁঝিপোকা তার শরীরের পিছনের সূচ্যগ্র ভাগের সাহায্যে পত্র-পল্লবের নরম কাণ্ডের গায়ে ছিদ্র করে তার মধ্যে দশ-বারোটি ডিম পেড়ে রাখে। তারপর সেই কাণ্ডের অন্য স্থানে এবং অপরাপর কাণ্ডেও ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বেরোবার কিছু দিন পরে সেগুলি কাণ্ডের মধ্য থেকে নেমে গিয়ে মাটির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। এখানেই সে খোলস বদ্‌লে ক্রমশঃ বড় হয়ে পুত্তলীর আকার ধারণ করে। পরবর্তী বসন্তকাল আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই

কতকটা চিনাবাদামের আকৃতিবিশিষ্ট ডানাশূন্য পুত্তলিগুলি মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসে যে কোন গাছের গুঁড়ি বেয়ে ৩·৪ ফুট উপরে উঠে শক্তভাবে আঁকড়ে বসে থাকে। বেশ কিছু সময় নিশ্চলভাবে থাকবার পর ঘাড়ের উপর দিকের শক্ত বহিরাবরণটা লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। সেই ফাটলের মধ্য থেকে প্রথমে ঝিঁঝিঁপোকার মুখ এবং ক্রমশঃ পিছনের দিকটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। প্রথমে এদের গায়ের রং অনেকটা সাদা দেখায়, কিন্তু ধীরে ধীরে গাঢ় সবুজ রঙে পরিণত হয়। পুত্তলী অবস্থায় ডানা থাকে না। খোলস থেকে বেরিয়ে আসবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানা বেরিয়ে সেগুলি তরতর করে বেড়ে উঠতে থাকে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ডানা-গুলি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। ডানাগুলি পাত্‌লা সেলোফেনের মত এবং শিরা-বহুল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শরীরটা শক্ত হলেই উড়ে গিয়ে গাছের পাতার মধ্যে আত্মগোপন করে। এদের মুখ একটা শক্ত হুলের মত। এই হুল দিয়েই ঝিঁঝিঁপোকা গাছপালার নরম অংশ থেকে রস চুষে খেয়ে বেঁচে থাকে। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই এদের বাজনা বন্ধ হয়ে যায়—এই পর্যন্তই এদের জীবনকাল।

অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূর্যগ্রহণ

সূর্যগ্রহণের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই তো বছরখানেক আগে একটা খুব বড় রকমের গ্রহণ হয়ে গেল। খবরের কাগজে তাই নিয়ে কয়েক দিন বেশ হৈ চৈও হলো। আগের দিনের লোকেরা কিন্তু গ্রহণ দেখলেই ভীষণ ভয় পেয়ে যেত। তারা গ্রহণের আসল কারণটা জানতো না বলেই তাদের ভয় হতো।

কলম্বাস যখন ভারত আবিষ্কারে বেরিয়ে আমেরিকায় গিয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তারা অজানা দেশের নতুন প্রকৃতির মানুষকে সাদর অভ্যর্থনা না জানিয়ে তাঁর প্রতি নানারূপ দুর্ব্যবহার সুরু করলো। এদের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার জন্যে কলম্বাস এক কৌশল অবলম্বন করলেন। সে দিন সূর্যগ্রহণ হবে, এটা কলম্বাসের জানা ছিল। তিনি তাদের ভয় দেখালেন যে, তারা যদি তাঁকে বিরক্ত করে তবে তিনি সূর্যকে ঢেকে ফেলবেন। এদিকে সূর্যগ্রহণের দরুণ আলোর প্রখরতা কমে গিয়ে ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। ভয় পেয়ে রেড ইণ্ডিয়ানরা তখন কলম্বাসকে সাহায্য করবার জন্যে অগ্রসর হলো। ততক্ষণে গ্রহণের সময় শেষ হয়ে গেছে, সূর্যও ক্রমশঃ

পূর্বের দীপ্তিতে ফিরে আসছে। অশিক্ষিত লোকেরা ভাবলো—কলম্বাসই বুঝি সূর্যকে আবার অনাবৃত করে দিলেন।

এবার আমরা দেখবো গ্রহণ কি? যখন সূর্য কর্তৃক আলোকিত কোন গ্রহ বা উপগ্রহের ছায়া অন্য কোন্ গ্রহ বা উপগ্রহের উপর এসে পড়ে, তখনই গ্রহণের সৃষ্টি হয়। নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রমণকালে যখন সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী এক সরল রেখায় আসে এবং সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চাঁদ অবস্থান করে, তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়বার ফলে সূর্যগ্রহণের সৃষ্টি হয়।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে, সূর্যগ্রহণ ঘটবার জন্যে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদের এক সরল রেখায় আসা দরকার। কিন্তু সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবীর আয়তনের বিশালত্ব মনে রেখে উপরের তথ্যটিকে বিচার করে দেখা দরকার। এদের আকার এত বড় যে, গ্রহণ সংগঠনের জন্যে এদের কেন্দ্রগুলি এক সরল রেখায় না এসে শুধু যদি চাঁদ পৃথিবীর কক্ষতলের কাছাকাছি এসে পড়ে, তবেও সূর্যগ্রহণ হতে পারে।

দেখা গেল যে, চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে আসে, তখন সূর্যগ্রহণ হতে পারে। প্রতি মাসে অমাবস্যার সময় চাঁদ এই অবস্থায় আসে। ফলে সূর্য থেকে নির্গত আলোক রশ্মি পৃথিবীতে আসবার পথে চাঁদ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় ও ছায়ার সৃষ্টি করে। এই ছায়া পৃথিবীর যে সব জায়গায় পড়ে, সেখানকার লোক সূর্যগ্রহণ দেখতে পায়। তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে—তাহলে প্রতি মাসে অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ দেখতে পাই না কেন?

যদি চাঁদ ও পৃথিবীর কক্ষতল দুটি একই তলে থাকতো, তবে প্রত্যেক মাসে একটা সূর্যগ্রহণ হতে পারতো। কিন্তু এই তল দুটি পরস্পর ৫° কোণে নত আছে। এই কারণে প্রত্যেক অমাবস্যায় নয়, শুধু যে অমাবস্যায় চাঁদ পৃথিবীর কক্ষতল ও চাঁদের কক্ষতলের ছেদরেখার উপর আসে, সেই অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয়।

বলয়গ্রাস, খণ্ডগ্রাস ও পূর্ণগ্রাস—এরা সূর্যগ্রহণের রকমভেদ। ছায়ার গঠন
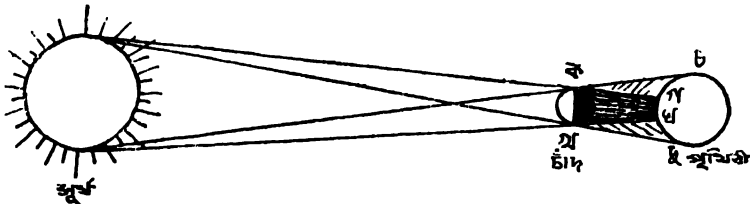
১নং চিত্র
পূর্ণগ্রাস ও খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ

সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখি, যখন আলোকের উৎস বৃহত্তর ও প্রতিবন্ধক ক্ষুদ্রতর হয়, তখন একই সঙ্গে ছায়া ও প্রচ্ছায়ার উৎপত্তি হয়। ১নং চিত্রে সূর্য

আলোকের উৎস ও চাঁদ (ক খ) প্রতিবন্ধক। সূর্য থেকে নির্গত আলোকরশ্মি চাঁদ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ছায়া ও প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি করে। এই ছায়া পৃথিবীর যে সব জায়গায় পড়ে (চিত্রে গ ঘ অংশ) সেখানকার লোক সূর্যের কোন অংশই দেখতে পায় না। তাদের কাছে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হয়। কিন্তু প্রচ্ছায়ার অংশ পৃথিবীর যে সকল স্থানে পড়ে, তারা সূর্যের কিছু কিছু অংশ দেখতে পায়। যেমন, চ গ অংশের লোক সূর্যের উপরিভাগ ও ঘ চ অংশের লোক সূর্যের নিম্নভাগ দেখতে পায়। তারা সূর্যকে একফালি আলোর মত দেখে থাকে। অপর অংশ তাদের কাছে অন্ধকারে ঢাকা বলে মনে হয়; অর্থাৎ এরা সূর্যের খণ্ডগ্রাস গ্রহণ দেখতে পায়। পূর্ণগ্রাস ও খণ্ডগ্রাস গ্রহণের পর অবশিষ্ট বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ। চাঁদের ছায়ার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট। কাজেই চাঁদের ছায়া পৃথিবীর আলোকিত গোলার্ধকে সম্পূর্ণ আবৃত করতে পারে না। ফলে, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সূর্যগ্রহণ দেখতে পাওয়া যায় না। এখন সময়ের তারতম্য অনুযায়ী কোন কোন সময় পৃথিবী ও চাঁদের (ক খ)
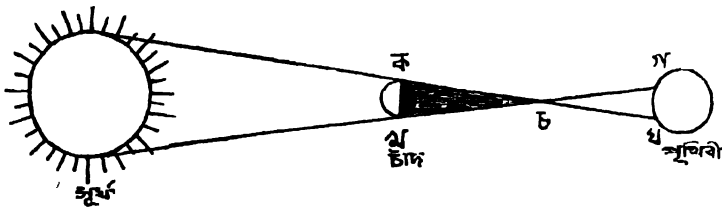
২নং চিত্র
বলয়গ্রাস

মধ্যবর্তী দূরত্ব এমন হয় যে, চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে এসে পড়বার আগেই শেষ হয়ে যায় (২নং চিত্র)। তখন ঐ ছায়া শঙ্কু চ ক খ-কে বাড়িয়ে যে বিপরীত অপসারী শঙ্কু চ ঘ গ পাওয়া যায়, তা পৃথিবীকে স্পর্শ করে। পৃথিবীর যে সব জায়গায় অর্থাৎ গ ঘ স্থানে অপসারী শঙ্কু এসে পৌঁছায়, সেখানকার লোক কালো সূর্যের চারপাশে এক সরু আলোক বেষ্টনী দেখতে পায়। একেই বলে বলয়গ্রাস গ্রহণ।

পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের তুলনায় বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণের স্থায়িত্ব বেশী। সূর্যগ্রহণের তিনটি বিভিন্ন রূপের মধ্যে খণ্ডগ্রাস গ্রহণই অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। বলয়গ্রাসের আলোচনায় বলা হয়েছে, এই সময় চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়কার দূরত্ব অপেক্ষা বেড়ে যায়। এর কারণ কি? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে—বৃত্তাকার পথে নয়। এই কারণে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কখনও বাড়ে, আবার কখনও কমে। আমাদের জানা আছে, বস্তু যতই দূরবর্তী হয়, তার আকৃতি ততই ক্ষুদ্রতর হয়। কাজেই যখন চাঁদ

পৃথিবীর কাছে থাকে, তখন তার আকার পৃথিবীর লোকের কাছে সূর্যকে ঢাকবার উপযুক্ত হয়। কিন্তু যখন চাঁদ দূরগামী—তখন চাঁদের আকার সূর্যকে ঢাকবার উপযুক্ত হয় না এবং সেক্ষেত্রে বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

চাঁদের ছায়ার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় অনেক ছোট। কাজেই এর ছায়া পৃথিবীর খুব কম অংশেই পড়ে। এই ছায়া যে জায়গায় পড়ে, সেখানকার লোক পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখতে পারে।

গোড়াতে তোমাদের বলেছিলাম যে, একদিন সূর্যগ্রহণ মানুষের ভয়ের কারণ ছিল। কিন্তু আজ তা মানুষকে অনেক ব্যাপারে, বিশেষ করে সূর্য সম্বন্ধে গবেষণার ব্যাপারে সাহায্য করছে। পৃথিবীতে আমাদের জীবনধারণের জন্যে সূর্যের উপর কতটা নির্ভর করতে হয়, তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। এথেকেই সূর্য সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়তাও বুঝতে পার, তাই আজও সূর্যগ্রহণের নাম শুনলেই বিজ্ঞানীদের মন নেচে ওঠে এবং তাঁরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটে যান সেখানে, যেখান থেকে গ্রহণের সময় সূর্যকে ভালভাবে দেখা যাবে।*

মহুয়া বিশ্বাস

* বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাপ্তাহিক পাঠচক্রে পঠিত।

স্পঞ্জ

স্পঞ্জের কথা তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান। জীবন্ত স্পঞ্জ না দেখলেও—স্পঞ্জ আমরা অনেকেই নানা কাজে ব্যবহার করি। তাছাড়া স্পঞ্জ শব্দটাও আমাদের অতি পরিচিত। কাগজপত্র ওল্টাতে বা কাগজের কোন কিছু গুণতে অনেকে স্পঞ্জের জলে আঙুলটাকে ভিজিয়ে নেয়—এটি ড্যাম্পার নামে পরিচিত। স্পঞ্জের মধ্যে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ রাখলে—স্পঞ্জ তা শুষে নেয়। আঙুল দিয়ে চাপ দিলেই আঙুল সেই শোষিত জলে বা তরল পদার্থে ভিজে যায়।

বহু বছর যাবৎ জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে—স্পঞ্জ উদ্ভিদ, না প্রাণী—এই নিয়ে মতভেদ ছিল। কেউ বলতেন উদ্ভিদ, আবার কেউ বলতেন প্রাণী। পরে অবশ্য নানা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়—স্পঞ্জ উদ্ভিদ নয়—প্রাণী শ্রেণীভুক্ত। স্নানের সময় আমরা যে শুষ্ক স্পঞ্জ ব্যবহার করি, তার এক টুক্রা আগুনে পোড়ালে বাদামী রঙের ধোঁয়া বেরোয় এবং পালক বা শিং আগুনে পুড়লে যে রকম গন্ধ বেরোয়, ঠিক সে রকম গন্ধ বেরোয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে—স্পঞ্জের উপাদানের সঙ্গে রেশমের উপাদানের মিল আছে। তাছাড়া স্পঞ্জ প্রাণীদের মতই শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং নড়াচড়া করে। যদিও প্রাণীদের মত এদের চোখ, মুখ, মস্তিষ্ক, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতি নেই। তোমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পার—স্পঞ্জকে উদ্ভিদ বলে ভাবা হতো কেন? ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ (যা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না) জলস্রোতের সঙ্গে স্পঞ্জের দেহের মধ্যে ঢুকে যেত—এতে রং হতো সবুজাভ। এথেকেই মনে করা হতো—স্পঞ্জ উদ্ভিদ।

স্পঞ্জকে কাটলে দেখা যায়—এর মধ্যে অনেকগুলি গোলাকৃতি কক্ষ আছে এবং কক্ষগুলি পরস্পর নালীর দ্বারা সংযুক্ত। স্পঞ্জের শরীরের উপরিভাগে এবং নিম্নভাগে অসংখ্য ছিদ্র আছে। উপরের ও নীচের ছিদ্রগুলি পরস্পর সংযুক্ত। স্পঞ্জের দেহের উপরিভাগের বৃহত্তর ছিদ্রটিকে বলা হয় অস্‌কুলা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রপথের মধ্য দিয়ে জলস্রোত স্পঞ্জের মধ্যে ঢোকে এবং বড় ছিদ্রটি অর্থাৎ অস্‌কুলা দিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। এভাবেই ক্রমাগত জল স্পঞ্জের দেহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। জীবনধারণের জন্যে এই জল-প্রবাহ স্পঞ্জের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এর ফলে এরা জলের মধ্যস্থিত অক্সিজেন শ্বাসক্রিয়ার জন্যে গ্রহণ করে। আর জলস্রোতের মধ্যস্থিত খাদ্যকণা অর্থাৎ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ পদার্থ দেহসাৎ করে পরিপুষ্টি লাভ করে। এদের শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ বর্জনীয় পদার্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। এই ভাবেই স্পঞ্জ জীবনধারণ করে। ডাঃ গ্রাণ্ট নামক জনৈক বিজ্ঞানী এই সব তথ্য আবিষ্কার করেন। ডাঃ হেগনারের মতে—প্রতিদিন প্রায় ৪৫ গ্যালন পরিমিত জল একটা সাধারণ আকৃতির স্পঞ্জের শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। স্পঞ্জের শরীরের উপরিভাগে চুলের মত সরু উপাঙ্গ আছে—এগুলি ফ্লাজেলা নামে পরিচিত। এই ফ্লাজেলার দ্বারাই স্পঞ্জ জলস্রোত তার শরীরের মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত করে।

স্পঞ্জের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ শ্রেণীবিভাগ আছে। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে স্ত্রী-স্পঞ্জ ডিম পাড়ে। কিছুদিন বাদে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। বাচ্চা অবস্থায় এরা সাঁতার কেটে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে। কিছু দিন বাদে এরা পূর্ণাঙ্গ স্পঞ্জে রূপান্তরিত হয়ে সমুদ্রের তলদেশে কোন কিছুতে লেগে থাকে।

সমুদ্রই এদের বাসস্থান। অসংখ্য স্পঞ্জ দলবদ্ধভাবে অর্থাৎ উপনিবেশ তৈরি করে বসবাস করে। সমুদ্রের জলের নানা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে স্পঞ্জ তার দেহের চারদিকে একটা কঠিন আবরণ বা খোলস তৈরি করে।

মাছ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে স্পঞ্জের এই খোলসের প্রয়োজন। বাজারে ব্যবহার্য স্পঞ্জ এবং জীবন্ত স্পঞ্জের মধ্যে মূলতঃ কোন সাদৃশ্য নাই। স্পঞ্জের এই খোলস বা কঙ্কালটা স্পঞ্জিন নামে পরিচিত। এই খোলস বা স্পঞ্জিনই

আমরা ব্যবহার করি। জ্যান্ত স্পঞ্জ চটচটে আঠালো পদার্থের মত মনে হয়। এদের দেহের রং ও আকৃতি নানা রকমের হয়। হাল্কা ধূসর, উজ্জ্বল হলুদ, বাদামী, কমলা, কালো, সাদা প্রভৃতি নানা রং এদের মধ্যে দেখা যায়। আর তীর ও ধনুক, ছোট বর্শা, চাকা, লৌহদণ্ড, কাঁটা ইত্যাদির মত নানা আকৃতি বিশিষ্ট হয়। এই আকৃতি অনুযায়ী স্পঞ্জের শ্রেণীবিভাগ ও নামকরণ হয়ে থাকে।

স্পঞ্জের আকৃতি ও রং অনুযায়ী তার মূল্য ঠিক হয়। খসখসে স্পঞ্জের তুলনায় কোমল স্পঞ্জের চাহিদা বেশী। স্পঞ্জের মধ্যে বালির ভাগ বেশী থাকলে তা খসখসে হয়।

আজকাল ডুবুরীরা আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হয়ে প্রচুর পরিমাণে স্পঞ্জ সংগ্রহ করে থাকে। সমুদ্র থেকে স্পঞ্জ সংগৃহীত হবার পর তা ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপর খোলস থেকে আঠালো পদার্থ অর্থাৎ মাংসপিণ্ডটাকে পৃথক করে ফেলা হয়। তারপর আবার খোলসটাকে ভাল করে জলে ধুয়ে কড়া রোদে শুকিয়ে বাজারে পাঠানো হয়ে থাকে। বহু লোক স্পঞ্জের ব্যবসায়ের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। আজকাল কৃত্রিম উপায়েও স্পঞ্জের চাষ হচ্ছে। কিন্তু স্পঞ্জের চাষ খুব সময়সাপেক্ষ। সে জন্যে কৃত্রিম চাষ আশানুরূপ সফল হয় নি। কৃত্রিম উপায়ে চাষ করে স্পঞ্জ বাজারে বিক্রয়ের জন্যে পাঠাতে ৬।৭বছর সময় লাগে। এর মধ্যে নানা প্রতিকূল অবস্থায় স্পঞ্জ নষ্ট হয়ে যায় অথবা সামুদ্রিক প্রাণী বা মাছ সেগুলি খেয়ে ফেলে।

ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণীর আশ্রয় স্থল হচ্ছে স্পঞ্জ। এক জাতীয় সামুদ্রিক কাঁকড়া তার পায়ের সাহায্যে স্পঞ্জকে পিঠের উপর চেপে রেখে চলাফেরা করে। এর কারণ হচ্ছে তার আসল চেহারা শত্রুর নজরের আড়ালে রাখা। কোন কোন স্পঞ্জ ঝিনুকের ভীষণ ক্ষতি করে। সে জন্যে ঝিনুক-চাষীরা স্পঞ্জের আক্রমণ থেকে ঝিনুককে রক্ষা করবার জন্যে নানা ব্যবস্থা করে। এই সব স্পঞ্জ ঝিনুকের খোলা ঝাঁঝরা করে দেয়।

আজ পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার রকমের স্পঞ্জের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন। অনেক দেশ থেকে স্পঞ্জ সংগ্রহ করা হলেও—প্রধানতঃ ভূমধ্যসাগর অঞ্চল থেকেই পৃথিবীর নানা দেশে স্পঞ্জ বিক্রয়ের জন্যে চালান দেওয়া হতো। প্রাচীন কাল থেকেই একদল লোক ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্পঞ্জের ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল। তারপর বাহামা দ্বীপপুঞ্জ থেকে স্পঞ্জের চালান বাড়তে থাকে।

স্পঞ্জের দ্বারা রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী ইত্যাদি পরিষ্কার করা হয়। ডেকরেটর, মৃৎশিল্পী, চিত্রকরদেরও নানা কাজে স্পঞ্জের প্রয়োজন হয়। কলকারখানা ও গৃহস্থালীর নানা কাজে স্পঞ্জ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পশ্চিম আটলাণ্টিকের সিপ্‌স্‌-উল বা উল স্পঞ্জ, ইয়েলো স্পঞ্জ, জামাইকার ভেলভেট স্পঞ্জ, ফ্লোরিডার নানা রকমের গ্রাস স্পঞ্জের মধ্যে অ্যাক্লোট গ্রাস স্পঞ্জ, গ্লোভ স্পঞ্জ, বাহামার রীফ স্পঞ্জ এবং বাহামা, কিউবা ও হণ্ডুরাসের হার্ডহেড স্পঞ্জ, ভূমধ্যসাগরের টার্কি সলিড স্পঞ্জ ও টার্কি টয়লেট স্পঞ্জ, জিমোকা স্পঞ্জ, হানিকুম্ব বা বাথ স্পঞ্জ, এলিফ্যাণ্ট ইয়ার স্পঞ্জ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি আমাদের নানা কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শ্রীঅনিল চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) সুদূর ভবিষ্যতে যদি কোন আকস্মিক কারণে সূর্যের দীপ্তি হঠাৎ নিবে যায়, তখন পৃথিবীর কি অবস্থা হবে?

(খ) কোন পদার্থ তেজস্ক্রিয় হয় কি কারণে? সব পদার্থ তেজস্ক্রিয় হয় না কেন?

মিতা চৌধুরী, বর্ধমান

প্রঃ ২। (ক) হীরক, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি রাত্রির অন্ধকারে আলো দেয় কেন? এই আলো কোথা থেকে এরা পায়?

(খ) প্যাঁচা, বাদুড় দিনের বেলায় দেখতে পায় না, কিন্তু রাত্রিতে দেখতে পায় কেন ও কিরূপে?

(গ) রেডিও কেন্দ্রের অনুষ্ঠান কি করে প্রচারিত হয় এবং রেডিও কি করে তা গ্রহণ করে?

শ্রীদামচন্দ্র দেবনাথ, নদীয়া

প্রঃ ৩। এমন কি পদার্থ আছে, যা প্রচণ্ড তাপ সহ্য করতে পারে?

হিমু দেবনাথ, শিবপুর

উঃ ১। (ক) সূর্যের আলো এবং উত্তাপ পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য। তাই সূর্য হঠাৎ নিবে গেলে অনতিবিলম্বে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যাবে। এদিকে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে নেমে আসবে ভীষণ শৈত্য, আর পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজ করবে চিররাত্রির অন্ধকার।

(খ) পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার লক্ষণ হচ্ছে—পদার্থটি থেকে আল্‌ফা, বিটা কণিকা

এবং গামা রশ্মির নির্গমন। এদের মধ্যে আল্‌ফা কণিকা হচ্ছে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রনের দ্বারা গঠিত। বিটা কণিকা হচ্ছে ইলেকট্রন আর গামা রশ্মি হচ্ছে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গমালার অন্তর্গত। আবার আমাদের এও জানা আছে যে, প্রতিটি পরমাণুই ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের দ্বারা গঠিত। ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু থেকেই ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন বেরিয়ে আসছে আল্‌ফা ও বিটা কণিকারূপে।

এরা বিশেষভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই বের হচ্ছে—অন্য পদার্থ থেকে বের হচ্ছে না কেন—এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের ধারণা এখনও খুব স্পষ্ট নয়। মোটামুটি যেটা ধরে নেওয়া হয়েছে, তাথেকে বলা যায় যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুর আভ্যন্তরীণ বন্ধন সাধারণ পদার্থের পরমাণুর মত সুদৃঢ় নয়। প্রতি মুহূর্তেই অভ্যন্তরে বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের কতকগুলি পরমাণু ভেঙ্গে যায়। ফলে প্রচণ্ড বেগে আল্‌ফা ও বিটা কণিকা বেরিয়ে আসে। অ-তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুগুলি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ় বলেই সেখানে এই ধরণের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে না। ফলে তাথেকে কোন তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় না।

২। (ক) এদের ঔজ্জ্বল্যের কারণ কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন। হীরকের ঔজ্জ্বল্যের কারণ তার অত্যধিক প্রতিসরণ ক্ষমতা। রাত্রিতে অন্ধকার হলেও কিছুটা আলো সব সময়ে সব জায়গাতেই থাকে। পাশাপাশি একখণ্ড হীরক ও কাচ রাখলে কাচের উপর একটি বিশেষ কোণে পতিত আলোক-রেখা সামান্য প্রতিসরিত হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে—দর্শকের চোখে এসে পড়বে না। তাই কাচটিকে দেখা যাবে না। কিন্তু অনুরূপ অবস্থায় হীরকের উপর পতিত আলো অতিমাত্রায় প্রতিসরিত হয়ে আবার ফিরে এসে দর্শকের চোখে পড়ে। ফলে হীরকটি অন্ধকারের মধ্যেও জ্বল্ জ্বল্ করে।

ফস্‌ফরাসের ঔজ্জ্বল্যের কারণ বাতাসের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বাতাসের অক্সিজেনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ফস্‌ফরাসের অক্সিডেশন হয়। এই অক্সিডেশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো বিকিরিত হয়ে থাকে।

(খ) প্যাঁচা, বাদুড় দিনের বেলায় দেখতে পায় না—এই কথাটা ভুল। এরা নিশাচর হয়েছে অন্য কারণে। যে সব খাদ্যের উপর এদের নির্ভর করতে হয়—যেমন, নানা জাতীয় পোকা, ব্যাং, ইঁদুর ইত্যাদি—সেগুলি রাত্রিতেই সহজলভ্য।

প্যাঁচা দিনের বেলায় বেশ ভালভাবেই দেখতে পায়। কয়েক শ্রেণীর প্যাঁচা (Hawk owl, Snowy owl প্রভৃতি) নিয়মিতভাবে দিনের বেলায় ঘুরে বেড়ায়। ভুল ধারণাটা সম্ভবতঃ এসেছে কোন কোন জাতীয় প্যাঁচার নির্বুদ্ধিতার জন্যে। তারা খুব সহজেই মানুষের কাছে দিনের বেলায় ধরা পড়ে। তবে রাত্রিতে

চলাফেরা ও শিকার ধরবার সুবিধার জন্যে প্যাঁচার চোখ কিন্তু একটু বিশেষভাবে গঠিত—ঠিক অন্য পাখীদের মত নয়। চোখগুলি খুব বড় বড়। চোখের অভ্যন্তরে রেটিনা—যেখানে দৃশ্য বস্তুর ছায়া পড়ে, সেটি অত্যধিক বৃহৎ। ফলে সামান্যতম আলোক রশ্মিকেও সে কাজে লাগাতে পারে।

বাদুড়ের ব্যাপারটা কিন্তু একটু অন্য রকম। সে দিন-রাত কোন সময়ই খুব ভালভাবে চোখে দেখতে পায় না। চলাফেরার জন্যে এরা চোখকে বেশী কাজে লাগায় না। এরা মুখ দিয়ে এক ধরণের শব্দ করে। এই শব্দ অত্যধিক কম্পন-সংখ্যাযুক্ত। ফলে আমরা তা শুনতে পাই না। শব্দ-তরঙ্গগুলি গাছপালা, দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। বাদুড়ের কান এই শব্দের প্রতি এত সচেতন যে, প্রতিফলিত শব্দ থেকেই সে বুঝতে পারে—সামনে কি আছে। এর উপর নির্ভর করেই বাদুড় চলাফেরা করে। চোখের উপর তার ভরসা কম।

(গ) রেডিও কেন্দ্রে যখন কেউ গান গায় বা বাজনা বাজায় অথবা বক্তৃতা প্রদান করে, তখন বাতাসে যে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, মাইক্রোফোন যন্ত্রের সাহায্যে তাকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয়ে থাকে। এরপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে চাপিয়ে দেওয়া হয় পৃথকভাবে সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গের ঘাড়ের উপর এবং রেডিও কেন্দ্রে অবস্থিত এরিয়াল থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাবে বেতার-তরঙ্গের ঘাড়ে চেপে বিদ্যুৎ-তরঙ্গরূপী শব্দ-তরঙ্গ আকাশ পথে চলে যায় পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে।

আমাদের বাড়ীর ছাদের উপর একটি তার দিয়ে তৈরি যে এরিয়াল আছে, তাতে এসে ঐ তরঙ্গমালা ধাক্কা দেয়। ফলে তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকে। তারের মাধ্যমে তরঙ্গমালা চলে আসে ঘরের মধ্যে অবস্থিত গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যে। এখানে এসে বিপরীত প্রক্রিয়া সুরু হয়; অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গের ঘাড় থেকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে নামিয়ে আনা হয়। এভাবে পৃথকীকৃত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ লাউড স্পীকারের মধ্যে পাঠিয়ে দিলেই সেখান থেকে সে শব্দ করে উঠবে। যন্ত্রপাতি সব ঠিক ভাবে কাজ করলে এবং পথে কোথাও গোলমাল না থাকলে এই শব্দ হবে রেডিও কেন্দ্রে মাইক্রোফোনের সামনে সৃষ্ট শব্দের একেবারে অনুরূপ।

৩। টাংষ্টেন নামক একটি ধাতু আছে, যা প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করতে পারে। এর গলনাঙ্ক ৩৩৭০° সেঃ। ইলেকট্রিক বাতিতে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

দীপক বসু

বিবিধ

পরলোকে অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ ২রা জুলাই তাঁহার কলিকাতাস্থিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৭ বৎসর।

১৮৯০ সালে ময়মনসিংহ (অধুনা পূর্বপাকিস্তান) জেলার টাঙ্গাইলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে এম এ. পরীক্ষায় গণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ১৯১৩ সালে তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে লেক্‌চারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ফলিত গণিত বিভাগে লেক্‌চারার হিসাবে যোগদান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি অর্ধশতাব্দীকাল স্নাতকোত্তর (কলা) বিভাগের সেক্রেটারী, পরীক্ষাসমূহের কন্ট্রোলার, কলেজসমূহের পরিদর্শক এবং রেজিষ্ট্রার হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬৬ সালে অবসর গ্রহণের সময় পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ থাকাকালে উপাচার্যের অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দুই বার তিনি কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হিসাবে কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক ঘোষ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।

চাঁদ এখনও বহু দূরে

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্নিয়া) থেকে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলন করতে পারে, এমন কোন পাথরের নুড়ি চাঁদের দেহে ছড়ানো আছে কি? যদি থাকেই তবে মানুষের চাঁদে অবতরণের পথে আর একটি সমস্যা দেখা দেবে। ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানীরা অন্ততঃ তাই আশঙ্কা করছেন।

চলতি বছরের গোড়ার দিকে সারভেয়ার-৩-কে যখন চাঁদে পাঠানো হয়, তখন সেটি সেখানকার ভূমি স্পর্শ করেই দু-দুবার লাফিয়ে উঠেছিল। কারণটি যে কি, বিজ্ঞানীরা তা বুঝে উঠতে পারেন নি। পৃথিবীতে বসে আবার গবেষণা সুরু হলো। প্রশ্ন উঠলো, চাঁদের প্রান্তর জুড়ে এমন কোন নুড়ি ছড়ানো আছে কি, যা আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত করতে পারে? নইলে তার রেডার যন্ত্র ও অন্য কয়েকটি যন্ত্র অকস্মাৎ বিকল হয়ে গেল কেন? বিপরীত-গতি রকেটটিই বা এমন অবাধ্য হয়ে উঠলো কেন?

সারভেয়ার-৪ আবার চাঁদে গেছে—উদ্দেশ্য, মানুষের চাঁদে অবতরণের পথ সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু বড় কথা হলো—সত্যই সেখানে এমন কোন পাথরের টুক্‌রা রয়েছে কিনা, যা অলক্ষ্যে মহাকাশযানের কলকব্জা বিকল করে দিয়ে চাঁদকে চিরকালই মানুষের ছোঁয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

খাদ্য হিসাবে তুলাবীজের তেলের ব্যবহার

তুলাবীজের তেল খাদ্য হিসাবে ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যায় কি না—সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় নি। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে পাঁচ বছরের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

এই পরিকল্পনা অনুসারে ঐ সকল বীজ থেকে

তেল নিষ্কাশনের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হবে। বর্তমানে যে পদ্ধতি চালু আছে, তাতে যথেষ্ট পরিমাণ তেল নিষ্কাশিত হয় না। ভারতে প্রায় ২ কোটি একর জমিতে তুলার চাষ হয়ে থাকে। এই পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ পৃথিবীর আর কোথাও হয় না।

হোভার বেডের উপর আগুনে-পোড়া রোগীর চিকিৎসা

এই প্রথম দুজন রোগীকে হোভার বেডের উপর রেখে সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা করা হলো। আগুনে-পোড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্যে উদ্ভাবিত এই হোভার বেডের উত্তপ্ত বাতাসের কুশনে শুইয়ে রেখে রোগীদের চিকিৎসা করা হয়।

চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা ল্যানসেট-এ এই পরীক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি ইনষ্টিটিউট অব অর্থোপেডিক্স এবং মাউণ্ট ভেরনন হসপিটাল-এর ডাক্তারেরা ও হোভার-ক্র্যাফট ডেভেলপম্যাণ্ট লিমিটেড-এর এক ইঞ্জিনীয়ার (যিনি এই সরঞ্জামটি তৈরি করেছেন) যৌথভাবে লিখেছেন।

ডাক্তারেরা জানিয়েছেন যে, এই দুজন রোগীর ক্ষেত্রেই পোড়া অংশ অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে এবং রোগীদের সেবার কাজও সহজ হয়।

এই সাফল্যের পর ন্যাশন্যাল রিসার্চ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন একটি দুই সংখ্যাবিশিষ্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইউনিট নির্মাণের সিদ্ধান্ত করেছেন।

হোভার বেডে রয়েছে একটি দৃঢ় কাঠামো, যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট কৃত্রিম রাবারে মোড়া হাল্কা নাইলনের তৈরি ব্যাগ থাকে। ব্যাগের উপর থাকে দুই সারি পকেট। পকেটগুলিকে জীবাণুমুক্ত উত্তপ্ত বাতাসের দ্বারা স্ফীত করলে তারা শয্যার মাঝামাঝি এসে মিলে যায়। রোগীকে শয্যায় শুইয়ে দিলে পকেটগুলির মুখ রোগীর দেহে ঢাকা পড়ে যায় এবং রোগী প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাতাসের উপর ভাসতে থাকে।

বিস্ময়কর ধান—আই. আর. ৮

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—উচ্চ ফলনক্ষম আই. আর. ৮ ধানকে বিস্ময়কর ধান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ এর ফলন সবচেয়ে বেশী।

ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি দিল্লীতে কয়েক শ্রেণীর ধান নিয়ে চাষ-আবাদ করে। উপরিউক্ত শ্রেণীর ধান চাষ করে প্রতি হেক্টরে নিট আয় হয়েছে ৪২৪৫ টাকা। আর তাইচুং দেশী ১ এবং এন. পি. ১৩০ চাষ করে প্রতি হেক্টরে আয় করা গেছে যথাক্রমে নিট ২৮৩৭ টাকা ও ২৩৭৭ টাকা।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

২। অরুণকুমার রায়চৌধুরী
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৩। প্রবীর সেনগুপ্ত
ইরসেট (I. R. S. E T.)
Hotel-2
Secundrabad-17
Andhra Prodesh

৪। শ্রীসতীন্দ্রকিশোর গোস্বামী
Dept. of Food Technology
&
Biochemical Engineering
Jadavpur University
Calcutta-32

৫। শ্রীঅমলকুমার মৈত্র
অবধায়ক—ডাঃ ডি. গাঙ্গুলী
২১।১এ, ফার্ণ রোড
কলিকাতা-১৯

৬। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র
১৭৫।এ, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

৭। সুনীল সরকার
B. P. C. Junior Technical School
P. O Krishnagar
Nadia

৮। মিনতি সেন
অবধায়ক—পরেশনাথ সেন
ব্যারাকপুর, ২৪ পরগণা

৯। মহুয়া বিশ্বাস
১৫।বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট (দোতলা)
কলিকাতা-৯

১০। শ্রীঅরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫ ও ৭ নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-১

১১। শ্রীঅনিল চক্রবর্তী
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৩

৯। দীপক বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

১৩। শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৫৯।বি, বকুল বাগান রোড
কলিকাতা-২৫

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ | নবম সংখ্যা

বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ

বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি

বেতার, তাপ, আলোক, অতিবেগুনী রশ্মি, রঞ্জেন রশ্মি ও গামা রশ্মিকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তি বলে। এদের মধ্যে কেবল তাপ ও আলোক মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, অন্যগুলি নয়। বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচলনের বাহকরূপে যেমন ধাতব তার বা অপর কোনও পরিবাহকের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির স্থানান্তরণে তার প্রয়োজন নেই। স্বতঃ-সঞ্চালিত বলে এদের স্থানান্তরণকে বিকিরণ বলা হয়।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির বিকিরণ প্রবাহিত হয় তরঙ্গের আকারে। পর পর দুটি ঢেউয়ের চূড়ার মধ্যে যে ব্যবধান, তাকে বলে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কয়েক সহস্র মিটার থেকে এক সেন্টিমিটারের এক শত কোটি ভাগের এক ভাগের চেয়েও ক্ষুদ্রতর হতে পারে। তরঙ্গগুলিকে পর পর সাজিয়ে সুরু থেকে কয়েকটি সীমায় ভাগ করে নিলে এক-এক ভাগে এক-এক জাতীয় রশ্মির বিকিরণ পাওয়া যায়। দীর্ঘতম তরঙ্গের দিক থেকে আরম্ভ করলে প্রথম ভাগে বেতার, দ্বিতীয় ভাগে অবলোহিত, তৃতীয় ভাগে আলোক, চতুর্থ ভাগে অতিবেগুনী, পঞ্চম ভাগে রঞ্জেন রশ্মি এবং ষষ্ঠ ভাগে গামা রশ্মি।

রশ্মিসমূহের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ক্ষুদ্র, তারা তত শক্তিশালী। গামা-রশ্মি মানুষের পক্ষে মারাত্মক। বেতার রশ্মি নিরীহ, মানুষের পক্ষে মোটেই বিপজ্জনক নয়। নিম্নে বিভিন্ন রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সীমা দেওয়া হলো।

রশ্মির শ্রেণী-বিভাগ	তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য
বেতার রশ্মি (Radio)	কয়েক সহস্র মিটার থেকে আরম্ভ করে এক সেন্টিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ।
অবলোহিত রশ্মি (Infra-red)	এক সেন্টিমিটারের দশমাংশ থেকে আরম্ভ করে এক লক্ষ ভাগের আট ভাগ, অর্থাৎ $১০^{-১}$ থেকে ৮×১০^{-৫} সেন্টিমিটার।
আলোক রশ্মি (Light)	সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের আট ভাগ থেকে আরম্ভ করে এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ, অর্থাৎ ৮×১০^{-৫} থেকে ৪×১০^{-৫} সেন্টিমিটার।
অতিবেগুনী রশ্মি (Ultraviolet)	সেন্টিমিটারের এক লক্ষ ভাগের চার ভাগ থেকে আরম্ভ করে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ ৪×১০^{-৫} থেকে $১০^{-৬}$ সেন্টিমিটার।
রঞ্জেন রশ্মি (X-rays)	সেন্টিমিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ থেকে আরম্ভ করে একশত কোটি ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ $১০^{-৬}$ থেকে $১০^{-৯}$ সেন্টিমিটার।
গামা রশ্মি (γ-rays)	সেন্টিমিটারের এক শত কোটি ভাগের একভাগ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর।

মহাকাশে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কের অত্যধিক তাপমাত্রার দরুণ ও অন্যান্য কারণে বিদ্যুৎ-চৌম্বক শক্তির সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে তাদের অবস্থা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উক্ত রশ্মিসমূহের বিকিরণ হয়। এদের মধ্যে যেগুলি পৃথিবীর অভিমুখে আসে, তাদের অধিকাংশই পৃথিবীর আবহমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে না, আবহমণ্ডল ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে শোষণ করে নেয়, বৃহৎ তরঙ্গগুলি আয়নোস্ফিয়ারের উপর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে চলে যায়। সুতরাং সামান্য একটি ভগ্নাংশ মাত্র আবহমণ্ডলের ভিতর দিয়ে এসে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছুতে পারে। এই ভগ্নাংশ হচ্ছে বেতার-তরঙ্গের কিয়দংশ ও আলোক-তরঙ্গের সম্পূর্ণাংশ। তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর আবহমণ্ডল-রূপ কম্বলের আবরণে দুটি ফাঁক বা জানালা আছে। একটি জানালা দিয়ে ভূপৃষ্ঠে কিছু বেতার-রশ্মি আসে এবং অন্য জানালা দিয়ে ভূপৃষ্ঠ পায় আলোক রশ্মি। (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। যে সব বেতার-রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এক সেন্টিমিটার থেকে আরম্ভ করে ১০ মিটার, সাধারণতঃ তাদের ধরেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়।

বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে মহাকাশে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণের নাম বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞান (Radio Astronomy)। ইতিপূর্বে হাজার হাজার বছর ধরে জ্যোতিষ-চর্চার প্রধান অবলম্বন ছিল দর্শনেন্দ্রিয় এবং দৃষ্টিশক্তি-সহায়ক যন্ত্রপাতি। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রপাত আধুনিক কালে। ১৯৩২ সালে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ইয়ানস্কী ভূপৃষ্ঠে মহাকাশের বেতার-তরঙ্গের সন্ধান পান। তারপর থেকে বিজ্ঞানীরা গবেষণায় সুকৌশলে মহাকাশের বেতার-তরঙ্গ ধরে ও বিশ্লেষণ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

মহাকাশ পর্যবেক্ষণে বেতার-তরঙ্গ দুই প্রণালীতে নিয়োজিত হয়—(১) ভূপৃষ্ঠ থেকে বেতার-তরঙ্গ পাঠিয়ে তাকেই প্রতিফলিত করে

ফিরিয়ে নিয়ে আসা; এবং (২) মহাকাশের জ্যোতিষ্কাদি থেকে যে সব বেতার-তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়, উপযুক্ত ব্যবস্থায় ভূপৃষ্ঠে তাদের ধরা। প্রথমটিতে রেডার নামক যন্ত্র এবং দ্বিতীয়টিতে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। রেডারের বেতার-তরঙ্গ গবেষকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু এর পরীক্ষা-ক্ষেত্রের ব্যাপ্তি বেশী দূর নয়। বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে আগন্তুক তরঙ্গ গবেষকের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, কিন্তু পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারী। বর্তমান কালের বৃহত্তম দূরবীক্ষণের দৃষ্টিসীমা পেরিয়েও বেতার দূরবীক্ষণের পর্যবেক্ষণ-ক্ষেত্র বিস্তৃত।
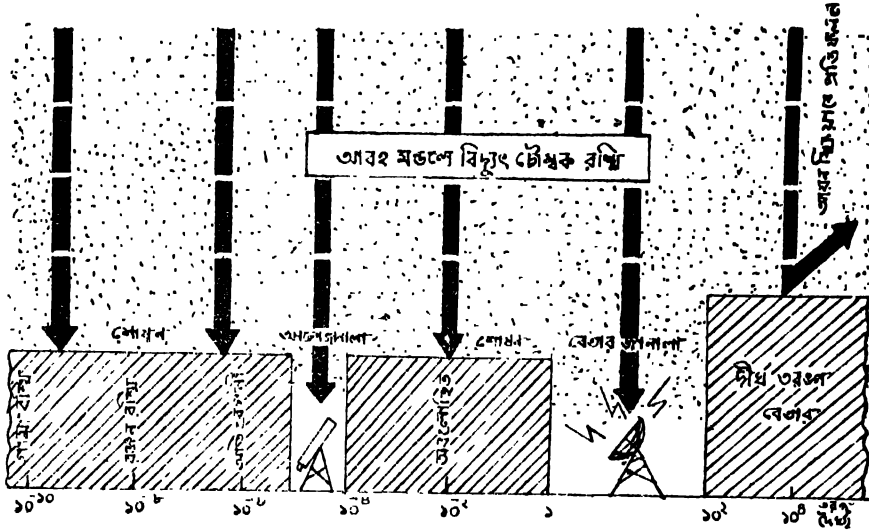
১নং চিত্র
আলো-জানালা ও বেতার-জানালা।

রেডার

ফাঁকা মাঠে বোমা ফাটালে অনতিদূরের চারতলা বাড়ীর দিক থেকে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। শব্দ বাতাসে তরঙ্গ তোলে। বাতাসে উত্থিত শব্দ-তরঙ্গ বাড়ীর দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে—সেটাই প্রতিধ্বনি। বাতাসে শব্দের গতি প্রতিসেকেণ্ডে ১১২০ ফুট। ধরা যাক, বোমা ফাটানো ও তার প্রতিধ্বনি পাওয়ার মধ্যে ছয় সেকেণ্ড সময়ের ব্যবধান। তাহলে শব্দের যাওয়া ও আসায় ৬ সেকেণ্ড সময় লেগেছে। অতএব বাড়ীর দেয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে শব্দ ৩ সেকেণ্ড সময় নিয়েছে। সুতরাং ঘটনাস্থল থেকে বাড়ীর দেয়ালের দূরত্ব ৩ × ১১২০ অর্থাৎ ৩৩৬০ ফুট।

একটি প্রদীপ জ্বালানো হলো—সঙ্গে সঙ্গে দূরের জিনিষটি দেখা গেল। জিনিষটি থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে এল বলেই সেটি দেখা গেল। এক্ষেত্রেও আলোর যাতায়াতে যত অল্পই হোক, কিছুটা সময় লেগেছে। কিন্তু আলোর তরঙ্গের গতি প্রতিসেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল, অর্থাৎ এত দ্রুত যে, কিছুটা সময় যে লেগেছে, তা মোটে বোঝাই গেল না—অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া বোঝবার উপায়ও নেই। জিনিষটি থেকে প্রতিফলিত রশ্মি ফিরে আসতে যে সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তা যদি পরিমাপ করা যেত,

তবে তাথেকে হিসেব করেই প্রদীপ ও জিনিষটির মধ্যেকার দূরত্ব জানা যেত।

বেতার-তরঙ্গের সাহায্যেও অনুরূপভাবে পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। কৌশলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান। যুদ্ধের সময়ে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে অনুসন্ধান-কার্য চালানো হতো বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল Radio Detection And Ranging—এরই সংক্ষিপ্ত নাম রেডার।

বেতার-তরঙ্গ অনেক বস্তু ভেদ করে যেতে পারে, আবার অনেক বস্তু তার গতি প্রতিহত করে দেয়। উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হলে বেতার-তরঙ্গ যদি কোন পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হয়, তবে সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে। আমরা জানি, বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ প্রতিসেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল—আলোর গতির সমান। সুতরাং কোন বেতার প্রেরক-যন্ত্র থেকে ধ্বনি পাঠাবার পর যদি সেখানেই আবার একটি বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে তবে বুঝতে হবে, তরঙ্গ কোথাও প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে। তরঙ্গের যাতায়াতে যে সময় লেগেছে, তার অর্ধেক সময়ে তরঙ্গটি যতদূর ভ্রমণ করতে পারে, প্রতিঘাতকারী বস্তুটি ততদূরে রয়েছে। যেমন—এখান থেকে একটি বেতার ধ্বনি পাঠানো হলো, ·০০০৮ সেকেণ্ড পরে তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেল। তাহলে প্রতিঘাতকারী বস্তুটি রয়েছে (১৮৬০০০ × ·০০০৮) ÷ ২ মাইল দূরে, অর্থাৎ প্রায় ৭৫ (৭৪·৪) মাইল দূরে। এক্ষেত্রে সময়-পরিমাপক যন্ত্রে সময়ের ঐ ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও যাতে নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে, তার সূক্ষ্ম ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বেতার প্রেরক-যন্ত্র, গ্রাহক-যন্ত্র ও সময়-পরিমাপক যন্ত্রের একত্র বিন্যাসে রেডার যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

রেডারের গঠনতন্ত্র নিম্নরূপ—

১। একটি বেতার প্রেরক-যন্ত্র (Transmitter)

২। একটি বেতার গ্রাহক-যন্ত্র (Receiver)

৩। একটি এরিয়েল (Aerial)

৪। একটি অসিলোস্কোপ (Oscilloscope)

প্রেরক-যন্ত্র থেকে দমকে দমকে অর্থাৎ ক্ষণকাল পর পর এরিয়েলের সাহায্যে বেতার-ধ্বনি উৎক্ষিপ্ত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে ঐ এরিয়েলের সাহায্যেই প্রতিধ্বনি গৃহীত হয়। ধ্বনি পাঠানো হয় সবিরাম, তাই প্রতিধ্বনিও আসে সবিরাম। তারই তালে তালে একটি সুইচের সাহায্যে এরিয়েলটিকে একবার শব্দ প্রেরণ এবং একবার শব্দ গ্রহণের কাজে ব্যবহার করবার ব্যবস্থা আছে। অবতল ফ্রেম-এরিয়েলটিকে যে কোন নির্দিষ্ট দিকে ঘুরিয়ে নেবার ব্যবস্থাও আছে।

গ্রাহক-যন্ত্র একটি অসিলোস্কোপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ধ্বনি প্রেরণকালে অসিলোস্কোপের কাচের পর্দার এক ধারে একটি দীর্ঘ আলোক-রেখা খাড়াভাবে দণ্ডায়মান দেখা যায়। প্রতিধ্বনি এলে অপেক্ষাকৃত খাটো অন্য একটি আলোক-রেখা ঐ কাচের পর্দারই কিছুটা দূরে এসে পড়ে। অসিলোস্কোপের স্কেলে দুই আলোক-রেখার ব্যবধান দেখে অতিক্রান্ত সময়ের পরিমাপ পাওয়া যায়। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থেকে কি করে দূরত্ব নির্ণীত হয়, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। বস্তুতঃ স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব এবং তা চলমান হলে তার গতিবেগ সঙ্গে সঙ্গেই জানা যায় (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

রেডারের ওজন ও আয়তন যাতে খুব বেশী না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এর প্রেরক-যন্ত্রটিকে বিশেষ শক্তিশালী করা হয়। লক্ষ্যবস্তু যদি বৃহদাকারের না হয়, তবে বৃহৎ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের যথাযথ প্রতিফলন সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্যে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ রেডার থেকে উৎক্ষেপণের ব্যবস্থা করা হয়। রেডারের হ্রস্ব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩ থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে।

বিমানপোতের গাত্র বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে দেয় বলে বিগত মহাযুদ্ধের সময় রেডারের সাহায্যে শত্রুপক্ষীয় বিমানের দূরত্ব নির্ণয় করে আগে থেকেই প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি পাকা করে নেওয়া হতো। বর্তমানে রেডারের ব্যবহার অসামরিক কাজেও খুব ছড়িয়ে পড়েছে।

এরিয়েল
সুইচ
প্রেরক যন্ত্র
গ্রাহক যন্ত্র
অসিলো স্কোপ

রেডারের গঠন বিন্যাস

২নং চিত্র

বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রেডার এখন অনিবার্যভাবে প্রয়োজনীয়। সমুদ্রে ঘন কুয়াসায় দুই জাহাজের সংঘর্ষ নিবারণে রেডার অত্যাবশ্যক। আবহতত্ত্ববিদ্‌গণ রেডারের সাহায্যে ঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল ও গতিপথ নির্ধারণ করে আগে থেকেই নৌ ও বিমান বন্দরকে সাবধান করে দেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আকাশ পর্যবেক্ষণেও রেডারের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উল্কা আমরা রাত্রে দেখতে পাই তার উজ্জ্বল আলোর জন্যে। দিনের বেলায়ও অসংখ্য উল্কাপাত হয়ে থাকে এবং রেডারই তার সন্ধান দেয়। কণা পরিমাণ ক্ষুদ্র উল্কা যে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে, তার শক্তি এত কম যে, রেডারের গ্রাহক-যন্ত্রে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭০ মাইল ঊর্ধ্বে উল্কা যখন গতির তীব্রতার দরুণ জ্বলতে আরম্ভ করে, তখন উল্কার পরমাণু ও বায়ু থেকে ইলেকট্রন খসে যায়। নিউট্রন, প্রোটন ও ইলেকট্রন সংযোগে পরমাণু গঠিত। একটা পরমাণুতে যে কটা ইলেকট্রন আছে—সংঘর্ষ, তাপ বা অন্য কোন কারণে যদি সেই সীমিত সংখ্যক ইলেক্ট্রনের দুই-একটা খসে যায়, তাহলে পরমাণুটিকে আয়ন (Ion) বলে। উল্কার ঐ তীব্রবেগে ভ্রমণকালে তার পরমাণু ও বায়ুকণা থেকে ইলেকট্রন খসে যায় বলে তার পশ্চাতে গতিপথের গ্যাসের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্যে থেকে যায় একটি ক্ষীণ আয়নক্ষেত্র। আয়নপূর্ণ ক্ষেত্রের বেতার-তরঙ্গ প্রতি-

ফলিত করবার ক্ষমতা আছে। এই কারণে দিবা-ভাগেও উল্কাপাতের সংবাদ বেতারের সাহায্যে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। উল্লিখিত আয়ন-ক্ষেত্র অল্পকাল স্থায়ী; কারণ আয়নগুলি অনতিবিলম্বে নিজেদের মধ্যে তেজঃকণার যোগ-বিয়োগের দ্বারা সাম্যাবস্থায় ফিরে আসে। ১৯৪৭ সালে জড্রেল ব্যাঙ্কে রেডারের সাহায্যে প্রতিমিনিটে উল্কা-পাতের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এই সময় থেকেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সুরু।

ভূপৃষ্ঠে বসেই এখন রকেট ও কৃত্রিম উপ-গ্রহের গতিপথ, বেগ প্রভৃতি রেডারের দ্বারা নির্ণয় করা হচ্ছে। কৃত্রিম উপগ্রহাদির মধ্যেও রেডার স্থাপন করে পৃথিবী ও বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

মেঘলোক ভেদ করে মানুষের দৃষ্টি এগোয় না, কিন্তু বেতার-তরঙ্গ মেঘলোক ভেদ করে যেতে পারে। তাই চোখের দৃষ্টি অপেক্ষা রেডারের তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বেশী এবং বিশ্বাসযোগ্য। রেডারের সাহায্যে চন্দ্রে ধ্বনি পাঠিয়ে আড়াই মিনিট পর তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে। এতেই প্রমাণিত হয়েছে যে, চন্দ্রের দূরত্ব পূর্বে যা নিরূপিত হয়েছিল, সে হিসেব নির্ভুল

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র

১৯৩২ সালে মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ইয়ানস্কী ইয়ার-ফোনে (শব্দ শোনবার জন্যে যে যন্ত্র দুই কানে চেপে লাগাতে হয়) এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পান। অচিরেই জানা গেল, এই আওয়াজ কোন অজানা উৎস থেকে আগত এক প্রকার বেতার-তরঙ্গ। এই উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে এমন বিশেষ এক ধরণের এরিয়েল ব্যবহার করা হলো, যা এককালে শুধু একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ ধরতে পারে। একে একে আকাশের বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেল—ছায়াপথের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে সবচেয়ে জোরালো আওয়াজ পাওয়া যায়, অন্যত্র ক্ষীণতর। এর পরেই সুরু হলো জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের পালা। তাঁরা ঐ ধরণের এরিয়েলের সঙ্গে বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্র যোগ করে নিলেন। এরই নাম বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র (Radio Telescope)। বহির্বিশ্ব থেকে যে বেতার-তরঙ্গ এরিয়েলে ধরা পড়ে, তা খুবই দুর্বল। বর্তমানে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সুবৃহৎ এরিয়েলের সঙ্গে যে গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং তারই মধ্যে দুর্বল বেতার-তরঙ্গকে জোরালো করবার ব্যবস্থা আছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যেরূপ আলোক-তরঙ্গ ধরে জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়, বেতার-দূরবীক্ষণেও সেরূপ জ্যোতিষ্কাদির দ্বারা বিকিরিত বেতার-তরঙ্গ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

প্রতিফলিত আলোর দূরবীক্ষণের (Reflector) প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বনে বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত। জ্যোতিষ্কের আলোকরশ্মি অবতল দর্পণে এসে পড়লে সেই সকল রশ্মি একত্রে প্রতিফলিত হয়ে দর্পণের ফোকাস বিন্দুতে গিয়ে জড়ো হয়। এক বিন্দুতে সম্মিলিত হবার ফলে দুর্বল রশ্মিগুলি যৌথভাবে অনেক শক্তিসম্পন্ন হয়। এই ফোকাসে ফটোপ্লেট রেখে জ্যোতিষ্কের ছবি নেওয়া যেতে পারে কিংবা ত্রিকোণ কাচ (Prism) রেখে জ্যোতিষ্কের আলোককে বিশ্লেষণ করে বর্ণালী পাওয়া যায়। জ্যোতিষ্কের আলো প্রতিফলিত করবার জন্যে এখানে দূরবীক্ষণের যেমন একখানা অবতল দর্পণের দরকার, জ্যোতিষ্কের বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলনের জন্যেও বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সেরূপ একটি অবতল এরিয়েলের দরকার। চক্রাকার ফ্রেমে একটি ধাতুনির্মিত জাল গভীর অবতলভাবে লাগিয়ে নেওয়া হয়। এই জালই এরিয়েল। অবতল জালের ফোকাসে একটি ধাতব দণ্ড সংযোগ করা হয়। দণ্ডটিকে ওয়েভ

গাইড (Wave Guide) বলে। সুদূর আকাশ থেকে ঐ এরিয়েলে যে সকল বেতার-তরঙ্গ এসে পতিত হয়, সেগুলি ওয়েভ গাইডে একত্র সম্মিলিত হয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিসম্পন্ন হয়। ওয়েভ গাইডটি বিশেষভাবে নির্মিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বিত এক শক্তিশালী গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বেতার-দূরবীক্ষণে এখান থেকেই আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হয়। বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে সাধারণতঃ এক সেন্টিমিটার থেকে দশ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ধরে আকাশে পর্যবেক্ষণ চালান।

সৌরজগতের বহিঃস্থিত যে সব উৎস থেকে বেতার-তরঙ্গ বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে, সেই সব উৎসকে বেতার-তারকা (Radio Stars) বলা হয়। সুতরাং বেতার-তারকা বলতে যেমন বেতার-রশ্মি বিকিরণকারী একটি মাত্র জ্যোতিষ্ককে বোঝাতে পারে, তেমনি বেতার-রশ্মি বিকিরণকারী একাধিক জ্যোতিষ্কের সমন্বয়কেও বোঝাতে পারে। কিন্তু ঐ সব অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রেই দূরবীক্ষণের দৃষ্টিতে কোন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় না। হতে পারে, অত্যধিক দূরত্বের জন্যে কিংবা অতি ক্ষীণ দীপ্তিমাত্রার জন্যে সেগুলি দূরবীক্ষণের দৃষ্টির বহির্ভূত। দূরবীক্ষণে দৃষ্ট বেতার-তারকাসমূহের

অবতল জাল এরিয়েল

গ্রাহক যন্ত্র

বেতার বীক্ষণ যন্ত্র

৩নং চিত্র
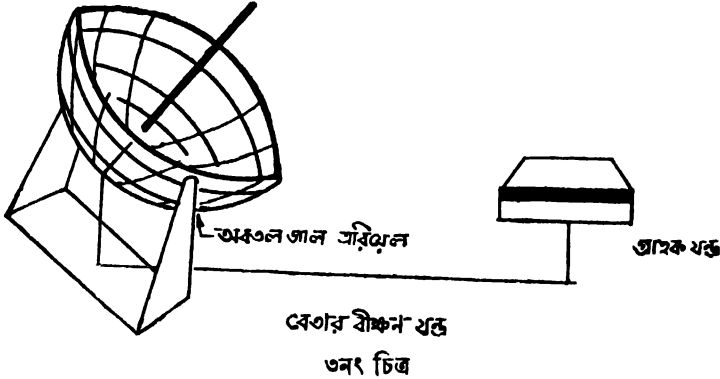
দূরবীক্ষণে জ্যোতিষ্কগুলিকে আমরা চাক্ষুষ দেখতে পাই অথবা দূরবীক্ষণে গৃহীত তাদের আলোকচিত্র চাক্ষুষ দেখি। বেতার-দূরবীক্ষণে জ্যোতিষ্কের চেহারা চাক্ষুষ দেখা যায় না। জ্যোতিষ্ক থেকে বিকিরিত বেতার-তরঙ্গ গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যে গিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে কাগজের উপর রেখাঙ্কন করে। এই সকল রেখার বিশ্লেষণ করে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জ্যোতিষ্কের আয়তন, তাপমাত্রা ইত্যাদি জানতে পারেন। একেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে জ্যোতিষ্ক দেখা বলেন। যেমন—কাশ্যপী নক্ষত্রপুঞ্জে একটি বেতার-তারকা দেখা যায় কিংবা বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার-সূর্যকে চাক্ষুষ সূর্য অপেক্ষা বড় দেখায়।

মধ্যে আছে—অ্যাণ্ড্রোমিডা বিশ্ব, মেগালানীয় মেঘমালা, ক্র্যাব নেবুলা, কিছু সংঘর্ষরত গ্যালাক্সী বা নীহারিকা, কয়েকটি অতিনোভার ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি। নীহারিকা বা গ্যালাক্সীগুলির সংঘর্ষকালে সৃষ্ট বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ অত্যন্ত শক্তিশালী। এজন্যে তাদের তরঙ্গও বেতার-দূরবীক্ষণে সহজ-লভ্য। সিগ্‌নাস (Cygnus), পারসিউস (Perseus), সেন্টোরাস (Centaurus) প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জে দৃষ্ট সংঘর্ষরত গ্যালাক্সীগুলি বেতার-তারকা। অতিনোভার ধ্বংসাবশেষ থেকে বিকিরিত বেতার-তরঙ্গও বেতার-দূরবীক্ষণে সহজে ধরা পড়ে—যেমন, ক্র্যাব নেবুলা এবং কাশ্যপী নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থিত এক অতি-

নোভার ধ্বংসাবশেষ। অত্যধিক উজ্জ্বল উৎসকে বেতার-তারকা হিসেবে চিহ্নিত করবার জন্যে যে অঞ্চলে তাদের অবস্থিতি, তথাকার নক্ষত্রপুঞ্জের নামের শেষে ইংরেজী অক্ষর "A" যোগ করা হয়। যেমন, উল্লিখিত বেতার তারকাগুলির নাম—Cygnus A, Perseus A, Centaurus A, Taurus A (অর্থাৎ ক্র্যাব নেবুলা), Cassiopeia A।

সৌরজগতের সকল গ্রহ ও চন্দ্র থেকে বেতার-বিকিরণ পাওয়া গেছে এবং তাথেকে তাদের পৃষ্ঠতাপও হিসেব করা হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহে কিছু বিশেষত্ব দেখা গেছে। বৃহস্পতি থেকে মাঝে মাঝে প্রবল বেতার-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস পাওয়া যায়। এগুলি বিশ্লেষণ করে জানা যায়—বৃহস্পতির আবহমণ্ডলে পৃথিবীর চেয়ে শক্তিশালী আয়নোস্ফিয়ার বর্তমান।

একক নক্ষত্রগুলি অনেক দূরে বলে তাদের বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীতে আসতে আসতে এত দুর্বল হয়ে পড়ে যে, বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। সৌরজগতের নিকটতম নক্ষত্রের দূরত্ব মাত্র কিঞ্চিদধিক চার আলোকবর্ষ, তথাপি তার বেতার-তরঙ্গ বেতার-দূরবীক্ষণে ধরা যায় নি।

একক নক্ষত্রগুলির মধ্যে সূর্যই একমাত্র বেতার-তারকা। সূর্যের আলোকমণ্ডল (Photosphere) থেকে যে আলোকরশ্মির বিকিরণ হয়, তারই সাহায্যে আমরা সূর্যকে চাক্ষুষ দেখি। সূর্যের বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও ছটামণ্ডল (Corona) সূর্যগ্রহণ ছাড়া অন্য সময়ে আমরা দেখতে পাই না। আমরা যদি সূর্যের আলোক-মণ্ডল না দেখে ছটামণ্ডল দেখতে পেতাম, তাহলে চাক্ষুষ দৃষ্টিতেই সূর্যকে অনেক বড় দেখা যেত। সূর্যের আলোকমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড, বর্ণমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ২০০০০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড এবং ছটামণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ১০ লক্ষ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। তাপমাত্রা যেখানে যত বেশী, সেখান থেকে তত বৃহৎ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়ে। এজন্যে আলোকমণ্ডল থেকে অতি হ্রস্ব তরঙ্গ, বর্ণমণ্ডল থেকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ এবং ছটামণ্ডল থেকে আরও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের বিকিরণ পাওয়া যায়। হ্রস্ব তরঙ্গের বেতার-সূর্য আমাদের দৃশ্য সূর্যের সমান। দশ সেণ্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-সূর্য দৃশ্য সূর্য অপেক্ষা দশ শতাংশ বড় এবং ছটামণ্ডলের বৃহৎ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-সূর্য আমাদের চাক্ষুষ সূর্যের চেয়ে অনেক বৃহদায়তনের, কিন্তু অতিশয় অস্পষ্ট। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত ক্ষুদ্র হয়, বেতার-সূর্য আকার ও আয়তনে তত বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহাকাশে নক্ষত্রগুলির অন্তর্বর্তী স্থানের গ্যাস-রাশি থেকেও বেতার-তরঙ্গ ধরা পড়ে। এই গ্যাস থেকে ২১ সেণ্টিমিটার দৈর্ঘ্যে প্রাপ্ত বেতার-তরঙ্গ ঠাণ্ডা হাইড্রোজেনের পরমাণু থেকে বিকিরিত। বর্ণালীর বিকিরণ-রেখার সঙ্গে এটি তুলনীয়। হাইড্রোজেনের এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ২১ সেণ্টিমিটার অপেক্ষা কিছু কম বা বেশী দেখা গেলে ডপ্‌লারের তত্ত্ব অনুযায়ী গ্যাসরাশি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে—না দূরে সরে যাচ্ছে, তা জানা যায়। ২১ সেণ্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, ছায়াপথ দ্বীপজগতের গ্যাসীয় বাহু আছে এবং এটি একটি সর্পিল অর্থাৎ কুণ্ডলী-পাকানো (Spiral) নীহারিকা।

আমেরিকা, ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়ার বহুস্থানে বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সমন্বয়ে ছোট-বড় বিবিধ আকারের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে এবং অহর্নিশি আকাশের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে। ইংল্যাণ্ডে ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকট জড্রেল ব্যাঙ্ক নামক স্থানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ

বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে। এর এরিয়েল বা প্রতিফলনকারী অবতল জালটির মুখের ব্যাস ২৫০ ফুট। কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে জড্রেল ব্যাঙ্কের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের একটি মডেল স্থাপিত হয়েছে।

ইন্টারফেরোমিটার (Interferometer) নামক আর একপ্রকার বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। এর যান্ত্রিক বিন্যাস ভিন্ন রকমের এবং এই যন্ত্রের বিশ্লেষণ-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দেশেই বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকার-প্রকারের বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হয়েছে এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণায় মহাকাশের জ্যোতিষ্কাদি সম্বন্ধে নিত্যই নানাবিধ তথ্য আবিষ্কৃত হয়ে চলেছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাকাশে সঞ্চরণশীল সব রকমের বিদ্যুৎ-চৌম্বক বিকিরণ ভূপৃষ্ঠে আসে না—আলো-জানালা ও বেতার-জানালা দিয়ে সামান্য কিছু বিদ্যুৎ-চৌম্বক রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আসে। সব রকম রশ্মি না আসায় বিজ্ঞানীরা মহাকাশ অনুশীলনে খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। এজন্যে তাঁরা এখন পৃথিবীর আবহমণ্ডলের উপরতলায় কৃত্রিম উপগ্রহ ও চন্দ্রপৃষ্ঠে তাঁদের গবেষণাগার স্থাপনের কথা ভাবছেন।

অজীবজনি ও জীবজনি মতবাদের শতবর্ষব্যাপী দ্বন্দ্বের সমাধান

রমেন দেবনাথ

১৮৬৪ সালের ২৪শে জুন ফ্রান্সের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীতে সেদিন এক হুলুস্থূল কাণ্ড। দুই বিরুদ্ধবাদী বিজ্ঞানী তাঁদের স্ব স্ব মতের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে হাজির। বিচারকের আসনে রয়েছেন অ্যাকাডেমী কর্তৃক নিযুক্ত সেখানকার জ্ঞানী-গুণী মহারথীগণ। বিরুদ্ধবাদী বিজ্ঞানীদের একজন হলেন পসেট, যিনি অজীবজনি মতবাদের (Abiogenesis) সমর্থক—যে মতবাদ অনুযায়ী অজৈব বা জড় পদার্থ থেকে জীবের জন্ম হয় এবং অন্য জন হলেন লুই পাস্তুর, যিনি জীবজনি (Biogenesis) মতবাদের সমর্থক—যে মতবাদ অনুযায়ী জীবের জন্ম জীব থেকেই হয়—অজৈব বা জড় পদার্থ থেকে নয়। বিচারে কোন্ মতবাদের জয় হলো—সে বিষয়ে যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে। তার আগে উপরিউক্ত মতবাদ দুটির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কি কি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং তখনকার দিনের বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই বিষয়ে কিরূপ ধারণা ছিল—তার কিছুটা পূর্বাভাস দেওয়া দরকার।

১৮৬৪ সালে যে বিরোধের মীমাংসা হলো—সেই বিরোধের জন্ম কিন্তু আরও তিন-শ' বছর আগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে এবং তারও আগে জীবের জন্ম সম্বন্ধে শুধু একটি মতবাদই প্রচলিত ছিল—সেটি হলো অজীবজনি মতবাদ। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে অ্যারিষ্টটল এই অজীবজনি মতবাদের পোষকতা করতেন। তাঁর মতে কীট-পতঙ্গের জন্ম হয়েছে শিশিরবিন্দু,

কাঠের গুঁড়া, মাংস ইত্যাদি থেকে, পাকাল মাছের জন্ম হয়েছে পুকুরের কাদা থেকে। তখনকার দিনে অ্যারিষ্টটলের প্রভাব ছিল সর্বত্র —তাই অজীবজনি মতবাদেই সকলে বিশ্বাস করতেন এবং এক এক জন এক এক ভাবে জীবের জন্ম-রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করতেন। ভার্জিলের মতে, ভোমরার জন্ম হয়েছে পচা গোবর থেকে। হেলমন্টের মতে নোংড়া এবং ছেঁড়া জামাকাপড় থেকে ইঁদুরের জন্ম হয়। তিনি ইঁদুর সৃষ্টি করবার একটি ফরমুলা প্রদান করেন—কিছু ছেঁড়া, নোংড়া জামাকাপড় এবং কিছু গমের দানা একটি পাত্রে রেখে দিলে ২১ দিন পর নাকি তাথেকে ইঁদুরের জন্ম হবে। এমনি ধরণের নানারকম আজগুবি মতবাদের তখন প্রচলন ছিল এবং সকলেই একবাক্যে এই অজীবজনি মতবাদে বিশ্বাস করতেন।

অজীবজনি সম্পর্কে সর্বপ্রথম সংশয়ের উদয় হয় ফ্রান্সেস্‌কো রেডী নামক সপ্তদশ শতাব্দীর এক ইটালীয় বিজ্ঞানীর মনে। তিনি ভাবলেন, অজৈব পদার্থ থেকে নয়—জীব থেকেই জীবের জন্ম যুক্তিযুক্ত। রেডী পরীক্ষায় নিযুক্ত হলেন। তখনকার দিনে সকলেই মনে করতো যে, গলিত পচা মাংস থেকে পোকার জন্ম হয়। এই বিষয় নিয়েই তিনি পরীক্ষা সুরু করেন। আটটি বোতলে তিনি পচা মাংসের টুকরা পুরে দিয়ে প্রথম চারটির মুখ খোলা রাখলেন এবং বাকী চারটি বোতলের মুখ বন্ধ করে দিলেন। কয়েক দিন পরে রেডী দেখতে পেলেন যে, খোলা মুখের বোতলগুলিতে পোকার (কীড়ার) জন্ম হয়েছে, কিন্তু মুখ-বন্ধ বোতলগুলিতে কোন পোকার জন্ম হয় নি। এথেকে রেডী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পচা মাংস থেকে পোকার জন্ম হতে পারে না, পোকার জন্ম তখনই সম্ভব, যখন মাছি বা অন্য পোকা মাংসের উপর এসে ডিম পাড়ে। মাছি বা অন্যান্য পোকার ডিম থেকেই পচা মাংসে পোকার (কীড়ার) জন্ম হয়ে থাকে। সুতরাং অ্যারিষ্টটলের সময় থেকে সুরু করে সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জীবের জন্ম সম্পর্কে যে অজীবজনি মতবাদ চালু ছিল (অর্থাৎ গলিত মাংস, কাদা, শিশিরবিন্দু প্রভৃতি অজৈব পদার্থ থেকে জীবের জন্ম), রেডীর পরীক্ষা ঐ মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণিত করলো এবং তাঁর সময় থেকেই জীবজনি মতবাদের জন্ম হলো। যদিও রেডীর পরীক্ষা খুবই মামুলী ধরণের, তবু জীববিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে এর মূল্য অপরিসীম। কারণ তখনকার দিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাতো না—কোন কিছু সম্পর্কে সংশয়ের উদয় হলেই অ্যারিষ্টটল, প্লিনীয়াস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিদের রচিত পুস্তক পড়ে তার সমাধান খোঁজবার চেষ্টা করা হতো। কিন্তু রেডী শুধু পুস্তকের লেখা দেখেই ক্ষান্ত হতেন না—হাতে-কলমে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করতেন। তিনি বললেন—কোন মন্তব্য বা মতবাদ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত না হলে, তা অর্থহীনই মনে করতে হবে।

রেডী কর্তৃক অজীবজনি মতবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হলেও সেটিই আবার সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো লিউয়েনহোয়েকের মাইক্রস্কোপ উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে। এই মাইক্রস্কোপ মানুষের চোখের সামনে এক অত্যাশ্চর্য পৃথিবী তুলে ধরলো, যার কল্পনাও মানুষ আগে করতে পারে নি। তারা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল যে, এক ফোঁটা জলের মধ্যে কত রকমের অদ্ভুত প্রাণী কিলবিল করছে! লিউয়েনহোয়েক বললেন যে, পচা জল থেকে এই সব আণুবীক্ষণিক প্রাণীর জন্ম হয়েছে—অর্থাৎ সেই অজীবজনি মতবাদের পুনরুল্লেখ। পচা ডোবার জল, বৃষ্টির জল—এই সব পরীক্ষা করে তখন অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এই মতবাদকে সমর্থন করলো। আবার

কিছু কিছু বিজ্ঞানী এই মতবাদকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে ঘোষণা করেন। তাঁদের মতে—ইঁদুর, মাছ, কীট-পতঙ্গের কীড়া ইত্যাদির জন্ম যেমন তাদের পূর্বপুরুষদের প্রজনন প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয়েছে, তেমনি আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের জন্মও একই প্রকারে হয়েছে—অর্থাৎ জীব থেকেই জীবের জন্ম হয়ে থাকে। সুরু হলো এই দুই মতবাদের দ্বন্দ্ব। সুদীর্ঘ তিন-শ' বছর ধরে চললো এই দ্বন্দ্ব আর বিতর্ক। খড়-গোলা জলে (Hay-infusion) জীবের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি—এই ছিল তখনকার দিনের দ্বন্দ্বের বিষয়। কিছু শুক্‌নো খড় কুচিয়ে কেটে জলের সঙ্গে মিশিয়ে পরে ফোটানো হলো—এই খড়-মিশ্রিত জলকেই খড়-গোলা জল বলা হয়। দেখা গেল যে, এই খড়-গোলা জল কোন মুখখোলা পাত্রে রেখে দিলে কয়েক দিনের মধ্যেই তাতে আণুবীক্ষণিক জীবের (ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি) জন্ম হয়। অজীবজনি মতবাদের সমর্থকগণ বললেন যে, খড়-গোলা জলে আপনা থেকেই নতুন প্রাণীর জন্ম হয়েছে, কিন্তু জীবজনি মতবাদের সমর্থকদের মতে তা সম্ভব নয়। তাঁরা বললেন, যেহেতু পাত্রের মুখ খোলা ছিল, তাই বাতাসে ভেসে-বেড়ানো প্রাণীর বীজরেণু (Spore) পাত্রে প্রবেশ করেছে এবং তাথেকে নতুন জীবের আবির্ভাব ঘটেছে।

লুই জব্লট ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষায় নামলেন। কিছু পরিমাণ খড়-গোলা জল আধ ঘণ্টাখানেক ফুটিয়ে নিয়ে কয়েকটি পাত্রে রেখে দিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি পাত্রের মুখ খোলা রাখলেন, যাতে বাতাস ঢুকতে পারে এবং অন্য কয়েকটির মুখ পার্চমেন্ট কাগজের সাহায্যে ভাল করে বন্ধ করে দিলেন, যাতে বাতাস ঢুকতে না পারে। কিছুদিন পরে পাত্রগুলির জল মাইক্রস্কোপে পরীক্ষা করে জব্লট দেখলেন যে, বন্ধ পাত্রের জলে কোন প্রাণীর জন্ম হয় নি, কিন্তু খোলা পাত্রের জলে অসংখ্য আণুবীক্ষণিক প্রাণীর জন্ম হয়েছে। এই পরীক্ষা থেকে জব্লট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুলেন যে, বাতাসে জীবের বীজরেণু ভেসে বেড়াচ্ছে—যখনই জলের সংস্পর্শে আসছে তখনই সেই বীজরেণু থেকে নতুন প্রাণীর জন্ম হচ্ছে। সুতরাং অজীবজনি মতবাদ পুনরায় অসত্য প্রমাণিত হলো।

কিন্তু তাও হলো স্বল্পস্থায়ী। জব্লটের পর অন্যান্য বিজ্ঞানীরা অনুরূপ পরীক্ষা করে উল্টো ফল পেলেন। তাঁদের মধ্যে নিডহামের পরীক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি জল ভাল করে ফুটিয়ে বিভিন্ন শিশিতে রাখলেন এবং তাদের মুখগুলি কর্কের সাহায্যে ভাল করে বন্ধ করে দিলেন। কিছুদিন পর শিশির জল পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, মুখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও শিশির ভিতরকার জলে জীবের জন্ম হয়েছে। সুতরাং অজীবজনি মতবাদ আবার দানা বেঁধে উঠলো। জীবজনি আর অজীবজনি বিতর্ক পুনরায় ঘোরালো হয়ে উঠলো।

রেডীর ন্যায় এবারেও আর একজন ইটালীয় জীবজনির সমর্থনে এগিয়ে এলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। তাঁর নাম ল্যাজারো স্প্যালানজানি। তিনি নিডহামের পরীক্ষারই পুনরাবৃত্তি করে অজীবজনি মতবাদের অসত্যতা প্রমাণ করেন। অবশ্য স্প্যালানজানি নিডহামের পরীক্ষা-পদ্ধতির কিছুটা অদলবদল করলেন। তিনি নিডহামের চেয়ে খড়-গোলা জলকে অনেক বেশী সময় সিদ্ধ করলেন (তাঁর মতে, জলকে নির্বীজিত করতে হলে অনেকক্ষণ ধরে ফোটানো দরকার)। সিদ্ধ করা জল তিনি ৮টি পাত্রে রেখে তাদের মুখগুলি বন্ধ করে দিলেন। মুখ বন্ধ করবার ব্যাপারেও নিডহামের পদ্ধতি থেকে স্প্যালানজানির পদ্ধতি ভিন্ন। তিনি ৮টি পাত্রের ৪টির মুখ বন্ধ করলেন বায়ুরোধী ছিপির (Airtight seal) সাহায্যে, আর বাকী ৪টির মুখ বন্ধ করলেন কর্কের সাহায্যে।

কয়েক দিন পর এই দুই শ্রেণীর পাত্রের জল পরীক্ষা করে স্প্যালানজানি দুই রকম ফল পেলেন—বায়ুরোধক ছিপি-দেওয়া পাত্রে কোন জীবের অস্তিত্ব নেই, কিন্তু কর্কওয়ালা পাত্রে নতুন জীবের জন্ম হয়েছে। এর কারণ কর্ক দিয়ে যথার্থ বায়ু-রোধক ঢাকনার কাজ হয় না, ফলে পাত্রের মধ্যে বায়ু ঢুকতে পারে এবং এই বায়ু থেকে প্রাপ্ত বীজ থেকে নতুন জীবের জন্ম হয়েছে। যেহেতু বায়ুরোধক ছিপিওয়ালা পাত্রে বাতাস ঢুকতে পারে নি—তাই তাতে কোন জীবের উৎপত্তি সম্ভব হয় নি। জীবজনি মতবাদের আবার জয় হলো, কিন্তু অজীবজনির সমর্থকগণও পিছু হঠবার পাত্র নন। স্প্যালানজানির বায়ুরোধক ছিপিওয়ালা পাত্রে জীবের উদ্ভব না হবার কারণস্বরূপ তাঁরা দেখালেন—পাত্রে বাতাসের অভাব। তারা বললেন যে, বাতাসের অভাবে অজীবজনি সম্ভব নয়।

ব্যাপার এখন বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। অজীবজনির সমর্থকগণ বলছেন যে, তাঁদের মতবাদ প্রমাণ করতে হলে পাত্রে বাতাস প্রবেশের রাস্তা থাকা দরকার, কারণ বাতাসের অভাবে অজৈব বা জড় পদার্থ থেকে জীবের জন্ম সম্ভব নয়—আবার জীবজনির সমর্থকগণ বলছেন যে, অজীবজনি মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করতে হলে পাত্র বায়ুশূন্য করতে হবে, কারণ বাতাসই হলো জীবের বীজ-রেণুর বাহক। সুতরাং বায়ুশূন্য অবস্থায় জীবজনি মতবাদ প্রমাণ করতে হবে।

সুরু হলো পুনরায় দুই দলের দ্বন্দ্ব এবং তা চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে, যখন দুই খ্যাতনামা বিজ্ঞানী পসেট এবং পাস্তুর রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। পসেট পূর্বকথিত খড়-গোলা জল নিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং জীবজনি সমর্থকদের আপত্তির বস্তু যা অর্থাৎ মুক্ত বাতাস, যার মধ্যে জীবের বীজরেণু থাকবার সম্ভাবনা আছে, তাঁর পরীক্ষায় এই মুক্ত বাতাস ব্যবহার না করে, তিনি পাত্রে রক্ষিত খড়-গোলা জলে অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন ছড়িয়ে দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে বাতাস তৈরি করলেন। কয়েক দিন পরে দেখা গেল, পাত্রের জলে আণুবীক্ষণিক জীবের জন্ম হয়েছে—এমন কি, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জল থেকেও তিনি একই ফল পেলেন। তাহলে পসেট বাতাসের অভাবেই খড়-গোলা জীবের জন্ম দেখাতে সমর্থ হলেন। লুই পাস্তুর কিন্তু পসেটের এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারলেন না, তিনি বললেন কৃত্রিম উপায়ে বাতাস তৈরি করলেও অসাবধানতাবশতঃ পাত্রের জলে পরীক্ষার সময় কিছু মুক্ত বাতাস নিশ্চয় ঢুকেছে এবং বাতাস-বাহিত বীজ থেকেই জলে নতুন প্রাণীর জন্ম হয়েছে, আপনা থেকে কোন জীবের সৃষ্টি হতে পারে না এবং তিনি পরীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণ করলেন।

অজীবজনি ও জীবজনি মতবাদের শতাধিক বর্ষব্যাপী এই বিতর্কের অবসান ঘটাবার জন্যে ফ্রান্সের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী একটি কমিশন নিযুক্ত করেন, যার সামনে পসেট ও পাস্তুর তাঁদের স্ব স্ব মতবাদের সমর্থনে প্রামাণ্য পরীক্ষা করবেন।

১৮৬৪ সালের ২২শে জুন সুরু হলো সেই ঐতিহাসিক পরীক্ষা। প্রথম লুই পাস্তুর তাঁর মতবাদ প্রমাণ করতে এগিয়ে এলেন। ৬০টি ফ্লাস্ক এবং চিনি আর ঈষ্টগোলা জলে (Sugar-yeast Infusion) নিয়ে তিনি পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। প্রত্যেকটি ফ্লাস্কে এই জল পুরে তা বেশ করে ফুটিয়ে নিয়ে তিনি ৫৬টি ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করে দিলেন (খোলা মুখটি আগুনের উত্তাপে গলিয়ে বন্ধ করা হলো)। এই ৫৬টি ফ্লাস্ককে তিনি আবার ৩ ভাগে ভাগ করলেন এবং সেগুলি বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাদের মুখ খুলে সেই সব স্থানের বাতাস ঢুকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আবার বন্ধ করে দিলেন। ঘরের ভিতর, ছাদের উপর এবং বাইরের উন্মুক্ত জায়গা—এই তিন

স্থানের বাতাস ঢুকিয়ে পরে তিনি দেখলেন যে, ফ্লাস্কের মধ্যে জীবের আবির্ভাবের হিসাব হলো যথাক্রমে ২৫%, ৩২% ও ৮৯%, অর্থাৎ ঘরের মধ্যেকার বাতাসের চেয়ে বাইরের বাতাসে জীবের বীজরেণুর পরিমাণ বেশী। বিভিন্ন জায়গার বাতাস নেবার কারণস্বরূপ পাস্তর বললেন যে, বাতাস যত নির্মল হবে, তাতে তত কম বীজরেণু থাকবে। তাঁর মতে, উচ্চ পর্বতের বাতাস জীবাণু-মুক্ত। ১৮৬০ সালে তিনি এই পরীক্ষা করেন। অনেকগুলি জলভরা ফ্লাস্ক নিয়ে তিনি সুউচ্চ আল্পস্ পর্বতে ওঠেন এবং ফ্লাস্কগুলির মুখ খুলে পর্বতোপরি বাতাস ঢুকিয়ে নিয়ে সেখানেই আবার ফ্লাস্কের মুখ এঁটে দেন। পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখেন যে, ঐ ফ্লাস্কগুলির কোনটাতেই জীবের অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ সুউচ্চ আল্পস পর্বতে জীবের বীজরেণু না থাকায় ফ্লাস্কে জীবের উদ্ভব হয় নি। এই পরীক্ষার কয়েকটি ফ্লাস্ক তিনি উপরিউক্ত কমিশনের সামনেও উপস্থিত করেন। কয়েকটি ফ্লাস্ক এখনও সেখানকার যাদুঘরে রক্ষিত আছে এবং সেগুলি এখনও পর্যন্ত নির্বীজিত আছে।

যে ৬০টি ফ্লাস্ক নিয়ে পাস্তর পরীক্ষা সুরু করেছিলেন তাদের ৫৬টি ছাড়া বাকী ৪টির জল ফোটাবার আগে তাদের গলার পাশের দিকটা গরম করে বাঁকিয়ে তিনি S-এর মত করলেন এবং পরে মুখটি খুলে রাখলেন। এর পরে ফ্লাস্কের জলকে নির্বিজীত করবার জন্যে যখন সিদ্ধ করলেন তখন বাঁকা নলের মাধ্যমে ধূমান্বিত বাষ্প বেরোতে লাগলো। খোলা বাঁকা নল দিয়ে বাতাস ফ্লাস্কের মধ্যে ঢুকলেও বাতাসের সঙ্গে মিশ্রিত ভারী বীজরেণু বাঁকা নলের গায়ে আটকে যায়, ফলে জলের মধ্যে বাতাস ঢুকলেও বাতাসস্থ বীজরেণু ঢুকতে পারে না। তাই ফ্লাস্কের মুখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তাতে কোন নতুন জীবের জন্ম হয় না। পরে ফ্লাস্ককে বাঁকিয়ে বাঁকা নলের গায়ে আটকানো বীজের সঙ্গে জলের মিশ্রণ করে অথবা বাঁকা-নলটিকে ভেঙে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখালেন যে, এবার ফ্লাস্কের জলে নতুন জীবের জন্ম হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পাত্রের জলে নতুন জীবের আবির্ভাবের জন্যে বাতাসের বীজরেণুই দায়ী, নির্বীজিত বাতাস নয়। কমিশনের বিচারক-গণ পাস্তরের সপ্তাহব্যাপী এই সব আশ্চর্য পরীক্ষা-গুলি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হলেন এবং তাঁদেরও দৃঢ় প্রত্যয় জন্মালো যে, জীব থেকেই জীবের জন্ম হয়, অজৈব পদার্থ থেকে নয়। পসেট এসব পরীক্ষা দেখে নিজেও অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং তিনি আর কোন পরীক্ষা করতে অগ্রসরই হলেন না। ফ্রান্সের বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী লুই পাস্তরকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করলেন। লুই পাস্তর যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন, আজকেও তা সর্বজনস্বীকৃতি পেয়ে আসছে—বর্তমান-কালের সমস্ত জীব-বিজ্ঞানীরাই জীবজনি মতবাদের সমর্থক। ১৮৬৪ সালের লুই পাস্তরের সেই পরীক্ষাবলী জীব-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জড় বা অজৈব পদার্থ থেকে জীবের জন্ম সম্ভব নয়, একথা স্বীকার করলেও কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে, পৃথিবীতে যখন কোনও জীব ছিল না তখন প্রাথমিক জীবের আবির্ভাব ঘটলো কেমন করে? এর জবাব খুঁজতে গেলে আবার অজীবজনির আশ্রয় নিতে হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটে পৃথিবীর তৎকালীন জড় পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে।

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

সাবান শব্দের সঙ্গে সকলেই পরিচিত। শুধু শব্দের সঙ্গে কেন, সাবান পদার্থটির সঙ্গেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য অল্পবিস্তর সম্পর্ক রয়েছে সকলেরই। কিন্তু নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য কোন্‌গুলি—তা হয়তো অনেকেরই কাছে নতুন মনে হবে, অন্ততঃ জানলেও বিশদভাবে সম্বন্ধিত নেই অনেকেই। ইংরেজিতে যাদের বলে Synthetic detergent (সংক্ষেপে Syndet অথবা Syndetergent) বা Non-soap detergent (সংক্ষেপে NSD) অথবা Soapless soap, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় সেগুলিই হলো নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য বা সাবানের অনুকল্প (Soap substitutes)। এই গোষ্ঠীর সকল পদার্থই হলো তল-কর্মণ্য নিয়ামক (Surface active agent বা Surfactant) এবং আসলে লেশ মাত্র সাবানবিহীন পদার্থগোষ্ঠী।

তল-কর্মণ্য নিয়ামক (Surface active agent)

তল-কর্মণ্য নিয়ামকদের ক্রিয়া কি? আমেরিকান সায়ানামাইড কোম্পানী তারই একটা সুষ্ঠু, চমকপ্রদ ও হৃদয়গ্রাহী নিদর্শন উপস্থাপিত করেছিলেন কয়েক বছর আগে এক প্রদর্শনীতে। নিদর্শনটির বর্ণনা নিম্নোক্তরূপ—কলের জলভর্তি চৌবাচ্চায় একটি হাঁস সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল—এটাই তো হাঁসের স্বভাব। এই নিদর্শনের ক্ষেত্রেও হাঁসের সেই চিরাচরিত স্বভাব-ধর্মেরই অভিব্যক্তি প্রকাশ পাচ্ছিল—এতে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতার লক্ষণ ছিল কি?

পরেই দেখানো হয়েছে নিদর্শনটির জলে নিমজ্জন—এখানেই তার অস্বাভাবিকতা। কি করে তা সম্ভব? হাঁস জলে ভাসমান না থেকে ডুবে গেল—এও কি সম্ভব? ব্যাপারটি আর কিছুই নয়—চৌবাচ্চার জলে (সায়ানামাইড কোম্পানীর প্রস্তুত) একটি তল-কর্মণ্য নিয়ামক পদার্থ দেবার সঙ্গে সঙ্গে অচিরাৎ এই নাটকীয় পরিণতি। হাঁসটি ডুবতে সুরু করলো—শেষে একেবারে তলিয়ে যায় যায়—এমন অবস্থা দাঁড়ালো। ভাসমান থাকবার জন্যে তার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হলো। তখন আবার হাঁসটিকে তার এই পরিস্থিতি থেকে ত্রাণ করবার পালা—তাকে আবার ভেসে উঠতে সহায়তা করা।

জল-বিতাড়নের যে ক্ষমতা হাঁসের ডানায় নিহিত ছিল, তল-কর্মণ্য নিয়ামক দেবার সঙ্গে সঙ্গে নিদর্শনটিতে তা লোপ পায়। পাখার পালকের ফাঁকে এবং দেহের আশেপাশে যে বাতাসের আবরণ থাকে, হাঁসটি তা হারিয়ে ফেলে। পালকের মধ্যবর্তী বাতাসের যে উর্ধ্ব চাপের (Buoyancy) ফলে হাঁস জলে ভেসে থাকে, তা তল-কর্মণ্য নিয়ামক দেবার ফলে দূরীভূত হয়। তখন যে পরিমাণ জল হাঁসটি নিজ অবয়বের দরুণ সরিয়ে ফেলছিল, তার ওজন নিজের দেহের ওজনের চেয়ে কম হওয়ায় হাঁসটি নিম্নগামী হয়ে জলের তলদেশে গিয়েছিল। (আর্কিমিডিসের প্রাচীন রীতির সারবত্তা একবার সপ্রমাণ হয়ে উঠেছে নিদর্শনটি শেষোক্তরূপ আচরণে)।

সায়ানামাইড কোম্পানীর তল-কর্মণ্য নিয়ামক

পদার্থের সিক্ত করবার ক্ষমতা ছিল। যার ফলে হাঁসের পক্ষসংলগ্ন পালকের মধ্যে স্বাভাবিক তৈলাক্ত পদার্থ সিক্ত হবার ফলে জল বিতাড়নের ক্ষমতা বিঘ্নিত হলো—হাঁস ডুবে গেল।

এইবার মূল প্রশ্ন হচ্ছে, কি ভাবে হাঁসের পালকের জলনিরোধক ক্ষমতা লোপ পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবদ্ধ বাতাস মুক্ত করে দিল। এর সদুত্তর নিহিত রয়েছে এই ব্যাপারের ভিতর যে, হাঁসটি যখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ভাসমান ছিল, সেই অবস্থায় যে ধরণের পদার্থ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার ধর্মের উপর।

জলের সিক্ত করবার ক্ষমতা কি ভাবে বাড়িয়ে ফেলা যায়, তা যখন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অথবা কেমন করে তাতে আরও বেশী ফেনার উদ্ভব হবে, জল ও তেল কিরূপে মিশ্রিত হতে পারে—ইত্যাকার সমস্যার সমাধান হলো—তল-কর্মণ্য নিয়ামক পদার্থের ব্যবহার ও প্রয়োগ। আর এই কথা প্রসঙ্গতঃ স্বীকার্য যে, এই ধরণের সমস্যা তো প্রতিনিয়তই দেখা দিয়ে থাকে।

মূলতঃ তল-কর্মণ্য নিয়ামক পদার্থগুলির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে তাদের তল-কর্মণ্য (Surface active) আখ্যা থেকেই। বস্তুতঃ জল এবং তেল (অথবা বাতাস ও জল কিংবা জল এবং কোন ধূলিকণার) তল বা উপরের পৃষ্ঠদেশ তল-কর্মণ্য নিয়ামকের দ্বারাই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। এদের অপর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এরা পৃষ্ঠটানকেও (Surface tension) পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। জলের বেলায় এরা পৃষ্ঠটানকেও কমিয়ে দেয়।

একটু বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। সব তরল জিনিষের আচরণ দেখে বোধ হয় যেন তাদের পৃষ্ঠোপরি একটা আবরণ বিস্তারিত রয়েছে। এই ঘটনাটি Tension বা টান নামে জ্ঞাত এবং একটা সূচকে উঠিয়ে ভাসিয়ে রাখবার পক্ষে তা যথেষ্ট মাত্রায় বলশালী (যদি সূচটি সযত্নে তরল পদার্থের পৃষ্ঠদেশে শায়িত হয়)।

দুটি মিশ্রণ অযোগ্য তরল পদার্থের (যেমন জল ও তেল) সীমানাবর্তী তলে (অথবা অন্তস্তলে—Interface) একটা বলক্ষেত্র (Field of force) সক্রিয় থাকে। তাকে বলা হয় আন্তস্তলীয় শক্তি (Interfacial tension)। সচরাচর এটি প্রকাশ করা হয় ডাইন্‌স্ প্রতি সেন্টিমিটারের হিসাবে (Dynes per centimetre)। অনুরূপভাবে একটা তরল ও অপরটি বায়বীয় পদার্থের সীমানাবর্তী তলে (যেমন জল ও বাতাসের অন্তস্তলে) একটা বলক্ষেত্র রয়েছে এবং সেই সঙ্গে একটা শক্তিও আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে Surface energy শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হয়। একে Surface tension-ও বলা হয় এবং পূর্বোক্তরূপেই (অর্থাৎ Dynes/cm. রূপে) প্রকাশ করা হয়।

পৃষ্ঠটানের প্রভাব (Surface Tension)

ধরা যাক, কোন তরল পদার্থে এমন একটা পদার্থ যুক্ত করা হচ্ছে, যা উক্ত তরল পদার্থে দ্রবণীয়। যেমন—ধরা যাক জলে লবণ ঢালা হলো—এক্ষেত্রে পৃষ্ঠটান প্রভাবিত হবে, তার পরিবর্তন ঘটবে। বিশুদ্ধ জলের পৃষ্ঠটান ৭২.৭ ডাইন্‌স্/সেন্টিমিটার। আর যদি অম্ল, ক্ষার অথবা লবণাদি এতে দ্রবীভূত হয়, তবে ঐ টানের বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ শতকরা ১ ভাগ সোডার জন্যে তা বৃদ্ধি পায় ৭৩-এ এবং শতকরা ১০ ভাগের জন্যে ৭৭.৫ ডাইন্‌স্/সেন্টিমিটার হয়ে দাঁড়ায়। তুলনামূলকভাবে বেশ খানিকটা লবণের প্রয়োজন হবে উক্ত পৃষ্ঠটানকে সামান্য মাত্রায় বৃদ্ধি করতে।

বিপরীতভাবে অ্যালকোহল শ্রেণীর কয়েকটি পদার্থ যুক্ত করলে পৃষ্ঠটানের হ্রাস ঘটে, কিন্তু এখানেও বেশ খানিকটা পরিমাণের প্রয়োজন হবে, যদি অত্যল্প মাত্রায়ও টানকে কমিয়ে ফেলতে হয় (যথা, শতকরা ১০ ভাগ—৪৬ ডাইন্‌স্/

সেন্টিমিটার; ২১ ডাইন্‌স্‌/সেন্টিমিটারের জন্যে শতকরা ৫০ ভাগ অ্যালকোহল)।

সে যাই হোক, কতক কতক জিনিষ রয়েছে, যেগুলি অত্যল্প মাত্রায়ও ব্যবহৃত হলে অতিমাত্রায় দ্রাবকের (Solvent) পৃষ্ঠটানের হ্রাস ঘটায় আর তারাই হলো তল-কর্মণ্য নিয়ামক যৌগ।

পুর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশুদ্ধ জলের পৃষ্ঠটান হলো ৭২·৭ ডাইন্‌স্‌/সেন্টিমিটার। জলে শতকরা ১ ভাগ পরিমিত সাবানের দরুণ তা কমে দাঁড়ায় ৭২·৭ থেকে ২৫ ডাইন্‌স্‌/সেন্টিমিটার। আর সংশ্লেষিত তল-কর্মণ্য নিয়ামকের অবস্থিতিতে অদ্ভূত রকমের বিকৃতি ঘটে পৃষ্ঠটানের। নোনাইলফেনল থেকে উদ্ভূত তল-কর্মণ্য যৌগ কর্তৃক (১০,০০০ ভাগ জলে মাত্র ১ ভাগের দ্বারা) ২৯ ডাইন্‌স্‌/সেন্টিমিটার পৃষ্ঠটান পাওয়া সম্ভব।

সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে তল-কর্মণ্য যৌগের সংজ্ঞা কি—দেখা যাক। যে সব পদার্থের অত্যল্প মাত্রায় অবস্থিতিহেতু পৃষ্ঠটানে দারুণ পরিবর্তন সাধিত হয় (অর্থাৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়) অথবা অনুরূপ ভাবে আন্তস্তলীয় শক্তির (Interfacial tension) তারাই এই প্রকারের যৌগ।

যে সব তল-কর্মণ্য নিয়ামকদের সিক্ত করবার ও অবদ্রবীভবনের (Emulsification) ক্ষমতা রয়েছে, তাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে পরিষ্করণকল্পে (Detergency), যদিও শিল্পে অন্য উদ্দেশ্যেও তারা লাভজনকভাবে প্রযুক্ত হয়।

কিন্তু কেন এত প্রচেষ্টা? সাধারণভাবে বলতে গেলে শতবর্ষ ধরে সাবানই চলে এসেছিল একমাত্র পরিষ্কারক দ্রব্যরূপে এবং এর পিছনে রয়েছে এক বিরাট কারিগরিমূলক অভিজ্ঞতা।

তল-কর্মণ্য নিয়ামক দ্রব্য উৎপাদনের ইতিবৃত্ত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনীকে সাবান তৈরির উপযুক্ত চর্বি আমদানী থেকে বঞ্চিত করা হলো। ইত্যবসরে জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানীরা আলকাত্‌রা শ্রেণীর পদার্থ (যা সেখানে পর্যাপ্ত) থেকে মালিন্যমোচক পদার্থগুলি তৈরির জন্যে মনোনিবেশ সহকারে পরীক্ষা চালিয়ে কৃতকার্য হলেন (তাঁদের গবেষণাপ্রসূত একটি যুদ্ধকালীন যৌগ পেটেন্টে গৃহীত হলো। জিনিষটি আসলে আলকাত্‌রাভিত্তিক এক পরিষ্কারক দ্রব্য এবং এখনও ব্যবহৃত হয়)।

যুদ্ধোত্তর কালে জার্মেনীতে আবার চর্বির বাজারের মন্দা কেটে গেল। তখন পর্যাপ্ত সরবরাহের দরুণ রাসায়নিক পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির প্রতি আগ্রহ কমে এল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান রসায়ন-বিজ্ঞানীরা নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির উদ্ভাবনকালে স্বভাবতঃই সাবানকে তাঁদের অনুকৃতি হিসেবে সামনে রেখে গবেষণা চালিয়েছিলেন।

অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ৬০° সেন্টিগ্রেড ঈষৎ উষ্ণ জলে সাবান বেশী কার্যকর ও ফলদায়ক। পাতিত জল ব্যবহৃত হলে খুবই ভাল এবং সে ক্ষেত্রে (কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া) নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির চেয়েও অনেক বেশী হিতকর। খরজলে (Hard water) ধৌতকরণ সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যেই নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির সূচনা, তবে খরজলে সাবানের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয়, তার জন্যে সোডিয়াম সিলিকেট, সোডিয়াম ট্রাই-পলিফস্‌ফেট (সাবানের সঙ্গে) যুক্ত করবার পদ্ধতি মামুলী। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য খরজলে খুব মিহি অধঃক্ষেপের সৃষ্টি করে, যা ধৌতকালে অপসৃত হয়। অনুরূপভাবে নিঃসাবান পরিষ্কারক

দ্রব্যগুলির ভিতরও সিলিকেট দেবার কথা শুনতে পাওয়া যায় বা প্রস্তাব করা হয়েছে সময়ে সময়ে।

১৮১১-২৩ খৃষ্টশতকে শেভ্রলের (Chevreul) অমূল্য গবেষণাবলীর ফলে সাবানের রাসায়নিক গঠনপ্রণালী বেশ ভালভাবেই জানা গিয়েছিল। সাবানের সংযুতি (Composition) হলো, দীর্ঘ রেখা বা সমসূত্রাকার কার্বন শৃঙ্খলের (Long straight carbon chain) কার্বোক্সিলিক অম্লগুলির (তথাকথিত মেদজ অম্ল—Fatty acids) সোডিয়াম লবণ। রসায়নবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মেদজ অম্ল ও অম্লের লবণ নিম্নোক্তরূপ :—

R_1—COOH   R—COONa

মেদজ অম্ল   মেদজ অম্লের লবণ (=সাবান)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে —COOH অংশটি (যাকে বলা হয় কার্বোক্সিল গ্রুপ বা সমবায়) খরজলে অবস্থিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগ্নেসিয়াম লবণের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে আঠালো দইয়ের মত ঘন অধঃক্ষেপের সৃষ্টি করে। বয়নশিল্পে এটাই রঞ্জনকার্য সুষ্ঠুভাবে হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বয়নশিল্পে যদি অম্লঘটিত দ্রবণ থাকে, তবে তাতেও সাবান থিতিয়ে যায়।

এমন অবস্থায় এমন এক কৃত্রিম দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যাচ্ছিল, যা দিয়ে পরিষ্কার করবার কাজের হার (সাবানের চেয়ে) বেশী হবে, অথচ তা খরজলের কুপ্রভাবমুক্ত হবে। জার্মেনীর বহু অংশে খরজলের অবস্থিতির দরুণ বয়নশিল্পে সাবান ব্যবহার কালে গ্রাহ্যজনক ভাবে অর্থনৈতিক ক্ষতি হচ্ছিল (প্রামাণ্য ভাবে জানা যায় যে, ১ গ্রেন খরতাসম্পন্ন হাজার গ্যালন জল প্রায় দেড় পাউণ্ড পরিমাণ সাবান 'খেয়ে ফেলে', অর্থাৎ দেড় পাউণ্ড পরিমাণ সাবান বৃথা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তারপর অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার করলে তবে ফেনাসহ পরিষ্কার করবার শক্তির সূত্রপাত দেখা যায়। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যেখানে গ্যালন প্রতি ২০ গ্রেন খরতা (Hardness) রয়েছে, সে জলে সাবান ব্যবহার করাই মূর্খতার পরিচায়ক।

সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো এই যে, পূর্বোক্ত কার্বোক্সিল সমবায়টিকে অপসারণ করা অথচ সাবানের মূল রাসায়নিক গঠনভঙ্গীমা অনড় থাকবে। যে সব তল-কর্মণ্য নিয়ামকের পূর্ব-বর্তী হলো সাবান, তাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই দুটি অংশ রয়েছে, যে দুটি জলীয় দ্রবণে পরস্পর বিরোধী ধর্মের পরিচয় দেয়।

এক অংশকে বলা হয় জল বিরোধী (Hydrophobic, গ্রীক শব্দ Hydro অর্থ জল, Phubos অর্থ ভীতি) ভাগ [সাবানের বেলায় কার্বন পরমাণুর সরল শৃঙ্খল, এই পরমাণুগুলি পরস্পর গ্রথিত এবং হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত]। তল-কর্মণ্য নিয়ামক গোষ্ঠীতে এই অংশ হলো হাইড্রোকার্বন রেসিডিউ।

আর দ্বিতীয় অংশটিকে আখ্যা দেওয়া যাক জলান্বেষী (Hydrophilic, গ্রীক Philos শব্দার্থ প্রেমী)। [সাবানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটা হলো কার্বোক্সিল সমবায়] আর অধিকাংশ তল-কর্মণ্য নিয়ামকে এই অংশটি হলো সোডিয়াম সালফোনেট সমবায় (বা গ্রুপ)। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, জলান্বেষী অংশটি জলবিরোধী অংশের ঠিক বিপরীত-ধর্মী। এক কথায় এর জলের প্রতি আচরণ সৌহার্দ্যমূলক।

এদের আচরণ ও স্বরূপ

এখন তল-কর্মণ্য নিয়ামক দ্রব্যগুলির অতুলনীয় আচরণ কি? এক কথায়, এদের অণুর যে কোন অর্ধাংশ বাকী অর্ধাংশের ঠিক বিপরীত-ধর্মী। জলান্বেষী অংশ সমস্ত অণুটিকে দ্রবণের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। আর জলবিরোধী অংশ বল প্রয়োগ করে বিপরীতভাবে। ফলে

জলাম্বেষী জলে শিকড় গেড়ে বসে যায়, আর অপর অংশ (জলবিরোধী অংশ) জলের তলদেশ থেকে দূরে বাতাসের দিকে ফিরে চলে। (যদি তেল-জলের আস্তরণের কথা বিবেচনা করা যায় তবে জলবিরোধী অংশ জলের তল বা পৃষ্ঠদেশ থেকে উর্ধ্বে তেল অভিমুখে ধাবিত হয়)। বাতাস-জল অথবা তেল-জলের অন্তস্তলে তল-কর্মণ্য নিয়ামক বা অণুগুলির অতিমাত্রায় সমাবেশ পৃষ্ঠ বা তলদেশের ভৌত (Physical) অবস্থার পরিবর্তন সাধিত করে; যার ফলে সিক্তকরণ, অবদ্রবীভবন (Emulsification), পরিষ্করণ (Detergency) এবং বিক্ষিপ্তকরণ (Dispersion) অবস্থার উদ্ভব হয়।

তল-কর্মণ্য নিয়ামক যৌগের প্রকৃষ্টতম ও প্রাচীনতম হলো সাবান—

R—CO O—Na

(এখানে R=হাইড্রোকার্বন অংশ এবং —CO ONa অংশ জলাম্বেষী অংশ)। তল-কর্মণ্য নিয়ামকের গুণগুলি তখনই প্রকাশ পায়, যখন $R=C_{12}$, অন্ততঃ—এটাই হলো একটি প্রয়োজনীয় প্রতিপাদ্য বিষয়।

তল-কর্মণ্য নিয়ামক যৌগসমূহ চারটি মুখ্য পর্যায়ে বিভক্ত :—

(১) অ্যানায়োনিক (Anionic),
(২) নন-আয়োনিক (Non-ionic),
(৩) ক্যাটআয়োনিক (Cationic),
(৪) অ্যাম্ফোটেরিক (Amphoteric)।

তল-কর্মণ্য নিয়ামকগুলির অধিকাংশ আয়োনিক পর্যায়ভুক্ত। জলীয় দ্রবণে এই শ্রেণীর যৌগগুলি তড়িদ্বাহী ক্ষুদ্রাংশে (যাদের বলা হয় Ions) বিভক্ত হয়। এদের অর্ধাংশ অধিকার করে ঋণাত্মক তড়িৎ (Anions), পক্ষান্তরে অপর অর্ধাংশ ধনাত্মক (Cations)।

অ্যানায়োনিক তল-কর্মণ্য নিয়ামকগুলিতে জলবিরোধী অংশ ঋণাত্মক তড়িদ্বাহী অ্যানায়ন, আর ক্যাটায়ন হলো ধনাত্মক তড়িদ্বাহী সোডিয়াম পরমাণু।

অ্যানায়োনিক পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়—

কার্বোক্সিলিক অম্লসমূহ,
সালফিউরিক এষ্টারগুলি,
অ্যালকেন সালফোনেটসমূহ
এবং অ্যাল্কিল অ্যারিল সালফোনেটসমূহ।

এগুলির মধ্যে প্রসাধনে সালফিউরিক এষ্টারগুলি অতীব প্রয়োজনীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সালফেট সমবায় (বা গ্রুপটি) জলবিরোধী অংশে সরাসরি যুক্ত অথবা কোন মধ্যবর্তী বাঁধনের মাধ্যমে। সোডিয়াম লরিল সালফেট—

$$CH_3\ (CH_2)_{10}\ CH_2\ O\ SO_3\ Na$$

প্রসাধন ও অঙ্গরাগের সামগ্রীতে ফেনাদায়ক ও পরিষ্কারক দ্রব্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাল্কিল সালফোনেট জাতীয় যৌগগুলির মাল পরিবহন বেশী মাত্রায় হয়। এগুলি ডোডেকাইল বেঞ্জিন, কেরাইল বেঞ্জিন অথবা ডোডেকাইল টলুইন ভিত্তিক। শিল্পে এদের ব্যবহারের মূলে অর্থনৈতিক সুবিধাই হলো প্রধান কারণ এবং গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির মধ্যে এরা অন্যতম প্রধান, তবে প্রসাধনে এরা কম মাত্রায় প্রযুক্ত হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ Nonionic) পর্যায়-ভুক্ত পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়েকটি তেলে ; যেমন—Spans।

তৃতীয় শ্রেণীর (অর্থাৎ Cationic) পরিষ্কারক দ্রব্যসমূহকে অ্যামিন সণ্ট অথবা কোয়াটারনারী অ্যামোনিয়াম যৌগসমূহে বিভক্ত করা হয়। প্রথমোক্তগুলির পর্যায়ে পড়ে স্যাপামিন (Sapamines) এবং শেষোক্তগুলির প্রতিনিধিমূলক হলো—সিটাইল ট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম ব্রোমাইড।

তল-কর্মণ্য নিয়ামক যৌগসমূহের বিশ্লেষণ

কালে প্রধানতঃ দেখা হয়—সর্বসমেত ক্রিয়াশীল ও যুক্ত মেদজ উপাদানের পরিমাণ, pH অঙ্ক, অজৈব লবণের পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়।

এদের রাসায়নিক শ্রেণী বিভাগ

নিম্নোক্ত ছয়টি মুখ্য শ্রেণীর নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যরাজি ঐ জাতীয় সংশ্লেষিত দ্রব্যাদির উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগের বেশী পরিমাণের জন্যে দায়ী—

(১) ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট,
(২) ফ্যাটি অ্যাসিড কণ্ডেনসেসন দ্রব্যসমূহ,
(৩) অ্যাল্কিল সালফোনেটসমূহ,
(৪) অ্যাল্কিল অ্যারিল সালফোনেটসমূহ,
(৫) সেকেণ্ডারি অ্যাল্কিল সালফেটসমূহ,
(৬) নন-আয়োনিক দ্রব্যাদি।

ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেট এবং অ্যাল্কিল অ্যারিল সালফোনেটগুলি Anionic ধরণের ভিতরে পড়ে। Cationic পর্যায়ের যৌগগুলি তল-কর্মণ্য নিয়ামকরূপে তেমন কার্যকর নয়; তবে তাদের জীবাণুনাশক শক্তি অমোঘ এবং সেই হিসাবেই তাদের মুখ্য ব্যবহার। আর Non-ionic পর্যায়ের পদার্থগুলি নিতান্ত সংখ্যালঘু নয়। মার্কিন মুলুকে সমস্ত বাজারে এর শতকরা ২৫ ভাগ সংগঠিত করে এবং এই সংখ্যা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী। এরা নবাগত নয়, ১৯২০ নাগাদ পেটেন্ট দ্বারা এদের সংরক্ষণ করবার চেষ্টা হয়ে এসেছে। অতি সাধারণ Non-ionic হলো ইথক্সিলেটেড নোনাইল ফিনল। ফিনলের সঙ্গে ট্রাইপ্রোপাইলিনের সহযোগে উৎপন্ন নোনাইল ফিনল ভিত্তিটি ইথিলিন অক্সাইডের রাসায়নিক প্রক্রিয়াজাত। পেট্রোলিয়াম শিল্পজাত ট্রাইপ্রোপাইলিন সহজলভ্য। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে ইথক্সিলেটেড নোনাইল ফিনলের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২৫ মিলিয়ন পাউণ্ড।

প্রায়ই কতক কতক অতিরিক্ত উপাদান (যাদের Additive বা Builder বলা হয়—যেমন—পলিফসফেট, কারবক্সিমিথাইল সেলুলোজ এবং সিলিকেট) যুক্ত করে এবং ঈপ্সিত ক্ষারত্বের মাত্রা নির্ধারণের দ্বারা সব দিক দিয়ে পরিষ্করণ ক্ষমতা এমন ভাবেই বর্ধিত করা যায় যে, সাবানের সমকক্ষ তো হবেই (তার চেয়ে বেশী না হলেও) অথচ সাবানের দোষমুক্ত হবে।

সাবানের সঙ্গে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের একটা তুলনা করা চলতে পারে। সাবান মানেই তো অনেকগুলি কাঁচা মালের সমাহার—বিভিন্ন শৃঙ্খল দৈর্ঘ্যযুক্ত মেদজ অম্লসমূহ ইত্যাদি। এই নীতির পরিবর্ধনের দ্বারা নিঃসাবান পরিষ্কারকগুলির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুফল পাওয়া গেছে। উদাহরণ-স্বরূপ Tide নামে প্রচলিত (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য উভয় দেশেই বিক্রয় হয়) দ্রব্যটির কথা ধরা যাক। এটি অ্যাল্কিল অ্যারিল সালফোনেট ও প্রাইমারী অ্যাল্কিল সালফেটের মিশ্রণজাত। সাধারণ সাবানের সংযুক্তি অনুসরণ করে Tide তৈরি হবার সুফল লাভ করা গেছে। এটি অবশ্য অনেক উদাহরণের মধ্যে একটি। মেদজ অম্লের (যথা, সাধারণভাবে R.COOH) —COOH গ্রুপটির পরিবর্তন সাধনে গবেষকগণ প্রথম প্রথম তৎপর হয়েছিলেন। আর সেই সঙ্গে অধিকতর ক্ষমতাবান জলাদ্বেষী গ্রুপের প্রবর্তনের কথাও চিন্তা করা হয়েছে (যাতে খরজলে কোন রকম বেগ পেতে না হয়)। মেদজ অম্ল অথবা তাদের এস্টারগুলিকে পরিবর্তনের দ্বারা তথাকথিত ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেটের সূচনা করা। আসলে এদের সংযুতি সাবানেরই অনুরূপ—কিন্তু অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন জলাদ্বেষী অংশ সমন্বিত। আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেছে —ফ্যাটি অ্যালকোহল সালফেটগুলি অতি মনোরম পরিষ্কারক দ্রব্য হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে (বলা বাহুল্য খরজলে অধিক মাত্রায় এদের স্বকীয়ত্ব বজায় থাকে)। শিল্পে ও

গৃহস্থালীতে এদের শতসহস্র প্রয়োগবিধি রয়েছে।

অন্য ভাবেও চেষ্টা চললো —COOH অংশকে এস্টারে (অথবা কোন অ্যামাইডে) রূপান্তরিত করে। সময়ে সময়ে (বিপরীত শেষভাগে সোডিয়াম সালফোনেট গ্রুপ সমন্বিত) অ্যামিনেও রূপান্তরিত করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এরূপে প্রাপ্ত যৌগগুলির বাণিজ্যিক আখ্যা Igepon (আমেরিকায় General Aniline & Film Corporation কর্তৃক প্রস্তুত)। অতি মাত্রায় কার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় দীর্ঘকাল যাবৎ এরা শুধু বয়নশিল্প পদ্ধতিকরণেই সীমিত থাকে নি, উপরন্তু চর্ম প্রণালীকরণ (Processing), ধাতব পৃষ্ঠ তৈরি এবং লম্বা বারের (Bar) আকারে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের অন্যতম উপাদান-রূপেও প্রযুক্ত। শেষোক্ত শ্রেণীর পদার্থগুলিতে ত্বকের উপর কোমল ভাবাপন্ন হওয়ায় এদের মূল্যবান বা এককথায় অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ লম্বা বারের আকারে বিক্রীত নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। কুড়ি-একুশ বছর আগে কোন এক প্রতিষ্ঠান এই আকারে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য তৈরি বাজারে ছাড়লেন। তবে বাজারে এর চাহিদা জিনিষটির গুণগত কৃতিত্বের দরুণ নয়। ইউরোপে তখন দারুণ সাবান সঙ্কট। সাবানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু রয়েছিল। এরই প্রত্যক্ষ কারণে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যটি ক্রেতামহলে কিছুটা সমাদর লাভ করেছিল। তবে তখনও পর্যন্ত এই ধরণের জিনিষ কোনদিনই প্রসাধনী সাবানের জায়গা একেবারে জুড়ে বসতে পারে নি।

ধীরে ধীরে বারের আকারে উন্নত ধরণের নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য বাজারে দেখা দিল। অন্যান্য মার্কার ভিতর Zest নামে এক রকমের পদার্থ বাজারে নাম করেছিল। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে জানা যায়, এটি ব্যবহারের ফলে ত্বকের কোনরূপ ক্ষতি হতে দেখা যায় নি, তবে সময়ে সময়ে একটু যেন শুষ্ক ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা ব্যবহারে বেসিন (Basin) পর্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যেত। কম সুবিধার কথা নয়! বারের আকারে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের পেটেন্ট নেবার কথাও শোনা গেছে; যেমন—বৃটিশ পেটেন্ট ৭৩১৩৭১ (৮/৬।১৯৫৫)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এক দশক কাল অবধি এই রকমের প্রারম্ভিক সাফল্য শুধু জার্মেনীতে নয়, মার্কিন মুলুক ও অন্যত্র গবেষণার কাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল। বাজারে এখন শতসহস্র রকমের একক তল-কর্মণ্য নিয়ামক পাওয়া যায়। সুতরাং এদের মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটির বিবরণ নীচে দেওয়া গেল।

পূর্বে যে জার্মান পেটেন্টের কথা বলা হয়েছে, তার ফলে অ্যাল্কিল অ্যারোমেটিক সালফোনেট জাতীয় তল-কর্মণ্য নিয়ামকসমূহের আবির্ভাব হয়েছিল। পেটেন্টের ধারা অনুযায়ী মূল পদার্থটি পাওয়া গিয়েছিল নিম্নোক্তরূপে—ন্যাপ্-থালিনের সঙ্গে আইসোপ্রোপানল অথবা বিউটানল শ্রেণীর অ্যালকোহলের রাসায়নিক পরিবর্তন। তারপর এই ভাবে লব্ধ জিনিষটিকে সালফিউরিক অম্লের সংস্পর্শে এনে কষ্টিক সোডা দিয়ে অনম্ল ও ক্ষারহীন (Neutralise) করে ফেলা। যুদ্ধোত্তর কালে এই ধরণের অ্যাল্কিল ন্যাপথালিন সোডিয়াম সালফোনেট 'Nekal' এই নামে বিক্রীত হতো। কোন কোন বয়নশিল্প প্রণালীকরণে তারা এখনও ব্যবহৃত হয়, যদিও এগুলি পরিষ্করণ ধর্মবর্জিত।

উল্লিখিত তল-কর্মণ্য নিয়ামকের গবেষণায় অতঃপর মোড় ফিরিয়ে দেওয়া হলো। ন্যাপথালিনের পরিবর্তে বেঞ্জিন ও পেট্রো-লিয়াম সহযোগে প্রস্তুত তল-কর্মণ্য নিয়ামকগুলির

উৎপাদনের ফলে প্রথম দেখা দিল—সস্তায় নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য (বলা বাহুল্য বেঞ্জিন ও পেট্রোলিয়াম এই দুটি জিনিষই সস্তায় পাওয়ার ফলে এই জাতীয় নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের দামও কম হয়েছিল)। আর এটাই হলো সাবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আশঙ্কাস্বরূপ। বয়নশিল্পে পরিষ্কার করবার কাজে এটা অতি-দ্রুত হারে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়। ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রেও এর প্রবেশ ঘটেছিল, কিন্তু শীঘ্রই তার জায়গা একচেটে ভাবে অধিকার করে বসলো DBS (ডোডেকাইল বেঞ্জিন সালফোনেট)। এর জলবিরোধী অংশটি পেট্রোলিয়ামজাত অল্প মূল্যের টেট্রাপ্রোপাইলিন ও বেঞ্জিনের দ্বারা গঠিত। এদের ফেনা এত বেশী হতো যে, নদীতেও ফেনার সৃষ্টি হতো এবং কলের জলে তা সময়ে সময়ে এসে পড়তো। এটাই ছিল এর বৈশিষ্ট্য ও প্রধান অসুবিধাও বটে। এখানেই প্রাণাবনমনকারী (Biodegradable) নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাবে।

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যরাজির বাণিজ্যিক শ্রেণীবিভাগ

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের রসায়নগত শ্রেণীবিভাগ আমরা আগেই জেনেছি। প্রধান প্রধান কয়েকটি নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য (তাদের ব্যবসায়গত নামসহ) ও তাদের বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেওয়া গেল—

প্রথমতঃ Nacconol NR, Santomerse 1, Grontite, Swerl—কাঁচামাল প্রধানতঃ ক্লোরিন গ্যাস ও কেরোসিন। পশমী বস্ত্র ধৌতকালে এরা বিশেষ সহায়ক। **দ্বিতীয়তঃ** Duponol WA, Gardionol WA, Igepon AP, Dreft, Vel, Shampoo, Derene, কাঁচামাল নারকেল তেল। এরা সাবানের চেয়ে বেশী মূল্যবান, খরজলে কার্যকর, গরম জল বা অম্লের সংস্পর্শে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর উদাহরণ MP।৪৭। এই জাতীয় অনুকল্প পেট্রোলিয়াম সালফার-ডাইঅক্সাইড এবং ক্লোরিন গ্যাস থেকে প্রস্তুত। তীব্র ক্ষার বা অম্লের সংস্পর্শে এরা নষ্ট হয় না। এদের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। চতুর্থ শ্রেণীর উদাহরণ Aerosol ot, Nacconollal ইত্যাদি। কাঁচামাল ম্যালেইক বা ফিউমারিক অম্ল বা অ্যাসিড। রঞ্জনশিল্পে এদের প্রয়োগ দেখা যায়। পঞ্চম শ্রেণীর উদাহরণ Igepon T, এটা বয়নশিল্পে প্রযুক্ত। ষষ্ঠ শ্রেণীর অনুকল্পের কয়েকটি Ceepryn, Roccal, Zephiron। এরা আদর্শ শোধক, রোগ-জীবাণু নাশক, পচন নিবারক, অথচ কোন রকম ক্ষতিসাধন করে না। সপ্তম পর্যায়ভুক্ত Santomerse DT (এটি উত্তম পরিষ্কারক দ্রব্য অথচ আশ্চর্যের বিষয় ধৌতকালে কোন ফেনার সৃষ্টি হয় না), Tweens, Pergal O, আর কোয়াটারনারী অ্যামোনিয়াম যৌগসমূহের (সংক্ষেপে Quats নামেও প্রচলিত) কথা পরে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

উপরের নামগুলি মুখ্যতঃ আমেরিকা মহাদেশে প্রচলিত। প্রত্যেক দেশেই নামকরণ ভিন্ন হতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ফরাসী দেশে এরকম কয়েকটি প্রচলিত নাম—Sipons (Sinnova), Primatex (Francolor), Meliorans (Beycopal), Sodapon T, Enerpon, Galoran, Solepals, Amitex TB, Ekasol D, Ekasol H ইত্যাদি।

এক বিশেষ শ্রেণীর তল-কর্মণ্য নিয়ামকের বৈশিষ্ট্য

এখন কোয়াটারনারী অ্যামোনিয়াম যৌগসমূহের (Quaternary ammonium compounds) বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন। কখনও কখনও এদের

কোয়াটারনাইস আখ্যাও দেওয়া হয়ে থাকে। এদের প্রয়োগের ক্ষেত্র কিছুটা ব্যাপক। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এদের সূচনা হলো; প্রোন্টোসিলের আবিষ্কর্তা ডোমাক (Domagk) এদের প্রবর্তক। এদের অতি প্রয়োজনীয় দুটি ব্যবহার হলো—(শল্যক্রিয়ার পূর্বে) শল্যচিকিৎসক ও রোগীর ত্বকের শোধনে এবং শল্যযন্ত্রাদির জীবাণু-নাশকতামূলক কাজে। আগেই বলা হয়েছে যে, এরা Cationic পর্যায়ভুক্ত সুষ্ঠু পরিষ্কারক দ্রব্য এবং পৃষ্ঠটানকে বেশী পরিমাণে হ্রাস করে থাকে। এরা রোগ-জীবাণু, বিশেষ করে Staphylococci নামক জীবাণুর দ্রুত হারে বিনাশ ঘটায়। পুঁজ, রক্ত, তন্তুর ভগ্নস্থান ইত্যাদি এদের জীবাণুনাশক ক্রিয়াকলাপ কমিয়ে থাকে।

একক যৌগ (যার মধ্যে সালফোন অ্যামাইডের ধর্ম ও তল-কর্মণ্য গুণাবলীর সমাবেশ রয়েছে) ইতিমধ্যেই সংশ্লেষিত হয়েছে। এদের নাম সিটাইল ট্রাইমিথাইল অ্যামোনিয়াম, সিটাইল পিরিডিনিয়াম এবং লরিল পিরিডিনিয়াম লবণ।

এই শ্রেণীর যৌগগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দেখা গেছে যে, সোডিয়াম ষ্টিয়ারেট এবং সোডিয়াম লরিল সালফেটজাতীয় Anionic পরিষ্কারক দ্রব্যের উপস্থিতিতে কোয়াটারনারী অ্যামোনিয়াম যৌগসমূহের জীবাণুনাশক ক্ষমতা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

কোয়াটারনারী অ্যামোনিয়াম যৌগসমূহের অনেকগুলির আর এক বৈশিষ্ট্যও ধরা পড়েছে। কেশকলাপে এরা ব্যবহৃত হচ্ছে; কারণ এরা দোষমুক্ত এবং (তীব্র ধরণের) অন্যান্য পদার্থের মত চুলের ক্ষতিসাধন করে না।

পরীক্ষার পর এই রকম সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে, (গ্র্যাম-নেগেটিভ অপেক্ষা) গ্র্যাম-পজিটিভ জীবাণুরাশির বিরুদ্ধে কোয়াটারনারী যৌগগুলি অধিকতর কার্যকর। এরকম নির্দেশিত হয়েছে কোয়াটারনারী যৌগসমূহের উৎপাদন-কারীরা যেন নজর রাখেন যে, তাঁদের যৌগগুলি এমনভাবে বাজারে ছাড়া হয় যেন জীবাণুনাশকটি হঠাৎ ক্ষারধর্মী অথবা নিষ্ক্রিয় (Neutral) হয় (ঈষৎ অম্লাত্মক যেন না হয়)। কারণ এই রকম পরিবেশে জীবাণুনাশক শক্তির যথেষ্ট বিকাশ দেখা যায়। তবে এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম দেখা দেখা যাবে সিটাইল পিরিডিনিয়াম ক্লোরাইড পদার্থটিতে, অম্লধর্মী দ্রবণে এটি সবচেয়ে বেশী মাত্রায় শক্তিশালী।

কোয়াটারনারী যৌগসমূহই যে একমাত্র জীবাণুনাশক তা নয়, নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের মধ্যেও এই ধর্ম ধরা পড়েছে। মাত্র দু-একটির বিবরণ এখানে দেওয়া গেল (তবে এগুলির মধ্যে কোন কোনটির নিজের নাশকতামূলক ক্ষমতা তেমন প্রবল না হলেও দ্রাবক, বাহক হিসাবেই প্রযুক্ত হচ্ছে)। জীবাণুনাশকের ভিত্তিরূপে সোডিয়াম লরিল সালফেটের নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। কতকগুলি সেকেণ্ডারী অ্যাল্কিল সালফেটের নাকি জীবাণু বিনষ্ট করবার অপূর্ব ক্ষমতা রয়েছে।

এদের ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা

অবশ্য নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির ব্যবহারের ফলে যে একেবারেই কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি—তা নয়। নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির ক্রমবর্ধনোন্মুখ ব্যবহারের ফলে যে প্রধান সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা হলো নর্দমার পঙ্ককুণ্ড অপসারণ। পাঁকের ভিতর এরা রয়ে গিয়ে এমন প্রচুর ফেনার সৃষ্টি করে যে, পঙ্ক-অপসারণ যন্ত্রে যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়। জানা গেছে যে, ৫০০০ অধিবাসীযুক্ত এক নগরে একটি নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য (যা প্রতি ঘরে বিতরণ করা হয়েছিল) ব্যবহারে স্থানীয় পঙ্ক-কেন্দ্রে পাঁচ ফুট উচু ফেনার সৃষ্টি হয়।

অবিবেচকের মত নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি ব্যবহারের ফলে ত্বকের উপর অপক্রিয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। এটা সুস্পষ্ট যে, ঠিকমত ব্যবহার করলে ত্বকের কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। প্রতিরোধকল্পে কখনও কখনও এক রকম ক্রীমের (যাকে বলা হয় Barrier cream) প্রচলন হয়েছে। বিশেষ বিশেষ কাজের উপযোগী ও বিশেষ ধরণের ধৌতকার্যে এই রকমের নিঃসাবান জিনিষগুলি কতটা মাত্রায় ব্যবহার করা নিরাপদ ও বিজ্ঞানসম্মত, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তার মাত্রা বেঁধে দেন তাহলে এই জাতীয় ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচা যায়।

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও অনেক রকম চেষ্টা চলেছে। এটা সুবিদিত যে, অধিকাংশ এই শ্রেণীর জিনিষই সাবানের সঙ্গে মিশ্রণযোগ্য নয়। সাবানের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে ফেনার ক্ষেত্রে দাঁড়ায় মহতী বিনষ্টি। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রমও রয়েছে অনেক।

অনেকগুলি পরীক্ষাকার্য চালাবার ফলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে, নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির এককভাবে যেটুকু পরিষ্কার করবার শক্তি আছে, বিজ্ঞানানুগ একাধিক নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের মিশ্রণে সুফল লাভ করা যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে (অনুরূপ ভাবে সুফল পাওয়া যায় সাবান এবং কয়েক শ্রেণীর নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের সুষ্ঠু মিশ্রণে)। আবার এটাও পরীক্ষালব্ধ সত্য যে, অধিকমাত্রায় কম শক্তিশালী নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের সঙ্গে অতিমাত্রায় শক্তিশালী নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য অল্প মাত্রায় মিশ্রিত হলেও সুফল লাভ করা যায়।

দু-জন আমেরিকান বিজ্ঞানী কার্বোক্সি-মিথাইল সেলুলোজ (CMC) সহযোগে সাবান ও নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের মিশ্রণ বিষয়ক গবেষণা চালিয়েছিলেন। তাঁদের মতে, অ্যাল্কিল অ্যারিল ধরণের সংশ্লেষিত পরিষ্কারক দ্রব্য, সাবান ও CMC-এর এমনই মিশ্রণ তৈরি করা সম্ভব, যা খরজলে ব্যবহারোপযোগী। সর্বোচ্চ পরিষ্করণের জন্যে সাবান ও নিঃসাবান কৃত্রিম পদার্থের অনুপাত ৫ ও তার সঙ্গে অল্প মাত্রায় CMC। এসব ক্ষেত্রে ফেনপুঞ্জের পরিমাপ স্থিরীকৃত হয় গাঢ়ত্ব বা ঘনত্বের দ্বারা। ঘনত্ব-নিরপেক্ষ অধিক ফেনার জন্যে সাবান ও নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের অনুপাত হলো ½।

হোটেলে জলযোগের স্থানে, অন্নসত্রে কাচের থালা, গেলাস, কাপ ও অন্যান্য পানপাত্র আগেকার দিনে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলা হতো। আর সেই সাবান দ্রবণের জন্যে যে জলটুকু ব্যবহার করা হতো, তার মাত্রা ছিল সীমিত। তাতেই বেশ কিছু সংখ্যক থালা, ঘটি-বাটি, গেলাস পরিষ্কার করা যেতো।

কিন্তু নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি ব্যবহারের ফলে অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত রকমের। নির্দিষ্ট পরিমাণ নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য যত বেশী পরিমাণ জলে দ্রবীভূত হবে, তত বেশী সংখ্যায় পাত্রাদি পরিষ্কার করা সহজ হবে। এই সুবিধা কম লাভের কথা নয়। সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, অনেকখানি ওজনের সাবান সীমিত মাত্রায় জলের সান্নিধ্যে যে পরিষ্করণের কাজ চালিয়ে যাবে, সামান্য পরিমাণ নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য অত্যধিক পরিমাণ জলের সঙ্গে সেই একই উদ্দেশ্য সাধন করে আরো সুষ্ঠুভাবে।

আর শুধু যে বাসনপত্র পরিষ্কারের কাজেই নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে তা নয়, অনেক সময়ে তরিতরকারির উৎকট গন্ধও এদের দ্বারা দূর করা যায়। ধরা যাক, পেঁয়াজ কাটা হয়েছে। কাটবার পর বিশেষ প্রকারের নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যটির সাহায্যে হাত পরিষ্কার করলে পেঁয়াজের গন্ধ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাবে। তারপর সেই নিঃসাবান দ্রব্যটির জল

নর্দমা দিয়ে নিম্নগামী হবার পথে নর্দমার ময়লাও সঙ্গে নিয়ে যাবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং সব দিক দিয়ে বিচার করলে এই শ্রেণীর দ্রব্যগুলি সাবানের অনুকল্প (Substitute) হবার চেয়ে আরও অনেক কিছু এবং তাদের উৎপাদনও সার্থক হয়েছে বিজ্ঞানীদের আনুকূল্যে।

বিবিধ তথ্যপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

তল-কর্মণ্য নিয়ামকদের সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। ১৯৪১ খৃষ্ট শতকে আমেরিকায় নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৬০০০ টন; ১৯৪৭ সালে ২০,০০০ টন এবং ১৯৫০ সালে ৫০০,০০০ টন। ১৯৬৪ সালে প্রামাণ্যভাবে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩০০ প্রতিষ্ঠানে এই রকমের ৪০০০ একক (Individual) যৌগ প্রস্তুত হতো। (১৯৬৩ সালে উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল ৫০০০ মেট্রিক-টন। বৈশিষ্ট্যময় ৪০০০ যৌগের সিন্ধুমন্থন সহজসাধ্য নয়। বিশেষ বিশেষ কাজের উদ্দেশ্যে এক-একটি যৌগ হিতকর। কোনটি পশম পরিষ্কারে, কোনটি রেশম, কোনটি ভুষাযুক্ত চিম্‌নি পরিষ্কারের কাজে আসে। কোন্ কাজের জন্যে কোন্ নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য বেছে নেওয়া হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে সুখের বিষয়, উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহও তথ্যমূলক প্রচার ও বিবৃতির দ্বারা ক্রেতাদের সহযোগিতা করে থাকেন।

তল-কর্মণ্য নিয়ামকবর্গের স্বরূপ বড় বিচিত্র। সহস্র সহস্র যৌগের ভিতর মাত্র দু-একটি কোন বিশেষ কাজের উপযোগী! বিষয়টির গুরুত্ব এখানেই উপলব্ধি করা যাবে। নিঃসন্দেহে এই সব যৌগের রাসায়নিক গঠন-ভঙ্গীমাই তাদের বিশেষ ধরণের কাজের উপযোগী করে তোলে। রাসায়নিক সংযুতির সামান্য অদল-বদলের ফলে তাদের কার্যকারিতায় দেখা যায় রহস্যজনক বিপুল প্রভাব।

তল-কর্মণ্য নিয়ামক দ্রব্যগুলির বর্গীকরণ ব্যাপারটি হলো আপোষমূলক। সিক্তকরণ, পরিস্রবণ ক্ষমতা, অবদ্রবীভবন ক্ষমতা ইত্যাদি সব ধর্মগুলিই এক-একটি যৌগে রয়েছে—তবে এদের মধ্য থেকে যে কোন একটি ধর্ম অপরগুলি থেকে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে ও মাত্রাধিক্য ঘটায়। এটাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার শৈল্পিক প্রয়োগে।

কয়েক বছর আগে আমেরিকার Sugar Research Foundation Inc. শর্করার প্রায়োগিক ব্যবহারের নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। চিনিকে কাঁচামালের উৎসরূপে এবং জৈব সংশ্লেষণে অবদান জোগাবার কাজে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার উন্মেষে এঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। তল-কর্মণ্য নিয়ামকের অণুর জলান্বেষী অংশের সমস্তটায় অথবা অংশতঃ চিনি ব্যবহারের সম্ভাবনামূলক মূল্যায়নে গবেষণাকার্য চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শর্করাভিত্তিক প্রায় ২৪টি তল-কর্মণ্য নিয়ামক তৈরি করা গেছে। সুখের বিষয় এই যে, তাদের মধ্যে কয়েকটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বেশী।

সাবান, Fatty alcohol sulphate এবং সরল হাইড্রোকার্বন শৃঙ্খলের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত অনুরূপ যৌগগুলি মৃদু (Soft) পরিষ্কারক রূপে জ্ঞাত এবং নর্দমার জীবাণুরাশির দ্বারা সহজে বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে শাখান্বিত শৃঙ্খলের পদার্থগুলি (যেগুলি নালার জীবাণুগোষ্ঠীর দ্বারা বিনাশশীল নয়) খর (Hard) পরিষ্কারক নামে প্রচলিত।

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ যে, জাপান দ্রুতগতিতে মৃদু পরিষ্কারকগুলি প্রস্তুতের কাজে এগিয়ে চলেছে। এই ধরণের পরিষ্কারক দ্রব্য উৎপাদনে সরলরেখাকার (Linear) অ্যাল্কিল বেঞ্জিন, প্যারাফিনগুলি ও উচ্চবর্গের অ্যালকোহল সমেত অন্যান্য কাঁচামাল উৎপাদনের অগ্রগতি-

মূলক প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির পরিবর্তন সাধনে জাপান অগ্রসর হয়ে চলেছে।

জাপানে এদের অগ্রগতি

বর্তমানে জাপানে মোট উৎপাদিত নিঃসাবান পরিষ্কারকদ্রব্যগুলির শতকরা ৩০ ভাগ মৃদু (যাদের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ সরলাকারের অ্যাল্কিল বেঞ্জিন ভিত্তিজাত এবং শতকরা ১০ ভাগ উচ্চবর্গের অ্যালকোহলভিত্তিক।

টোকিওর নিকটবর্তী Chiba অঞ্চলে Nissan Conoco Co., Ltd. ১৯৬৬ সালের মার্চ এমন সব যন্ত্রপাতি খাটিয়েছেন, যাতে বছরে ২০,০০০ টন অ্যাল্কিল বেঞ্জিন উৎপাদন হয়। অপর এক প্রতিষ্ঠান (যার নাম Japan Atlantic Co, Ltd.) অক্টোবরের পর থেকে উক্ত পরিমিত অ্যাল্কাইল বেঞ্জিন উৎপাদনের উপযোগী যন্ত্রপাতি খাটিয়ে চলেছেন। এছাড়া Mitsubishi Petro-Chemical Co., Tokyo Koatsu Industries Inc.-এর সঙ্গে একযোগে ২০,০০০ টনের উপযোগী যন্ত্রপাতি এবং Nippon Mining Co, Ltd. ৪০০,০০০ টন উৎপাদনের পরিকল্পনা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারীর ভিতর বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রস্তুত। এই শেষোক্ত প্রতিষ্ঠান প্যারাফিন শিল্পায়নে নিজস্ব পদ্ধতির কারিগরিতে সিদ্ধহস্ত। এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিই আমেরিকার কাছ থেকে এই বিষয়ে কারিগরি বিদ্যা অর্জনে আগ্রহী।

আগে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবসায়ীরা নৈসর্গিক তেল ও চর্বিজাত উচ্চবর্গের অ্যালকোহল ব্যবহার করতেন। এতে উৎপাদন খরচও পড়তো প্রচুর। ইদানীং মোম বা ইথিলিন থেকে কৃত্রিম অ্যালকোহল উৎপাদনের পরিকল্পনা এঁরা পেশ করেছেন। এদের নাম হলো—Kao Soap (উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২১,০০০ টন), Mitsui Chemical Industry Co., Ltd. (১৪,০০০ টন) এবং Mitsui Petro-Chemical Industries Ltd. (৪০,০০০ টন)। এছাড়া আরও একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা প্যারাফিনের অক্সিডেশন ও ইথিলিন অক্সাইড যুক্তকরণের দ্বারা উচ্চবর্গের অ্যালকোহল আহরণের পদ্ধতি গবেষণার ফলে বের করেছেন। এরা এখন পরীক্ষামূলক যন্ত্রপাতির বিষয় বিবেচনা করে দেখছেন।

বিভিন্নমুখী গবেষণা

গবেষণার দ্বারা নতুন নতুন শ্রেণীর নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের উদ্ভাবন প্রায়ই হচ্ছে। এরকমের গবেষণা কোন্ এক দেশ বা মহাদেশে সীমাবদ্ধ নয়। ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির বিবরণে এক জাতীয় বিবিধ পরিষ্কারক (Multi-cleanser) দ্রব্যের খবর প্রকাশিত হয়। এদের রসায়নগত নাম মরফোলিনিয়াম অ্যাল্কিল সালফেট। এরা অধাতব (Non-metallic) ও ক্ষারাত্মক ধর্মবর্জিত। সহজে এরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। ময়লা পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুনাশকেরও কাজ করে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, এরা ত্রিধা কার্যকর বিপরীত-ধর্মী সাবান (Invert বা Reverse Soap)। পূর্বেই আমরা জেনেছি যে, এরা মলিনতা তো দূর করে থাকেই, উপরন্তু জীবাণুনাশক। আবার সেই সঙ্গে তারা সিক্ত পদার্থের গন্ধও নষ্ট করে দেয়। শিরিষ, চামড়া প্রভৃতির কারখানার উৎকট গন্ধ দূর করতে এরা সমর্থ। ক্ষার ও অম্লে সমানভাবে মিশ্রণযোগ্য, নিখুঁতভাবে দানাদার, গন্ধবিহীন এবং আঠালো বা চট্‌চটে ভাব একেবারেই এদের মধ্যে নেই।

তল-কর্মণ্য নিয়ামকগুলি বিজ্ঞানী ও ক্রেতা মহলে অভূতপূর্ব কৌতূহল জাগায়। লণ্ডনের জনৈক বিজ্ঞানী একবার প্রস্তাব করেন যে, ধোঁয়াশা (Smog) বিতাড়নে তল-কর্মণ্য নিয়ামকগুলি বিশেষ ফলদায়ক—তারা নাকি ক্ষুদ্র জল

বিন্দুগুলির প্রবাহ সহজে ঘটায় এবং তুষার-দানা বাঁধতে পারে অল্প আয়াসে এদেরই উপস্থিতিতে। এক্ষেত্রে এরা সিলভার আয়োডাইড, ড্রাই আইস প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ।

আর নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য যে কত মূল্যবান, তার জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে ক্যানাডার টরন্টো সহরের পরীক্ষা থেকে। যে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যটির দ্বারা পরীক্ষা চালানো হয়েছিল, তার নাম Nacconol Nr.—কেরোসিনজাত একটি অ্যাল্কিল লরিল সালফোনেট। ২০০০ গ্যালন জলে পাঁচ পাউণ্ড পরিমিত দ্রব্যটি মাইলখানেক রাস্তা পরিষ্কারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এক্ষেত্রে সরু নলের সূচ্যগ্র মুখের চাপ ৩০—৬০ পাউণ্ড (প্রতি বর্গইঞ্চিতে) রাখা হয়েছিল। শুধু জলে যতটুকু পরিষ্কার-ক্রিয়া হয়, তার চেয়ে দ্বিগুণ মাত্রায় ফল লাভ করা যায়। তেল, গ্রীজ প্রভৃতি সাফল্যের সঙ্গেই দূরীভূত হয়। আর খরচ স্বভাবতঃই সাবানের চেয়ে কম পড়ে।

আর একটি নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের কথা ধরা যাক। এটির নাম Teepol। ভারতে বার্মা-শেল কোম্পানী এটি বিক্রয় করে থাকেন। এটি বহুভাবে ব্যবহৃত সেকেণ্ডারী অ্যাল্কিল সালফেট পরিষ্কারক দ্রব্য। যে সমস্ত জিনিষ পরিষ্কারে এটা ব্যবহৃত হয়, তা হলো—কাঠের জিনিষ, এনামেল, পেণ্ট, ডিস, লিনোলিয়াম, কাচের জিনিষ, কার্পেট, ওয়াশ বেসিন, টালি লাগানো দেয়াল, মোটর গাড়ীর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। দীর্ঘ ফিরিস্তি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে অন্য ব্যবহারের উল্লেখ করা হলো না। Teepol দিয়ে এত রকমের কাজ করা যায় এবং তাও অতি কম মাত্রায় (এক গ্যালন জলে সর্বোচ্চ দু-চামচ পরিমিত Teepol-এর দ্রবণই যথেষ্ট। এক চামচ = ১৪·১৮ গ্রাম ধরতে হবে)। বৃটিশ সরকারের পরিচালনাধীনে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পাঁকে (Sewage) যে হারে Teepol থাকে, তাতে পঙ্ক বিশোধিতকরণ প্রক্রিয়ার উপর এমন কিছু প্রভাব বিস্তার করে না অর্থাৎ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না।

এই রকমের দ্রব্যের সংখ্যা অগণিত। মাত্র একটির উদাহরণ উপরে বিস্তৃতভাবে দেওয়া গেল।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে যে, গৃহকর্ত্রীরা জলীয় নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেছেন। দ্রবণকাল ত্বরান্বিত হওয়ায় তাঁরা এতই সুবিধাবোধ করেন যে, তাঁরা ভুলে যান যে, বেশ কিছু পরিমাণ জল তাঁরা অর্থের বিনিময়ে কিনে থাকেন।

এদের ভবিষ্যৎ

তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি সাবানের স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাকে উচ্ছেদ করে চলবে? কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তা নয়। ইউনিলিভার লিমিটেডের বার্ষিক সভায় সার জিওফ্রে হেওয়ার্থ এই পরিণতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান যে, সাবান শিল্পের ক্ষতি স্বীকার করে কতকগুলি সংশ্লেষিত পরিষ্কারক দ্রব্যের ব্যবসায় দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু সাবান শ্রেণীর ও নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির মোট চাহিদা বর্ধনোন্মুখ। এই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে সংশ্লেষিত পরিষ্কারকগুলি যদি পাওয়া না যেত, তবে সাবানের এবং সে জন্যে স্বভাবজাত চর্বির চাহিদা এত হতো যে, তেল ও চর্বির দাম বৃদ্ধি ছাড়া পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব হতো। মার্জারিন প্রাপ্তি ও তার মূল্যও এতে বিঘ্নিত হতো।

সুতরাং কয়েক হিসাবে সংশ্লেষিত পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির আবির্ভাব যুদ্ধোত্তর অবস্থার উভয়তঃ সহায়ক হয়েছে—চর্বি মূল্যে স্থায়িত্ব এনে এবং রাসায়নিক শিল্পের নতুন শাখার প্রতিষ্ঠার দ্বারা।

বাস্তব ক্ষেত্রে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির অর্থনীতির উপর প্রভাব কি রকমের, তা দেখা

যাক। UCLA (যার পুরো তাৎপর্য হলো United Co-operative Laundries Association, Ltd.) নামক প্রতিষ্ঠানটির লিভারপুল, বার্কেনহেড, ম্যাঞ্চেষ্টার, ওয়ারিংটন ইত্যাদি স্থানে কারখানা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক বাণিজ্যিক মূলধন ১০ লক্ষ পাউণ্ড। সাবান ব্যবহার করলে তাদের প্রতি বছরে খরচ পড়তো ২৪,০০০ পাউণ্ড; পক্ষান্তরে সমপরিমাণ কাজে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহৃত হওয়ায় ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ালো ১৩,৭৫০ পাউণ্ড। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজারের কথায়—যদি নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি সাবানের সমান মূল্যের হয়, তাহলেও প্রগতিশীল ধৌতাগারগুলি সর্বাগ্রে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলিকেই পছন্দ করে নেবে।

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যরাজির (এক কথায় সমস্ত তল-কর্মণ্য নিয়ামক পদার্থনিচয়) রসায়নী জ্ঞান ও আনুষঙ্গিক কারিগরিবিদ্যা ইত্যাদি ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য গড়ে উঠছে। ফলে এই বিষয়ে এক দেশের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চিত পদ্ধতি অন্য দেশে অবাধে ছড়িয়ে দিয়ে অনগ্রসর ভূভাগকে পরিপুষ্ট করতে সাহায্যের কথা প্রায়ই শোনা যায়। যেমন ধরা যাক, লণ্ডনের Armour & Co, Ltd. নামে প্রতিষ্ঠানটির কথা। ১৯৫৪ সালের এক সংবাদে জানা যায় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান শিকাগোর Armour প্রতিষ্ঠানে ২৫০,০০০ পাউণ্ড নিয়োগ করেন, Cationic ও Non-ionic শ্রেণীর পদার্থ উৎপাদনের জন্যে। এই সব উৎপাদন সামগ্রীর মধ্যে জীবাণুনাশক কোয়াটারনারী Arquad থাকবে। এই রকমের অন্য একটি প্যারিসের সংবাদে জানা যায় যে, Societe Des Produits Chimiques De Shell-Saint Gobain নামে এক প্রতিষ্ঠান রুএঁ নগরে এক বিরাট নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যের কারখানা স্থাপন করবেন। মাঝে মাঝে এরকম খবর বের হয়েই থাকে।

এখন দেখা যাক, পেট্রো-কেমিক্যালস কোন্‌গুলি। ইথিলিন, প্রোপাইলিন, বিউটাইলিন বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন (প্যারা, মেটা ও অর্থো) মিথাইল অ্যালকোহল, ইথাইল অ্যালকোহল, আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল, ইথিলিন অক্সাইড ইত্যাদি মুখ্য পেট্রো-কেমিক্যালস্। যে দেশে পেট্রো-কেমিক্যালস্‌এর উৎপাদন ক্ষমতা যত বেশী, নিঃসন্দেহে সে দেশে নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যেরও উন্নতি তদনুযায়ীই হবে। ১৯৬২ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংশ্লেষিত সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল'পেট্রো-কেমিক্যালস্। ফলে অশানুরূপ উন্নতি দেখা যায় নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলির উৎপাদনের মাত্রায় ও মানে।

নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য উৎপাদনে ভারতও অনগ্রসর নয়। তবে এদের সংখ্যা যথেষ্ট নয় এবং এই শিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রয়েছে; আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর চাহিদা ক্রমেই বেশী হয়ে উঠবে। পেট্রো-কেমিক্যালস্-এর উন্নতিতে এই শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিশেষজ্ঞ মহলে এই রকম অভিমত পাওয়া যায় যে, বারাউনিতে এই পেট্রো-কেমিক্যালস-এর উৎপাদনের ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশেও নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠবে।

মোটামুটি বলতে গেলে, নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যরাশির প্রসার ও প্রচার যে রকম দ্রুতহারে বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে বেড়ে চলেছে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ও শিল্পে, গৃহস্থজীবনে ও কৃষিকার্যে এদের ভূমিকা যে রকম প্রগতিশীল, তাতে মনে হয়, নিঃসাবান পরিষ্কারক দ্রব্যগুলি অদূর ভবিষ্যতে যে কোন দেশের সভ্যতার মাপকাঠিরূপে পরিগণিত হতে পারে।

হৃদ্‌যন্ত্রের কথা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

যতক্ষণ হৃৎস্পন্দন, ততক্ষণই জীবন। জীব-দেহে হৃৎপিণ্ডের কাজ ঠিক স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মত। এর সাহায্যে নিয়ত পুষ্টিকর রস ও অক্সিজেন সর্বশরীরে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। মানুষের হৃৎপিণ্ড বুকের মধ্যে দুই ফুস্‌ফুসের মাঝখানে ঈষৎ বাঁ-দিকে অবস্থিত। এটি প্রায় ত্রিকোণাকার—অনেকটা মুষ্টিবদ্ধ হাতের সমান। পুরুষের হৃৎপিণ্ডের গড় ওজন প্রায় ১০ আউন্স আর মেয়েদের হৃদ্‌যন্ত্রের ওজন প্রায় ৮ আউন্স। আমাদের হৃৎপিণ্ড চারটি কুঠুরিতে বিভক্ত। উপরের দুটি অংশের নাম অলিন্দ (Auricles) এবং নীচের অংশদ্বয়ের নাম নিলয় (Ventricles)। হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে প্রায় ৭২ বার পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়ে শরীরের সমস্ত কোষে রক্ত চালনা করে।

শরীরের সব অংশ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড-যুক্ত নীলাভ দূষিত রক্ত এসে মহাশিরা দিয়ে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে দক্ষিণ নিলয়ে আগমন করে। উভয়ের মাঝখানে একটি ত্রিপত্র কপাট আছে, যা কেবল একদিকেই খোলে। দক্ষিণ নিলয় থেকে ধমনি দিয়ে ঐ রক্ত ফুস্‌ফুসে গমন করে। ফুস্‌ফুসের মধ্যে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে এবং নতুন করে অক্সিজেন গ্রহণ করে উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ ধারণ করে। ফুস্‌ফুসের শিরা থেকে শোধিত রক্ত বের হয়ে আবার হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে বাম নিলয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে একটি দ্বিধাবিভক্ত কপাট আছে। বাম নিলয় থেকে মহাধমনি দিয়ে রক্ত সমস্ত শরীরে গমন করে এবং পরে আবার শিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরে আসে। এইভাবে রক্ত চলাচল হয়। ধমনি ও শিরা ক্রমশঃ সরু হতে হতে অসংখ্য জালক নালীতে (Capillaries) পরিণত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এই সব জালের মত কৈশিক নালীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০০০ মাইল।

১৬২৮ খৃঃ অব্দে ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হার্ভি রক্ত-সঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম অলিন্দ সঙ্কুচিত হয়ে যথাক্রমে শরীরের দূষিত রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে ও বায়ুপূর্ণ রক্ত বাম নিলয়ে প্রেরণ করে। আর দক্ষিণ ও বাম নিলয় সঙ্কুচিত হয়ে যথাক্রমে ফুস্‌ফুসে দূষিত রক্ত ও সমস্ত শরীরে শোধিত রক্ত সঞ্চালিত করে। শোণিত সঞ্চলনের মূলতত্ত্ব এই।

হৃৎপিণ্ডের পেশীর মধ্যে করোনারি ধমনি দুটি দিয়ে রক্ত প্রবেশ করে। দুই রকম স্নায়ু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে থাকে—ভেগাস স্নায়ু হৃৎপিণ্ডের গতি মন্থর করে, আর সিম্‌-প্যাথেটিক স্নায়ু হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত করে দেয়। এছাড়া উত্তাপের ফলে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় আর শৈত্য প্রয়োগে এর বেগ মন্থর হয়ে আসে।

সাধারণ মানুষের হৃৎপিণ্ড প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ বার স্পন্দিত হয়। এর ফলে যে কাজ হয়, তাতে ২৪ ঘণ্টায় ২৭ মণ ওজন ৮২ ফুট উপরে তোলা যায়। প্রতি মিনিটে আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রায় পাঁচ সের বিশুদ্ধ রক্ত পাম্প করে শরীরে চালনা করে। মহাধমনিতে রক্তস্রোত প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় দুই ফুট বেগে

চলাচল করে। শিরার মধ্যে শোণিতের গতিবেগ এর প্রায় অর্ধেক। কৈশিক নাড়ীর ভিতর রক্তের গতি মিনিটে এক ইঞ্চি। প্রতিবার স্পন্দনে আমাদের হৃৎপিণ্ড প্রায় ১০০ কিউবিক সেন্টিমিটার রক্ত চালনা করে। প্রতিবার পূর্ণ স্পন্দনের পর মানুষের হৃৎপিণ্ড গড়ে প্রায় সিকি সেকেণ্ড আন্দাজ বিশ্রাম গ্রহণ করে; অর্থাৎ মানুষের জীবনকাল যদি ৭০ বছর ধরা হয়, তাহলে প্রায় সতেরো-আঠারো বছরের মত তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত থাকে।

স্বাভাবিক সুস্থ লোকের হৃৎপিণ্ডের সঙ্কোচন-কালীন (Systolic) রক্তচাপ ১২০—১৯০ মিলি-মিটার এবং হৃৎপিণ্ডের প্রসারণকালীন (Diastolic) রক্তচাপ ৬০—৯০ মিলিমিটার পরিমাণ পারদ-চাপের মত হয়ে থাকে। স্ফিগ্‌মোম্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ধমনির মধ্যেকার রক্তচাপ মাপা হয়।

বিভিন্ন বয়সে মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন কি প্রকার হয়ে থাকে, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

জন্মকাল থেকে	প্রতি মিনিটে
এক বছর বয়স পর্যন্ত	১৪০ বার
শৈশবকালে	
তিন বছর বয়স পর্যন্ত	১২০—১০০ বার
বাল্যকালে	
ছয় বছর বয়স পর্যন্ত	১০০—৯০ বার
৭ থেকে ১৪ বছর ,,	৯০—৭৫ বার
১৪ ,, ২১ ,, ,,	৮৫—৭৫ বার
২১ ,, ৬৫ ,, ,,	৭৫—৬৫ বার
বৃদ্ধ বয়সে	৮৫—৭০ বার

গড়ে পুরুষের নাড়ী মিনিটে ৭২ বার স্পন্দিত হয়, আর মেয়েদের নাড়ীর গতি মিনিটে প্রায় ৮০ বার।

বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তুর হৃদ্‌স্পন্দনের মাত্রা এই রকম দেখা যায়:—

ঝিনুক	প্রতি	মিনিটে	২-২০ বার
স্কুইড (শম্বুক জাতীয় জীব)	,,	,,	৪০-৮০ ,,
বড় ও ছোট ইঁদুর	,,	,,	৩০০-৫০০ ,,
বড় বাদুড়	,,	,,	১০০ ,,
খরগোস	,,	,,	২০০ ,,
মুরগী	,,	,,	১৫০-১৮০ ,,
বড় ও ছোট পাখী	,,	,,	২০০-৬০০ ,,
সিংহ ও বাঘ	,,	,,	৪০-৬৪ ,,
ঘোড়া	,,	,,	৪২ ,,
উট	,,	,,	৩২ ,,
হাতী	,,	,,	২৫ ,,

সাধারণতঃ যে জীব যত বড় ও ভারী তার হৃদ্‌স্পন্দন ও শ্বাসক্রিয়া তত মন্থর হয়ে থাকে।

১৮১৮ সালে ফ্রান্সের ডাক্তার লেনেক মানুষের হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরীক্ষা করবার জন্যে ষ্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাছাড়া আজকাল হৃৎপিণ্ডের গঠন ও আকৃতি এক্স-রে দিয়ে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা হয়। প্রতিবার হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে যৎসামান্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই বিদ্যুৎ-স্রোত হৃৎপিণ্ডের সক্রিয় অংশ থেকে নিষ্ক্রিয় অংশের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের গতি ও প্রকৃতি ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে নিখুঁতভাবে স্থির করা যায় এবং এথেকে হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা খুব সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয়। ফোনোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা ফিতার উপর হৃৎপিণ্ডের শব্দলিপি অঙ্কিত করা হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনজনিত শরীরের কম্পন ব্যালিষ্টোকার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। রোগ নির্ণয়ের জন্যে এক এক সময় রক্তবহা নালীর মধ্য দিয়ে একেবারে হৃৎপিণ্ডের ভিতর রবারের নল প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ ধরে কঠিন দৈহিক পরিশ্রম করলে সব মানুষেরই হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত ও রক্তচাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ থাকলে শারীরিক শ্রম অবসানের প্রায় তিন মিনিটের মধ্যে নাড়ীর গতি ও রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এটি শারীরিক সুস্থতা পরীক্ষার একটি খুব ভাল উপায়। হৃদ্‌যন্ত্রের ব্যাধিতে বিশ্রামকালীন নাড়ীর গতি অতিদ্রুত কিম্বা অতি মন্থর অথবা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। হৃৎপিণ্ডের অসুস্থতার প্রধান লক্ষণ বুকের বেদনা, শ্বাসকষ্ট, মাথাঘোরা এবং বুকের মধ্যে চাপবোধ হওয়া। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে গেলে প্রায়ই শোথরোগ প্রকাশ পায়।

গুরুভোজন, অতিরিক্ত মানসিক শ্রম ও শরীর চালনার নিতান্ত অভাব ঘটলে প্রায়ই হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। চা, কফি, তামাক এবং মদ্যপানের আধিক্য হলেও হৃদ্‌যন্ত্র অসুস্থ হয়ে যায়। ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণুজনিত বাতজ্বর, যৌনব্যাধি ও বীজাণুর আক্রমণেও মানুষের হৃৎপিণ্ড বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া ডিপথিরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফাস ও টাইফয়েড জ্বর, আমাশয়, লালজ্বর ও তীব্র সর্দিজ্বর (Influenza) হলেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। পুষ্টিহীনতা, রক্তাল্পতা, স্থূলতা এবং যকৃৎ ও বুকের ব্যাধির সঙ্গে সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াও অল্পাধিক প্রভাবিত হয়ে থাকে। অনেক দিন ধরে ধমনির রক্তচাপ বেড়ে থাকলেও হৃদ্‌যন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনা, দুশ্চিন্তা, অবসাদ ও অনিদ্রা দীর্ঘকাল স্থায়ী হলেও মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যক্ষমতা ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয়।

হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ওষুধ হিসাবে কর্পূর, কেফিন, কোরামিন ও ষ্ট্রিকনিন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আর হৃদ্‌যন্ত্রের অত্যধিক উত্তেজনা প্রশমন ও বেদনা নিবারণের জন্যে মর্ফিন, পেথিডিন, ভেলেরিয়ান ও ব্রোমাইড প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। হৃৎপিণ্ড দুর্বল ও নাড়ীর গতি দ্রুত হলে ডিজিট্যালিস, ষ্ট্রোফান্থাস ও কুইনিডিন প্রয়োগ করে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সবল ও নিয়মিত করা হয়। ১৭৪৫ সালে সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম উইদারিং ডিজিট্যালিসের এই ভেষজগুণ আবিষ্কার করেন। অসুস্থতার দরুণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যেকার ধমনি অতিরিক্ত সরু হয়ে গেলে যখন তার মধ্যে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তখন বুকে ব্যথা বোধ হয়। এই সময় নাইট্রোগ্লিসারিন, নাইট্রাইট এবং অ্যামাইনোফাইলিন প্রয়োগ করে রোগীর কষ্ট লাঘব করা হয়। কারণ, এই সব ওষুধ সেবনের ফলে শরীরের রক্তবাহী নলগুলি প্রসারিত হয় এবং রক্ত চলাচলের বৃদ্ধি ঘটে। কোন রকম শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হলে যন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন প্রয়োগ করা হয়। উচ্চ রক্তচাপ রোগে আমাদের দেশের ভেষজ সর্পগন্ধা আজকাল খুবই সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পুষ্টিহীনতা ও দুর্বলতার জন্যে হৃদ্‌যন্ত্র ব্যধিগ্রস্ত হলে লৌহ, ফস্‌ফরাস ও নানারকম ভিটামিন ব্যবহার করা হয়। হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া মন্থর হয়ে পড়লে আধ আউন্স মাত্রায় সুরাসার প্রয়োগ করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। কোন কারণে অবসন্ন, ক্লান্ত ও দুর্বল বোধ করলে সামান্য পরিমাণ চিনি, মধু কিম্বা গুড় খেয়ে নেওয়া উচিত। তাহলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার শরীর সতেজ ও সবল হয়ে উঠবে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে রক্ত সঞ্চালনের ব্যবস্থা করে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দশ-পনেরো মিনিটের জন্যে স্থগিত রেখে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে রুগ্ন হৃদ্‌যন্ত্র সবল ও সুস্থ করা সম্ভব হচ্ছে।

হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ রাখতে হলে চা, কফি, মদ্য ও ধূমপান অত্যন্ত পরিমিতভাবে করা আবশ্যক। এই সব নেশার জিনিষ একেবারেই বাদ দিতে পারলে সবচেয়ে ভাল হয়। প্রতিদিন পরিমিত

পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। অতিরিক্ত আহার ও অত্যল্প ভোজন—দুই-ই সমান ক্ষতিকারক। প্রৌঢ় বয়সে ঘি, মাখন, ক্ষীর, ডিম এবং চর্বিযুক্ত মাছ ও মাংস ভক্ষণ যতদূর সম্ভব কম করা উচিত। যাঁরা অতিরিক্ত মানসিক শ্রম করেন ও সেই সঙ্গে গুরুভোজনে অভ্যস্ত, তাঁদের প্রত্যহ কোন না কোন রকম শ্রমসাধ্য ব্যায়াম করা উচিত। দৈনিক অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণের অভ্যাস রাখলেও হৃৎপিণ্ডের পীড়া থেকে অনেকাংশে মুক্ত থাকা যায়। প্রত্যহ নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা রীতিমত বেড়ে যায়।

হৃদ্‌যন্ত্র সুস্থ ও সবল রাখতে হলে ব্যায়াম ও বিশ্রামের একটা সাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়। রাত্রে অন্ততঃ আট ঘণ্টা সুনিদ্রা হওয়া উচিত, তাহলে স্নায়বিক ক্রিয়া স্বাভাবিক থাকবে।

আজকাল করোনারি থ্রম্বসিসের খুবই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরস্থ করোনারি ধমনির মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যাবার ফলে ঐ অংশে শোণিত সঞ্চলন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। সে জন্যে রোগী দারুণ ব্যথা ও কষ্ট বোধ করে। এই অসুখ এক দিনের নয়। গুরুতর মানসিক শ্রম, প্রচুর পরিমাণে গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং সেই সঙ্গে শরীর চালনার একান্ত অভাব ঘটলে কোলেষ্টেরল সঞ্চারের ফলে মানুষের সব রক্তবহা নাড়ী অপরিসর ও অনমনীয় হয়ে আসে।

তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে রক্ত সহজেই জমাট বেঁধে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কোন এক সময় হৃৎপিণ্ডের ভিতর কোথাও রক্ত জমে গেলে রোগীর জীবনসংশয় উপস্থিত হয়। এই রোগের চিকিৎসায় প্রধানতঃ অক্সিজেন, আফিং ও হিপারিন নামক রক্ত-তরলকারী ভেষজ প্রযুক্ত হয়।

মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের ক্ষমতা কিরূপ আশ্চর্যজনক হতে পারে, সে বিষয়ে এখন কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। সুপ্রসিদ্ধ রাশিয়ান দৌড়বাজ জামেনস্কির বিশ্রামকালীন হৃৎপিণ্ডের গতি ছিল মিনিটে ৪০ বার মাত্র, তাঁর রক্তচাপও খুব কম থাকতো। সোভিয়েট রাশিয়ার একজন লোকের আঠারো বছর বয়সে বন্দুকের গুলি লেগে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দ ও নিলয়ের মধ্যবর্তী দ্বিপত্র কপাটিকা বিদীর্ণ হয় এবং গুলিটি হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই থেকে যায়। তাকে হাসপাতালে তিন মাস ধরে চিকিৎসা করবার পর ভাল মনে করে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং সে বাড়ী ফিরে গিয়ে আবার নিজের আগেকার শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজে পূর্ণোদ্যমে যোগদান করে। এই ঘটনার দশ বছর পরেও তাকে সুস্থ থাকতে দেখা গিয়েছিল। ১৮৯৮ সালে ঈজিপ্টে ওমডারমানের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতি সার আর্থার স্লগেটের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে গুলি লাগে। তাঁর ডাক্তারদের অবাক করে দিয়ে তিনি এরপর আরও ৩১ বছর জীবিত ছিলেন এবং পরিশেষে ৭১ বছর বয়সে মারা যান।

শোনা যায় ইটালীর নেপেল্‌স্‌ নগরীর অধিবাসী জিউসেপ-ডি-সায় নামক এক ব্যক্তির একটির বদলে বুকে দুটি হৃৎপিণ্ড ছিল। তিনি ১৮৯৪ সালে লণ্ডন অ্যাকাডেমি অফ মেডিসিনের নিকট থেকে প্রায় ১৫ হাজার ষ্টার্লিং অর্থ গ্রহণ করে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে দেওয়া হবে এবং জীবিতকালে তিনি কখনও সমুদ্রযাত্রা করবেন না। লেখকের বন্ধু অধ্যাপক অজিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হৃৎপিণ্ড বুকের বাঁ-দিকে না থেকে ডান দিকে অবস্থান করতে দেখে ডাক্তারেরা বিস্ময় বোধ করছেন। গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে লণ্ডনের কর্ণেল টাউনশেণ্ড নিজের হৃৎপিণ্ডের গতি ইচ্ছামত অবরুদ্ধ ও পরিচালিত করতে

পারতেন। একবার ডক্টর চেন ও বেনার্ডের সামনে তিনি নিজের হৃদ্‌যন্ত্র আধ ঘণ্টার জন্যে একেবারে থামিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য এর কিছুকাল পরে তিনি মারা যান।

১৯১৬ সালে লণ্ডনের গাইস হাসপাতালে ডেভিস নামক একটি ছয় বছরের বালকের যখন অজ্ঞান অবস্থায় টন্সিলে অস্ত্রোপচার করা হচ্ছিল, তখন অকস্মাৎ তার হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া থেমে যায়। তৎক্ষণাৎ বুকের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে তার হৃৎপিণ্ড মৃদুভাবে মর্দন করা হতে থাকে। এর ফলে হৃদ্‌যন্ত্র পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরে ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে এবং স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা ও দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেশ কিছু সময়ের জন্যে স্থগিত ছিল। অস্ত্রোপচার না করেও আজকাল বক্ষাস্থির উপর তালে তালে হাতের চাপ দিয়ে স্তব্ধ হৃৎপিণ্ডকে পুনরায় সক্রিয় করবার চেষ্টা হয়ে থাকে।

রাশিয়ান ডাক্তার এণ্ড্রিয়েভ (১৮৭৯-১৯৫২) কুকুরের হৃৎপিণ্ড পুনরুজ্জীবিত করবার এক উপায় আবিষ্কার করেন। ১৯১৩ সালে একবার তিনি একটি কুকুরকে প্রথমে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তারপর অ্যাড্রিনালিনযুক্ত রাসায়নিক রস তার হৃৎপিণ্ডের দিকে কোন ধমনিতে প্রবেশ করিয়ে দেন। এর ফলেই কুকুরটির হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া পুনরায় সচল হয়ে উঠলো এবং শ্বাস-প্রশ্বাসও আবার আরম্ভ হয়ে গেল। সেই কুকুরটি পুনর্জীবন লাভ করলো এবং এই পরীক্ষার পর সে আরও কয়েক ঘণ্টা বেঁচেছিল। নেগভস্কির প্রণালীতে হৃৎপিণ্ডের দিকে কোন ধমনীতে রক্ত পাম্প করে অনেক সদ্যমৃত রোগীর দেহে প্রাণ-সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছে—যাদের হৃদ্‌যন্ত্র ও শ্বাসক্রিয়া থেমে যাবার দরুণ আপাতদৃষ্টিতে মৃত্যু ঘটেছিল। ১৯৪১ সালে ডাঃ সিনিৎসিন একটি ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড কেটে বের করে তার জায়গায় আর একটি ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড জুড়ে দিয়েছিলেন এবং এরপর প্রথম ব্যাংটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেঁচেছিল। ১৯৪৬ সালে ডাঃ ডেমিকভ কোন কুকুরের হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস—দুটিই বদ্‌লে দিয়েছিলেন, তৎসত্ত্বেও সে বেশ কয়েক দিন ধরে বেঁচে থেকে ঘুরে বেড়িয়েছিল এবং স্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করেছিল। সেই বছরেই ডাঃ ডেমিকভ আর একটি পরীক্ষা সম্পাদন করেন। তিনি একটি সাধারণ কুকুরের শরীরের সঙ্গে আর একটি হৃৎপিণ্ড যোগ করে দিয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের পর এই কুকুরটির একটির পরিবর্তে দুটি কার্যক্ষম হৃৎপিণ্ড হয়েছিল।

অধ্যাপক রিঙ্গার কর্তৃক উদ্ভাবিত অক্সিজেন ও গ্লুকোজ সহযোগে প্রস্তুত নিম্ন-নির্দিষ্ট রাসায়নিক দ্রবে যদি কোন খরগোসের হৃৎপিণ্ড আলাদা করে রাখা হয়, তাহলে সেটি অনেকক্ষণ অবধি বেঁচে থেকে স্পন্দিত হতে থাকে। অনুরূপ ক্ষেত্রে কচ্ছপের মত কোন শীতল রক্তের প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্থাপন করলে বহু সপ্তাহ পর্যন্ত জীবন্ত থাকে। এই রাসায়নিক দ্রবণের মাত্রা নিম্নোক্তরূপ :—

সোডিয়াম ক্লোরাইড	·৮%
পটাসিয়াম ক্লোরাইড	·০২%
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	·০২%
ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড	·০১%
সোডিয়াম বাইকার্বনেট	·১%
জল	অবশিষ্ট অংশ

সঞ্চয়ন

গ্রহান্তর যাত্রা

আমেরিকার এপোলো পর্যায়ের মনুষ্যবাহী মহাকাশযানকে চন্দ্রলোকে প্রেরণের প্রস্তুতি ১৯৬০ সাল থেকেই চলছে। এপোলোর পরে আমেরিকার গ্রহলোক সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যানুসন্ধানী কার্যক্রম হলো ভয়েজার পরিকল্পনা। ভয়েজার পর্যায়ের মহাকাশযানের সাহায্যে প্রধানতঃ মঙ্গল ও শুক্রগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং ১৯৭০ সাল থেকে এই পরিকল্পনার কাজ সুরু হবে।

গ্রহলোক সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল অনেক কালের। ঐ দুটি গ্রহ দেখতে কেমন, এরা কি কি উপাদানে গঠিত হয়েছে, এদের বিবর্তনের ইতিহাসই বা কি, সেখানে কি প্রাণ বা প্রাণীর অস্তিত্ব আছে এবং যদি না থাকে তবে সেখানে ভবিষ্যতে কি কোন প্রাণীর বেঁচে থাকা সম্ভব হবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর এই ভয়েজার পর্যায়ের মহাকাশযানের সাহায্যে পাওয়ার চেষ্টা করা হবে। এই সকল সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেলে প্রকৃতি, জীবন এবং সৃষ্টি-রহস্যের অনেক সন্ধান মিলবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর মহাকাশ বিজ্ঞান পর্ষৎ এই পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলেছেন: বৈজ্ঞানিক-লক্ষ্য সাধনের দিক থেকে খুবই ফলপ্রদ হবে বলে ১৯৭০-৮৫ সালের জন্যে গ্রহলোক সম্পর্কে এই তথ্যানুসন্ধানী ভয়েজার পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে এবং এই পরিকল্পনার কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে সুপারিশ করা হয়েছে। মঙ্গলগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অভিযান সফল হলে মানবেতিহাসে এই তথ্যানুসন্ধানী উদ্যোগ চিরকালের জন্যে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানী পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে ও কারিগরি বিষয়ক জ্ঞান লাভ করেছে, সেই অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানই হবে ভয়েজার পরিকল্পনার ভিত্তি—যেমন মেরিনার পর্যায়ের উপগ্রহটি সর্বপ্রথম মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের নিকটবর্তী অঞ্চল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। তারপর অরবিটার নামে যে উপগ্রহটি চন্দ্রলোক অভিমুখে প্রেরিত হয়, সেটি পৃথিবী ছাড়িয়ে চন্দ্রলোকে গিয়ে চন্দ্রের কক্ষপথ পরিক্রমা করছে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভূপদার্থ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামসহ একটি উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করেছে। এটিও কক্ষপথে স্থাপিত হয়েছে। বহুদূরবর্তী গ্রহলোকে যাত্রায় মহাকাশে যে ধরণের ঘাঁটি বা প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন হবে, ঐ দুটি উপগ্রহই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কক্ষপথে থেকে গ্রহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান দেবার জন্যে ঐ দুটি উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্যাটার্ণ-৫ রকেটের সাহায্যে দুটি ভয়েজার শ্রেণীর উপগ্রহকে একই সঙ্গে মহাকাশে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দুটি উপগ্রহকে মহাকাশে প্রেরণের সুবিধা অনেক। মহাকাশের দুটি দিকের এবং তার অনেকখানি স্থানের সমীক্ষা গ্রহণ এর ফলে সম্ভব হবে। তাছাড়া পরিকল্পনার সাফল্যের দিক থেকেও এই ধরণের কার্যসূচীর উপর অনেকখানি নির্ভর করা চলে।

স্যাটার্ণ-৫ রকেটটি ছাড়বার পর ১৫০ সেকেণ্ডের মধ্যে ভয়েজারকে মহাকাশের ৩৯ মাইল উর্ধ্বে নিয়ে যাবে। প্রতি সেকেণ্ডে তখন তার তরল অক্সিজেন ও ইন্ধন খরচ হবে ১৫ টন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩৯০ সেকেণ্ডের মধ্যে এটি পৃথিবী থেকে ১১৪ মাইল উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হবে। তৃতীয় পর্যায়ে ঐ রকেটটিই মহাকাশযানটিকে কক্ষপথে স্থাপন করবে। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে এস-৪ বি নামে তৃতীয় পর্যায়ের রকেটটি পুনরায় চালু করা হবে এবং মঙ্গলগ্রহের পথে পৌঁছুবার উপযোগী গতিবৃদ্ধি হবে। পৃথিবী থেকে যাত্রা করে মঙ্গলগ্রহে পৌঁছুতে ঐ মহাকাশযানের এক মাস সময় লাগবে।

মাঝপথে পৌঁছুবার পর এটি যাতে বিপথে চলে না যায়, তারই জন্যে ভূতলে অবস্থিত বিজ্ঞানীদের নির্দেশে সঠিক পথে স্থাপন করা হবে। তবে মঙ্গলগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছুবার পর ভয়েজার উপগ্রহটিকে মঙ্গলের কক্ষপথে স্থাপনের জন্যে এর বড় রকমের একটি রকেট ছাড়তে হবে। কারণ তখন উপগ্রহটিকে সেকেণ্ডে ৬৫০০ ফুট গতিতে ভ্রমণ করতে হবে এবং গতি সৃষ্টির জন্যে প্রচুর পরিমাণ ইন্ধনেরও প্রয়োজন হবে। তবে এটি সঠিক পথে ভ্রমণ করছে কি না, সে বিষয়ে বেশ কিছু দিন নজর রাখতে হবে। ভয়েজারের সঙ্গে যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি আধার থাকবে। সেটি মঙ্গলগ্রহের উপর ফেলে দেওয়া হবে। কোথায় ও কখন যে এটি মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠে পড়ে, তা জানবার জন্যে কেবলমাত্র কয়েক দিনই নয়, কয়েক সপ্তাহ পর্যন্তও নজর রাখবার প্রয়োজন হতে পারে। ভয়েজার মহাকাশযানটি দু-বছর পর্যন্ত মঙ্গলের কক্ষপথে থেকে ঐ গ্রহটি সম্পর্কে তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করবে।

ঐ আধারটি মহাকাশযান থেকে পৃথক হবার পর সঠিক অবস্থায় মঙ্গলের পৃষ্ঠে সুনির্দিষ্ট স্থানে নেমে আসবে। তবে উপগ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরই বহু দূরে চলে গেলে তার গতি হ্রাস করবার জন্যে একটি রকেট ছাড়তে হবে। এই রকেট ছাড়বার ফলে এটি ক্রমেই নীচে নেমে আসবে এবং মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডলে প্রবেশ করবে। ঐ সময়ে প্রতি সেকেণ্ডে এর গতির মাত্রা থাকবে ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার ফুটের মধ্যে। তারপরে ঐ আধারটি যখন মঙ্গলগ্রহের উপরে ১৫ হাজার ফুটের মধ্যে থাকবে, তখন আবহমণ্ডলের জন্যে এর গতি হবে প্রতি সেকেণ্ডে ৪০০ থেকে ১০০০ ফুটের মধ্যে। তখন আরও একটি রকেট ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে প্যারাস্যুটের সাহায্যে এর গতি আরও হ্রাস করা হবে। আধারটি মঙ্গলগ্রহের ঠিক উপরে যখন আসবে, তখন এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে শূন্য থেকে ১০ ফুটে এসে দাঁড়াবে। এটি ঐ সময়ে ধীরে ধীরে মঙ্গলপৃষ্ঠের অবতরণ করবে।

নামবার সময়ে ঐ আধারের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি মঙ্গলগ্রহের আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ও মঙ্গল-পৃষ্ঠের আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করবে। মঙ্গলের পৃষ্ঠে অবস্থানকালে ঐ সকল যন্ত্রপাতি সর্বদাই তথ্যাদি সংগ্রহ করবে এবং পৃথিবীতে পাঠাতে থাকবে। তবে তা সরাসরি পাঠাতেও পারে অথবা মঙ্গলের কক্ষপথে ভ্রমণরত ভয়েজার উপগ্রহের মাধ্যমেও রিলে করতে পারে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে ভয়েজার উপগ্রহ মঙ্গলগ্রহে অবতরণ করবে না। ঐ গ্রহের কক্ষপথে থেকে তথ্যানুসন্ধানী স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি আধার সে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দেবে। একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হবে। মঙ্গলগ্রহস্থিত তথ্যানুসন্ধানী যন্ত্রপাতিকে পৃথিবীস্থিত কেন্দ্র থেকে ঐ উপগ্রহের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হবে।

ঐ সকল যন্ত্রপাতি মঙ্গলগ্রহের আবহমণ্ডল কি কি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত, এর উপরিস্থিত চাপ, তাপমাত্রা, বাতাসের গতিবেগ, আহ্নিক গতি এবং অন্যান্য বিষয়ে মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠ ও জলের অস্তিত্ব সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। এই সকল তথ্যই সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করবে।

১৯৬৮ সালের মধ্যে ভারতে বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ও সংসদীয় দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল এই সম্বন্ধে লিখেছেন—আগামী দু-বছরের মধ্যে ভারত যোগাযোগের ক্ষেত্রে মহাশূন্য গবেষণার যুগে প্রবেশ করবে।

১৯৬৮ সালের শেষার্ধে ভারত মহাসাগরের উপরে কৃত্রিম উপগ্রহ কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। ভারত ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম উপগ্রহটি সুবিধা দান করবে। কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে দূরপাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থার আন্তর্জাতিক কনসর্টিয়াম যে কয়টি যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করেছে, উক্ত কৃত্রিম উপগ্রহটি হলো তাদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে তৃতীয়।

ভারত উল্লিখিত কনসর্টিয়ামের সদস্য। বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ পদ্ধতির জন্যে খরচ হবে বিশ থেকে ত্রিশ কোটি টাকা। এতে ভারতের অংশ হচ্ছে শতকরা ০'৫ ভাগ, অর্থাৎ প্রায় পচাত্তর লক্ষ টাকা।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্যে পুণার কাছে আরভিতে ভারত ভূপৃষ্ঠে একটি ষ্টেশন স্থাপন করবে। এই ভূপৃষ্ঠের ষ্টেশনটি তৈরি করবার জন্যে প্রায় চার কোটি টাকা খরচ হবে, যার মধ্যে প্রায় তিন কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রার কেনা যন্ত্রাংশ থাকবে। এজন্যে ২০০ একর জমি সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্মাণকার্যের জন্যে প্রাথমিক হিসাবও মঞ্জুর করা হয়েছে। বর্তমান কার্যসূচী অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের শেষে ভূপৃষ্ঠের ঐ ষ্টেশনটি ব্যবহারোপযোগী হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ পদ্ধতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে। বর্তমানে ভারতে বত্রিশটি বেতার টেলিফোন ব্যবস্থা, উনত্রিশটি রেডিও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সাতটি সরাসরি আন্তর্জাতিক টেলেক্স ব্যবস্থা এবং সাতটি সরাসরি বেতারচিত্র ব্যবস্থা রয়েছে। আর সাতাশটি টেলিগ্রাফ চ্যানেল ভারত ইজারা নিয়েছে। এছাড়া জলের নীচে ভারতের দুটি টেলিগ্রাফের তারের যোগাযোগও রয়েছে। উচ্চ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির উপ নির্ভরশীল এই ব্যবস্থাগুলির আবহাওয়াগত গণ্ডগোলের জন্যে কয়েকটি সহজাত অসুবিধা রয়েছে। এগুলির ক্ষমতাও

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে সংবাদ প্রেরণের হার অনেকটা বেড়ে যাবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার মানও উন্নত হবে।

ভারত মহাসাগরের উপরকার প্রস্তাবিত উপগ্রহটির মাধ্যমে বৃটেন, জার্মেনী, নাইজেরিয়া, পূর্ব-আফ্রিকা, লেবানন, হংকং, থাইল্যাণ্ড, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স এবং অষ্ট্রেলিয়াসহ কুড়িটি দেশ যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা অর্জন করবে। এর মধ্যে কয়েকটি দেশ অন্যান্য কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমেও যোগাযোগের ব্যবস্থা চালাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে বৃটেন আটলান্টিক

মহাসাগরের উপরকার কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করছে। সংযোগের সুবিধার জন্যে বৃটেনকে ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী কৃত্রিম উপগ্রহবাহিত যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে ভারত আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

কৃত্রিম উপগ্রহগুলি শুধু ধ্বনিতরঙ্গই বহন করে না, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টেলিভিশন অনুষ্ঠানগুলিও পুনঃপ্রচার করে। আরভির ভূপৃষ্ঠ ষ্টেশনটির টেলিভিসন অনুষ্ঠানগুলি পুনঃপ্রচারের ক্ষমতা থাকবে। ভবিষ্যতে সাগরপারে পৃথিবীর অন্য অংশে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের মত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি ভারতে বসে টেলিভিসনের পর্দায় দেখতে পাওয়া সম্ভব হবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সিগ্ন্যালগুলিকে অত্যন্ত উঁচু ফ্রিকোয়েন্সিতে বহন করা হয়। এই সিগ্ন্যালগুলিকে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাবার জন্যে অতি উচ্চ স্তম্ভের দরকার হয়। বহু ঊর্ধ্বে উপরের আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি প্রেরকস্তম্ভ হিসেবে কাজ করে। এই প্রেরক স্তম্ভের কাজ হলো, যে সব যোগাযোগের সিগ্ন্যাল আসছে, তা একটি জায়গা থেকে গ্রহণ করে অন্য জায়গায় পুনঃপ্রেরণ করা।

যে সব দেশের স্থলভাগ বিশাল, সে সব দেশ আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্যে শীঘ্রই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মস্কো থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সোভিয়েট ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই টেলিভিসন অনুষ্ঠানগুলি ব্লাডিভোষ্টকে পাঠাচ্ছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে কৃত্রিম উপগ্রহবাহিত যোগাযোগ ব্যবস্থা করবে বলে আশা করা যায়।

দু-বছর আগে পাশ্চাত্যের জনসাধারণ তাঁদের টেলিভিসনের পর্দায় টোকিওর অলিম্পিক খেলা দেখেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাশূন্য প্রশাসনের (নাসা) পুনঃপ্রচারের জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জাপান ও ইউরোপে টেলিভিসনে প্রেসিডেন্ট কেনেডির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখানো হয়েছিল।

ভারতের সঙ্গে বিশ্বের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে ওভারসীজ কমিউনিকেশন সার্ভিস। এই সংস্থা চতুর্থ পরিকল্পনার সময় এমন কয়েকটি প্রকল্প রচনা করেছে, যার ফলে ভারত ও অন্যান্য বহির্দেশের সঙ্গে টেলিভিশনে জীবন্ত বেতার প্রচার সম্ভব হয়ে উঠবে।

কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রেরণ—পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করবে

প্রোটিন সংশ্লেষণ

সতী চক্রবর্তী

জীবকোষের প্রধান উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। প্রোটিন কথাটি এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। Proteuo গ্রীক শব্দটির অর্থ হচ্ছে—আমিই প্রথম স্থানটি অধিকার করেছি (I occupy the first place)। প্রোটিন শব্দটি গ্রহণের পরিকল্পনা করেন বার্জেলিয়াস। ১৮৪০ সালে মুল্ডার তাঁর পাঠ্যপুস্তকে প্রোটিন কথাটি ব্যবহার করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট প্রোটিনের উপর নির্ভর করে জীবনের মৌলিক কার্যাবলী। বস্তুত: প্রোটিন ছাড়া জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। মুল্ডারের সময়ের এক শতাব্দী বাদে ১৯৫০ সালের মধ্যেই হাজারো রকমের প্রোটিন আবিষ্কৃত হয়েছে মানুষের দেহ থেকে। দেহের প্রতিটি কোষে প্রোটিন রয়েছে। দেহযন্ত্রের প্রধান উপাদান ও পরিচালক হচ্ছে প্রোটিন—মাংসপেশীতে প্রোটিন, সংযোজক তন্তুতে প্রোটিন, সংকোচক পদার্থের বিন্যাসে প্রোটিন—এমন কি, শরীরের অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে প্রোটিন, শরীরের পরিবহন কাজের দায়িত্ব পালনে যে রক্ত, তাতেও প্রোটিন, যে অস্থি দিয়ে দেহের কাঠামোটি তৈরি হয়েছে, তাতেও প্রোটিন। তাছাড়া কোষের চারপাশের চার দেয়ালের যে আবরণ, তা প্রোটিন দিয়েই তৈরি। এই কারণে ক্রিক বলেছিলেন—প্রোটিনের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপারই হচ্ছে এই যে, তারা প্রায় সব কাজই করে থাকে।

প্রোটিন কতকগুলি ছোট ছোট অণু দিয়ে তৈরি। এদের নাম হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড—এই অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা হলো ২০টি। অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যে বিশেষ বন্ধনের সাহায্যে নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে প্রোটিন তৈরি করে, তার নাম হচ্ছে পেপ্‌টাইড বণ্ড। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক এমিল ফিসার দুটি অ্যামিনো অ্যাসিডের যোগ সাধন করেন একটির অ্যামিনো কার্বক্সিল অ্যাসিডের কার্বক্সিল (COOH) গ্রুপের সঙ্গে অন্যটির অ্যামিনো (NH_2) গ্রুপের—এক অণু জলের অপসৃতিতে ও পেপ্‌টাইড বন্ধনের দ্বারা। কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল দিয়ে জুড়ে জুড়ে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল গড়ে ওঠে। আবার কতকগুলি পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল জুড়ে প্রোটিন তৈরি হয়। তবে বলতে যত সোজা শরীরের মধ্যে প্রোটিন তৈরির ব্যাপারটা তত সোজা নয়। প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্বন্ধে আজও জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। প্রোটিন সংশ্লেষণই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

কোষের মধ্যে আছে কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস আর বাকীটা সাইটোপ্লাজম। এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে জালির আবরণ আছে, তার মধ্যে কতকগুলি ঝিল্লীময় থলির মত পদার্থ থাকে। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট এই জালিকে বলা হয় এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম (Endoplasmic reticulum)। ঝিল্লীময় থলির মধ্যে বেশ ঘন গোলাকার দানা থাকে। এদের ব্যাস হচ্ছে ১০০—১৫০ অ্যাংস্ট্রম (Å) ইউনিট। ১ Å ইউনিট—$\frac{১}{১০০,০০০,০০০}$ সেন্টিমিটারের সমান। এই দানাগুলির শতকরা ৮০ ভাগ ভর্তি থাকে রাইবোনিউক্লিক অম্ল বা আর. এন. এ-তে। জালকের দানাগুলিকে তাই রাইবোসোম (Ribosome) বলে।

এই রাইবোসোমই হচ্ছে প্রোটিন সংশ্লেষণের স্থান বা কারখানা। প্রোটিন সংশ্লেষণে আর. এন. এ. যে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে, সে সম্বন্ধে বহু নজীর আছে। রাইবোসোমে সংযুক্ত আর. এন. এ-গুলি প্রোটিন তৈরির ছাঁচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রোটিন তৈরির সময় এই ছাঁচগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে যথোপযুক্তভাবে পলিপেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে। নিউক্লিওটাইডের বড় বড় শৃঙ্খলে তৈরি এই আর. এন. এ-তে আছে অনেকগুলি করে পিউরিন ও পাইরিমিডিন শ্রেণীর নাইট্রোজেন-ঘটিত উপাদান।

প্রয়োজনীয় প্রকল্প অনুযায়ী বংশানুক্রমিক ধারায় প্রোটিন ও জারক (Enzyme) সংশ্লেষণে অণুকেন্দ্রের ডি. এন. এ. তার বিশেষ বংশানুক্রমিক খবর বা Genetic information পাঠায় সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত প্রোটিন সংশ্লেষণকারী যন্ত্রে। নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত ডি. এন. এ. সূত্রটি নির্দেশ করে তার পরিপুরক বিশেষ আর. এন. এ. সংশ্লেষণে। এই শেষোক্ত আর. এন. এ-র উপযুক্ত নাম হচ্ছে সংবাদবাহী আর. এন. এ.। সংবাদবাহী আর. এন. এ-কে ছাঁচ বলা হয়; কারণ ডি. এন. এ. থেকে এরা সাঙ্কেতিক ছাঁচের আকার নিয়ে জন্মায় এবং সঙ্কেত অনুসারে এদের বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড আকৃষ্ট করবার কৌশল আছে। সংবাদবাহী আর. এন. এ. উৎপন্ন হবার পর সেগুলি এণ্ডোপ্লাজমিক রেটিকিউলামে এসে মিলিত হয় রাইবোসোম্যাল আর. এন. এ-র সঙ্গে। রাইবোসোমের আর. এন. এ. ও সংবাদবাহী আর. এন. এ. মিলে সক্রিয় আর. এন. এ. তৈরি করে ও প্রোটিন সংশ্লেষণের কাজে লিপ্ত হয়।

প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্যে সংবাদবাহী আর. এন. এ বা সাঙ্কেতিক ছাঁচ একটি মাত্র নিউক্লিওটাইড দিয়ে তৈরি নয়, পর পর সজ্জিত তিনটি নিউক্লিওটাইডের দ্বারা তৈরি। নাম এদের ত্রয়ী বা Triplet। প্রোটিন শৃঙ্খলে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে পর পর ঠিকমত সাজাবার জন্যে যে সঙ্কেত আছে, তার সংখ্যা হচ্ছে কুড়িটি ত্রয়ী অর্থাৎ পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে কুড়িটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে কুড়িটি Triplet আছে। এই ত্রয়ী অ্যাডিনিন (এ), সাইটোসিন (সি), গুয়ানিন (জি) ও ইউরাসিল (ইউ)—এই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে যে কোন একটির অন্তরে গঠিত নিউক্লিওটাইড। প্রকৃতপক্ষে, এই চারটি অক্ষরের ব্যবহার করে চৌষট্টি তিন অক্ষরে গঠিত ত্রয়ীর রূপান্তরণ সম্ভব।

বৈজ্ঞানিক জে. এইচ. মাথাই ও এম. ডাব্লিউ. নিরেনবার্গ প্রথম সংবাদবাহী আর. এন. এ-র প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করেন। তাঁরা দেখলেন যে, একটি সংশ্লেষিত পলিনিউক্লিওটাইড (বহু অর্থাৎ তিনটি ইউরিডিলিক অ্যাসিড সমন্বিত) পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে শুধু ফিনাইল অ্যালেনিন অ্যামিনো অ্যাসিডটি যুক্ত করবার ছাঁচ হিসাবে কাজ করে। তেমনি আইসোলিউসিন অ্যামিনো অ্যাসিডটি সংগ্রহ করবার ছাঁচ দুটি ইউরিডিলিক অ্যাসিড ও একটি অ্যাডিনিলিক অ্যাসিড দিয়ে তৈরি। ১৯৬২ সালে বৈজ্ঞানিক স্পেয়ার উপযুক্ত কোষমুক্ত জারকসমষ্টি নিয়ে গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে, কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে বিভিন্ন ত্রয়ী নিউক্লিয়াস থেকে বিভিন্ন সঙ্কেত আনবার দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গেই পালন করছে। প্রোটিন সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কারের গোড়ার দিকে প্রকাশিত কাজে ইউরিডিন নিউক্লিওটাইডকেই প্রোটিন সংশ্লেষণের একমাত্র ছাঁচ হিসেবে মনে করা হতো। এরপর বৈজ্ঞানিকেরা আরও নতুন তথ্যের কথা জানিয়েছেন। আধুনিক মত অনুযায়ী দ্বিত্ব বা Doublet এক সঙ্কেত বহনের দায়িত্ব পালন করে বলে জানা গেছে। ইউরিডিলিক অ্যাসিডবিহীন নিউক্লিওটাইডও যে প্রোটিন সংশ্লেষণে ফলপ্রসূ, সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ ও সমর্থন পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা

যেতে পারে—এ. সি. পলিনিউক্লিওটাইড বস্তুটি প্রোলিন, থ্রিয়োনিন, হিস্‌টিডিন এবং সামান্য মাত্রায় গ্লুটামিন গ্রহণে উদ্দীপিত করে। আর একটি পলি-এ পাওয়া গেছে, যেটি যকৃৎ ও ই. কোলাই ব্যাক্‌টিরিয়ার Cell free system থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডটি গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। আর. এন. এ। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের একটির বেশীই সঙ্কেত আসে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সঙ্কেত নষ্ট (Degeneracy) হয়ে যায় আপনা থেকেই।

প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রথম পর্যায়ে অ্যামিনো অ্যাসিডের সক্রিয় হওয়া দরকার। উপযুক্ত
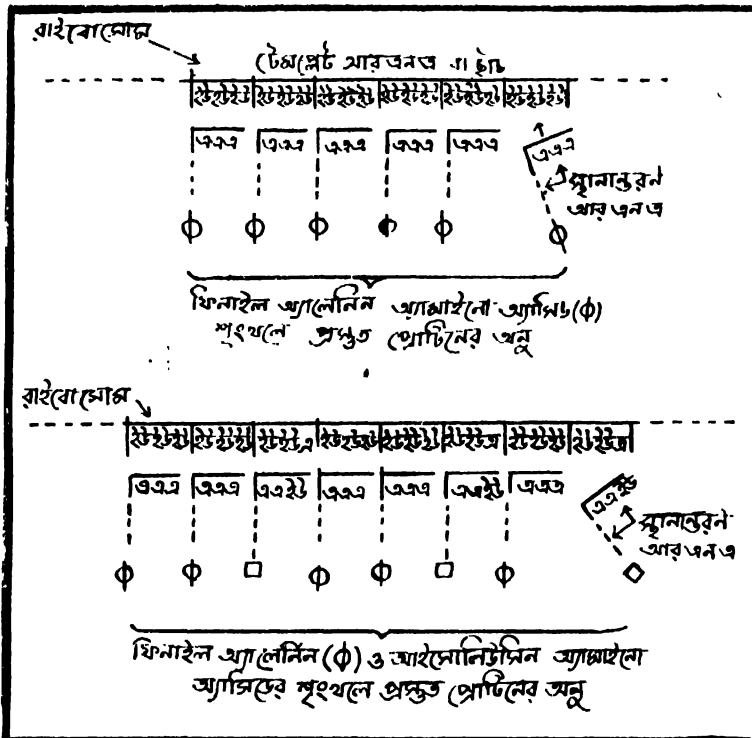
১নং চিত্র

রাইবোসোমের ছাঁচে বিশেষ স্থানান্তরণ। আর. এন. এ-তে সংযুক্ত বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে নির্দিষ্ট ত্রয়ী বা সংবাদবাহী আর. এন. এ-র সংযোগ সাধন।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, ত্রয়ীর দুটি উপাদানই (Base) বেশী সংবাদ বহন করে থাকে।

আর. এন. এ-র ছাঁচ দিয়ে তৈরি অ্যামিনো অ্যাসিডের যে প্রোটিন প্রস্তুতির কাজ চলে, তার জন্যে সঙ্কেত বয়ে আনে প্রতিটি সংবাদবাহী কার্যকরী জারকের সহায়তায় এ. টি. পি-র (অ্যাডিনোসিন ট্রাইফস্‌ফেট একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ, যেটি কোষের প্রায় সমস্ত কাজ ও কর্মশক্তি প্রদান করে) উপস্থিতিতে অ্যামিনো অ্যাসিডের সক্রিয়তা সম্পন্ন হয়। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে একটি জটিল জারক অ্যাডিনোসিন

মনোফস্‌ফেট ৫' অ্যামিনো অ্যাসিডটি তৈরি হয়।

এ. টি. পি. + অ্যামিনো অ্যাসিড + জারক ⇌ জারক (এ. এম. পি. ~ অ্যামিনো অ্যাসিড) + পাইরোফস্‌ফেট

এ. টি. পি. থেকে পাইরোফস্‌ফেটটি মুক্ত হয়ে যায় —এ. টি. পি-র রাইবোস শর্করার অংশটির হাইড্রক্সিল (OH) দলের সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল (COOH) দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটে ; ফলে একটি কমপ্লেক্স তৈরি হয়, আগেই বলা হয়েছে।

পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে স্বতন্ত্র কার্যকরী জারকের প্রয়োজন। ডেভির গবেষণাই এই ব্যাপারটি প্রমাণিত করে। ১৯৫৬ সালে ডেভি রীতিমত বিশুদ্ধ ট্রিপ্‌টোফেন অ্যামিনো অ্যাসিডকে কার্যকরী করে, গরুর অগ্ন্যাশয় থেকে এমন এক জারক স্বতন্ত্র করেন। Schweet ১৯৫৮ সালে টাইরোসিন অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকরী জারকটি পৃথক করতে সক্ষম হন শূকরের যকৃৎ থেকে। বিগত কয়েক বছর ধরে প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রথমাংশটি সম্পর্কে এই বিশেষ ধারণায় পৌঁছানো শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে।

প্রোটিন সংশ্লেষণের দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যকরী অ্যামিনো অ্যাসিডের অণুগুলি রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিলিত হয়। এই আর. এন. এ-গুলি সাইটোপ্লাজমে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে এদের দ্রবীভূত আর. এন. এ. বা Soluble RNA বা সংক্ষেপে S-RNA বলা হয়। অ্যামিনো অ্যাসিডকে গ্রহণ করে বলে এদের নাম গ্রহীতা বা Acceptor RNA অথবা অ্যামিনো অ্যাসিডকে স্থানান্তরিত করে বলে এদের স্থানান্তরণকারী আর. এন. এ. অথবা Transfer RNA বলা হয়ে থাকে। গুণ অনুসারে নানা রকম নামকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের স্থানান্তরণকারী আর. এন. এ. সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করেছেন তাইসন্নুম, বেগ্লার এবং হোলি। ১৯৬২ সালে তাঁরা দেখলেন যে, কেবল মাত্র লিউসিন ও ভ্যালিন অ্যামিনো অ্যাসিড দুটির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে অনেকগুলি দ্রবীভূত আর. এন. এ. আছে। এখানে অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকরী জারকের আর একটি গুণের কথা বলে নেওয়া দরকার। ঐ জারক শুধুমাত্র অ্যামিনো অ্যাসিডকে সক্রিয় করে ক্ষান্ত হয় না—কার্যকরী অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে উপযুক্ত দ্রবীভূত আর. এন. এ-র বন্ধন সাধন করে। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—অনেকগুলি কার্যকরী জারক রয়েছে একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্যকারিতার জন্যে অথবা একটি জারকের একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে একদল এস. আর. এন. এ-র সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দেবার ক্ষমতা আছে।

কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে সক্রিয় করে তোলবার জন্যে ও তারপর উপযুক্ত এস. আর. এন. এ-র সঙ্গে সংযোগ ঘটাবার জন্যে যতগুলি জারকের প্রয়োজন, জৈব উৎস থেকে তার সম্পূর্ণ আবিষ্কার আজও সম্ভব হয় নি। নিউক্লিওটাইডের কোন্ অংশটির সঙ্গে অ্যামিনো অ্যাসিডের বন্ধন সাধন হচ্ছে, সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। অ্যামিনো অ্যাসিডটি এস. আর. এন. এ-র রাইবোস শর্করার অংশের ২' অথবা ৩' অংশের হাইড্রক্সিল দলের সঙ্গে সংযোজিত হচ্ছে। ৩' অংশের বন্ধনই দৃঢ় বলে অনেকে মত পোষণ করেন।

প্রতিটি বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড প্রতিটি স্বতন্ত্র ধরণের এস. আর. এন. এ-র সঙ্গে সংযোজিত হবার পর অ্যাডিনোসিন মনোফস্‌ফেট ও কার্যকরী জারক আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে।

জারক (এ. এম. পি ~ অ্যামিনো অ্যাসিড) + এস. আর. এন. এ ⇌ এস. আর. এন. এ— অ্যামিনো অ্যাসিড + জারক + এ. এম. পি.

এরপর হলো প্রোটিন সংশ্লেষণের তৃতীয় ধাপ। এই ধাপের কাজটি চলে রাইবোসোমে অবস্থিত ছাঁচের (Ribosomal template) সাহায্যে। অ্যামিনো অ্যাসিড ও এস. আর. এন. এ-র মিলিত কমপ্লেক্সটি রাইবোসোমের নির্দিষ্ট ছাঁচে এসে যুক্ত হয়। এই অংশে জি. টি. পি-র (গুয়া-নোসিন ট্রাইফস্‌ফেট—এ. টি. পি-র মতই গুণ-সম্পন্ন একটি নিউক্লিওটাইড) একটি কাজ আছে। প্রোটিন সংগঠনে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ. কমপ্লেক্স থেকে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি নিজেদের সরিয়ে এনে প্রোটিন তৈরির কাজে আত্মনিয়োগ করে। নীচের চিত্রের সাহায্যে প্রোটিন সংশ্লেষণের পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ধারণায় আসা যাবে।

১৯৬৩ সালে ওয়াটসনের নিরীক্ষা প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রকাশভঙ্গীর কিছুটা পরিবর্তন দেখিয়েছে। প্রোটিনের পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য একটি একটি করে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযোগেই সাধিত হয়। একটি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্ব-ক্সিল গ্রুপের সঙ্গে অপর অ্যাসিডের অ্যামিনো
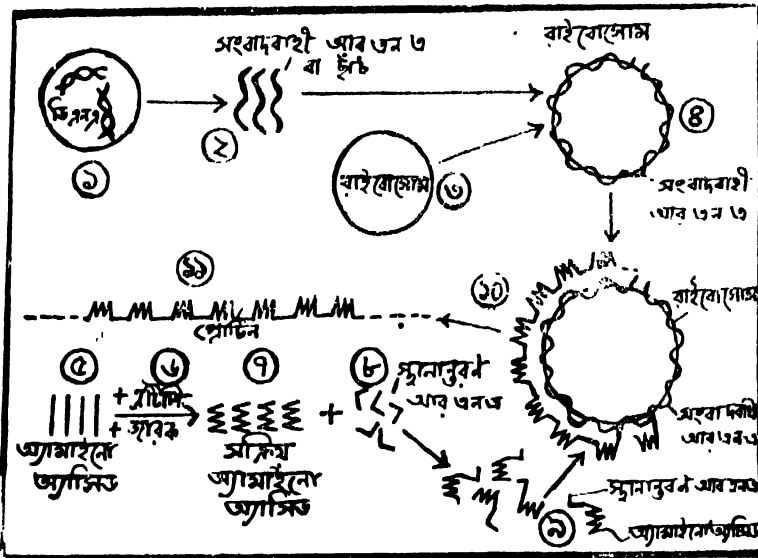
২নং চিত্র
প্রোটিন সংশ্লেষণ।

অ্যামিনো অ্যাসিডকে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে স্থানান্তরণ জি. টি. পি-র অনুপস্থিতিতে সম্পূর্ণতা লাভ করে না। ঠিক কি পদ্ধতিতে জি. টি. পি-কাজ করে তা জানা এখনও সম্ভব হয় নি। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এর সমাধান সম্ভবপর হবে।

রাইবোসোমে অবস্থিত ছাঁচের মাপ বা নির্দেশক্রমে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পর পর জুড়ে সারিবদ্ধ হয়ে পড়ে—অ্যামিনো অ্যাসিড এস. আর. এন. এ. কমপ্লেক্স থেকে প্রান্তটি জুড়ে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল গঠিত হয়। আগের অ্যামিনো অ্যাসিড এস. আর. এন. এ. কমপ্লেক্স থেকে এস. আর. এন. এ. টি মুক্ত হয়ে যায়; কিন্তু পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলে যুক্ত নতুন কমপ্লেক্সটির এস. আর. এন. এ. থেকে যায়। সুতরাং অ্যামিনো অ্যাসিড এস আর. এন. এ. কমপ্লেক্সকে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল প্রস্তুতিকরণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী (Immediate precursor) বলে অভিহিত করা হয়।

১। ক অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ^{১} + খ অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ^{২} →

ক অ্যামিনো অ্যাসিড—খ অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ^{২}+এস. আর. এন এ^{১}

পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। প্রত্যেক রাইবোসোম আবার প্রতিবারে একটি স্থানান্তরণ আর. এন. এ-কে ধরে রাখতে পারে। রাইবোসোম কতকগুলি সাবইউনিটের সমষ্টি। এর পৃথকীকরণ সম্ভব হয় ম্যাগ্‌নেসিয়াম ধাতুর ঘনত্বের পরিমাপ দিয়ে। এই রাইবোসোমের
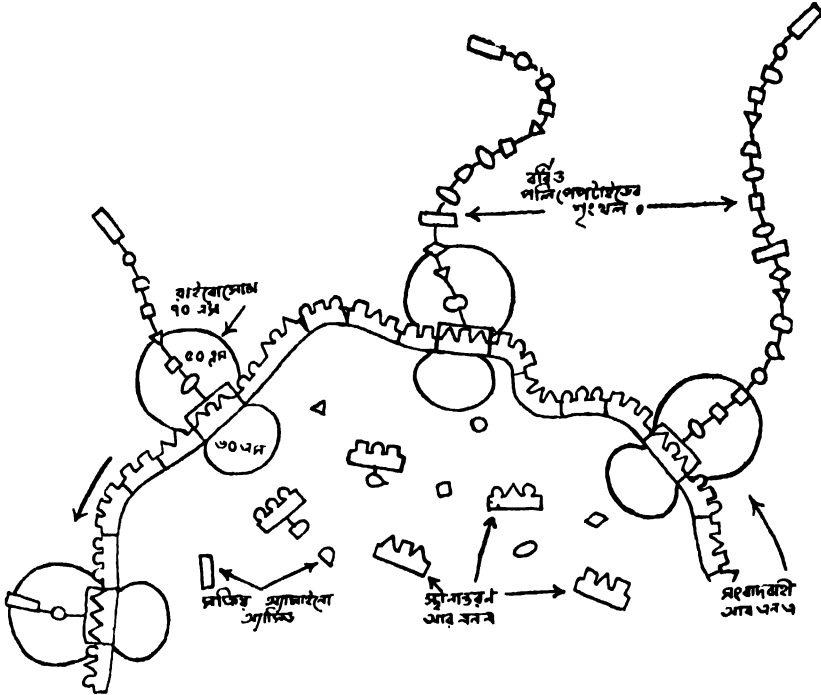
৩নং চিত্র

প্রোটিন সংশ্লেষণে সংবাদবাহী আর. এন. এ-র সঙ্গে রাইবোসোমের সম্বন্ধ।

২। ক অ্যামিনো অ্যাসিড—খ অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ^{২}+গ অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ^{৩} →

ক অ্যামিনো অ্যাসিড—খ অ্যামিনো অ্যাসিড—গ অ্যামিনো অ্যাসিড—এস. আর. এন. এ^{৩}+এস. আর.এন. এ^{২}

৩। এন বার

প্রোটিন সংশ্লেষের সময় রাইবোসোমের সঙ্গে স্থানান্তরণকারী আর. এন. এ. যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য-

সাবইউনিটগুলির শ্রেণী-বিভাগ করা হয় তাদের থিতাবার স্থির অনুপাত (Sedimentation constant ratio) দিয়ে। থিতাবার Constant হচ্ছে

$$\frac{\text{আলট্রা সেন্টিফিউজ যন্ত্রে থিতাবার গতি}}{\text{কেন্দ্রাতিগ ক্ষেত্র}},$$

অর্থাৎ

$$\text{Sedimentation Constant} = \frac{\text{Sedimentation Velocity}}{\text{Centrifugal Field}}$$

এবং ঐ অনুপাতকে মাপা হয় Svedberg

unit (S) দিয়ে। যেমন ৩০ এস, ৫০ এস, ৭০ এস—ইত্যাদি। প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্যে উপযুক্ত রাইবোসোম হচ্ছে ৫০ এস ও ৩০ এস সাব-ইউনিট দুটির সমষ্টি—৭০ এস। ৭০ এস ইউনিটের ৫০ এস সাবইউনিটটিই প্রকৃত কাজের ক্ষেত্র, অর্থাৎ Active site, যেখানে এস. আর. এন. এ. অ্যামিনো অ্যাসিড কমপ্লেক্সটি এসে স্থান পায়। নির্দিষ্ট বিরতিতে একটি কার্যকরী রাইবো-সোম একটি মাত্র পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল গড়ে তোলে। রাইবোসোমের ৫০ এস সাবইউনিটটিতে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল যেমন বেড়ে চলে, প্রথম অংশের অ্যামিনো প্রান্তটি নতুন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। রাইবোসোমের বিশেষ অংশে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খল সংগঠনের স্থানে সংবাদবাহী আর. এন. এ. তার সঙ্কেত দিয়ে যায়। সেই সঙ্কেত অনুসারে অ্যামিনো অ্যাসিড এস. আর. এন. এ. কমপ্লেক্সটি পেপ্‌টাইড গঠনের কাজে লেগে যায়। আবার পরের সঙ্কেত অনুযায়ী অন্য কমপ্লেক্স এসে পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলকে দীর্ঘতর করে। একটি সংবাদবাহী আর. এন. এ. একেবারে বেশ কয়েকটি রাইবো-সোমে তার ঐ সঙ্কেত নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে যায়। বস্তুতঃ ছয় থেকে আটটি রাইবোসোমের সঙ্গে একটি সংবাদবাহী আর. এন. এ-র অণু থাকে। এই রাইবোসোমগুলি ও সংবাদবাহী আর. এন. এ-কে একসঙ্গে বলে আর্গোসোম্‌স্‌ (Ergosomes) বা পলিসোম্‌স্‌ (Polysomes)। একটি সংবাদবাহী আর. এন. এ. একসঙ্গে অনেকগুলি রাইবোসোমকে তার সঙ্কেত জানিয়ে যায়—পেপ্‌টাইড শৃঙ্খলও বেড়ে চলে সংখ্যা অনুযায়ী। ৩নং ছবিতে রাইবোসোম ও সংবাদ-বাহী আর. এন. এ-র সম্বন্ধটি বোঝা যাবে।

জীবকোষে প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা গেছে। মানুষ জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে, কেমন করে ডি. এন. এ-র মধ্যে সব সঙ্কেত জড়ো হয়ে থাকে, যেগুলি কোষ কিছুতেই ব্যবহার করতে পারে না। যতগুলি সংবাদবাহী আর এন. এ-র দরকার, কোষ কেবল ততগুলিকেই নিউক্লিয়াস থেকে সঙ্কেত দিয়ে বিশেষ প্রোটিন তৈরি করবার উদ্দেশ্যে সাইটো-প্লাজমে পাঠায়। প্রোটিন সংশ্লেষণ কেন্দ্র কি এবং প্রোটিন সংশ্লেষণের উপর হর্মোনের কি কাজ? এসব সমস্যার সমাধানে এবং নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে হর্মোনের প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এসব জিজ্ঞাসার সমাধান হবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থব্যয়ের সার্থকতা

শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রত্যেক সভ্যদেশেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। আমাদের দেশেও এই বাবদে খরচ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং ১৯৬৬ সালে ৮৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টাতেই এই অর্থের অধিকাংশ নিয়োজিত হয়। অপ্রয়োজনীয় কারণে ব্যয় কোনও দেশের শাসনতন্ত্রই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করে না। বিজ্ঞানের সম্প্রসারণে জনসাধারণের এই পর্যন্ত কি উন্নতি বা উপকার হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এই অর্থব্যয়ের সার্থকতা বা ব্যর্থতার কথা বুঝা যেতে পারে।

সভ্যতার অভ্যুদয় হয় মানুষের সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা ও দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা থেকে। প্রথম অবস্থায় এই যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল পদব্রজে, পরে পশুচালিত যানবাহনে এবং ক্রমশঃ বাষ্পযানে—জলপথে ও স্থলপথে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইণ্টারন্যাল কমবাস্‌সন ইঞ্জিন প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতের ব্যবস্থা দ্রুততর হলো মোটর গাড়ী ও উড়োজাহাজে। আকাশপথ মানুষের আয়ত্তাধীন হলো। বর্তমানে মহাকাশ পর্যটনও সম্ভব হয়েছে। জল, স্থল এবং আকাশপথ সুগম হওয়ায় অভিনব সুযোগ ও সুবিধা হয়েছে এক দেশের অভাবের সামগ্রী অন্য দেশ থেকে আমদানী করায় এবং ভিন্ন দেশের অধিক উৎপাদন অনটনের দেশে রপ্তানী করায়। এই বাণিজ্যিক সূত্রেই এক দেশের জ্ঞানসম্পদ অন্য দেশে প্রসার লাভ করছে এবং মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর প্রবর্তন হয়েছে। নিজের অস্তিত্ব, ক্ষমতা ও বুদ্ধি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এখন মানুষ আর প্রকৃতির বশে না থেকে প্রকৃতিকে বশে আনতে সচেষ্ট।

বিরাট ব্রহ্মাণ্ডে আমাদের এই পৃথিবী যে একটি ধূলিকণার মত স্থান জুড়ে আছে এবং এই জগৎ ছাড়াও এই রকম অসংখ্য জগৎ বিদ্যমান, আমাদের এখন এই জ্ঞান হয়েছে। যদিও এই পৃথিবীর আবহাওয়া, নদ-নদী, পর্বত ও সমুদ্র সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ। অক্লান্ত প্রচেষ্টা এখনও চলেছে সঠিক উত্তর জানবার জন্যে। এই পৃথিবীর উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে, এর অভ্যন্তরের গঠন কেমন এবং কিরূপ প্রক্রিয়া সেখানে চলছে? বিশ্বপ্রকৃতির তত্ত্ব বা রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ সতত সচেষ্ট।

শত বছরের অনুসন্ধানে অণু-পরমাণু সম্বন্ধে যে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আহরণ করা হয়েছিল, বিগত বিশ বছরে বিরামহীন গবেষণার ফলে সে জ্ঞান-ভাণ্ডারের অনেক বৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। সময়, কাল ও দূরত্ব বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম হিসাবের ধারণা এখন হয়েছে। $১০^{১০}$ বছর পূর্বে নভোমণ্ডলে কতগুলি নক্ষত্রপুঞ্জ বা উপগ্রহ ছিল, তার হিসাব করা এখন সম্ভব। যে মৌলিক কণিকাগুলি (Fundamental particles) মাত্র $১০^{১০}$ সেকেণ্ড স্পন্দিত হয়, সেগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করা হচ্ছে এবং মাত্র $১০^{-২২}$ সে. মি. ব্যবধানে পারমাণবিক কেন্দ্রীনের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আয়ত্তাধীন হয়েছে। গত বিশ বছরে বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণু সম্বন্ধে যে

জ্ঞান আহরণ করেছেন, তার সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের বহুমুখী উৎকর্ষ সাধনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরমাণু বিভাজনের ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয়, তার প্রথম প্রয়োগ মারণাস্ত্র নির্মাণে হয়েছে বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণার অভিপ্রায় তা ছিল না। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে এবং অন্যান্য হিতকর উদ্দেশ্যে এই শক্তি নিযুক্ত করাই ছিল অভীষ্ট। ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীন বিভাজনের ফলে এই শক্তি উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম প্রচুর পাওয়া যায় এবং ট্রম্বেতে ইউরেনিয়াম বিভাজনের একটি কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ভারত সরকার ঘোষণা করেছেন যে, এই সংস্থায় উৎপাদিত শক্তি কেবলমাত্র জনহিতকর কার্যেই ব্যবহৃত হবে।

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্যে এখনও অনেক ক্ষেত্রেই খনিজ তৈল বা কয়লা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু খনিজ সম্পদ চিরস্থায়ী নয় এবং বৈদ্যুতিক শক্তির চাহিদাও শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়েই চলেছে। ১৯৫৩ সালে চাহিদা ছিল ৪৩৭.৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার। ১৯৬৩ সালে বেড়ে হয়েছিল ১১৮৬। অতএব কোনও উন্নততর বা বিকল্প প্রকৃষ্ট পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা অনেক দিন চলেছিল; যেমন, একটি হলো জলশক্তি। ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রীন বিভাজনে ২০০ এম. ই. ভি. শক্তি উৎপন্ন হয়। এক গ্র্যাম ইউরেনিয়াম থেকে ১৯ মিলিয়ন কিলোক্যালরী তাপের সৃষ্টি হয়। সমপরিমাণ কয়লা বা খনিজ তেলের চেয়ে তা অনেকগুণ বেশী। সুতরাং প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও এর প্রয়োজন অল্প। এছাড়া সৌরশক্তির ব্যবহারও মানুষের আয়ত্তাধীন হয়েছে। সৌরশক্তি (বাৎসরিক ২.০১×১০^১৮ কিলোওয়াট) কাজে লাগাতে পারলে ভবিষ্যতে শক্তির উৎসের অভাব থাকবে না। আপাততঃ এই শক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহারে নানা অসুবিধা আছে এবং ব্যবস্থা করাও অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। পরমাণুর বিভাজনে উৎপাদিত বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে ছোটখাটো কলকারখানা চালিত করা অর্থাৎ স্বল্প ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় (Unit form) প্রয়োগ করবার সুযোগ নেই। কারণ এই শক্তির স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সম্ভব নয় এবং অল্প পরিমাণে এই বিভাজন-প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করাও যায় না। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করতে হলে বৃহৎ সংস্থার প্রয়োজন; যেমন—D. V. C. থেকে গ্রিডের মাধ্যমে তড়িৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। একখানি মোটর গাড়ী চালাতে যে তড়িৎ-শক্তির প্রয়োজন, একটি বাক্সের মত ছোট স্থানে পরমাণুর বিভাজনের দ্বারা সেই শক্তির উৎপাদন সম্ভব হলেও নিরাপত্তার জন্যে ধাতু ও কংক্রিটের যে আবরণের প্রয়োজন, তার ওজন উপস্থিত ব্যবহৃত ইঞ্জিনগুলির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু কলকারখানা বা যানবাহন চালনার জন্যে পারমাণবিক শক্তির আপাততঃ ব্যবহার সম্ভব না হলেও এই সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না যে, শিল্পের উন্নতির জন্যে বা মানবকল্যাণে পারমাণবিক শক্তির কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নি। যে, সকল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কেন্দ্রীনের বিভাজন-ক্রিয়া থেকে প্রস্তুত হচ্ছে, সেগুলির সাহায্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে বহুমুখী উন্নতি সাধিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন হাতে পেয়েছেন 'পরশ পাথর' (Philosopher's stone), যে শক্তির সাহায্যে একটি মৌলিক পদার্থকে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিবর্তিত করা যায়।

আমরা জানি, উদ্ভিদ-জগৎ আলো ও জলের সাহায্যে বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে নিজেদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম, কিন্তু জীব-জগতে সেটা সম্ভব নয়। রোগীর শরীরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ প্রবিষ্ট করিয়ে এখন জটিল

রোগ নির্ণয়, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার করা হয়। আশা করা যায়, উদ্ভিদ-জগতের এই আলোক-সংশ্লেষণের রহস্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে গবেষণার ফলে একদিন উদ্ঘাটিত হবে এবং শর্করাজাতীয় যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যই তখন কারখানায় নিজেদের প্রয়োজনমত প্রস্তুত করা যাবে। রাসায়নিকদের সাহায্যে সংশ্লেষিত স্নেহজাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা আগেই হয়েছে। সামুদ্রিক আগাছা থেকে পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করবার ব্যবস্থাও চলেছে। প্রোটিন-প্রধান খাদ্য সংগ্রহের জন্যে সমুদ্রে মৎস্যশিকারের উপযোগী জাহাজ নির্মিত হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণের জন্যে নানা বৈজ্ঞানিক প্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে এবং খাদ্যপ্রাণ সম্বন্ধে যে সব গবেষণা গত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে হয়েছে, তাথেকে খাদ্যের যথাযথ পুষ্টিমূল্য নির্ণয় করা সম্ভব হওয়ায় শরীর সুস্থ রাখবার সুযোগ হয়েছে। মাটির উর্বরাশক্তি বাড়াবার অনেক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গত বিশ বছরে আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে এখন জানা যায়, তাতে কোন্ পদার্থের অভাব আছে এবং সেই অভাব পূরণ করে অনুর্বর জমিকে উর্বর করা যায়। তাছাড়া কুলসংক্রমণ (Genetical) পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এখন এমন বীজ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে, যা প্রতিকূল অবস্থায়ও অঙ্কুরিত হবে এবং বেশী ফলন দিতে পারবে। সব দেশেই শিল্প-সংস্থা প্রসারের সঙ্গে ও ক্রমবর্ধিষ্ণু লোকসংখ্যার বাসস্থানের ব্যবস্থায় গত বিশ বছরে চাষ-আবাদের জমির সঙ্কোচন হয়েছে, কিন্তু উন্নত প্রথায় কৃষির সাহায্যে খাদ্যশস্যের ফলন বেড়েছে। আমাদের দেশে গত ১৫ বছর খাদ্যশস্যের ফলন শতকরা ৫০ ভাগ বর্ধিত হয়েছে (১৯৪৭-৪৮—৫২ মিলিয়ন টন; ১৯৬০-৬১—৭৬ মিলিয়ন টন), কিন্তু অপরিমিত লোক-সংখ্যার জন্যে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব মেটে নি। যাহোক, জোলো ও পোড়ো জমিকে কৃষি বা বাসস্থানের উপযোগী করবার চেষ্টাও চলেছে এবং মরুভূমিকে আয়ত্তাধীনে আনবার বৈজ্ঞানিক চেষ্টারও বিরাম নেই। খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাব দূর করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা বৈজ্ঞানিকের দায়িত্ব এবং সেই কারণেই প্রত্যেক দেশের জাতীয় বাজেটে গবেষণার জন্যে অর্থসংস্থান করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে দেশের খাদ্য-সংস্থায় যা উন্নতি সম্ভব হয়েছে এবং ভবিষ্যতের জন্যে আশা করা যায়, তার আভাস আগেই দেওয়া হয়েছে। রাসায়নিক গবেষণার সাহায্যে সম্প্রতি নানা প্রকার সংশ্লেষিত তন্তু আবিষ্কৃত হয়েছে। দেশে তুলার চাষ কম হলেও পোষাক-পরিচ্ছদের অভাব বোধ হয় আর হবে বলে মনে হয় না, কারণ নাইলন বা টেরিলিন তন্তু প্রস্তুতির জন্যে প্রকৃতিজাত কোনও বস্তুরই প্রয়োজন নেই।

রাসায়নিক ও বায়োকেমিষ্টদের সমবেত গবেষণার ফলে গত বিশ বছরে ছত্রাক থেকে কিংবা রাসায়নিক সংশ্লেষণ করে স্ট্রেপ্টোমাইসিন পেনিসিলিন, সাল্‌ফোন্যামাইড, প্যাস ইত্যাদি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ওষুধগুলি যক্ষা, কুষ্ঠ প্রভৃতি দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় অমোঘ অস্ত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে এই সব ওষুধ প্রস্তুতের সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবও D. D. T. প্রভৃতি সম্প্রতি আবিষ্কৃত প্রতিষেধকের দ্বারা প্রশমিত হয়েছে। সুস্থ ও সবল স্বাস্থ্যে মানুষ এখন দীর্ঘজীবন ভোগ করবার আশা রাখে। এই সব দেখে-শুনে প্রত্যয় হয় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অর্থব্যয়ের অনেকাংশই মানবকল্যাণে নিয়োজিত হয়। মহাকাশ পর্যটনের প্রয়াসে শিল্পোন্নত দেশগুলি যে প্রচুর অর্থব্যয় করে চলেছে, সেই সম্বন্ধে গবেষণাপ্রসূত নানা তথ্য এখন লোকহিতকর কার্যে ব্যবহারের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

। "টাইরস" প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশের আবহাওয়া নিরীক্ষণের জন্যে ব্যবহার করা হয়। লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন স্থানে ও সমুদ্রের উপর এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মহাঝঞ্ঝা (টাইফুন হ্যারিকেন প্রভৃতি) উপক্রমের খবর পূর্বভাগেই পাওয়া যায় এবং তাতে অনেকের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়। অদূর ভবিষ্যতে এরূপ কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশের নানা স্থানে জালের মত বিস্তার করে পৃথিবীর সকল দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের খবর পূর্বভাগেই সংগ্রহ করা যেতে পারবে। জানা গেছে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকায় লুইসিয়ানা ও টেক্সাস প্রদেশে যে মহাঝঞ্ঝা হয়েছিল, তার খবর যোগাযোগ উপগ্রহ টাইরস-৩-এর সাহায্যে পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। ঐ সময় ফরমোসা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যে টাইফুন হয়, সে খবরও উপগ্রহের মারফৎ পূর্বেই সংগৃহীত হয়েছিল এবং পূর্বভাগেই প্রয়োজনমত সাবধানতা অবলম্বন করে দুর্বিপাক থেকে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

কতকগুলি কৃত্রিম উপগ্রহে অবলোহিত রশ্মির সাহায্যে পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পর্বত-চূড়ায় সমাবিষ্ট তুষারের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। তদনুসারে জানা যায়, নদ-নদীর জল কত বাড়তে পারে এবং বন্যার সম্ভাবনা থাকলে আগেই সাবধান হওয়া যেতে পারে। এই যোগাযোগকারী উপগ্রহগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত থাকলে পঙ্গপালের গতিবিধি সম্বন্ধেও পূর্বনিদর্শন পাওয়া যায় এবং তার ফলে সতর্কতা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

টেলষ্টার ও রিলে উপগ্রহের সাহায্যে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এখন টেলিভিসনে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিভিসনে কেবলমাত্র আমোদ-প্রমোদের কর্মসূচীই সরবরাহ করা হয় না, এর মাধ্যমে বিদেশের সঙ্গে নানাভাবে যোগাযোগের সুব্যবস্থাও হয়ে থাকে। ইংল্যাণ্ডের কোনও একটি হাসপাতালে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগীর হৃদ্‌স্পন্দনের ছবি (Cardiogram) টেলিভিসনের সাহায্যে আমেরিকার কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পাঠিয়ে তাঁর নির্দেশমত তৎপরতার সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে বলেও শোনা যায়।

মহাকাশ অভিযানে প্রস্তুতির জন্যে তথ্যানুসন্ধানে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা এপর্যন্ত হয়েছে, তাতে শিল্প ও শিক্ষাবিস্তারের অনেক সাহায্য হচ্ছে। প্রথমতঃ জটিল কলকব্জা তৈরির জন্যে কতকগুলি কারখানা ও উচ্চাঙ্গের গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে। মহাকাশগামীযানের এক অংশে ব্যবহারের জন্যে সহসা তাপ-পরিবর্তনশীল একপ্রকার প্লাস্টিক উদ্ভাবিত হয়েছে। এই প্লাষ্টিকের তৈরি পাত্রাদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যায়। ঐ যান গঠনের সময় ছিদ্র করবার জন্যে বিশেষ এক প্রকার ছেদন যন্ত্রের (Drill) প্রয়োজন হয়। এই জন্যে একটি কঠিন সঙ্কর ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে। কঠিন প্রস্তর ভেদ করতে ও মরুদেশে কূপ খনন করতে এই সঙ্কর ধাতু-নির্মিত ছেদন যন্ত্রের ব্যবহার অপরিহার্য। মহাকাশ অভিযানে তড়িৎ-

শক্তি উৎপাদনের জন্যে সৌরশক্তি প্রভাবিত কোষ (Cell) আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কোষগুলি পৃথিবীতে লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে। মহাকাশযাত্রীদের নিরাপত্তা ও কষ্ট লাঘবের জন্যে যে চাপ-নিয়ন্ত্রিত পোষাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই পোষাক এখন গুরুতর রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীর শুশ্রূষার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

অতএব দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে অর্থব্যয় হয়, তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লোকহিতকর কার্যেই প্রযুক্ত হয়। এই সম্পর্কিত গবেষণা-কেন্দ্রগুলি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান—সেখানে সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী ও বিদগ্ধজন সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ পান এবং তার সংস্পর্শে অদূর ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠারও আশা করা যায়।

কোয়াসার

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

আজ অবধি মহাকাশে যেসব জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে রহস্যময় হলো কোয়াসার (QUASAR)—পুরো নাম—Quasi Stellar Radio Source, অর্থাৎ উপনাক্ষত্রিক বেতার-প্রভব। প্রায় দশ হাজার সূর্যের সমান দ্যুতি এক-একটি কোয়াসারের। আর নক্ষত্রের মত দেখালেও এরা ঠিক নক্ষত্র নয়, আবার গ্যালাক্সীর (নীহারিকা বা নক্ষত্র-জগৎ) সঙ্গেও এদের মিল নেই।

কোয়াসার আবিষ্কারের কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। রহস্যের সূচনা হয়—বলতে গেলে ১৯৫১ সালে, যখন উইলসন মানমন্দিরে ওয়াল্টার বাডে সর্বপ্রথম বেতারগুঞ্জন শুনতে পান ৭০ কোটি আলোক-বছর দূরে অবস্থিত এক দৈত্যাকার গ্যালাক্সী থেকে। এর ফলে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল জাগ্রত হলো এবং বেতার-প্রভব সম্পর্কে আরও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর নানাস্থানে স্থাপিত হলো টেলিস্কোপ। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো—ক্যালটেক, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গ্রীন ব্যাঙ্ক, অষ্ট্রেলিয়ার পার্কস্ এবং ইংল্যাণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্কের রেডিও-টেলিস্কোপসমূহ। এরপর দশ বছর ধরে নানা দেশে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চললো। এর ফলে ক্রমে আরও প্রায় এক শত শক্তিশালী বেতার-প্রভবের সন্ধান পাওয়া গেল এবং এদের সবগুলিকেই আমাদের পরিচিত গ্যালাক্সীরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব হলো। এই তালিকায় বর্তমানে সবচেয়ে দূরবর্তীটি হলো বুয়েটিস নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত 3C 295 (এর অর্থ হলো, ৩নং কেম্ব্রিজ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ২৯৫ নং জ্যোতিষ্ক)। এর দূরত্ব হলো ৪ মহাপদ্ম আলোক-বছর (১ মহাপদ্ম=1 Billion =1,000,000,000,000)।

এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা যেসব বেতার প্রভবের সন্ধান পেয়েছেন, তাদের কোনটিই গ্যালাক্সীর চেয়ে ছোট নয়, অর্থাৎ এদের কারোর ব্যাসই এক লক্ষ আলোক-বছরের চেয়ে কম নয়। কিন্তু ১৯৬০ সালে দেখা গেল, ছোট্ট একটি নক্ষত্র থেকে প্রভূত পরিমাণে বেতার-তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে আসছে। এই সংবাদে বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ক্রমে আরও কয়েকটি বেতার-প্রভবের অবস্থান সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করবার পর

আকাশের আলোকচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হলো। দেখা গেল, এসব ক্ষেত্রেও বেতার-তরঙ্গ উৎসারিত হয়ে আসছে অবিশ্বাস্য রকমের ছোট এবং ম্লান এক-একটি নক্ষত্র থেকে। এদের কারোর দ্যুতিই পঞ্চদশ প্রভার (15th magnitude) নক্ষত্রের চেয়ে বেশী নয়। বিজ্ঞানীরা এদের নাম দিলেন কোয়াসার। এতদিন পর্যন্ত এদের অবস্থান সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানা যায় নি, কিন্তু ১৯৬৩ সালে এবিষয়ে নতুন করে কৌতূহল জাগ্রত হলো, যখন অষ্ট্রেলিয়ায় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা 3C 273 নামক একটি বেতার-প্রভবের অবস্থান সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্যালোমারের বিখ্যাত দূরবীক্ষণের সাহায্যে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করা হলো। শুধু তাই নয়, ক্যালটেক গোষ্ঠীর বিজ্ঞানী স্মিড বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখলেন, বর্ণালীর হাইড্রোজেন রেখাগুলি লাল আলোর দিকে অনেকখানি সরে গেছে। ডপ্লারের তত্ত্ব অনুসারে লাল-অপসরণ (Red shift) সূত্র প্রয়োগ করে এর দূরত্ব নির্ধারণ করে স্মিড বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এই হিসেব অনুযায়ী দূরত্ব বেরুলো ২ মহাপদ্ম আলোক-বছর। আর এর ছবি পরীক্ষা করে বোঝা গেল যে, এটি গ্যালাক্সী হতে পারে না, কারণ এর ব্যাস আমাদের ছায়াপথের ব্যাসের এক সহস্রাংশেরও কম।

১৯৬৫ সালে স্মিড আরও পাঁচটি কোয়াসারের দূরত্ব নির্ধারণ করেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে দূরবর্তী হলো 3C 9। লাল-অপসরণ সূত্র প্রয়োগ করে দেখা গেল, এর দূরত্ব প্রায় ১০ মহাপদ্ম আলোক-বছর। আর এটি আমাদের কাছ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১,৫০,০০০ মাইল বেগে আরও দূরে ছুটে চলেছে। এই ভাবে—বলতে গেলে প্রায় এক বছরের মধ্যেই আমাদের দিগন্ত আরও দ্বিগুণ দূরে প্রসারিত হয়ে গেছে।

এদের সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এদের ঔজ্জ্বল্য। 3C 273 নামক কোয়াসারের কথা ধরা যাক। এটি প্রায় ২ মহাপদ্ম আলোক-বছর দূরে রয়েছে। কিন্তু এথেকে এত বিপুল পরিমাণে আলোক-রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে যে, একে একটি সাধারণ দূরবীক্ষণের সাহায্যেই দেখা যায়, যদিও অত দূরের কোন নীহারিকা দেখতে হলে দরকার হয় পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীক্ষণের। এর কারণ—একটি নীহারিকার প্রায় এক শত গুণ আলো উৎসারিত হয়ে আসছে এই কোয়াসার থেকে।

যেমন তেজ, তেমন দূরত্ব এবং তেমনি অসাধারণ দ্রুতি এক-একটি কোয়াসারের। কোয়াসার এত তেজ, এত শক্তি পেল কোথা থেকে? এই প্রশ্নটি আজ জগতের সেরা বিজ্ঞানীদেরও ভাবিত করে তুলেছে। তাই তাঁরা একের পর এক মতবাদ প্রচার করে চলেছেন আর তাই নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে জল্পনা-কল্পনা আর বাক্‌বিতণ্ডার অন্ত নেই।

ইংরেজ বিজ্ঞানী হয়েল এবং ক্যালটেক গোষ্ঠীর বিজ্ঞানী ফাউলার বলেছেন, কোয়াসারের সৃষ্টি হয়েছে একপ্রকার অন্তর্মুখী বিস্ফোরণের (Implosion) ফলে। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার।

আমরা জানি, সূর্য অথবা অন্যান্য তারকার উত্তাপের মাত্রা কল্পনাতীত। সেখানে তারকার উপাদান পরমাণুগুলি অতি ভয়ঙ্কর বেগে ছুটাছুটি করছে। কাজেই এরূপ সংঘাতের ফলে দুটি পরমাণু মিলিত হয়ে নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এর নাম ফিউসন বা সম্মিলন-প্রক্রিয়া। এভাবে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনে সম্মিলিত হবার ফলে তৈরি হয় ডয়টেরিয়াম, আর দুটি ডয়টেরিয়াম মিলে তৈরি করে হিলিয়াম। কিন্তু এর ফলে খানিকটা পদার্থের বিলোপ ঘটে এবং

তাথেকে প্রচুর শক্তি জন্মায়—আইনষ্টাইনের সূত্র অনুসারে। এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে, কাজেই তারকাটির উষ্ণতাও ক্রমে বাড়তে থাকে। এভাবে তারকাটি লাল দানবের (Red giant) অবস্থা থেকে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত অতি উত্তপ্ত এবং অতি উজ্জ্বল নীল তারকায় পরিণতি লাভ করে।

তারকায় যতদিন হাইড্রোজেন থাকবে ততদিন এই বিক্রিয়া চলতে থাকবে, অর্থাৎ তারকার অভ্যন্তরে পারমাণবিক চুল্লীটি অনির্বাণ জ্বলতে থাকবে। কিন্তু হাইড্রোজেন ইন্ধন যেদিন ফুরিয়ে যাবে, সেদিন এই বিক্রিয়া আর সম্ভব হবে না। তাই নতুন করে শক্তিরও সৃষ্টি হবে না। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে অত্যুত্তপ্ত তারকা থেকে তেজ-শক্তির বিকিরণ চলতে থাকবে অব্যাহত-ভাবে। এর ফলে একদিন তারকাটি আবার শীতল ও সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করবে।

এইভাবে সঙ্কুচিত হতে হতে শেষে একদিন তারকার জীবনে নেমে আসবে এক দারুণ বিপর্যয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, তারকার সঙ্কোচন একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালে উপাদান পরমাণুগুলির অনেকেরই ইলেকট্রন-খোলস ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, সৃষ্টি হবে ঘন সন্নিবিষ্ট নিউট্রন, প্রোটন আর ইলেকট্রন কণার স্তূপ। তারকার অভ্যন্তরে এরূপ বিপর্যয় হবার ফলে তারকাটির আকার হঠাৎ অনেক ছোট হয়ে যাবে; অর্থাৎ ফুটো-হয়ে-যাওয়া বেলুনের মত তারকাটি হঠাৎ একেবারে চুপ্‌সে যাবে।

কিন্তু এভাবে দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে গেলে হঠাৎ অপরিসীম তেজ-শক্তির উদ্ভব হবে। তাই ছোট হলেও এরূপ তারকার উষ্ণতা হবে খুবই বেশী। এরাই আকাশে শ্বেত বামন (White dwarf) তারকারূপে বিরাজ করে।

বিজ্ঞানীরা আরও বুঝতে পেরেছেন যে, তারকার অভ্যন্তরে যখন বিপর্যয় ঘটে, অর্থাৎ তারকাটি যখন হঠাৎ চুপ্‌সে যেতে থাকে, তখন হঠাৎ যে অপরিসীম তেজের সৃষ্টি হয়, তা তারকাটির অভ্যন্তর থেকে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। সম্ভবতঃ এজন্যেই এরূপ তারকার চারদিকে ক্রমবর্ধমান উজ্জ্বল গ্যাসীয় আবরণ দেখা যায়। আর এই কারণেই দেখা যায়, আকাশের একটি ম্লান তারকার ঔজ্জ্বল্য হঠাৎ হয়তো খুব অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেল—সৃষ্টি হলো একটি নোভা বা নতুন তারকার। এক কথায় বলা যায়, একটি তারকার অভ্যন্তরে পরমাণু-বোমার অনুরূপ এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ হওয়াতেই তার নোভার অবস্থা প্রাপ্তি সম্ভব হয়।

হয়েল এবং ফাউলার বলেন, অসংখ্য নক্ষত্র সমন্বিত একটি গ্যালাক্সীর জীবনেও অনুরূপ বিপর্যয় ঘনিয়ে আসতে পারে। তবে তা ঘটবে আরও বিরাট মাত্রায়। কাজেই তার ফল হবে আরও সাংঘাতিক। এক্ষেত্রে সমগ্র গ্যালাক্সীটাই এক বারে চুপ্‌সে যাবে। তারপর চলতে থাকবে একের পর এক প্রলয়ঙ্কর অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী বিস্ফোরণ। এভাবেই জন্ম নেয় কোয়াসার। বাস্তবিক এরা যেন মহাকাশের প্রত্যন্ত প্রদেশের এক-একটি অতিনোভা (Super nova)।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এরূপ কতিপয় বিস্ফোরণের ফলে শেষ পর্যন্ত একটি গ্যালাক্সীর যাবতীয় জড় বস্তুই অপেক্ষাকৃত ছোট একটি কেন্দ্রে ঘনীভূত হয়ে পড়বে। তখন এর আয়তন হবে শ্বেত বামন তারকার চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু ঘনত্ব হবে সে তুলনায় অনেক কম। আর এরূপ বিরাট মাত্রার ভয়ঙ্কর অন্তর্মুখী বিস্ফোরণের ফলে যে কি বিপুল পরিমাণ তেজ-শক্তি উৎসারিত হয়ে আসবে, তার পরিমাপ করা মানুষের অসাধ্য।

অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ যে এক অভিনব এবং দুঃসাহসিক কল্পনা, এটা ঠিক। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রধান

উৎপত্তি দেখা দিল আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুসারে। একটি গ্যালাক্সীতে ১০ লক্ষ থেকে ১০ কোটি সূর্যের সমান পদার্থ থাকা সম্ভব। সুতরাং অন্তর্মুখী বিস্ফোরণের ফলে এরূপ একটি গ্যালাক্সী যখন সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে, তখন তার অভিকর্ষীয় টান এত মারাত্মক হয়ে পড়বে যে, সেই টান পেরিয়ে আলোক-তরঙ্গও বেরিয়ে আসতে পারবে না। তাই সমগ্র গ্যালাক্সীটাই হঠাৎ আমাদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে; অর্থাৎ একটা প্রলঙ্কর বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরে সমগ্র গ্যালাক্সীটাই হঠাৎ দপ্ করে নিবে যাবে। কিন্তু কই, এরূপ দৃশ্য তো আজ অবধি কারোর নজরে পড়ে নি!

কিন্তু হয়েল হার মানলেন না। তিনি বললেন, আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শুধু নিখুঁৎ গোলকের বেলায়ই প্রযোজ্য। একটি গ্যালাক্সী নিখুঁৎ গোলকের মত নাও হতে পারে। কাজেই তা হয়তো সব দিকে সমানভাবে চুপ্সাবে না, তাই তখন নানাদিক দিয়ে তেজ বেরিয়ে পড়বে।

সম্প্রতি লস্ আলামস্-এর বিজ্ঞানী টেরেল কোয়াসারের অস্তিত্ব সম্পর্কে এক নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন। কেম্ব্রিজের বিজ্ঞানী হয়েল এবং ক্যালিফোর্নিয়ার বিজ্ঞানী বারবিজও এই মতবাদ সম্ভবপর বলে স্বীকার করেছেন। এঁরা বলেন, আমাদের নক্ষত্রজগতেই (ছায়াপথ) কিংবা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্রজগতে স্বল্পকাল আগেই হয়তো এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে গেছে এবং তারই ফলে হয়তো এসব কোয়াসারের সৃষ্টি হয়েছে। এরা অপেক্ষাকৃত কাছ দিয়েই অত্যন্ত দ্রুতবেগে আমাদের নিকট থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে। অন্যান্য গ্যালাক্সীর তুলনায় এরা অনেক কাছ দিয়ে ছুটে চলেছে বলেই হয়তো এদের আপেক্ষিক গতিবেগ এত বেশী বলে মনে হচ্ছে। আর এজন্যেই হয়তো এদের লাল-অপসরণের মাত্রা এত বেশী বলে মনে হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এরা যদি আমাদের কাছ দিয়েই যাচ্ছে বলে মনে করা যায়, তাহলে এরা অপরিমিত তেজ-শক্তির আধার, এরূপ মনে করবার দরকার হয় না।

কিন্তু বিজ্ঞানী স্মিড এই মতবাদ সমর্থন করেন নি। তিনি বলেন, আমাদের নক্ষত্রজগতে কিংবা আমাদের নিকটবর্তী কোন নক্ষত্রজগতে এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের ফলেই যদি এসব কোয়াসারের উৎপত্তি হয়ে থাকে, তাহলে সকলেই আমাদের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে—এটা হতে পারে না। কেউ কেউ নিশ্চয়ই বিপুল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসবে। কাজেই কোন কোনটির আলোর বর্ণালী নিশ্চয়ই নীল আলোর দিকে সরে যাবে। আবার কেউ কেউ নিশ্চয়ই আশেপাশে সরে যাবে, তখন তাদের প্রকৃত গতি নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হবে। কিন্তু কই, এরূপ ঘটনা তো কেউ আজ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হন নি। তাই স্মিড বলেন, কোয়াসার আমাদের নক্ষত্রজগতের নিকটে অবস্থিত দ্রুত ধাবমান কোন জ্যোতিষ্ক, এরূপ প্রস্তাব মেনে নেওয়া যায় না। সুতরাং এখন একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কোয়া-সারের অপরিমিত তেজ-শক্তির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন।

যাহোক, পৃথিবী থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজও ঠিক বুঝতে পারছেন না যে, কোয়াসার দূর দিগন্তের অধিবাসী কোন অতিকায় নীহারিকা বা ঘনসন্নিবিষ্ট কতকগুলি তারকার সমষ্টি, না অতিনোভা! তবে এরা যে মহাকাশের প্রত্যন্ত দেশে অবস্থিত এক-একটি অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, সে বিষয়ে এখন অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত হয়েছেন, যদিও তাঁরা এখন পর্যন্ত এদের অপরিমিত তেজ-শক্তির উৎস সম্পর্কে সঠিক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি।

আর একটি কথা—কোয়াসার যদি সত্য সত্যই দূর দিগন্তের জ্যোতিষ্ক হয়, তাহলে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা এখন প্রায় ১০ মহাপদ্ম বছর আগেকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হচ্ছি। কারণ পৃথিবীতে বসে সবচেয়ে দূরবর্তী কোয়াসারের যে আলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা ঐ জ্যোতিষ্ক থেকে যাত্রা করেছিল প্রায় ১০ মহাপদ্ম বছর আগে! জানি না, হয়তো ইতিমধ্যে ঐ কোয়াসারের আলো নিবে গেছে, কিন্তু সে খবর যে আমরা কবে জানতে পারবো, তা কে বলবে? অনেকের অনুমান, এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল ৫ মহাপদ্ম বছর আগে। তাহলে বলতে হয় যে, কোয়াসারের সৃষ্টি হয়েছিল তারও প্রায় ৫ মহাপদ্ম বছর আগে; অর্থাৎ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল অন্ততঃ ১০ মহাপদ্ম বছর আগে।

কোয়াসার সম্পর্কে এপর্যন্ত যা কিছু বলা হলো, তার মূল ভিত্তি হলো লাল-অপসরণ সূত্র। কিন্তু এটা সত্য না মিথ্যা—সম্ভব না অসম্ভব, তা যাচাই করে দেখবার কোন পদ্ধতি আজও আবিষ্কৃত হয় নি। এর চাক্ষুষ প্রমাণ মিলবে তখনই, যখন দেখা যাবে যে, কোন গ্যালাক্সী সত্য সত্যই ডাইনে অথবা বাঁয়ে সরে গেছে। তবে বিজ্ঞানী-দের অনুমান, আমাদের নিকটবর্তী কোন গ্যালাক্সীকেও যদি তার ব্যাসের সমান দূরত্বে সরে যেতে হয় (যাতে তার অপসরণ প্রত্যক্ষ করা যায়), তাহলে সময় লাগবে অন্ততপক্ষে দশ লক্ষ বছর। সুতরাং উপরিউক্ত লাল-অপসরণ সূত্রের সত্যতা যাচাই করে দেখতে হলে আমাদের আরও অন্ততঃ ১০ লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হবে। ততদিনে কত সভ্যতা মুছে যাবে, আর কত নতুন সভ্যতার জন্ম হবে, তা কে বলবে?

বিজ্ঞান-সংবাদ

কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

লণ্ডনের ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ-এর গবেষণায় এমন একটা সুফল পাওয়া গেছে, যা থেকে আশা করা যেতে পারে যে, কুষ্ঠরোগ একদিন সাফল্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে—এমন কি, শেষ পর্যন্ত উচ্ছেদ করাও সম্ভব হবে।

মেডিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে সম্প্রতি এই কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে যে সব কাজ হয়েছে, তার একটা বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বিবরণীতে বলা হয়েছে—গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ও আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে, বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই রোগের প্রকোপ বেশী। বিশ্বে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকের সংখ্যা ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৫০ লক্ষের মধ্যে।

কৃত্রিম উপায়ে সংক্রামক জীবাণুর (Infective organism: Mycobacterium leprae) বিষয় অনুশীলন করা সম্ভব না হওয়ায় এপর্যন্ত লেবরেটরির কাজকর্মে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। এই কারণে পরীক্ষামূলকভাবে জীবজন্তুর উপর রোগ সংক্রমণ করাও সম্ভব হয় নি।

কিছুদিন ধরে জানা গেছে Mycobacterium laprae ইঁদুরের পায়ে কিছুটা সংক্রামিত হতে পারে। এই কথাটা জানবার পর নানা ধরণের ভেষজ নিয়ে পরীক্ষা করা এবং জীবাণুর আচরণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্ভব

হয়েছে। কিন্তু সংক্রমণের প্রকৃতি সীমিত হওয়ায় গবেষণা বেশী দূর এগুতে পারে নি।

এখন ইনষ্টিটিউটে গবেষণা-কর্মীরা আবিষ্কার করতে পেরেছেন—কি ভাবে ইঁদুরের কুষ্ঠরোগ-সংক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমানো যায় এবং কিভাবে ইঁদুরের মধ্যে সংক্রমণের বিস্তার ঘটানো যায়।

এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম, কারণ এই আবিষ্কার নতুন ভেষজের সন্ধান জোরদার করতে সাহায্য করেছে এবং লেবরেটরিতে রোগ সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে এই রোগ কিভাবে স্নায়ুর ক্ষতি করে, তা ভাল করে জানতেও সাহায্য করছে।

ইনষ্টিটিউটে কুষ্ঠরোগের জীবাণুর প্রকৃতি সম্বন্ধে কাজ করা সম্ভব হওয়ায় রোগের চিকিৎসায় ভেষজের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখবার কাজও সহজ হয়ে উঠেছে।

মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের বিবরণীতে রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আর একটা দিকও স্পষ্ট হয়েছে। উগাণ্ডায় সম্প্রতি ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে বি. সি. জি. টীকার কার্যকারিতা। বিবরণীতে বলা হয়েছে—প্রাথমিক ফলাফল দেখে এখনই উল্লসিত হবার কারণ নেই, এই সব ফলাফল সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। তবে এটুকু অন্ততঃ জানা গেছে যে, বি. সি. জি. টীকার কার্যকারিতা শতকরা অন্ততঃ ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে।

মানুষের যকৃৎ পুনঃসংস্থাপনের আশা

ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারির রীডার জোসেফ পীকক-এর নেতৃত্বে ১৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি চিকিৎসক দল আগামী বছর বৃটেনে মানুষের যকৃৎ পুনঃসংস্থাপনের কাজ সফল করে তুলতে পারেন। এই রকম আশা করবার কারণ, ১৬ মাসের একটি বন্য শূকর, মাস কয়েক যাবৎ অন্য জাতের একটি শূকরের যকৃৎ এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে।

মিঃ পীকক বলেন—পরীক্ষার জন্যে শূকর বেছে নেবার কারণ, গঠন ও প্রতিক্রিয়ায় শূকরের যকৃৎ অনেকটা মানুষের যকৃতের মত। এই সাদৃশ্যের জন্যে এবং পার্সিনানের শূকরটির ক্ষেত্রে সফল হওয়ায় মানুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ সাফল্যের আশা করা হচ্ছে। মিঃ পীকক বলেন, যকৃতের পুনঃ-সংস্থাপন অবিশ্বাস্য রকমের বড় অপারেশন। যকৃৎ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে এবং এখন শূকর ছেড়ে অনায়াসে মানুষ নিয়ে পরীক্ষা করা চলে।

পার্সিনানের সেই শূকরটির স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে। এথেকে বোঝা যায় যে, সে বিদেশী যকৃৎকে সহজভাবে গ্রহণ করেছে। মিঃ পীকক বলেন, ১৪টি শূকরের উপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র দুটি শূকর নতুন যকৃৎকে গ্রহণ না করায় তাদের মৃত্যু ঘটেছে। অন্য শূকরগুলির স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু ঘটেছে।

মিঃ পীকক-এর মতে, এই অস্ত্রোপচার সফল হলে যে সব রোগ নিরাময় করা সম্ভব হবে, তা হলো—পিত্তনালী বন্ধ হয়ে যাওয়া, যকৃতের রোগ ও যকৃতের ক্যান্সার ইত্যাদি।

সাধারণ অস্ত্রোপচারও যে বয়স পর্যন্ত চলে, এই যকৃতের অস্ত্রোপচারও সেই বয়স পর্যন্ত চলবে।

হোভার লিফটের সাহায্যে ৬০ টন ট্যাঙ্ক উত্তোলন

৬০ টনেরও বেশী ওজনের একটি ৩ লক্ষ গ্যালনের তেলের ট্যাঙ্ককে হোভার ক্র্যাফ্‌ট্ পদ্ধতির সাহায্যে চার দিনে একটি নতুন স্থানে সরানো সম্ভব হয়েছে। সাধারণভাবে এটিকে স্থানান্তর করতে সময় লাগতো তিন সপ্তাহ।

এই ট্যাঙ্কটির ব্যাস ৫০ ফুট এবং উচ্চতা ৩০ ফুট। এটি উঁচু-নীচু জমির উপর দিয়ে, রেল লাইনের উপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। হোভার ক্র্যাফ্‌ট্ পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে কোন মাপ ও ওজনের জিনিষকেই যে তোলা ও বহন করা সম্ভব, তা দেখাবার জন্যেই ম্যাঞ্চেষ্টারে এই কৌশল প্রদর্শিত হয়।

ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল লেবরেটরির হোভার ক্র্যাফ্‌ট্ ইউনিট পরিকল্পিত এই হোভার লিফ্‌টে রয়েছে একটি প্লাষ্টিকের স্কার্ট, যেটিকে ট্যাঙ্কের তলা দিয়ে দুটি ডিজেল চালিত ফ্যানের সাহায্যে একটি এয়ার কুশনের সৃষ্টি করা হয়। প্রতি বর্গফুটে ৬০ পাউণ্ডের মত বায়ুর চাপ সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে ট্যাঙ্কটি ১০ ইঞ্চির মত জমি থেকে উপরে উঠে যায়। তখন তাকে একটি ট্র্যাক্টরের সাহায্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদি ঐ ট্যাঙ্কটিকে রোলারের সাহায্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলে শুধু তিন সপ্তাহ সময়ই লাগতো না, ট্যাঙ্কটিকে খালি করে নেবার দরকার হতো।

পুস্তক পরিচয়

মুদ্রাঙ্কন—(মুদ্রণ-শিল্প সম্পর্কিত দ্বি-মাসিক বাংলা পত্রিকা)। সম্পাদক—দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ; ৬৭, গাঙ্গুলী বাগান লেন, রিষড়া হইতে প্রকাশিত।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই বোধ হয় সর্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ভারতের মুদ্রণ-শিল্পের ক্ষেত্রে বাংলার মুদ্রণ-শিল্প শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু এই শিল্পের অধিকতর প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে মুদ্রণ সম্পর্কিত শিক্ষাপ্রদ বাংলা পত্রিকার একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। আলোচ্য পত্রিকাখানি দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইয়াছি এই কারণে যে, মুদ্রণ-শিল্প সম্পর্কিত এই পত্রিকাটি হয়তো এই অভাব পূরণ করিতে সক্ষম হইবে। ইহাতে প্রকাশিত কয়েকটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ এবং ইহার মুদ্রণপারিপাট্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। আমরা পত্রিকাখানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

সেপ্টেম্বর—১৯৬৭

২০শ বর্ষ, ঃ ৯ম সংখ্যা
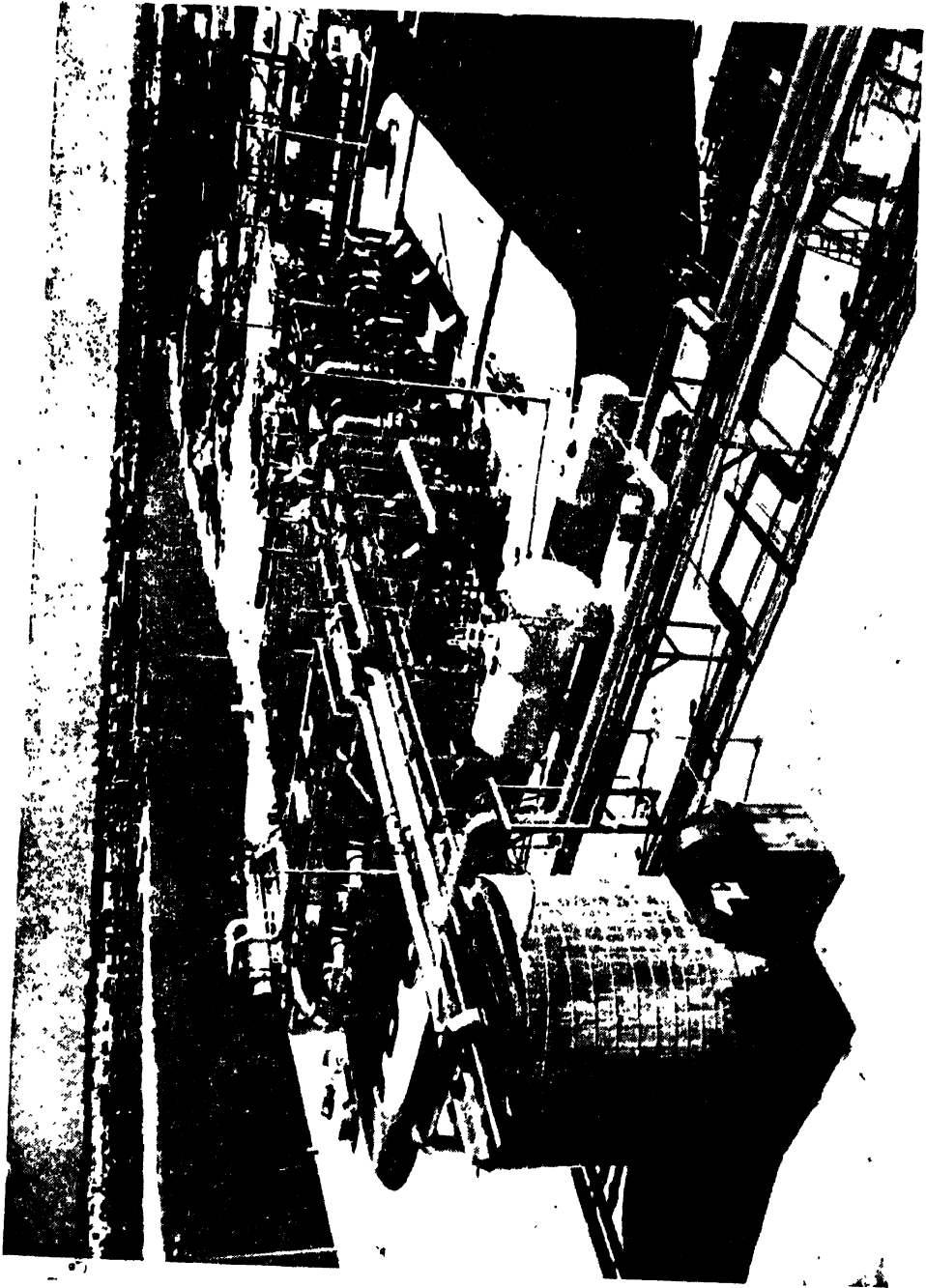
সমুদ্রের লবণাক্ত জল থেকে পানীয় জল উৎপাদনের কারখানা। সম্প্রতি ফ্লোরিডার কি-ওয়েষ্টে সমুদ্র-জল লবণমুক্ত করবার জন্যে এই কারখানাটির নির্মাণ-কার্য শেষ হয়েছে। এখানে প্রত্যহ প্রায় ৬ মিলিয়ন গ্যালন সমুদ্র-জল লবণমুক্ত করা যাবে।

করে দেখ

তড়িদ্গতিতে যোগফল নির্ণয়

বন্ধুদের কাউকে কাগজ অথবা বোর্ডের উপর পাঁচ অঙ্কের যে কোন একটা সংখ্যা লিখতে বল। তার নীচে তুমিও আবার পাঁচ অঙ্কের আর একটি সংখ্যা লিখে দাও। তোমার লেখা সংখ্যাটা দেখে সবাই মনে করবে—যেন খুসীমত যে কোন একটা সংখ্যা লিখেছ। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। তুমি যে অঙ্কগুলি বসাবে, তার প্রত্যেকটিকেই উপরের অঙ্কটির সঙ্গে যোগ দিলে যেন ৯ হয়।
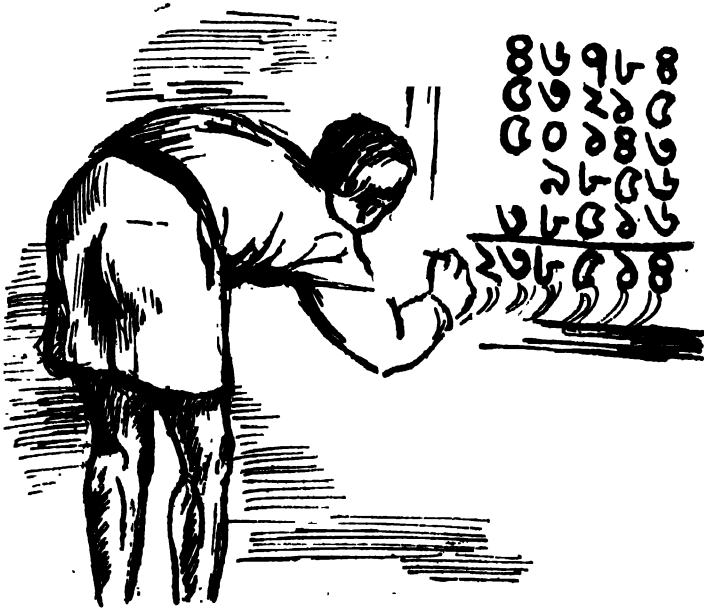
ধর, তোমার বন্ধু লিখেছে ৪৬৭৮৪। তাহলে তার নীচে তোমাকে লিখতে হবে ৫৩২১৫। বন্ধুকে এবার তার নীচে তৃতীয় ঘরে পাঁচ অঙ্কের আর একটা যে কোন সংখ্যা লিখতে বল। উপরের নিয়ম অনুসারে তুমিও তার নীচে চতুর্থ ঘরে আর একটা সংখ্যা লিখবে। এভাবে পঞ্চম ঘরে তোমার বন্ধু আর একটা সংখ্যা বসাবার পর নীচে লম্বা লাইন টেনে কিছুমাত্র চিন্তা না করেই সঠিক যোগফলটা লিখে দেবে। আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, যোগফলটা তুমি বাঁ-দিক থেকে ডান

দিকে লিখবে। কেমন করে সেটা করবে? তোমার বন্ধু যে পঞ্চম সংখ্যাটা লিখেছে, তার ডান দিকের শেষের অঙ্কটি থেকে ২ বাদ দিলে যা হবে, সেটাই লিখবে এবং সম্পূর্ণ সংখ্যাটির বাঁ-দিকে প্রথমে ২ সংখ্যাটি বসিয়ে দেবে।

ধর, তোমার বন্ধু শেষ সংখ্যাটি লিখেছে—৩৮৫১৬। যোগফলে তুমি এই সংখ্যাটির আগে ২ অঙ্কটি বসাবে এবং শেষের অঙ্ক ৬ থেকে ২ বাদ দিয়ে ৪ বসাবে। যোগফলটি তাহলে দাঁড়াবে ২৩৮৫১৪।

—গ—

মাইকেল ফ্যারাডে

মাইকেল ফ্যারাডের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। স্কুল-কলেজে কোন শিক্ষালাভ না করেও যে নিজের সাধনায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান লাভ করা যায়, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মাইকেল ফ্যারাডে। ডায়নামোর উদ্ভাবক হিসাবে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম অমর হয়ে আছে। অবশ্য বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। একথা অত্যুক্তি নয় যে, তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলেই মানব-সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্যারাডে তাঁর বন্ধু রিচার্ড ফিলিপ্‌সকে এক চিঠিতে লেখেন—আমি এখন পুনরায় বিদ্যুৎ-চুম্বকত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় রত আছি। আমার মনে হয়, আমি একটি ভাল জিনিষ বের করতে পারবো—তবে সেটা কি, বলতে পারছি না। হয়তো শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, এত পরিশ্রমের পর আমি মাছের বদলে আগাছা তুলেছি।

পরে প্রমাণিত হয়েছিল যে, তিনি মাছই তুলেছিলেন, আগাছা নয়—অর্থাৎ সে সময় পর্যন্ত যে সব যুগান্তকারী আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে ফ্যারাডের আবিষ্কার অতি বিস্ময়কর। ১৮২০ সালে অরস্টেড নামে এক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, কোন তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে তারের চতুর্দিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, ফ্যারাডে অরষ্টেডের এই আবিষ্কার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। তাঁর ধারণা হলো, বিদ্যুৎ-প্রবাহ যদি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারে, তবে চৌম্বক ক্ষেত্রও বিদ্যুৎ-প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারবে। পরীক্ষার ফলে তাঁর ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। এর ফলেই বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র ডায়নামোর উদ্ভাবন সম্ভব হয়। ১৮৩১ সালে তিনি

বিদ্যুৎ-চৌম্বক আবেশ সম্পর্কিত সূত্রটি আবিষ্কার করেন। ফ্যারাডে বৈদ্যুতিক মোটরের মূল সূত্রও আবিষ্কার করেন।

তার এই আবিষ্কারের ফলেই মানুষের বহু প্রয়োজনীয় কাজ অল্প সময়ে দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হচ্ছে। শুধু বৈদ্যুতিক মোটর এবং ডায়নামোই নয়, চুম্বক এবং তড়িতের মধ্যে সম্বন্ধের সূত্রগুলির অধিকাংশই ফ্যারাডের আবিষ্কার। বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের ধারণা তিনিই প্রমাণিত করেন। তড়িৎ বিশ্লেষণের নিয়ম, আলোর সমবর্তন (Polarisation) ও গ্যাসের ব্যাপন (Diffusion) সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্যাস তরলীকরণ এবং নিষ্কলঙ্ক ইস্পাত তৈরির ক্ষেত্রেও ফ্যারাডের অবদান কম নয়। তিনি বেঞ্জিন ও অন্যান্য কার্বন-যৌগ আবিষ্কার করেন।

১৭৯১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের সারে কাউন্টিতে নিউ-ইটন সহরে মাইকেল ফ্যারাডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন একজন কর্মকার, তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই অস্বচ্ছল ছিল—কোন রকমে সংসার চলতো। স্কুলে ফ্যারাডে সামান্যই শিক্ষালাভ করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ফ্যারাডে তাঁর পিতা-মাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন—প্রচণ্ড কর্মশক্তি এবং ধর্মানুরাগ। এঁরা প্রেসবিটেরীয় ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। অর্থ এবং সম্মানের প্রতি এঁদের আকর্ষণ ছিল না। এই জন্যেই মাইকেল ফ্যারাডে পরবর্তী কালে রয়েল সোসাইটির সভাপতির পদ এবং প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন। এই সব সম্মান ও অর্থ গ্রহণ করলে হয়তো তিনি গবেষণা থেকে দূরে সরে যেতেন।

ফ্যারাডে মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে জর্জ রিবোর দপ্তরীখানায় পরিচারকের কাজে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে বই বাঁধাইয়ের কাজ শিক্ষা করেন। দপ্তরীখানায় বই বাঁধাইয়ের অবসরে তিনি মনোমত বইগুলি পড়ে দেখতেন। অনেক বিশিষ্ট লোক বই বাঁধাইয়ের ব্যাপারে সেই দোকানে আসতেন। তাঁরা ফ্যারাডের এই পাঠস্পৃহা লক্ষ্য করে তাঁকে এই বিষয়ে উৎসাহ দিতেন।

বিজ্ঞানের বই পড়বার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। Encyclopaedia Britanica বাঁধতে গিয়ে তিনি তার মধ্যে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পড়েন এবং বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নিজের বেতন থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে সেই অর্থের বিনিময়ে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত সাধারণ পরীক্ষার জন্যে কয়েকটি জিনিষ সংগ্রহ করেন। এই ভাবেই ফ্যারাডে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের প্রতি একান্ত অনুরাগী হয়ে পড়েন। বিজ্ঞানের প্রতি এই সাধারণ বালকের অসাধারণ ঝোঁক লক্ষ্য করে দপ্তরীখানার একজন ক্রেতা তাঁকে রয়েল ইনষ্টিটিউশনে সার হাম্ফ্রি ডেভির ধারাবাহিক বক্তৃতা শোনবার জন্যে টিকেট সংগ্রহ করে দেন। ফ্যারাডে ডেভির বক্তৃতাবলী

সাগ্রহে শোনেন এবং তার সারাংশ টুকে নিয়ে ৩৮৬ পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। তখন বিজ্ঞানীমহলে সার হাম্ফ্রি ডেভির খুব নাম।

মাইকেল ফ্যারাডে পাণ্ডুলিপিটি সার হাম্ফ্রি ডেভির কাছে পাঠান এবং গবেষণাগারের সাহায্যকারী হিসাবে একটি চাকুরী প্রার্থনা করেন। ফ্যারাডের সেই পাণ্ডুলিপি দ্রষ্টব্য বস্তু হিসাবে আজও রয়েল ইনষ্টিটিউশনে রক্ষিত আছে।

সার হাম্ফ্রি ডেভি সযত্নে ফ্যারাডের পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখলেন এবং এই বিষয়ে তাঁর অসাধারণ আগ্রহের বিষয় উপলব্ধি করে তিনি ফ্যারাডেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চিঠি লেখেন। ফ্যারাডের জীবনে সার ডেভির কাছ থেকে তাঁর চিঠির উত্তরপ্রাপ্তি এক স্মরণীয় ঘটনা। এর পর থেকে মাইকেল ফ্যারাডের জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে যায়।

যথাসময়ে ফ্যারাডে ডেভির সঙ্গে দেখা করেন। ডেভি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুবই খুসী হন এবং সপ্তাহে ২৫ শিলিং বেতনে তাঁকে রয়েল ইনষ্টিটিউশনের গবেষণাগারের সাহায্যকারী হিসেবে কাজে নিযুক্ত করেন। এটি হলো ১৮১২ সালের কথা, তখন তাঁর বয়স ২১ বছর মাত্র। এই রয়েল ইনষ্টিটিউশনই প্রায় অর্ধশতাব্দী কালব্যাপী তাঁর কর্মস্থল ছিল। ১৭৯৯ সালে রয়েল ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়। এটি পৃথিবীর অন্যতম বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান।

রয়েল ইনষ্টিটিউশনে যোগদানের প্রথম বছরে মাইকেল ফ্যারাডে সার ও লেডি হাম্ফ্রি ডেভির সঙ্গে ১৮ মাস ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। এই পরিভ্রমণের ফলে ফ্যারাডের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত ফ্যারাডে নিজে কোন মৌলিক গবেষণা সুরু করেন নি। যখন তাঁর বয়স ৩০ বছর, তখনই তাঁর আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক মোটর নির্মাণের সূত্র প্রকাশিত হয়।

বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারের সান্নিধ্যে চুম্বকের কাঁটা যেমন ঘুরে যায়, তেমনি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকলে সেটিও ঘুরে যাবে। এই সূত্রানুযায়ী বৈদ্যুতিক মোটর কার্যকরী হয়। মোটরে শক্তিশালী চুম্বক এবং তারের কুণ্ডলী (আর্মেচার) থাকে। আর্মেচারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকলে এর চতুর্দিকে চৌম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এবং আর্মেচার ঘুরতে থাকে। ফ্যারাডের এই আবিষ্কারের কিছুদিন বাদে কার্যোপযোগী বৈদ্যুতিক মোটর নির্মিত হয়। কোন আবিষ্কারের দ্বারা আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে দেখলেই ফ্যারাডে অন্য দিকে মনোনিবেশ করতেন।

ফ্যারাডের মনে প্রশ্ন জাগে—বৈদ্যুতিক প্রবাহ যদি চৌম্বক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তবে কি চুম্বকত্বও বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করতে সক্ষম?

ফ্যারাডে সাধারণ একটা পরীক্ষা করেন। অপরিবাহী পদার্থে আবৃত তার একটা ফাঁপা কাগজের চোঙের উপর জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত একটা গ্যালভানোমিটারের সঙ্গে যোগ করে দিলেন। তারপর একটা চুম্বককে দ্রুত চোঙের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার বের করে নিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই গ্যালভানোমিটারে বৈদ্যুতিক প্রবাহের অস্তিত্ব দেখা গেল। এথেকেই সিদ্ধান্ত হলো যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন হলে তারের কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হয়। অন্য ভাবে বলা যায়—যে চৌম্বক বলরেখাগুলি তারের কুণ্ডলীকে ছেদ করে—তার কোন পরিবর্তন হলেই তারের কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন হবে। এর উপর ভিত্তি করেই ১৮৩১ সালে ফ্যারাডে ডায়নামো তৈরি করেন। ডায়নামো চালিয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়—আর তা দিয়ে কলকারখানা, আলো, পাখা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি চালু করা যায়।

১৮২৭ সালে সার হাম্ফ্রি ডেভির অবসর গ্রহণের পর ফ্যারাডে রয়েল ইনষ্টিটিউশনের গবেষণাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৬১ সালে তিনি রয়েল ইনষ্টিটিউশন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং হ্যাম্পটন কোর্টের বাড়ীতে বাস করতে থাকেন। ১৮৬৭ সালের ২৫শে অগাষ্ট মাইকেল ফ্যারাডে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শান্তি চক্রবর্তী

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। (ক) মেসার ও লেসারের পার্থক্য কি? উভয়ের সুবিধা ও অসুবিধা কি? ইহাদের প্রয়োজন কি?

(খ) সূর্যের রশ্মিকে কিভাবে বিদ্যুতে পরিণত করা হয়?

শ্রীঅসিতবরণ ঘোষ
জলপাইগুড়ি

২। (ক) শ্যাওলা জন্মায় কিরূপে?

(খ) মাটির রাসায়নিক উপাদান কি কি?

শ্রীসীমা দাস

উঃ ১। (ক) মেসার ও লেসারের কর্মপ্রণালী একই ধরণের। পরমাণু-কেন্দ্রীনের চতুর্দিকে কয়েকটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন ঘুরে বেড়ায়। ইলেকট্রনগুলি আবার নিজ নিজ অক্ষের চতুষ্পার্শ্বেও ঘোরে—ঠিক লাট্টুর মত। একে বলা হয় স্পিন (Spin)।

পরমাণুর মধ্যে কক্ষপথের অবস্থানও স্পিনের মানের উপর নির্ভর করে। ইলেকট্রনের শক্তি বিভিন্ন হয়ে থাকে ও তারা নির্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি শোষণ ও বিকিরণ করতে পারে। সাধারণতঃ ইলেকট্রনগুলি ন্যূনতম শক্তি ধারণ করতে চায়। বাইরে থেকে শক্তি সংযোজন করলে ইলেকট্রনগুলি বেশী শক্তিসম্পন্ন কক্ষপথে উঠে যায় বা তাদের স্পিনের মান পরিবর্তিত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই ইলেকট্রনগুলি শক্তি বিকিরণ করে নিম্নশক্তিতে ফিরে আসে। এই শক্তির বিকিরণ বাইরে থেকে প্রযুক্ত অন্য কোন শক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। একে বলা হয় উদ্দীপিত বিকিরণ (Stimulated emission of radiation)। শক্তির বিকিরণ হয়ে থাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরূপে ও উদ্দীপক শক্তিরও যোগান হয়ে থাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গরূপে। কেবলমাত্র পরমাণুর ক্ষেত্রেই নয়, অণুর ক্ষেত্রেও এই ধরণের বিকিরণ ঘটানো সম্ভব।

লেসার ও মেসার উভয় যন্ত্রই উপরিউক্ত উদ্দীপিত বিকিরণ-প্রক্রিয়ার সাহায্যে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গকে শক্তিশালী করে। মেসার (MASER) শব্দটি ইংরেজী Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation-এর সংক্ষিপ্তকরণ। লেসার (LASER) অর্থে বোঝায় Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। মাইক্রোওয়েভ বলতে ৩০ সেমি. থেকে ১ মিমি. দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বোঝায়। আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিস্তার দূর অবলোহিত (১ মিমি.) থেকে অতিবেগুনী (৫×১০^{-৬} মিমি.)। সাধারণতঃ লেসারে দূর অবলোহিত ও অবলোহিত তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মেসার ও লেসারের পার্থক্য একমাত্র ব্যবহৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ও তার জন্যে যন্ত্রাংশের পার্থক্য থাকে।

লেসার ও মেসারের আবিষ্কার ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিস্তার বৃদ্ধির সুবিধার জন্যে। এদের সবচেয়ে বড় সুবিধা, তাপীয় কোলাহলের (Thermal Noise) প্রায় অনুপস্থিতি। এতে সংবাদ-কোলাহলের অনুপাত ((Signal to noise ratio) বেশী থাকে ও সংবাদ-তরঙ্গের বিস্তারকে বহুল পরিমাণে বর্ধিত করা যায়। প্রধান অসুবিধা হলো, যন্ত্রগুলি একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কাজ করে—একই যন্ত্র বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে কাজ করতে পারে না।

মেসার ও লেসার উভয়েই সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহু দূর থেকে আসা স্বল্প শক্তির সংবাদ-তরঙ্গকে বর্ধিত করবার কাজে এদের ব্যবহার করা হয়। লেসারের সাহায্যে অবলোহিত রশ্মিকে খুব উচ্চ শক্তিসম্পন্ন করে তার সাহায্যে উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট ধাতু গলানো বা গর্ত করা প্রভৃতি কাজ করা হয়।

১। (খ) সূর্যরশ্মি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনের আধুনিক পদ্ধতি হলো সৌর ব্যাটারীর (Solar Battery বা Solar cell) ব্যবহার। সৌর ব্যাটারীতে থাকে একটি সিলিকনের কেলাস। এই সিলিকন কেলাসে মিশানো থাকে কিছু পরিমাণে আর্সেনিক (প্রায় প্রতি ১০ লক্ষ সিলিকন পরমাণুতে এক পরমাণু আর্সেনিক)। সিলিকনের

. যোজ্যতা চার ও আর্সেনিকের যোজ্যতা পাঁচ হওয়ায় আর্সেনিক মিশ্রিত সিলিকন কেলাসে ইলেকট্রন-সংখ্যা সিলিকন কেলাসের চেয়ে বেশী হয়। এই ধরণের সিলিকনকে বলা হয় n-type। এই n-type সিলিকন কেলাসের একটি পাতলা চাক্তির এক পিঠে বোরনের আস্তরণ দেওয়া হয়। বোরনের যোজ্যতা তিন হবার জন্যে এই পিঠে সিলিকন কেলাসে ইলেকট্রন-সংখ্যা কম থাকে এবং ইলেকট্রন কমে যাবার দরুণ কিছু ফাঁকা জায়গার উদ্ভব হয়—একে বলা হয় hole ও বোরন মিশ্রিত সিলিকনকে বলা হয় p-type। n-type সিলিকন চাক্তির এক পিঠ p-type করবার জন্যে একটি p-n জংশনের (p-n junction) উৎপত্তি হয়। এই জংশনের n-অঞ্চলের দিকে থাকে ইলেকট্রনের আধিক্য ও p-অঞ্চলের দিকে থাকে হোলের আধিক্য অর্থাৎ ইলেকট্রন অনুপস্থিতির আধিক্য। হোলের চালচলন ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট, ইলেকট্রনের মতই হয়। সূর্যরশ্মি পাতলা বোরন স্তর (২-৩ পরমাণুর স্তর) ভেদ করে p-n জংশনে পড়লে আলোর তরঙ্গ এই অঞ্চলে ইলেকট্রন ও হোলের জোড়া তৈরি করে। স্বভাবতঃই হোল চায় ইলেকট্রনের সঙ্গে যুক্ত হতে ও ইলেকট্রন ছুটে যেতে চায় হোলের দিকে। তাই p-n জংশন থেকে হোলগুলি যায় n-অঞ্চলের দিকে ও ইলেকট্রনগুলি যায় p-অঞ্চলের দিকে। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ও হোল ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হওয়ায় p-অঞ্চল ধনাত্মক বিভববিশিষ্ট ও n-অঞ্চল ঋণাত্মক বিভববিশিষ্ট হয় ও ওই দুই অঞ্চলে তার জুড়ে এই বিদ্যুৎ-শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। এই ভাবে তৈরি হয় সৌর ব্যাটারী।

যতগুলি চাক্তি বা যত বড় চাক্তি আমরা ব্যবহার করবো, তত বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তি আমরা পেতে পারি। সৌর ব্যাটারী বর্তমানে কোথাও কোথাও দূরপাল্লার টেলিফোন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়। সৌর ব্যাটারীর সর্বাধিক ব্যবহার হয় কৃত্রিম উপগ্রহে ও মহাকাশযানে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্যে।

সৌর ব্যাটারী ছাড়াও থার্মোইলেকট্রিক প্রক্রিয়ার সাহায্যেও সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়। আর এক পদ্ধতি হচ্ছে—সূর্যালোকের সাহায্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

২। (ক) শ্যাওলার জন্ম হয় শ্যাওলা থেকেই, তবে প্রক্রিয়াটি দু-রকমের হতে পারে —অযৌন ও যৌন। অযৌন প্রজননে মূলতঃ এর অঙ্গ খণ্ডিত হয়ে যায় অথবা প্রজননের জন্যে বিশেষ ধরণের কোষ তৈরি হয়, যাকে বলা হয় বীজগুটি (Zoospores)। এই বীজগুটি যাতে জলে বা ঐ জাতীয় মাধ্যমের মধ্যে চলাচল করতে পারে, সেজন্যে এদের ফ্ল্যাজেলা (Flagella) নামক উপাঙ্গ থাকে। বীজগুটির দ্বারাই প্রধানতঃ শ্যাওলা একস্থান থেকে আর একস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যৌন প্রজননে পুরুষ ও স্ত্রী জনন-কোষের (Male and female gametes) সংযোগ সাধন ঘটে থাকে এবং নতুন শ্যাওলা জন্ম নেয়।

২। (খ) মাটির রাসায়নিক উপাদান অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরণের হয়। দুই ভাগে আমরা মাটির রাসায়নিক উপাদানকে ভাগ করতে পারি—অজৈব ও জৈব। অজৈব উপাদানে সাধারণতঃ নানান ধাতুর সিলিকেট থাকে—প্রধানতঃ থাকে অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট ও তা বাদে লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্নেসিয়াম ইত্যাদি। সিলিকা অর্থাৎ সিলিকনের অক্সাইড (যা বালির প্রধান উপাদান) অঞ্চল বিশেষের মাটিতে কম-বেশী থাকে। অন্যান্য ধাতুর অক্সাইডও মাটিতে পাওয়া যায়। লোহার নানান যৌগ মাটিকে নানা রং দেয়। ফস্‌ফরাসেরও নানা যৌগ মাটিতে আছে। মাটির জৈব উপাদান আসে উদ্ভিদের পচনের ফলে—যা মূলতঃ কালো চট্‌চটে আঠালো পদার্থ। এই জৈব উপাদানকে বলা হয় হিউমাস (Humus)।

শুভেন্দুকুমার দত্ত

বিবিধ

ছায়া-রহস্য

নয়াদিল্লী থেকে পি. টি. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা আকাশে তথাকথিত 'দেবদূতের ছায়ার' রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন বলে সোভিয়েট সংবাদ সংস্থা এ. পি-এন. ঘোষণা করেছেন।

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে কোথাও কিছু নেই, কিন্তু রেডার তাক করলেই ভুতুড়ে ছায়া দেখা যায়। দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে বলে এসেছেন, ওটা 'দেবদূতের ছায়া'। আবার পাশ্চাত্য জগতের কেউ কেউ বলে এসেছেন, বায়ুমণ্ডলে কি যেন একটি পদার্থ ঘোরাফেরা করছে, যা আমরা ধরতে পারছি না। উড়ন্ত পীরিচ বলে যে পদার্থটি মাঝে মাঝেই আকাশে এসে হাজির হচ্ছে, বোধ হয় সেটাই হবে—রেডার প্লেটের উপর ছায়া ফেলে পরমুহূর্তেই উধাও হয়ে যাচ্ছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রধান ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান মানমন্দিরের গবেষক বায়েবলত প্রমাণ পেয়েছেন যে, বায়ুস্রোতের টানে পৃথিবীর মশামাছি, প্রজাপতি এবং হরেক রকমের কীট-পতঙ্গ ঊর্ধ্বের আকাশে উঠে যাচ্ছে এবং তাদের ছায়া পড়ছে রেডার যন্ত্রে। তথাকথিত 'দেবদূত' এরাই।

বৃহস্পতি গ্রহে জীবন-সৃষ্টির সূচনা?

ওয়াশিংটন থেকে ইউ. পি. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—দীর্ঘকাল যাবৎ বিজ্ঞানীরা যাকে জীবন-সম্ভাবনাহীন বন্ধ্যা বলে জেনে এসেছেন, সেই বৃহস্পতি গ্রহ এখন জীবন-সৃষ্টির আদি-পরমাণু গড়ে তোলবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে।

আমেরিকান বিজ্ঞানী গ্রীন স্পান ও ক্রিয়াগো বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল বিশ্লেষণ করে উপরউক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। অতিবেগুনী ও ক্ষীণ-লোহিত আলোক-ধারায় তাঁরা বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করেছেন।

সাময়িক পত্র সায়েন্স-এ তাঁদের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁরা বলেছেন, বৃহস্পতি সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি, তারই আলোকে একদিন পৃথিবীর জীবন উৎসও আমরা খুঁজে পাব।

ভূমিকম্পের ফসল

কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোডা থেকে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ—সেখানে সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূকম্পে চিকাকের পাহাড়ের গায়ে একটি ফাটল দেখা দেয়। আর তা থেকে উঁকিঝুঁকি মারে মূল্যবান এক ধাতু—পান্না। স্থানটি উত্তর কলম্বিয়ায়—রাজধানী থেকে ১৫ মাইল উত্তরে। এখানকার চাষীরা এখন পান্নার কারবারী।

তিন লক্ষ বছরের কাহিনী

প্রাগ থেকে রয়টার কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ—চেকোশ্লোভাক সংবাদ প্রতিষ্ঠান চেইকা জানাচ্ছেন, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মোরাভিয়ার ব্রনো নামক স্থানের নিকটে একটি গুহায় প্রায় তিন লক্ষ বছরের পুরনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্ত্রাদি আবিষ্কার করেছেন—সম্ভবতঃ ইউরোপে এত প্রাচীন যুগের কোন কিছু ইতিপূর্বে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

সারভেয়ার-৪ ও ম্যারিনার-৪

পাসাডেনা (ক্যালিফোর্ণিয়া) রয়টার থেকে কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—মহাকাশে ধাবমান অবস্থায় চন্দ্রের নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থলের দিকে সারভেয়ার-৪-এর মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে—পৃথিবী থেকে পাঠানো একটি নির্দেশ মেনে সারভেয়ার-৪ ১১ই জুলাই চন্দ্রের ঠিক মাঝামাঝি জায়গাটিতে অবতরণ করে।

আমেরিকার মহাকাশযান ম্যারিনার-৪ তিন বছর আগে পৃথিবী থেকে যাত্রা করেছিল, কিন্তু আজও তার পরিক্রমা শেষ হয় নি। দু-বছর আগে সে মঙ্গলগ্রহের পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। এপর্যন্ত সে ভ্রমণ করেছে ১৩০ কোটি মাইল।

সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হলো, ওর প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি আজও সক্রিয় রয়েছে, পাসাডেনার বিজ্ঞানীরা অতটা আশা করেন নি।

মঙ্গলগ্রহের ছয় হাজার মাইলের ভিতর দিয়ে যাবার কালে সে ২২ খানা ছবি পাঠিয়েছে। সে সব ছবি থেকে পৃথিবীর মানুষ প্রথম জানতে পারলো মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অনেক বেশী হাল্কা।

কিন্তু ম্যারিনার-৪-এর কাজ এখনও শেষ হয় নি, বেতার-তরঙ্গের উপর সৌর-বলয়ের প্রভাব সম্পর্কে অনেক কিছু খোঁজ-খবর সে নিচ্ছে এবং যথারীতি পৃথিবীকে তা জানিয়ে দিচ্ছে।

সূর্যের দিকে চোখ রেখে সে আজও মহাকাশে ছুটে চলেছে। আরও কয়েক মাস সে এভাবেই ছুটে চলবে। তারপর স্বভাবতঃই তার যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যাবে। সেদিন তার যান্ত্রিক চোখ কিছুই ধরতে পারবে না, যান্ত্রিক বক্ষস্পন্দনও স্তব্ধ হয়ে যাবে।

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। শ্রীজিতেন্দ্রকুমার গুহ
৪৪।৫৫, বি. টি. রোড
কলিকাতা-৫০

২। রমেন দেবনাথ
(প্রাণী-বিদ্যা বিভাগ)
রাণীগঞ্জ কলেজ
রাণীগঞ্জ, বর্ধমান

৩। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর
২, মান্নাপাড়া রোড
কলিকাতা-৫০

৪। শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস
"সাধনালয়"
পুরুলিয়া রোড, রাঁচী

৫। সতী চক্রবর্তী
২৪।বি, মনসাতলা লেন
খিদিরপুর, কলিকাতা-২৩

৬। শ্রীবসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়
৩৯।৬ ব্রড স্ট্রীট
কলিকাতা-১৯

৭। শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
৭৭।১, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড
ফ্ল্যাট নং-২
কলিকাতা-৩৭

৮। শ্রীশান্তি চক্রবর্তী
২৪৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

৯। শুভেন্দুকুমার দত্ত
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৬৭ দশম-একাদশ সংখ্যা

নিবেদন

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গত শারদীয় সংখ্যাটি বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে বলে এবারও আমরা শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের ব্যবস্থা করেছি। বিশেষতঃ এবার নভেম্বর মাসে বিশ্ববিশ্রুত মহিলা বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরীর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে এই মহিয়সী মহিলার অবিস্মরণীয় স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদনও অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্যান্য পত্র-পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাগুলিতে যেমন গল্প-উপন্যাস-কবিতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' সে ধরণের পত্রিকা নয়—এতে কেবল বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন লেখা প্রকাশিত হয় না। এই কারণেই পত্রিকাটির গ্রাহক ও পাঠক-সংখ্যা সীমিত। কাজেই নিয়মিত সংখ্যাগুলির মধ্যে এরূপ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে যেরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রয়োজন, জনসাধারণ এবং সরকারের সাহায্য ও সহানুভূতি ছাড়া তার ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য। কাজেই গত বারের ন্যায় এবারও আমরা তাঁদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের আশা পোষণ করে অক্টোবর ও নভেম্বর সংখ্যা দুটিকে একত্রে শারদীয় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

এই সংখ্যাটিতে মাদাম কুরীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, অধ্যাপক রমেশ দাশ প্রমুখ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ। ছোটদের জন্যেও বিশেষ বিশেষ প্রবন্ধাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই সংখ্যাটি বিজ্ঞানানুরাগী জনসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

শতবর্ষ পরে—মাদাম কুরীর স্মরণে

সত্যেন বোস

১৮৬৭ সালের ৭ই নভেম্বর। ওয়ার-শ (Warsaw) সহরে এক দরিদ্র বিজ্ঞান শিক্ষকের ঘরে জন্মেছিলেন মারী স্কলোদাস্কা। ইনিই পরে মাদাম কুরী বলে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। পোলাণ্ডে জন্ম, তখন সে দেশের গৌরবরবি অস্তমিত। পোলেরা স্বাধীনতা হারিয়েছে, তাদের দেশ ভাগ করে নিয়েছে শত্রুরা। রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়েছে ওয়ার-শ। সেখানে চলেছে নির্মম শাসন। পোল জাতির ভাষা প্রচারও লোপ পেতে বসেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও রুশ ভাষায় শিক্ষা দেবার সর্বত্র ব্যবস্থা।

মারীর শৈশব এই অপ্রীতিকর পরিবেশের মধ্যে কেটেছিল। মা অল্প বয়সেই মারা গেছেন। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে পিতা বিব্রত হয়ে পড়লেন। শেষ বয়সে চাকুরী থেকে অবসরও নিতে হলো। পারিবারিক আয় অনেক কমে গেল—ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় না। এই অপ্রতুল সংসারে বড় মেয়েরা এগিয়ে এলো পিতার ভার লাঘব করতে। বড় দুই বোন রোজগার সুরু করলে। তবু মেয়েদের নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতায় বিশ্বাস অটুট—উচ্চ শিক্ষার প্রতি অদম্য আকর্ষণ। ওই পথেই স্বাবলম্বী হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে তারা, তবে রাশিয়া কি জার্মেনী ছেড়ে যেতে হবে। সেখানে প্রতিমুহূর্তে পরাধীনতার গ্লানি মনকে বিষাক্ত করে দেয়, ব্যক্তিত্বের অবাধ স্ফুরণ ও প্রসারের এত কঠোর অন্তরায়।

তাই বহু দূরে পারী সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করবার সিদ্ধান্ত করলেন দুই বোন। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার দেশ—পরদেশী নির্যাতিতদের সে সাদর অভ্যর্থনা করেছে সব সময়। স্বাধীনতাকামী কত পোলও সেই দেশে আশ্রয় নিয়েছে। আর পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তো জগৎ-জোড়া সুনাম।

পিতা মেয়েদের এই উচ্চাভিলাষে সায় দিলেন। তবে এক সঙ্গে দুই বোনেরই বিদেশে শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলান অসম্ভব। তাই প্রথম কন্যা গেলেন পারী সহরে। আর মাত্র ১৭ বছরের কুমারী মারী চললেন দেশের মধ্যেই এক ধনী পরিবারের গৃহ-শিক্ষকতা করতে। এইভাবে দরিদ্র তহবিল স্বচ্ছল হলো। বড় মেয়েকে বাপের অর্থসাহায্য করাও সম্ভব হলো।

(২)

মারীর সুযোগ এলো ৭ বছর পরে। দিদি ব্রনিয়ার পড়া শেষ হয়েছে, বিবাহ হয়েছে স্বদেশী ভদ্র পরিবারে। স্বামী ডাক্তার, পারীতেই প্র্যাকটিস সুরু করেছেন। এত বছরের কৃচ্ছ সাধনায় মারীর কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়েছে। রেলের নিম্নতম শ্রেণীতে ওয়ার-শ থেকে পারীর রাহা-খরচ, তাছাড়া বিদেশে যাবার আনুষঙ্গিক পোষাকাদির ব্যয়ও কুলিয়ে গেল। পিতা নানাভাবে ব্যয় সংক্ষেপ করে প্রতি মাসে খরচ হিসেবে দেবেন ৪০ রুবল। পারীতে দাঁড়াবে ১০০ ফ্রাঁ (তখনকার ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র ৫০ টাকা)। তাই নিয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরু হলো পড়াশুনা। বড় বোন ও ভগ্নীপতি চেয়েছিলেন মারী তাঁদের বাড়ীতে থেকে পড়াশুনা করে। তবে তাতে নানা অসুবিধা দেখা গেল,

মাদাম কুরী

জন্ম—৭ই নভেম্বর, ১৮৬৭ | মৃত্যু—৪ঠা জুলাই, ১৯৩৪

পারীতে কুরীদম্পতীর বাড়ীর বাগানে ১৯০৪ সালে এই ছবি তোলা হয়। মাদাম কুরীর কোলে তাঁর মেয়ে ইরেনকে দেখা যাচ্ছে।

সে বাসাও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক দূরে। তাই মারী চলে এলেন ল্যাটিন পাড়ায়। ওখানেই দরিদ্র ছাত্রেরা কষ্ট করে থাকে। ক্লাশ, লাইব্রেরী, লেবরেটরী সবই কাছে। তবে মারীর বাসস্থান জুটলো ৭ তলায় একটি ছোট কামরা—আসবাব-পত্র সবই কিনতে হলো। সস্তা কাঠের টেবিল, চেয়ার, লোহার খাট, কাঠ-কয়লা জ্বালাতে আঙ্গারিকা। রাঁধতে স্পিরিট-ষ্টোভ, দুখানা প্লেট, কাঁটা, ছুরি, চামচ, কেট্‌লী ও তিনটি গ্লাস। এসব জোগাড় হলো। বিছানা এসেছে সঙ্গে ওয়ার-শ থেকে। যে বাক্সে পোষাক, আসবাব এসেছিল, তাই পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো আলমারী। সব কাজ নিজে করতে হয়, অন্যের সাহায্য নিলে খরচ বাড়বে। সোরবনে (Sorbonne) পড়তে প্রত্যহ হেঁটে যেতে হচ্ছে। শীত পড়লে নিজেকেই টেনে তুলতে হচ্ছে ২।৩ বস্তা কয়লা অল্পে-অল্পে ৭ তলায়, শুধু মাঝে মাঝে দম ফেলতে জিরিয়ে নিতে হয়। রাত দশটা পর্যন্ত পাড়ার লাইব্রেরীতে আরামে গরমে পড়া যায়। তেলের খরচ বাঁচে। পরে নিশীথে ঘরে পড়া চলে রাত ২।৩টা পর্যন্ত, তারপর ঘুম। দিনের পর দিন কঠোর সাধনা, তবে এতেই সিদ্ধিলাভ হলো। মারী সম্মানের সঙ্গে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৯৩ সালে পদার্থবিদ্যায় হলেন প্রথম। পরের বছর গণিতে অধিকার করলেন দ্বিতীয় স্থান। তবে প্রত্যেক বছর শরতের ছুটিতে দেশে ফেরা চাই। সেই দূরের যাওয়া-আসা, তার ভাড়া যোগাড় করা এক সমস্যা। খরচের গুরুভার বৃদ্ধ বাপের কাঁধে কত আর চাপানো যাবে! হঠাৎ স্বদেশী সহৃদয়া এক বন্ধু চেষ্টা করে দরিদ্র ছাত্র সাহায্য-ভাণ্ডার থেকে সাময়িক সাহায্য জুটিয়ে দিলেন ৬০ রুবল। এতে পনেরো মাস থাকা চলবে প্যারী সহরে। অপ্রত্যাশিত এই দয়ায় অভিভূত হয়ে পড়েন মারী। তবে দেশের গরীব ছাত্রদের কথা সব সময়ই মনে রয়েছে। যখন উপার্জন করতে পারলেন, কয়েক বছর কষ্ট করে সব টাকাই সংগ্রহ করে ফেরৎ দিলেন। সদাব্রতী সভ্যদের আশ্চর্য করে দিলেন। মারী চাইলেন যে, ওই টাকা আবার অন্য গরীব ছাত্রের কাজে লেগে যাক। (এই ধরণে বিদেশে শিক্ষালাভের জন্যে ছাত্রকে সাময়িক অর্থ-সাহায্য দেবার রীতি আছে সব দেশেই, তবে উপার্জনক্ষম হয়ে কজনই বা সে টাকা ফেরৎ দেন! কলকাতা সেনেটের বিবরণীতে পড়েছিলাম সেদিন পালিত-স্কলাররা কত টাকা ফেলে রেখেছেন!)। জীবনের সায়াহ্নে এই সব গল্প করতেন মারী ছোট মেয়ে ঈভার কাছে, তখন রেডিয়াম আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের দরবারে মাদাম কুরী সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ২ বার, যা আজ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানীর ভাগ্যেই জোটে নি। তবু সম্পদের মধ্যে জীবনের সায়াহ্নে গল্প করতেন যৌবনের সেই সব দুঃখ-কষ্টের। তাঁর ভাগ্যে সুখ-দুঃখ অনেক জুটেছে, তবু মায়ের গল্প শুনে মেয়ের মনে হতো, সেই সব পুরনো দিনের স্মৃতি মায়ের মনে সবচেয়ে বেশী রমণীয় হয়ে রয়েছে। গল্প করতেন অভাবের কথা—প্রত্যেক দিন তো আনন্দে কাটতো না! তবে কখনও বা এমন দুর্ঘটনা ঘটতো, যার তাল সামলে নেওয়া কঠিন। হয়তো একমাত্র জুতাজোড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে অচল। নতুন এক জোড়া কিনতেই হয়, তবে এত দাম যে, সে খরচ কুলাতে খাবার ও আলোর খরচে টান পড়ে। আবার কখনও শীতের দিন আর কাটে না। ৭ তলার ছোট কুঠরী বরফের মত ঠাণ্ডা। ঘুম হচ্ছে না, এদিকে কাঠ-কয়লা ফুরিয়ে গেছে, আঙ্গারিকায় আগুন জ্বালা যাবে না। তবে ওয়ার-শ'র মেয়ে কি প্যারীর হিমের কাছে হার মানবে? মারী বাক্স খুলে যে ক'প্রস্থ পোষাক এক সঙ্গে অঙ্গে চাপানো যায়—সব পরেছে, বাকী বাক্স উজাড় করে বিছানার লেপের উপর ঢাললো।

তবু শীত ভাঙে না—মারী বিছানার তলা থেকে হাত বের করে চেয়ারখানা লেপের উপর—পোষাকের উপর চাপাচ্ছে। হয়তো এই ভাবে চাপায় পড়ে মনে হবে শরীর গরম হলো। আর তো কিছু নেই—তবু কাঁপুনী যায় না, বেশ কিছুক্ষণ বিছানার মধ্যে—পরে শরীরের উত্তাপে বিছানা গরম হয়ে উঠেছে—পরে ঘুম এলো। অবশ্য পরে এলো সুখের দিন, পিয়ের কুরী এলেন জীবনে—প্রথম পরিচয় হলো '৯৪ সালের প্রথম দিকে—তখনও সব পরীক্ষা শেষ হয় নি মারীর।

(৩)

পিয়ের কুরী জন্মেছিলেন ১৫ই মে, ১৮৫৯ সালে, আলসাস প্রদেশের বাসিন্দা ফরাসী পরিবারে। তিন পুরুষ ধরে বিজ্ঞান-চর্চা চলছে। পিতা-পিতামহ সুচিকিৎসক। বাপ ইউজেন নিজে মিউজিয়ামের লেবরেটরীতে গবেষণায় শিক্ষানবিশী করেছেন, যক্ষারোগের প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কারের জন্যে পরিশ্রমও করেছেন। দুই ভাই জ্যাক ও পিয়ের, দুজনেই বিজ্ঞানী বলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন অল্প বয়সে। কেলাস-কঠিন

পিয়ের কুরী

নানা বস্তুর পরীক্ষা নিয়ে মেতেছিলেন। চাপ দিয়ে বৈদ্যুতিক সাম্য অবস্থার রূপান্তরের সঙ্গে পরিবর্তিত হলো। বিদ্যুতের বহিঃপ্রকাশ এই ভাবে তাঁরাই দেখেছিলেন প্রথমে। এই পিজো-ইলেকট্রিসিটির (Piezo-Electricity) আবির্ভাব হলো। সূক্ষ্মভাবে বিদ্যুৎ-পরিমাণের যন্ত্র তৈরি হচ্ছে এইভাবে। তাছাড়া চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি-পরিমাপের তৌল-যন্ত্রেরও আবিষ্কার হলো। এই নিয়ে তাপের পরিবর্তনে কেলাসে চৌম্বক ক্ষেত্রের রূপান্তরের বিষয়ে মৌলিক সূত্র আবিষ্কার করেছেন পিয়ের—এটি বিজ্ঞানে কুরী নিয়ম বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

পিয়ের ও মারীর প্রথম পরিচয় হলো এক নব-পরিণীত বন্ধু পোল দম্পতির নিমন্ত্রণে—চায়ের টেবিলে। পিয়ের তখনই অধ্যাপনা করছেন—মিউনিসিপাল বিজ্ঞান স্কুলে (১৮৯৪)। মারীর গণিতের পরীক্ষা পাশ করতে কয়েক মাস দেরী। এদিকে পিয়ের অধ্যাপক, ১৫ বছরে—মাইনে মাত্র ৩০০ ফ্রাঁ। মারী কাজ করেন প্রোফে. লিপ্‌-ম্যানের লেবরেটরীতে। এই প্রথম পরিচয় শীঘ্রই গভীর বন্ধুত্বে দাঁড়ালো—তেজস্বিনী, বুদ্ধিমতী বিদেশিনীর আকর্ষণে পিয়ের ধরা পড়ে গেলেন। সব বিষয়ে বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ হচ্ছে। বান্ধবীর উৎসাহে ১৫ বছরের ছড়ানো মৌলিক কার্যের বিবরণী একত্রিত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান ডক্টরেটের প্রার্থী হয়ে থিসিস পেশ করলেন। পরীক্ষকেরা ভূয়সী প্রশংসার সঙ্গে ডক্টর উপাধিতে সম্মানিত করলেন সেই বছর। আসবাবহীন দরিদ্রের রিক্ত ঘরে মারীর চায়ের নিমন্ত্রণে আসছেন পিয়ের। দুজনে একত্রে কাছে, দূরে—সহরতলীতে, জঙ্গলে, উপবনে বেড়াতে যাচ্ছেন—তুলে আনছেন নানা বনফুল। মারীর পরীক্ষা শেষ হলো। ওয়ার-শ যাবার দিন এগিয়ে আসছে। সে দেশ থেকে বিদেশিনী আবার ফিরবেন তো? পিয়ের উৎকণ্ঠা কোনমতে চেপে বলছেন—"মারী তোমার বিজ্ঞান-চর্চা বন্ধ করবার কোন মানে হয় না। আবার প্যারীতে ফিরে এসো।" বহুক্ষণ দুজনে নীরব, শেষে মারী বলছেন—

"তোমার কথাই ঠিক। ফিরে আসতে আমার খুবই ইচ্ছা।" শেষ অবধি বাড়ী থেকে আবার ফিরলেন মারী। অক্টোবর মাসে লিপ্‌মানের লেবরেটরীতে কাজ জুটলো। ব্রনিয়ার কাছে উঠেছেন এবার, মারীর ল্যাটিন পাড়ায় কষ্ট করে থাকা শেষ হয়েছে। পিয়েরও খুসী। সোরবনের বক্তৃতা-কক্ষেই দেখা হচ্ছে দুজনায়। আরও দশ মাস নানা কথাবার্তা। মারী ভাবছেন ফ্রান্স ছেড়ে শিক্ষাব্রতী হয়ে দেশে ফিরবেন—এই ভাবে দেশসেবায় উৎসর্গ করবেন জীবন। পিয়েরও নাছোড়বান্দা। শেষ অবধি ২৬শে জুলাই, ১৮৯৫, মারী ও পিয়েরের বিবাহ হলো। সমারোহ কিছু নেই। বাজে অর্থব্যয় নেই। এমন কি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও বাহুল্য নেই। মেয়রের রেজেষ্টারীতে সই করলেন দু-জনে, সাক্ষী ব্রনিয়া-কাশিমির। বাপ স্কলো-দায়স্কি এসেছেন ওয়ার-শ থেকে। অনাড়ম্বর হৃদ্যতার মধ্যে দুই বিদেশী পরিবারের মধ্যে প্রীতির নিবিড় বন্ধন বাঁধা হলো।

(৪)

স্বাধীনভাবে গৃহস্থালী সুরু হলো। পিয়েরের আয় মাত্র ৫০০ ফ্রাঁ। মারীকেও রোজগার করতে হবে, তাছাড়া সংসারের সব কাজ। সারা জীবন দুজনে বিজ্ঞান-চর্চায় কাটাবেন। শিক্ষাব্রতী হতে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি হলেই চলে না, ফ্রান্সে আরও এক পরীক্ষা। এ্যাগ্রেজে হলে তবে···। তাই মারীকে আরও পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এদিকে সংসারে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেন—কন্যা ইরেন, পরে ইনিও নোবেল বিজয়িনী হবেন। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কত কাজ—স্বামী, কন্যা, তাদের পরিচর্যা। লিপ্‌মানের লেবরেটরীতেও বিশেষ এক কাজের দায়িত্ব। নানা ধরণের ইস্পাতে চৌম্বক ধর্মের তারতম্য—এসব পরীক্ষার ফলও নিবন্ধ হয়ে বুলেটিনে প্রকাশ হলো, কন্যা প্রসবের মাস-তিনেক পরেই। অটুট স্বাস্থ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে মারীর। সুকুমার সৌন্দর্য অন্তর্হিত হলো। ডাক্তারেরা ভয় পেয়েছেন। কিছুদিন স্বাস্থ্যাবাসে অবসর ও বিশ্রামের কথা তোলেন। কিন্তু মারীর সে সব ভাববার সময় নেই। ১৮৯১ সালে পারীতে প্রথম পদক্ষেপের পর পাঁচ বছর প্রতি-

ইরেন কুরী

কূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম চলেছে। অবশ্য শেষ অবধি জয়····· সব পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হলেন। শিক্ষকতার অনুমতিও মিললো। এবার কিছুদিন অবসর—তাও মাত্র এক বছর।

(৫)

'৯৭ সালে মারী ভাবছেন, এইবার উপযুক্ত বিষয় বেছে গবেষণায় মন দিতে হবে। পিয়েরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। অনুসন্ধানী পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছেন—এবার ভবিতব্য তাঁর জীবনের প্রধান অবদানের দিকে তাঁকে অলক্ষ্যে নিয়ে গেল। '৯৫ সালে জার্মেনীতে প্রোফেঃ রঞ্জেন আবিষ্কার করলেন X-রশ্মি। বায়ুশূন্য কাচের

গোলকে প্রোথিত ২টি ধাতুদণ্ডের মাঝে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠাবার চেষ্টা করেছেন বিজ্ঞানী, প্রচুর শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে। গোলকের কাচ ঈষৎ পীতাভ আভায় স্ফুরিত হলো। এক অদৃশ্য কিরণ ছড়াচ্ছে চারদিকে। কাঠ আড়াল-করা কালো কাগজে মোড়া চিত্র-ফলকেও এই কিরণের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। সাধারণ আলো অবশ্য কাঠ, কাগজ ভেদ করতে পারে না,

ফ্রেডারিক জোলিও

তবে ধাতুর ফলকের বাধায় আট্‌কা পড়ে দুজনেরই প্রভাব—আলোর বা X-রশ্মির। আরও সব নতুন গুণ প্রকাশ পেল। বায়ুর মধ্য দিয়ে নতুন রশ্মি প্রবাহিত হলে বিদ্যুৎ-সংরোধক গুণ লোপ পেতে বসে বাতাসের। আধারে রক্ষিত বিদ্যুৎ-ইলেক্‌ট্রোস্কোপে যুক্ত করা সোনার-পাতের বিস্তার জ্ঞাপন করছে বিদ্যুৎ-আধান। X-রশ্মি ছুটলো বাতাসের মধ্য দিয়ে, ধাতব পাত দুটি বুজে এলো, শেষে একেবারে মিশে গেল। বায়ুর মধ্যে আয়নের সৃষ্টি হয়েছে—তাই বিদ্যুতের অবক্ষয় ঘটছে—ইত্যাদি।

ফরাসী বিজ্ঞানী হাঁরী বেকরেল (Henri Becquerel) ভাবছেন, অদৃশ্য X-রশ্মির সঙ্গে কাচের আবরণের পীতাভ স্ফুরণের কোন সম্পর্ক আছে কি? নানা ধাতুভস্ম মিশিয়ে নানা রঙের কাচ—বাজারে। ইউরেনিয়াম ধাতুঘটিত কাচ থেকে সূর্যের আলো পড়লে এইরূপ ঈষৎ পীতাভ স্ফুরণ দেখা যায়। বেকরেল ইউরেনিয়ামের নানা যৌগিক নিয়ে পরীক্ষা করলেন—দেখলেন অন্ধকারে এই সব দ্রব্য থেকেও অনুরূপ এক অদৃশ্য বিকিরণ হয়। কাগজ-ঢাকা চিত্রফলকে দাগ পড়ে, কাছে থাকলে এসব যৌগিক রক্ষিত আধার থেকে বিদ্যুতের অবক্ষয় ঘটতে থাকে। বাতাসে বিদ্যুৎ-ভরা আয়নের সৃষ্টি হয়। সব ঠিক রন্‌গেনের X-রশ্মির মত। বেকরেল এই সব পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছিলেন '৯৬ সালে। নতুন ক্ষেত্র নির্দেশিত হচ্ছে। খুব নতুন ব্যাপার, ইউরোপে অন্য স্থানে তখনও ইউরেনিয়াম রশ্মির দিকে নজর যায় নি। এই সম্পূর্ণ অজানা পথে নব-আবিষ্কারের অ্যাডভেঞ্চার মারীকে হাতছানি দিয়ে ডাকলে।

রীতিমত অনুসন্ধান চালাতে মারীর উপযুক্ত স্বতন্ত্র স্থানের দরকার—যেখানে নিজের খুসীমত পরীক্ষা করা চলে। তাঁর স্কুলের অধ্যক্ষের কাছ থেকে চেয়ে পিয়ের নীচের তলায় রাস্তার ধারে পরিত্যক্ত মেসিন ঘরে কাজ করবার অনুমতি পেলেন। বিশেষ কিছু নেই সেখানে—কি আসবাব—কি যন্ত্র। আরামের স্থানও নয়—এতে নব-বিজ্ঞানী দমলেন না। সবকিছু নিজের খরচে গুছিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। ঘর স্যাঁতসেতে, Electrometer বা Electroscope-এ কাজ করা দুঃসাধ্য—তাছাড়া খুব স্বাস্থ্যকর পরিবেশও নয়। তবু তাড়াতাড়ি কাজ এগিয়ে চললো। ইউরেনিয়ামের সব যৌগিক থেকেই রশ্মি নির্গমনের প্রমাণ মিললো। যেভাবে বায়ুকে পরিবাহক করতে

পারে নিপুণ যত্নে মেপে দেখা গেল, বায়ুকে আয়নিত করবার ক্ষমতা সরাসরি উপস্থিত ইউরেনিয়াম ধাতুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এখন ভাবতে হয় অন্যান্য আদি বস্তু থেকেও এই ধরণের অদৃশ্য বিকিরণ হচ্ছে কি না। আশীটি আদি ধাতুর মধ্যে ইউরেনিয়াম ছাড়া মাত্র থোরিয়ামে এই গুণ দেখা গেল। তার যৌগিকগুলিরও পরীক্ষা হলো, এখানেও এই প্রভাবের শক্তি অবস্থিত থোরিয়ামের সমানুপাতিক। আদি বস্তুর অদৃশ্য রশ্মি বিকিরণের ক্ষমতা রয়েছে—এটার উপযুক্ত নামকরণ চাই। মাদাম কুরী বললেন—এটা রেডিও-অ্যাক্টিভিটি; অর্থাৎ তেজস্ক্রিয়তা (রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ)।

কয়েক মাস পরীক্ষার পর মারীর ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, রেডিও-অ্যাক্টিভিটি পরমাণুর স্বভাবগুণ —যে পরমাণু তেজস্ক্রিয়, সে সব অবস্থায় ওই শক্তি প্রকাশ করবে। শক্তির ক্রিয়ার ফল ও পরমাণুর সংখ্যা সমানুপাতিক। ইউরেনিয়াম কি থোরিয়াম থাকলে তেজস্ক্রিয়তার পরীক্ষা করে বস্তুতে তাদের পরিমাণ আন্দাজ করা যাবে। পারীর ওই স্কুলের মিউজিয়ামে নানা প্রস্তরের সংগ্রহ ছিল। বিশুদ্ধ যৌগিক ছেড়ে মারী সেই সব নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। প্রথম প্রথম সন্তোষজনক ফল পাচ্ছিল, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম না থাকলে প্রস্তরে তেজস্ক্রিয়তা দেখা যায় না। তবে ইউরেনিয়ামের আকর ছিল মিউজিয়ামে। তাদের পরীক্ষা করে প্রথমে বিভ্রমের সৃষ্টি হলো। Pitchblende কি Chalcolite-এর মধ্যে ইউরেনিয়াম রয়েছে—তবে তেজস্ক্রিয়তা মেপে মনে হলো তারা অনেক বেশী শক্তিশালী। অস্তরের ইউরেনিয়াম গণনায় এনেও সে শক্তির পরিমাণ বোঝানো যায় না। এই সব প্রস্তরে তেজস্ক্রিয়তা অবস্থিত ইউরেনিয়ামের চেয়ে অনেক বেশী। বার বার পরীক্ষা করে একই ফল পাওয়া যাচ্ছে। নানা স্থান থেকে প্রস্তরের সংগ্রহ, তবে সব পরীক্ষায় একই ফল। Pitchblende-এ তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নিহিত ইউরেনিয়ামের প্রায় ৪ গুণ। অনেক চিন্তার পর মারী স্থির করলেন, Pitchblende-এ অত্যল্প মাত্রায় কোন অজানা বস্তু রয়েছে। এতদিন রাসায়নিক পরীক্ষায় সে ধরা পড়ে নি। আজ তেজস্ক্রিয়তা ধরিয়ে দিচ্ছে তাকে। অতএব প্রবন্ধে লিখলেন—Pitchblende-এ রয়েছে কোন অজানা মৌলিক পদার্থ, বিজ্ঞানীরা এতদিন তার সন্ধান পান নি। এই সিদ্ধান্ত সত্যই চাঞ্চল্যকর। বহু বিজ্ঞানী তখনও বেকরেলের আবিষ্কার নিয়ে ভাবতে সুরু করেন নি। তাঁদের তেজস্ক্রিয়তার সঙ্গে পরিচয় ছিল না। এভাবে বিদ্যুৎ নিয়ে মাপ-জোখ করে নতুন এক মূল বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে—বিজ্ঞানীর মন ঐ কথায় সায় দিলে না। '৯৮ সালে Pitchblende-এর অসাধারণ তেজস্ক্রিয়তার কথা প্রকাশ করবার পর পিয়েরও মারীর সঙ্গে আদি বস্তুর সন্ধানে যোগ দিলেন। তারপর পিয়ের যত দিন বেঁচেছিলেন, দুজনে একত্রে এই সব গবেষণার কাজ করেছেন। গুরুতর পরিশ্রম করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় Pitchblende থেকে প্রথমে এক তেজস্ক্রিয় আদি বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেল। '৯৮ সালেই মাদাম কুরীর মাতৃভূমির স্মরণ করে দুই বিজ্ঞানী তার নাম দিলেন "পলোনিয়াম"। ১৯০০ সালে ক্ষারধর্মী নতুন এক মৌলিক বস্তুর সন্ধান পেলেন তাঁরা পিচব্লেণ্ডে। ব্যবহার এর বেরিয়ামের মত—নাম দিলেন—রেডিয়াম।

দুটি নতুন মৌলিক বস্তুর আবিষ্কারের খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। বিশ্বের বিজ্ঞানীর দরবারে কুরীদের স্থান প্রথম শ্রেণীতে দাঁড়ালো। তবু তখনও বিতর্কের অবসান হয় নি। কেমিষ্ট বললেন, নব ধাতুগুলির বিশুদ্ধ যৌগিক তৈরি করা চাই, তার যৌলাঙ্ক প্রায় ঠিক কত বলতে হবে—তা না হলে তাদের অস্তিত্ব সর্বজনগ্রাহ্য হবে না। এবার কুরীরা বিপদে পড়লেন। এতদিন গবেষণার সব খরচ দরিদ্র দম্পতি

নিজেরাই জুগিয়ে এসেছেন। একমাত্র পিয়ের উপার্জন করেন। মারী স্কুলে পিয়েরের সহায় বলে গণিত। সংসারের সব চাহিদা মিটিয়ে নিজেদের গবেষণার খরচ কোনমতে চলে যেত এতদিন। যে নতুন ফরমাস হলো নব ধাতুকে বিশুদ্ধ অবস্থায় Pitchblende থেকে নিষ্কাশন—তা তো প্রচুর ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। Pitchblende দামী জিনিস। সরকারী আনুকূল্য না পেলে এত টাকা আসবে কোথা থেকে? পিয়ের তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ছাড়পত্র পান নি। স্কুলের শিক্ষকের গবেষণার জন্যে সরকারী অর্থ-সাহায্য চাওয়া বাতুলতা বলে মনে হয়। তবু তাঁরা সফলতার আশা ছাড়লেন না। ভাগ্য-দেবীরও করুণা হলো। ব্যাভেরিয়ায় Pitch-blende প্রচুর পরিমাণে খনি থেকে তোলা হয়। সেখানে ইউরেনিয়াম বের করে নেবার বড় কারখানা আছে। কারখানার চারদিকে অপ্রয়োজনীয় আবর্জনার স্তূপ জমছে। অথচ কুরীরা জানেন, এই আবর্জনার মধ্যে মূল্যবান অজানা ধাতু লুকানো রয়েছে। যদি কেউ তাঁদের ওই আবর্জনা পৌঁছে দেয়! অবশেষে এক বন্ধু বিজ্ঞানীর সাহায্যে অস্ট্রীয় গভর্ণমেন্টের আনুকূল্যে কয়েক টন এই Pitchblende-এর টাট্‌কা অবশেষ পারী সহরে পৌঁছালো। অধ্যক্ষের অনুমতি নিয়ে স্কুলের উঠানে এক পড়ো ঘরে রাসায়নিক বিশ্লেষণের আয়োজন হলো। কয়েক বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর কুরী দম্পতি প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় রেডিয়ামের যৌগিক তৈরি করলেন। মৌলাঙ্কও মোটামুটি স্থির হলো—রেডিয়ামের ২২৫। এবার সব সন্দেহের নিরসন হলো। জগৎ রেডিয়ামের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে।

(৬)

তারপর সারা জগতে সাড়া পড়ে গেল। জুন, ১৯০৩ ইংল্যাণ্ডের রয়েল ইনষ্টিটিউশনে পিয়ের কুরীর নিমন্ত্রণ এলো রেডিয়ামের বিষয় বক্তৃতা করতে। পরে লণ্ডনে নানাস্থানে সুধী সমাজে, অভিজাত মহলে, অভ্যর্থনা ও নিমন্ত্রণ কুরী দম্পতির। নভেম্বর মাসে রয়েল সোসাইটি তাঁদের ডেভি পদকে ভূষিত করলেন। অবশেষে ১০ই ডিসেম্বর স্টকহল্‌ম থেকে প্রকাশ—১৯০৪ সালে তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার বেকরেল ও কুরী দম্পতির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। স্বদেশে স্বীকৃতি হলো সকলের শেষে। এতদিন অপেক্ষাকৃত নগণ্য লেবরেটরীতে নিজের খরচায় গবেষণা চালিয়েছিলেন কুরী দম্পতি। মারী শেষ অবধি থিসিস দিলেন তেজস্ক্রিয় বস্তুর সম্বন্ধে ১৫ই জুন, ১৯০৩, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা উচ্চ প্রশংসা করে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করলেন মারীকে। ১৯০৪ সালে নানা বাধাবিপত্তি কেটে গেল। পিয়ের কুরী পদার্থবিদ্যায় অধ্যাপনা করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। পুরনো সোরবন অট্টালিকার মধ্যে নতুন লেবরে-টরীর স্থান সঙ্কুলান করা গেল না, বাইরে দুটি ঘর তৈরি হলো—সেখানে রেডিও-অ্যাক্টিভিটির নিজস্ব লেবরেটরী। এবার মারীরও চাকরী হলো এতদিন স্বামীর লেবরেটরীতে কাজ করছিলেন বিনা মাইনায়।

নভেম্বর ১৯০৪, অধ্যাপনায় প্রোফেসর পিয়ের কুরীর লেবরেটরীতে প্রধান সহায় নিযুক্ত হলেন, মাস মাইনে—২০০ ফ্রাঁ। ৬ই ডিসেম্বর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো—এটি কন্যা ঈভা। ১০ই ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার ঘোষিত হলে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেল তেজস্ক্রিয়তার বিষয়ে গবেষণার কথা। ১৯০৩ সালে রাদারফোর্ড ও সডি দুজনে রেডিয়াম থেকে হিলিয়াম উৎপত্তির কথা প্রমাণ করলেন। তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে—তাই তেজস্ক্রিয়তার বিকাশ হয়—রাদারফোর্ড সন্তোষজনকভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণ ছাপালেন। বিশেষ যে নিয়মে পরমাণুর পরিমাণের রূপান্তর

ঘটে—তাও আবিষ্কৃত হলো। জার্মেনী, হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ক্যানাডা সর্বত্র মহাউৎসাহে কাজ চলতে লাগলো। পিয়ের ও মারী সব সময় একসঙ্গে কাজ করছেন। নানা নতুন তথ্য আবিষ্কার করছেন—সব প্রবন্ধে যুগ্ম নাম। রেডিয়াম থেকে বের হয় ইমানেশন গ্যাস, এটি রেডিয়ামের মতই তেজস্ক্রিয়। তাই নিয়ে কাজ চলছে। ১৯০৬ সালে ১৪ই এপ্রিল পিয়ের লিখছেন—দুজনে চেষ্টা করছি, ইমানেশনের পরিমাণ মেপে কতটা রেডিয়াম থেকে এর উৎপত্তি হলো, তা নিরূপণ করা যায় কিনা।

(৭)

১৯শে এপ্রিল সাংঘাতিক এক দুর্ঘটনায় গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে পিয়ের নিহত হলেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত!

*　　*　　*　　*

এর আগে মৃত্যুর ছায়া মাঝে মাঝে আতঙ্কিত করতো মারীকে। ১৯০২ সালে বাপকে হারালেন, অসুখের সংবাদ পেয়ে ছুটে ওয়ার-শ গিয়েও বাপকে জীবিত দেখলেন না। অন্ত্যেষ্টি শেষে ফিরে এলেন। আবার ভাই-বোন সকলে একত্র হলেন পিতার স্মৃতি উদ্‌যাপন করতে পোলাণ্ডে। তারপর অক্টোবর মাস—একদিন লেবরেটরী থেকে দুজনে পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরছেন—মারীর মন হঠাৎ বিষাদে ভরে উঠলো—জীবন-পথে চলবার সব উৎসাহ যেন নিবে এসেছে। রুদ্ধকণ্ঠে ডাকলেন—পিয়ের। সচকিত পিয়ের ফিরে তাকালেন—সুধালেন আদর করে—কি হলো, কি দুঃখ মনে জাগছে? মারী বলছেন—একজন যদি মরে যায়, তবে অপরে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে? আমরা দুজনে কেউ যদি কাউকে হারাই! পিয়ের নিরুত্তর। তবে বিজ্ঞানী নিজের কর্তব্য বা দায়িত্ব কখনো ভোলে না। পিয়ের ঘাড় নাড়লেন, জ্ঞানের পূজায় তো ব্যাঘাত হবে না! আস্তে বললেন—বৃথা ভাবছ তুমি—এসব বাজে কথা। তবে যাই-ই হোক, কাজ করে যেতেই হবে।

তাই হলো—শেষ অবধি ১৯০৬ সালের শেষ থেকে একলা চললেন মারী।

বিশ্ববিদ্যালয় পিয়েরের পরিবর্তে মারীকে অধ্যাপনার ভার দিলেন—সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পিয়েরের অসমাপ্ত বক্তৃতামালা কয়েক মাস বাদে মারী উপসংহার করলেন।

পরে Institute of Radium তৈরি হলো—তার সব ভার নিজের হাতে নিয়ে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে গেলেন সব কাজ আরও ২৭ বছর। তার মধ্যে মহাযুদ্ধ হলো। দেশসেবার জন্যে প্রাণপাত করলেন মারী। রেডিয়াম দুরন্ত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বড় মেয়ে তাঁর মত প্রথিতযশা বিজ্ঞানী হয়ে উঠলো। সেও তাঁর মত নোবেল পুরস্কার পাবে। রেডিয়ামের অদৃশ্য রশ্মির তেজে অল্পে অল্পে মারীর জীবনশক্তি ক্ষয় হয়ে গেল। সংস্থা আর চালাতে পারেন না। শেষ দিন মালীকে ডেকে বললেন—গোলাপ-ঝাড়গুলির যত্ন করো।

স্বাস্থ্যের জন্যে আরোগ্য নিকেতনে যেতেই হলো—সেখানে মাদাম কুরী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, জুলাই ১৯৩৪।

(৮)

শেষ অবধি দুষ্ট অ্যানিমিয়া। রেডিয়াম শরীরের মেরু সার—সব নিস্তেজ করে—শ্বেত ও রক্ত-কণা সবই কমে গেছে। আর নিস্তার নেই। রেডিয়াম আবিষ্কারের শেষ মূল্য দিলেন নিজের জীবন এবং তারই স্মৃতি হিসাবে রইলো তাঁর বিখ্যাত পুস্তক "Radio-activita."

(৯)

*　　*　　*　　*

১৯২৪ সালের অক্টোবর। ইউরোপে যাবার

প্রথম - সুযোগ এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২ বছর বিজ্ঞান-চর্চার ছুটি দিয়েছে। পারী উপস্থিত হয়েছি। এখানে আগে থেকেই অনেক বন্ধু ডাঃ মুখার্জ্জী, ডাঃ বাগচী—তাঁরা ধরে বসেছেন, ওইখানে তাঁদের সঙ্গেই থেকে যাই। অল্প কিছুদিন আগে ফোটনের সংখ্যায়ন সংক্রান্ত প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় বের হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, কারণ আইনষ্টাইন স্বয়ং তর্জমা করে প্রশংসার সঙ্গে ছাপিয়েছেন। আমি তখনও ভারতে। ইউরোপে এসেই দেখি সর্বত্র দুয়ার সহজেই খোলে। পারীতে প্রথম পৌঁছলাম। মনে আশা, নতুন কিছু শিখে যাব, যাতে ফিরে ছাত্রদের কাজে লাগতে পারি।

সহরের দর্শনীয় সবকিছু দেখবার বাসনা। বন্ধুরা পথ দেখাচ্ছেন।

যে মিউনিসিপাল স্কুলে রেডিয়ামের আবিষ্কার হয়েছিল, সেখানে পিয়ের কুরীর শিষ্য লাঁজ-ভ্যাঁ (Lange-vin) অধ্যক্ষতা করছেন। আমার প্রবন্ধ দেখেছেন—সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি শিখতে চাই—কত দিন থাকবো—ইত্যাদি। এঁরই পরিচয় পত্র নিয়ে গেলাম মাদাম কুরীর কাছে। ইচ্ছা—তাঁর ইনস্টিটিউটে কিছুদিন থেকে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত কাজ নিজে হাতে করতে শিখি। ছোট খাসকামরায় প্রবেশ করবার অনুমতি পেলাম—বর্ষিয়সী মহিমময়ী মহিলা—কালো পোষাক পরে রয়েছেন। ছবি দেখেছি আগে—চিনলাম ইনি সেই। তাঁর হাতে পরিচয় পত্র দিলাম। সস্নেহে আপ্যায়ন করলেন—বললেন, যাঁর কাছ থেকে সুপারিশ এনেছ—তাঁর কথা তো ঠেলতে পারি না! তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে কাজ করবার সুযোগ পাবে—অবশ্য এখনই নয়—৩।৪ মাস বাদে। তুমি ভাষাটা একটু দুরস্ত কর। তা না হলে লেবরেটরীতে কাজ করবার বড় অসুবিধা হবে। আর তোমার তো বিশেষ তাড়া নেই!

মাদাম বলছিলেন বিশুদ্ধ ইংরেজীতে অবলীলা-ক্রমে—প্রায় মিনিট দশেক হবে। কোন সুযোগ জুটলো না তখন জানাতে যে, চলনসই ফরাসী তখনই আমি জানি। এই নিয়ে দেশেই ১০ বছর চেষ্টা করেছি। মাদামের নির্দেশ শিরো-ধার্য করে ফিরলাম। তার পর—যথারীতি কিছুদিন রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে-ছিলাম—তখন ৪।৫ মাস পারী সহরে আছি। পুরনো বাসিন্দা বলা চলে।

* * *

ঈভা কুরী মায়ের জীবনী বিশদভাবে লিখেছেন। সে বই নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলাতে শ্রীমতী কল্পনা রায় তর্জমা করেছেন।

বাংলার বিজ্ঞানসেবী ছেলে-মেয়েরা পড়লে মারীর জীবনের অনেক তথ্য জানতে পারবেন।

বিরল গ্যাসের যৌগিক ধর্ম

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

এযুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের কারো অজানা নয় যে, প্রধানতর—নাইট্রোজেন (আয়তনে ৭৮%) ও অক্সিজেন (আয়তনে ২১%) ব্যতীত অতি অল্পমাত্রায় আরো ৫টি মৌলিক গ্যাস বায়ুমণ্ডলে সর্বদা বর্তমান থাকে। এদের মোট পরিমাণ বায়ুর আয়তনের শতকরা এক ভাগেরও কম। এই কারণে এদের বায়ুমণ্ডলের বিরল গ্যাস (Rare gases) বলা হয়। অতি সামান্য পরিমাণে থাকে বলে বিজ্ঞানীরা অনেক কাল যাবৎ এদের অস্তিত্বের সন্ধান করতে পারেন নি। কিন্তু ১৭৮৫ সালে বিজ্ঞানী কেভেনডিস (Cavendish) বায়ুর উপাদান সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন যে, বায়ুতে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ব্যতীত যদি অন্য কোন গ্যাস থাকে, তবে তার পরিমাণ বায়ুর আয়তনের শতকরা ১ ভাগের বেশী নয়। প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ কেভেনডিসের এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীদের নজরে পড়ে নি। ফলে, এদের অকস্মাৎ আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। ১৮৯৪ সালে বিজ্ঞানী রেলে (Rayleigh) ধারাবাহিকভাবে যাবতীয় গ্যাসের ঘনাঙ্ক নির্ণয় করতে গিয়ে দেখলেন যে, বায়ু থেকে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ঘনাঙ্ক নাইট্রোজেন ঘটিত বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেনের ঘনাঙ্ক থেকে সকল সময়ই কিছু বেশী (০.০৫%) থাকে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি পুরনো দলিলপত্র থেকে কেভেনডিসের পরীক্ষার বিবরণ ও সিদ্ধান্ত উদ্ধার করলেন। তখন তিনি রসায়ন-বিজ্ঞানী রামজের (Ramsay) সঙ্গে একযোগে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও বিচক্ষণ কৌশল সহকারে কেভেনডিসের পরীক্ষার অনুযায়ী পরীক্ষা সুরু করেন। পরীক্ষায় কেভেনডিসের পরীক্ষার ফলের সমর্থন পাওয়া গেল। বায়ু থেকে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অপসৃত করে যে গ্যাস তাঁরা পেলেন তা বায়ুর আয়তনের এক-শ' ভাগের এক ভাগ। এর বর্ণালীর (Spectrum) সঙ্গে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের বর্ণালীর কোন সাদৃশ্য দেখা গেল না। তাঁরা একে বায়ুর একটি নতুন উপাদান মেনে নাম দিলেন আরগন (Argon)। অনতি-বিলম্বে বিজ্ঞানী রামজে ও ট্রেভার্স (Travers) মিলে তরল বায়ুকে অংশানুক্রমে বারংবার বাষ্পীভূত করে বায়ুর উপাদান হিসাবে আরো ৪টি গ্যাস আবিষ্কার করেন। এদের নাম হলো :—

হিলিয়াম (Helium), নিয়ন (Neon), ক্রিপটন (Krypton) এবং যিনন (Xenon)। এই দুই বিজ্ঞানী তখন বায়ুর উপাদান এই পাঁচটি গ্যাসের যাবতীয় ধর্মের পরীক্ষা করতে মন দিলেন। তাঁরা পরীক্ষার ফলে দেখলেন যে, এসব গ্যাস অন্য কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে মিলতে পারে না, অর্থাৎ তাদের রাসায়নিক ধর্মের সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। এরা এই হিসাবে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert gases)। অন্য পদার্থের সঙ্গে এদের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না বলে এদের কুলীন (Noble) গ্যাসও বলা হয়। বিজ্ঞানীরা এই কারণে এদের যোজনাঙ্ক (Valency) নির্দেশ করেছেন শূন্য (0) সংখ্যায়। তাই পর্যায়-সারণীতে (Periodic Table) এদের স্থান হয়েছে শূন্য স্তম্ভে (0 Group)। পরবর্তী কালে বিজ্ঞানী বয়র (Bohr) প্রবর্তিত পরমাণু

গঠন-প্রণালী তত্ত্বের আলোকে বিজ্ঞানীরা এসব গ্যাসের পরমাণুর গঠন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য থেকে তাদের রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার ব্যাখ্যা দিলেন। এই ব্যাখ্যা অনুসারে এদের পরমাণুর সর্বোচ্চ শক্তি-স্তরে ইলেকট্রনের কোন ঘাটতি নেই। এই কারণে এদের পরমাণুর পক্ষে ইলেকট্রন বর্জন, গ্রহণ বা বিনিময় সম্ভব নয়। অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগ ঘটতে হলে এরূপ কোন প্রক্রিয়া অপরিহার্য। এদের বেলায় তা ঘটতে পারে না বলে এরা রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয়। এই কারণে এদের পরমাণু ও অণুতে কোন প্রভেদ নেই, অর্থাৎ এদের পরমাণুর স্বতন্ত্র স্থায়িত্ব আছে —অন্যান্য পদার্থের অণুর মত।

রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ হয়েও যে এসব বিরল গ্যাসগুলির কোন রাসায়নিক ধর্ম নেই—এটা এক প্রকার বিসদৃশ বা অসঙ্গত পরিণাম। তাই র‍্যামজে ও ট্রেভার্সে'র পরীক্ষার পরেও অনেক বিজ্ঞানী বিরল গ্যাসঘটিত যৌগিক পদার্থ নির্মাণে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের এসব প্রচেষ্টা ফলবতী হয় নি। তথাপি কয়েক জন দুঃসাহসিক বিজ্ঞানী বিরল গ্যাসঘটিত যৌগিক পদার্থের অস্তিত্বের সম্ভাবনায় একেবারে বিশ্বাস হারাতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী পাউলিং-(Pauling) এর নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী কালে ইনি রসায়ন-বিজ্ঞানে অপূর্ব গবেষণার জন্যে নোবেল (Nobel) পুরস্কার পেয়েছেন। মৌলিক পদার্থসমূহের ইলেকট্রন-আসক্তি (Electro-negativity) এবং তাদের আয়নের (Ion) ব্যাসার্ধ পর্যালোচনা করে তিনি ১৯৩৩ সালে ক্রিপটন ও জিনন গ্যাসের ফ্লুরিন (Fluorine) ঘটিত যৌগিক পদার্থ KrF_6 ও XeF_6-এর এবং XeF_8-এর অস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি আরো বলেন যে, ৮ যোজনাঙ্কের (Octavalent) জিননঘটিত পদার্থ জিনিক অ্যাসিড, H_4XeO_6 এবং ঐ অ্যাসিডের রৌপ্যঘটিত লবণ Ag_4XeO_6 ও AgH_3XeO_6-এর অস্তিত্বের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। পাউলিং-এর ভবিষ্যদ্বাণী এখন সম্পূর্ণ সফল হয়েছে।

জিনন ও ফ্লুরিনঘটিত যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার একটি আকস্মিক ঘটনা হিসাবে গণ্য করা চলে। ১৯৬২ সালে দুই বিজ্ঞান-কর্মী বার্টলেট ও লেহমান (Bartlett and Lehman) অক্সিজেনের সঙ্গে PtF_6-এর বাষ্প মিশিয়ে একটি নতুন যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করেন। এর সংযুতি হলো $O_2^+[PtF_6]^-$ এই পদার্থে Pt-এর যোজনাঙ্ক ৫-সংখ্যায় নেমে এসেছে। অক্সিজেন অণুর আয়নীভবন বিভব (Ionization potential) ও জিনন পরমাণুর আয়নীভবন বিভবের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ না থাকায় অক্সিজেন গ্যাসের পরিবর্তে জিনন গ্যাস ব্যবহার করে বার্টলেট অনুরূপ জিনন প্ল্যাটিনাম ফ্লুরাইড $Xe^+[PtF_6]^-$ প্রস্তুতে কৃতকার্য হলেন। এভাবেই ঘটলো জিননের প্রথম যৌগিক পদার্থের আবিষ্কার। এর পরে আমেরিকার আরগন ন্যাশন্যাল লেবরেটারীর (Argonne National Laboratory) কর্মীরা একাজে যোগদান করেন। এঁরা প্রথমতঃ প্রস্তুত করেন XeF_4; দানাদার পদার্থ, গলনাঙ্ক 100°C-এর উপর। আয়তনে ৫ ভাগ ফ্লুরিন এবং ১ ভাগ জিনন গ্যাস মিশিয়ে নিকেল ধাতু-নির্মিত পাত্রে 400°C-এ উত্তপ্ত করে বা ঐ দুই গ্যাসের মিশ্রণে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ চালিয়ে ঠাণ্ডা করলে XeF_4 কঠিন দানা বেঁধে জমতে থাকে। দানাগুলি বর্ণহীন—কঠিন অবস্থাতেই বিনা তাপে বাষ্পীভূত হয় (Sublimed).

আরগন ন্যাশন্যাল লেবরেটরীর বিজ্ঞান-কর্মীরা জিনন-ফ্লুরিনঘটিত আরো কয়েকটি যৌগিক পদার্থ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। উদাহরণ: XeF_2, XeF_6, XeF_8।

XeF_2: জিনন ও ফ্লুরিন গ্যাস মিশিয়ে কম চাপে নিকেল ধাতুর নলের মধ্যে 400°C তাপে উত্তপ্ত করে চালিয়ে হঠাৎ -50°C-এ

ঠাণ্ডা করলে XeF_2-এর স্বচ্ছ দানা জমতে থাকে। গলনাঙ্ক 140°C নীলা পাথরের (Sapphire) জানালা দেওয়া নিকেল পাত্রে অবরুদ্ধ জিনন ও ফ্লুরিন গ্যাসের মিশ্রণকে উচ্চচাপের পারদ বাষ্পের আর্ক-বাতির (Mercury vapour lamp) আলোকে আলোকিত করলে বিশুদ্ধ XeF_2-এর সৃষ্টি হয়। আয়তনে ১ ভাগ জিনন ও ২ ভাগ ফ্লুরিন মিশিয়ে তাতে উচ্চ বিভবের (Voltage) Induction Coil থেকে বিদ্যুৎক্ষরণ (Electric discharge) চালিয়ে -78°C-এ ঐ মিশ্রণকে ঠাণ্ডা করলে XeF_2 কঠিন দানা বেঁধে জমতে থাকে।

XeF_6 : সাদা দানাদার পদার্থ; গলনাঙ্ক 40°C। একে তৈরি করতে হলে আয়তনে ৩ ভাগ জিনন ও ২০ ভাগ ফ্লুরিন মিশিয়ে পাকা ইস্পাতের (Stainless steel) পাত্রে অধিক চাপে 350°—450°C তাপে উত্তপ্ত করে পরে ঐ মিশ্রণকে 0°C-এ ঠাণ্ডা করে অংশানুক্রমে পাতন (Fractional distillation) করতে হয়। XeF_6 জলে ভেঙে যায়। সমানুপরিমাণ জলে $XeOF_4$ সৃষ্টি হয়। এটি একটি স্বচ্ছ বর্ণহীন তরল পদার্থ; -4°C-এ এটি কঠিন হয়। অধিক পরিমাণ বরফ জলে XeF_6 থেকে জিনিক অ্যাসিড $Xe(OH)_6$ এবং গরম জলে জিনিক অক্সাইড XeO_3-এর সৃষ্টি হয়।

XeF_8 : জিনন এবং ফ্লুরিনের এই সর্বোচ্চ যৌগিক পদার্থটিও বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন। এটি একটি পীতবর্ণের গ্যাস।

উপরে বর্ণিত জিনন-ফ্লুরিনঘটিত সকল পদার্থ প্রবল জারক (Oxidizing agent) এবং ফ্লুরিন-যোজক (Fluorinating agent).

জিনিক অক্সাইড XeO_3 ও জিনিক অ্যাসিড $Xe(OH)_6$-এর উৎপত্তির কথা আগে বলা গেছে। XeO_3 একটি বর্ণহীন দানাদার পদার্থ, কিন্তু দারুণ বিস্ফোরক। অল্প তাপেই (30°—40°C-এ) এর বিস্ফোরণ ঘটে। এর বিস্ফোরণের শক্তি TNT-এর সমান। জিনিক অ্যাসিড, $Xe(OH)_6$ বা H_6XeO_6 একটি মৃদু অম্ল। এর সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও বেরিয়াম ধাতুঘটিত লবণ সহজে তৈরি করা যায়।

ফ্লুরিনঘটিত ক্রিপটন গ্যাসের যৌগিক পদার্থ KrF_4 and KrF_2-এরও প্রস্তুতবিধি বিজ্ঞানীরা বর্ণনা করেছেন। এদের গুণাগুণ ও ধর্ম XeF_4 ও XeF_2-এর অনুরূপ।

এখন এ-সব বিরল গ্যাসের যৌগিক পদার্থের অণুর আকার বা অবয়ব তাদের উপাদান বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে যোজক সূত্রের (Valance bond) স্বরূপ এবং তৎসংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনের অবস্থান বা বিন্যাস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে এই প্রবন্ধের উপসংহার করবো।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিরল গ্যাসের পরমাণুগুলি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করতে পারে এবং স্থায়ী। তাই তাদের অণুতে আর পরমাণুতে কোন প্রভেদ নেই। বিজ্ঞানীরা এর কারণ নির্ণয় করেছেন তাদের পরমাণু-কেন্দ্রের বহির্দেশে উচ্চতম শক্তি-স্তরে ইলেকট্রনের কোন ঘাটতি বা বাড়তি নেই। আরগন, ক্রিপটন ও জিনন প্রভৃতির পরমাণুর এই বহিস্তর আটটি ইলেকট্রনে পূর্ণ হয়ে স্থায়িত্ব লাভ করে। ইংরেজিতে একে অক্টেট (Octet) গঠন বলে। এই কারণে এদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে আগে গণ্য করা হতো। এখন প্রশ্ন হলো, ফ্লুরিন বা অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে তাদের কিভাবে সংযোগ ঘটতে পারে ?

একদল বিজ্ঞানীর মতে, সংযোগকালে এদের সর্বোচ্চ বহিস্তরের বিস্তার ঘটে, ফলে আটটি ইলেকট্রনেরও বেশী ইলেকট্রন ঐ স্তরে অবস্থান করতে পারে। এই ধারণার ভিত্তিতে তাঁরা XeF_2, XeF_4, XeF_6 ইত্যাদি যৌগিক পদার্থের যে গঠন ও ইলেকট্রন-বিন্যাস প্রস্তাব করেছেন, প্রথমে তার বর্ণনা করবো। কিন্তু আগে সংযোজন

তত্ত্বের (Valency theory) কয়েকটি গোড়ার কথা বলা আবশ্যক।

বিজ্ঞানীরা দু-রকম সংযোজনের (Valency) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বিসম সংযোজন (Electrovalency) এবং সমসংযোজন (Covalency)। প্রথমটির সৃষ্টি হয় দুই পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন বর্জন ও গ্রহণে, যার ফলে বর্জক পরমাণুটি হয় যোগাত্মক আয়ন (Positive ion) এবং গ্রাহক পরমাণুটি হয় বিয়োগাত্মক আয়ন (Negative ion)। উভয়ের মধ্যে তখন বিপরীত বিদ্যুৎ-ভারের দরুণ আকর্ষণ ঘটে এবং বিসম সংযোজন সূত্রের (Electrovalent bond) সৃষ্টি হয়। সমসংযোজনের বেলায় দুটি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের বিনিময় (Exchange or sharing) ঘটে বলে উভয়ের মধ্যে একটি সমসংযোজন সূত্রের (Covalent bond) উৎপত্তি হয়ে একটি যৌগিক অণুর সৃষ্টি করে। এই উভয় প্রকার সংযোজনের ফলে উভয় পরমাণুর বহিস্তর স্থিতিশীল অবস্থায় পরিণত হয়; অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের বহির্তম শক্তি স্তর আটটি ইলেকট্রনে সম্পূর্ণ হয় বা Octet সৃষ্টি করে। যদি কোন পরমাণুর বহির্তম শক্তি-স্তরে স্থিতিশীল Octet সৃষ্টির জন্যে এক বা দুই ইলেকট্রনের ঘাটতি হয়, তবে ঐ জাতীয় দুই পরমাণু তাদের মধ্যে ইলেকট্রন বিনিময় করে একটি যৌগিক অণুতে জুড়ে গিয়ে প্রত্যেক পরমাণুর বহির্তম স্তরে স্থিতিশীল অবস্থার (Octet) সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ ফ্লুরিন অণুর উৎপত্তির কথা বলা যায়। ফ্লুরিন পরমাণুর বহির্তম শক্তি-স্তরে সাতটি ইলেকট্রন থাকে। দুটি ফ্লুরিন পরমাণু তাই পরস্পরের মধ্যে ইলেকট্রন বিনিময় করে যখন একটি ফ্লুরিন অণুর সৃষ্টি করে, তখন উভয় পরমাণুর চারদিকে স্থিতিশীল Octet-এর উৎপত্তি হয়। সে জন্যে কোনও পরমাণুর একটি স্থিতিশীল Octet স্তরের পরবর্তী উচ্চস্তরে যদি এক বা দুই ইলেকট্রন থাকে, তবে ঐ পরমাণু ঐ সব অস্থায়ী বা চঞ্চল ইলেকট্রন বর্জন করে স্থিতিশীল Octet-এ ফিরে আসতে চায় যোগাত্মক আয়ন, (Positive ion) হয়ে। সেরূপ কোন পরমাণুর বহির্তম স্তরে আটটি ইলেকট্রন থেকে যদি একটি বা দুটি কম থাকে, তবে ঐ পরমাণু অন্য কোন পরমাণুর বাড়তি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঐ ঘাটতি পূরণ করে স্থিতিশীল Octet গড়ে তুলতে চায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোডিয়াম ও ফ্লুরিন পরমাণুর উল্লেখ করা যায়। সোডিয়াম পরমাণুতে Octet-এর উপর একটি বাড়তি ইলেকট্রন থাকে, ফ্লুরিন পরমাণুতে সেরূপ Octet গড়বার জন্যে একটি কমতি থাকে। সুতরাং সোডিয়াম ও ফ্লুরিনের সংযোগে যোগাত্মক সোডিয়াম আয়ন এবং বিয়োগাত্মক ফ্লুরিন আয়ন হয়ে পরস্পর সংযোগে সোডিয়াম ফ্লুরাইড অণুর সৃষ্টি করে।

Xe

F

১নং চিত্র
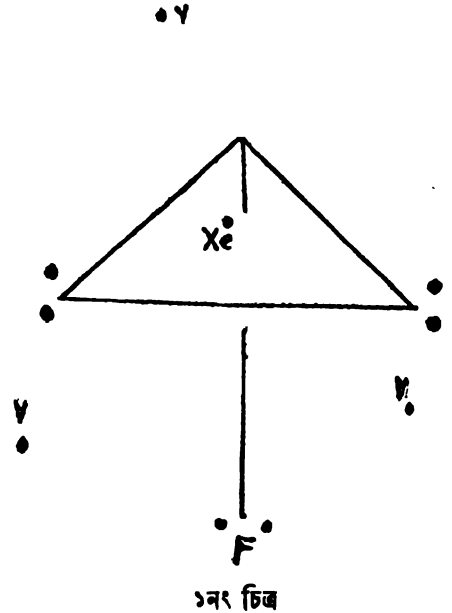
কিন্তু ঝিনন বা ক্রিপটন পরমাণুর বহির্তম শক্তি-স্তর আটটি ইলেকট্রনের সমাবস্থানে স্থিতিশীল Octet-এর সৃষ্টি করে বলে এদের নিষ্ক্রিয় বলা

হতো। তাই একদল বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেছেন যে, জিনন পরমাণু সক্রিয় হতে হলে তার বহির্তম শক্তি-স্তর বিস্তৃত হয়ে স্থিতিশীল দশ বা বারো ইলেক-ট্রনের শক্তি-স্তরে পরিণত হবে। XeF_2-এ এই প্রকার একটি দশ ইলেকট্রনের বহিঃস্তরের সৃষ্টি হয় জিনন পরমাণুর চারদিকে। জিনন পরমাণুর স্বকীয় আটটি ইলেকট্রন এবং দুটি ফ্লুরিন পরমাণুর দুটি ইলেকট্রনের সঙ্গে পরস্পর বিনিময়ের ফলে দশটি ইলেকট্রনের একটি স্থিতিশীল স্তরের উৎপত্তি হয়। ফ্লুরিন পরমাণুর Octet ও সম্পূর্ণ হয়। XeF_2 অণুর গঠন ও তার আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রনের অবস্থান এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১নং চিত্রে দেখানো হলো।
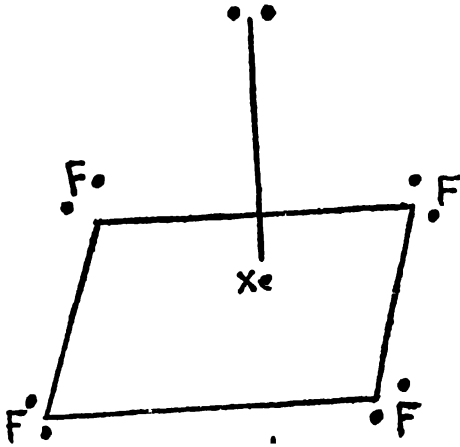
২নং চিত্র

তলদেশে জোড়া দুটি ত্রিকোণ পিরামিডের (Triangular bypyramid) প্রত্যেক কোণে ও শীর্ষদেশে দুটি করে ইলেকট্রন অবস্থিত। শীর্ষদেশের দু-জোড়া ইলেকট্রন দুটি ফ্লুরিন অণুর সঙ্গে যুক্ত।

এই মতে XeF_4 অণুর যে গঠন ও ইলেকট্রন বিন্যাস হবে, তাও ২নং চিত্রে দেখানো হলো।

এক্ষেত্রে জিনন পরমাণুর বহির্তম স্তরের আটটি ইলেকট্রন ও চারটি ফ্লুরিন পরমাণু থেকে চারটি ইলেকট্রন মিলে XeF_4 অণুর অভ্যন্তরে জিনন পরমাণুর চারদিকে বারোটি ইলেকট্রনের একটি বৃহত্তর বহির্তম স্থিতিশীল স্তরের সৃষ্টি করে। এই বারোটি ইলেকট্রন একটি সমঅষ্টতলে (Regular octahedron) ছয় কোণায় দুটি করে প্রত্যেক কোণে অবস্থান করে। চারটি ফ্লুরিন পরমাণু জিনন পরমাণুকে কেন্দ্র করে তার চারদিকে এক সমচতুর্ভুজ কোণে সমসংযোজন সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করে। জিনন ও ফ্লুরিন পরমাণুর মধ্যে কোণস্থ ইলেকট্রনদ্বয়ের বিনিময়ের ফলে এই সমসংযোজন বাঁধনের সৃষ্টি হয়।

কুলসন (Coulson) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মতে উপরে বর্ণিত XeF_2 ও XeF_4-এর গঠন-বিন্যাসের ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য ও সন্তোষজনক নয়। কারণ দশটি বা বারোটি ইলেকট্রনের সমাবেশে বৃহত্তর স্থিতিশীল শক্তি-স্তর সৃষ্টির কোন প্রমাণ নেই। কুলসনের মতে, সম ও বিসম উভয় জাতীয় সংযোজন-প্রক্রিয়ার যুগপৎ প্রভাবের ফলে XeF_2 XeF_4 ইত্যাদি বিরল গ্যাসঘটিত যৌগিক পদার্থের অণুর সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ XeF_2-এর অণুর গঠন-বিন্যাস আলোচনা করা যেতে পারে। এই অণুতে একটি ফ্লুরিন পরমাণু জিনন পরমাণুর সঙ্গে বিসম সংযোজন সূত্রে এবং অপরটি সমসংযোজন সূত্রে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু মুহুর্মুহুঃ এই দুই জাতীয় বন্ধনের মধ্যে পরস্পর পরিণতি ঘটে; অর্থাৎ এক মুহূর্তে যে ফ্লুরিন পরমাণুটি জিনন পরমাণুর সঙ্গে সমসংযোজন সূত্রে আবদ্ধ থাকে, পরমুহূর্তে তা বিসমসংযোজন সূত্রে পরিণত হয়। ইংরেজিতে একে বলে Resonance; আমরা একে বলতে পারি দোলন।

$$\bar{F}\ \overset{+}{Xe}-F \rightleftharpoons F-\overset{+}{Xe}\ \bar{F}$$

অন্যভাবে বলা যায়, ঝিনন ও ফুরিন পরমাণুর যে বাঁধন, তা অনবরত সম ও বিসম সংযোজন স্বরূপের মধ্যে প্রবলবেগে দুলতে থাকে, অথবা এই বাঁধনকে উভয় জাতীয় বাঁধনের সমসংমিশ্রণ বলা যায়। এই সিদ্ধান্তে স্থিতিশীল Octet স্তরের ধারণা অব্যাহত থাকে। এই হলো এই সিদ্ধান্তের প্রধান সুবিধা।

বায়ুমণ্ডলের বিরল গ্যাসের যৌগিক ধর্মের আবিষ্কারে এদের নিষ্ক্রিয়তার ধারণা গেছে বিলোপ হয়ে এবং কৌলিন্য গেছে ভেঙে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কারণ, এই হলো বৈজ্ঞানিক সত্যের স্বরূপ। বৈজ্ঞানিক সত্যমাত্রই তাৎকালিক সত্য, চিরন্তন সত্য নয়। জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যের রূপ যায় বদ্‌লে। তাই বিজ্ঞানে মতবাদের কোন গোঁড়ামি নেই। বিজ্ঞানের গতি সতত উর্ধ্ব দিকে। এর চলার কোন বিরাম নেই। যদি কখনো এটি অচল হয়ে পড়ে, তবে বিজ্ঞান যাবে বিলুপ্ত হয়ে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের চর্চা চলেছিল প্রবল উদ্যমে। কিন্তু পরবর্তী যুগে শাস্ত্রের অনুশাসনের অচলায়তনের অন্ধকূপে আবদ্ধ করে ভারতবাসী তাকে হত্যা করেছে। বর্তমানে পশ্চিমের বিজ্ঞান-সাধনার দীপ্ত আলোক অনুসরণ করে আমরা ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান-চর্চা সুরু করেছি। কিন্তু একে ফলবতী করতে হলে চাই কঠোর সাধনা, নিরাসক্ত একাগ্রতা, অকপট বিনয় এবং শ্রদ্ধা। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র পাঠক-পাঠিকা এর জন্যে প্রস্তুত হবেন কি? নতুবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষামন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে পুনরায় বিজ্ঞান থাকবে অচল হয়ে। এই অবস্থায় ভারতের মাটিতে এখানে-ওখানে হয়তো ২।৪টি পাদপাদপ গজাতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানের ফসল তাতে ফলবে না।

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান

রমেশ দাশ

পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) কথাটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ অপ্রয়োজনীয় আতিশয্য লক্ষিত হয়। মনোবিজ্ঞান যে একটি বিশেষ বিজ্ঞান, তা তো মনোবিজ্ঞান কথাটির দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে সূচিত হচ্ছে। বিজ্ঞান মাত্রেই যখন পরীক্ষামূলক, তখন মনোবিজ্ঞানও যে পরীক্ষামূলক হবে, সেটা তো সহজেই অনুমান করা যায়। তাহলে মনো-বিজ্ঞানকে পরীক্ষামূলক বিশেষণের দ্বারা অলঙ্কৃত করবার প্রয়োজন কি? পরীক্ষামূলক পদার্থ-বিজ্ঞান বলবার দরকার যদি না থাকে, তাহলে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান বলবার সার্থকতা কোথায়?

বিজ্ঞানের মধ্যে কোনখানে—এমন কি, নামেও অনাবশ্যক আতিশয্যের স্থান নেই। সুতরাং মনোবিজ্ঞানকে যখন 'পরীক্ষামূলক' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজনটা স্পষ্টতঃই মনো-বিজ্ঞানকে অপরাপর বিজ্ঞানের সমতুল্যরূপে ঘোষণা করা। বস্তুতঃ এই নবীন বিজ্ঞানটিকে বিজ্ঞান-জগতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে রীতি-মত সংগ্রাম করতে হয়েছে। তার প্রধান

কারণ, এর বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্রতা। অপরাপর বিজ্ঞান যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে, সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-ধ্বনিময় যে জগৎ, তাই হলো অন্যান্য বিজ্ঞানের গবেষণা-ক্ষেত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ নিয়ে যে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব, সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। এই জগতের যে কোন বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিকগণ একক বা সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা (অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পর্যবেক্ষণ) করতে পারেন। কিন্তু মনোজগৎ বা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো এমনি একটি জগৎ, যেখানে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনটিকেই আশ্রয় করে আমরা পৌঁছুতে পারি না। এই রকম একটি জগৎ নিয়ে যে পরীক্ষা সম্ভব, সে কথা কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বেও মানুষের কল্পনাতীত ছিল। তাই মনোবৈজ্ঞানিকগণ যখন নানাবিধ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে মনের উপর পরীক্ষা সুরু করলেন এবং তাঁদের পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে মনের 'বিজ্ঞান' রচনা করলেন, তখন তাঁদের সেই সাধু প্রচেষ্টা ও দুরন্ত সাফল্যকে স্বীকৃতি জানাবার পরিবর্তে উপেক্ষাই প্রদর্শন করা হয়েছিল। পরীক্ষার ভিত্তিতে মনের বিজ্ঞান রচিত হবার পূর্বে মন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে সব কথা বলেছিলেন, তা ছিল নিছক তর্ক, যুক্তি ও অনুমানলব্ধ। মনের তৎকালীন আলোচনাকে তাই Fireside Psychology বা Speculative Psychology বলা হয়, অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক-গণ তখন অগ্নিপীঠের (Fire-place) পার্শ্বে উপবিষ্ট হয়ে উত্তাপের আরামটুকু উপভোগ করতে করতে তাঁদের অবকাশ মুহূর্তে মনের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা করে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন, মনোবিজ্ঞান (মনস্তত্ত্ব বলাই বোধ হয় ঠিক হবে) বলতে তখন তাই বোঝাতো। এসব সিদ্ধান্তের যে কোন মূল্য নেই তা নয়, কিন্তু এগুলিকে যথার্থ অর্থে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বলা চলে না, কারণ মানসিক ঘটনাবলীকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে তার ভিত্তিতে এই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি।

মনকে পর্যবেক্ষণ করা বা মনের উপর পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, এই রকম একটা ধারণা এখনও অনেকেরই মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে তার কারণ, মন আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের জালে ধরা পড়ে না। কিন্তু ধারণাটি যথার্থ নয়। মন বলতে যদি আমরা আমাদের চেতনাকে (Consciousness) বুঝি (ফ্রয়েড-পূর্ব মনো-বৈজ্ঞানিকগণ তাই বুঝতেন। ফ্রয়েডের মতে, মন বলতে একমাত্র চেতনাকেই না বোঝালেও চেতনা যে মনের একটা প্রধান অংশ, তা সর্বজনস্বীকৃত), তাহলে চেতনাকে চক্ষু-কর্ণ-ত্বক-নাসিকা-রসনার দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয় মেনে নিলেও তাকে যে আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছি, সে বিষয়ে তো বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের স্ব স্ব চেতনার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করি এবং আপন চেতনার ক্ষেত্রে কোন রকম পরিবর্তন ঘটলে প্রত্যক্ষভাবেই সেটি পর্যবেক্ষণও করতে পারি। আমাদের চেতনার সমুদ্রে সবিরাম যে সব চিন্তা (Cogintion), অনুভূতি (Affect) ও প্রেরণার (Conation) তরঙ্গ উত্থিত হচ্ছে, সেগুলি আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি, যার জন্যে আমাদের চেতনাটি কখন শান্ত-নিস্তরঙ্গ, কখন বিচলিত-বিক্ষুব্ধ, কখন বা ক্রোধাবিষ্ট, কখন ঈর্ষান্বিত, তা বুঝতে পারি ও বলতে পারি। সুতরাং চেতনাকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না, একথাটা সত্যি নয়। অবশ্য চেতনাকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না, চেতনাকে পর্যবেক্ষণ করি চেতনারই সাহায্যে। এইভাবে চেতনার সাহায্যে চেতনাকে পর্যবেক্ষণ করা যে সম্ভব, এটা মনোবৈজ্ঞানিকগণ বুঝতে

পারলেন এবং এই পদ্ধতির নাম দিলেন অন্তর্দর্শন (Introspection)। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—ক্রোধ চেতনারই একটি অবস্থা, আবার এই অবস্থাটিকে পর্যবেক্ষণ করবার কাজটা (ক্রুদ্ধ ব্যক্তির দ্বারা তাঁর ক্রোধের অনুভূতিটি লক্ষ্য করা) চেতনারই কাজ। অনেক সমালোচক চেতনার এই বৈশিষ্ট্যটিকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। নিজের চেতনার সাহায্যে নিজের চেতনাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব, একথা তাঁরা মানতে রাজী নন। কিন্তু তাঁরা মানতে রাজী না হলেও যে ঘটনাটি প্রত্যেকেরই ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ঘটছে, সেটি তো আর মিথ্যে হয়ে যেতে পারে না! কোন কোন সমালোচক আবার বলেছেন, চেতনার কোন অবস্থাকে চেতনা দিয়ে লক্ষ্য করতে গেলে সেই অবস্থাটি আর থাকে না। যেমন তাঁদের মতে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি যদি তাঁর ক্রোধের অনুভূতিটিকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করেন, তাহলে উক্ত অনুভূতিটি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যখন তাঁর ক্রোধের বর্ণনা করেন, তখন বস্তুতঃ তিনি তাঁর ক্রোধকে পর্যবেক্ষণ করে তা বলেন না। পক্ষান্তরে, স্বাভাবিকভাবে তাঁর ক্রোধ অন্তর্হিত হয়ে যাবার পর তিনি তাঁর স্মৃতির সাহায্যে তাঁর পূর্বানুভূতির (ক্রোধের) বিবরণ দিয়ে থাকেন মাত্র। এই ক্রিয়াটিকে অন্তর্দর্শন বা আত্মপর্যবেক্ষণ (Introspection) না বলে সমালোচকগণ তাই স্মৃতিচারণ বা অনুস্মরণ (Retrospection) বলার পক্ষপাতী। চেতনার কোন একটি অবস্থা অন্তর্হিত হয়ে যাবার পর তার কথা স্মরণ করে বলাটা নিশ্চয়ই অনুস্মরণ। কিন্তু অবস্থাটির অবস্থান কালে অন্তর্দর্শন না হয়ে থাকলে যে তার অনুস্মরণ সম্ভব নয়, একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। যা এখন স্মরণ করছি, পূর্বে নিশ্চয়ই তা লক্ষ্য করেছি; যাকে লক্ষ্য করি নি, তাকে স্মরণ করা কি সম্ভব?

অন্তর্দর্শন পদ্ধতিটিকে তাই যখন থেকে মনোবৈজ্ঞানিকগণ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রয়োগ করে, চেতনার বিবিধ অবস্থা ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে সুরু করলেন, তখন থেকেই পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত।

অন্তর্দর্শন আর পর্যবেক্ষণ অভিন্ন পদ্ধতি। সতর্কতার সঙ্গে বহির্বিশ্বের বস্তুনিচয় বা ঘটনাবলীকে লক্ষ্য করবার সাধারণ নাম পর্যবেক্ষণ আর অন্তর্লোকের অর্থাৎ চেতনারাজ্যের বিবিধ ঘটনা ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করবার নাম অন্তর্দর্শন। সুতরাং অন্তর্দর্শন এক প্রকার পর্যবেক্ষণ। সমূহ বিজ্ঞানের মৌলিক পদ্ধতিই হলো পর্যবেক্ষণ (Observation)। অন্যতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পরীক্ষা (Experiment) পর্যবেক্ষণের অধিকতর সুষ্ঠু প্রয়োগ। পরীক্ষাগারের (Laboratory) নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে কোনও ঘটনা বা বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করবার নামই পরীক্ষা।

একই বা অনুরূপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের আপন চেতনার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেন। তারপর পরস্পরের বিবরণ মিলিয়ে দেখলেন। এইভাবে চেতনার সম্বন্ধে বহু সাধারণ তথ্য বা সূত্র আবিষ্কৃত হতে লাগলো।

প্রখ্যাত জার্মান মনোবৈজ্ঞানিক Wilhelm Wundt পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান (Experimental Psychology) কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন এবং তিনিই ১৮৭৯ সালে লাইপজিগে (Leipzig) মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রথম পরীক্ষাগারটির প্রতিষ্ঠা করেন। এই পরীক্ষাগারে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে প্রতিভাধর মনোবৈজ্ঞানিক মিলিত হতে থাকেন। গবেষণান্তে তাঁরা আপন আপন দেশে প্রত্যাবর্তন করে নিজেরাই মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করেন ও পরম নিষ্ঠার সঙ্গে

অপ্রতিহত গতিতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকেন। বিশ্বময় মনোবৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। মনোবিজ্ঞান-জগতে একটা রীতিমত আলোড়ন দেখা দেয়। ভুণ্ট্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত দিকপালগণের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের Titchener, আমেরিকার Stanley Hall, Cattell, Angell, Judd ও বৃহত্তর ইউরোপীয় ভূখণ্ডের Kraepelin, Münsterberg, Külpe এবং Lange-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

Ernst Heinrich Weber (১৭৯৫-১৮৭৪) এবং Gustav Theodor Fechner (১৮০১-১৮৮৭) কিন্তু ইতিপূর্বেই মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পাদন করেছিলেন এবং তাঁদেরই গবেষণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠছিল মনোবিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট শাখা, যার নাম Psychophysics। বহির্জগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় করাই ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ সংবেদনার (Sensation) ক্ষেত্রেই তাঁদের গবেষণা নিবদ্ধ ছিল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই আমরা বহির্জগৎকে প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যেমন—খুব ক্ষীণ আলো আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, খুব ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাই না। তেমনি খুব প্রচণ্ড আলোয় চোখ ঝল্‌সে গিয়ে অন্ধ হয়ে যায়, খুব প্রচণ্ড শব্দে কানের পর্দা ফেটে গিয়ে আমরা বধির হয়ে পড়ি। তাহলে আলো থাকলেই দেখতে পাবো, শব্দ হলেই শুনতে পাবো—একথা ঠিক নয়। বস্তুটি (যেমন আলো, শব্দ ইত্যাদি) ন্যূনতম কি পরিমাণ হলে তবে সেটি প্রত্যক্ষ করা সম্ভব? আবার প্রত্যক্ষের বস্তুটির যে কোনও বৃদ্ধি বা হ্রাসই কি আমরা ঠাহর করতে পারি? যে ঘরে একশ'টি বাতি জ্বলছে, সে ঘরে আর একটি বাতি জ্বেলে দিলে কি আমরা আলোর বৃদ্ধি বুঝতে পারবো বা তাথেকে যদি একটি বাতি সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে কি আমরা আলোর তীব্রতার হ্রাস ঠাহর করতে পারবো? তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝতে হলে বস্তুকে কি পরিমাণ কমাতে বা বাড়াতে হবে? এক কথায় বস্তুজগতের (Physical World) সঙ্গে মনোজগতের (Phychological World) সম্পর্কটা কি, সেটাই হলো Psychophysics-এর উপজীব্য। Weber-এর গবেষণালব্ধ তথ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করে ও তাঁর নিজস্ব গবেষণার আলোকে অন্তর্লোক ও বহির্লোকের সম্পর্ক সম্বন্ধে Fechner যে সূত্রটি আবিষ্কার করেন, সেটি Weber-Fechner Law নামে পরিচিত। এই সূত্রের মূল বক্তব্য—বস্তুর (Stimulus) জ্যামিতিক বৃদ্ধি (Geometrical progression) ঘটলে তবেই সংবেদনার (Sensation) গাণিতিক বৃদ্ধি (Arithmetical progression) সম্ভব হয়। সংবেদনার অনুভবযোগ্য হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে হলে উদ্দীপক বস্তুটিকে একটি নির্দিষ্ট হারে কমাতে বা বাড়াতে হবে। উক্ত হারটি নির্ধারণ করবার জন্যে Method of Limits, Method of Right and Wrong cases, Method of Mean Error ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি উদ্ভাবিত হয়।

বস্তুজগতের প্রভাবে চেতনালোকে কি কি পরিবর্তন হয়, অন্তর্দর্শনের সাহায্যে তা নির্ধারণ করবার পদ্ধতিটিকে Method of Impression বলা হয়। যেমন আটটি রঙের প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটিকে জোড়ায় জোড়ায় কোনও ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থাপিত করে তাঁকে বলতে বলা যেতে পারে, উপস্থাপিত দুটি রঙের মধ্যে কোন্‌টি তাঁর বেশী ভাল লাগছে। এই ভাবে আটটি রঙই উপস্থাপিত হবার পর বোঝা যাবে, কোন্ রঙটি তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় এবং কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা অপ্রিয়। তাঁর ভাল লাগা-না লাগার পরিপ্রেক্ষিতে

প্রত্যেকটি রঙেরই আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

পক্ষান্তরে, চেতনালোকে কোনও পরিবর্তন ঘটলে ব্যক্তির দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যে কি ভাবে তার প্রকাশ ঘটে, তা নির্ধারণ করবার পদ্ধতিটিকে Method of Expression বলা হয়। দেহ ও মনের মধ্যে সম্পর্কটি অবিচ্ছেদ্য বলেই মনোবৈজ্ঞানিকগণ Method of Expression-কে বিশেষ একটি মূল্যবান পদ্ধতি বলে মনে করেন। একজনের চেতনাকে অন্য একজন প্রত্যক্ষ করতে পারে না; কিন্তু একজনের দৈহিক পরিবর্তনগুলি অন্য যে কেউ প্রত্যক্ষ করতে পারেন। একই বা অনুরূপ পরিস্থিতিতে যদি দেখা যায়, বিভিন্ন ব্যক্তি অন্তর্দর্শন করে অনুরূপ অনুভূতির কথা বলছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে Method of Expression-এর সাহায্যে যদি দেখা যায় সকলের মধ্যেই অনুরূপ দৈহিক পরিবর্তন ঘটছে, তাহলে উক্ত অনুভূতির সঙ্গে উক্ত দৈহিক পরিবর্তনের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুমান (Infer) করা যেতে পারে। ফলে অন্য কোনও ব্যক্তির মধ্যে উক্ত দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তাঁর মনেও যে উক্ত অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, তাও যুক্তিসঙ্গতভাবেই অনুমান করা যেতে পারে। মনোবৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ করে আবেগ বা প্রক্ষোভের (Emotions) ক্ষেত্রে Method of Expression প্রয়োগ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, নাড়ীর স্পন্দনের হার, রক্তের চাপ ইত্যাদি দৈহিক বিশিষ্টতার সঙ্গে প্রক্ষোভের একটি নিবিড় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়েছে।

দেহের সঙ্গে, বিশেষতঃ স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) সঙ্গে মনের সম্বন্ধ নির্ণয় করা পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। মস্তিষ্ক কি ভাবে আমাদের চিন্তা, কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কি ভাবে বিভিন্ন গ্রন্থি (Glands) আমাদের বুদ্ধি, আবেগ, মনঃপ্রকৃতি (Temperament) ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে—এবম্বিধ বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে মনোবিজ্ঞানীদের অনলস চেষ্টার ফলে। Cannon, Lashley প্রমুখ মনোবৈজ্ঞানিকদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। J B. Watson মনের অধিকাংশ ক্রিয়াকেই দৈহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে তাঁর প্রখ্যাত আচরণবাদ (Behaviourism) প্রবর্তন করেন।

কি ভাবে শিক্ষা-কর্মটি সম্পাদিত হয়, তার উপর বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন Thorndike, Pavlov, Köhler, Lewin, Tolman প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। এঁরা প্রধানতঃ জীবজন্তুর উপর নানা রকম পরীক্ষা করে শিক্ষা-ক্রিয়ার মূল সূত্রটি আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

১৯০৫ সালে ফরাসী মনোবৈজ্ঞানিক Alfred Binet বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence test) উদ্ভাবন করে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি নতুন দিগন্তের নির্দেশ দান করেন। তাঁর নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়ে মনোবৈজ্ঞানিকগণ তারপর বুদ্ধি, প্রবণতা (Aptitude), অনুরাগ (Interest), দক্ষতা (Ability) ইত্যাদির পরিমাপ করবার জন্যে রাশি রাশি অভীক্ষা রচনা করেছেন।

১৮৭৯ সালে মনোবিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষাগারটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর এত অল্প সময়ের মধ্যে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তা দেখে আশান্বিত হবার কারণ আছে যে, একদিন এই বিজ্ঞানটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানে পরিণত হবে। এই অগ্রগতির যথার্থ বিবরণ স্বল্প পরিসরের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়। বর্তমান নিবন্ধে তার একটা আভাস মাত্র দেবার প্রয়াস পেয়েছি।

শুধু অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয়, বস্তুতঃ জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই মানুষ যে উন্নতি লাভ করে চলেছে, তার মূলে আছে তার মন। সুতরাং আপন মনকে যদি মানুষ বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানতে পারে, তবে সর্বক্ষেত্রেই তার অগ্রগতি দ্রুততর ও অপ্রতিহত হবে। তাই তার নিজের স্বার্থেই মনোবিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে।

ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ (E. E. G.) যন্ত্র

পরবর্তী পৃষ্ঠার আলোকচিত্রে কলিকাতার বিজ্ঞান কলেজের শারীরবৃত্ত বিভাগে একজন বয়স্ক ব্যক্তির E. E. G. রেখাঙ্কিত করার পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে। এভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রর তড়িৎ-বিভব রেখাঙ্কিত করবার যন্ত্রকে ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph), সংক্ষেপে E. E. G. যন্ত্র বলা হয়।

মস্তিষ্কের তড়িৎ-শক্তি মাত্রায় খুবই অল্প, যা মাইক্রোভোল্টে পরিমাপ করা হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর-তড়িৎ-শক্তিকে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে (Mechanical energy) পরিবর্তিত করা হয়। যন্ত্রের সঙ্গে রেখায়নের জন্যে কলম এবং কাগজ থাকে, আলোক-চিত্রের সম্মুখদিকে যাচ্ছে। যন্ত্রের কলম যান্ত্রিক শক্তিতে গতিসম্পন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখায়ন করার কাগজটিও একটা নির্দিষ্ট গতিতে ক্রমাগত সরতে থাকে। কাগজের গতি ও মাপ জানা থাকলে যে কোন মস্তিষ্ক-তরঙ্গের স্পন্দন সংখ্যা জানতে পারা যায়।
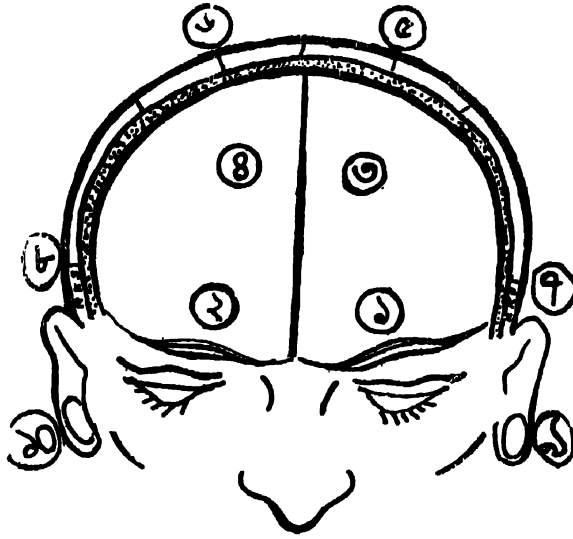
চিত্রে "করোটি'র উপর তড়িৎ-দ্বার বসানোর চিহ্নিত স্থানগুলো দেখানো হচ্ছে। সারা মস্তিষ্কটাকে সিঁথির মাঝ বরাবর সমান দুই অংশে বিভক্ত করা হয়েছে (চিত্রে একটা সরল রেখার সাহায্যে বোঝানো হয়েছে)। দক্ষিণ দিকের অংশটাকে দক্ষিণ গোলার্ধ (Right hemisphere) এবং বাম দিকের অংশটাকে বাম গোলার্ধ (Left hemisphere) বলা হয়। প্রতিটি গোলার্ধকে আবার চার অংশে বিভক্ত করা হয়েছে; যেমন (১), (২) মস্তিষ্কের "সম্মুখ ভাগ" (Fröntal lobe); (৩) (৪), মধ্যভাগ (Parietal lobe); (৫), (৬) পশ্চাৎভাগ (Occipital lobe) এবং (৭) (৮) পার্শ্বভাগ (Temporal lobe)

মস্তিষ্কের উল্লিখিত অংশগুলো করোটির উপর চিহ্নিত করা হয় এবং বিশেষ প্রকার জেলির (Jelly) সাহায্যে দুই গোলার্ধে মোট আটটি তড়িৎ-দ্বার বসানো হয়। আর্থ (Earth) অথবা গ্রাউণ্ড তড়িৎ-দ্বার হিসাবে কাজ করবার জন্যে আলাদা দুই তড়িৎ-দ্বার (৯), (১০) বহিঃকর্ণের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-দ্বার সমূহের অপর প্রান্ত 'সংযোগ বোর্ডের' মাধ্যমে E. E. G যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

মস্তিষ্কের আটটি অংশ থেকে উদ্ভূত তড়িত-তরঙ্গ রেখায়নের জন্যে আটটা কলম থাকে। আজকাল বত্রিশটা কলম বিশিষ্ট E. E. G. যন্ত্রও প্রস্তুত হয়েছে যাতে মস্তিষ্কের আরো বেশী অংশ থেকে তড়িৎ-তরঙ্গ রেখান্বিত করা সম্ভব।

এই তরঙ্গ সমূহের নানা প্রকার ধর্ম, যেমন তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি, প্রতি সেকেণ্ডে স্পন্দন সংখ্যা (Frequency), বিস্তার (Amplitude) ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি বিচার করে নানা প্রকার মস্তিষ্ক-রোগের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

ইলেক্‌ট্রোএন্‌সেফালোগ্রাফ (E. E. G) যন্ত্র
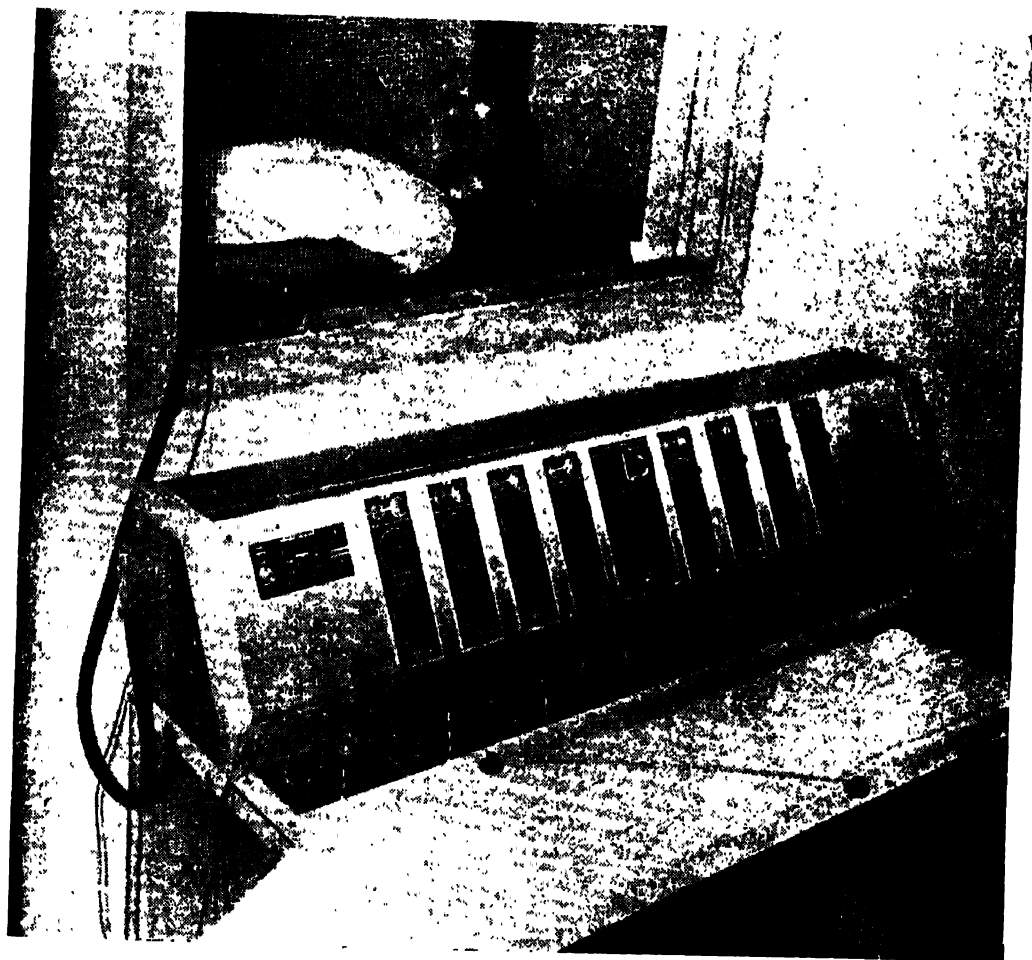
একজন বয়স্ক ব্যক্তির E. E. G রেখায়িত করার পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে

[১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। মানুষের তৈরি প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক ঐদিন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত হলো। তারপর গত দশ বছরে আরো অনেক উপগ্রহের জন্ম হয়েছে, পৃথিবী আর বাতাবরণ পেরিয়ে মানুষ পাড়ি দিয়েছে মহাকাশে, চাঁদ ও কাছাকাছি গ্রহগুলিতে যাত্রার তোড়জোড় চলছে। তবে মহাকাশ-বিজ্ঞান থেকে মানুষ এপর্যন্ত যা সবচেয়ে বেশী লাভ করেছে, তা হলো তার নিজের পৃথিবী ও পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অঞ্চল সম্বন্ধে নতুন অনেক জ্ঞান। আর যে ব্যবহারিক প্রয়োগের প্রচেষ্টা আজ সবচেয়ে বেশী চলছে, তা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বেতার যোগাযোগের ব্যবস্থা। প্রথম স্পুটনিকের দশম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে—১। 'ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী,' ২। 'বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ,' ৩। 'বেতারবার্তা পরিবেশনে উপগ্রহ' শীর্ষক তিনটি প্রবন্ধ এই সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। সঃ]

ভ্যান অ্যালেন (Van Allen) বেষ্টনী

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

ভূমিকা

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে আজ আমরা জানি যে, ঊর্ধ্বে মহাকাশে পৃথিবীকে বেষ্টন করে প্রভূত পরিমাণ প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকা ভিন্ন ভিন্ন দুটি বিস্তৃত খণ্ডে ঘন-সন্নিবিষ্ট আছে। বিদ্যুৎ-কণিকায় পূর্ণ এই দুটি বিস্তৃত খণ্ডের যেটি পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত, তাকে নিম্ন বেষ্টনী, আর যেটি দূরে অবস্থিত, তাকে ঊর্ধ্ব বেষ্টনী বলা যেতে পারে। রাশিয়া ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের গবেষণায় এই দুটি বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনী আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৮-৫৯ সনে আইওয়া স্টেট য়ুনিভার্সিটির (Iowa State University) অধ্যাপক ভ্যান অ্যালেন ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণায় বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনীদ্বয় অবিসম্বাদিত-ভাবে প্রমাণিত হয় বলে এই দুটি বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনীকে ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী নাম দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনীদ্বয়ের আবিষ্কার

মহাকাশে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকায় পূর্ণ বেষ্টনী দুটির আশ্চর্য আবিষ্কারের কথা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। গোড়াতেই সে জন্যে এই আবিষ্কারের কথা বিবৃত করা যাক। ৪টা অক্টোবর, ১৯৫৭—মহাকাশ-বিজ্ঞানে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনে রুশ বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম ভূতল থেকে রকেটের সাহায্যে ঊর্ধ্ব আকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরই নাম স্পুটনিক-১ (Sputnik I)। পরের মাসে রুশ বিজ্ঞানীরা যে আরও একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে পাঠিয়েছিলেন, তার নাম স্পুটনিক-২ (Sputnik II)। এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে লাইকা (Laika) নামে একটি কুকুরকে পাঠানো হয়—ঊর্ধ্ব আকাশে শারীরবৃত্তের উপর ভারহীনতার প্রভাব ইত্যাদি পরীক্ষার জন্যে। কৃত্রিম উপগ্রহের প্রকোষ্ঠে নানা রকম যন্ত্রপাতি—যেমন স্বয়ংক্রিয় বেতার-তরঙ্গের প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র, তাপমান ও বায়ুর

চাপমান যন্ত্র, রঞ্জেন-রশ্মি ও ব্যোম-রশ্মি প্রভৃতির তীব্রতা-পরিমাপক যন্ত্র, আলফা-কণা, প্রোটন ও বিটা-কণা (বা ইলেকট্রন) প্রভৃতি পদার্থের প্রাথমিক বিদ্যুৎ-কণাগুলির সংখ্যা-নির্ণয়ক গণনা-যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় সাধারণ ও দূরেক্ষণ-ক্যামেরা ইত্যাদি বহন করবার ব্যবস্থা করা হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এই সব যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর পরিমণ্ডলের বহিঃস্থ মহাকাশ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ পড়ে। কিন্তু আবার যখন ঐ উচ্চতা থেকে নীচে নেমে আসে, গণনা-যন্ত্র তখন আবার সুষ্ঠুভাবে কাজ করে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, ১০০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে বিদ্যুৎ-কণিকার তীব্রতা এত বেশী যে, গণনা-যন্ত্রের কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যায়। অধ্যাপক ভ্যান অ্যালেনের বীক্ষণাগারে এই নিয়ে গবেষণা চলে এবং বিদ্যুৎ-কণিকার তেজ তীব্র হলেও গণনা-যন্ত্র যাতে ঠিকভাবে কাজ করে, তার ব্যবস্থা করা হয়। পরে আমেরিকার
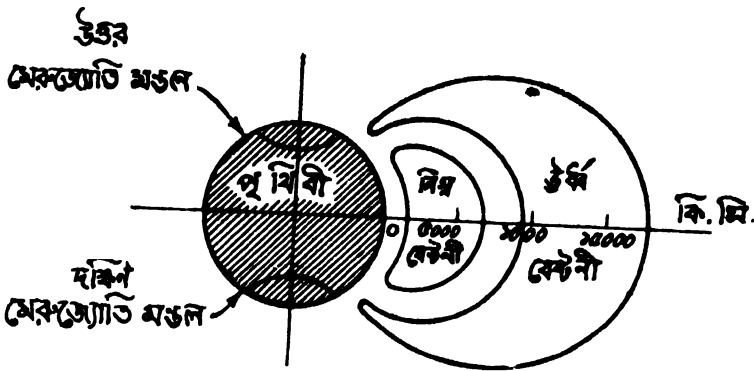
১নং চিত্র

পৃথিবীর চারদিকে বিদ্যুৎ-কণায় পূর্ণ বেষ্টনী দুটির অঙ্গ-সংস্থান বেষ্টনীর 'শৃঙ্গ'-দুটি দ্রষ্টব্য।

হয়েছে। স্পুটনিক-২ যে উপবৃত্তের পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেছিল, পৃথিবীর অক্ষরেখা থেকে তার অক্ষের আনতি ছিল ৬৫°। কৃত্রিম উপগ্রহটির কক্ষ-পথের অপভূ (Apogee) ও অনুভূ (Perigee) পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে যথাক্রমে ১৬৭১ ও ২২৬ কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থিত। বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা-নিরূপক গণনা-যন্ত্র থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে যে সব তথ্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিল, তাথেকে ভূপৃষ্ঠের বহু উর্ধ্বে তীব্র শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা যে এক্সপ্লোরার—১ এবং ৩ (Explorers I and III) পৃথিবীর চারদিকে পাঠিয়েছিলেন—গণনা-যন্ত্র ১০০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে অচল হয়ে

এক্সপ্লোরার—৪ (Explorer IV) পৃথিবীর চারদিকে যখন পাঠানো হয়, তখন এর ভিতর ভ্যান অ্যালেনের তত্ত্বাবধানে নির্মিত গণনা-যন্ত্রটি বসানো হয়। এই ভাবে আবার বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনীর সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্সপ্লোরার—৪ থেকে বিদ্যুৎ-কণিকার যে গণনার হার পৃথিবীতে প্রেরিত হয়, তা বিশ্লেষণ করে একটি নতুন তথ্য জানা যায়। সমান গণনা-হারের রেখাগুলি টানা হলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এই রেখাগুলি পৃথিবীর চৌম্বক বলের রেখাগুলিকে অনুসরণ করে। রাশিয়ার স্পুটনিক-৩ (Sputnik III) থেকে প্রেরিত বিদ্যুৎ-কণিকার গণনার হারই বিদ্যুৎ-কণিকায় পূর্ণ দুটি বেষ্টনীর অস্তিত্ব

সর্বপ্রথম প্রমাণিত করে। ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮, আমেরিকার পাইওনিয়ার—৩ (Pioneer III) পৃথিবীর চারদিকে চালিত করা হয়। এর উপবৃত্ত-কক্ষের অপভূ ছিল ১০৭০০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থিত। পাইওনিয়ার—৩ চন্দ্রের নিকটবর্তী হলে চন্দ্র-পৃষ্ঠের ছবি নেওয়া সম্ভব হয়—তাছাড়া তীব্র শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকার সংখ্যা-নিরূপণের উপযোগী গণনা-যন্ত্রের সাহায্যে উর্ধ্বে ওঠবার সময় এক বার ও নীচে নামবার সময় আরেক বার ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী দুটির অস্তিত্ব নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে প্রমাণিত হয়। এর পরে রাশিয়া থেকে ১৯৫৯ সনের ২রা জানুয়ারী যে লুনিক-১ (Lunik I) পৃথিবীর চারদিকে পাঠানো হয়—তাথেকে বিদ্যুৎ-কণিকার পূর্ণ বেষ্টনী দুটির অস্তিত্বের সমর্থন পাওয়া যায়।*

* ১৯৬২ সনের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার এক্সপ্লোরার—১২ (Explorer XII) থেকে গৃহীত তথ্য থেকে কিন্তু দুটি বেষ্টনীর পরিবর্তে একটি বৃহত্তর ও বিস্তৃততর বেষ্টনীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী দুটির অঙ্গ-সংস্থান

ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যতলে (Geomagnetic meridian plane-এ) যদি বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনী দুটির প্রস্থচ্ছেদ কাটা যায়, তবে এদের অনেকটা অর্ধচন্দ্রাকারে দেখা যাবে। ১নং চিত্রে পৃথিবীর ও বেষ্টনী দুটির প্রস্থচ্ছেদ এবং সেই সঙ্গে ভূচৌম্বক বলের রেখাগুলি প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বিদ্যুৎ-কণিকার নিম্ন ও উর্ধ্ব বেষ্টনীর মধ্যস্থল ভূপৃষ্ঠ থেকে যথাক্রমে আনুমানিক ৪০০০ কিলোমিটার ও ১৩০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং এদের প্রত্যেকটির উপরে ও নীচে দুটি 'শৃঙ্গ' বর্তমান—যা পৃথিবীর মেরুজ্যোতির্মণ্ডলের দিকে উদ্গত। আরও লক্ষ্য করা যায় যে, বেষ্টনী দুটির প্রান্ত-রেখা ভূচৌম্বক বলের সমান্তরাল, অর্থাৎ সমান গণনা-হারের রেখাগুলি ভূচৌম্বক বলকে অনুসরণ করে। চিত্রে প্রদর্শিত বেষ্টনী দুটি যদি পৃথিবীর ভূচৌম্বক অক্ষের চারদিকে আবর্তিত করা যায়, তবে বেষ্টনী দুটির ত্রৈমাত্রিক গঠন সম্বন্ধে আমরা ধারণা করতে পারি।
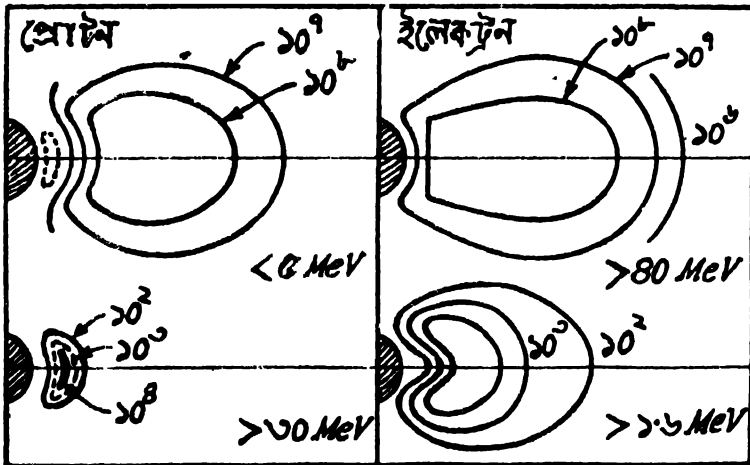
২নং চিত্র

পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন শক্তির প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমাবেশ। সমান গণনা-হারের রেখাগুলির পাশে গণনা-হারের সংখ্যা লিখিত হয়েছে।

ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী নিয়ে যখন গবেষণা আরম্ভ হয়, তখন কৃত্রিম উপগ্রহের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত গণনা-যন্ত্রে বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণিকাকে পৃথক করে জানা সম্ভব ছিল না এবং ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের কণিকাগুলিকে এক সঙ্গেই তখন গোনা হতো। মহাকাশে বিদ্যুৎ-কণিকার সমাবেশ সে জন্যে সহজ ও সরল মনে হয়েছিল। আধুনিক গণনা-যন্ত্রে বিভিন্ন শক্তির ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের কণিকাগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে গোনা হয়। দেখা গেছে যে, নিম্ন বেষ্টনীতে ধন-বিদ্যুতের কণিকা প্রোটন (Proton)-এর সংখ্যাই বেশী এবং এদের শক্তির পরিমাণ চল্লিশ MeV* অথবা তারও বেশী। ঊর্ধ্ব বেষ্টনীতে ধন-বিদ্যুৎ কণিকা প্রোটনের শক্তি সেই অনুপাতে অত্যন্ত অল্প। মহাকাশ দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিমাণ শক্তির প্রোটন-কণার সমাবেশ ২নং চিত্রের এক অর্ধে প্রদর্শিত হলো। সমান গণনা-হারের রেখাগুলির পাশে-পাশে গণনার হারগুলি লেখা

উত্তর

দক্ষিণ
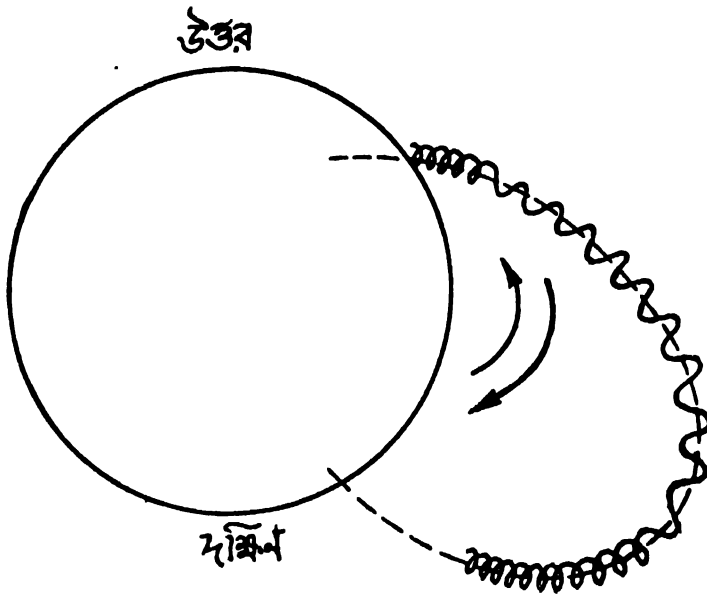
৩নং চিত্র

ভূচৌম্বক বলকে অক্ষ করে বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি 'স্ক্রু'-এর প্যাঁচের মত ঘোরানো পথে চলতে থাকে। বিষুব রেখার কাছে প্যাঁচানো পথের পরস্পর পাশাপাশি পাকের ব্যবধান খুব বেশী এবং মেরু অঞ্চলের নিকট খুবই কম। এই প্যাঁচানো পথের দুই প্রান্ত থেকে বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি প্রতিফলিত হয় বলে তাদের গতি বার বার দিক পরিবর্তন করে। শর-চিহ্নের দ্বারা এই প্রতিফলন সূচিত করা হয়েছে।

*এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক বিভবের প্রভাবে ইলেকট্রন যে চলৎ-শক্তি লাভ করে—তাকেই বলা হয় ১ ইলেকট্রন-ভোল্ট (eV)। দশ লক্ষ বা এক মিলিয়ন (Million) ইলেকট্রন ভোল্টের সাংকেতিক নাম এক MeV। ১ MeV $=১\cdot৬\times১০^{-৬}$ আর্গ (erg)।

হয়েছে। প্রোটনের ক্ষেত্রে নিম্ন ও উর্ধ্ব বেষ্টনী পৃথকভাবেই পরিস্ফুট। এই চিত্রের অন্য অর্ধে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন শক্তির ইলেকট্রনের সমাবেশ দেখানো হয়েছে। ইলেকট্রনের সমাবেশ থেকে নিম্ন ও উর্ধ্ব বেষ্টনীর পৃথক সত্তা নির্ধারণ করা যায় না।

ভূচৌম্বক বলের প্রভাবে বিদ্যুৎ-কণিকার গতিবিধি

মহাকাশে স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ-কণিকা এলো কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যদি ধরে নেই—মহাকাশের বিশেষ বিশেষ অংশে বিভিন্ন পরিমাণ শক্তির বিদ্যুৎ-কণিকা বর্তমান, তাহলে ভূচৌম্বক বলের প্রভাবে বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির গতি-পথ কি রকম হবে, সে কথার আলোচনা সাধারণভাবে করা যেতে পারে। মনে করা যাক, ভূচৌম্বক বলের ক্ষেত্রে কোনও এক স্থলে একটি গতিশীল বিদ্যুৎ-কণিকা তির্যকভাবে ছুটে চলেছে। চুম্বকত্ব ও বিদ্যুৎ-কণার গতিবিজ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, এই বিদ্যুৎ-কণাটি ঐ স্থলের ভূচৌম্বক বল-রেখাকে অক্ষ করে 'স্ক্রু'-এর প্যাঁচের মত ঘোরানো পথে চলতে থাকবে। বিজ্ঞানী আল্‌ফ্‌ফেন (Alfven) দেখিয়েছিলেন যে, এই প্যাঁচানো পথে পাশাপাশি দুটি পাকের ব্যবধান বিদ্যুৎ-কণার গতি-বেগ ও ভূচৌম্বক বলের উপর নির্ভর করে। তাঁর সিদ্ধান্ত অনুসারে বিদ্যুৎ-কণার গতি-বেগ সমান ধরে নিলে বিষুব রেখার অঞ্চল—ভূচৌম্বক বল যেখানে সর্বাপেক্ষা কম, বিদ্যুৎ-কণার প্যাঁচানো পথের পাশাপাশি দুটি পাকের ব্যবধান সেখানে সবচেয়ে বেশী। আবার মেরু অঞ্চলে যেখানে ভূচৌম্বক বল অনেক বেশী, বিদ্যুৎ-কণার প্যাঁচানো পথে পর-পর দুটি পাকের ব্যবধান সেখানে অত্যন্ত কম। ৩নং চিত্রে ভূচৌম্বক বলের রেখাকে অক্ষ করে বিদ্যুৎ-কণাগুলির প্যাঁচানো পথটি দেখানো হয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বিদ্যুৎ-কণাগুলি ভূচৌম্বক বল-রেখার উপর তির্যকভাবে যখন আসে, তখন এদের গতি-বেগের এক উপাংশ ভূচৌম্বক বলের দিকে লম্বালম্বিভাবে এবং অন্য উপাংশ অনুপ্রস্থভাবে বিশ্লিষ্ট করা যেতে পারে। শেষোক্ত অনুপ্রস্থ গতি বিদ্যুৎ-কণাগুলিকে চক্রাকারে ঘোরায়, আর যে উপাংশ ভূচৌম্বক বলের লম্বালম্বিভাবে কাজ করে, তা ঐ দিকেই এদের টেনে নিয়ে যায়। এই দুয়ের সংযুক্ত ক্রিয়ার ফলেই বিদ্যুৎ-কণাগুলি প্যাঁচানো পথে চালিত হয়। প্যাঁচানো পথের দুই প্রান্ত থেকে প্রতিফলনের ফলে ভূচৌম্বক বলের লম্বালম্বি গতি বার বার দিক পরিবর্তন করে। একেই বলা হয় ভূচৌম্বক বলের দিকে বিদ্যুৎ-কণাগুলির ইতস্ততঃ গতি। ৩নং চিত্রে শর-চিহ্নের দ্বারা ইতস্ততঃ গতি প্রদর্শিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ-কণাগুলির আরও দুটি গতির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; যথা—(১) উর্ধ্বাধঃ গতি ও (২) পূর্ব-পশ্চিম দিকে দ্রাঘিমার বরাবর একটি গতি। পৃথিবী ঠিক দ্বি-মেরু বিশিষ্ট আদর্শ চুম্বক নয়—ভূচৌম্বক ক্ষেত্রে সে জন্যে অসমতা দৃষ্ট হয়। এই অসমতার জন্যেই উল্লিখিত দুটি গতি সম্ভব বলে মনে করা যায়।

ভূচৌম্বক বলের প্রভাবে বিদ্যুৎ-কণার অবরোধ বা ফাঁদে পড়া

বিভিন্ন শক্তির বিদ্যুৎ-কণিকাগুলিকে ভূ-চৌম্বক বল নির্দিষ্ট প্যাঁচানো পথে চালিত করে—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ তীব্র শক্তিসম্পন্ন প্রোটন ও ইলেকট্রন ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী দুটির মধ্যে আবদ্ধ হলো কি করে? এই প্রশ্নের উত্তর দু-জন নরওয়েবাসী

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী কে. বার্কল্যাণ্ড (K. Birkeland) এবং কার্ল স্টোর্মার (Carl Störmer)-এর বহু বছর আগেকার এক তত্ত্বীয় গবেষণার অবতারণা করা যেতে পারে। ১৮৯৬ সনে তাঁরা প্রমাণ করেছিলেন যে, যদি পৃথিবীকে একটি আদর্শ দ্বি-মেরু-বিশিষ্ট চৌম্বক মনে করা যায়, তবে পৃথিবীর চারদিকে 'নিষিদ্ধ' ও 'অনুমোদিত'
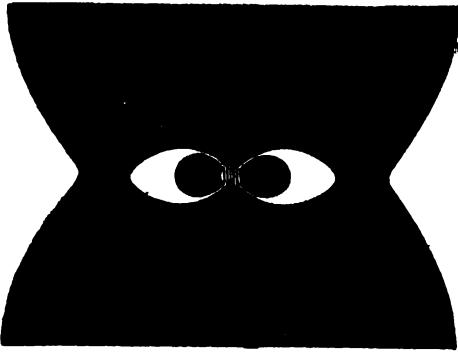
৪নং চিত্র

বার্কল্যাণ্ড (Birkeland) ও স্টোর্মার (Störmer)-এর তত্ত্ব অনুসারে পৃথিবীর চারদিকে ভূ-চৌম্বক বলের প্রভাবে 'নিষিদ্ধ' ও 'অনুমোদিত' স্থান গঠিত হয়। এক বিশেষ অবস্থায় যে 'নিষিদ্ধ ও 'অনুমোদিত' স্থানের সৃষ্টি হয়, পৃথিবীর চারদিকে তাদের পরিস্থিতি চিত্রে প্রদর্শিত হ'য়েছে। 'নিষিদ্ধ' স্থান কৃষ্ণ বর্ণে এবং 'অনুমোদিত' স্থান সাদা রঙে আঁকা হয়েছে।

স্থান গঠিত হওয়া সম্ভব। এই দুই বিজ্ঞানীর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত অনুসারে এক বিশেষ অবস্থায় ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যতলে পৃথিবীর চারদিকে যে 'নিষিদ্ধ' ও 'অনুমোদিত' স্থান গঠিত হয়—তা ৪নং চিত্রে প্রদর্শিত হলো। এই চিত্রে 'অনুমোদিত' স্থানগুলি সাদা রঙে ও 'নিষিদ্ধ' স্থানগুলি কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত। অনুমান করা যেতে পারে, সূর্য থেকে ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের কণা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে এবং কোনও অজানা উপায়ে 'নিষিদ্ধ' স্থানগুলি পেরিয়ে 'অনুমোদিত' স্থানে এসে পৌঁছায়। মনে হয় 'অনুমোদিত' স্থানে এসেই বিদ্যুৎ-কণাগুলি যেন ফাঁদে পড়ে যায়। বিদ্যুৎ-কণায় পূর্ণ 'অনুমোদিত' স্থানই যে, ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী, এরূপ পরিকল্পনা অযৌক্তিক নয়। চিত্রে প্রদর্শিত 'অনুমোদিত' স্থানের 'শৃঙ্গ' দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যুতের কণাগুলি এই শৃঙ্গের ভিতর দিয়ে মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং ঐ অঞ্চলে মেরুজ্যোতির সৃষ্টি করে।

'টেরেলা' (Terrella) নিয়ে বার্কল্যাণ্ডের পরীক্ষা

'অনুমোদিত' ও 'নিষিদ্ধ' স্থানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে দেখবার জন্যে ১৮৯৬ সনে বার্কল্যাণ্ড তাঁর বীক্ষণাগারে এক পরীক্ষা করেছিলেন। একটি বৃহৎ আয়তনের বায়ুশূন্য কাচের আধারের
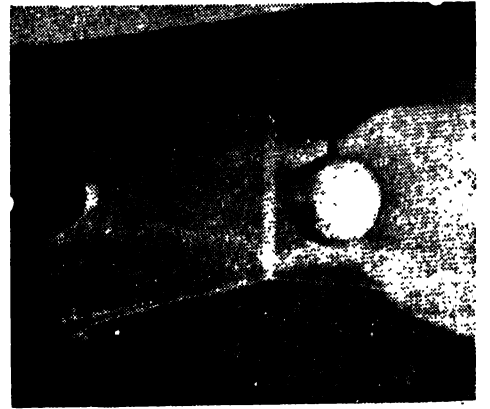
৫নং চিত্র

'টেরেলা' (Terrella) নিয়ে বার্কল্যাণ্ডের পরীক্ষা। চুম্বক-গোলকের চারদিকে নাতি-অন্ধকার 'নিষিদ্ধ' স্থান এবং তার চারদিকে অত্যুজ্জ্বল 'অনুমোদিত' স্থান আলোক-চিত্রে ধরা পড়েছে। 'অনুমোদিত' স্থানের 'শৃঙ্গ'-দুটি দ্রষ্টব্য।

মাঝখানে একটি লোহার গোলক চৌম্বকধর্মী করে তিনি ঝুলিয়ে রাখেন। গোলকটিকে তিনি টেরেলা নাম দিয়েছিলেন। এই বায়ুশূন্য আধারে ক্যাথোড-রশ্মি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় এবং 'টেরেলা' গোলকটির উপর ক্যাথোড-রশ্মি ফেলা হয়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, 'টেরেলার' চারদিকে নাতিঅন্ধকার মণ্ডল বা 'নিষিদ্ধ' স্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং তার চারদিকে অত্যুজ্জ্বল 'অনুমোদিত' মণ্ডল গঠিত হয়েছে। ক্যাথোড-রশ্মির ইলেকট্রন-গুলি এই 'অনুমোদিত' মণ্ডলটি অধিকার করে সেখানেই যেন আট্‌কা পড়ে যায়! ৫নং চিত্রে টেরেলার চারদিকে 'নিষিদ্ধ' ও 'অনুমোদিত' মণ্ডলের ফটোগ্রাফ দেওয়া গেল। 'অনুমোদিত' মণ্ডলের প্রস্থচ্ছেদে 'শৃঙ্গ' দুটি ছবিতে বেশ স্পষ্ট।

কৃত্রিম উপায়ে ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনীর সৃষ্টি

১৯৫৮ সনে বিজ্ঞানী কৃষ্টফোলোস (Christo-folos)-এর প্রস্তাবে ভূচৌম্বক বলের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ-কণাগুলির ফাঁদে পড়া বা অবরুদ্ধ হবার ফলে ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনীর সৃষ্টি সম্পর্কে পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ করে এক বিরাট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। একেই আর্গাস (Argus) পরিকল্পনা বলা হয়। দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে ফক্‌ল্যাণ্ড (Folkland) দ্বীপপুঞ্জের কাছে রকেটে করে ৪০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে একটি সাধারণ পরমাণু-বোমা নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সেটির বিস্ফোরণ করা হয়। ১৯৫৮ সনের ২৭শে ও ৩০শে অগাষ্ট ও ৬ই সেপ্টেম্বর এই তিন দিন পরীক্ষাটি করা হয়েছিল। এই তিন দিনই বোমা-বিস্ফোরণের সময় ফিসন (Fission) প্রক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন প্রচুর ইলেকট্রন ভূচৌম্বক বলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং বিদ্যুৎ-কণার এক বিরাট বেষ্টনী সৃষ্টি করে। আমেরিকার এক্সপ্লোরার—৪ এবং কতকগুলি রকেটবাহিত গণনা-যন্ত্রে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই বেষ্টনী স্থায়ী হয় নি। উত্তর গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে জনসন (Johnson) দ্বীপের উপরেও এই সময় পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ করা হয়। এখানেও বিদ্যুৎ-কণিকার বিস্তৃত বেষ্টনীর প্রমাণ পাওয়া যায়। মেরু অঞ্চলে মেরু-জ্যোতির সৃষ্টি এবং অন্যান্য ফলাফলও পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণের সময় দেখা গিয়েছিল।

১৯৬২ সনের ৯ই জুলাই প্রশান্ত মহাসাগরে জনসন দ্বীপের ৪০০ কিলোমিটার উর্ধ্বে প্রায় দেড় মেগাটন্ (Megaton)-এর হাইড্রোজেন-বোমা রকেটে করে নিয়ে গিয়ে তার বিস্ফোরণ করা হয়। একেই ষ্টারফিশ্ (Starfish) পরীক্ষা বলা হয়েছে। এই বিস্ফোরণের ফলে ভূচৌম্বক বলের ক্ষেত্রে যে বিদ্যুৎ-কণিকার সুদূরপ্রসারী বেষ্টনী গঠিত হয়, সে সম্বন্ধে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ এরিয়েল (Aerial) বাহিত সূক্ষ্ম গণনা-যন্ত্রের সাহায্যে বিস্তারিত গবেষণা ও বিশ্লেষণ করা হয়। ঐ বছরেই কয়েক মাস পরে টেলষ্টার (Telstar) বাহিত এক বিশেষ গণনা-যন্ত্রে বিদ্যুৎ-কণিকার বেষ্টনীতে ০.২ MeV থেকে আরম্ভ করে ১ MeV শক্তির ইলেকট্রনের সন্ধান পাওয়া যায়। আমেরিকার এক্সপ্লোরার—১৫ থেকে এই সময় উর্ধ্বে আকাশে প্রায় ০.১ Mev ও তার চেয়েও বেশী শক্তির ইলেকট্রনের সমাবেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা গিয়েছে। প্রোটন-কণাসমূহের সমাবেশ এবং তাদের শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য তথ্য আমরা পেয়েছি।

ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনীদ্বয়ে বিদ্যুৎ-কণিকার উৎপত্তি

উর্ধ্ব বেষ্টনী :—অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের মতে, উর্ধ্ব বেষ্টনীতে যে ধন-বিদ্যুৎ ও ঋণ-বিদ্যুতের কণিকাগুলি অবস্থান করে, তারা সূর্য থেকেই আসে। সূর্য সময় সময় শান্ত অবস্থায় থাকে, আবার সময় সময় তাকে বিক্ষুব্ধ অবস্থায় দেখা

যায়। বিক্ষুব্ধ অবস্থায় সূর্য-দেহে বহুবিধ বিক্ষেপের সঞ্চার হয় এবং তা থেকে নানা রকম বিকিরণ নির্গত হয়। আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ পাইওনিয়ার—৩ যখন ছাড়া হয়, তখন সূর্য ছিল শান্ত। আবার পাইওনিয়ার—৪ যখন উৎক্ষিপ্ত হয়, সূর্যে তখন প্রবল বিক্ষোভ। পাইওনিয়ার—৪ থেকে ঊর্ধ্ব বেষ্টনীর অন্তর্গত বিদ্যুৎ-কণিকার যে তীব্রতা পাওয়া যায়, পাইওনিয়ার—৩ থেকে পাওয়া তীব্রতার চেয়ে তা অনেক গুণ বেশী। এথেকেই অনেক বিজ্ঞানী সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্য থেকেই বিদ্যুৎ-কণা ঊর্ধ্ব বেষ্টনীতে গিয়ে জড়ো হয়। কি করে সৌর বিদ্যুৎ-কণা ঊর্ধ্ব বেষ্টনীতে সন্নিবিষ্ট হয়, তা এখনও রহস্যপূর্ণ। বিজ্ঞানী গোল্ড্ (Gold) অনুমান করেন, গতিশীল সৌরবিদ্যুৎ-কণিকা যে চৌম্বক বলের সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে ভূচৌম্বক বলের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই ভূচৌম্বক বলে অসমতার সৃষ্টি হয়। ভূচৌম্বক বলের অসমতার জন্যেই হয়তো সূর্য থেকে বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি 'নিষিদ্ধ' স্থান অতিক্রম করে 'অনুমোদিত' স্থানে এসে জড় হয়।

ঊর্ধ্ব বেষ্টনীতে যে বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি সন্নিবিষ্ট, সেগুলি সূর্য থেকেই উৎসারিত হয়—এই মতবাদের স্বপক্ষে অন্য যুক্তিও আছে।

নিম্ন বেষ্টনী :—নিম্ন বেষ্টনীর অন্তর্বর্তী বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির উৎপত্তির প্রধান কারণ সৌর বিদ্যুৎ-কণা নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর নিকটবর্তী বেষ্টনীতে বিদ্যুৎ-কণিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে উৎপন্ন হয়। ব্যোম-রশ্মির বিদ্যুৎ-কণিকাগুলি ঊর্ধ্ব আকাশে বায়ুর সঙ্গে যখন সংঘর্ষে আসে, তখন বায়ুর প্রধান উপাদানগুলির পরমাণু ভেঙ্গে যায়। ফলে পরমাণুর কেন্দ্রীন থেকে বিদ্যুৎ-কণাসমূহ ও বিদ্যুৎহীন নিউট্রন কণাগুলি পাওয়া যায়। কতকগুলি নিউট্রন-কণা যখন ঊর্ধ্বে ছুটে যায়, তখন নিউট্রন-ক্ষয় (Decay) প্রক্রিয়ায় প্রোটন ও ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুৎ-কণিকাগুলিই ভূ-চৌম্বক বলের প্রভাবে নিম্ন বেষ্টনীতে সন্নিবিষ্ট হয়ে থাকে। এই তত্ত্বটির সঙ্গে নিম্ন বেষ্টনীতে প্রোটন-কণা সমাবেশের সুসঙ্গতি দেখা যায়, কিন্তু এই বেষ্টনীর ইলেকট্রন সমাবেশের সামঞ্জস্য খুবই কম। কোনও কোনও বিজ্ঞানী মনে করেন যে নিউট্রন-ক্ষয়ে যে ইলেকট্রনের সৃষ্টি হয়—তা যথেষ্ট নয়। নিম্ন বেষ্টনীর কিছু ইলেকট্রন হয়তো সূর্য থেকেই এসে থাকে।

উপসংহার

ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনী সম্বন্ধে এখনও শেষ সিদ্ধান্ত হয় নি। ঊর্ধ্ব আকাশে বিভিন্ন শক্তির প্রোটন-কণার সমাবেশ যদি বিচার করা যায়, তবে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উভয় বেষ্টনীরই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন শক্তির ইলেকট্রনের সমাবেশ থেকে বেষ্টনী দুটি পৃথকভাবে জানা যায় না। ১৯৬২ সনে আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার—১২ তার গণনা-যন্ত্র থেকে যে সব তথ্য প্রেরণ করেছিল, তা থেকে দুটি বেষ্টনীর পরিবর্তে মাত্র একটি সুবৃহৎ বেষ্টনীর সন্ধান পাওয়া যায়। এর কারণ কি, তার মীমাংসা এখনও হয় নি। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে আকাশ-বিজ্ঞানীদের সংযুক্ত গবেষণার ফলে ভ্যান অ্যালেন বেষ্টনীর অনেক জটিল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

বায়ুমণ্ডলের গবেষণায় কৃত্রিম উপগ্রহ

শান্তিময় বসু

১৯৫৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখটা সকলের কাছেই স্মরণীয় হয়ে রয়েছে—এই দিন রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম পৃথিবীর একটি নকল চাঁদ বা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করে মানুষের সুদূর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন। সাধারণ মানুষের কাছে এই ধরণের উপগ্রহ সৃষ্টিটুকুই চাঞ্চল্যকর, কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে কৃত্রিম উপগ্রহ এনে দিল নানা ধরণের গবেষণা করবার বিরাট সম্ভাবনা। পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির উপর নানা ধরণের যন্ত্র বসিয়ে সরাসরিভাবে পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করবার সম্ভবনায় বিজ্ঞানীরা হয়ে ওঠলেন অধীর। তাই আজ দশ বছর পরেও বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছেন এবং নানা ধরণের চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করছেন। পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর গবেষণা করা ছাড়াও দূরপাল্লার সংবাদ আদান-প্রদান করবার জন্যেও কৃত্রিম উপগ্রহকে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহের এই অবদানটুকু পরবর্তী প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হবে। তাছাড়া উপগ্রহগুলিকে গুপ্তচরের ভূমিকায়ও লিপ্ত করা হয়েছে—বৈরীদেশ সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করে পৃথিবীর উপরিভাগের বেতার-তরঙ্গের আদেশ অনুযায়ী উপগ্রহগুলি সেই তথ্য প্রকাশ করছে।

বহির্বিশ্বের খবরাখবর উপগ্রহ সৃষ্টির আগে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এইভাবে বিজ্ঞানীরা তাঁদের প্রখর চিন্তাধারা এবং অভিনব যন্ত্রের মাধ্যমে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রগুলির বর্ণালী-বিশ্লেষণ ও তারপর অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার বিখ্যাত তাপ-আয়নন সমীকরণের (Saha Ionization Formula) সাহায্যে নির্ণয় করেছেন সুদূর নক্ষত্রের তাপমাত্রা। কিন্তু বহির্বিশ্বের সকল তথ্য পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে আহরণ করা যায় না। যেমন উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের উপাদান, তাপমাত্রা ও তড়িৎ-কণার ঘনত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলি ছিল বিজ্ঞানীর অজানা। এছাড়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কয়েকটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য শোষণ করে বলে সেই সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে নভোমণ্ডলের রূপ কি, তাও ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীর অজানা। এই অজানা রাজ্যকে বিজ্ঞানীর কাছে উদ্ভাসিত করবার জন্যে সৃষ্টি হলো কৃত্রিম উপগ্রহ।

পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বায়ুমণ্ডল সুরু হয়, একথা সকলের কাছেই সুবিদিত। কিন্তু এই বায়ুমণ্ডলের শেষ কোথায়, তা হলো এক জটিল প্রশ্ন। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই শেষ সীমানা হলো সেইখানে, যার ঠিক নীচে বায়ুর উপাদানগুলির গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র এবং যার উপরের উপাদান গ্রহান্তর চুম্বক ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সীমানাকে বলা হয় চৌম্বক ক্ষেত্রের সীমানা (Magnetosphere Boundary)। দিনের বেলায় এর উচ্চতা হলো প্রায় ৫৬,০০০ কিলোমিটার এবং রাত্রিকালে এর উচ্চতা হয় প্রায় ২,৪০,০০০ কিলোমিটার। এই সুদূরবিস্তৃত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নিয়তই নানা ধরণের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে চলেছে। এই প্রক্রিয়াগুলির পিছনে রয়েছে

বায়ুর বিভিন্ন উপাদান, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র, সূর্য থেকে উৎসারিত বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মি ও বিভিন্ন শক্তির তড়িৎ-কণা এবং সর্বশেষে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র। মোটামুটিভাবে বায়ুর হাল্কা ধরণের উপাদানগুলি থাকে উঁচুতে এবং ভারী ধরণের উপাদান নীচে। বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন উপাদান ও বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সূর্যরশ্মি জটিল সংঘটন সৃষ্টি করে। এর ফলে অণুগুলি যায় ভেঙ্গে এবং সৃষ্টি হয় ইলেকট্রন এবং আয়নিত অণু-পরমাণুর। প্রায় ১০০০ কিলো-মিটার উচ্চতার উপরে বিশেষ কম্পনাঙ্কের সূর্যরশ্মির শক্তি বেশী থাকবার জন্যে প্রায় সবগুলি অণুই ভেঙ্গে যায়, ফলে তড়িৎশূন্য অণু প্রায় থাকেই না। বায়ুমণ্ডলের নীচের দিকে বিশেষ কম্পনাঙ্কের সূর্যরশ্মিগুলি উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে শোষিত হওয়ায় এদের শক্তিমাত্রা হ্রাস পায় ও তার ফলে প্রায় ১০০ কিলোমিটারের কাছে অনেকগুলি অণুই তড়িৎবিহীন অবস্থায় থাকে। ১০০ কিলোমিটার উচ্চতার নীচের বায়ুমণ্ডল প্রায় তড়িৎবিহীন (Neutral Atmosphere)। ১০০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে তড়িৎ-কণা উপস্থিত থাকবার জন্যে বায়ু-মণ্ডলের এই অংশকে বলা হয় আয়নমণ্ডল। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে ইলেকট্রন, আয়ন এবং সমষ্টিগত ঘনত্ব নির্ধারিত করে সূর্যরশ্মি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র এবং কিয়দংশে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র।

উপগ্রহের সাহায্যে উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব নির্ণয়

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে কি ধরণের সমষ্টিগত ঘনত্ব (Mass density) আছে, তা নির্ধারণ করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিয়েছেন। মোটামুটিভাবে জানা আছে যে, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ যদি বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে এক স্থায়ী কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে, তাহলে উপগ্রহটির উপর মাধ্যাকর্ষণ এবং কেন্দ্রবিচ্যুতি বলের মাত্রা সমান হবে। ১নং চিত্রে উপগ্রহ উ পৃথিবী প কে (R+h) ব্যাসার্ধের বৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করছে। সুতরাং উপগ্রহটির ভর যদি m এবং
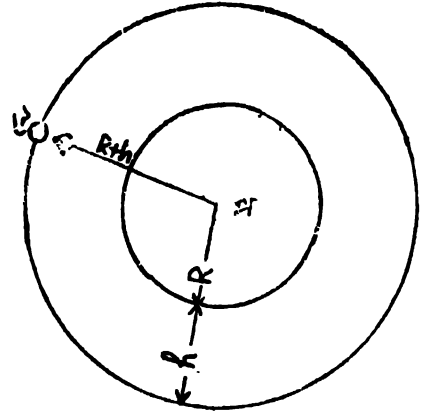
১নং চিত্র

গতিবেগ v হয়, তাহলে উপরিউক্ত কক্ষপথে কেন্দ্রবিচ্যুতি বলের (C) পরিমাণ হলো

$$C=\frac{m v^2}{(R+h)} \quad \cdots(১)$$

পরন্তু নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অনুযায়ী ওই উপগ্রহটির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের (F) পরিমাণ হলো

$$F=\frac{G\,Mm}{(R+h)^2} \quad \cdots(২)$$

যেখানে M হলো পৃথিবীর ভর এবং G মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবক। স্থায়ী কক্ষপথ হলে সমীকরণ (১) ও (২) পরস্পর সমান। সুতরাং

$$\frac{m v^2}{R+h}=\frac{G\,Mm}{(R+h)^2} \quad \cdots(৩)$$

$$v=\left(\frac{G\,M}{R+h}\right)^{\frac{1}{2}} \quad \cdots(৪)$$

উপরিউক্ত সমীকরণ (৪) উপস্থাপিত করবার সময় আমরা ধরেছি যে, কক্ষপথটি শূন্যস্থানে অবস্থিত। কিন্তু কক্ষপথে যদি বায়ু উপস্থিত থাকে, তাহলে

উপগ্রহটির গতিবেগের বিপরীত দিকে বায়ুর ঘর্ষণ-জনিত এক বলের সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপগ্রহের যে গতিবেগ আছে, বায়ুর উপস্থিতিতে সেই গতিবেগের মাত্রা পরিবর্তিত হয় ও এক অবত্বরণের (Deceleration) সৃষ্টি হয়। এর ফলে বায়ুর উপস্থিতিতে উপগ্রহের গতিবেগ কমে যায় এবং সমীকরণ (৩)-এ মাধ্যাকর্ষণ বল বেশী হওয়ায় উপগ্রহটি নীচে নামতে থাকবে। এখন বায়ুর ঘর্ষণজনিত বল উপগ্রহের গতিবেগ এবং বায়ুর ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রতি প্রদক্ষিণে উপগ্রহটির উচ্চতা নির্ণয় করে বায়ুর ঘনত্বের পরিমাপ করা যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, এই ধরণের উচ্চতায় বায়ুর ঘনত্ব এত কম যে, উপগ্রহটির উচ্চতা অত্যন্ত ধীরে ধীরে কমবে।

আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ণয়

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের এক বিশেষ অংশ হলো আয়নমণ্ডল। এর বিস্তৃতি প্রায় ১০০ কিলোমিটার থেকে ১০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এবং এর বিভিন্ন উচ্চতায় ইলেকট্রন, আয়ন ও তড়িৎশূন্য অণুর ঘনত্ব বিভিন্ন। অনেকেরই জানা আছে যে, মহাশূন্যের প্রতিসরক ক্ষমতার মান (Refractive Index) হলো এক। কিন্তু আয়নমণ্ডলে ইলেক-ট্রণের উপস্থিতিতে প্রতিসরক ক্ষমতা একের চেয়ে কম হয়ে যায়। দেখানো যায় যে, f কম্পনাঙ্কের তরঙ্গের কাছে আয়নমণ্ডলের প্রতিসরক ক্ষমতা μ হয়—

$$\mu = \left[1 - \frac{Ne^2}{4\pi^2 m\, \epsilon_0 f^2}\right]^{\frac{1}{2}} \quad \cdots (৫)$$

যেখানে N—ইলেকট্রনের ঘনত্ব/(মিটার)^৩, e, m — যথাক্রমে ইলেকট্রনের তড়িৎ-মাত্রা (= ১.৫৯ × ১০$^{-১৯}$ কুলোম্ব) ও ভর (= ৯ × ১০$^{-৩১}$ কিলোগ্র্যাম), ϵ_0—শূন্যস্থানের ধ্রুবক $\left(= \frac{১০^{-৯}}{৩৬\pi}\right.$ ফ্যারাড / মিটার $\left.\right)$ এবং f—তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক (সাইক্লস / সেকেণ্ড)।

উপরিউক্ত সমীকরণ (৫) থেকে বোঝা যায় যে, ইলেকট্রন বিরাজিত স্থানে প্রতিসরক ক্ষমতা একের চেয়ে কম। সুতরাং ইলেকট্রনশূন্য স্থান থেকে আয়নমণ্ডলে কোনও তরঙ্গ আপতিত হলে বিজ্ঞানী স্নেলের আইন অনুযায়ী আপতন কোণের (Angle of Incidence) চেয়ে প্রতিসরণ কোণ (Angle of Refraction) বড়। প্রতিসরক ক্ষমতা কম হলে প্রতিসরণ কোণও হবে বেশী। এর ফলে μ যখন শূন্য হয় তখন প্রতিসরণের জায়গায় পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব এমন যে, বেতার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। ফলে উপরিউক্ত তরঙ্গের কাছে আয়নমণ্ডল্ একটি আয়নার কাজ করে।

সুতরাং আয়নমণ্ডলের কোন স্থান থেকে f কম্পনাঙ্ক যদি পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়, তাহলে সমীকরণ (৫) থেকে সেই স্থানের ইলেকট্রনের ঘনত্ব হবে—

$$\left[\epsilon_0 - \frac{Ne^2}{4\pi^2 m f^2}\right]^{\frac{1}{2}} = 0$$

অর্থাৎ

$$N = \frac{4\pi^2 m\, \epsilon_0 f^2}{e^2} \quad \ldots (৬)$$

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে কম কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ থেকে সুরু করে উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ পাঠাতে থাকেন। প্রতি কম্পনাঙ্কের তরঙ্গ যখন প্রতি-ফলিত হয়ে ফিরে আসে, তখন তা গ্রাহক-যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রতি কম্পনাঙ্কের যাওয়া-আসার সময় নির্ধারণ করে ওই কম্পনাঙ্ক কোন্ উচ্চতা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে, তার পরিমাপ করা যায় এবং কম্পনাঙ্ক f জানা থাকলে সমীকরণ (৬)-এর সাহায্যে সেই স্থানের ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়। এই ধরণের পরীক্ষা করে আয়নমণ্ডলের উচ্চতার সঙ্গে ইলেকট্রনের ঘনত্ব কি ভাবে পরিবর্তিত হয়, তা দেখানো হয়েছে ২নং চিত্রে। চিত্রে দেখা যায় যে, আয়নমণ্ডলে কয়েকটি

স্তর, যথা—D, E, F আছে। এখন F স্তরের ইলেকট্রন ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী এবং এই স্তরের উত্তরদিকে ঘনত্ব কমে আসে। এর ফলে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে F-স্তরের উপর থেকে কোন প্রতিফলন করা সম্ভব নয় কেন না, সেখান থেকে যে কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত আদেশ পাঠালে সংগৃহীত তথ্যগুলি উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে মাটিতে আসে। উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গে আয়নমণ্ডলের প্রতিসরক ক্ষমতা প্রায় এক অর্থাৎ আয়নমণ্ডলে এই সংবাদ আদান-প্রদানে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।
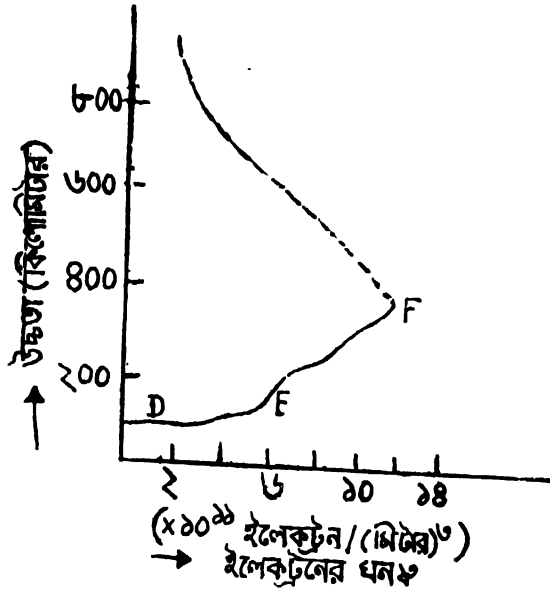
২নং চিত্র

হবে, তা F-স্তরের নীচে আগেই প্রতিফলিত হয়ে যায়।

F-স্তরের উপরের ঘনত্ব নির্ণয় করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহ অ্যালোয়েট (Alouette Satellite) সৃষ্টি করলেন। এই উপগ্রহে একটি প্রেরক-যন্ত্র স্থাপন করা হলো এবং প্রেরক-যন্ত্র থেকে বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ উৎসারিত করে F-স্তরের উপরের আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত করানো হয়। প্রতিফলিত তরঙ্গ পুনরায় উপগ্রহে অবস্থিত গ্রাহক-যন্ত্রে গ্রহণ করে উচ্চতার সঙ্গে ইলেকট্রনের ঘনত্ব F-স্তরের উপরে কিভাবে পরিবর্তিত হয়, তা লিপিবদ্ধ করা হয়। পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে পরে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে

পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে ১০০০ কিলোমিটার উচ্চতায় মোট ইলেকট্রন সংখ্যার পরিমাপ

এই ধরণের নির্ণয়কার্যে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে উচ্চ কম্পনাঙ্কের বেতার-তরঙ্গ পাঠানো হয় ও পৃথিবীতে অবস্থিত গ্রাহক-যন্ত্রের বেতার-সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করা হয়। বেতার-তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক বেশী হওয়ায় তরঙ্গগুলি আয়নমণ্ডল অনায়াসে ভেদ করে মাটিতে পৌঁছুতে পারে। এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানী ফ্যারাডের এক মৌলিক রচনা। ফ্যারাডে দেখান যে, তড়িৎ-চৌম্বক বেতার-তরঙ্গ যদি চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভাবিত ইলেকট্রন-মণ্ডলের মধ্য দিয়ে যায়, তাহলে ওই

মণ্ডল ভেদ করবার পর দেখা যাবে যে, গতিপথে উৎসারিত বেতার-তরঙ্গের সমবর্তন দিকের (Polarisation) পরিবর্তন ঘটেছে।

৩নং চিত্রে দেখানো হয়েছে উৎসারিত বেতার-তরঙ্গের সমবর্তন দিক ক খ এবং ইলেকট্রন-মণ্ডল ও চৌম্বক ক্ষেত্র ভেদ করায় সমবর্তন দিক পরিবর্তিত হয়ে ক' খ' রেখায় পর্যবসিত হয়েছে। এর কারণটিও উপরিউক্ত ছবিতে আলোচিত হয়েছে।

৩নং চিত্র

ক খ যদি সরলরৈখিক সমবর্তন হয়, তাহলে এটিকে দুটি বিপরীতমুখী (Opposite), সমবিস্তৃত (Equal amplitude) সমপর্যায় (In-phase), বৃত্তাকার সমবর্তন দিকের (Circular polarisation) সমষ্টি। চৌম্বক ক্ষেত্র প্রভাবিত ইলেকট্রন-মণ্ডলের মধ্যে ওই দুটি বিপরীতমুখী বৃত্তাকার সমবর্তন দিক সম্পন্ন তরঙ্গের গতিবেগ বিভিন্ন। তার ফলে ওই মণ্ডল ভেদ করবার পর ওই দুটি তরঙ্গের মধ্যে পর্যায়ের তফাৎ ঘটে। এখন ওই দুটি বিভিন্ন পর্যায়ের বৃত্তাকার সমবর্তন দিকের সমষ্টি করলে পাওয়া যাবে সরলরৈখিক সমবর্তন দিক ক' খ'। উৎসারিত ও গৃহীত তরঙ্গের সমবর্তন দিক ক খ ও ক' খ' এর মধ্যের কোণকে বলা হয় ফ্যারাডে ঘূর্ণন কোণ। এই ফ্যারাডে ঘূর্ণন কোণের (Ω) পরিমাপ হলো—

$$\Omega = \frac{K H_L}{f^2} N_T$$

যেখানে H_L – তরঙ্গের গতিপথে চৌম্বক ক্ষেত্রের মান, f–তরঙ্গের কম্পনাঙ্ক, K–একটি ধ্রুবক এবং N_T –পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে উপগ্রহের উচ্চতার মধ্যে একক কেন্দ্রচ্ছেদসম্পন্ন স্তম্ভে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা। উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে দেখা যায় যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের মান এবং কম্পনাঙ্ক জানা থাকলে ফ্যারাডে ঘূর্ণন কোণের পরিমাপ করে আয়নমণ্ডলে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব।

এই উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করলেন। ৪নং চিত্রে দেখানো হয়েছে যে, একটি কৃত্রিম উপগ্রহ ট স্থান থেকে 'চ ছ' সমবর্তন সম্পন্ন বেতার-তরঙ্গ উৎসারিত করছে এবং পরবর্তী অবস্থান 'ট' এ সমবর্তন দিক চ' ছ'। উপগ্রহটি এমনভাবে চালিত করা হয় যেন চ ছ ও চ' ছ' সমান্তরাল হয়, অর্থাৎ

উপগ্রহটি থেকে উৎসারিত বেতার-তরঙ্গের স্পন্দনদিক সর্বদাই একদিকে রয়েছে। ৪নং চিত্রে পৃথিবী এবং পৃথিবীর আয়নবলয়ের উপস্থিতি দেখানো হয়েছে। ট স্থানের বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে ঠ ড গতিপথ অতিক্রম করে এবং ট' স্থানের বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডলে ঠ' ড' পথ অতিক্রম করে। ঠ ড এবং ঠ' ড' বিভিন্ন হওয়ায় ফ্যারাডে ঘূর্ণনের পরিমাপ বিভিন্ন হবে। ফলে পৃথিবীর উপরিভাগে আপতিত তরঙ্গের সমবর্তন দিকের পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তন নির্ণয় করবার জন্যে পৃথিবীর উপরিভাগে 'ক খ' সরলরৈখিক সমবর্তন দিক সম্পন্ন একটি তরঙ্গ-আহরককে গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এই তরঙ্গ-আহরকের সমবর্তন দিক নির্ণয় করবার ক্ষমতা আছে, কারণ আপতিত তরঙ্গের সমবর্তন দিক যখন তরঙ্গ আহরকের সমান্তরাল তখন, আহরিত বৈদ্যুতিক চাপ হয় সবচেয়ে বেশী এবং লম্বমান হলে বৈদ্যুতিক চাপমাত্রা শূন্য হয়। সুতরাং আপতিত তরঙ্গের সমবর্তন দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আহরিত বৈদ্যুতিক চাপমাত্রা বিভিন্ন হবে এবং

৪নং চিত্র

জুলাই, ২৭, ১৯৬৬
উপগ্রহ বি-ই-বি
প্রদক্ষিণ সংখ্যা:- ৯০০২

১৩০৬·৭৫ ১৩০৭

৫নং চিত্র

এই চাপমাত্রার ওঠা-নামা গ্রাহক-যন্ত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। ৫নং চিত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ-পদার্থ গবেষণাগারে (Institute of Radio physics and Electronics) কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে গৃহীত বেতার-তরঙ্গের ফ্যারাডে ঘূর্ণনলিপি দেখানো হয়েছে। এই গ্রাহকলিপি অনুধাবন করে এবং সমীকরণ (৭)-এর সাহায্যে সমগ্র আয়নমণ্ডলে একক কেন্দ্রচ্ছেদসম্পন্ন স্তম্ভে মোট ইলেকট্রনের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। দেখা গেছে যে, কলিকাতার উপরিভাগের আয়নমণ্ডলে উপরিউক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা মধ্যাহ্নে প্রায় ৪০×১০^{১৬} / (মিটার)^{২} এবং রাত্রিকালে ১০×১০^{১৬} / (মিটার)^{২} থাকে।

রাত্রিকালে গ্রাহকলিপিতে উপরিউক্ত ফ্যারাডে ঘূর্ণনের উপর কখনও কখনও এক সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনকে বেতার-তরঙ্গের ঝিকমিকি (Scintillation of radio waves) বলা হয়। ৬নং চিত্রে উপরিউক্ত গবেষণাগারে গৃহীত এই ধরণের লিপি দেখানো হয়েছে। আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রন ঘনত্বের সূক্ষ্ম পরিবর্তনের জন্যে বেতার-তরঙ্গের অপবর্তন (Diffraction) ঘটে ও তারই ফলে উপরিউক্ত ঝিকমিকি পরিলক্ষিত হয়। এই ঝিকমিকি অনুধাবন করে আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রন ঘনত্বের সূক্ষ্ম তারতম্য সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আহরণ করা হয়েছে।

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের উপর গবেষণা ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মহাকাশ সম্বন্ধে নানা তথ্য এই কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যেই আহরণ করেছেন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কয়েকটি বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য শোষিত হবার ফলে এই সকল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে মহাকাশ সম্বন্ধে কোনও তথ্য আহরণ করা সম্ভব নয়। সেই জন্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে অবস্থিত এই কৃত্রিম উপগ্রহে ওই ধরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপন করে মহাকাশের অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটিত করছেন।

এক কথায়, মহাকাশ ও পৃথিবীর পারিপার্শ্বিকতার সঠিক রূপ উদ্‌ঘাটন করে মানুষের মহাশূন্য অভিযানের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চলেছে মানুষেরই সৃষ্টি—এই কৃত্রিম উপগ্রহ।

জুলাই ১২, ১৯৬১

সর্বভারতীয় সময়

৬নং চিত্র

বাংলা দেশের শিলাবিন্যাসে পরিবেশিক রূপান্তর

সত্যেশ চক্রবর্তী

১। সঞ্চয় পরিবেশ আধুনিক অর্থে

উত্তরে হিমালয় পাহাড় এবং পুবে-পশ্চিমে শিলং ও ছোটনাগপুর মালভূমি ছেড়ে দিলে বাংলা দেশের বেশীর ভাগ অঞ্চলই নতুন পলিতে ঢাকা। পলিমাটির আধুনিক উৎস-স্থল প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত। শুধু গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নয়, আরো বহু ছোট নদী উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে ছোটনাগপুর-মালভূমি অথবা পুবে নাগা-লুসাই পাহাড় থেকে নানান জাতের পাথর ভেঙে পলি তৈরি করে বাংলা দেশের সমতলভূমি গঠনে সাহায্য করছে। সঞ্চিত পলির গঠন-বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। মেঘনা নদীর পলিতে জৈব পদার্থের ভাগ পদ্মার পলি থেকে অনেক বেশী। কারণ মেঘনার মূল উপনদী সুরমার পর্যঙ্কে শ্রীহট্ট জেলার হাওর জলাভূমি আছে। তিস্তার পলি-কণার আকার ভাগীরথীর পলি-কণার চেয়ে বড়, কারণ তিস্তার গর্ভদেশ বেশী ঢালু, স্রোতবেগও বেশী। একই নদীর বিভিন্ন খণ্ডে সঞ্চিত পলির বৈচিত্র্য বড় কম নয়। এর উপরে আছে বঙ্গোপ-সাগর। ভরা-জোয়ারের সময় মহীসোপানের সূক্ষ্ম পলিমাটি বাংলা বদ্বীপ প্রান্তে ক্রমাগত জমা হচ্ছে। হুগলী নদীর ক্রমহ্রাসমান নাব্যতা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই ভাবেই বাংলা দেশ গড়ে উঠেছে অনেক হাজার বছর ধরে। সে অতীত যুগে সব সময়েই সমুদ্র ঠিক ক্রেসারগঞ্জ বা দীঘার কাছে স্থির হয়ে ছিল না। কখনো বাংলা দেশ প্রায় সম্পূর্ণই সমুদ্রে ডুবে গেছে, কখনো সমুদ্র-তীর উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ ছিল, নদী-নালার গতিপথও পালটেছে বহুবার। বাংলা দেশের শিলাবিন্যাস থেকে সেই ইতিহাস মোটামুটি উদ্ধার করা যায়, কারণ শিলারাশির গঠনমঞ্জুষায় সঞ্চয়-পরিবেশ সম্বন্ধে সংবাদ সঙ্কেত নিবদ্ধ। আধুনিক যুগের কথাই ধরা যাক। আধুনিক কালের সঞ্চয় পরিবেশের বৈশিষ্ট্য এবং সঞ্চিত পলির গঠন-বৈচিত্র্য আমাদের জানা, উভয়ের সম্পর্কটিও নির্দিষ্ট। সুতরাং বিশ্লেষণ-ধারাটিকে উল্টে নিয়ে, অর্থাৎ পলির গঠন-বৈচিত্র্য থেকে সঞ্চয়-পরিবেশ অনুমান করলে অতীতকালের পরিবেশিক রূপান্তরের ইতিহাস রচনা সম্ভব। কারণ বর্তমানই অতীতের চাবিকাঠি।

শিলাবিন্যাস থেকে সঞ্চয়-পরিবেশ বিশ্লেষণের কাজটি যাঁরা করেন, তাঁদের বলে শিলাতত্ত্ববিদ (পেট্রোলজিস্ট)। এঁদের মধ্যে নানারকম বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। কেউ করেন আগ্নেয় অথবা রূপান্তরিত শিলা-বিশ্লেষণ, আবার কেউ বা করেন পাললিক শিলা-বিশ্লেষণ; কারোর পছন্দ কোন বিশিষ্ট ভূতাত্ত্বিক যুগের ইতিহাস, আবার কারোর বা পছন্দ কোন বিশিষ্ট অঞ্চল। ভূতত্ত্ব, ভূ-রসায়নবিদ্যা, ভূ-পদার্থবিজ্ঞান, জীববিদ্যা, প্রভৃতি বহু সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানের যৌথ প্রয়োগে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যায়। তবে ভারতের শিলাতত্ত্ববিদেরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভূতত্ত্বের আওতায় থেকে এই কাজটি করে থাকেন।

২। সংবিধানগত বিশ্লেষণের জটিলতা

মানবজীবনের মাপকাঠিতে বাংলা দেশের কোন কোন অঞ্চলের পাললিক শিলা আবরণের কাজ শেষ হয়েছে বহু প্রাচীন কালে; যেমন—রক্তাভ মৃত্তিকা-গঠিত ভাওয়াল গড় (ঢাকা জেলা),

মধুপুর গড় (ময়মনসিংহ জেলা), বরেন্দ্রভূম (উত্তর বঙ্গ) ও রাঢ়ভূম (পশ্চিম বঙ্গ)। এসব ভূপৃষ্ঠ গঠিত হয়েছে ১১ হাজার বা ৫৫ হাজার বছর আগে। শিলা সঞ্চয় আরম্ভের কথা ধরলে এদের বয়স হবে প্রায় ১০ লক্ষ বছর। ভূতত্ত্বের সময়ের মাপকাঠিতে এ-রকম বয়স কিন্তু অতি নগণ্য। কারণ ভূপৃষ্ঠ রচিত হতে আরম্ভ করেছে আজ থেকে প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে এবং ছোটনাগপুর-মালভূমি গঠনের কাজটিই শেষ হয়েছে প্রায় ৯০ কোটি বছর আগে। এই বিরাট সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই নৈসর্গিক ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। যুগে যুগে সঞ্চিত শিলারাশির বাহ্যিক গঠনে, রসায়ন-সংযুক্তিতে কিংবা জীবাশ্ম সংস্থানে ঐ ক্রম-পরবর্তিত পরিবেশ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই নানারকম সংবাদ-সঙ্কেত নিবদ্ধ। ঐ সব সঙ্কেতগুলির প্রকৃত অর্থ বের করা শিলাতত্ত্ববিদদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কাজ খুবই জটিল। কারণ, অতীত কালের শিলাস্তরগুলির সব কটিই অবিকৃত থাকে নি। এদেরও পরিবর্তন হয়েছে নানা উপায়ে।

পাললিক শিলার কথাই ধরা যাক। সাধারণ কাদা মাটি, তাপ ও চাপে রূপান্তরিত হয়ে স্লেট-পাথরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। তেমনি বালিপাথর হয়ে যায় কোয়ার্টজাইট, কিংবা চুনাপাথর হয় মার্বেল পাথর। এর উপরে আছে অগ্ন্যুৎপাত। ভূ-অভ্যন্তর থেকে কখনো উচ্ছৃত হচ্ছে অম্লধর্মী গ্র্যানিট পাথর, কখনো বা ক্ষারধর্মী ব্যাসল্ট লাভা। মধ্যে মধ্যে ঐসব লাভা ভূপৃষ্ঠে না এসে ভূত্বকের ভিতরেই থেকে যায়। অনেক যুগ ধরে ক্ষয় হবার পর, ঐ সব পাতালিক (প্লুটোনিক) শিলা উন্মোচিত হয়ে ভূপৃষ্ঠের অঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়। পুরনো আগ্নেয়শিলাও আবার নতুন করে তাপ ও চাপের ফলে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে, যেমন হয় গ্র্যানিট থেকে নাইস পাথর। এইভাবে রূপান্তরিত হবার সময়ে আগ্নেয়শিলার বাহ্যিক গঠনেও নানারকম পরিবর্তন হতে পারে। পাঁচ-মিশালী রাসায়নিক পদার্থগুলি রূপান্তরের সময়ে গলে যায় এবং নতুন করে জমাট বাঁধবার আগে বিভিন্ন রসায়নিক যৌগিক আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রভেদ অনুসারে পাটে পাটে সজ্জিত হয়ে যেতে পারে। পাললিক শিলাও অত্যধিক তাপ ও চাপের ফলে গলে গিয়ে নতুন ভাবে পাটে পাটে সজ্জিত হতে পারে। এই দু-রকম শিলার আদিম রূপ-বৈশিষ্ট্য রূপান্তরিত পট্টবদ্ধ শিলায় নিশ্চয়ই প্রচ্ছন্নভাবে থেকে যায়। কিন্তু সে সঙ্কেতের অর্থ উদ্ধারের জন্যে চাই অতি সতর্ক অনুশীলন।

এর উপর আছে রাসায়নিক যৌগিকের পচন ও শিলাস্তরের ক্ষয়িভবন। অম্লধর্মী আবহমণ্ডলের সংস্পর্শে যেমন ক্ষারধর্মী রাসায়নিক যৌগিকের পচন দ্রুত হয়, তেমনি ক্ষারধর্মী ভৌমজলের প্রভাবে অম্লধর্মী রাসায়নিক যৌগিকের পচন হয় দ্রুত। এই রকম পচনের ফলে শিলাস্তরের দৃঢ়তা কমে যায়। ফলে জলস্রোত, সমুদ্রতরঙ্গ, বায়ু কিংবা হিমবাহ-প্রবাহের সংস্পর্শে ঐ সব শিলাস্তর ক্ষয়িভূত হয় সহজেই। সাধারণভাবে পাললিক শিলার ক্ষয় হয় আগ্নেয় বা রূপান্তরিত শিলার তুলনায় দ্রুততর হারে। সব কিছু মিলে প্রাচীনতর শিলা-নিদর্শনে পাললিক শিলার তুলনায় আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলার আধিক্য স্পষ্টতর। ফলে অসতর্ক অনুসন্ধানীর কাছে মনে হতে পারে যে, প্রাচীন-কালে আগ্নেয় শিলার সঞ্চয় পলল-সঞ্চয় অপেক্ষা ব্যাপকতর ছিল, অন্ততঃ আধুনিক কালের তুলনায়। অথচ প্রাচীন কালে সত্যই কত পরিমাণ পাললিক শিলা সঞ্চিত হয়েছিল, তার কোন হিসেব নেবার উপায় নেই। ফলে তৎকালীন শিলা-সঞ্চয় পরিবেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য অনুমানায় অনিশ্চয়তা থেকেই যায়।

তাছাড়া মনে রাখতে হবে যে, ভূপৃষ্ঠ কখনো অনড়, অচঞ্চল অবস্থায় থাকে নি। নানারকম ভূগঠনিক শক্তির প্রভাবে কোন অঞ্চল বিশেষ

বিশেষ সময়ে নমনীয় হয়ে ওঠে, কোন অঞ্চল সঙ্কুচিত হয়ে যায়, কোন অঞ্চল হয়তো নানারকম চ্যুতির (ফল্ট) প্রভাবে বিকৃত হয়ে যায়। এসব ভূগঠনিক আলোড়নের সঙ্গে থাকে শিলার রাসায়নিক ও আকৃতিগত রূপান্তর এবং উত্তরকালের পচন ও ক্ষয়িভবন। ফলে প্রাথমিক শিলা-বিন্যাসের যে মৌলিক সঙ্কেতগুলির সাহায্যে সঞ্চয়-পরিবেশ বিশ্লেষণ সম্ভব, তা ক্রমেই লুপ্ত, অন্ততঃপক্ষে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়। স্পষ্ট হয়ে ওঠে রূপান্তর প্রক্রিয়ার প্রভাবগুলি।

প্রাচীন কালের শিলারাশিতে নিবদ্ধ এরকম দু'জাতের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন সংবাদ সঙ্কেতের আপেক্ষিক তাৎপর্য বিচার স্বভাবতঃই অনুমান-আশ্রয়ী। একাজে ব্যবহৃত অনুষঙ্গাগুলি অবশ্যই বহু গুরুত্ব-পূর্ণ সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেছে। অথচ ভারতের কিছু কিছু শিলা-বিন্যাসের আপাতঃ বিশ্লেষণে এমন সব সঞ্চয়-পরিবেশের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যার সরাসরি অনুমোদন ভূতত্ত্বের সংবিধানগত চিন্তাধারায় প্রহেলিকার সৃষ্টি করে। উদাহরণ হিসেবে ধারওয়ার যুগের কথা আলোচনা করা যায়।

৩। ধারওয়ার শিলারাশির গঠন-বৈচিত্র্য

দক্ষিণাপথে মহীশূর রাজ্যে ধারওয়ার নামে একটি অঞ্চল আছে। ঐ অঞ্চলের শিলারাশি যে যুগে সঞ্চিত হয়েছিল, ভূতত্ত্বের সংবিধান অনুসারে সে যুগটিকে আমরা বলি ধারওয়ার যুগ। বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম ভাগে এবং সংলগ্ন আরো পশ্চিম অঞ্চলে, যেমন—ধলভূম, সিংভূম ও গাংপুরে সমসাময়িক কালে বহু শিলা গঠিত হয়। গঠন-বিন্যাস অনুসারে এই যুগের শিলারাশিকে দুটি ভাগে সাজানো যায়—শল্কীভূত (ফলিয়েটেড) সিষ্ট ও স্থূল গ্র্যানিট-নাইস। ভূ-আলোড়নজনিত তাপ ও চাপ সঞ্চারের ফলে দু-রকম শিলারই আদিরূপ পরি-বর্তিত হয়ে গেছে এবং উভয় প্রকার শিলা একত্রে দক্ষিণাপথ ভূখণ্ডের প্রায় তিন পঞ্চমাংশ ভাগ রচনা করেছে।

ভূতাত্ত্বিকদের মতে, এই সব রূপান্তরিত শিলা —সিষ্ট ও গ্র্যানিট-নাইস—ভারতের প্রাচীনতম ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়িভূত অংশমাত্র। তাঁরা মনে করেন যে, শল্কীভূত সিষ্টজাতীয় শিলা প্রথম অবস্থায় পাললিক শিলার আকারে সঞ্চিত হয়ে পরে রূপান্তরিত ও কেলাসিত হয়। গ্র্যানিট-নাইস জাতীয় শিলা ভূঅভ্যন্তরস্থ তাপ বিকিরণের সহগামী প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট। এখন সমস্যা এই যে, দু-রকম শিলার মধ্যে কে প্রাচীনতর?

৪। কে প্রাচীনতর?

সংবিধানগত অনুষঙ্গা অনুসারে মনে হয়, কেলাসিত গ্র্যানিট-নাইস প্রাচীনতর, কারণ পাললিক শিলা গঠনের জন্যে প্রয়োজন প্রাচীন-তর কোন শিলার ক্ষয়িভবন। কিন্তু ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মহীশূর রাজ্য ভূতাত্ত্বিক সংস্থার সমর্থনে স্মিথ বলেন যে, ধারওয়ার অঞ্চলের পাললিক শিলাই প্রাচীনতর। বিস্তৃত জরিপের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, গ্র্যানিট-নাইস জাতীয় শিলা সিষ্টের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট; অর্থাৎ ঐ অনুপ্রবেশ ঘটেছে পলল-সঞ্চয়ের পরে।

অবশ্য ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেই সার লুইস ফারমোর অনুরূপ একটি সিদ্ধান্তের গোড়াপত্তন করেন। তিনি বলেন যে, ধারওয়ার যুগের অধিকাংশ স্লেট, ফিলাইট, মাইকা-সিষ্ট ও কোয়ার্টজাইট আসলে রূপান্তরিত পাললিক শিলা। এমন কি, মধ্য ভারতের অতিকেলাসিত চুনাপাথর ও চুন-সমৃদ্ধ গ্র্যানিট ও প্রাথমিক পর্যায়ে পাললিক শিলা ছিল। ফারমোর অনুমান করেন যে, অগ্ন্যুৎপাতজনিত অত্যধিক তাপ সঞ্চারের ফলে ধারওয়ার পাললিক শিলারাশি ভিত্তিস্তরের সঙ্গে আংশিকভাবে গলে যায়। পরে ঐ গলিত

স্পর্শতলে সঙ্কর শিলার জন্ম হয় গলিত শিলার অনুপ্রবেশের সূত্রে চাপ ও তাপের প্রভাবে ধারওয়ার পলল-স্তরগুলি সামগ্রিকভাবে সিষ্ট পাথরে রূপান্তরিত হয়ে যায়

৫। ভিত্তিস্তরহীন পলল-সঞ্চয়

ফারমোরের সিদ্ধান্ত অনুসারে ধারওয়ার পলল-সঞ্চয় গোত্রের একটি ভিত্তিস্তর ছিল, যাকে আমরা প্রাচীনতম ভূত্বক বলতে পারি। রাজপুতানা অঞ্চলে বুন্দেলখণ্ড গ্র্যানিটকে ঐ রকম ভিত্তিস্তর বলে অনুমান করেন ভারতীয় জরিপ সংস্থার হেরন। কিন্তু ভারতের অন্যত্র, মহীশূরে বা বাংলা-বিহারে ওই রকম কোন ভিত্তিস্তরের কোন সন্ধান নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে উত্তর আমেরিকার ক্যানাডা দেশে কিওয়াটিন অঞ্চলের শিলাবিন্যাস বিশ্লেষণের পর লসন যখন ভিত্তিস্তরের অনুপস্থিতির কথা জানান, তখন ভূতাত্ত্বিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। পরে দেখা গেল যে, কেবল ভারত বা ক্যানাডায়ই নয়, পৃথিবীর বহু অঞ্চলেই প্রাচীনতম পাললিক শিলার সঞ্চয়-ক্ষেত্রের কোন ভিত্তিস্তর খুঁজে পাওয়া যায় নি। এর ফলে ভূতাত্ত্বিক মহলে এক আজগুবি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং ম্যানুয়েল অব জিওলজি অফ ইণ্ডিয়ার তৃতীয় সংস্করণে (১৯৫০ খৃঃ) সম্পাদক প্যাস্কো বলেন :

"To be asked to regard the Dharwar sediments and lavas as everywhere the oldest rock present is like being asked to look at a picture with no wall to support it" (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬২)।

অর্থাৎ ধারওয়ার যুগের পাললিক ও লাভা জাতীয় শিলাকে সর্বত্রই প্রাচীনতম শিলাবিন্যাস মনে করবার অর্থ নিরাবলম্ব কোন ছবি দেখতে বলা। উক্তিটির মধ্যে সন্দেহ আকুলতা স্পষ্ট। ান পলল-সঞ্চয় ক্ষেত্রের সম্ভাবনা, মনে হয় যেন ভূতাত্ত্বিক ধ্যান-ধারণার কোন প্রচলিত 'সংস্কারের' গোড়ায় আঘাত করেছে।

৬। সংবিধানের জড়তা

মনে রাখতে হবে, ধারওয়ার শিলা-সঞ্চয় ঘটে এমন যুগে, যখন পৃথিবীর বয়স খুবই কম। সেই সুদূর অতীত যুগের ভূগঠন ও নৈসর্গিক পরিবেশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধ্যান-ধারণা আজও বেশ অস্পষ্ট। বিশেষতঃ ভূতত্ত্ববিদ্যার গঠন-কাঠামোয় পৃথিবীর জন্মকালের পরিবেশ-বিশ্লেষণকে বলা যায় ঐ বিজ্ঞানের সীমান্ত দেশস্থ বিষয়বস্তু। ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদিতে বিভক্ত বিশ্ব-বিজ্ঞান-চিন্তার খণ্ডিত অনুশীলনের জন্যে প্রত্যেক ব্যবহারিক বিজ্ঞানীই নিজস্ব কর্ম-পরিবেশের প্রান্তিক বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন শাস্ত্র প্রদত্ত অনুষঙ্গগুলিকে মেনে নিতে বাধ্য হন, প্রায় স্বতঃসিদ্ধের মত। যেহেতু প্রান্তিক অনুষঙ্গার যাথার্থ্য বিচার সম্ভব কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্রগুলির যৌথ প্রয়োগে এবং যেহেতু ঐ যৌথ প্রয়োগের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আজও স্বীকৃত নয়, সেহেতু ব্যবহারিক ভূতাত্ত্বিকেরা ঐ প্রাচীন যুগের পরিবেশ ব্যাখ্যায় পৃথিবীর জন্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূত্রে প্রাপ্ত তথা সমকালে লোকপ্রিয় মতামতগুলিকে মেনে নেন স্বতঃসিদ্ধ বলে, সম্ভবতঃ জ্ঞানতঃ, কিন্তু প্রায়শঃ পূর্বসূরীদের অনুসরণে, অভ্যাসবশে। ফলে ভূতত্ত্ববিদ্যার যুক্তি কাঠামোয় ঐ সব স্বতঃসিদ্ধের বিরুদ্ধ গুণসমৃদ্ধ তথ্যাদি স্বাভাবিক প্রথা অনুসারে সঙ্কটের জন্ম দেয়। সম্পাদক প্যাস্কোরও হয়েছে তাই।

আধুনিক শতাব্দীর গোড়ায় দিকে ধারণা ছিল, বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে যে, পৃথিবীর জন্ম হয় কোন জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড থেকে। এই অনুষঙ্গার ঔপপত্তিক রূপান্তরে অনুমান করা

যায় যে, তাপ বিকিরণের সাহায্যে ঐ গ্যাসপিণ্ড ক্রমে তরল ও শেষে কঠিন আকৃতি পাবে। কঠিন পদার্থের সঞ্চয় হবে প্রথমে ঐ পিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে এবং অত্যধিক চাপের জন্যে কেন্দ্র-দেশের পদার্থ আরো বহুদিন পর্যন্ত তরল অবস্থায় থেকে যাবে। পিণ্ডের পৃষ্ঠদেশ কঠিন হওয়ার ভূতাত্ত্বিক অর্থ, কেলাসিত শিলার জন্ম হওয়া। সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে জলপূর্ণ সমুদ্র সৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ মহাদেশ রচনাকারী কেলাসিত গ্র্যানিট, অথবা মহাসমুদ্রতল গঠনকারী কেলাস্থিত ব্যাসল্টের গলনাঙ্ক জলের স্ফুটনাঙ্ক থেকে অনেক অনেক বেশী। বহুদিন পর্যন্ত আবহমণ্ডলের অন্তর্ভূত রাসায়নিক যৌগিকের ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণও সম্ভব বে না। ফলে ভূত্বক রচনার প্রাথমিক যুগে কেলাসিত শিলারাশির রাসায়নিক পচন ঘটলেও আবহমণ্ডল থেকে রাসায়নিক যৌগি-কের অধঃক্ষেপণ অভাবে ঐ ভূত্বকের কোন 'ক্ষয়' হবে না। পাললিক শিলা-সঞ্চয়ও ঘটবে না। সুতরাং পৃথিবীর আদিরূপ জলন্ত গ্যাস-পিণ্ড অনুমানের বৈজ্ঞানিক অনুসরণে ভিত্তিস্তরহীন পলল-সঞ্চয় ক্ষেত্র থাকা সম্ভব নয়। অথচ অনুসন্ধানের পরেও ধারওয়ার পলল-সঞ্চয় ক্ষেত্রের ভিত্তিস্তর উধাও। ফলে সঙ্কট এবং সম্পাদক প্যাস্কোর সন্দেহ আকুলতা বা নৈরাশ্য।

ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ নতুন অনুকল্পার ব্যবহার করছেন। গত চার দশকে মহাজগৎ সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র—এমন কি, জীববিদ্যায় ব্যাপক অনুশীলনের ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন যে, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে ক্রমবর্ধমান মাধ্যাকর্ষ ক্ষেত্রে কঠিন-শীতল পদার্থ সঞ্চয়ের মাধ্যমে, যেমন রূপক অর্থে বলা যায়, আধুনিক কালের উল্কাবৃষ্টি পৃথিবীর আয়তন, তথা মাধ্যাকর্ষ-শক্তি বাড়িয়ে যাচ্ছে। এই অনুকল্পা অনুসারে প্রথম থেকেই ভূপৃষ্ঠ চূর্ণ-বিচূর্ণ কঠিন ও শীতল রাসায়নিক যৌগিক দিয়ে রচিত হবে। সে সময়ে সম্ভবতঃ কোন আবহমণ্ডল থাকবে না, কারণ অনুষঙ্গায় ভূগঠন-কারী পদার্থগুলি কঠিন ও শীতল ছিল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান আয়তন ও চাপের জন্যে ভূকেন্দ্রে তাপবৃদ্ধি ঘটবে এবং ভূকেন্দ্রস্থ পদার্থগুলি তরল হয়ে যাবে। তরলীভবনের সুযোগে কেন্দ্রদেশে বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগিকের মিশ্রণ, তথা তাপ উৎপাদক রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। পদার্থবিদ্যার নিয়মানুসারে ঐ তাপ ভূ-পৃষ্ঠের দিকে পরিবাহিত হবে এবং সেই সুযোগে অপেক্ষাকৃত উদ্বায়ী রাসায়নিক যৌগিকগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই আবহমণ্ডল রচনা করবে। তাপ বিকিরণের মাধ্যমে আবহমণ্ডলের কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগিকের অধঃক্ষেপণও সম্ভব হবে তরল আকারে। ঐ তরল পদার্থের স্রোতে ভূ-পৃষ্ঠের চূর্ণিত পদার্থ কণাসমূহ সহজেই পলল-স্তর রচনা করতে পারবে। ইতিমধ্যে ভূকেন্দ্রস্থ তাপ পরিবহনের সুযোগে তরলীভূত পদার্থগুলি ভূপৃষ্ঠে উচ্ছৃত হতে থাকবে, যারা অল্প সময়ের মধ্যে কেলাসিত ভূত্বকের পত্তন করবে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠাভিমুখী তাপ পরিবহন ও পরিচলন এবং অধঃক্ষেপিত নৈসর্গিক রাসায়নিক যৌগিকের যুগ্ম প্রচেষ্টায় একই সঙ্গে পাললিক শিলা গঠন ও তন্মধ্যে কেলাসিত শিলার অনুপ্রবেশ সম্ভব হবে; অর্থাৎ এই অনুকল্পা অনুসারে ধারওয়ার পলল-সঞ্চয় ক্ষেত্রের জন্যে কোন প্রাচীনতর কেলাসিত ভিত্তিস্তরের প্রয়োজন নেই।

পরমাণু-কেন্দ্রক সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে ভারতে তৈরী দুটি যন্ত্র

নিউট্রন উৎপাদক যন্ত্র

এই যন্ত্রটির দ্বারা উচ্চ বিভব (Potential) উৎপাদন করা হয়। ১৫০ হাজার থেকে ৪৫০ হাজার ভোল্ট বিভব দিয়ে ডয়েটরন (D) আয়নকে ত্বরান্বিত করলে এবং ঐ আয়ন ট্রিটন (T) গ্যাস-শোষিত ধাতব ফলকে এসে পড়লে $D + T \rightarrow He + n$, এই বিক্রিয়ায় নিউট্রনের (n) জন্ম হয়; সেই সঙ্গে একটি হিলিয়াম (He) কেন্দ্রকও পাওয়া যায়। প্রায় ১৪ MeV শক্তিসম্পন্ন নিউট্রনের সংখ্যা এতে সর্বাধিক পরিমাণে থাকে। এই নিউট্রন দিয়ে স্থায়ী মৌলিক পদার্থের রূপান্তরে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি হয়। তাদের কেন্দ্রকের বিকিরণ থেকে কেন্দ্রক সংক্রান্ত তথ্য জানা যায়। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১নং ছবিতে কলকাতার সাহা ইনষ্টিট্যুটের কর্মীদের তৈরি নিউট্রন-উৎপাদক যন্ত্রের আলোকচিত্র দেখা যাচ্ছে। চিত্রের বাঁ-দিকে কন্‌ডেন্‌সার দিয়ে সাজানো স্তম্ভ দুটি উচ্চ বিভব তৈরির কাজে লাগে—এর নাম হলো কক্‌ক্রফ্‌ট্‌-ওয়াল্টন সার্কিট। ডান-দিকের অংশটি ত্বরণ স্তম্ভ (Accelerating column); এতে ত্বরান্বিত ডয়েটরন নিম্নাংশে ট্রিটনের সঙ্গে সংঘাত করে নিউট্রনের জন্ম দেয়। স্তম্ভের নীচে আয়ন বিচরণের কক্ষটি বায়ুশূন্য করবার জন্যে ব্যবহৃত 'ভ্যাকুয়াম বাম্প' ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

মাস্‌-স্পেকট্রোমিটার

২নং ছবিতে যে মাস্‌-স্পেকট্রোমিটারের আলোকচিত্র দেখা যাচ্ছে, সাহা ইনষ্টিট্যুটে অবস্থিত সেই যন্ত্রটি ১৯৫৮ সালে তৈরি; পারমাণবিক সংঘাতের গবেষণায় যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটির প্রধান অংশ হলো একটি বিদ্যুচ্চুম্বক (মাঝখানে)। এই চুম্বকের

(২)

মধ্যবর্তী অংশ একটি লৌহদণ্ড, যাকে বলা হয় কোর (Core)। কোরের চারদিকে বৃত্তাকার তারের কুণ্ডলী—এ দিয়ে বিদ্যুৎ চালনা করে লোহাতে চুম্বকত্ব সৃষ্টি করা হয়। তারের কুণ্ডলীর বাইরে বলয়াকার মেরুগুলির (Pole pieces) বিস্তৃতি ৪ ইঞ্চি। আর তাদের মাঝামাঝি বিন্দুর ব্যাসার্ধ ১৫ ইঞ্চি। মেরুগুলির মধ্যে অবস্থিত একটি বায়ুশূন্য কক্ষে এই ব্যাসার্ধের মধ্যে বিশিষ্ট শক্তির আয়ন বিচরণ করে বৃত্তাকার পথে। মেরুগুলিতে চৌম্বকশক্তি ব্যাসার্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে—কারণ মেরুগুলির আকার সেই অনুযায়ী তৈরি। এ রকম চৌম্বক ক্ষেত্রে অরীয় (Radial) ও অক্ষীয় (Axial) ফোকাস সম্ভব হয়। উন্নততর ফোকাসিং-এর জন্যে সাধারণ মাস্-স্পেক্‌ট্রোমিটারের থেকে এতে অধিকতর তীব্রতাসম্পন্ন আয়ন-ভর বিশ্লেষিত (Mass analysed) অবস্থায় পাওয়া যায়। আলোকচিত্রের বাঁ-দিকে দেখা যাচ্ছে, আয়ন বিচরণের কক্ষটিকে বায়ুশূন্য করবার জন্যে ব্যবহৃত ভ্যাকুয়াম পাম্পসমষ্টি, ডান-দিকে রয়েছে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলি। চুম্বকের সঙ্গে সংলগ্ন তিনটি শলাকাবিশিষ্ট ডান-দিকের অংশটি হলো আয়ন-উৎস। বায়ব বা কঠিন মৌলিক পদার্থ থেকে সেই পদার্থের আয়ন এতে তৈরি হয়।

(কলকাতার সাহা ইনষ্টিট্যুটের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে আলোকচিত্র দুটি সংগৃহীত)

পরমাণু-কেন্দ্রক সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে ভারতে তৈরী যন্ত্র

১ নং চিত্র—নিউট্রন উৎপাদক যন্ত্র

২ নং চিত্র— মাস্-স্পেক্ট্রোমিটার

উল্টো পুরাণ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি নিয়ে আমাদের স্বাভাবিক জগৎ। এই জগতের রীতি-নীতি বিজ্ঞানের চোখে অনেকটা ধরা পড়েছে। কিন্তু এই জগতের উল্টো কোনও জগৎ আছে কি? এরকম প্রশ্ন উঠছে—তার কারণ উল্লিখিত বস্তুকণার বিপরীত কণিকার সন্ধান এই জগতেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন ধরুন—পজিট্রন, ধনাত্মক আধানের এই কণিকাটি ইলেকট্রনের ভরের সমান। অথচ এই জগতে তার দর্শন পাওয়া যায় কদাচিৎ। এই জগতের গঠন ব্যবস্থায় তার বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। তবু মহাজাগতিক রশ্মি বা কোন কোন কৃত্রিম আইসোটোপ, (যেমন সোডিয়াম-২২) থেকে আমরা পজিট্রন পাই। আইনষ্টাইনের সূত্রানুযায়ী ইলেকট্রনের মত পজিট্রনের ভরটুকু শক্তিতে রূপান্তরিত হলে শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৫১০০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট। এর প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ শক্তির কিছু বেশী যদি জড় পদার্থে রূপান্তরিত হয়, তবে আমরা ইলেকট্রন-পজিট্রন জুড়ি পাই। পরমাণু-কেন্দ্রের প্রোটন কখনও কখনও নিউট্রনে রূপান্তরিত হলে পজিট্রন বাইরে বেরিয়ে আসে। পরমাণু-কেন্দ্রকের ভিতর তার মুক্ত অবস্থায় থাকবার উপায় নেই। আবার পরমাণু-কেন্দ্রকের বাইরে ও ইলেকট্রনের সংস্পর্শে তার অস্তিত্ব লোপ পায় ইলেকট্রনের সঙ্গে। কিন্তু এই রকম বিলুপ্তির আগে কিছুক্ষণ ইলেকট্রনের সঙ্গে পজিট্রন একটি পরমাণুর মত থাকতে পারে। ইলেকট্রন-পজিট্রনের এই পরমাণু অবস্থার নাম হলো পজিট্রনিয়াম—যার গড় জীবনকাল প্রায় ১০^{-৭} সেকেণ্ড। এখানে পজিট্রন হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটনের সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু তার ভর প্রোটনের প্রায় ১৮৩৬ গুণ কম। তাই এই অস্থায়ী পজিট্রনিয়ামের ধর্ম হাইড্রোজেন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

কিন্তু ইলেকট্রনের মত পজিট্রন দিয়ে আমাদের জগতের উল্টো বস্তুজগৎ সম্ভব কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে অ্যান্টিনিউক্লিয়াস বা বিপরীত পরমাণু-কেন্দ্রক থাকতে পারে কিনা, তা দেখা দরকার। তার কিছুটা সম্ভাবনা দেখা গেল অ্যান্টিপ্রোটন আবিষ্কার হবার পর। প্রোটন অ্যান্টিপ্রোটন মিলিত হলেই ভরের বিনাশ হয়ে আমরা প্রায় ২০০ কোটি ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি পাই। অ্যান্টিনিউট্রনের সাক্ষাৎও পাওয়া গেছে। এখন প্রোটন, নিউট্রন, ইলেকট্রন নিয়ে আমাদের যে জগৎ, তার ঠিক উল্টো একটা জগৎ আমরা কল্পনা করতে পারি—যেখানে অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টিনিউট্রন ও পজিট্রন দিয়ে পরমাণুগুলি তৈরি হয়েছে।

আমাদের পরমাণু-কেন্দ্রক সংক্রান্ত বিজ্ঞানে নিউট্রিনো, মিউ মেসন, পাই মেসন এবং আরও যে সব কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে—তাদের বিপরীত কণার অস্তিত্বও ধরা পড়েছে। কণা ও বিপরীত কণার মিলনে পজিট্রনিয়ামের কথা আগেই বলা হয়েছে। μ^- মেসনের বিপরীত কণা μ^+; এদের গড় জীবনকাল প্রায় ২·২ × ১০^{-৬} সেকেণ্ড। μ^+ ও ইলেকট্রন, এরা হাইড্রোজেনের মত একটি অস্থায়ী পরমাণু গঠন করতে পারে—যার নাম হলো মিউওনিয়াম।

পজিট্রনিয়াম ও মিউওনিয়াম—এই দুটি হলো কণা-বিপরীত কণার মিলিত পরমাণু অবস্থার অস্থায়ী রূপ। এথেকে বিপরীত বস্তুজগতের

সম্ভাবনা কতটুকু, তা ধরা সম্ভব নয়। কারণ এই পরমাণুগুলির বন্ধন-শক্তি খুবই সামান্য। উল্টো জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করছে, আমাদের জগতের একই কেন্দ্রীয় বল অ্যান্টিপ্রোটন ও অ্যান্টিনিউট্রনগুলিকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তরের উপর। কেন্দ্রীন বল প্রোটন ও নিউট্রনকে পরমাণু-কেন্দ্রকের ভিতর আকর্ষণ করে, তাই তারা বাঁধা পড়ে। কিন্তু উল্টো জগতের উল্টো পুরাণ হয়তো বলবে, এই বল অ্যান্টিপ্রোটন ও অ্যান্টিনিউট্রন এদের মধ্যে আনবে বিকর্ষণ। তখন আমাদের ছুটতে হবে আর এক বলের সন্ধানে, যা কেন্দ্রীন বলের উল্টো।

তৈরি করতে পারেন, তবেই প্রোটন বা নিউট্রনের সেখানে সাক্ষাৎ পাবেন। তখন হয়তো আমাদের পৃথিবীর কাল্পনিক চিত্র তাঁরা আঁকতে পারবেন—কিন্তু জগতের বাসিন্দাদের এই সব কল্পনা নিয়েই থাকতে হবে—মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা নৈব নৈব চ।

উল্টো কণিকা আমাদের সামনে ধরা দিয়ে মহাকর্ষ বল সম্পর্কে নতুন ভাবনা এনে দিয়েছে। কেন্দ্রীন বল দিয়ে উল্টো পরমাণু, অণু—এসব না হয় তৈরি হলো, কিন্তু দুটি উল্টো বস্তুর ক্ষেত্রে মহাকর্ষ বল কি রকম কাজ করবে? প্রোটন আর অ্যান্টিপ্রোটন, শক্তির রূপান্তরে যখন আবির্ভূত হয়, তখন কোন্ শক্তির বলে তারা
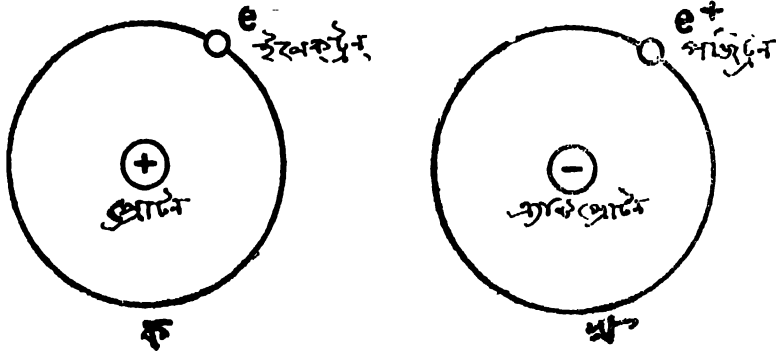
১নং চিত্র
ক—হাইড্রোজেন পরমাণু, খ—অ্যান্টিহাইড্রোজেন পরমাণু

সে দুর্ভাগ্য থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। কিছুদিন হলো অ্যান্টিডয়টেরনের অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে ধরা পড়েছে। এখন উল্টো জগৎ যে একেবারে কাল্পনিক কিছু নয়; আর একই কেন্দ্রীন বল যে আমাদের জগৎ ও উল্টো জগতে সমান কাজ করবে, তাও মনে হচ্ছে।

আমাদের জগতে ইলেকট্রন যেমন প্রভাবশালী, উল্টো জগতে পজিট্রন হবে তাই। সেখানে ইলেকট্রনকে চলাফেরা করতে হবে সতর্ক হয়ে। সেখানকার বিজ্ঞানীরা যদি আমাদের মত বিভাট্রন

বিযুক্ত হয়ে পড়ে? সে বল নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক বল নয়—কারণ বৈদ্যুতিক বল দিয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎকণার আকর্ষণই সম্ভব। তবে আমরা ভাবতে পারি যে, মহাকর্ষ বল এর জন্যে দায়ী। মহাকর্ষ বল আমাদের জগতের সাধারণ বস্তুতে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ আনে। উল্টো পুরাণের মতে হয়তো সাধারণ বস্তু আর উল্টো বস্তুর ভিতর বিকর্ষণ ভাব নিয়ে আসে আমাদের মহাকর্ষ বল। তাই কি প্রোটন আর অ্যান্টিপ্রোটন বিযুক্ত হয়ে পড়ে? তা যদি হয়, তবে

নিউট্রনের সূত্র লঙ্ঘন করে উল্টো বস্তু আমাদের আপেলের মত নীচের দিকে না পড়ে উপরের দিকে উড়বে। অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টিডয়টেরন প্রভৃতি ক্ষুদে ক্ষুদে উল্টো কণিকা থেকে অবশ্য এই পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মহাকর্ষ বল সম্পর্কে অনেক কিছু রহস্য আজও আমাদের অজানা। উল্টো জগতের মহাকর্ষ বল হয়তো সেখানে আমাদের জগতের মত কাজ করে—গ্রহ, নক্ষত্র-জগৎ নিয়ে উল্টো বিশ্বজগৎ হয়তো বিরাজমান। কিন্তু তার সীমান্ত কোথায় তা আমরা জানি না। তবু আমাদের ভাবতে হয়—আমাদের বিশাল বিশ্বে যে শক্তির খেলা চলেছে, তার মধ্যেই তো প্রভাব নিয়ে আসবে। কারণ মহাকর্ষীয় আকর্ষণ দুটি বস্তুর ভরের গুণফলের উপর নির্ভরশীল। একটি বস্তু যদি ঋণ-ভরের হয়, তবে এই আকর্ষণও ঋণাত্মক হবে অর্থাৎ বিকর্ষণ হবে, কিন্তু উল্টো পুরাণে বলবে অন্য কথা। ঋণ-ভর যে ধন-ভরের উল্টো—তাই মহাকর্ষের ফলও হবে উল্টো।

মনে করুন, ধন-ভরটির বাঁয়ে ঋণ-ভরটি রাখলেন। মহাকর্ষ বল ধন-ভরের ক্ষেত্রে চলতি নিয়ম মানছে অর্থাৎ মহাকর্ষ বলজনিত পরস্পরের মধ্যে বিকর্ষণের জন্যে আরও ডাইনে ছুটে যাবে, কিন্তু ঋণ-ভরের ক্ষেত্রে ঘটবে উল্টো, অর্থাৎ মহাকর্ষ-
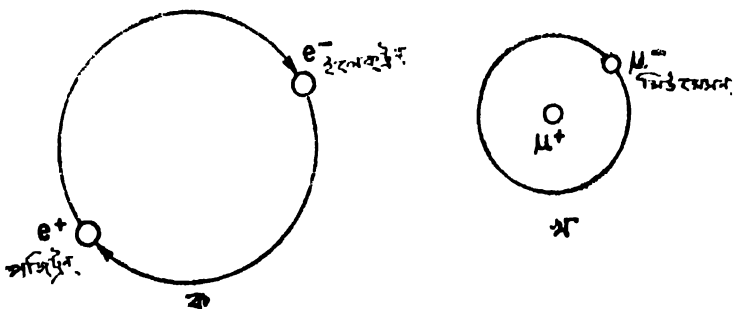
২নং চিত্র
ক—পজিট্রনিয়াম, খ—মিউওনিয়াম

লুকিয়ে আছে উল্টো বস্তুর কণিকা। তার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিয়মগুলির সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে নিয়মগুলির যথার্থতা বোঝা যাবে না।

মহাকর্ষ বল প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন ওঠে। আমাদের সাধারণ বস্তুকে যদি ধন-ভরের ধরা যায়, তবে উল্টো বস্তুর মত ঋণাত্মক ভরের (Negative mass) কোন বস্তু থাকতে পারে কি? ধরা যাক, আমাদের বিজ্ঞানের চলতি নিয়ম অনুযায়ী এরকম ঋণ-ভরের বস্তু থাকতে পারে। মহাকর্ষ বল তখন এই ঋণ-ভর ও আমাদের সাধারণ বস্তু অর্থাৎ ধন-ভরের মধ্যে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণের জনিত বিকর্ষণে সে মানবে ধন-ভরের উল্টো নিয়ম; ফলে ছুটবে ডাইনে ধন-ভরের দিকে। মহাকর্ষ বলে যদি ধন-ভরের পিছনে ঋণ-ভর এরকম ধাওয়া করে, তবে তো আপনা-আপনি বিপুল গতিবেগ পাওয়া যাবে—অর্থাৎ এমনি অনেক শক্তি পেতে পারবো। কিন্তু শক্তি তো নিত্য। এক শক্তির বিনাশে অন্য শক্তি পাওয়া যায়। শূন্য থেকে শক্তি পাওয়া যে চলতি নিয়মের বাইরে! কিন্তু এক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতা বজায় থাকবে কি করে, তাই বলছি। ধন-ভরটি যত ছুটবে, তার শক্তি তত বাড়বে সন্দেহ নেই—কিন্তু ঋণ-ভরের বেলায় উল্টো পুরাণ; সে যত ছুটবে, তার শক্তি ততই

ঋণাত্মক হবে। ফলে ধন-ভরের ও ঋণ-ভরের মোট শক্তি একই থাকবে।

উল্টো পুরাণ আর একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, ধন-ভর মহাকর্ষ বলে ঋণ ও ধন-ভর উভয়কেই আপনার কাছে টেনে আনে, আর ঋণ-ভর সে ক্ষেত্রে উভয় রকমের ভরকেই নিজের থেকে ঠেলে রাখতে চায়। ধন-ভর ও ঋণ-ভর দুটিতে যদি আবার একই বিদ্যুৎ-আধান থাকে, তাহলেও ঋণ-ভর ধন-ভরের পিছনে ছুটবে। দুজনের আধান উল্টো হলে আর বৈদ্যুতিক বল যদি মহাকর্ষ বলের চেয়ে বেশী হয়, তবে ধন-ভরই ঋণ-ভরের পিছনে তাড়া করবে।

হয়তো সম্ভব নয়—কিন্তু আমাদের বিশ্বজগতের কোথাও এর অস্তিত্ব আছে কি? সম্প্রতি কোয়াসার (Quasar) নামে নতুন আবিষ্কৃত নক্ষত্র শ্রেণীর কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋণ-ভরের অস্তিত্ব স্বীকার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

জড় পদার্থ ও শক্তি অনিত্য—এই সূত্রের যথার্থতা নিউক্লিয়ার যুগে আমাদের মেনে নিতে হয়েছে। আপেক্ষিকতা বাদের মতবাদ বড় জটিল, অঙ্ক ছাড়া সেখানে আমাদের প্রবেশ অসম্ভব। তার দু-একটি তত্ত্ব যে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় নি, তা নয়, তবে তার অধিকাংশ তত্ত্বই দুর্বোধ্য।
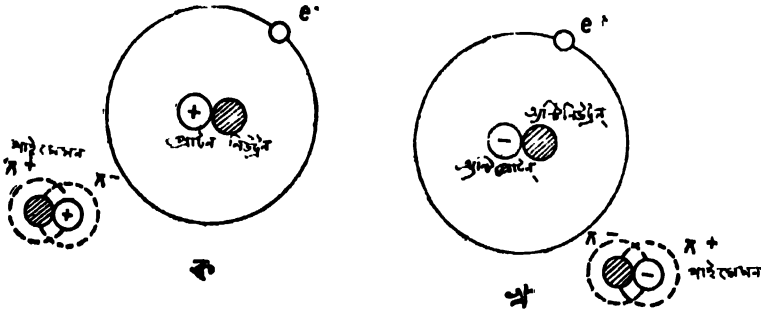
৩নং চিত্র

ক—ডয়টেরন পরমাণু, খ—অ্যান্টিডয়টেরন (?) পরমাণু

আমাদের জগতে যে ধন ও ঋণ উভয় আধানের বস্তুকণা পাওয়া গেছে—তা আমরা দেখেছি। এখানে ঋণ-ভরের অস্তিত্ব সম্ভব কিনা, তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে। এর অস্তিত্বের পয়লা নম্বর বাধা হলো—ঋণ-ভর যদি সত্যই আমাদের জগতে থাকতে পারে, তবে সব ধন-ভরই ঋণ-ভরে পরিণত হয়ে যে বিপুল শক্তির সৃষ্টি করবে, তাতে বিশ্বজগৎ টিকে থাকবে না। তবে আমরা এরকম রূপান্তর হওয়া চলতি নিয়মের বাইরে বলে যদি ধরে নিই—তাহলেও ঋণ-ভর কি করে তৈরি হয়, তা বোঝা যায় না।

আমাদের পৃথিবীর পরিবেশে ঋণ-ভরের অস্তিত্ব

'কেন' এই প্রশ্ন না তুলে আমরা একটি তত্ত্বের এখানে উল্লেখ করবো। মহাকর্ষ বলের উৎস কোথায়—এই প্রশ্নের উত্তরে আইনষ্টাইন বলেছেন, দেশ ও কালের বক্রতাই মহাকর্ষ বলের উৎস।

এই সূত্রটুকু থেকে আমরা যদি ধরে নিই যে, কোয়াসারে আভ্যন্তরীণ অবস্থায় দেশ-কালের বক্রতা একটু অন্য রকম, যাতে মহাকর্ষ বল সেখানে বিশ্বের অন্যান্য জায়গা থেকে তীব্রতর। মনে করুন, এরকম তীব্র মহাকর্ষ বলের পরিবেশে ঋণ-ভরের উৎপত্তি হতে পারে। কিন্তু মহাকর্ষ বলের সঙ্গে বৈদ্যুতিক বলের ধর্মে অনেক পার্থক্য আছে। বৈদ্যুতিক বল বেতার, আলোক প্রভৃতি

শক্তি-তরঙ্গের উৎস। কিন্তু মহাকর্ষ-তরঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে না। মহাকর্ষ বলজনিত মহাকর্ষ-তরঙ্গ বস্তুর ভর থেকে জন্মায়, আর তার উপর চড়ে বস্তু চলাচল করতে পারে। এখন ধন-ভর থেকে ঋণ-ভরের উৎপত্তি হলে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তা বৈদ্যুতিক না হয়ে যদি মহাকর্ষ শক্তির তরঙ্গ হয়, তবে আমরা একটা সমাধানে পৌঁছুতে পারি। ধরুন, কোয়াসারের আভ্যন্তরীণ তীব্র উষ্ণতা ও বস্তুর ঘনত্ব তার কণিকাগুলিকে যে গতিবেগ দেয়, তাতে সৃষ্টি হয় মহাকর্ষ-তরঙ্গের। আইনষ্টাইনের তত্ত্বে আরও একটি কথা জানা গেছে—ধন-ভর বা ঋণ-ভর, যে কেউ মহাকর্ষ-তরঙ্গের উৎস হতে পারে, কিন্তু এই তরঙ্গের শক্তি হবে ধনাত্মক, আর ধন-ভরই শুধু এই তরঙ্গের মাধ্যমে চলাফেরা করতে পারবে। এখন ধরা যাক, ১০ গ্র্যাম ধন-ভর ধন-ভরে পরিণত হতো। কিন্তু আইনষ্টাইন বলে রেখেছেন যে, কোন ভরই এমন মহাকর্ষ-তরঙ্গ বিকিরণ করতে পারে না, যার শক্তি ঋণাত্মক। বরং ২ গ্র্যাম ঋণ-ভর আরও ৪ গ্র্যাম শক্তি-তরঙ্গ পাঠালে ঋণ-ভরটি আরও বেশী ঋণাত্মক (-৬ গ্র্যাম) হয়ে পড়বে। এভাবে ভরটি যত বেশী ঋণাত্মক হবে, তার গতিবেগও ক্রমশঃ কমে আসবে—কারণ তার শক্তির মাত্রাও যে বেশী ঋণাত্মক হয়ে পড়ছে!

কোয়াসারের কেন্দ্র থেকে যে মহাকর্ষ-তরঙ্গ বাইরের দিকে বিপুল ধনাত্মক শক্তি নিয়ে বেরিয়ে আসছে—সেই শক্তির ঘাটতি পূরণ হচ্ছে কেন্দ্রে ঋণ-ভরের সৃষ্টিতে। ধন-ভর মহাকর্ষের টানে কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছে, আবার অন্যান্য কণিকার চাপে পড়ে কিছুটা ভাসবার চেষ্টা করছে। ঋণ-
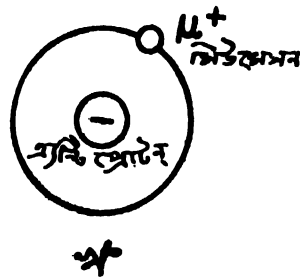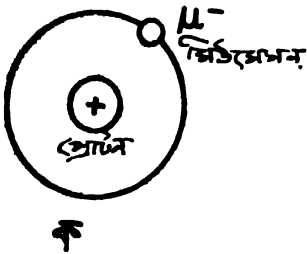
৪নং চিত্র
ক—মেসিক পরমাণু, খ—অ্যান্টিমেসিক (?) পরমাণু

মহাকর্ষ-তরঙ্গে যে শক্তি বিকিরণ করলো, তার ভর অনুরূপ ৬ গ্র্যাম (শক্তি ও বস্তু পরস্পর পরিবর্তনশীল)। তাহলে ধন-ভরের অবশিষ্ট পরিমাণ দাঁড়াবে ৪, কিন্তু যদি ১০ গ্র্যাম ধন-ভর ১২ গ্র্যাম অনুরূপ শক্তি বিকিরণ করে, তবে তার অবশেষ হলো ঋণাত্মক অর্থাৎ-২ গ্র্যাম। একেই আমরা বলছি ঋণ-ভর। এখন এই ঋণ-ভর যদি-৪ গ্র্যামের মত শক্তি বিকিরণ করতে পারতো, তবেই ঋণ-ভর ভরের গতিও মহাকর্ষের জন্যে কেন্দ্রের দিকে—কিন্তু বাইরের কণিকার চাপে তার ভেসে থাকবার দিকটা উল্টো। অর্থাৎ কোয়াসারের কেন্দ্রের দিকে। ফলে কোয়াসারের কেন্দ্রে ধন ও ঋণ-ভর মিলে গিয়ে শূন্য ভরের সৃষ্টি করেছে। কোয়াসারের দেহ তাই বিচিত্র, তার কেন্দ্রাঞ্চলটি ভরহীন, বাইরের দিকে রয়েছে ধন-ভর। কোয়াসারের যে

প্রচণ্ড শক্তি আমরা দেখেছি—তার ঘাট্‌তি ঋণ-ভরের আকারে জমা হচ্ছে তার কেন্দ্রে।

আমরা যে ঋণ-ভর দেখতে পাই না, তার কারণ এখন বুঝতে পারি। কোয়াসারের কেন্দ্র থেকে ঋণ-ভর তো ঠেলে বাইরে আসতে পারে না। কিন্তু যতই শক্তির বিকিরণ হচ্ছে, বাইরের দিকে ঋণ-ভর বেড়ে গিয়ে কোয়াসারের ভরহীন কেন্দ্রাঞ্চলটির ততই কেঁপে ওঠবার কথা। বেশী কেঁপে উঠলে জ্যোতিষ্কটি তো ভেঙ্গে পড়তে পারে। তখন কি ঋণ-ভর দেখা যাবে? তখন মহাকাশের ভিতর দিয়ে অন্য জ্যোতিষ্কের আকর্ষণে তাকে অবিলম্বে ঢুকে পড়তে হবে সেই জ্যোতিষ্কের কেন্দ্রে, বাইরে তার থাকা কখনও সম্ভব হবে না। আর মহাকর্ষ বলের কাছে ঋণ-ভরের পরস্পর বিকর্ষণই শুধু সম্ভব, তাই নতুন একটি ঋণ-ভরের জ্যোতিষ্কও কখনই গড়ে উঠবে না।

তবে মহাকাশে ক্ষণিক অবস্থানের সময় ঋণ-ভর যদি ধন-ভরের কাছে এসে যায়, তবে ধন-ভরটি আরও বেগে ছুটে চলবে। তখন এই ধনভরটি কোনক্রমে যদি আমাদের জগতে এসে পড়ে, তবে তাথেকে সৃষ্টি হবে মহাজাগতিক রশ্মিধারার। উচ্চ শক্তির মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের গবেষণাগারে ধরা পড়েছে—তার উৎস যে উল্লিখিত ঋণ-ভর নয়, একথা আমরা বলতে পারি না।

আজ পর্যন্ত চল্লিশটিরও অধিক কোয়াসারের-খবর পাওয়া গেছে—উল্টো ভরের মতবাদ দিয়ে তার শক্তির উৎস নির্ণয় যদি ভবিষ্যতের গবেষণায় যথার্থ প্রমাণিত হয়, তবে উল্টো ভরের উল্টো জগৎ খুঁজতে আমাদের বিশ্বের বাইরে যেতে হবে না।

মহাকাশ গবেষণায় আমাদের সবে হাতেখড়ি হয়েছে। বিপুল মহাকাশের অনেক কিছুই এখনও আমাদের অজানা। অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন, পজিট্রন দিয়ে গড়া উল্টো জগৎও হয়তো আমাদেরই বিশ্বে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। উল্টো ভরের বা উল্টো পরমাণুর উল্টো জগৎ যেখানেই থাকুক না কেন, তা চিরদিনই থাকবে আমাদের নাগালের বাইরে। উল্টো ভরের দেশে গেলে তাড়া খেয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে হবে, আর উল্টো পরমাণুর দেশে পাওয়া যাবে সাদর সম্ভাষণ, অথচ সমাপ্তি ঘটবে নিজের বিনাশে।

তাই চাঁদে, মঙ্গল বা শুক্রগ্রহে পাড়ি জমানোর কথা আনন্দে ভাবতে পারেন—কিন্তু উল্টো জগৎ সম্বন্ধে একটু সাবধান হতে হবে বৈকি!

"* * * দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গলাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

—বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১২৮৯)

বেতার-বার্তা পরিবেশনে উপগ্রহ

রবীন্দ্রনাথ রায়

কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে মহাকাশে গবেষণার কথা আমরা শুনেছি। আমরা উপগ্রহকে জেনেছি মহাশূন্যে ভ্রমণশীল এক গবেষণাগাররূপে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান কৃত্রিম উপগ্রহকে নিয়োজিত করছে আর এক অভিনব পরিকল্পনায়—উপগ্রহের সহায়তায় বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে—সঙ্গীত বা ছবি পরিবেশন করা হবে। ভূপৃষ্ঠের যে কোন স্থানের বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত টেলিফোনের কথা বা টেলিভিসনের ছবির সঙ্কেত—উপগ্রহ প্রথমে গ্রহণ করবে; তারপর উপগ্রহের ভিতরে সন্নিবেশিত যন্ত্রাবলী সেই (ছবি বা সঙ্গীতের) সঙ্কেত বহুগুণে পরিবর্ধিত করে পুনরায় পরিবেশন করবে তার প্রেরক-যন্ত্র দিয়ে। মহাকাশে ভ্রাম্যমান উপগ্রহ হবে একটি পুনর্বিকিরণ কেন্দ্র-স্বরূপ (Relay Station)—পুনঃপরিবেশিত এই সঙ্কেত তখন পৌঁছে যাবে বহুদূরে অবস্থিত গ্রাহক-যন্ত্রে। মহাসাগরের ব্যবধান অতিক্রম করে এক মহাদেশ থেকে অপর মহাদেশে কথা, গান বা ছবির পরিবেশন আজ শুধু বিজ্ঞানীর মানস-কল্পনা নয়, মার্কিন বিজ্ঞানীদের কুশলী প্রচেষ্টায় এরূপ কয়েকটি উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করা হয়েছে—পৃথিবীব্যাপী বেতার-বার্তার পরিবেশনে উপগ্রহের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় পুনর্বিকিরণ কেন্দ্র-স্বরূপ উপগ্রহ আজ এক সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

উপগ্রহ-সহযোগে এই বেতার-বার্তা পরিবেশন করা হয় বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে; কিন্তু সেই তরঙ্গ বেতার-অনুষ্ঠান প্রচারে ব্যবহৃত সাধারণ বেতার-তরঙ্গের অনুরূপ নয়। উপগ্রহে ব্যবহৃত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুবই কম—কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র। এরূপ ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের নাম মাইক্রো-তরঙ্গ (Microwaves)। বেতার-অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় যে তরঙ্গে, তার দৈর্ঘ্য ১৫ মিটার থেকে ৫০০ মিটার পর্যন্ত। এরূপ তরঙ্গকে বেতার-বার্তা প্রেরণের কাজে নিয়োগ করবার মূলে রয়েছে কয়েকটি ধাপ। বেতার-কেন্দ্রের ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয় সঙ্গীত বা যন্ত্রধ্বনি, মাইক্রোফোন ও পরিবর্ধক যন্ত্র সাহায্যে রূপ নেয় শ্রুতিগোচর তরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গরূপে, তারপর এই বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে মেশানো হয় বাহক বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে। সঙ্গীত-তরঙ্গ-বহনশীল এই মিশ্রিত তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়েল (Aerial) থেকে। এই মিশ্রিত বাহক-তরঙ্গের কিছু অংশ চলে যায় ঊর্ধ্বাকাশে—প্রতিফলিত হয় (বেতার-তরঙ্গের কাছে দর্পণস্বরূপ) আয়ন-মণ্ডলে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কি. মি. থেকে ৫০০ কি. মি. উচ্চতায় বিস্তৃত আয়নিত বায়ুস্তর ফিরিয়ে দেয় বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর বুকে। গ্রাহক-যন্ত্রে তখন ধরা পড়ে দূরে অবস্থিত বেতার-কেন্দ্রের প্রতিটি অনুষ্ঠান সঙ্গীত বা সংবাদ-পরিক্রমা। কিন্তু বাহক বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি ১৫ মিটারের কম হয়, যদি মাইক্রো-তরঙ্গের মত কয়েক সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় বেতার-বার্তা পরিবেশনে, তখন আসে এক প্রধান বাধা। মাইক্রো-তরঙ্গের মত ক্ষুদ্র তরঙ্গ আকাশের আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয় না; আকাশ-পথে প্রেরিত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডল ভেদ করে মহাকাশে মিলিয়ে যায়, কখনই তা পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে না।

আকাশে মাইক্রো-তরঙ্গের উপযোগী দর্পণ নেই, তাহলে কি করে মাইক্রো-তরঙ্গের সাহায্যে দূর-দূরান্তে বেতার-বার্তার আদান-প্রদান সম্ভব হবে?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার—বেতার-বাহক হিসাবে ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহারে কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বৈদ্যুতিক বিভ্রাট বা রব (Noise) কম। বেতার-গ্রাহক যন্ত্র চালু করলেই দেখা যায়, মিডিয়াম তরঙ্গে বৈদ্যুতিক রব অত্যধিক; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে মেঘে মেঘে চলে বিদ্যুৎ-সঞ্চার, বজ্রধ্বনি শোনবার আগেই বেতার-গ্রাহকে ধরা পড়ে অনাকাঙ্খিত এক ধ্বনি। আবার হয়তো বৈদ্যুতিক মোটর চলেছে অদূরে কোনস্থানে, মোটরের অংশবিশেষে হচ্ছে স্ফুলিঙ্গ বিক্ষেপ, বেতার-গ্রাহক যন্ত্রে শোনা যায় শ্রুতিকটু এক রব। তাছাড়া মহাকাশের সুদূর সীমায় রয়েছে ছায়াপথে অবস্থিত তারকা-মণ্ডলী তারাও পাঠায় তড়িৎ-চৌম্বকধর্মী এক অর্থহীন তরঙ্গমালা, গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে মহাকাশের প্রেরিত রব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কমে বৈদ্যুতিক এই বিভ্রাট বা রবের মাত্রা তত কমে। মিডিয়াম তরঙ্গের বদলে হ্রস্বতর তরঙ্গে এই রবের মাত্রা যে কম, তা বেতার অনুষ্ঠানের শ্রোতা প্রত্যেকেই জানেন। মাইক্রো-তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই বৈদ্যুতিক রবের মাত্রা খুবই সামান্য; এই কারণে মাইক্রো-তরঙ্গ বেতার-বার্তা পরিবেশনের জন্য আদর্শ বাহক-তরঙ্গ।

তাছাড়া বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যত কমে, সেই তরঙ্গের সঙ্কেত-ধারণ ক্ষমতা তত বাড়ে। গ্রাহক-যন্ত্র দিয়ে বেতার অনুষ্ঠান শোনবার সময়ে হয়তো সকলেই লক্ষ্য করেছেন—মিডিয়াম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে বেতার-প্রেরক ষ্টেশনের সংখ্যা কম। হ্রস্বতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে (Short wave) ষ্টেশনের সংখ্যা অনেক বেশী। তাহলে আশা করা যায়, আরও ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ—মাইক্রো-তরঙ্গকে বেতার-বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হলে অনেকগুণ বেশী সংখ্যার ষ্টেশনের অনুষ্ঠান একসঙ্গে প্রচার সম্ভব হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে —৩০০ মিটার দীর্ঘ তরঙ্গের সঙ্কেত-ধারণ ক্ষমতা
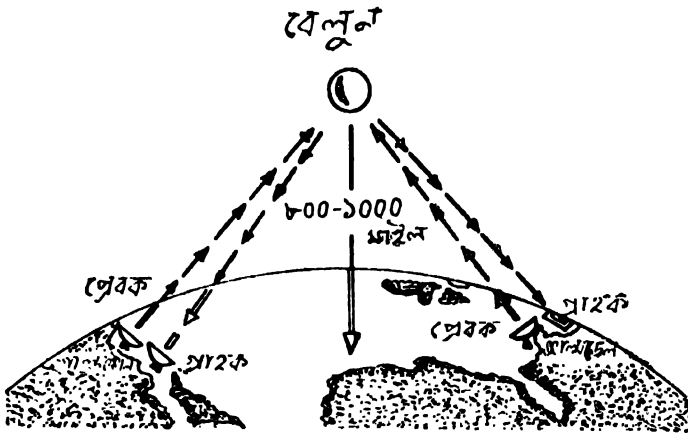
১নং চিত্র

বেলুন উপগ্রহ দিয়ে সংবাদ আদান-প্রদান।

যদি হয় পঞ্চাশ, ৩ সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরঙ্গের সেই ক্ষমতা হবে পাঁচ লক্ষ। অতএব ৩০০ মিটার দীর্ঘ তরঙ্গের ক্ষেত্রে যদি ৫০টি ষ্টেশনের অনুষ্ঠান প্রচার সম্ভব হয়, সেস্থলে ৩ সেন্টিমিটার দীর্ঘ মাইক্রো-তরঙ্গ ৫ লক্ষটি ষ্টেশনের অনুষ্ঠান প্রচারে সক্ষম।

তাই আজকাল মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে বাহক-তরঙ্গ হিসাবে। একই দেশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প দূরত্বের ব্যবধানে—শহর থেকে শহরে টেলিফোনের কথা বা টেলিভিশনের ছবির সঙ্কেত প্রচার করা হচ্ছে মাইক্রো-তরঙ্গের মাধ্যমে। এই মাইক্রো-তরঙ্গ চলে সরল ঋজুরেখা পথে। উন্নত এক স্তম্ভশীর্ষে সাজানো এরিয়েল থেকে মাইক্রো-তরঙ্গ বিকিরিত হয়ে পৌঁছে যায় সরল রেখার পথ ধরে কিছুদূরে অবস্থিত অপর এক স্তম্ভশীর্ষের এরিয়েলে। কিন্তু প্রেরক ও গ্রাহক কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব যদি বেশী হয়, যদি দুটি কেন্দ্রের মধ্যে থাকে আটলান্টিক বা প্রশান্ত মহাসাগরের মত বিরাট ব্যবধান—মাইক্রো-তরঙ্গ তখন আর গ্রাহক কেন্দ্রে ঠিকমত পৌঁছায় না। বিশাল দূরত্বের ব্যবধানে ভূপৃষ্ঠের বক্রভাব ব্যক্ত হয়ে পড়ে, ভূপৃষ্ঠকে আর অনুভূমিক সমতল বলে গণ্য করা যায় না। ঋজুরেখ পথে চলমান মাইক্রো-তরঙ্গ প্রেরক কেন্দ্র থেকে এসে গ্রাহক কেন্দ্রের ঊর্ধ্বাকাশ দিয়ে চলে যায়, গ্রাহক কেন্দ্রের এরিয়েলে সঙ্কেতবাহী মাইক্রো-তরঙ্গ ধরা পড়ে না। প্রশ্ন উঠেছিল এমতাবস্থায় মাইক্রো-তরঙ্গ সহযোগে এক মহাদেশ থেকে অপর মহাদেশে বার্তা প্রেরণ কি করে সফল করে তোলা যায়?

বেতার-যোগাযোগে মাইক্রো-তরঙ্গ ব্যবহার করতে হলে প্রথম প্রয়োজন, মহাকাশে মাইক্রো-তরঙ্গের উপযোগী একটি দর্পণ। বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন—পৃথিবীর নিত্যসহচর চন্দ্রকেই ব্যবহার করা হবে মাইক্রো-তরঙ্গের প্রতিফলনে। ১৯৫৯ সালের ১৫ই মে তারিখে ইংল্যাণ্ডের Jodrel Bank গবেষণা-মন্দির থেকে মাইক্রো-তরঙ্গরশ্মি প্রেরণ করা হলো চন্দ্রপৃষ্ঠে; চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ধরা পড়লো সেই তরঙ্গ ২.৬ সেকেণ্ড পরে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে মার্কিন দেশে Cambridge, Massachusetts-এর গবেষণাগারে। প্রমাণিত হলো চন্দ্রগাত্রে মাইক্রো-তরঙ্গের প্রতিফলন সম্ভব। অতএব মাইক্রো-তরঙ্গকে বাহক হিসাবে ব্যবহার করে দূরদূরান্তে সংবাদ-প্রেরণও সম্ভব। জাগলো বিজ্ঞান-জগতে নতুন সাড়া! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সংবাদ পাঠালেন Maryland থেকে মাইক্রো-তরঙ্গের মাধ্যমে। চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলনের পরে সে সংবাদ ধরা পড়লো সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হাওয়াই দ্বীপে। কিন্তু চন্দ্র চলে তার আপন গতিতে তার আপন কক্ষপথে, পৃথিবীর এই আসল উপগ্রহের গতি ও আবর্তন-সময় প্রকৃতির নিয়মে বাঁধা, তা পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণের অধিকার বিজ্ঞানীর নেই। তাই বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন—তাঁরা সৃষ্টি করবেন কৃত্রিম উপগ্রহ, আর বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণাধীন এরূপ উপগ্রহ হবে সারা ভূপৃষ্ঠব্যাপী বেতার-যোগাযোগের কেন্দ্রস্বরূপ।

১৯৬০ সালের ১২ই অগাষ্ট তারিখে সৃষ্টি করা হলো Echo I নামে নিষ্ক্রিয় (Passive) উপগ্রহ; ৮০০-১০০০ মাইল উচ্চতায় আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে ঊর্ধ্বাকাশে স্থাপিত হলো একটি ১০০ ফুট ব্যাসের বেলুন (চিত্র-১)। বেলুনটির আবরণ ছিল যেন রূপার পাতের মত Aluminised Mylar Polyester দিয়ে গড়া। মাইক্রো-তরঙ্গের মত ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের সকল তরঙ্গ এই বেলুনের গাত্রদেশে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। মনুষ্য-সৃষ্ট উপগ্রহ স্থান নিল বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলক হিসাবে। আকাশে রইলো মাইক্রো-তরঙ্গের দর্পণ Echo I—বিজ্ঞানীরা দেখালেন দর্পণস্বরূপ বেলুনের কার্যকারিতা।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বাণী প্রচারিত হলো মাইক্রো-তরঙ্গ ও বেলুনের সহায়তায় আমেরিকার প্রতিটি রাষ্ট্রে। আবার চেষ্টা চললো আন্তর্মহাদেশীয় বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থার। ক্রান্সের Holmdel (New Jersy) থেকে সংবাদ- সঙ্গীত প্রেরিত হলো, Echo I উপগ্রহে প্রতিফলিত হয়ে সে তরঙ্গ পৌঁছে গেল আটলাণ্টিকের অপর পারে Goldstone-এর (California) গ্রাহক কেন্দ্রে। মহাসমুদ্রের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থা সফল হলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু এরূপ বার্তা-প্রেরণ ব্যবস্থায়ও যে অনেক বাধা। সুদূর আকাশে স্থাপিত চলমান উপগ্রহ—ক্ষুদ্রকায় এক বেলুন, কতটুকু তরঙ্গ-শক্তি সে প্রতিফলিত করতে পারে। প্রেরিত সঙ্কেত যখন গ্রাহক-যন্ত্রে ধরা পড়ে, এ যে বড় ক্ষীণ, বড় দুর্বল এই সঙ্কেতশক্তি। বার্তা পরিবেশনের পক্ষে এত দুর্বল সঙ্কেত যে যথেষ্ট নয়।

উপগ্রহ সহযোগে বেতার-যোগাযোগের পথে এই বাধা দূর করতে হবে—বিজ্ঞানীরা নিলেন নতুন পরিকল্পনা। উপগ্রহ নিষ্ক্রিয় হলে চলবে না, মাইক্রো-তরঙ্গ শুধু প্রতিফলন করেই উপগ্রহের কাজ শেষ হবে না, নতুন উপগ্রহ হবে সক্রিয় (Active), বেতার-যোগাযোগের কাজে উপগ্রহ সক্রিয় সহযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। এরূপ উপগ্রহের মধ্যে সন্নিবেশিত থাকবে বিভিন্ন ধরণের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত মাইক্রোতরঙ্গ-বাহিত সঙ্কেত উপগ্রহ প্রথমে গ্রহণ

২নং চিত্র
টেলষ্টার উপগ্রহ

করবে, তারপর সেই সঙ্কেতটি তর্জমা করবে উপগ্রহের যন্ত্রাবলী অপর কোন দৈর্ঘ্যের মাইক্রো-তরঙ্গে। নতুন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে ও প্রচুর শক্তি-ক্ষমতায় প্রচারিত হবে তর্জমিত সঙ্কেত উপগ্রহের গাত্রদেশে সাজানো মাইক্রো-তরঙ্গের উপযুক্ত এরিয়েল থেকে (চিত্র-২)। এরূপ একটি সক্রিয় উপগ্রহের নাম Telster I। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত নিতে বা উপগ্রহ-প্রেরিত সঙ্কেতের জাতি নির্ণয়ে ভূপৃষ্ঠস্থিত গ্রাহক কেন্দ্রের কোন অসুবিধাই হয় না।

এই প্রেরক ও গ্রাহক-যন্ত্র ছাড়া উপগ্রহে থাকে আরও বিবিধ ধরণের যন্ত্র। ভূপৃষ্ঠস্থিত কেন্দ্র থেকে আসে আদেশ এক বিশিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে (২'৪৪ মিটার)। সেই আদেশ অনুযায়ী উপ-গ্রহের যন্ত্রাবলী কখনও চালু হয়, কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে ; কোন সময়ে উপগ্রহের গ্রাহক-যন্ত্র ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত বার্তা-সঙ্কেত গ্রহণ করে, আবার কোন সময়ে প্রেরক-যন্ত্র দিয়ে বার্তা পরিবেশন করে। তাছাড়া আকাশপথে চলবার সময়ে উপগ্রহ করছে ঊর্ধ্বাকাশের গবেষণা—সেখানে উষ্ণতা কত, বায়ুচাপের পরিমাণ কি, কি জাতীয়

৩নং চিত্র

উপগ্রহ সহযোগে সঙ্কেত আদান-প্রদানের পরিকল্পনা।

সঙ্কেত গ্রহণ করে টেলষ্টার এক মাইক্রো-তরঙ্গে, দৈর্ঘ্য তার ৪'৬৯৫ সে মি.। আর বহুগুণে পরিবর্ধিত সঙ্কেত পাঠিয়ে দেয় টেলষ্টার ৭'১৯৭ সে.মি. দীর্ঘ মাইক্রো-তরঙ্গে। সংবাদ-সঙ্গীত গ্রহণের জন্যে একটি তরঙ্গ, আর পুনরায় পরিবেশনের জন্যে ভিন্ন তরঙ্গ—এরূপ ব্যবস্থায় কোন্ সঙ্কেত উপগ্রহমুখী আর কোন্ সঙ্কেত উপগ্রহ-প্রেরিত তা চিনে

কণা রয়েছে মহাকাশে ছড়িয়ে—তারা কি ধন-বিদ্যুৎ বা ঋণ-বিদ্যুতে আহিত—সকল সংবাদ উপগ্রহ পাঠাচ্ছে আর একটি প্রেরক-যন্ত্র দিয়ে (চিত্র-৩) অপর এক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে (২'২ মিটার)। তাছাড়া উপগ্রহের মধ্যে সাজানো প্রত্যেকটি যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে কিনা—সে সংবাদও চাই, প্রতিটি যন্ত্রাংশের কাজ বিষয়ে খবর আসছে পূর্বোক্ত ২'২ মিটার দীর্ঘ বেতার-তরঙ্গে। এই বেতার-তরঙ্গকে আরও একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো হয়—কোন্ সময়ে আকাশের কোন্ স্থানে এই চলমান উপগ্রহ রয়েছে, তার অবস্থান নির্দেশ করে দেয় এই বেতার-তরঙ্গ। হয়তো সূক্ষ্মভাবে অবস্থান নির্ণয়ের কাজ দীর্ঘ ২'২ মিটার তরঙ্গে সম্ভব হলো না—উপগ্রহ সে জন্যে পাঠায় আর একটি মাইক্রো-তরঙ্গ—দৈর্ঘ্য তার ৭'৩৪৯ সে.মি.। এভাবে ভূপৃষ্ঠস্থিত কেন্দ্রে বসে বিজ্ঞানী সূক্ষ্ম অবস্থান নির্ণয় করে উপগ্রহের, নিয়ন্ত্রণ করে উপগ্রহের কাজ, সংগ্রহ করে মহাকাশ গবেষণার ফল.—আর বিজ্ঞানীর ইচ্ছামত উপগ্রহ টেলিফোন ও টেলিভিসনের সঙ্কেত পৃথিবীর একস্থান থেকে অপরস্থানে পরিবেশন করে।

সক্রিয় উপগ্রহে রয়েছে এত যন্ত্র—কত জটিল এর ক্রিয়াকাণ্ড। আমরা জানি Telstar উপগ্রহের যন্ত্রাবলী সৃষ্টি করবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল ১৪৬৪টি ডায়োড (Diode), ১০৬৪টি ট্রানজিষ্টর ও মাইক্রো-তরঙ্গ পরিবর্ধনের জন্যে একটি বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক ভাল্‌ভ—Travelling wave Amplifier। গ্রাহক, তরঙ্গ-শক্তি পরিবর্ধক, প্রেরক এরূপ বিবিধ যন্ত্র চলবে মহাকাশে বছরের পর বছর ধরে অনির্দিষ্ট কাল—কিভাবে চালানো হবে এই যন্ত্রাবলী—সে জন্যে চাই অফুরন্ত শক্তির উৎস। প্রত্যেকটি উপগ্রহের গাত্রদেশে সাজানো থাকে সারি সারি সৌর ব্যাটারী। সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এই ছোট ছোট দর্পণাকৃতির সৌর ব্যাটারী—তার ফলে আহিত হয় উপগ্রহের মধ্যে সন্নিবেশিত ক্যাডমিয়াম-নিকেল সমন্বয়ে গঠিত বৈদ্যুতিক ব্যাটারী। উপগ্রহ-গাত্রের সকল সৌর ব্যাটারী যেন সূর্যরশ্মির প্রভাবে আসে, সে জন্যে প্রতি সেকেণ্ডে ৩ বার ঘুরছে উপগ্রহ তার অক্ষের চারদিকে। ঘূর্ণনশীল উপগ্রহটির অক্ষের উপরেই থাকে কুণ্ডলাকৃতির এরিয়েল—ভূপৃষ্ঠ থেকে আদেশের অপেক্ষায়। এই এরিয়েল-কুণ্ডল যেন সব সময়ে পৃথিবীর দিকে নিশানা রাখে—আবার সৌর-রশ্মিও যেন উপগ্রহের গাত্রদেশে সমানভাবে পড়ে—সে জন্যে উপগ্রহের ঘূর্ণন-অক্ষটি পৃথিবীর ক্রান্তিপথের তলের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করে।

মাইক্রো-তরঙ্গের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র টেলিফোন, টেলিভিসনের ছবি প্রেরণের জন্যে মার্কিন বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি কয়েকটি উপগ্রহ সৃষ্টি করেছেন। নিম্নে উল্লিখিত সক্রিয় উপগ্রহগুলির অধিকাংশের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার (ভূপৃষ্ঠ থেকে নিকটতম ও দূরতম বিন্দু) অনুভূ-অপভূর দূরত্ব ও কক্ষপথে এদের আবর্তন সময় বিভিন্ন।

উপগ্রহ	কক্ষে স্থাপনের তারিখ	অপভূ মাইল	অনুভূ মাইল	আবর্তন সময় মিনিট	চৌম্বক নিরক্ষ তলের সঙ্গে কক্ষতলের নতি
Courier I B	৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬০	৬৫৮	৫০১	১০৯	২৮°৩
Telstar I	১০ই জুলাই, ১৯৬২	৩৫১৪	৫৯২	১৫৭'৮	৪৪°৮
Relay	১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৬২	৪৬১১	৮১৮	১৮৫	৪৭°৪
Telstar II	৭ই মে, ১৯৬৩	৬৭১৩	৬০৪	২২৫'৪	৪২°৭

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের আকাশে উপগ্রহের সঞ্চার পথ বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক। আমরা জানি Telstar I উপগ্রহ ২ঘ. ৩৭.৮ মি সময়ে উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিক্রমণ করছে (চিত্র-৪)। ভূচৌম্বক নিরক্ষ তলের সঙ্গে এর কক্ষতল ৪৪.°৮ ডিগ্রী কোণে আনত। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার পথে উপগ্রহটি কখনও পৌঁছে যায় ৪৪.°৮ উঃ অক্ষাংশে, আবার কখনও সে আসে ৪৪.°৮ দঃ অক্ষাংশে। আকাশে সঞ্চরণ-পথ জানতে হবে, তার উদয়-অস্তের লগ্নমুহূর্ত জানতে হবে, যে কোন মুহূর্তে উপগ্রহের অবস্থান জানা যদি থাকে তবেই বেতার-প্রেরিত সঙ্কেত উপগ্রহ-যোগে পরিবেশন সম্ভব হবে।

কিন্তু উপগ্রহটি যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে আকাশের কোন স্থানে স্থির অচঞ্চল ভাবে থাকতো, তাহলে বেতার-যোগাযোগের পক্ষে উপগ্রহ আরও সহায়ক হতো। উপগ্রহ সর্বদাই চলবে তার
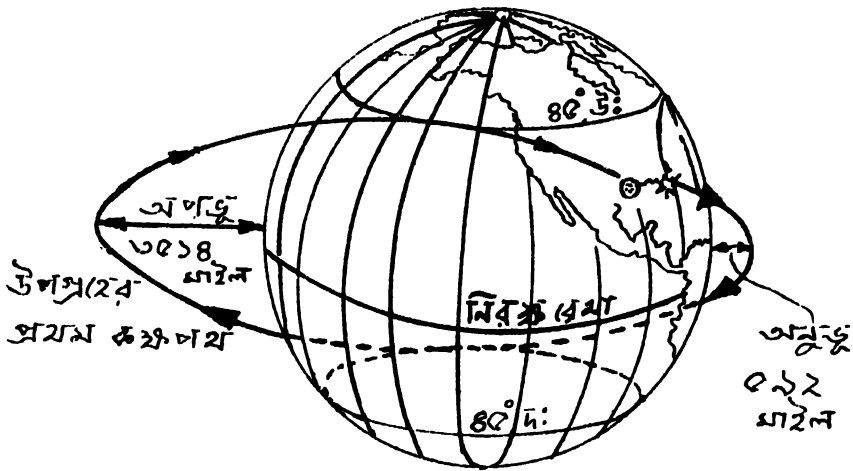
৪নং চিত্র
টেলষ্টার উপগ্রহের প্রথম কক্ষপথ।

অতএব ৪৪.°৮ উঃ/দঃ অক্ষাংশের মধ্যে যে কোন স্থানের আকাশে প্রতি ২ ঘ. ৩৭.৮ মি. সময়ের ব্যবধানে উপগ্রহকে পাওয়া যাবে। আমরা চাই বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় উপগ্রহের অবিচ্ছিন্ন সহযোগিতা। ভূপৃষ্ঠের দুটি সংযোগ-সন্ধানী ষ্টেশনের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানের আকাশে উপগ্রহটি যদি উপস্থিত না থাকে—এই বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থা কখনই সম্ভব হতে পারে না। উল্লিখিত প্রত্যেকটি সক্রিয় উপগ্রহ আকাশে সঞ্চরণশীল। এরূপ গতিশীল বেতার-যোগাযোগ কেন্দ্রকে কাজে লাগাতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন উপগ্রহ বিষয়ে পঞ্জিকা। প্রত্যেকটি উপগ্রহের কক্ষপথে পৃথিবী পরিক্রমণে, কিন্তু তার আবর্তন-সময় যদি পৃথিবীর অক্ষের চারদিকে ঘূর্ণনের সময় ২৩ ঘ. ৫৬ মি.-এর সমান হতো—উপগ্রহটিকে আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের মনে হতো আকাশে স্থির হয়ে আছে। এরূপ উপগ্রহের নাম Syncom বা Synchronous Communication Satellite। ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২,৩০০ মাইল উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে এরূপ একটি Syncom উপগ্রহ স্থাপন করা হয়েছে ১৯৬৩ সনের ২২শে জুলাই তারিখে। ঊর্ধ্বাকাশে (আপাতঃদৃষ্টিতে) অচঞ্চল এই উপগ্রহ বেতার-বার্তা পরিবেশনে শ্রেষ্ঠ সংযোগ কেন্দ্র।

ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২,৩০০ মাইল উচ্চতায় স্থাপিত হলেও একটি Syncom উপগ্রহ প্রেরিত বেতার-সঙ্কেত পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছায় না। উপগ্রহ-প্রেরিত বেতার-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৪২% অংশে। অতএব সারা পৃথিবী জুড়ে সর্বক্ষণ বেতার-যোগাযোগ ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে হলে প্রয়োজন অন্ততঃ তিনটি Syncom উপগ্রহের (চিত্র-৫)। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পরিকল্পনা করেছেন—তাঁরা স্থাপন করবেন তিনটি Syncom উপগ্রহ বৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত অঞ্চলে। যে কোন দুটি উপগ্রহের মধ্যে কৌণিক ব্যবধান হবে ১২০°। একটি উপগ্রহ থাকবে আটলান্টিক মহাসাগরের উপরে, দ্বিতীয়টি প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে, আর তৃতীয়টি থাকবে ভারত মহাসাগরের উপরের আকাশে। ভূপৃষ্ঠের যে কোন ষ্টেশন (ধরুন ওয়াশিংটন) থেকে টেলিফোন বা টেলিভিসনের সঙ্কেত ভূপৃষ্ঠের অপর দিকে অবস্থিত গ্রাহক ষ্টেশনে (ধরুন কলকাতায়) একটি উপগ্রহ দিয়ে প্রেরণ হয়তো সম্ভব হবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রথম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রেরিত সঙ্কেত গ্রহণ করে পাঠিয়ে দেবে আকাশপথে সোজাসুজি দ্বিতীয় উপগ্রহে। শেষোক্ত উপগ্রহটি তারপর সেই বার্তা পরিবেশন করবে গন্তব্যস্থলের গ্রাহক কেন্দ্রে। এইভাবে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সর্বক্ষণ মাইক্রো-তরঙ্গ-বাহিত টেলিফোন বা টেলিভিসন সঙ্কেত পরিবেশনের পরিকল্পনা উপগ্রহের সক্রিয় সহায়তায় সম্ভব হতে চলেছে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করবো—উপগ্রহের সাহায্যে বেতার-বার্তা পরিবেশনের পরিকল্পনায় ভারতবর্ষও এগিয়ে এসেছে। আহমেদাবাদ শহরের সন্নিকটে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উপগ্রহ-বার্তা-যোগাযোগ কেন্দ্র। অদূর ভবিষ্যতে আমরা টেলিফোনে কথা বলবো—বিদেশী বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে—মাইক্রো-তরঙ্গ নিয়ে যাবে আমাদের কথা উপগ্রহে—সেই বেতার-সঙ্কেত প্রেরিত হবে আলোর গতিতে অপর এক উপগ্রহে, তারপর সেই সঙ্কেত যাবে গন্তব্যস্থলে। টেলিফোনে কথা চলবে পৃথিবীর প্রতিপাদ বিন্দুদ্বয়ে অবস্থিত দুটি শহরে, বেতার-যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে দূরত্বের দুস্তর ব্যবধানকে অতিক্রম করে উপগ্রহের সাহচর্যে। জাপান, আমেরিকা বা ইংল্যাণ্ড যে কোন দেশের টেলিভিসনের ছবি ভেসে উঠবে আমাদের টেলিভিসন গ্রাহক-যন্ত্রে উপগ্রহের মাধ্যমে।

৫নং চিত্র
তিনটি Syncom উপগ্রহ দিয়ে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সর্বক্ষণ সংবাদ পরিবেশন।

সাইক্লোট্রোনের ক্রমবিকাশ

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

এই কাহিনীর সুরু ১৯৩১ সালে, যখন ক্যালিফোর্ণিয়ার বার্কলে গবেষণাগারে আর্নেস্ট লরেন্সের হাতে তৈরি হলো পৃথিবীর প্রথম সাইক্লোট্রোন। সাইক্লোট্রোন একটি ত্বরণ যন্ত্র। ত্বরণ যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গেলে আরও একটু উপক্রমণিকা চাই। ইতিহাসকে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক আরও বছর বারো, পৌঁছানো যাক ১৯১৯ সালের ইংল্যাণ্ডে, লর্ড রাদারফোর্ডের লেবরেটরীতে। রাদারফোর্ড লক্ষ্য করছিলেন যে, স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে যে আলফা কণা পাওয়া যায় তাকে দিয়ে স্থায়ী মৌলের কেন্দ্রককে আঘাত করে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব। তারপর কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন মৌলের কেন্দ্রকে বিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব হলো আলফা কণার আঘাতে। কেন্দ্রকের ভিতরে কি আছে, কি তাদের ধর্ম—এসব সম্বন্ধে নতুন সব তথ্য উদ্ঘাটিত হলো। কিন্তু স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি থেকে যে আলফা রশ্মি বেরোয়, তাদের শক্তি নির্দিষ্ট এবং প্রকৃতিতে আহরণ করবার মত যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বস্তু আছে, তাও সীমিত। ১৯২৬-২৭ সাল থেকেই তত্ত্বীয় পদার্থবিদেরা অনুমান করছিলেন যে, প্রোটন দিয়ে পরমাণু-কেন্দ্রককে আঘাত করলে অনেক নতুন সংবাদ পাওয়া যাবে এবং প্রোটন দিয়ে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটাবার সম্ভাবনাও খুব বেশী হবে। কিন্তু এমন কোন স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌল জানা নেই, যা থেকে প্রোটন বেরোয়। সুতরাং একমাত্র আশা, কৃত্রিম কোন উপায়ে যদি প্রোটনকে ত্বরিত করা যায়। ত্বরণ যন্ত্র বা অ্যাকসিলারেটর তৈরির এই হলো প্রধান প্রেরণা।

আহিত কণা ত্বরিত করবার একমাত্র উপায় ঐ আহিত কণাটিকে একটি তড়িৎ-ক্ষেত্রের মধ্যে রাখা। ধরা যাক, একটি বায়ুশূন্য বাক্সে দুটি তড়িদ্ধারের মধ্যে এক ভোল্ট তড়িৎ বিভব সৃষ্টি করা হয়েছে, এখন তড়িতের ধর্ম অনুযায়ী একটি ইলেকট্রন নেগেটিভ প্লেটের মুখে রাখলে সেটি পজিটিভ প্লেটের দিকে আকৃষ্ট হবে। যখন ইলেকট্রন পজিটিভ প্লেটের কাছে পৌঁছুবে, তখন তার শক্তির পরিমাণ হবে ১ ইলেকট্রন ভোল্ট বা ১ eV। ইলেকট্রন ভোল্ট (eV), বিশেষ করে মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (MeV) আহিত কণাসমূহের শক্তির একক হিসেবে ব্যবহার হয়। ১ MeV হচ্ছে $১\cdot৬\times১০^{-৬}$ আর্গ। আবার একটি প্রোটন যদি পজিটিভ প্লেটের কাছে ছাড়া যায়, তবে সেটি যখন নেগেটিভ প্লেটের কাছে পৌঁছুবে, তখন তারও শক্তি হবে ১ eV। কারণ সকলেরই জানা যে, প্রোটনের বৈদ্যুতিক আধানের পরিমাণ ইলেকট্রনের বৈদ্যুতিক আধানের সমান। এই পর্যন্ত বেশ চমৎকার। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া ঘটানো—দশ, বিশ, এক-শ', এমন কি হাজার ইলেকট্রন ভোল্টের কর্ম নয়। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে যে আলফা কণা বেরোয়, তাদের শক্তি হয়ে থাকে ৭ MeV পর্যন্ত। শক্তি অন্ততঃ কয়েক মিলিয়ন ভোল্ট পর্যন্ত না তুলতে পারলে প্রোটন দিয়ে কেন্দ্রীন বিক্রিয়া সম্ভব হবে না। এটা শেষ অবধি ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যায় দাঁড়ালো। প্রথমতঃ, কি করে কয়েক মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপন্ন করা যায়, দ্বিতীয়তঃ, এমন কি অপরিবাহী বা অন্তরক মাধ্যম পাওয়া যেতে পারে, যার এই

উচ্চ বিভব ধারণ ক্ষমতা আছে। এই সমস্যার প্রথম সমাধান করলেন ১৯৩০ সালে কক্‌ক্রফ্‌ট্ ও ওয়ালটন ক্যাস্‌কেড জেনারেটর তৈরি করে। তবে অসুবিধার মধ্যে, এথেকে ১ MeV-এর বেশী শক্তি পাওয়া গেল না।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আর একটা অভিনব উপায়ে এই সমস্যার আর এক সমাধান বের হলো। উদ্ভাবক আর্নেষ্ট লরেন্স। আহিত কণাসমূহের ধর্ম তড়িৎ-ক্ষেত্রের বলরেখা ধরে সোজা চলা। আবার চৌম্বক ক্ষেত্রে ঐ আহিত কণা বৃত্তাকার পথে চলে। ১নং চিত্রে ইংরেজি অক্ষর D-এর আকারের দুটি তড়িদ্বারের মাঝখানে—ধরা যাক, একটি প্রোটনের উৎস রাখা হয়েছে। ক নামক ডি-তে পজিটিভ ও খ নামক ডি-তে নেগেটিভ বিভব দেওয়া আছে। স্বভাবতঃই প্রোটনগুলি খ নামক ডি-র দিকে আকৃষ্ট হবে। একবার ডি-এর মধ্যে ঢুকে গেলে সেখানে আর তড়িৎ-ক্ষেত্র নেই। ডি দুটি যদি একটি তড়িৎ-চুম্বকের মধ্যতলে এমনভাবে রাখা থাকে যে, চৌম্বক বলরেখাগুলি ডি-তলের উপর লম্বভাবে অবস্থান করে, তবে ডি-এর মধ্যে ঢুকেই প্রোটনটি এক বৃত্তাকার পথে চলবে। যে সময় প্রোটনগুলি, অর্ধবৃত্ত সম্পূর্ণ করে ডি ফাঁকের মধ্যে এসে পৌঁছুচ্ছে, তখন যদি ডি-গুলির বিভব চিহ্ন উল্টে দেওয়া যায় অর্থাৎ খ পজিটিভ ও ক নেগেটিভ হয়, তবে প্রোটনগুলি আবার ক ডি-এর দিকে আকৃষ্ট হবে। ক ও খ-এর মধ্যে বিভব-পার্থক্য যদি V হয়, তবে খ থেকে বেরোবার সময় প্রোটন-গুলির শক্তি হবে e×V। এর পরে ক ডি-এর অর্ধবৃত্ত পথ অতিক্রম করে খ ডি-এর মুখে আসবার সময় শক্তি হবে e×2V। প্রথম অর্ধবৃত্ত থেকে দ্বিতীয়টি একটু বড় হবে। তৃতীয়টি হবে আরও একটু বড়। এইভাবে চলবে। ক ও খ-এর মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের পরিবর্তী তড়িৎ বিভব দিতে পারলে প্রোটন কণাগুলি এইভাবে শক্তি আহরণ করে চলবে, যতক্ষণ না তারা ডি-বাক্সের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছয়। লরেন্সের কৌশল হলো, এক সঙ্গে মিলিয়ন ভোল্ট বিভব উৎপাদন না করে অপেক্ষাকৃত অল্প বিভবের মধ্যে আহিত কণাগুলিকে বার বার ঘুরিয়ে তাদের

১নং চিত্র
সাইক্লোট্রোন ত্বরণ

উচ্চশক্তিতে শক্তিমান করা। চক্রাকার (Cyclic) পথে ত্বরণ সৃষ্টি করবার জন্যেই এর নাম হলো সাইক্লোট্রোন (Cyclotron)।

পদ্ধতিটি শুনতে যত সোজা, কাজের বেলায় ততটা নয়। যন্ত্রটি তৈরি করতে গিয়ে দেখা গেল এর সমস্যা অনেক। সময়াভাবে আমরা সাইক্লোট্রোনের যান্ত্রিক জটিলতার মধ্যে না গিয়ে এই প্রবন্ধে শুধু চেষ্টা করবো সাইক্লোট্রোনের মূল সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করবার। আহিত কণা ত্বরিত করবার ব্যাপারে তত্ত্বগত বাধা কোথায়, এই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

এখানে Hev হলো অপকেন্দ্র বল এবং mv^2/r হলো অভিকেন্দ্র বল।

v হলো সরলরৈখিক বেগ। কৌণিক বেগ ω তাহলে হবে $\omega = \frac{v}{r} = \frac{eH}{m}$

আহিত কণাগুলির কেন্দ্রের উৎস থেকে বেরিয়ে ক্রমবর্ধমান অর্ধবৃত্তাকার সর্পিল পথে ঘুরে যাওয়া সর্তসাপেক্ষ। আহিত কণা যে সময়ে অর্ধবৃত্ত অতিক্রম করবে তাকে হতে হবে পরিবর্তী তড়িৎ বিভবের দোলন কালের অর্ধেকের সমান; অর্থাৎ পরিবর্তী তড়িতের বৃত্তীয় কম্পাঙ্ক
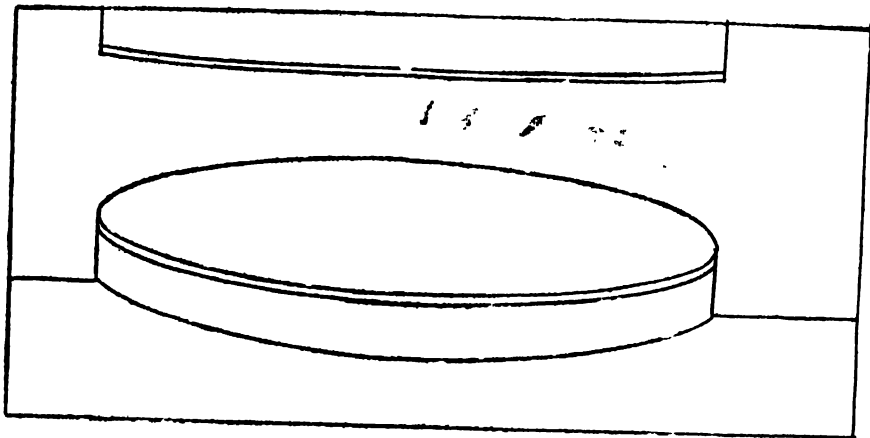
২নং চিত্র

সাইক্লোট্রোন চুম্বকের মেরুতল

সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে আহিত কণার শক্তি কতদূর বাড়ানো যেতে পারে, তার হিসাব করতে গেলে আমাদের অঙ্কের সাহায্য না নিয়ে উপায় নেই। একটি সমসত্ত্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে (H) v বেগে যদি কোন আহিত কণা, যার আধান e এবং ভর m ছাড়া থাকে, তবে সেটিকে 2r ব্যাসের বৃত্তাকার পথে ঘুরতে হলে নিম্নলিখিত সমীকরণটি মেনে চলা দরকার।

$$Hev = \frac{mv^2}{r}$$

(Circular frequency) যদি ω_0 হয় তবে তাকে ω-র সমান হতে হবে।

অর্থাৎ, $\omega_0 = \frac{eH}{m}$

সুতরাং পরিবর্তী তড়িৎ বিভবের কম্পাঙ্ক

$$f_0 = \frac{eH}{2\pi m}$$

একেই বলা হয় সাইক্লোট্রোন অনুনাদ (Cyclotron resonance) সর্ত। যে কণাগুলি ডি-এর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ত্বরিত হবে, তাদের শক্তি কত?

R ব্যাসার্ধ যদি ত্বরণের সীমা হয় তবে শক্তি হবে-

$$E = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m (R\omega_0)^2 = \frac{H^2 R^2 e^2}{2m}$$

অথবা $$2\pi^2 R^2 f_0^2 m$$

চৌম্বক ক্ষেত্রের মান ১০-১৫ হাজার গাউসের বেশী করা সম্ভব নয়। তাই শক্তি বাড়াবার উপায় হলো R বাড়ানো, অর্থাৎ তড়িচ্চুম্বকের ব্যাস বাড়ানো। কোন সাইক্লোট্রোনের শক্তির মান বোঝাবার জন্যে তড়িচ্চুম্বকের মেরুতলের (Pole face) ব্যাস বলা হয়। ২নং চিত্র।

অনুনাদ সর্ত থেকে পরিবর্তী তড়িৎ বিভবের কম্পাঙ্ক হিসেব করলে দেখা যাবে, তা প্রতি সেকেণ্ডে ৫ থেকে ১৫ মেগাসাইকল। সুতরাং এটি বেতার কম্পাঙ্কের (Radio frequency) পাল্লার মধ্যে পড়ে। সমীকরণে তড়িৎ বিভব মানের কোন উল্লেখ নেই। নীতিগত ভাবে বিভব মাত্রা যাই হোক না কেন, ত্বরণ ক্রিয়া বন্ধ হবার কথা নয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি ডি-এর মধ্যে তড়িৎ বিভব যত বাড়ানো যায় ততই ভাল। ৫০ থেকে ১০০ কিলো ভোল্ট সাধারণতঃ প্রয়োগ করা হয়।

প্রোটন ছাড়া অন্যান্য আহিত কণা সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে ত্বরিত করা হয়েছে; যেমন—ডয়টেরন (H^2), ট্রাইটন (H^3), আলফা (He^4), হিলিয়াম-৩ (He^3)। পরে অবশ্য আরও ভারী কণা ত্বরিত করা হয়েছে। যে সব সাইক্লোট্রোন এখনও চালু আছে, তাদের কয়েকটির তালিকা দেওয়া হলো—

মেরু-তলের ব্যাস	এম ই ভিতে শক্তি	স্থান
৩৭″	৪ p	কলকাতা
৪২.৫″	১৫ d	কিয়াটো, জাপান
৬১.৫″	২০ d	বার্মিংহাম, ইংল্যাণ্ড
৮৩″	২২ d	ষ্টকহলম, সুইডেন
৮৬″	২২ p	ওকরিজ, টেনেসি, আমেরিকা
৯০″	১৪ p	লিভারমোর, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা

p—প্রোটন d—ডয়টেরন

এই তালিকাটি দেখলেই বোঝা যাবে, সাইক্লোট্রোন দিয়ে ত্বরিত শক্তি সীমিত। কিন্তু কেন? যদি আমাদের সমীকরণগুলি সম্পূর্ণভাবে খাটতো তাহলে কোন কথা ছিল না। তড়িচ্চুম্বকের ব্যাস বাড়িয়ে বেশী শক্তি পাওয়া সম্ভব হতো। কিন্তু শক্তি বেশী বাড়তে থাকলে আহিত কণাগুলির ভর আর ধ্রুব থাকতে পারে না। অনুনাদ সর্তে কণার ভর m-কে ধ্রুবক ধরা হয়েছিল। কণার বেগ অতিরিক্ত বাড়লে সেটা আর খাটে না। কণাটি যত দ্রুত থেকে দ্রুততর বেগে ছুটে চলবে, তার ভর আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র অনুযায়ী বেড়ে হবে

$$\frac{m_0}{\sqrt{1-}}$$

এখানে m_0 হলো কণার স্থিতিভর (Rest mass), v হলো কণার বেগ আর c আলোর বেগ—প্রতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। ১০ Mev প্রোটনের বেগ আলোর বেগের দশমাংশের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। নতুনভাবে তাহলে অনুনাদ সর্তটি দাঁড়াবে—

$$f = \frac{eH}{2\pi m_0}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

অর্থাৎ কণাগুলির শক্তি যত বাড়বে v তত বাড়বে এবং $\frac{v^2}{c^2}$ অনুপাতও বাড়বে। সাইক্লোট্রোন অনুনাদ সর্তটি আর কার্যকর হবে না। তাই মামুলী সাইক্লোট্রোনে ২০/২২ MeV-এর বেশী শক্তিতে প্রোটনকে ত্বরিত করা কঠিন। ২০ Mev কেন—সে কথায় আসছি। শক্তিবৃদ্ধি ছাড়াও সাইক্লোট্রোনের আর একটি উদ্দেশ্য হলো আহিত সংখ্যক কণা ব্যাসার্ধ বরাবর কেন্দ্র থেকে দূরে চলে যেতে চেষ্টা করে। এদের মধ্যতলে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা দরকার। সাইক্লোট্রোনের ভাষায় এই প্রচেষ্টার নাম ফোকাসিং। উল্লম্বগতি সীমিত করাকে বলে উল্লম্ব ফোকাসিং এবং ব্যাসার্ধ বরাবর গতি সীমিত করাকে বলে অরীয় ফোকাসিং (Radial focussing)। গতিবিস্তার সাহায্যে উল্লম্ব দোলন (Vertical oscillation) এবং অরীয় দোলনের (Radial
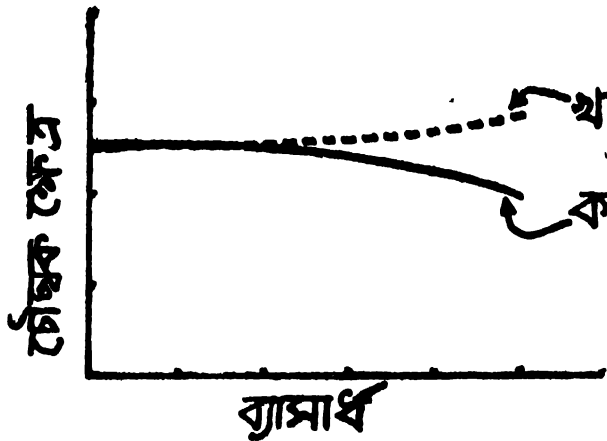
৩নং চিত্র
চুম্বকের কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা;
ক—সাইক্লোট্রন, খ—এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন

কণার সংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থাৎ যত বেশী সম্ভব আহিত কণাকে ত্বরিত করা। আমাদের আলোচনা ও সর্তগুলি এতক্ষণ কেবল চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যতলে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। প্রোটনের উৎস হিসাবে সাইক্লোট্রোন চুম্বকের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়া হয়। বৈদ্যুতিক ক্ষরণের সাহায্যে হাইড্রোজেনকে আয়নিত করলে প্রোটন পাওয়া যাবে। এই প্রোটনগুলি প্রথম ডি-তে ঢোকে শঙ্কুর (Cone) আকারে। সব সময় বেশ কিছু সংখ্যক কণা মধ্যতল থেকে তার নীচে বা উপরে ছিটকে যেতে চায়। আবার কিছু oscillation) সূত্র বের করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের মান যদি কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বরাবর চুম্বকের পরিধি পর্যন্ত ধীরে ধীরে কমানো যেতে থাকে তাতে উল্লম্ব ফোকাসিং-এ সাহায্য হয়; অর্থাৎ সাইক্লোট্রোনের ভাষায় বিম কারেন্ট বাড়ে (৩নং চিত্র)। এই সর্ত টি অনুনাদ সর্তের পরিপন্থী। ফলে উচ্চ শক্তি ও প্রয়োজনীয় বিম কারেন্টের মধ্যে একটা আপোষ করতে হয়। তাই মামুলী সাইক্লোট্রোন থেকে ২০-২২ MeV-এর বেশী শক্তিসম্পন্ন প্রোটন পাওয়া মুস্কিল।

উচ্চতর শক্তির চাহিদায় নতুন পথের সন্ধান চলতে থাকলো। আপেক্ষিকতার বাধা পার হয়ে কি করে অনুনাদ সর্তটি বাঁচানো যায় সেটা এইবার দেখা যাক—

$$f = \frac{eH}{2\pi m_0 R}\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

অথবা $$\frac{f}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{eH}{2\pi m_0 R}$$

গুচ্ছ প্রোটনকে ত্বরিত করবার পর আবার আর এক গুচ্ছ প্রোটন নিয়ে একই ভাবে ত্বরণ ক্রিয়া চলবে। এই ব্যবস্থায় কেবল গুচ্ছীকৃত প্রোটন বিম পাওয়া যাবে। এই নীতি অনুসরণ করে যে নতুন শ্রেণীর সাইক্লোট্রোন তৈরি হলো, তার নাম দেওয়া হলো সিনক্রোসাইক্লোট্রোন বা ফ্রিকোয়েন্সি মডিউলেটেড সাইক্লোট্রোন। ১৯৪৫ সালে এর প্রচলন করেন বার্কলেতে ই. এম. ম্যাকমিলান এবং রাশিয়াতে ভি ভেক্সলার।

চৌম্বক ক্ষেত্র

খ

ক

0° ৬০° ১২০° ১৮০° ২৪০° ৩০০° ৩৬০°
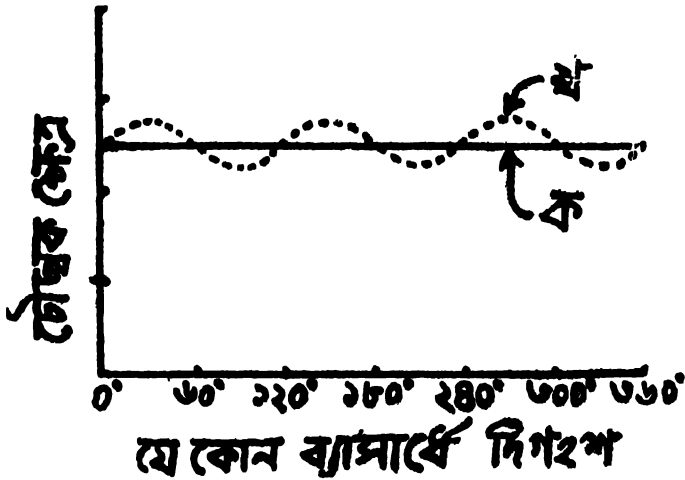
যে কোন ব্যাসার্ধে দিগংশ

৪নং চিত্র

যে কোন ব্যাসার্ধে দিগংশ বরাবর চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা ;
ক—মামুলি সাইক্লোট্রোন, খ—এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন

নিরবচ্ছিন্ন প্রোটন প্রবাহের বদলে যদি এক সঙ্গে এক গুচ্ছ (Pulse) প্রোটন ছাড়া হয় এবং গুচ্ছের বেগ v বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তড়িৎ বিভবের কম্পাঙ্ক

$$\frac{f}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

অনুযায়ী বর্ধিত করা হয়, তাহলে অনুনাদ সর্ত রক্ষিত হবে এবং প্রোটন গুচ্ছ ত্বরিত হয়ে ব্যাসার্ধের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এক

ঠিক একই যুক্তিতে কম্পাঙ্কের বদলে চৌম্বক ক্ষেত্রকে

$$H\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

হিসাবে মিশ্রিত বা মডিউলেট করেও উচ্চশক্তি লাভ করা সম্ভব হয়েছে সিনক্রোটোনগুলিতে। তবে এইগুলিকে সাইক্লোট্রোন গোষ্ঠীতে ধরা হয় না।

সাইক্লোট্রোন গোষ্ঠীর মধ্যে তরুণতম হলো এ. ভি. এফ সাইক্লোট্রোন—এজিমুথালি ভেরিয়িং

সাইক্লোট্রোন—দিগাংশিকভাবে পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র সমন্বিত সাইক্লোট্রোন। এরও একটি পূর্ব ইতিহাস আছে। ১৯৩৮ সালে যখন সাইক্লোট্রোন বিশারদেরা ফোকাসিং নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তখন একজন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ এল. এইচ. টমাস একটি নতুন ধরণের প্রস্তাব করেন। আশ্চর্যের বিষয়, টমাস সাইক্লোট্রোনের সঙ্গে কোন ভাবেই জড়িত ছিলেন না। তড়িৎ গতিবিদ্যার সাহায্যে টমাস দেখালেন যে, সমসত্ত্ব চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার না করে যদি দিগাংশিক ভাবে পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্র ব্যবহার করা যায়, তাহলে ফোকাসিং-এর কোন ভাবনাই থাকে না (৪নং চিত্র)। ঐ পরিবর্তী চৌম্বক ক্ষেত্রই বিপথগামী আহিত কণাগুলিকে মধ্যতলে ফিরিয়ে আনবে। তাহলে ব্যাসার্ধ বরাবর চৌম্বক ক্ষেত্র

$$H\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$$

অনুযায়ী বাড়িয়ে ভরের আপেক্ষিক বৃদ্ধির সঙ্গে অনুনাদ সূত্র মেলানো যাবে। ফলে সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে আহিত কণার শক্তি বৃদ্ধির সীমা অনেক দূর বাড়ানো সম্ভব হবে। এই গবেষণা-পত্রটি প্রায় ১৬ বছর ফিজিক্যাল রিভিউ-এর পাতায় চাপা পড়েছিল। ১৯৫৪-'৫৫ সাল থেকে এটি অনেকের নজরে আসতে থাকে। তখন তৈরি হলো টমাস সাইক্লোট্রোন। বিটাট্রোনের আবিষ্কর্তা ডন কার্স্ট ও তাঁর সহকর্মীরা টমাস সাইক্লোট্রোনের নীতি অনুসরণ করে স্পাইরাল রিজ সাইক্লোট্রোনের প্রবর্তন করেন (৫নং চিত্র)। তাঁরা এই নীতির কার্যকারিতা প্রমাণ করবার জন্যে একটি ইলেকট্রন মডেলও তৈরি করেছিলেন। পরে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ৪৩.৫" ব্যাসের পূর্ণাঙ্গ এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন চালু হয় ১৯৬০ সালে। এই জাতীয় সাইক্লোট্রোন অনেকগুলি নামে পরিচিত; যথা—স্পাইরাল রিজ সাইক্লোট্রোন, সেকটার ফোকাস সাইক্লোট্রোন, আইসোক্রোনাস সাইক্লোট্রোন, এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন, ভেরিএবল এনার্জি সাইক্লোট্রোন প্রভৃতি। তবে এ. ভি. এফ. নামেই এটি সর্বাধিক পরিচিত। গত ছ-বছরে ছোট-বড়-মাঝারি নানা সাইজের এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এই ধরণের সাইক্লো-

৫নং চিত্র

এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোনের মেরুতল

ট্রোনের উপর আধুনিক বিজ্ঞানীদের এত ঝোঁক দেখা যাচ্ছে কেন—এটা মনে হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। সেই আলোচনায় আসতে গেলে এখনকার চালু ত্বরণযন্ত্রগুলির শক্তি-সীমা আলোচনা করা প্রয়োজন এক নজরে দেখবার জন্যে নীচে একটি তালিকা দেওয়া হলো—

ত্বরণ যন্ত্র	প্রোটন শক্তি	প্রথম ব্যবহার
কক্‌ক্রফ্‌ট্‌ ওয়ালটন জেনারেটর	0·২ —১ MeV	১৯৩০
ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর	0·৫ —৮ "	১৯৩০
ট্যানডেম ভ্যান ডি গ্রাফ	৫ —১১ "	১৯৫৮
এম্পারার ট্যানডেম	১০—২০ "	১৯৬৬
সাইক্লোট্রোন	২—২২ "	১৯৩১
লিনিয়ার প্রোটন অ্যাক্সিলারেটর	১০—৫০ "	১৯৫৪
এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন	১০—৬০ "	১৯৬০
সিনক্রোসাইক্লোট্রোন	২০—১০০ "	১৯৪৫
সিনক্রোটোন :		
কসমোট্রন, ব্রুকহাভেন	৩ GeV *	
বিভাট্রন, বার্কলে	৬·২ "	
সিনক্রোফেজোট্রন, ডুবনা	১০ "	
এ জি সিনক্রোটোন		
C.E.R.N. জেনেভা	২৫ "	১৯৬০
ব্রুকহাভেন	৩০ "	১৯৬১

* ১ GeV = ১০০০ MeV

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ত্বরণ যন্ত্রগুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়। উচ্চশক্তি ও নিম্নশক্তি-বিশিষ্ট ত্বরণযন্ত্র। উচ্চ ও নিম্নের সীমা নির্ধারণ করা হয় কিভাবে? যে শক্তিতে আঘাত করলে বস্তুর কেন্দ্রক থেকে মৌলিক কণা, যেমন—মেসন, পায়ন প্রভৃতি বেরোতে থাকে, সেটাকেই উচ্চশক্তির নিম্ন সীমা বলে ধরা হয়। আর নিম্নশক্তি বলতে সাধারণতঃ ২০—৩০ MeV পর্যন্ত ধরা হয়ে থাকে। নিম্নশক্তির ত্বরণ যন্ত্রগুলি ব্যবহার করে পরমাণু-কেন্দ্রকের নানা গুণ ও ধর্ম বিশদভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। কেন্দ্রকের শক্তিস্তর গঠন, কেন্দ্রীন বল ইত্যাদি কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সেই পরীক্ষার ফল অনুযায়ী নানা ধরণের কেন্দ্রকের মডেল তৈরি হয়েছে। এর অনেক সূত্রই কিন্তু উচ্চশক্তির বেলায় খাটে না। উচ্চ শক্তির গবেষণা সুরু হয় নভোরশ্মিতে যে মৌলিক কণা পাওয়া যায়, তাই দিয়ে। পরে অতি উচ্চশক্তির ত্বরণ যন্ত্র তৈরি হতে থাকে এবং গবেষণাগারে বেশী সংখ্যায় মৌলিক কণা তৈরি করা সম্ভব হয়। উচ্চশক্তি পদার্থবিদ্যায় দেখা গেছে যে, মৌলিক কণাগুলির রীতিনীতি অনেক আলাদা। মাঝারি রকমের শক্তি ২০—১২০ MeV-তে বিক্রিয়া ঘটালে কি হতে পারে, তা আজও ভাল করে জানা নেই। তার কারণ, এই পাল্লার শক্তিসম্পন্ন ত্বরণ যন্ত্রের সংখ্যা খুবই কম।

বা-ও বা আছে, তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট শক্তিতে চলে।

এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোনের প্রধান সুবিধা হলো এর একটি যন্ত্র থেকেই ১০ থেকে ১০০ Mev পর্যন্ত প্রোটনকে ইচ্ছামত শক্তিতে ত্বরিত করা সম্ভব। প্রোটন, ডয়টেরন আলফা তো বটেই, এমন কি অপেক্ষাকৃত ভারী মৌলগুলিকেও আংশিকভাবে আয়নিত করে ত্বরিত করা সম্ভব। মামুলী সাইক্লোট্রোনে ত্বরিত কণাদের বিম কারেন্ট ১০—৫০ মাইক্রো আম্পিয়র হয়। সিনক্রো-সাইক্লোট্রোনের গড় বিম কারেন্ট কয়েক মাইক্রো আম্পিয়রের বেশী পাওয়া শক্ত। কিন্তু এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোনের ১ মিলিআম্পিয়ার বিম কারেন্ট পেতে কোন অসুবিধাই নেই। তাই এর সাহায্যে মাঝারি শক্তির কেন্দ্রক গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। বেশী বিম কারেন্ট পাওয়ার জন্যে কেন্দ্রক পদার্থবিদ্যা ছাড়া কেন্দ্রক রসায়ন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান—এমন কি, বিশেষ বিশেষ তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরির কাজেও এর প্রয়োগ হচ্ছে। আহিত কণার সাহায্যে কেন্দ্রীন বিভাজন সম্পর্কে গবেষণার কাজেও এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন খুবই উপযোগী।

লরেন্স যখন সাইক্লোট্রোন তৈরি করেছিলেন, তখন তা ছিল একান্তভাবে বিজ্ঞানীর নিজস্ব যন্ত্র, গবেষণাগারের কারখানায় এর সব যন্ত্রাংশ তৈরি হতো। এটি ছিল আকারে ছোট এবং বিশেষ জটিলতাও এর মধ্যে ছিল না। আজকালকার এ. ভি. এফ. সেই তুলনায় অতিকায় এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও দক্ষ কারিগরী শিল্পের একটি কীর্তি-বিশেষ। বার্কলের ৮৮ এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোনের যে তড়িচ্চুম্বকটি আছে, তার লোহার ওজন ২১০ টন। যে কুণ্ডলী দিয়ে ঐ চুম্বকে তড়িৎ সঞ্চালন করা হয়, শুধু তারই তামার ওজন ১০ টন। ভারী শিল্পের সাহায্য ব্যতীত এই সব যন্ত্র তৈরি আজ আর সম্ভব নয়। সম্প্রতি ভারতের পরমাণু শক্তি দপ্তর কলকাতায় এই রকম একটি এ. ভি. এফ. সাইক্লোট্রোন তৈরি করবার কথা ভাবছেন। তা তৈরি হলে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা এখানেই অনেক নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন। এর জন্যে বিদেশে ছুটতে হবে না।

পদার্থের তুরীয় অবস্থা

জয়ন্ত বসু

(১)

ভাই বাতায়নদা,

শুনেছি হিমালয়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা যান তুরীয় অবস্থা লাভ করবার জন্যে। হিমালয়ের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় তাঁদের সব রিপু একেবারে গুটিসুটি মেরে যায়, মন হয়ে যায় মুক্ত, বাধাশূন্য। আমাদের অধ্যাপিকা সবিতাদি কাল ক্লাসে যা বললেন, তা থেকে বুঝলুম, খুব ঠাণ্ডায়—হিমালয়ের চেয়েও অবশ্য অনেক বেশী ঠাণ্ডায়—কোন কোন পদার্থও এক ধরণের তুরীয় অবস্থা লাভ করে। যেমন—তরলীভূত হিলিয়াম নাকি তখন কোন বাধাকেই বাধা বলে গ্রাহ্য করে না; এমন সব সরু নল ও সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বিনা বাধায় সে স্বচ্ছন্দগতিতে গলে যায়, যেখান দিয়ে সাধারণ তরল পদার্থ একটুও গলতে পারে না। তরল হিলিয়ামের এই আশ্চর্য গুণকে বলা হয়, সবিতাদি জানালেন, Superfluidity বা অতিতারল্য। আবার খুব ঠাণ্ডায় অনেক ধাতুর ভিতরের বেশ কিছু ইলেকট্রন একেবারে বাধা-শূন্য অবস্থায় চলাফেরা করতে পারে। ইলেক-ট্রনগুলির সেই অবাধ গতির ফলে ঐ সব ধাতুর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের কোন রকম অন্তরায় থাকে না। ধাতুগুলির বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা তখন হয়ে যায় অসীম। এই বিশেষ গুণটির নাম, সবিতাদি জানালেন, Superconductivity বা অতিপরিবাহিতা।

অতিতারল্য ও অতিপরিবাহিতা সম্বন্ধে আরো কিছু জানবার জন্যে আমাদের খুব কৌতূহল হলো। কিন্তু সবিতাদির পিছনে সিলেবাসের তাড়া আছে এবং সিলেবাসে যা থাকে, তা সাদামাটা জিনিষ, এই সব 'অতি'-র সেখানে বালাই নেই। ওগুলি সম্পর্কে কঠিন কঠিন কয়েকটি বইয়ের নাম বলে দিয়ে সবিতাদি তাই প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। 'অতি'-গুণগুলি সম্পর্কে জানবার আমার সাধ আছে, কিন্তু ঐ সব অতি কঠিন বই পড়ে বোঝবার সাধ্য আমার নেই। তাই যথারীতি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি, বাতায়নদা—তুমি সহজ করে শক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে যদি কিছু বলো!……ইতি—

বোলপুর — তোমার স্নেহের
৬।৭।৬৭ — বোলতা

(২)

কল্যাণীয়াসু,

...তোমার নামের মর্যাদা রেখে তুমি যখন ফের প্রশ্নের হুল ফোটাতে সুরু করেছ, তখন আমাকেও আমার নামের মর্যাদা রাখতে হবে বৈকি! তোমাদের সিলেবাসের বাইরের জগতের কিছু আলো-বাতাস আমার মধ্য দিয়ে তুমি নিশ্চয় পাবে।

একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করা যাক। ১৯০৮ সালের ১০ জুলাই। হল্যাণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী হাইকে ক্যামার্লিং ওন্‌স্ হিলিয়াম গ্যাসকে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করে নিম্ন তাপমাত্রার বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। কারণ ঐ রূপান্তর ঘটে ৪.২° কেলভিন তাপমাত্রায়, অর্থাৎ চরম শূন্য তাপমাত্রা থেকে মাত্র ৪.২° সেন্টিগ্রেড উপরে। জান বোধ হয়, যে তাপমাত্রায় জল জমে বরফ হয়, তাথেকে ২৭৩° সেন্টি-

গ্রেড নীচে ঐ চরম শূন্য তাপমাত্রা—ওর থেকে নীচে আর কোন তাপমাত্রা সম্ভব নয়। চরম শূন্যের কাছাকাছি পদার্থের সেই তুরীয় অবস্থা দেখতে পাওয়া গেল, যার কথা তোমার চিঠিতে তুমি বলেছ। প্রথম যে লক্ষণ আবিষ্কৃত হলো তা হচ্ছে অতিপরিবাহিতা—১৯১১ সালে ওন্স্ নিজেই এটি আবিষ্কার করেন। পারদ নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন যে, পারদের তাপমাত্রা কমাতে থাকলে ৪·২° কেলভিনের কাছে পারদের বৈদ্যুতিক রোধ বা বিদ্যুৎ-প্রবাহে বাধার পরিমাণ হঠাৎ খুব কমে গিয়ে একেবারে শূন্য হয়ে যায়, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে, পারদের পরিবাহিতা হঠাৎ খুব বেড়ে গিয়ে একেবারে অসীম হয়ে যায়। পদার্থে যে অবস্থায় সীমার মধ্যে অসীমের এই প্রকাশ ঘটে, ওন্স্ তার নামকরণ করলেন—অতি-পরিবাহী অবস্থা।

তুমি বোধ করি জানো যে, কোন উৎস থেকে ধাতুখণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করে সেই উৎসকে সরিয়ে নিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সামান্য সময়ের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। অতিপরিবাহী সীসার একটি বলয়ের মধ্যে একবার বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করে এস. কলিন্স নামে ম্যাসাচুসেট্স্ ইন্‌স্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির একজন অধ্যাপক দেখেছেন যে, কয়েক বছর পরেও সেই বিদ্যুৎ-প্রবাহ অব্যাহত আছে, কোনরকম পরিবর্তন তিনি ধরতে পারেন নি। এথেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, অতি-পরিবাহী পদার্থে রোধের পরিমাণ শূন্য বা শূন্য না হলেও নেহাৎই নগণ্য।

অতিপরিবাহী পদার্থের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি। কোন চুম্বকের দুই প্রান্তের মধ্যে যে চৌম্বক বলরেখা থাকে, প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাসে পরীক্ষা করে তোমরা নিশ্চয় তা দেখেছ। এখন ঐ দুই প্রান্তের মধ্যে কোন ধাতুখণ্ডকে রেখে দিলে তার মধ্য দিয়েও চৌম্বক বলরেখা বজায় থাকবে। এইবার ধাতুখণ্ডটির তাপমাত্রা খুব কমিয়ে যেই সেটিকে অতিপরিবাহী করে তোলা যায়, অমনি তার ভিতরের সব বলরেখাকে সে জোর করে তার ভিতর থেকে বের করে দেয়। এই সঙ্গে যে ছবিগুলি পাঠাচ্ছি, তার প্রথমটিতে দেখতে পাবে, অতিপরিবাহী একটি গোলক থেকে বহিষ্কৃত হয়ে চৌম্বক বলরেখাগুলি গোলকটির চারদিকে কিভাবে বেঁকে রয়েছে। অতিপরিবাহী পদার্থের মধ্যে কোন চৌম্বক বলরেখা থাকতে পারে না, অর্থাৎ সেটি একটি সম্পূর্ণ অচুম্বকীয়
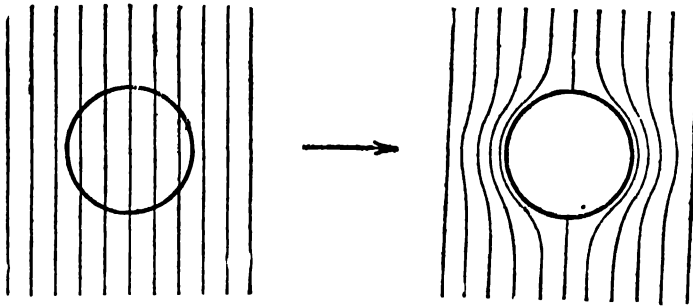
ক ১নং চিত্র খ

ক—চৌম্বক বলরেখা ও মাঝখানে একটি পরিবাহী গোলক
খ—গোলকটি অতিপরিবাহী হলে চৌম্বক বলরেখা তার মধ্য থেকে বহিষ্কৃত।

(Perfectly diamagnetic) পদার্থ; ১৯৩৩ সালে এ ঘটনা আবিষ্কার করেন মাইস্‌নার ও অখ্‌সেন্‌ফেল্ড। আসলে চৌম্বক বলরেখা অতি-পরিবাহী পদার্থের ভিতর যৎসামান্য দূরত্ব পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে। ঐ দূরত্বকে বলা হয় ভেদ গভীরত্ব (Penetration depth)। চরম শূন্য তাপমাত্রার কাছে সেই গভীরত্বের পরিমাণ এক সেন্টিমিটারের লক্ষ ভাগের এক ভাগের মত।

যাই হোক, চৌম্বক বলরেখাও ছাড়বার পাত্র নয়। তারা অতিপরিবাহী পদার্থের ভিতর ভালভাবে ঢোকবার চেষ্টা করতে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার উপর তোলা যায়, তবে তারা জোর করে ভিতরে ঢুকে পড়ে অতিপরিবাহী পদার্থের 'অতি-ত্ব' নষ্ট করে দেয়—পদার্থটি সাধারণ অবস্থায় ফিরে আসে। অতিপরিবাহী পদার্থের ভিতরের বিদ্যুৎ-প্রবাহকেও শুধু বাড়িয়ে একটি বিশেষ সীমার উপরে তুললে পদার্থটি যে 'অতি'-ত্ব হারিয়ে ফেলে (ওন্‌স্‌ও এটা লক্ষ্য করেছিলেন), তার কারণ হলো—বিদ্যুৎ-প্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র বড় হতে হতে তখন তার নির্দিষ্ট সীমা পেরিয়ে যায়।

এখন প্রশ্ন হলো, অতিপরিবাহিতাকে ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে? এই প্রসঙ্গে সাধারণ পরিবাহী ধাতুর বিদ্যুৎরোধের ব্যাখ্যাটা আগে বলে রাখি। ধাতুর কেলাসের জাফরী পাতে যে সব পরমাণু রয়েছে, সাধারণ তাপমাত্রায় তারা থাকে আন্দোলিত অবস্থায়। বিদ্যুৎ-বহনকারী ইলেকট্রনদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ইলেকট্রনদের গতিতে যে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাই বিদ্যুৎরোধ হিসাবে প্রকাশ পায়। তাপমাত্রা যত কমে, পরমাণুদের চাঞ্চল্যও তত কমে আসে, ইলেকট্রনদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষও ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে থাকে, ইলেকট্রনদের গতিপথে অন্তরায় সেই সঙ্গে কমে, ফলে বিদ্যুৎরোধও ক্রমশঃ কমে যায়। ক্লাসিকাল বলবিদ্যা অনুযায়ী চরম শূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছুলে পরমাণুগুলি একেবারে শান্ত হয়ে পড়বে এবং বিদ্যুৎরোধও হয়ে যাবে নগণ্য। কিন্তু তাপমাত্রা শূন্যে পৌঁছানোর আগেই যে বিদ্যুৎরোধ শূন্য হয়ে গেল? এ প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর এখনও জানা যায় নি, যেটুকু জানা গেছে, তাও অত্যন্ত জটিল। তবে এটা বোঝা গেছে যে, এর ব্যাখ্যা ক্লাসিকাল বলবিদ্যা থেকে হবে না, এর জন্যে দরকার কোয়ান্টাম বলবিদ্যার, অণু-পরমাণু জগতের কাণ্ড-কারখানা ব্যাখ্যা করতে যে বলবিদ্যার শরণাপন্ন হতে হয়। কোয়ান্টাম ঘটনাগুলি খুব সূক্ষ্ম। সাধারণ তাপমাত্রায় পরমাণুগুলির চাঞ্চল্যের জন্যে কোয়ান্টাম প্রকৃতি ধরা পড়ে না। কিন্তু চরম শূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি পরমাণুগুলির চাঞ্চল্য যখন খুব কমে যায়, তখন কোন কোন ধাতুখণ্ডের সামগ্রিক কোয়ান্টাম প্রকৃতি প্রকাশ পায়; তখন ধাতুখণ্ডটি একটি বিরাট আয়তন পরমাণুর মত, আর অতিপরিবাহী ইলেকট্রনদের অবাধ গতি পরমাণু-কেন্দ্রকের চতুর্দিকে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলির গতির অনুরূপ। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ফ্রিৎজ্‌ লণ্ডন নামে একজন বিজ্ঞানী বুঝিয়ে দিয়েছেন, অতিপরিবাহী পদার্থের ভিতরে কেন চৌম্বক বলরেখা থাকতে পারে না।

যাই হোক, বিদ্যুৎরোধের কথায় ফিরে আসা যাক। ১৯৫০ সালে ফ্রোয়েলিখ ও বার্ডীন যে মতবাদ প্রকাশ করলেন, তাতে একথা বলা হলো, পরমাণুগুলির সঙ্গে যে পরিবাহী ইলেকট্রনগুলির ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সাধারণ তাপমাত্রায় বিদ্যুৎরোধের সৃষ্টি হয়, খুব কম তাপমাত্রায় পরমাণুর আন্দোলনের সঙ্গে সেই ইলেকট্রনগুলির গতির এমন একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে, ঐ ঘাত-প্রতিঘাত তাদের গতিতে বাধার সৃষ্টি না করে বরং তাতে সহায়তা করে। সীসা, টিন, ট্যান্টালাম প্রভৃতি যে ধাতুগুলি সাধারণ তাপ-

মাত্রায় উৎকৃষ্ট পরিবাহক নয়, অর্থাৎ যাদের মধ্যে পরমাণু ও পরিবাহী ইলেকট্রনগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া জোরালো, তারাই যে আবার অপেক্ষাকৃত সহজে, অপেক্ষাকৃত বেশী তাপমাত্রাতেই অতিপরিবাহী হয়ে যায়, তার কারণ এক্ষেত্রে ঐ পারস্পরিক ক্রিয়া ইলেকট্রনগুলির গতিকে বেশি সাহায্য করে। অপরপক্ষে সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি যে সব ধাতু সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট পরিবাহক, তাদের অতিপরিবাহী করতে হলে আরো কম তাপমাত্রার দরকার।

অতিপরিবাহিতার বিশদ ব্যাখ্যা এত জটিল যে, পদার্থের ঐ গুণ প্রায় ষাট বছর আগে আবিষ্কৃত হলেও ওর সম্পর্কে মোটামুটি একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব খাড়া হয়েছে মাত্র দশ বছর আগে, ১৯৫৭ সালে। তত্ত্বটির উদ্ভাবক বার্ডীন, কুপার ও স্রীফার নামে তিনজন বিজ্ঞানী; তাঁদের নাম অনুসারে 'BCS তত্ত্ব' নামে সেটি সুপরিচিত। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত সোভিয়েট বিজ্ঞানী বোগোলিউবভ ও তাঁর সহকর্মীদের মতবাদও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বিজ্ঞানীরা অবশ্য শুধু তত্ত্বের মুখ চেয়েই বসে নেই। অতিপরিবাহিতা সম্পর্কে তাঁরা এমন কয়েকটি পরীক্ষামূলক তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন যে, সেই তথ্যগুলিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা কয়েক-শ' নতুন অতিপরিবাহী পদার্থ তৈরি করে ফেলেছেন; তাঁরা এমন সব ধাতুসঙ্কর তৈরি করেছেন, অপেক্ষাকৃত বেশি তাপমাত্রাতেই যারা অতিপরিবাহী হয়ে যায়, যেমন টিন-কলোম্বিয়াম বা টিন-নায়োবিয়াম, ১৮° কেলভিনেই এদের অতি-গুণ দেখতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টার কারণ, অতিপরিবাহী পদার্থের যে প্রয়োগ হচ্ছে এবং আরো যে বহু প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে (যেমন বিদ্যুৎ-শক্তির কোন অপচয় না করে তাকে দূর-দূরান্তে পাঠানো), সেই সব প্রয়োগ অনেক সহজ হয়ে যায়, যদি অপেক্ষাকৃত বেশি তাপমাত্রায় পদার্থের অতিপরিবাহিতা কার্যকরী হয়ে ওঠে। অবশ্য সাধারণ তাপমাত্রায় অতিপরিবাহী থাকে, এমন পদার্থের সন্ধান পেলে সব চেয়ে সুবিধা। কিন্তু ধাতু বা ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে এই গুণ বোধ করি সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীমহলে অনেকে আশা করেন, বিশেষ রকম জৈব অতিকায় অণু দিয়ে গঠিত পদার্থে এই গুণ হয়তো একদিন ধরা পড়বে। কেউ কেউ তো এমনো মনে করেন, বংশবৈশিষ্ট্য-বাহক যে ক্ষুদ্র জীন—যার কথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকায় তুমি পড়ে থাকবে, সেই জীনের মধ্যে অতিপরিবাহী কোন পদার্থ প্রকৃতি সৃষ্টি করে রেখেছে; সেই পদার্থের স্থায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহের মাধ্যমে প্রকৃতি বংশ-বৈশিষ্ট্যকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে।

যাহোক, বর্তমানে অতিপরিবাহী পদার্থের হরেক রকম ব্যবহার হচ্ছে, সেগুলির বিষয় কিছু বলি। প্রথমত ধরো, বিদ্যুচ্চুম্বকের কথা। শক্তিশালী বিদ্যুচ্চুম্বক তৈরি করতে হলে তার তারের মধ্য দিয়ে যথেষ্ট বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠাতে হয় সেই তারের রোধের জন্যে বেশ খানিকটা বিদ্যুৎ-শক্তি উত্তাপে পর্যবসিত হয়। ফলে বিদ্যুৎ-শক্তির অপচয় তো ঘটেই, তার উপর বিদ্যুচ্চুম্বক যাতে না খুব গরম হয়ে ওঠে, সে জন্যে তাকে ঠাণ্ডা রাখবার বিশেষ আয়োজন করতে হয়। এখন, এই সব সমস্যা আর থাকে না, যদি অতিপরিবাহী পদার্থের তার অর্থাৎ রোধশূন্য তার দিয়ে বিদ্যুচ্চুম্বক তৈরি হয়। যেখানে প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োজন, সেখানে এজন্যে অতিপরিবাহী চুম্বকের প্রয়োগ হচ্ছে। তবে চৌম্বক ক্ষেত্র খানিকটা শক্তিশালী হলেই তার উপস্থিতিতে সাধারণ ধাতুর অতিপরিবাহিতা নষ্ট হয়ে যায়। সে জন্যে টিন-নায়োবিয়াম, নায়োবিয়াম-জার্কোনিয়াম, ভ্যানাডিয়াম-গ্যালিয়াম প্রভৃতি এমন সব ধাতুসঙ্কর বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন,

অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতেও যাদের অতিপরিবাহিতা বজায় থাকে।

তারপর ধরা যাক, অতিপরিবাহী সুইচের কথা। বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা চৌম্বক ক্ষেত্রকে পরিবর্তিত করে অতিপরিবাহী কোন উপাদানের 'অতি'-ত্ব যখন নষ্ট করে দেওয়া যায়, তখন তার বিদ্যুৎ-রোধের হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটে। এই যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বজায় রাখা যায়, সেটি সহজেই স্মরণের উপাদান হিসেবে কাজ করে।

তাপশক্তির নিয়ন্ত্রণে অতিপরিবাহী পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। ধাতুর পরিবাহী ইলেকট্রনগুলি বাইরে থেকে উত্তাপ নিয়ে পরমাণুগুলির সঙ্গে নিজেদের সংঘর্ষের মাধ্যমে ধাতুর মধ্য দিয়ে সেই তাপ সঞ্চালন করে দেয়। অতিপরিবাহী পদার্থে ঐ সংঘর্ষ ক্ষীণ হওয়ায় ইলেকট্রনগুলি
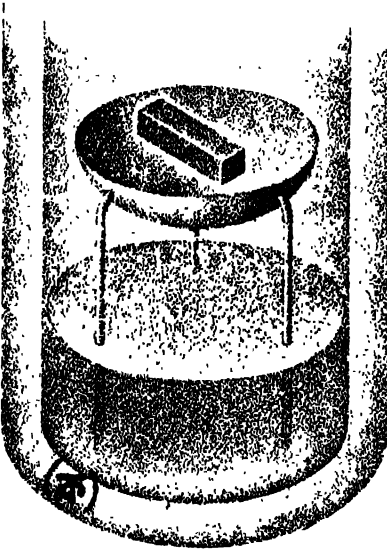
২নং চিত্র

ক—অতিপরিবাহী একটি সীসার পেয়ালার উপর একটি চুম্বক শূন্যে ভাসমান

খ—দুটি অতিপরিবাহী বলয়ের মধ্যে আবদ্ধ চৌম্বক ক্ষেত্র মাঝখানের অতিপরিবাহী সীসার গোলকটিকে শূন্যে ধরে রেখেছে।

ঘটনার সদ্ব্যবহার করে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অতিপরিবাহী সুইচ তৈরি করা হচ্ছে। বিশেষতঃ ক্রায়োট্রন নামে এই ধরণের সুইচ সংখ্যাত্মক (Digital) কম্পিউটারে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

কম্পিউটারের স্মারক অংশেও অতিপরিবাহী পদার্থের প্রয়োগ ঘটেছে, কারণ ঐ পদার্থে অপেক্ষাকৃত অনেক কম তাপ সঞ্চালন করতে পারে। এজন্যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে ধাতুর অতিপরিবাহী অবস্থা থেকে পরিবাহী অবস্থায় রূপান্তর ঘটিয়ে সহজেই তাপের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অতিপরিবাহী পদার্থের একটা চমকপ্রদ প্রয়োগের কথা বলে এখনকার মত আমি শেষ করবো। অতিপরিবাহী পদার্থ

যেহেতু চৌম্বক বলরেখাকে নিজের ভিতর থেকে বের করে দেয়, চুম্বকের উপর ওর সে জন্যে যেন একটা বিকর্ষণী বল আছে। ঐ বলের জন্যে অতিপরিবাহী পদার্থের উপর কোন চুম্বককে বা বা চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে অতিপরিবাহী

(৩)

ভাই বাতায়নদা,

তুমি যে অতিবিজ্ঞানী হয়ে উঠছো, তা তোমার চিঠি পড়ে বোঝা যায়। তুমি আরম্ভ করেছিলে অতিতারল্য ও অতিপরিবাহিতা
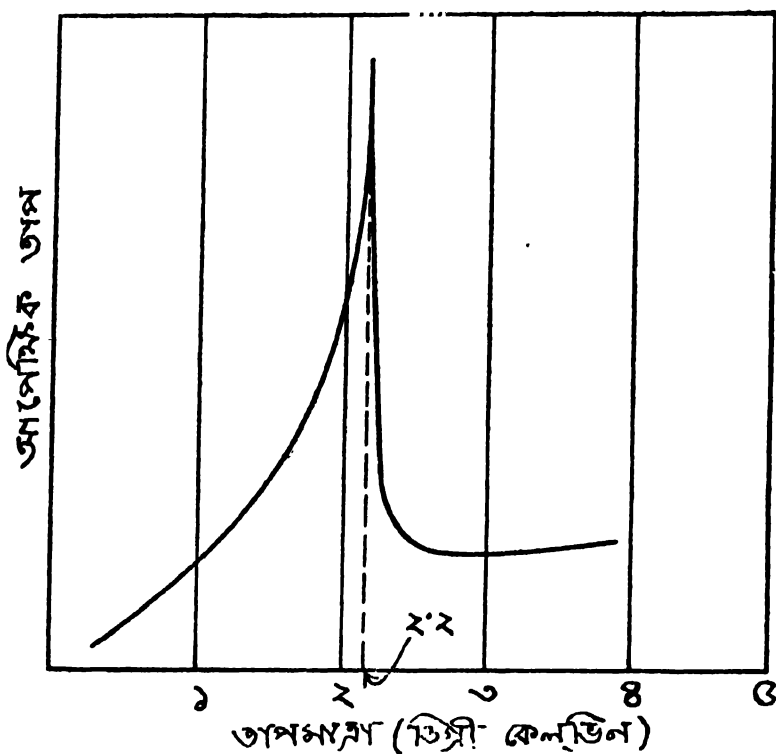
৩নং চিত্র
তাপমাত্রার সঙ্গে তরল হিলিয়ামের আপেক্ষিক তাপের সম্পর্ক

কোন উপাদানকে সংযোগবিহীন অবস্থাতেই শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা যায় (২নং চিত্র)। এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়ে অতিপরিবাহী জাইরোস্কোপ তৈরি করা হয়েছে। ইতি—

কলকাতা
২৪।৭।৬৭

তোমার
বাতায়নদা

সম্বন্ধে বলবে বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতিতরল পদার্থ সম্পর্কে লিখতে তুমি ভুলে গেছ। নাকি ঐ পদার্থ এতই তরল যে, তোমার চিঠির ফাঁক দিয়ে পথে কোথাও পড়ে গেল ?······ইতি—

বোলপুর
৯।৮।৬৭

তোমার স্নেহের
বোলতা

(৪)

কল্যাণীয়াসু,

……অতিতারল্যকে আগের বার বাদ দিয়েছি, কারণ তা না হলে ডাকটিকিট অনেক বেশি লেগে যেত। আর কোন কোন চিঠিতে টিকিট একসঙ্গে বেশি লাগালে সেটা খোয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কেমন জানি বেড়ে যায়।

এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমি আগের চিঠিতে বলেছি যে, ৪·২° কেলভিন তাপমাত্রায় হিলিয়াম গ্যাস তরলে রূপান্তরিত হয়। এখন তাপমাত্রা যদি আরো কমানো যায়, তবে ২·২° কেলভিনে হিলিয়ামে আর এক ধরণের পরিবর্তন ঘটে। পদার্থবিদ্যার ক্লাসে তোমরা নিশ্চয় আপেক্ষিক তাপের (Specific heat) কথা পড়েছ। বিভিন্ন তাপমাত্রায় তরল হিলিয়ামের আপেক্ষিক তাপের পরিমাপ করে যে ফল পাওয়া গেল, ৩নং চিত্রে আমি তা দেখিয়েছি। ২·২° কেলভিনে দেখছো, আপেক্ষিক তাপের হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটছে। চিত্রের রেখাটি গ্রীক অক্ষর λ (ল্যাম্বডা)-র উল্টানো চেহারার মত দেখতে বলে আপেক্ষিক তাপের হঠাৎ পরিবর্তনের তাপমাত্রাকে (অর্থাৎ ২·২° কেলভিনকে) ল্যাম্বডা-বিন্দু বলা হয়। যে হিলিয়ামের তাপমাত্রা ল্যাম্বডা-বিন্দুর চেয়ে বেশি, তাকে বলা হয় হিলিয়াম-I, আর যে হিলিয়ামের তাপমাত্রা ল্যাম্বডা-বিন্দুর চেয়ে কম, তাকে বলা হয় হিলিয়াম-II। হিলিয়াম-II-এর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা গেল যে, তা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে উত্তাপকে পরিবহন করতে পারে। মস্কোর বিজ্ঞানী পিটার কাপিৎজার ধারণা হলো যে, ঐ উত্তাপ-পরিবহন ক্ষমতার মূলে আছে হিলিয়াম-II-এর নিজস্ব অবাধ প্রবাহ। পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, এক ইঞ্চির পঞ্চাশ হাজার ভাগের একভাগ আয়তন, এমন এক সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হিলিয়াম-II অনায়াসেই প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। জানা ছিল যে, হাইড্রোজেনের পরমাণু খুব হাল্কা বলে হাইড্রোজেন গ্যাসের সান্দ্রতা (Viscosity) বা গতিজনিত বাধা যৎসামান্য। কাপিৎজার পরীক্ষা থেকে হিসেব করে দেখা গেল, হিলিয়াম-II-এর সান্দ্রতা হাইড্রোজেন গ্যাসের দশ হাজার ভাগের এক-ভাগের চেয়েও কম। কাপিৎজা তখন সাহসের সঙ্গে বললেন, হিলিয়াম-II-এর সান্দ্রতা শূন্য, অর্থাৎ ঐ পদার্থ একেবারে বাধাবন্ধনহীনভাবে
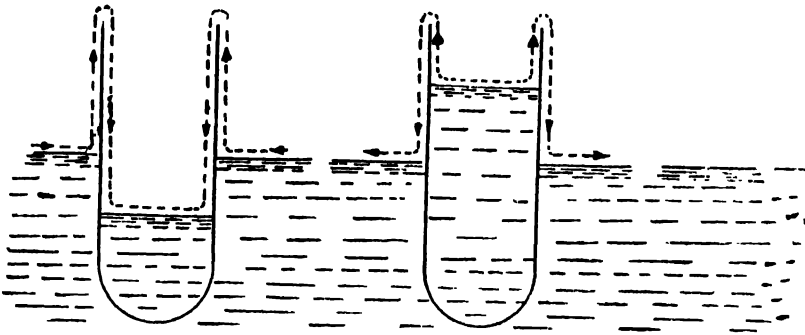
৪নং চিত্র
পাত্‌লা স্তরের মাধ্যমে অতিতরল হিলিয়াম দেয়াল বেয়ে যাচ্ছে বাইরের কক্ষ থেকে ভিতরের কক্ষে বা ভিতরের কক্ষ থেকে বাইরের কক্ষে।

প্রবাহিত হতে পারে। হিলিয়াম-II-এর এই আশ্চর্য গুণের তিনি নাম দিলেন—অতিতারল্য। এটা হলো ১৯৩৭ সালের কথা।

অতিতরল পদার্থের আর একটি অদ্ভুত ধর্মের কথা আগেই জানা ছিল। ধরা যাক, একটি ফ্লাস্কের ভিতর দুটি কক্ষে হিলিয়াম-II রাখা হলো। কক্ষ দুটিতে হিলিয়ামের উচ্চতা সমান না হলে, যে কক্ষে হিলিয়ামের উচ্চতা বেশি, সেখান থেকে কিছু হিলিয়াম কোন অদৃশ্য উপায়ে অপর কক্ষে চলে যাবে, যাতে অচিরেই কক্ষ দুটিতে হিলিয়ামের উচ্চতা সমান হয়ে যায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাউন্ট ও মেণ্ডেল্‌সন পরীক্ষা করে দেখালেন যে, কক্ষ দুটির দেয়ালে হিলিয়াম-II-এর খুব পাত্‌লা (এক ইঞ্চির লক্ষ ভাগের এক ভাগের চেয়েও পাত্‌লা) একটা স্তর তৈরি হয় এবং ঐ স্তরের মাধ্যমেই হিলিয়াম এক কক্ষের দেয়াল বেয়ে উঠে কক্ষান্তরে যেতে পারে (৪নং চিত্র)। সেই চলন্ত স্তরের গতি সেকেণ্ডে এক ফুটের মত হতে পারে।

অতিপরিবাহিতার মত অতিতারল্যকে ব্যাখ্যা করতে হলেও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শরণ নিতে হয়। ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যা অনুযায়ী চরম শূন্য তাপমাত্রার কাছাকাছি অণু-পরমাণুগুলি সব শান্ত হয়ে আসবে এবং যে কোন পদার্থই কঠিন অবস্থা লাভ করবে। এখন, খুব কম তাপমাত্রায়, আমরা আগেই দেখেছি, পদার্থের কোয়ান্টাম প্রকৃতি প্রকাশ পায়। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে হিলিয়াম তরল থেকে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হবার আগেই তার কোয়ান্টাম ধর্ম প্রকট হয়ে ওঠে; ফলে সেই 'কোয়ান্টাম তরল' হিলিয়াম-II আর ক্ল্যাসিকাল বলবিদ্যাকে মানে না, মানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে। সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর জগৎ ছেড়ে কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে যেন এবার বৃহৎ জগতেও দেখতে পাওয়া গেল।

অতিতারল্যের কয়েকটি তথ্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার উপর ভিত্তি করে লণ্ডন, টিস্‌জা ও পরে ল্যাণ্ডাও যে তত্ত্ব রচনা করেছেন, তার মূলে আছে 'দুই তরলের মডেল'। এই তত্ত্ব অনুযায়ী হিলিয়াম-II-এর দুটি উপাদান—একটি সাধারণ তরল, অপরটি অতিতরল। তাপমাত্রা কমলে অতিতরলের ভাগ বেড়ে যায়, সবটাই অতিতরল হয়ে যায় চরম শূন্য তাপমাত্রায়। হিলিয়াম-II যে উত্তাপ পরিবহন করে, সে তার সাধারণ উপাদানের জন্যে; অতিতরল উপাদানটি একেবারে উত্তাপহীন।

এই তত্ত্ব থেকে অতিরল পদার্থের একটি নতুন বৈশিষ্ট্যের কথা আন্দাজ করা যায়। সেই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'দ্বিতীয় প্রকৃতির শব্দ'। তুমি নিশ্চয় জানো যে, কোন পদার্থের মধ্য দিয়ে যে শব্দ প্রবাহিত হয়, সে ঐ পদার্থের কণিকাগুলির আন্দোলনের মাধ্যমে। হিলিয়াম-II-এর সাধারণ ও অতিতরল উপাদান দুটি যখন একই সঙ্গে আন্দোলিত হয়, তখন তা হয় সাধারণ বা প্রথম প্রকৃতির শব্দ। কিন্তু একটি উপাদান যখন অন্যটির মধ্য দিয়ে আন্দোলিত হতে থাকে, তখন তা দ্বিতীয় প্রকৃতির শব্দ। এই দ্বিতীয় শব্দের অস্তিত্ব পরীক্ষা থেকেও সমর্থিত হয়েছে। অতিতরল সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কাজে এই বিশেষ শব্দ বিজ্ঞানীদের সাহায্য করছে।

অতিতারল্য সম্বন্ধে আর একটা কথা, বোল্‌তা; তারপরেই তোমার ছুটি। যে হিলিয়ামে অতিতারল্য দেখতে পাওয়া যায়, তা হলো সাধারণ হিলিয়াম—হিলিয়াম-৪, যার পরমাণু-কেন্দ্রকে ৪টি কণিকা: ২ প্রোটন, ২ নিউট্রন। হিলিয়ামের কিন্তু আর একটি আইসোটোপ আছে—হিলিয়াম-৩, যার কেন্দ্রকে ১টি নিউট্রন কম। এই হিলিয়াম-৩ ৩·২° কেলভিনে তরলে রূপান্তরিত হলেও তার মধ্যে অতিতারল্য দেখতে পাওয়া যায় না। হিলিয়াম-৪-এর পরমাণু-কেন্দ্রকে মৌল কণিকার সংখ্যা যুগ্ম হওয়ায়

সেই পরমাণু বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন মেনে চলে, আর হিলিয়াম-৩-এর পরমাণুতে ঐ সংখ্যা অযুগ্ম হওয়ায় সেই পরমাণু মেনে চলে ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন। (তুমি যখন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার নিয়মিত পাঠিকা, এই সংখ্যায়নগুলি সম্পর্কে নিশ্চয় আগে পড়েছ)। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা থেকে একথা বলা যায় যে, সেই তরল পদার্থেই শুধু অতিতারল্য প্রকাশ পাবে, যে পদার্থের পরমাণুগুলির ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত সংখ্যায়নটি প্রযোজ্য।

এ বিষয়ে যদি আরো কিছু এবং আরো ভাল করে জানতে চাও, তাহলে যখন তুমি কলকাতায় আসবে, তখন বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়নের প্রধান হোতা জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর শরণাপন্ন হওয়া যাবে; তিনি নিশ্চয় তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করবেন। ইতি—

কলকাতা ২৭।৮।৬৭ — তোমার বাতায়নদা

"অরণ্যবাসী মনুষ্য যেদিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শস্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই শস্য আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির ফলকে সুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লেবরেটরীতে সেই বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুযায়ী কারখানা অদ্যাপি চলিতেছে। এই আত্মরক্ষার প্রযত্নে, এই আত্মপুষ্টির প্রযত্নে আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজ্রে একদিন যাহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, জল তুলিতেছেন। দূর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শক্তিচয়কে আমরা আমাদের কাজে মজুর খাটাইতেছি। কবিকল্পিত লঙ্কেশ্বর স্বর্গের সমস্ত দেবতাকে সেবকত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের তপস্যাবলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা লঙ্কেশ্বর হইয়াছি। যে বাহ্য জগতের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ্য জগৎ একদিন না একদিন আমাদের উপর জয়লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর দম্ভের সহিত প্রভুত্ব খাটাইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির জয়জয়কার দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ?"

—রামেন্দ্রসুন্দর

আমাদের দেশে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা

মাইক্রো-তরঙ্গ হচ্ছে সেই সব অতি ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ, যাদের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১ মিলিমিটার থেকে ৩০ সেন্টিমিটারের মধ্যে। বেতার যোগাযোগে, আমরা জানি, সঙ্কেতকে বহন করবার জন্যে একটি বাহক-তরঙ্গের প্রয়োজন। সাধারণ বেতার-তরঙ্গের পরিবর্তে মাইক্রো-তরঙ্গকে বাহক হিসাবে ব্যবহার করবার কয়েকটি সুবিধা আছে। যেমন, একটি হলো : মাইক্রো-তরঙ্গ বহু সঙ্কেতকে এক সঙ্গে বহন করতে পারে,—একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ পর্যন্ত টেলিফোনের সঙ্কেতকে একসঙ্গে পাঠানো চলে।

আমাদের দেশে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রথম কার্যকরী করা হয় ১৯৬৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সঙ্কেতকে বহন করবার জন্যে ডাক ও তার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ঐ রকম কয়েকটি ব্যবস্থা এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে। পূর্বাঞ্চলের একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার অংশবিশেষ পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

সঙ্কেতবাহক মাইক্রো-তরঙ্গকে প্রেরক-যন্ত্র থেকে বাইরে পাঠাবার জন্যে যে এরিয়েল ব্যবহার করা হয়, ১ (ক) নং ছবিতে সেই রকম দুটি এরিয়েলের আলোকচিত্র দেখানো হয়েছে; ১ (খ) নং ছবিতে বোঝানো হয়েছে তাদের কর্মপদ্ধতি। জলকে স্থানান্তর করবার জন্যে যেমন জলের পাইপ, মাইক্রো-তরঙ্গ স্থানান্তর করবার জন্যে সেই রকম 'ওয়েভ-গাইড নামে ধাতু নির্মিত এক বিশেষ ধরণের নল ব্যবহৃত হয়। ঐ নলের মুখে থাকে চোঙার মত একটি অংশ : একে বলা হয় 'হর্ন'। প্রেরক-যন্ত্র থেকে ওয়েভ-গাইড-এর মধ্য দিয়ে এসে মাইক্রো-তরঙ্গ হর্ন থেকে বাইরে নিঃসৃত হয়। এখন ঐ হর্ন একটি অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকের ফোকাসে অবস্থিত হওয়ায় হর্ন থেকে নিঃসৃত তরঙ্গ অনেকটা আলোক-তরঙ্গের মতই প্রতিফলিত হয়ে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলও ঠিক প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়েলের মত। সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ সেখানে পৌঁছে অধিবৃত্তাকার প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে তার ফোকাসে অবস্থিত হর্ন-এ গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে ওয়েভ-গাইড-এর মধ্য দিয়ে চলে যায় গ্রাহক-যন্ত্রে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, একটি এরিয়েলই কখনো প্রেরক ও কখনো গ্রাহক হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রেরক-যন্ত্র থেকে গ্রাহক-যন্ত্রের দূরত্ব কয়েকশো বা কয়েক হাজার কিলোমিটার হতে পারে। এতখানি দূরত্ব মাইক্রো-তরঙ্গের পক্ষে এক লাফে যাওয়া সম্ভব নয়; সেজন্যে পান্থ-শালার মত পথের মধ্যে মধ্যে (গড়ে প্রায় ৫০ কিলোমিটার অন্তর) রিপিটার (Repeater) ষ্টেশন থাকে। ভারতের পূর্বাঞ্চলের ঐরকম একটা ষ্টেশনের আলোকচিত্র ২ (ক) নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে। কেমনভাবে ষ্টেশনটি কাজ করে, ২ (খ) ১নং ছবি দেখলে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, বাঁ-দিক থেকে কোন মাইক্রো-তরঙ্গ আসছে। বাঁ-দিকের উপরের প্রতিফলকে প্রতিফলিত হয়ে তা নেমে আসবে নিচের এরিয়েলে। সেখান থেকে ওয়েভ-গাইড-এর মধ্য দিয়ে সেটা যন্ত্রের কুটিরে উপস্থিত হলে সেখানে তাকে পরিবর্ধিত করা হয় এবং সে যে সঙ্কেতকে বহন করছে, পথে যদি তার বিকৃতি ঘটে থাকে, তবে সেই বিকৃতি অপসারণ করা হয়। অতঃপর মাইক্রো-তরঙ্গ ওয়েভ-গাইড-এর মাধ্যমে ডানদিকের নীচের এরিয়েলে চলে যায়। সেখান থেকে সমান্তরাল রশ্মি হিসাবে নির্গত হয়ে ও তারপর উপরের প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে মাইক্রো-তরঙ্গ আবার তার যাত্রা সুরু করে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, জাংশন ষ্টেশনে রেলগাড়ির ইঞ্জিন বদলের মত রিপিটার ষ্টেশনে সঙ্কেতবাহক মাইক্রো-তরঙ্গের বদল হয়, অর্থাৎ যে তরঙ্গ ষ্টেশনে এসে ঢোকে, তাকে আর না পাঠিয়ে অন্য কম্পাঙ্কের আর একটি তরঙ্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাহক হিসাবে।

ডান-দিক থেকে কোন মাইক্রো-তরঙ্গ রিপিটার ষ্টেশনটিতে এলে একই উপায়ে তা পরিবর্ধিত ও বিশুদ্ধ হয়ে বাঁ-দিকে ফের তার যাত্রা সুরু করবে। রিপিটার ষ্টেশন যেন সব্যসাচী, তার বাঁ-দিক ও ডান-দিক একইভাবে তরঙ্গ নেওয়া ও দেওয়ার কাজ করতে পারে।

('ডাক ও তার' বিভাগের শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে আলোকচিত্র দুটি সংগৃহীত)

আমাদের দেশে মাইক্রো-তরঙ্গ যোগাযোগ ব্যবস্থা
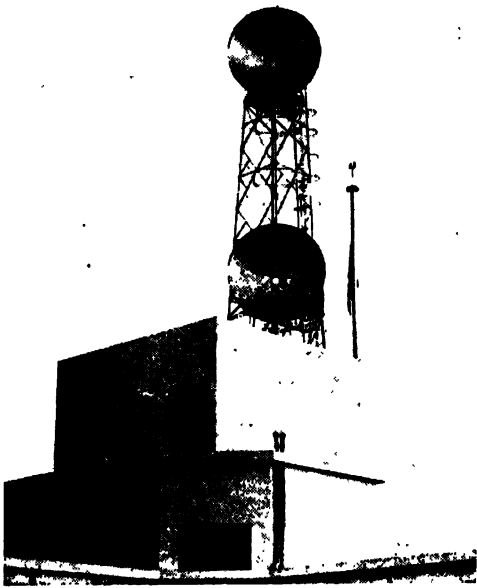
(ক)
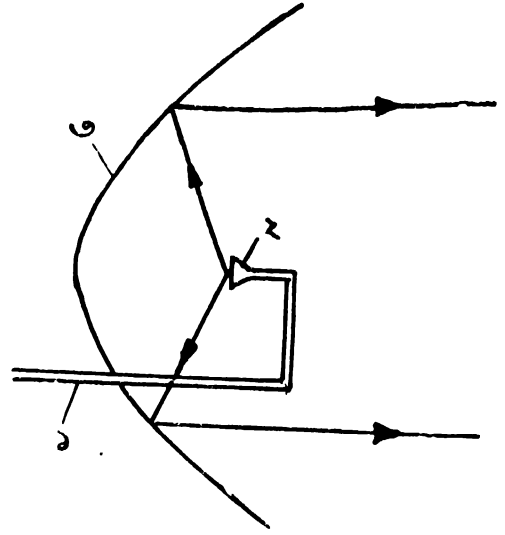
(খ)

১ নং চিত্র— মাইক্রো-তরঙ্গ এরিয়েল

১— ওয়েভ-গাইড; ২— হর্ণ; ৩— অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক।

(খ)
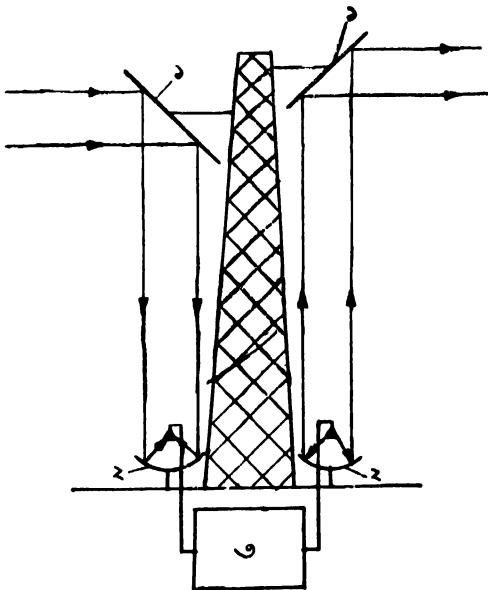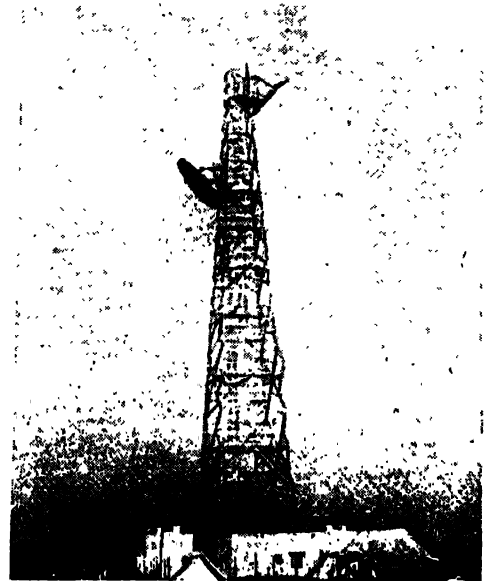
(ক)

২ নং চিত্র— ভারতের পূর্বাঞ্চলের একটি রিপিটার স্টেশন

১—প্রতিফলক; ২—মাইক্রো-তরঙ্গ এরিয়েল; ৩—পরিবর্ধন ও বিশুদ্ধিকরণের যন্ত্রাদি

জৈব তড়িৎ-বিভব ও তার প্রয়োগ

সুশীলরঞ্জন মৈত্র ও বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

জীবকোষের স্বাভাবিক বিপাক (Metabolism) পদ্ধতির ফলে প্রতিটি কোষ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাত্রা-বিশিষ্ট তড়িৎ-শক্তি উৎপাদন করতে পারে। কোষের তড়িৎ-শক্তির মাত্রা যদিও অতি ক্ষুদ্র, তথাপি এর গুরুত্ব কম নয়। দেহের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের তড়িৎ-বিভব পরিমাপের জন্যে বিশেষ প্রকার যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে।

জীবদেহ জীবকোষের সমষ্টি মাত্র। শরীরের একটা জীবকোষ অপর একটা জীবকোষ থেকে তার কার্যাবলীর দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু মৌলিকত্বের দিক থেকে তারা অভিন্ন। যে কোন জীবকোষের 'সজীবতা' অথবা নির্দিষ্ট কার্যাবলী নির্ভর করে প্রধানতঃ কোষের দুই পরিবেশের উপর—একটা কোষের অন্তঃপরিবেশ, আর অপরটা কোষের বহিঃপরিবেশ। এখানে কোষের পরিবেশ বলতে আমরা শুধু পরিবেশের রাসায়নিক উপাদানের কথাই বুঝবো।

কোষের দুই পরিবেশের মধ্যস্থলে একটা পর্দা বা মেম্ব্রেন (Membrane) থাকে। পর্দার গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র থাকতে দেখা যায়। পরিবেশদ্বয়ের রাসায়নিক উপাদানের গাঢ়ত্ব রক্ষার কার্যে পর্দার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায়—কোষের অন্তঃপরিবেশে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) এবং সোডিয়াম বাইকার্বনেটের ($NaHCO_3$) ভাগ বহিঃপরিবেশের তুলনায় কম থাকে। এতদ্‌ভিন্ন অন্তঃপরিবেশে পটাসিয়াম আয়ন (K^+) ও নানা প্রকারের জৈব উপাদানের মিশ্রণও থাকতে দেখা যায় (চিত্র নং ১)। কোষের বহিঃপরিবেশে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), সোডিয়াম বাইকার্বনেট এবং তুলনায় কম পরিমাণ পটাসিয়াম আয়ন (K^+) থাকে। পর্দার ছিদ্রপথ দিয়ে রাসায়নিক উপাদানের চলন পর্দার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আবার পর্দার এই কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করছে কোষের তড়িৎ-শক্তি।

যদি কোন সজীব কোষের অন্তঃ ও বহিঃ-পরিবেশ বিশেষ প্রকার যন্ত্রের তড়িদ্দ্বার দিয়ে সংযোগ স্থাপন করা হয়, তাহলে যন্ত্রে একটা তড়িৎ-বিভব (Eletrical Potential) রেকর্ড হয়, যাকে স্থির তড়িৎ-বিভব (Resting Electrical Potential) অথবা পর্দা-বিভব বলা হয়। মাংসপেশী অথবা স্নায়ুর স্থির তড়িৎ-বিভব প্রায় ১০০০ মাইক্রো-ভোল্টের মত।

আমরা আগে বলেছি যে, জীবকোষের তড়িৎ-শক্তি কোষের দুই পরিবেশের রাসায়নিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল। এখন সহজভাবে বোঝবার জন্যে অন্তঃপরিবেশের সোডিয়াম বাই-কার্বনেটকে যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে ধরা যায়, তাহলে যা দাঁড়াবে, ১নং চিত্রে তা দেখানো হয়েছে। যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, পটাসিয়াম আয়নই এক মাত্র পর্দার ছিদ্রপথ দিয়ে স্বাধীনভাবে কোষের ঐ দুই পরিবেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে (যা সাধারণতঃ কোষের স্থির অবস্থায় দেখা যায়), তাহলে কোষের পর্দার গায়ে যে ভাবে ঋণাত্মক ও ধনাত্মক আধানগুলি দেখতে পাওয়া যাবে, ১নং চিত্রে তা পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে।

দেখা যায়, ক্লোরিন আয়ন (Cl^-) মাংসপেশীর পর্দার ছিদ্রপথ দিয়ে অতি সহজেই যাতায়াত

করতে পারে। কোষের স্থির অবস্থায় সোডিয়াম পর্দার ছিদ্রপথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না, অর্থাৎ পর্দার স্থির অবস্থায় সোডিয়ামের যাতায়াতে বাধা দেয়। পটাসিয়াম কিন্তু স্বাধীনভাবেই ছিদ্রপথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। পটাসিয়ামের এ যেন জন্মগত অধিকার। এখন বিভব স্থায়ী এবং একে যতক্ষণ ইচ্ছা ঐ ভাবে রাখা যায়। কারণ এটা নির্ভর করছে কোষের অন্তঃ ও বহিঃপরিবেশের পটাসিয়াম আয়নের গাঢ়ত্বের উপর। যেহেতু কোষের অন্তঃপরিবেশের নানা প্রকার জৈব উপাদানের মিশ্রণ A- পর্দার ছিদ্রপথ দিয়ে যাতায়াত করতে

কোষের পর্দা

K^+
A^-
Na^+
Cl^-

K^+
Na^+
Cl^-

১ ২
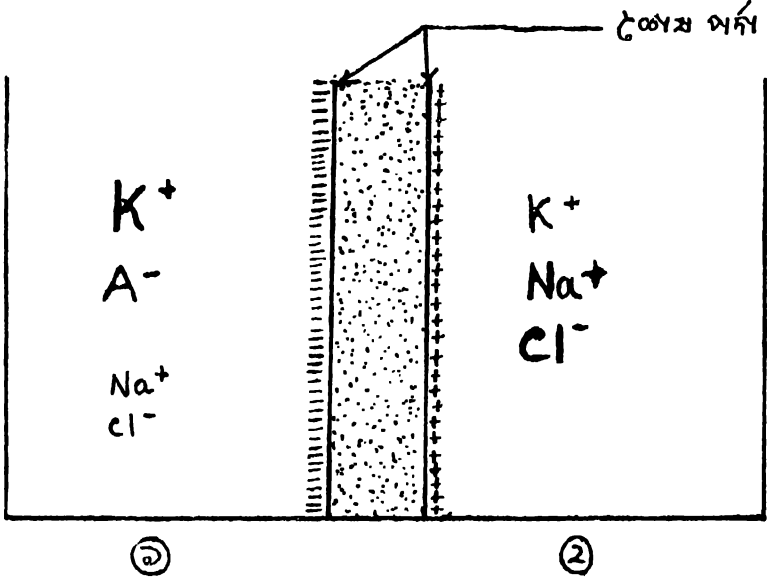
১নং চিত্র

১। কোষের অন্তঃপরিবেশ ২। কোষের বহিঃপরিবেশ। চিত্রে মাংসপেশী অথবা স্নায়ুর "স্থির তড়িৎ-বিভব" উৎপাদন-পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে। A^-কে নানান প্রকার জৈব উপাদানের মিশ্রণ ধরতে হবে। মোটা হরফে লেখা থাকলে ঐ উপাদানের ভাগ সেই পরিবেশে তার বিপরীত পরিবেশের তুলনায় বেশী আছে বুঝতে হবে। উপাদানের মাথায় যুক্ত অথবা বিযুক্ত চিহ্ন ঐ উপাদানের আধানের কথা নির্দেশ করে।

যদি ক্লোরিনকে (Cl^-) বহির্মুখী পটাসিয়ামের সঙ্গ নিতে হয়, তাহলে একে একটা গাঢ়ত্বের ক্রমোচ্চ সীমা রেখা (Concentration gradient) অতিক্রম করতে হবে। কারণ বহিঃপরিবেশে ক্লোরিনের গাঢ়ত্ব অন্তঃপরিবেশের তুলনায় অনেক বেশী (চিত্র নং ১)। ফলে ক্লোরিনের আসল চলন হয় না, আর তাই একটা তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়। এই প্রকারে উৎপন্ন তড়িৎ-পারছে না এবং তুলনায় সোডিয়াম আয়নের অবস্থাও প্রায় একই—সেহেতু পটাসিয়ামের গাঢ়ত্ব একই থাকবে। কোষের বহিঃপরিবেশের পটাসিয়ামের গাঢ়ত্ব যদি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে, নিম্নে প্রদত্ত অনুপাতটাও কমে যাবে, ফলে তড়িৎ-বিভবও কমে যাবে।

[প] ভিতর অর্থাৎ বন্ধনীর মধ্য দিয়ে 'প'
[প̄] বাহির পটাসিয়ামের গাঢ়ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

উত্তেজিত (Stimulated) অবস্থায় কোষের বিভিন্ন আয়নের গাঢ়ত্বের একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, কোষের স্থির অবস্থায় যে সোডিয়াম আয়ন পর্দার ছিদ্রপথে বার বার বাধা পেয়ে আপন পরিবেশে ফিরে এসেছে কোষের উত্তেজিত অবস্থায়, এখন সে অনায়াসে কোষের অন্তঃপরিবেশে প্রবেশ করতে পারে আর সঙ্গে সঙ্গে স্থির অবস্থায় ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক আধান যে ভাবে সাজানো ছিল, ঠিক তা উল্টোভাবে সাজানো হয়ে যায়। ফলে পর্দার বাইরের দিকটা ঋণাত্মক এবং ভিতরের দিকটা ধনাত্মক আধানের দ্বারা আহিত হয়। পূর্বের মত তড়িদ্বারের সাহায্যে রেকর্ড নেওয়া হলে একটা নতুন তড়িৎ-বিভব পাওয়া যাবে, যাকে ক্রিয়া-বিভব (Action Potential) বলা হয়।

জীবকোষের তড়িৎ-ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বিরাট এক শাখা—তড়িৎ-শারীরবৃত্ত (Electro-physiology)। শারীরিক নানা প্রকার অঙ্গের বিভিন্ন কার্যের অন্তর্নিহিত কলাকৌশল এবং বহু প্রকার অজানা রোগ নির্ণয়ে এর অবদান অতুলনীয়। এর প্রয়োগে আজ আমরা বিভিন্ন রোগের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তার প্রতিকারের রাস্তা খুঁজে পেয়েছি। আলোচ্য প্রবন্ধে তারই কয়েকটা দিক পাঠকের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি।

জীবকোষের তড়িৎ-বিভবের সাহায্যে চোখের 'দেখা' কাজের গূঢ় রহস্য আজ বিজ্ঞানীদের কাছে বহুলাংশে সহজ হয়ে পড়েছে। মানুষ কিভাবে একটা রঙীন পদার্থকে অনুভব করে, সর্বকালের শারীরবিজ্ঞানীদের কাছে এটা একটা বিশেষ চিন্তার বিষয়। আলো অথবা রঙীন বস্তুর সঙ্গে চোখের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন রেকর্ড করে এ-বিষয়ে প্রচুর বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং তার যথাযথ বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে।

চোখের বিভব-অন্তর (Potential difference) পরিমাপ করবার জন্যে সাধারণতঃ একটা তড়িদ্বার চোখের অচ্ছোদপটলের (Cornea) উপর এবং অপর একটা তড়িদ্বার মুখবিবরের মধ্যে রাখা হয়। এই ভাবে যে তড়িৎ-বিভব-অন্তর পাওয়া যায়, তাকে ইলেকট্রো-রেটিনোগ্রাম (Electroretinogram) বা সংক্ষেপে E. R. G. বলা হয়।

চোখের মধ্যে বিশেষ দুই প্রকার কোষ থাকে, যাদের রড (Rod) কোষ এবং কোণ (Cone) কোষ বলে। রড কোষ প্রধানতঃ অল্প আলোতে দেখবার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে, সেইরূপ উজ্জ্বল আলোতে কোণ কোষের তৎপরতা অনেক বেড়ে যায়। ইলেকট্রো-রেটিনোগ্রামের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার জন্তুর অক্ষিপটের (Retina) শ্রেণীবিভাগ করা হয়ে থাকে। দেখা যায়, কোন কোন জীব অল্প আলোতে পরিষ্কার দেখতে পায়, কিন্তু দিনের উজ্জ্বল আলোতে দেখতে পায় না। আবার কোন কোন প্রাণী দিনের আলোতে পরিষ্কার দেখতে পায়, কিন্তু অল্প আলোতে দেখতে পায় না। সাধারণ ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়—যে সব প্রাণী অল্প আলোতে দেখতে পায় অথচ উজ্জ্বল আলোতে পরিষ্কার দেখতে পায় না, তাদের চোখে কোণ (Cone) কোষের তুলনায় রড (Rod) কোষ অনেক বেশী আছে। অপর পক্ষে, যে সব প্রাণী দিনের আলোতে দেখতে পায়, কিন্তু অল্প আলোতে দেখতে পায় না, তাদের চোখে রড (Rod) কোষের তুলনায় কোণ (Cone) কোষের সংখ্যা অনেক বেশী।

আজকাল চোখের ঐ দুই প্রকার কোষ থেকেও সরাসরি তড়িৎ-বিভব রেকর্ড করা সম্ভব

হয়েছে—যার সাহায্যে চোখের দেখা কাজটা আরও নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

চোখের মত আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্যেরও নানা প্রকার মতবাদ জড়িয়ে রয়েছে তড়িৎ-বিভবের সঙ্গে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-তরঙ্গের সঙ্গে শ্রবণেন্দ্রিয়ের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন পুনরায় যন্ত্রের সাহায্যে সেই সেই শব্দ-তরঙ্গে পরিবর্তিত করা যায়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক কোষ ও অংশ থেকে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের তড়িৎ-বিভব রেকর্ড করা হয়েছে। যদিও এই সব তড়িৎ-বিভবের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিটি বিভবই কোন না কোন দিক দিয়ে শ্রবণক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষসমূহের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন করে শারীরিক নানা প্রকার অনুভূতির বিষয় জানতে পারা যায়। যেমন—পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ তড়িৎ-তরঙ্গ নানা প্রকারের 'স্বাদ' অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। জিহ্বার উপর তড়িদ্দ্বার দিয়ে উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ দিলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ধাতব স্বাদ অনুভূত হয়। আবার একটি তড়িদ্দ্বার জিহ্বার উপর এবং অপরটি শরীরের যে কোন স্থানে রেখে তার মধ্য দিয়ে পূর্বের মত তড়িৎ-প্রবাহ দিলে অম্ল অথবা ক্ষারের স্বাদ অনুভূত হয়। তড়িৎ-তরঙ্গের গতিপথের উপর নির্ভর করে স্বাদ অম্ল অথবা ক্ষার হবে। এই ভাবে স্বাদ-কোষের (Taste cell) তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন করে আমরা যদি আমাদের ঈপ্সিত খাদ্যের স্বাদ অনুভব করতে পারি, তাহলে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-দ্রব্যের কোন এক-আধটা বাজার থেকে উধাও হয়ে গেলেও তার অনুভূতিকে আমরা জাগিয়ে রাখতে পারবো বরাবরের জন্যে।

মাংসপেশীর রোগ নির্ণয়ে জীবকোষের তড়িৎ-বিভবকে গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজে লাগানো হয়েছে। মাংসপেশীর তড়িৎ-বিভব পরিমাপ করবার জন্যে এক প্রকার যন্ত্র আছে, যাকে ইলেকট্রোমাইওগ্রাফ (Electromyograph) বলা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে মাংসপেশীর ক্রিয়াশীলতা পরিমাপ করা যায়। শ্রম অথবা মাংসপেশীর রোগের সঙ্গে তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন করে নানা প্রকার নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাংসপেশীর নিশ্চল অবস্থা মাংসপেশীর নিজের জন্যে অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত স্নায়ুতন্তুর জন্যে, তা রেকর্ডের সাহায্যে পরিষ্কার ধরা পড়ে। মাংসপেশীর বৈদ্যুতিক রেকর্ডকে ইলেকট্রোমাইওগ্রাম (Electromyogram) বা সংক্ষেপে E. M. G. বলা হয়। মিলিভোল্টকে E. M. G.-এর একক হিসাবে ধরা হয়।

শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কথা বলতে গেলে প্রথমেই হৃদ্‌যন্ত্রের কথা মনে হয়। শরীরের অপরাপর মাংসপেশীর সঙ্গে হৃদ্‌যন্ত্র থেকেও তড়িৎ-বিভব রেকর্ড করা যায়। হৃদ্‌যন্ত্রে প্রতিটি স্পন্দনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন সরাসরি হৃদ্‌যন্ত্র থেকে অথবা দেহের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে তড়িদ্দ্বার বসিয়ে বিশেষ প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়ে থাকে। যে যন্ত্রের সাহায্যে হৃদ্‌যন্ত্রের তড়িৎ-বিভবের রেকর্ড নেওয়া হয়, তাকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ (Electrocardiograph) এবং রেকর্ডকে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) বা সংক্ষেপে E. C. G. আবার অনেক সময় E. K. G.-ও বলা হয়।

হৃদ্‌যন্ত্রের বৈদ্যুতিক কার্যকলাপ দেহের জলীয় পদার্থের সাহায্যে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। ২নং চিত্রে E. C. G-র একটা প্রতিরূপ দেখানো হলো। চিত্রের দিকে লক্ষ্য করলে

কতকগুলি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পর পর দেখতে পাওয়া যাবে। এক-একটা তরঙ্গের এক-একটা নির্দিষ্ট স্থিতিকাল এবং বিস্তার (Amplitude) থাকে। তরঙ্গের স্থিতিকাল আবার হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক। হৃদ্‌যন্ত্রের তড়িৎ-তরঙ্গগুলির বিভিন্ন নামকরণও করা হয়েছে;

হৃদ্‌তরঙ্গের নির্দিষ্ট স্থিতিকাল ও বিস্তার ছাড়াও একটা নির্দিষ্ট দিক (Direction) এবং নির্দিষ্ট স্পন্দন-সংখ্যা থাকে, যা প্রত্যেক স্বাভাবিক ব্যক্তি ও জীবের ক্ষেত্রে সব সময়েই ঠিক থাকে। হৃদ্‌রোগ নির্ণয়ের সময় তরঙ্গের উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাগুণ বিশেষভাবে বিচার করা হয়ে
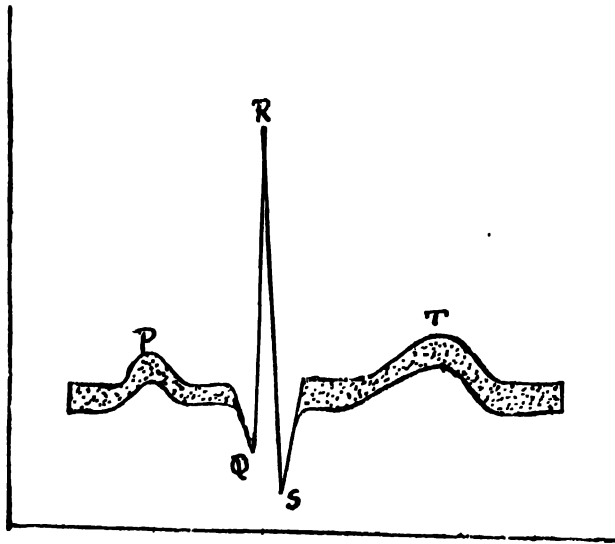
২নং চিত্র

একজন সুস্থ ব্যক্তির E C. G-র একটা প্রতিরূপ দেখানো হচ্ছে।

যেমন—P-তরঙ্গ, স্থিতিকাল •'•৭ থেকে •'১২ সেকেণ্ড। QRS-তরঙ্গ, স্থিতিকাল •'•৫ থেকে •'১• সেকেণ্ড এবং T-তরঙ্গ, স্থিতিকাল •'২৭ সেকেণ্ড।* সাধারণতঃ P-তরঙ্গ অলিন্দের (Auricle) ক্রিয়াশীলতা নির্দেশ করে। QRS-তরঙ্গ হৃদ্‌যন্ত্রের নিলয়ের (Ventricle) কার্যাবলী এবং T-তরঙ্গ নিলয়ের কর্মমুক্ত (Recovery) অবস্থায় তড়িৎ-পরিবর্তন জ্ঞাত করতে সাহায্য করে।

* এখানে হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন তরঙ্গের স্থিতিকাল বয়স্ক ব্যক্তির গড় হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

থাকে। হৃদ্‌যন্ত্রের যে কোন প্রকার রোগের প্রতিফলন হৃদ্‌তরঙ্গে অবশ্যই পাওয়া যাবে, যার সাহায্যে রোগের শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

শ্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যধারার পরিবর্তন রেকর্ড করে যে সব মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, তার দ্বারা হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে পরিষ্কার একটা ধারণা জন্মেছে। মানুষের শারীরিক ক্ষতি না করে একটা নির্দিষ্ট বয়সের ব্যক্তিকে কি পরিমাণ শ্রম দিলে সে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা দেখাতে পারবে, হৃদ্‌যন্ত্রের তড়িৎ-বিভব তা আমাদের জানিয়ে দিতে পারে।

দেহের অন্যান্য জীবকোষের মত মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ থেকেও তড়িৎ-বিভব সংগ্রহ করা যায়। বিশেষ প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে কোষ-সমূহের তড়িৎ-শক্তিকে ইচ্ছামত বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে তরঙ্গের আকারে রেকর্ড করা যায়। যে যন্ত্রের সাহায্যে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের বৈদ্যুতিক শক্তিকে তরঙ্গের আকারে রেকর্ড করা হয়, তাকে ইলেকট্রোএনকেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph) এবং যে তরঙ্গ-রেখা রেকর্ডে পাওয়া যায়, তাকে ইলেকট্রো-এনকেফালোগ্রাম (Electro-encephalogram), সংক্ষেপে E.E.G. বলা হয় (এই পত্রিকার অন্যত্র চিত্র দ্রষ্টব্য)।

দেখা যায়, একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির স্থির অবস্থায় মস্তিষ্ক থেকে প্রতি সেকেণ্ডে তিন প্রকার স্পন্দন-সংখ্যায় তড়িৎ-তরঙ্গ আসতে থাকে। প্রতি সেকেণ্ডে তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তাদের এক একটা নামকরণও করা হয়েছে। যেমন—আলফা (Alpha) তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ৮-১০ এবং ভোল্টেজ গড়ে ৫০ মাইক্রোভোল্ট। ১ মাইক্রো-ভোল্ট = $\frac{১}{১০০০}$ মিলিভোল্ট, আবার এক মিলি-ভোল্ট = $\frac{১}{১০০০}$ ভোল্ট। বিটা (Beta) তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে ১৫-৬০ এবং এর ভোল্টেজ আলফা (Alpha) তরঙ্গের তুলনায় কম, গড়ে প্রায় ৫-১০ মাইক্রোভোল্ট। ডেল্টা (Delta) তরঙ্গের স্পন্দন-সংখ্যা আগের দুই তরঙ্গের তুলনায় কম, কিন্তু এর ভোল্টেজ অনেক বেশী, গড়ে প্রায় ১০ থেকে ২০০ মাইক্রোভোল্ট। এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সব বিভিন্ন তরঙ্গের এক-একটা নির্দিষ্ট বিস্তার থাকে।

মস্তিষ্কের তড়িৎ-তরঙ্গের নানা প্রকার ধর্ম, যেমন—তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি, প্রতি সেকেণ্ডে স্পন্দন-সংখ্যা, বিস্তার এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি বিচার করে অজানা বহু প্রকার কঠিন ও দুরারোগ্য প্রাচীন রোগসমূহের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

কোষের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন ঘটিয়ে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ, যারা শারীরিক এক-একটা অঙ্গের নিয়ন্ত্রণ-কার্যে সর্বদাই তৎপর রয়েছে, তাদের সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব। যেমন দেখা যায়, কোন একটা অঙ্গে নির্দিষ্ট অংশকে যদি পরিমাণমত তড়িৎ-শক্তি দিয়ে বাইরে থেকে উত্তেজিত করা হয়, তাহলে ঐ তড়িৎ-শক্তির জন্যে মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট একটা অংশে (অন্যান্য অংশের তুলনায়) তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন হয়। এই ভাবে পরীক্ষা করে সারা মস্তিষ্কটাকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এক-একটা অংশকে শরীরের এক-একটা অঙ্গের কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্যে দায়ী করা হয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রত্যেক রকম অনুভূতির পিছনে জীবকোষের তড়িৎ-বিভবের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জীব-কোষের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন না করে কোন প্রকার অনুভূতি অনুভব করা সম্ভব নয়। চর্ম-কণার কথা যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে দেখতে পাবো, নানা প্রকার অনুভূতি গ্রহণ করবার কাজে বিশেষ বিশেষ জীবকোষ সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। যখনই কোন জীবকোষ তার নির্দিষ্ট অনুভূতির দ্বারা উত্তেজিত হয়, তখনই তার স্থির বিভব চঞ্চল হয়ে ওঠে। ফলে, যদি ঐ পরিবর্তিত তড়িৎ-বিভব নির্দিষ্ট একটা সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে, একমাত্র তখনই স্নায়ু-আবেগের (Nerve Impulse) সৃষ্টি হয়। স্নায়ু-আবেগ স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে মস্তিষ্কের বিশেষ অংশের স্নায়ু-কোষের স্থির তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন ঘটায়। ঐ স্নায়ুকোষের কার্যের সঙ্গে জড়িত অপরাপর অংশের তড়িৎ-বিভবের পরিবর্তন করে ঐ বিশেষ অনুভূতির অনুভব ও তার যথাযথ তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করবার প্রয়াস পায়।

বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা

মহাদেব দত্ত ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউটন তাঁর 'প্রিন্‌সিপিয়া' গ্রন্থে প্রস্তাব করেন যে, বিজ্ঞানে প্রত্যক্ষ কার্যের কারণ হিসাবে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে পাওয়া তত্ত্বকে গ্রহণ করতে হবে। আইনষ্টাইনও এই নীতিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে নিউটন তত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিকতাবাদের প্রস্তাব করেন। বোর (Bohr), বর্ণ্ (Born), হাইসেনবার্গ (Heisenberg) প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও এই নীতি আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করে 'কোয়ান্টামবাদ'কে রূপ দেবার প্রস্তাব করেন। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি এই নীতির উপর গড়ে উঠেছে।

এই নীতির বিচারে বিজ্ঞানের প্রধানতঃ দুটি দিক—প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া তথ্য, যা আসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে এবং এই সব তথ্যকে বিশ্লেষণ করে সুসংবদ্ধভাবে পাওয়া তত্ত্ব। বিজ্ঞানের প্রগতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তত্ত্বীয় বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত দুই পক্ষ। বর্ণ্ তাঁর একটি বক্তৃতার (The Experiment) গ্রন্থে এই বিষয়টি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন।

প্রকৃত বিজ্ঞান-শিক্ষায় এই দুটি দিকের উপরই জোর দেওয়া উচিত। বিজ্ঞান-শিক্ষাকে সুসঙ্গত রূপ দিতে গেলে একদিকে যেমন ভালভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে পাওয়া তথ্যকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করবার শিক্ষাও দিতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার সর্বস্তরে কারুশালা (Laboratory) চাই। কিন্তু কারুশালার বাইরেও যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যায়, তাও ভুললে চলবে না। এজন্যে সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ক্ষুদ্র সংস্করণ পাওয়া যায় ছেলে-মেয়েদের খেলনা হিসাবে। এই সব খেলনার সাহায্যে ছেলে-মেয়েদের মন বিজ্ঞানমুখী হয়ে ওঠে। এছাড়া থাকে প্রকৃতি-পাঠ অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রকৃতির কাছ থেকে গাছপালা, পোকা-মাকড়, পশুপাখী, নানারকম মাটি, নানারকম পাথর আর জল, বাতাস ও আকাশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এর জন্যে যে সামাজিক সুখসুবিধার দরকার—তা কবে এদেশে হবে, কে জানে! কেবল কারুশালায় নিম্নতম পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কাজ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভ্যস্ত মন তৈরি করা বিজ্ঞান-শিক্ষার পক্ষে বিশেষ সহায়ক নয়। এর উপর আবার অনেক জায়গার কারু-শালায় প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব আর যেখানে উপকরণ আছে, সেখানেও নিয়মিত অনুশীলন-ব্যবস্থার অভাব প্রায়ই দেখা যায়। স্বভাবতঃই এর সঙ্গে দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা জড়িত থাকে।

শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তথ্য জানাই বিজ্ঞান নয়। প্রতিদিনই সংবাদপত্রে আবহাওয়ার চার্ট দেখতে পাওয়া যায়। এই চার্ট বিজ্ঞান নয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার তথ্যকে বিশ্লেষণ করে যুক্তিসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত করলে তবে বিজ্ঞান হয়। তথ্য বিশ্লেষণ করে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। আমাদের দেশে সাধারণভাবে এবিষয়ে সজাগ

দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না। এবিষয়ে গণিত-শিক্ষা বিশেষ সহায়ক। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে সাধারণ বিজ্ঞানীদের গণিত-শিক্ষার মান মোটেই আশানুরূপ নয় বলে মনে হয়। এজন্যে এদেশে ভালভাবে বিজ্ঞান-প্রগতি বেশ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। একথা সত্য, এদেশে গণিতে ও গাণিতিক বিজ্ঞানে কিছু কিছু অবদান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু সাধারণভাবে গণিত-শিক্ষার মান ভাল না হওয়ায় বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ভারতীয় বিজ্ঞানীদের যোগ্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হবার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিছুটা আশার বিষয়, গণিতের পাঠ্যসূচীর কিছু পরিবর্তন করা হচ্ছে। তবে এখনও গণিত-শিক্ষার মান যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নি। আর যে পরিবর্তন করা হচ্ছে, তার হার এতই মন্থর যে, অপর দেশের সঙ্গে এ-বিষয়ে ব্যবধান থেকে যাবার সম্ভাবনা রয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান-শিক্ষার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে বিবেচনা না করলে, বিজ্ঞান-শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, যতক্ষণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করা মানসিক অভ্যাসে পরিণত না হয়। মনে হয়, মানসিক চিন্তার গঠন-প্রণালীর সঙ্গে মাতৃভাষা গভীরভাবে জড়িত। সুতরাং মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা না করলে শিক্ষা সাধারণতঃ অসম্পূর্ণ থেকে যাবার সম্ভাবনা। আশার বিষয়, ভারত সরকারের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ত্রিগুণা সেন এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করছেন। শেষ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষানীতি কিভাবে ঘোষিত হবে, তা লক্ষণীয়। তবে সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা চালু হলে বিজ্ঞান-শিক্ষার গভীরতা ও প্রসার আশা করা যায়। এদেশে অনেক সময় বলা হয়, মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের ভাব প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ এদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞানের পরিভাষা সন্তোষজনকভাবে এখনও গড়ে ওঠে নি। একথা যুক্তিসহ নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সরকার যদি সর্বস্তরে মাতৃভাষায় মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষা চালু করেন, তাহলে পরিভাষার জন্যে আট্‌কাবে না। একবার এই নীতি স্বীকৃত হলে পরিভাষা আপনা-আপনি গড়ে উঠবে। যে ভাব সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে নিয়েছি, তা নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে কেন পারবো না? বিজ্ঞানের যে ভাব আমরা বিদেশী ভাষায় আয়ত্ত করবার চেষ্টা করেছি এবং মনে যার ভাসা ভাসা ধারণা রয়ে গেছে, তা নিজের মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে গেলে প্রথমে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। এখানে প্রশ্ন ভাব প্রকাশের নয়, প্রশ্নটা তর্জমার।

এরপর শিক্ষিত মহলে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, 'তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও, কিন্তু বাংলা ভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই?' এই প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বে দিয়ে গেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায়—"নাই সেকথা জানি, কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা-গ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে-ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তারপরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে। বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না, এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয়, তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।" সুখের বিষয়, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর সেন এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে জানিয়েছেন, আঞ্চলিক ভাষায় প্রামাণ্য

বিজ্ঞান-গ্রন্থ অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ রচনার জন্যে সরকার অর্থ-সাহায্য করবেন।

• বিজ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা আসে। সাধারণভাবে বিজ্ঞান-শিক্ষার অর্থ, বিজ্ঞানের তথ্য সম্যকভাবে আহরণ বুঝায়। এটা কিন্তু সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নয়। শিক্ষায় যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্বের আহরণ বুঝায়, তবে সম্পূর্ণ হয় না, বিজ্ঞান-শিক্ষায় নতুন ফলনের জন্যে সম্যকরূপে প্রস্তুতি থাকা চাই। শিক্ষায় যদি সৃজনীশক্তির উন্মেষ না হয়, তবে সেই বন্ধ্যাত্ব মঙ্গলদায়ক হয় না। শিক্ষাকে সৃজনধর্মী হতে হলে শিক্ষকের স্রষ্টার অভিজ্ঞতা থাকা চাই। গবেষণার অভিজ্ঞতা না থাকলে শিক্ষকের শিক্ষা এদিক থেকে সফল হওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষার উপরের স্তরে শিক্ষকদের গবেষণায় অভিজ্ঞতার অত্যাবশ্যকতা আজ স্বীকৃত, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের নীচের স্তরগুলিতে শিক্ষকের অভিজ্ঞতার বিষয় ভাববার কথা দেশে এখনও চিন্তা করা হয় না। বিজ্ঞান-শিক্ষার সম্পূর্ণ ও সফল রূপায়ণের জন্যে সব স্তরের শিক্ষকের গবেষণায় অভিজ্ঞতা অত্যাবশ্যক। একথাটা আপাতঃদৃষ্টিতে অসম্ভব বা অকার্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, প্রস্তাবটা ততটা অকার্যকর নয়। একথা বোঝবার জন্যে গবেষণা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও সম্যক বিশ্লেষণ করা উচিত। বর্তমানে সাধারণ শিক্ষিতেরাও গবেষণা বলতে বোঝেন, কারুকলায় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বা কোনও অঙ্ক কষে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে স্বদেশী বা বিদেশী গবেষণা-পত্রিকায় প্রকাশ করা বা ঐ প্রবন্ধ 'থিসিস্'রূপে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার জন্যে দিয়ে একটি উপাধি লাভ করা। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের আশেপাশে রোজ যা দেখছি, তা সবই জানা হয়ে যায় নি। সে সব বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করবার সম্ভাবনা এখনও আছে। নানা স্তরের শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে নতুন করে ভাববার বিষয়ও আছে এবং কিছু সমস্যাও আছে, যার সম্পূর্ণ সমাধান এখনও হয় নি। যাঁরা উচ্চ শিক্ষার সম্যক সুযোগ পান নি, তাঁদের পক্ষেও এসব বিষয় ও সমস্যায় কিছু করা সম্ভব। এর জন্যে চাই এমন সব পত্রিকা, যেগুলি এসব বিষয় ও সমস্যার আলোচনার সূত্রপাত করবে এবং এবিষয়ে যাঁরা নিজেরা কিছু ভাববার চেষ্টা করবেন, তাঁদের প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে উৎসাহ দেবে। অপরাপর অগ্রসর দেশে এরূপ ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। আঞ্চলিক ভাষায় এই চেষ্টা করলে আরও ভাল ও ব্যাপক ফল পাবার সম্ভাবনা।

শুধু সর্বস্তরের শিক্ষকদের নয়, ছাত্রদেরও তাদের নিজেদের আশেপাশের জিনিষ নিয়ে ভাববার, নিজেদের পাঠ্য বিষয় নতুন করে ভাববার এবং আশেপাশে যে সব সমস্যার (তা যত সাধারণ বা সামান্য হোক না কেন) সমাধান হয় নি, সে সম্বন্ধে চিন্তা করবার উৎসাহ দেওয়া উচিত। গবেষণার উচ্চমানের ধুয়া তুলে এবিষয়ে এদেশে কোনও চিন্তা করা হচ্ছে না। মৌলিক চিন্তা বিকাশের বিশেষ কোন বয়স নেই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখা যায়, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই যুগান্তকারী মৌলিক অবদান করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতকপূর্ব স্তরেই ছাত্রদের মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে ও তাদের প্রবন্ধ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সে দেশে এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। সোভিয়েট রাশিয়াতেও এই চেষ্টা চলছে। আমাদের দেশেও এবিষয়ে কালবিলম্ব না করে সচেতন হওয়া উচিত। কেবল বিদেশে খ্যাতির দিকে তাকিয়ে শিক্ষা ও গবেষণার নীতি নির্ধারণ করা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।

ভারতে পাটের চাষ

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু

পাট, শন, সিসল, র‍্যামি প্রভৃতি প্রকৃতিজ বা রেয়ন, নাইলন প্রভৃতি মনুষ্য-নির্মিত যত প্রকার বায়নিক তন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হয়, পাট তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুলভ। পাট হইতে সাধারণতঃ বস্তা বা থলিয়া, এক প্রকার মোটা কাপড় (যাহা হেসিয়ান বা আমেরিকাতে বারলাপ বলিয়া কথিত হয়) এবং নানা প্রকারের রজ্জু ও সুতা প্রস্তুত হয়। থলিয়া ও হেসিয়ান কাপড় কৃষিজাত শস্যাদি এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি বহনে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই সব কার্যের জন্য ব্যবহৃত অন্য নানা প্রকার উৎপন্ন দ্রব্যাদি হইতে পাটজাত বস্তুসমূহ অনেক সুলভ। এই কারণে সারা পৃথিবীতে এই তন্তু ও তাহা হইতে নির্মিত দ্রব্যাদির চাহিদা খুবই বেশী।

থলিয়া জাতীয় জিনিষ ব্যতীত পাট হইতে অন্যান্য নানা প্রকার সৌখীন দ্রব্যাদি, যথা—সতরঞ্চ, গালিচা, পর্দার কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ইহা তুলা—এমন কি, রেশম ও পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিভিন্ন প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু নির্মিত হয়। পাটের আঁশকে এক প্রকার প্রক্রিয়ার দ্বারা জারিত করিয়া ঠিক পশমের মত নরম ও কুঞ্চিত আকারের করা যায়। ইহাকে Jute wool বা পাট পশম বলা হয়। ইহা আসল পশমের সহিত মিশ্রিত করিয়া কম দামের কম্বল ও গায়ের আলোয়ান তৈয়ার করিতে ব্যবহৃত হইতেছে। বর্তমান যুগে পাটের আঁশ বিভিন্ন প্রকারে জারিত করিবার পর নাইলন বা মনুষ্য-নির্মিত অন্যান্য কৃত্রিম তন্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী সৌখীন বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে লেখক আমেরিকায় এই প্রকার সৌখীন কাপড় গজপ্রতি এক ডলারে বিক্রীত হইতে দেখিয়াছেন।

মনে হয় ভারতবর্ষে পাটের চাষ বহুকাল যাবৎ হইতেছে। এককালে পাট শাক (যাহাকে নালিতা বলা হয়) বাঙ্গালীর দৈনন্দিন আহার্যে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কাব্যে খাদ্য হিসাবে পাট শাক ব্যবহারের বহু উল্লেখ আছে।

চক্রদত্ত ও রাজবল্লভ প্রণীত আয়ুর্বেদের বিভিন্ন গ্রন্থে নালিতার বিভিন্ন গুণের উল্লেখ আছে: তিক্ত-নালিতার শুষ্কপত্র সারারাত জলে ভিজাইয়া সেই জল খাইলে যকৃতের পীড়া, কৃমি—এমন কি, কুষ্ঠ পর্যন্ত আরোগ্য হয়। মধুর নালিতা ঐভাবে সেবন করিলে সর্দি, শ্লেষ্মা, বায়ু—এমন কি, পক্ষাঘাত পর্যন্ত সারিয়া যাইতে পারে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে কাঁচা পাট হইতে ঢেরা, টাকু প্রভৃতি সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে গৃহশিল্প হিসাবে দড়ি বা সুতা প্রস্তুত হইত। সেই সুতা বা দড়ি হইতে বাংলা দেশের এক জাতীয় কারিগর—যাহাদিগকে কাপালি বলা হইত—পাটের ছালা, চট বা গুণ তৈয়ার করিত। প্রাক-বৃটিশ যুগে এবং বৃটিশ যুগে ভারতে পাট কল স্থাপিত হইবার পূর্বে এইরূপ কুটীর শিল্প হিসাবে পাটের দ্রব্যাদি প্রচুর প্রস্তুত হইত। মুসলমান যুগে ও বৃটিশ শাসনের প্রথম পর্বে এই সকল দ্রব্যাদি ভারতের বাহিরেও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। ইহার প্রমাণ তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়। কবি

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে পাটজাত ও অন্যান্য দ্রব্যাদিতে সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যে যাইবার বিবরণ আছে।

তবে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারের বিপুল প্রসার ও প্রচুর চাহিদা ইংরেজদের দ্বারাই সম্ভবপর হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ রক্সবার্গ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির জাহাজসমূহে ব্যবহারের উপযোগী ইউরোপীয় হেম্প তন্তুর বিকল্প এবং শস্যাদি বহনোপযোগী থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য সুলভে উৎপন্ন হয়, এরূপ কোনও ভারতীয় তন্তুর সন্ধান করিতেছিলেন। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি পাটকেই এইভাবে ব্যবহার-যোগ্য সুলভ তন্তু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি ১০০ টন এই তন্তু 'পাট' নামে ইংল্যাণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের ফ্ল্যাক্স কলগুলিতে এই পাট বয়ন করা যাইতে পারে কিনা, সেই বিষয়ে পরীক্ষা চালান হইয়াছিল। তখনও পর্যন্ত বর্তমান বহুল প্রচলিত ইংরেজী নাম জুট (Jute) প্রচলিত হয় নাই। সরকারী সমস্ত নথীপত্রে ও তখনকার ব্যবসায়ীদের কাগজপত্রে পাট নামই চালু ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে পাটের পরিবর্তে জুট নাম প্রচলিত হয় এবং তাহার পর হইতে সরকারী কাগজপত্রে বা অন্যত্র ব্যবসায়ীদের খাতা ইত্যাদিতে পাট নাম আর দেখা যায় নাই। কোথা হইতে এই জুট নাম আসিল, তাহার সঠিক বিবরণ আজ পর্যন্তও কোথাও পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ মনে করেন যে, তৎকালীন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাগানে (বর্তমানের Indian Botanic Garden) রক্সবার্গ সাহেবের পাট চাষ ইত্যাদির জন্য নিযুক্ত উড়িয়া মালিগণ পাটকে 'ঝুট' বলিত। সেই ঝুট শব্দ হইতে বর্তমান জুটশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও উড়িষ্যার কোন কোন অঞ্চলে পাটকে ঝুট বলে।

পাট কোথায় জন্মায়

ভারত ও পাকিস্তান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কয়েকটি দেশে, যেমন—নেপাল, ফরমোজা, ব্রেজিল, থাইল্যাণ্ড, চায়না, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে পাটের চাষ হয়। ভারত, পাকিস্তানসহ সব দেশগুলিতে ২০ লক্ষ টনেরও অধিক পাট উৎপন্ন হয়। ইহার প্রায় অধিকাংশই ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশেই উৎপন্ন হয়। এই পাটের বেশীর ভাগই পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেই জন্মায়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর দেশে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব হয়। কারণ পাট উৎপাদনকারী অবিভক্ত বঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাগুলি পাকিস্তানে চলিয়া যায়, কেবলমাত্র কয়েকটি জেলা ভারতবর্ষে থাকে। কিন্তু সমস্ত পাটের কলগুলি—যাহাদের বেশীর ভাগই কলিকাতায় বা সন্নিকটবর্তী স্থানে হুগলী নদীর উভয় তীরে অবস্থিত—ভারতেই থাকিয়া যায়। এই কলগুলিতে সরবরাহ করিবার জন্য ভারতে যথেষ্ট পাট জন্মিত না। ১৯৪৮ সালে ভারত সরকার স্থির করিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান হইতে পাট আমদানী করিয়া কলগুলি চালাইবার ব্যবস্থা করা হইবে; অবশ্য তাহার পরিবর্তে পাকিস্তানকে ভারত হইতে ইস্পাত, কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যাদি দিতে হইবে। তখনকার কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন, এই ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। এই ব্যবস্থা হয়তো কিছুকাল চলিতে পারে, কিন্তু বহুকাল চলা অসম্ভব, তাহা কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন। ১৯৪৮ সালে বর্তমান লেখক 'ভারতবর্ষে অধিকতর পাট ফলান সম্ভব'—এই নামে একটি প্রবন্ধ ও পরে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, চেষ্টা করিলে ভারতবর্ষেই যথেষ্ট পাট ফলানো সম্ভব হইতে পারে। এই উপলক্ষে তিনি নিজে ও তাঁহার সহকর্মিগণ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের জেলাসমূহে

পর্যবেক্ষণ (Survey) করিয়া পাটচাষের উপযোগী বিভিন্ন জায়গা নির্বাচিত করিয়াছিলেন। সেই ভারতকে এখন মোটামুটি স্বাবলম্বী বলা যায়। দেশ বিভাগের সময় খণ্ডিত ভারতে পাট

১নং চিত্র

বগী পাট, ফলগুলি লম্বা লম্বা শুঁটির আকার।

সমস্ত জায়গাতে এখন পাটের চাষ খুবই প্রচলিত হইয়াছে। কাঁচা পাটের জন্ত ভারতকে আর এখন পরমুখাপেক্ষী হইবার দরকার নাই— উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৬৫৮ লক্ষ বেল*। আর এখন ধীরে ধীরে বাড়িয়া ভারতে আজ

*১ বেল—৫ মণ

১৯৬৬-৬৭ সালে পাট উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৫,৩৪৮,৩০০ বেল (৯৪৭,৫০০ টন)। এই অধিক ফলন শুধুমাত্র পাটের জমির একর বৃদ্ধির ফলে নহে, একর প্রতি অধিক ফলনের জন্যও ইহা সম্ভব হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বিশেষ

২নং চিত্র
তিতা পাট, ফলগুলি প্রায় গোলাকার।

প্রকার পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে কিছু উৎকৃষ্ট জাতের পাটের জন্য হয়তো পাকিস্তানের কাছে এখনও হাত পাতিতে হয়। তবে চেষ্টা করিলে তাহারও দরকার না হইতে পারে। কারণ, যাহাতে ভারতে উৎপন্ন পাট পৃথিবীর

যে কোন দেশের উত্তম শ্রেণীর পাটের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহার জন্য ভারত সরকার জনসাধারণের সহায়তায় উত্তম শ্রেণীর পাট উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগারের অবদান সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

পাটের প্রকারভেদ

পাট সাধারণতঃ দুই প্রকার গাছ হইতে পাওয়া যায়। ইহারা বর্ষজীবী। মাত্র ৪-৮ মাসের মধ্যেই ইহাদের জীবনপর্ব শেষ হয়। এই দুই প্রকার গাছের সাধারণ নাম—(১) তিতা পাট (Corchorus capsularis) ও (২) বগী পাট (Corchorus olitorius)। এই দুই প্রকার পাটই দেখিতে প্রায় মোটামুটি এক রকম। কিন্তু ইহাদের মধ্যে নানাবিধ পার্থক্য আছে। বগী পাটের পাতার উপরিভাগ উজ্জ্বল, নীচের দিক কর্কশ। এই পাতা প্রায়ই স্বাদহীন—এই জন্য এই পাটকে মিঠা পাটও বলা হয়। ক্যাপসুলারিস বা তিতা পাটের পাতার স্বাদ তিতা। ইহার পাতার উপরের দিক উজ্জ্বল নয়। ইহাদের ফুল ও ফলের আকৃতিতেও যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। তিতা পাটের ফুলগুলি ছোট ও ফল প্রায় গোলাকার। বগী বা মিঠা পাটের ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও ফল লম্বাকৃতি শুঁটির ন্যায় লম্বা হয়। এই দুই জাতীয় পাটের বীজ খুবই ছোট। তবে তিতা পাটের বীজ বগী বা মিঠা পাটের বীজ হইতে অপেক্ষাকৃত বড় এবং বাদামী রঙের হইয়া থাকে। এক গ্র্যামে প্রায় ৩০০ বীজ হয়। বগী পাটের বীজ সাধারণতঃ কালো বা সবুজ রঙের এবং খুব ছোট ছোট—এক গ্র্যামে প্রায় ৫০০ বীজ হয়।

আকৃতিগত পার্থক্য ছাড়াও ইহাদের তন্তুর স্বাভাবিক গুণেরও পার্থক্য আছে। বগী পাট সাধারণতঃ উচু জমিতে চাষ করা হয়। ইহার তন্তু সাধারণতঃ সূক্ষ্ম, নরম, সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল রঙের হয়। ইহার রং অনেক সময় একটু লাল্‌চে ধরণের হয়। তিতা পাটের আঁশও যথেষ্ট দৃঢ় হয়, তবে বগী পাটের মত সূক্ষ্ম হয় না। রং সাধারণতঃ সাদা হয়। এই জন্য ইহার বাণিজ্যিক নাম, White jute বা সাদা পাট। বগী পাটকে Tossa jute বা তোষা পাট বলা হয়। এই দুই প্রকার পাটেরই নানাবিধ শ্রেণী আছে।

কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগার

পাটের চাষের উন্নতি করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বাংলা সরকার বহু দিন আগেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৯০৪ সালে মিঃ আর. এস. ফিনলোকে পাট-বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহার চেষ্টায় ডি ১৫৪ নামে উৎকৃষ্ট জাতির তিতা পাট, চিনসুরা গ্রীণ নামক বগী পাট উদ্ভূত হইয়াছিল। উৎকৃষ্ট জাতির পাট হিসাবে বহুদিন ধরিয়া এই রকমের পাটের প্রচলন ছিল।

কাঁচা পাটের সর্ববিধ উন্নতি সাধনের জন্য ১৯৩৮ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় এই গবেষণাগারটি বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সাহায্যে ভারতে ১৯৪৮ সালে চুঁচুড়ায় নূতন করিয়া ইহার আবার সূত্রপাত করা হয়। ১৯৫২ সাল হইতে বারাকপুরের সন্নিকটে নীলগঞ্জে স্থায়ী গবেষণাগার ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হয়। ইহা ব্যতীত পাট-চাষ সম্পর্কিত স্থানীয় সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশেও শাখা গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। সেই সকল কেন্দ্রে মূলকেন্দ্র হইতে সৃষ্ট উন্নত ধরণের বীজ ও চাষের উন্নত ধরণের পদ্ধতিসমূহ স্থানীয় জলবায়ু ও জমির উপযোগী হইবে কিনা, এই বিষয়ে পরীক্ষা করা হইয়া থাকে।

উন্নত চাষের পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগারের নিরলস অনুসন্ধান ও প্রচেষ্টার ফলে দেখা গিয়াছে যে, নিম্নলিখিত উপায়ে স্বল্প ব্যয়ে উত্তম শ্রেণীর পাটের উৎপাদন, বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে এবং কৃষকদেরও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে।

(১) উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহার।

(২) উন্নত প্রণালীতে পাট চাষ।

 (ক) লাইনে বোনা ও উন্নত প্রণালীর পরিচর্যা।

 (খ) প্রয়োজনমত গোবরসার, পচা-সার (কম্পোষ্ট) ও লবণ-সারের প্রয়োগ।

(৩) দোফসলী চাষ।

(৪) পাট কাটিবার উপযুক্ত কাল নিরূপণ ও পাট ভিজাইবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা।

(৫) আঁশ ছাড়াইবার সঠিক সময় ও প্রক্রিয়া।

(৬) রোগ ও কীট-পতঙ্গের প্রতিষেধ ও প্রতিকার।

উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহার

বিভিন্ন স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিতা পাট ও বগী পাটের বিভিন্ন প্রকার গুণাগুণযুক্ত উন্নত ধরণের কয়েকটি জাতি কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগার কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিতা পাটের জে. আর. সি. ২১২, জে. আর. সি. ৩২১ এবং বগী পাটের জে. আর. ও. ৬৩২, জে. আর. ও. ৭৫৩ এবং জে. আর. ও. ৬২০ সর্বোৎকৃষ্ট।

তিতা পাটের উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে জে. আর. সি. ৩২১ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, শীঘ্র কাটা যায় এবং উহার আঁশও খুব উৎকৃষ্ট হয়। নীচু দোফসলা জমির পক্ষে জে. আর. সি. ৩২১ খুবই উপযুক্ত—কেন না, তাড়াতাড়ি কাটিয়া পরবর্তী ফসল বুনিবার পক্ষে সুবিধা হয়। বর্তমানে প্রচলিত সকল প্রকার তিতা পাটের জি. আর. সি. ২১২ পাটের ফলন সর্বাপেক্ষা বেশী এবং এই কারণে চাষীদের নিকট খুবই প্রিয়।

বগী পাটের মধ্যে জে. আর. ও. ৬৩২ এবং জে. আর. ও. ৭৫৩ সর্বাপেক্ষা অধিক ফলন দেয় এবং জে. আর. ও. ৬২০-এর ফলন উহাদের তুলনায় কিছু কম হইলেও উহার আঁশ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হয়।

একমাত্র উপরিউক্ত উন্নত শ্রেণীর বীজ ব্যবহার করিয়াই তিতা পাটে একর প্রতি প্রায় দুই মণ ও বগী পাটে প্রায় চারি মণ বেশী ফলন পাওয়া গিয়াছে।

পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল পাইবার পর এই সকল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ রাজ্য সরকারের বীজোৎপাদন খামার ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের উদ্যোগে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে ও কৃষকদের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উন্নত প্রণালীতে পাট চাষ

উঁচু-নীচু বা মাঝারি, এঁটেল বা দোআঁশ—সর্বপ্রকার জমিতেই পাটের চাষ হইতে পারে। তিতা পাট সাধারণতঃ ফাল্গুন হইতে বৈশাখের মধ্যে এবং বগী পাট বৈশাখের প্রথম হইতে বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে বোনা প্রশস্ত। সকল সময়েই জমি খুব পাট করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

৮০° হইতে ১০০° ফারেনহাইট তাপযুক্ত এবং ন্যূনপক্ষে ৫০ ইঞ্চি বারিপাতযুক্ত অঞ্চলই পাটচাষের উপযুক্ত। বৃষ্টিপাতের বিস্তৃতির উপরেও পাটের বৃদ্ধি নির্ভর করে।

যথাসময়ে পাট বোনা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়—কেন না, বেশী দেরীতে বুনিলে পাটের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফলন কমিয়া যায়।

যে সকল অঞ্চলের জমি উঁচু এবং দেরীতে বৃষ্টি হয়, সেখানে বগী পাট এবং যে সকল অঞ্চলের জমিতে চৈত্র মাসেও রস থাকে বা তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হয়, সেখানে তিতা পাটের চাষ হইতে পারে।

লাইনে বোনা ও উন্নত প্রণালীর পরিচর্যা

পাটচাষ অত্যন্ত আয়াসসাধ্য, উপযুক্ত যত্ন ব্যতীত সন্তোষজনক ফল লাভ করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথাসময়ে উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবেই ফসল নষ্ট হইয়া যায় অথবা ফলনের পরিমাণ আশানুরূপ হয় না। উপযুক্ত পরিচর্যা বলিতে বিশেষতঃ সময়মত বাছ দেওয়া ও নিড়ানকেই বুঝাইয়া থাকে। অনেক সময় অর্থাভাব ও লোকাভাবে এই সকল কার্য অবহেলিত হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগার লাইনে পাট চাষের প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। তুলনা-মূলক বিচারে দেখা গিয়াছে যে, ছিটাইয়া বোনা ক্ষেতের পাটের চেয়ে লাইনে বোনা ক্ষেতের পাট পরিমাণে বেশী এবং আঁশ উৎকৃষ্টতর হয়। এতদ্ব্যতীত লাইনে বুনিলে বীজের অর্ধেক বাঁচিয়া যায় এবং অপচয় নিবারিত হয়। চাষের খরচও শতকরা ২০-৩০ ভাগ কমে। গাছগুলি সমান আলো, বাতাস ও রস পাইবার ফলে সমানভাবে বাড়িয়া ওঠে।

ব্যাপক চাষের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় পাট কৃষি গবেষণাগার একটি লাইনে বীজ বুনিবার যন্ত্র—ড্রিল উদ্ভাবন করিয়াছেন। একজন লোক ইহা একাই পরিচালনা করিতে পারে। ইহার সাহায্যে দাগকাটা, বীজফেলা, মাটিচাপা প্রভৃতি সকল কাজ একই সঙ্গে সমাধা হয়।

নিড়ান দিবার সুবিধার জন্য এক হইতে তিনটি খুরপী, কাঁটাবিশিষ্ট হুইল হো বা চক্রবিদা ব্যবহার করিয়া একজন লোক একদিনে তিন বিঘা জমির পাটের পরিচর্যা করিতে পারে।

(খ) প্রয়োজনমত গোবরসার, পচাসার (কম্পোষ্ট) ও লবণসারের প্রয়োগ

সারের সুষ্ঠু প্রয়োগে পাটের পরিমাণ ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়। পাটক্ষেতে জৈব ও লবণ—উভয় জাতীয় সার দেওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, ১০ হইতে ২০ কিলো জৈব ও লবণ জাতীয় নাইট্রোজেন প্রয়োগে অতিরিক্ত ফলন পাওয়া যায়। বীজ বপনের পূর্বে একর প্রতি ৪০ হইতে ৮০ মণ আবর্জনাপ্রসূত পচাসার (কম্পোষ্ট) এবং নিড়ানের পর ২৫ হইতে ৫০ কিলো অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলদায়ক। শুধু অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগেই প্রভূত ফললাভ করা যায়। সাধারণতঃ এক মণ অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগে প্রতি একরে দুই মণ অতিরিক্ত পাট পাওয়া যায়।

পটাশঘটিত সার প্রয়োগ করিলে কয়েক প্রকার রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। একর প্রতি ২২ হইতে ৩৫ কিলো পটাশ প্রয়োগ করিয়া সন্তোষজনক ফললাভ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত যে সকল জমি অম্লধর্মী, তাহাতে বীজ বুনিবার ৩-৪ সপ্তাহ পূর্বে একর প্রতি ৩ হইতে ৬ মণ পর্যন্ত গুঁড়া চুন ব্যবহার করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

...ত্রীয় পাটগবেষণাগারে ...ক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইউরিয়া (Urea) সার পরিমাণমত জলে গুলিয়া পাট গাছের পাতায় Sprayer বা জল ছড়াইবার যন্ত্রের দ্বারা বিন্দু-বিন্দুর আকারে ছড়াইতে পারিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। কৃষি গবেষণা-ক্ষেত্রে কয়েক বৎসর ধরিয়া এই প্রক্রিয়া চালাইয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা কৃষকদের ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে দেওয়া সম্ভব। গত দুই-তিন বৎসর ধরিয়া আসাম, বিহার ও উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ইউরিয়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল লাভ হইয়াছে। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার সাফল্যে উৎসাহিত হইবার পর উড়োজাহাজের সাহায্যে বিহারের কিষণগঞ্জ মহকুমায়, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় ও উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় ঘন সন্নিবিষ্ট পাটক্ষেতসমূহে ব্যাপকভাবে ইউরিয়া সারের প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই প্রচেষ্টার দ্বারা ভারতে উন্নত ধরণের পাটচাষের ইতিহাসে এক নব অধ্যায় রচিত হইয়াছে।

দোফসলী চাষ

পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, পাটের ঝরাপাতা জমির উর্বরতা রক্ষায় সাহায্য করে। সেই কারণে আমন ধানের পূর্বে ঐ জমিতে পাটচাষ করা খুবই লাভজনক। যে জমিতে শুধু আমন ধান করা হয়, সামান্য সেচের ব্যবস্থা করা গেলে বা বৃষ্টির সুবিধা থাকিলে সেই জমিতে আগে পাট দিয়া আয়ের সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কেন না, প্রায়ই দেখা যায় যে, আবহাওয়ার খামখেয়ালীতে কোন বৎসর পাট আবার কোন বৎসর ধান নষ্ট হয়। কিন্তু দোফসলী ব্যবস্থায় হয় দুইটিই নতুবা অন্ততঃ একটি ফসলের সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়।

দোফসলী মাঝারি বা নীচু জমিতে তিতা পাটকে প্রথম ফসলরূপে ব্যবহার করা বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ কয়েক দিন বৃষ্টি না হলেও টিকিয়া থাকিবার পক্ষে বগী পাট অপেক্ষা তিতা পাট অধিকতর উপযোগী। তাছাড়া যে জমিতে জল জমে, সেখানে তিতা পাটই দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে।

পাট কাটিবার উপযুক্ত কাল নিরূপণ ও পাট বিভাজনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা

পাটের গুটি বা ফল কিছুটা বড় হইবার পর পাট কাটিলে সর্বাপেক্ষা অধিক আঁশ পাওয়া যায়। কিন্তু গুটি যখন ছোট থাকে, তখন কাটিলে পরিমাণ ও উৎকর্ষের সমন্বয় হয়।

পাট পচাইবার জন্য যে আঁটি বাঁধা হয়, তাহা খুব সরু বা মোটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সাধারণতঃ ৬" হইতে ৮" ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত আঁটিই জলে ভিজাইবার পক্ষে প্রশস্ত।

বেশীর ভাগ স্থানেই পাট ডুবাইবার জন্য সহজলভ্য দ্রব্যের ব্যবহার হয়; যথা—মাটি, কলাগাছ ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল দ্রব্য ব্যবহারে আঁশ শ্যামলা বা কালচে রঙের হইয়া যায়। জলজ দাম বা কচুরীপানার একটি আবরণ দিতে পারিলে রং শ্যামলা হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। অল্প জল ও বদ্ধজলে পাট ডুবাইলে পাটের রং নষ্ট হইতে পারে। স্বল্পস্রোতা বিল, খাল বা গভীর পুষ্করিণীতে ৬ হইতে ৯ ইঞ্চি নীচে পাট

ভিজাইলে আঁশের রং হয় উজ্জল সোনালী এবং আঁশও হয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর।

পাটের মাথার দিক আগে এবং গোড়ার দিক দেরীতে পচে বলিয়া অসমান পচন হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, পাট কাটিয়া আঁটিগুলি ২-৩ দিন এক হইতে দুই ফুট জলে দাঁড় করাইয়া রাখিবার পর আঁটিগুলি পচাইতে দিলে মাথায় ও গোড়ার দিকে পচনের সামঞ্জস্য থাকে

আঁশ ছাড়াইবার সঠিক সময় ও প্রক্রিয়া

পাট পচিতে যত কম সময় লাগে, আঁশ ততই উৎকৃষ্ট হয়। এই জন্য প্রথম দিকে [ভাদ্র মাসে] ভিজান পাট, শেষের দিকে [আশ্বিন-কার্তিক] ভিজান পাট অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়। ভিজাইবার সময় পাটের 'জাকে' কিছু অ্যামোনিয়াম সালফেট ও হাড়ের গুঁড়া মিশাইয়া দিলে পচন-ক্রিয়ার সাহায্য হয়।

ঠিক কোন্ সময়ে আঁশ ছাড়ান উচিত, তাহা সঠিক নির্ধারণ করিতে হইলে কয়েক দিন পর পরই 'জাকের' বিভিন্ন স্তরের নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। এই বিষয়ে নিপুণতা লাভ করা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। আঁশ যাহাতে অসম্পূর্ণভাবে বা অতিরিক্ত না পচে, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যখন দুই আঙুলের চাপেই সহজে ডাঁটা হইতে আঁশ সরিয়া আসে, বুঝিতে হইবে যে তখন ছাড়াইবার সময় হইয়াছে। বিভিন্ন আঁটি হইতে একটি বা দুইটি পাট টানিয়া ঐ প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

অভিজ্ঞতার ফলে বলা যায় যে, একটি একটি করিয়া পাটের আঁশ ছাড়াইবার প্রথা আঁটি ভাঙ্গিয়া আঁশ ছাড়াইবার প্রথা অপেক্ষা ভাল। প্রথমোক্ত প্রথায় আঁশের অপচয় খুবই কম হয়, যদিও ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য।

পাট কাটা হইতে আঁশ ছাড়াইবার অন্তর্বর্তী সময়ে অবহেলা বা অসতর্কতার ফলে প্রায়ই আঁশের রং শ্যামলা বা কালচে হইয়া যায়। খুব তরল তেঁতুল-গোলা জলে শ্যামলা পাট ধুইয়া লইলে শ্যামলা রং দূরীভূত হইয়া স্বর্ণাভ বা শ্বেতাভ হইয়া থাকে।

রোগ ও কীট-পতঙ্গের প্রতিষেধ ও প্রতিকার

সাধারণতঃ রোগ ও কীটের আক্রমণে স্বাভাবিক বৎসরেই আনুমানিক শতকরা ৫ হইতে ৬ ভাগ ফসল নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত উহাদের আক্রমণে আঁশের অপকর্ষ ঘটে। আক্রমণ ব্যাপক ভাবে হইলে ফসলও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য রোগ ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

পাটের রোগগুলির মধ্যে (১) ডাঁটা-পচা, [Stem rot], (২) শিকড়-পচা [Root rot], (৩) এন্থ্রাক্নোজ [Anthracnose], (৪) রস-পচা [Soft rot] ও (৫) কালি রোগ [Black band] প্রধান।

রোগের প্রতিষেধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে লিখিত হইল :

(১) পারদঘটিত ঔষধ; যথা—'এগ্রোসান জি. এন.', 'সেরেসান', 'গ্রানোসান' বা 'লাণ্ডিসানে'র দ্বারা বপনের পূর্বে বীজগুলিকে পরিশোধিত করা।

(২) পূর্ব বৎসরের রোগ বীজবাহী পাটের গোড়া অপসারণ। অম্লধর্মী জমিতে চূন প্রয়োগ। যে সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক বৎসর অল্পবিস্তর রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সকল জমিতে ১২ হইতে ২০ কিলো পটাশের প্রয়োগ।

তৎসত্ত্বেও শিকড়-পচা রোগের মাত্রাধিক্য ঘটিলে পুনঃ পুনঃ দুই বৎসব পাটের বদলে ধান চাষ করিয়া তৃতীয় বৎসর হইতে পুনরায় পাট চাষ করিলে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব।

যে জমিতে আলু ও পাট উৎপাদন করা হয়, সে স্থলে সম্ভব হইলে অন্ততঃ দুই বৎসর আলুর বদলে সব্জীর চাষ করিলে ভাল হয়। কেন না, আলু পাটের জমিতে যে শিকড়-পচা রোগ হয়, তাহা স্বতন্ত্র ধরণের—ইহা আসল 'শিকড়-পচা' হইতে কিছুটা পৃথক।

(৩) ডাঁটা-পচা রোগে পাতার মধ্য দিয়া ডাঁটা আক্রান্ত হয়। ইহা প্রতিরোধ করিতে হইলে যথাসম্ভব শীঘ্র পাট বপন, যথাকালে পাট ও নিড়ানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত ৪ : ৪ : ৪০ মাত্রায় বোর্দো মিক্চার বা অন্যান্য অম্লঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়।

(৪) রস-পচা রোগে কয়েক দিন অন্তর মাটি আল্গা করিয়া এবং ঝরা পাতার উপরে ও পাটের গোড়া ভিজাইয়া তাম্রঘটিত ঔষধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

(৫) সবল ও সতেজ গাছে কালি রোগের আক্রমণ বিশেষ হয় না। এই জন্য উপযুক্ত সার ব্যবহারে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। আক্রমণ আরম্ভ হইলে তাম্রঘটিত ঔষধ যন্ত্রের সাহায্যে ছিটাইয়া আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

কীটের আক্রমণে পাটের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। পাটের ক্ষতিকারক কীটের সংখ্যা খুবই বেশী, তবে প্রধানতঃ 'ইণ্ডিগো ক্যাটারপিলার,' ছটকাপোকা (সেমিলুপার), শোঁয়াপোকা (হেয়ারি ক্যাটারপিলার), আঙ্কাপোকা (এপিয়ন), 'সিউডোকক্কাস', 'নাপসেরা' এবং হল্দে মাইটই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে। ঐ সকল আক্রমণের প্রতিকার ও প্রতিরোধ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) 'ইণ্ডিগো ক্যাটারপিলার', শোঁয়া ও ছাটকাজাতীয় পোকা। 'ডি-ডি-টি', 'এনড্রিন', 'ফলিডল' প্রভৃতি জলে উপযুক্ত পরিমাণ মিশাইয়া পাট গাছে প্রয়োগ করিয়া ইহার প্রতিকার করিতে হয়।

(২) প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে উপযুক্ত পরিচর্যাই আঙ্কা পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের প্রকৃষ্ট উপায়। ক্ষেত্রবিশেষে 'বি. এইচ. সি', 'ডি. ডি. টি' ইত্যাদি প্রয়োগেও কিছু সুফল পাওয়া যায়।

(৩) 'নিকোটিন সালফেট' ও 'লাইম সালফার' সলিউশন ইত্যাদি গাছের মাথায় প্রয়োগ করিলে 'সিউডোককাসের প্রতিকার হয়।

(৪) তিতা পাট স্বভাবতঃই নাপসেরা আক্রমণ প্রতিরোধকারী। এই জন্য যে স্থানে নাপসেরার প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী, সেখানে তিতা পাটের চাষ ফলদায়ক। সুষ্ঠু পরিচর্যার ব্যবস্থায়, বিশেষতঃ পাট কাটিবার পরে পরবর্তী আক্রমণ প্রশমনের জন্য শূককীট সমন্বিত গাছের ডাঁটার টুকরাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা।

(৫) 'মাইটে'র প্রতিকারের জন্য ৩ : ১ অনুপাতে চুন ও গন্ধকের চূর্ণ প্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক।

"চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উচ্চশিক্ষা বলিলে সাধারণতঃ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বুঝাইত। ছাত্র ও অভিভাবকগণ যখন দেখিলেন যে, কেবল এই প্রকার শিক্ষায় জীবিকালাভ দুর্ঘট, তখন অনেকের মন বিজ্ঞানের দিকে ঝুঁকিল। একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মিল যে, বিজ্ঞানই হইল প্রকৃত কার্যকরী বিদ্যা ; বিজ্ঞান শিখিলেই শিল্পজাত পণ্য উৎপাদন করিবার ক্ষমতা হইবে এবং ভদ্র সন্তানের জীবিকাও জুটিবে। তখন কাব্য, সাহিত্য, দর্শনের মায়া ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণ দলে দলে বিজ্ঞান শিখিতে আরম্ভ করিল ; বি-এস-সি, এম-এস-সি-তে দেশ ছাইয়া গেল। কিন্তু কোথায় শিল্প, কোথায় পণ্য ? আত্মীয়-স্বজন ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—এত সায়েন্স শিখিয়াও ছোকরা শেষে কেরানী বা উকিল হইল। হায়, ছোকরা কি করিবে ? বিজ্ঞান ও কার্যকরী বিদ্যা এক নয়। কেমিষ্ট্রি-ফিজিক্স পড়িলেই পণ্য উৎপাদন করা যায় না এবং কোনও গতিকে উৎপন্ন করিলেই তাহা বাজারে চলে না।

এখন আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইলেই বিজ্ঞানের প্রয়োগে ক্ষমতা জন্মে না। সে বিদ্যা আলাদা, যাহাকে বলে Technical education। অতএব উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত সরঞ্জামের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প শিখিতে হইবে। শিক্ষার পদ্ধতি নির্বাচনে ভুল করিয়া পূর্বে হতাশ হইয়াছি, এবারেও কি আশা নাই ? সাবান, কাচ, চামড়া শিখিয়াও কি শেষে কেরানীগিরি বা ওকালতি করিতে হইবে ?"

—রাজশেখর বসু

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

শারদীয়

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর-নভেম্বর—১৯৬৭

২০শ বর্ষ, : ১০ম-১১শ সংখ্যা

কলকাতার চিড়িয়াখানায় সারস পাখীর নাচ।

করে দেখ

চোখের ভুল

চোখের ভুলের অনেক দৃষ্টান্তের কথা পূর্বে তোমাদের কাছে বলেছি। এবার চোখের ভুলের আরও কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। এই ছবি দেখে অথবা ছোট বা বড় করে নিজের হাতে এঁকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

ক

খ

১

ক

খ

২
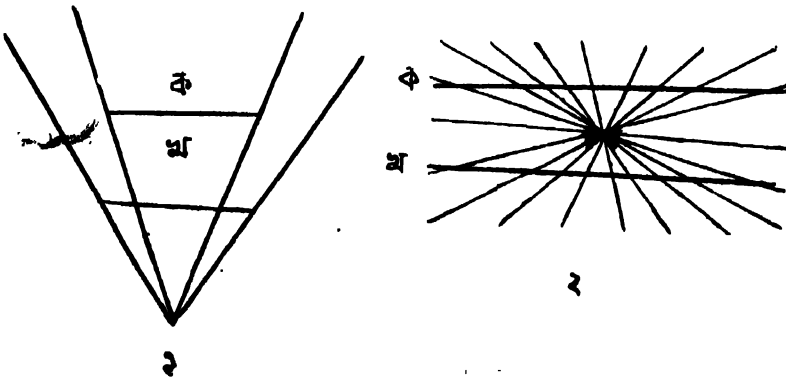
১নং চিত্রে দুটি কোণের সঙ্গে আঁকা উপরের ক রেখাটিকে নীচের খ রেখাটির চেয়ে ছোট দেখায়। কিন্তু মেপে দেখলেই বোঝা যাবে—দুটি রেখাই সমান।

২নং চিত্রে ক খ রেখা দুটি সমান্তরাল, কিন্তু দেখাচ্ছে যেন দুটি রেখাই মাঝখানটায় বেঁকে গেছে।

ক

খ

৩

ক

খ

৪
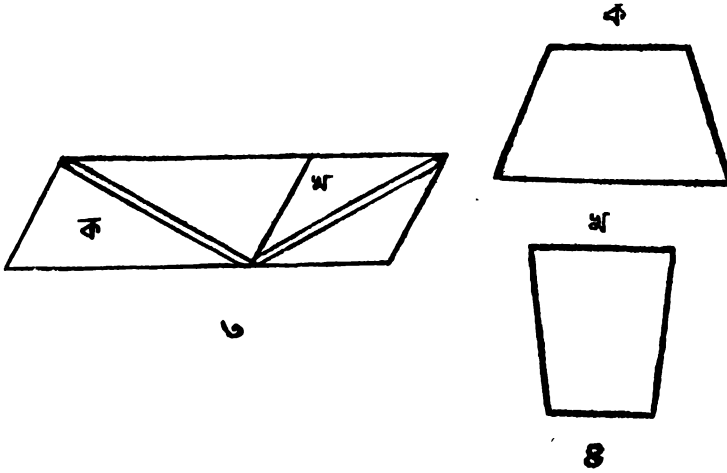
৩নং চিত্রে ক রেখার চেয়ে খ রেখাকে ছোট বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মেপে দেখলেই বুঝবে, রেখা দুটি পরস্পর সমান। ৪নং চিত্রে ক রেখাটিকে খ রেখার চেয়ে বড় মনে হচ্ছে—আসলে কিন্তু উভয় রেখার দৈর্ঘ্যই সমান।

৫

ক খ

৬
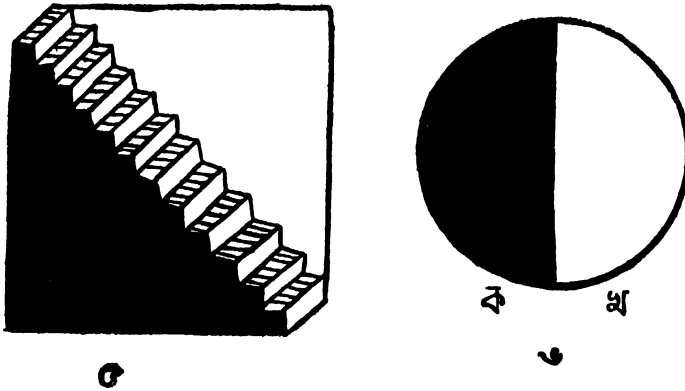
৫নং চিত্রে সিঁড়ির ছবিটি ভাল করে দেখ। বইখানাকে উল্টে নিয়ে দেখলে একই রকম সিঁড়ি দেখা যাবে। ৬নং চিত্রের সাদা ও কালো ক খ অংশ দুটিকে কি সমান বলে মনে হয়?

—গ—

ক্যালেণ্ডার (বর্ষ-গণনা)

জীবজগতের মধ্যে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যার সামনের পা দুটো হাতের মত ব্যবহার করতে শিখে ক্রমশঃ তার শিরদাঁড়াটা সোজা হয়ে সে অনন্ত আকাশের অপার বিস্ময় দু-চোখ ভরে দেখতে পারে। হাতের ব্যবহারের দ্বারা অবশ্য তার সভ্যতার সুরু।

এই সভ্য মানুষ গোড়াতেই লক্ষ্য করলো যে, আকাশের চাঁদের গোল থালাটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূর্ণ গোলাকার অবস্থা থেকে একেবারে মিলিয়ে গিয়ে আবার পুরো গোল হয় আর সেটা ঘটে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। তেমনি সূর্যের উদয়-অস্তও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই হয়ে থাকে। আবার পৃথিবীতে ঋতু-পরিবর্তন, বিশেষ করে গ্রীষ্ম ও শীত, ঠিক একই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে।

এই সমস্ত জিনিষ লক্ষ্য করে মানুষ বুঝতে পারলো যে, সময়ের হিসাব করতে হলে আকাশের ঐ চন্দ্র-সূর্যের গতিবিধির উপরই নির্ভর করতে হবে। তবে সকলে নিশ্চয়ই এটা জানে যে, সূর্যের গতি আসলে আমাদের চোখের ভুল।

তাহলেও ঐ চন্দ্র আর সূর্যের গতিকে হিসাব করে মানুষ দু-রকমের ক্যালেণ্ডার তৈরি করলো—চান্দ্র আর সৌর ক্যালেণ্ডার।

চান্দ্র ক্যালেণ্ডার

চাঁদের পৃথিবী-প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করতে সময় লাগছে ২৯½ দিন। তাহলে বারোটি চান্দ্রমাসে বছর দাঁড়াচ্ছে ২৯½ × ১২ = ৩৫৪ দিন, অর্থাৎ ৩৬৫ দিন (যাকে সাধারণতঃ আমরা এক বছর ধরি) থেকে ১১ দিন কম। তাহলে তিনটি চান্দ্র-বছর ১১ × ৩ = ৩৩ দিন বা এক মাসের সামান্য বেশী কম পড়বে। এইভাবে চললে প্রতি তিন বছরে একমাস কমতে কমতে শেষকালে বছরের কোন্ মাসে কোন্ ঋতু আসবে, সেটা একেবারে গুলিয়ে যাবে।

প্রাচীন ইতিহাসে আসিরিয়ার রাজা আসুরবানিপালের সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী) একদল পুরোহিত-পণ্ডিতদের উপরে বিশেষ দায়িত্ব ছিল যে, প্রতি তিন কি চার বছরে হিসাব করে একটি বাড়তি মাস যোগ করে আবার বছর গোনা ঠিক করে দিতে হবে। এই পুরোহিত-পণ্ডিতদের নাম ছিল 'কালোমাস', আর সেই থেকে ঐ বাড়তি মাসকে কালোমাস বা মলমাস বলা হয়।

সৌর বছর

খৃষ্ট জন্মের কিছু আগে জুলিয়াস সীজারের আমলে প্রথম সূর্য-ক্যালেণ্ডার মোটামুটি হিসাব করে স্থির করা হলো। ক্যালেণ্ডার কথাটির উৎপত্তি রোমান ক্যালেণ্ড (Kalend) থেকে—তখনকার দিনের প্রথামত রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিতকে ঐ ক্যালেণ্ডের দিনে সারা বছরের উৎসব ঘোষণা করতে হতো।

যাই হোক, জুলিয়াস সীজারের আমলেই প্রথম হিসাব করে ঠিক করা হলো যে, সূর্য-প্রদক্ষিণ একবার পুরো সমাপ্ত করতে পৃথিবীর লাগছে ৩৬৫ দিন, ৬ ঘণ্টা; কাজেই জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর, এই বারো মাসে ৩৬৫ দিন ভাগ করে প্রতি চার বছর অন্তর ফেব্রুয়ারীতে একটি দিন যোগ করে (৬ ঘণ্টা×৪=২৪ ঘণ্টা বা এক দিন) লিপ্ ইয়ার করা হলো। এই হিসাবটা অবশ্য সকলেরই জানা আছে।

আসল হিসাবটার কিন্তু সমাধান হলো এরও প্রায় দেড় হাজার বছর পরে। সবাই জানে যে, বছরের দুটি দিন, বসন্তকালে একটি দিন (Vernal equinox) ও শরৎকালে আর একটি দিন (Autumnal equinox)—দিন-রাত্রি সমান হয়। বসন্তকালের দিনটি ২৪শে মার্চ নাগাদ হবার কথা। ষষ্ঠদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৫৪২ সাল নাগাদ) দেখা গেল, বসন্তকালের ঐ দিনটি এসে পড়ছে প্রায় দশ দিন আগে, ১৪ই মার্চ নাগাদ। পৃথিবীর সূর্য-প্রদক্ষিণের গতিবেগ তো আর হঠাৎ মন্থর হয়ে যেতে পারে না—তাহলে? সকলেই বুঝলেন যে, আমাদের বছর গণনার হিসাবে কোথাও বিশেষ গরমিল আছে।

গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডার

তখনকার দিনের ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপ গ্রেগরি নতুন করে বছর গণনার জন্যে বড় বড় জ্যোতির্বিদ্দের নিযুক্ত করলেন। তাতে দেখা গেল যে, সূর্যের চারধারে পৃথিবীর একবার পুরো প্রদক্ষিণ সমাপ্ত করতে সময় লাগছে (ঠিক ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা নয়) ৩৬৫ দিন, ৫ ঘণ্টা, ৪৮ মিনিট, ৪৬ সেকেণ্ড; অর্থাৎ আগের এক বছরের হিসাব থেকে ১১ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড কম।

এখন বোঝা গেল যে, এই ১১ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড বেশী সময় প্রতি বছরের হিসাবে জমা হতে হতে শেষ অবধি বছরের গণনাতে দশ দিন এগিয়ে গেছে। অতএব ঐ ১৫৪২ সালে দশ দিন কেটে দেওয়া হলো। ইংল্যাণ্ডে ছিল প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম, কাজেই ক্যাথলিক ধর্মগুরু পোপের নির্দেশ গোড়াতে তারা মেনে না নিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বীকার করলো। রাশিয়ার গ্রীক অরথডক্স চার্চ তখনও স্বীকার করে নি। একমাত্র রুশ বিপ্লবের পরে ক্যালেণ্ডারের সংশোধন করা হয়।

এইভাবে সারা পৃথিবীতেই এখন পোপ গ্রেগরী প্রবর্তিত গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডার চালু। বছরে দশ-এগারো দিন এগিয়ে তো না হয় একবার ক্যালেণ্ডারকে সংশোধন করা হলো, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার হিসাবের গরমিল হতে পারে না কি ?

সে জন্যে গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডারে লিপ্ ইয়ারের মত শুধ্রে নেবার ব্যবস্থা করা হলো। শতাব্দীর বছরগুলি (যেমন ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০, ২০০০ ইত্যাদি) যদি ৪০০ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায়, কেবলমাত্র তাহলেই সেটাকে লিপ ইয়ার করা হবে। আমরা জানি, চার দিয়ে ভাগ করলে লিপ্ ইয়ার হয়, তাহলে ১৮৯৬ সাল লিপ্ ইয়ার, ১৯০৪ সালও লিপ্ ইয়ার। কিন্তু গ্রেগোরিয়ান ক্যালেণ্ডারে ১৯০০ সাল লিপ্ ইয়ার হবে না—হবে ২০০০ আবার ২১০০, ২২০০, ২৩০০ সাল লিপ্ ইয়ার হবে না, হবে ২৪০০ সাল।

তাহলে আমরা দেখছি যে, এই পদ্ধতিতে প্রতি ৪০০ বছরে তিন করে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাঠকদের ইচ্ছা হলে প্রতি বছরে ১১ মিনিট, ১৪ সেকেণ্ডকে ৪০০ দিয়ে গুণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, এক দিনের (২৪ ঘণ্টার) সামান্য কিছু বেশী পড়েছে। সেটা শোধরাতে আবার প্রায় হাজার পাঁচেক বছরে একদিন কমাতে হবে, সেটা নিশ্চয়ই সাম্প্রতিক ইতিহাসের হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য নয়।

বিশ্ব-ক্যালেণ্ডার

প্রতি বছরে যাতে একই ক্যালেণ্ডার ব্যবহার করা যায়, সে রকম চেষ্টা এপর্যন্ত দু-বার হয়েছে।

১৯১৬ সালে আমেরিকা থেকে বলা হলো, বছরের ৩৬৫ দিনের একটি দিনকে বিশ্ব-দিন বা 'W' ঘোষণা করে তাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে বাকি ৩৬৪ দিনকে ৭ দিয়ে ভাগ করে ৫২ সপ্তাহ করা হোক। আচ্ছা, এবারে ১৩ মাসে বছর করলে প্রতি মাসেই ঠিক পুরো ৪ সপ্তাহ পড়বে—হিসাবটা দাঁড়ালো ৭ দিন×৪=২৮ দিনে মাস ; আর ২৮ দিন×১৩ মাস=৩৬৪ দিন। এই বাড়তি মাসের নাম দেওয়া হবে 'এক্সেম্বর' (Exember), জুন আর জুলাইয়ের মধ্যে পড়বে।

২৮ দিনে মাস করলে প্রতি মাসই রবিবারে শুরু হয়ে শনিবারে শেষ হবে। বছরের শেষ দিনটি (অর্থাৎ ৩৬৪ দিনের পরের দিনটি) আর লিপ্ ইয়ারের বেলায় আরো একটি দিনকে বিশ্ব-ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হবে।

মেঘনাদ সাহার প্রস্তাব

বিশ্ব-ক্যালেণ্ডারের ঐ একই হিসাবকে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ৺মেঘনাদ সাহা

আর একভাবে উপস্থাপিত করলেন, জেনেভাতে ১৯৫৪ সালের ইউনেস্কো সম্মেলনে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পুরো সম্মতি ছিল তাতে।

বছরকে ১৩ মাস না করে ৩৬৪ দিনকে (এক দিনকে আগের মতই বিশ্ব-ছুটির দিন বলে ধরা হবে) চারটি সমান অংশে ভাগ করলে ৯১ দিনে এক-চতুর্থাংশ (বা Quarter) হলো। তাহলে জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ দাঁড়ালো ৯১ দিন আবার এপ্রিল, মে, জুন ৯১ দিন; জুলাই, অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর ৯১ দিন; আর অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর ৯১ দিন।

তাহলে ৯১ দিনকে ৭ দিয়ে ভাগ করলে ১৩ সপ্তাহ দাঁড়াচ্ছে, অর্থাৎ প্রতি এক-চতুর্থাংশে ১৩ সপ্তাহ পড়ছে। জানুয়ারীর প্রথম দিনটি রবিবার ধরলে পুরো ১৩ সপ্তাহ পরে আবার এপ্রিলের প্রথম দিনটি রবিবার পড়বে। এই রকম ভাবে জুলাইয়ের প্রথম দিনটি ও অক্টোবরের প্রথম দিনটি পড়বে রবিবার।

নীচে মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবিত বিশ্ব-ক্যালেণ্ডারের প্রথম এক-চতুর্থাংশের ছক দেওয়া হলো। পরের তিনটি এক-চতুর্থাংশেও এরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

	জানুয়ারী					ফেব্রুয়ারী				
রবি	১	৮	১৫	২২	২৯		৫	১২	১৯	২৬
সোম	২	৯	১৬	২৩	৩০		৬	১৩	২০	২৭
মঙ্গল	৩	১০	১৭	২৪	৩১		৭	১৪	২১	২৮
বুধ	৪	১১	১৮	২৫	*	১	৮	১৫	২২	২৯
বৃহস্পতি	৫	১২	১৯	২৬	*	২	৯	১৬	২৩	৩০
শুক্র	৬	১৩	২০	২৭	*	৩	১০	১৭	২৪	*
শনি	৭	১৪	২১	২৮	*	৪	১১	১৮	২৫	*

মার্চ

রবি	*	৩	১০	১৭	২৪
সোম	*	৪	১১	১৮	২৫
মঙ্গল	*	৫	১২	১৯	২৬
বুধ	*	৬	১৩	২০	২৭
বৃহস্পতি	*	৭	১৪	২১	২৮
শুক্র	১	৮	১৫	২২	২৯
শনি	২	৯	১৬	২৩	৩০

উপরের এই ক্যালেণ্ডারে জানুয়ারী মাসের মত দাঁড়াবে এপ্রিল, জুলাই আর অক্টোবর; ফেব্রুয়ারী মাসের মত দাঁড়াবে মে, অগাষ্ট আর নভেম্বর, আর মার্চ মাসের মত দাঁড়াবে জুন, সেপ্টেম্বর আর ডিসেম্বর।

ডিসেম্বর মাসে তাহলে ৩০ দিন ধরে তার পরের দিনটিকে বলা হবে W, যেটিকে আমাদের হিসাব থেকে বাদ দিয়ে সারা বিশ্বে ছুটির দিন বলে ঘোষণা করা হবে।

উপরের ছকটা দেখলেই বোঝা যাবে যে, এই ক্যালেণ্ডারে বছরের পর বছর প্রতিটি দিনে সপ্তাহের একই বার (অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী রবিবার—ইত্যাদি) থাকবে; দ্বিতীয়ত; প্রতিমাসেই কাজ করবার দিনের (Working days) সংখ্যা হচ্ছে ২৬, কারণ যে মাসে ৩১ দিন থাকছে (জানুয়ারী, এপ্রিল, জুলাই আর অক্টোবর), সে মাসেই পাঁচটি রবিবার থাকছে।

একমাত্র বিশেষ এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোকেদের বাধার জন্যেই মেঘনাদ সাহার উপরিউক্ত ক্যালেণ্ডারকে সারা বিশ্বে চালু করা সম্ভব হলো না।

ভারতীয় ক্যালেণ্ডার

আমাদের দেশে বহু ক্যালেণ্ডার চালু, শতাব্দী গোনার হিসাবও এক নয়। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পরে মেঘনাদ সাহাকে চেয়ারম্যান করে এক ক্যালেণ্ডার সংস্কার কমিটি গঠিত হয়। তাতে ভারতীয় শতাব্দীকে শকাব্দ ধরে উপস্থিত আমরা ১৮৮৮ শকাব্দ ধরছি। অবশ্যই এটা ভারতীয় শতাব্দী, আন্তর্জাতিক ব্যবহারের জন্যে আমাদের খৃষ্টীয় শতাব্দীই ব্যবহার করে আজকে ১৯৬৭-ই বলতে হবে।

মাস গণনার হিসাবে অনেক সংস্কার করা হলো। পুরো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বসন্তকালের যে তারিখটিতে দিন-রাত্রি সমান হবে (২৩-২৪ মার্চ Vernal equinox), সেই তারিখটিকে বছরের প্রথম দিন হিসাবে সাব্যস্ত করা হলো। আমাদের চালু বাংলা তারিখের হিসাবে দেখছি, পয়লা বৈশাখ দাঁড়াচ্ছে সাধারণতঃ ১৪-১৫ এপ্রিল। অতএব পয়লাকে ২৩-২৪ মার্চ করলে ক্যালেণ্ডারের তারিখকে অনেকখানি এগোতে হয়। সেটা না করে মেঘনাদ সাহার প্রস্তাবানুসারে পয়লা চৈত্রকে করা হলো ২৩-২৪ মার্চ, অর্থাৎ ক্যালেণ্ডারকে সামান্য পেছিয়ে দেওয়া হলো। আমাদের ভারতীয় শকাব্দ গণনাতে এই ব্যবস্থাই চালু আছে।

মোটামুটি এই হলো মানুষের বছর ও মাস গণনার হিসাব। সপ্তাহের হিসাব এর মধ্যে পড়ে না; কারণ সাত দিনে সপ্তাহের ভাগটা একেবারেই কাজের সুবিধার জন্যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের দিক থেকে তার কোনই তাৎপর্য নেই।

তবু এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, টেলিস্কোপ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ খালি চোখে পৃথিবী ছাড়া আর যে পাঁচটি গ্রহকে দেখতে পেতো (মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি) আর তার সঙ্গে সূর্য (রবি) আর চন্দ্রকে (সোমকে) নিয়ে তার সপ্তাহের সাতটা বার তৈরি হয়েছে। আর আমরা যাকে রবি, সোম, মঙ্গল প্রভৃতি বলি আমাদের ভাষায়, ঠিক সেই দিনগুলিকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ তাদের স্ব স্ব ভাষায় সূর্যের দিন, চন্দ্রের দিন, মঙ্গল গ্রহের দিন বলে থাকে।

এটা চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকে, আর তাথেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বেশ যোগাযোগ আছে।

দিলীপ বসু

জানবার কথা

মধ্যরাতের রামধনু

মধ্যরাতে রামধনু দেখা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। তবে পৃথিবীতে মাত্র দুটি জায়গা আছে, যেখানে মধ্যরাতেও রামধনু দেখা যায়। ইউ. এস.-এর ক্যান্টাকীতে কাম্বারল্যাণ্ড জলপ্রপাত এবং মধ্য আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের উপর পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় প্রপাতের উর্ধ্বে উত্থিত জলীয় বাষ্পের মধ্যে রামধনুর সৃষ্টি হয়ে থাকে।

গর্তবাসী প্যাঁচা

সামান্য কয়েক জাতের পাখী মাটির নীচে গর্তে বাস করে। আমাদের দেশের মাছরাঙা পাখী জলের পাড়ে মাটির ভিতর শয়ানভাবে গর্ত করে বাসা তৈরি করে। বিভিন্ন জাতের প্যাঁচা গাছের গায়ে অপরের পরিত্যক্ত কোটরে বাসা বেঁধে ডিম পাড়ে। কিন্তু 'বারোয়িং আউল' বা গর্ত-খোঁড়া প্যাঁচা আল্‌গা বালির নীচে শয়ানভাবে গর্ত খুঁড়ে বাসা তৈরি করে। কিন্তু প্রায়ই তারা অন্যান্য জীবজন্তুর পরিত্যক্ত গর্তই বেছে নেয়। এই জাতের প্যাঁচা দিনের বেলায়ও ভাল দেখতে পায়।

সমুদ্রের কথা

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল সাগরের জলে। সে আজ থেকে প্রায় তিন-শ' বছর আগেকার ঘটনা। সমগ্র পৃথিবীর শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ জায়গা জুড়ে এই যে বিরাট বিপুল সাগরের রাজত্ব চলেছে, তার রহস্যের যেন শেষ নেই। সেই রহস্যের বৈজ্ঞানিক ছবির খুব সামান্য অংশই আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। মহাদেশের জমিতে যে পরিমাণ খাদ্যবস্তুর ফলন হয়ে থাকে, তার উপর আমাদের প্রয়োজনের দাবীটাও ক্রমেই বাড়ছে। আগামী ২০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যা ৩৩০ কোটি থেকে বেড়ে ৬০০ কোটিতে গিয়ে পৌঁছাবে। মানুষের খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের তখন সুপরিকল্পিত ভাবে সাগরের ভিতর অভিযানে নামতে হবে। শ্রমশিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় বহু খনিজ পদার্থ বিপুল পরিমাণে সাগরের জলে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। সেগুলির উদ্ধারের কাজের গুরুত্বটাও কম নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমুদ্র-বিজ্ঞানের গবেষণার কাজ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে শুধু যে খাদ্য ও খনিজের জন্যে সাগরের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে তাই নয়, সাগরের বিভিন্ন স্রোত ও তার সমগ্র প্রকৃতিকে বোঝবার গুরুত্বটাও কম নয়, কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

যে সাগরের গবেষণার প্রয়োজন এত বেশী, তার তলদেশের শতকরা মাত্র দু-ভাগ জায়গা ভূবিদেরা এপর্যন্ত জরীপ করতে পেরেছেন ; অর্থাৎ গোটা পৃথিবীর বেশীর ভাগ অংশই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে।

সাগরের সৃষ্টি

সারা পৃথিবী জুড়ে অথৈ জলে ভরা এই সাগরগুলি—ওদের সৃষ্টি কিভাবে হলো, সে কথা তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করে।

এসম্বন্ধে গোটাকয়েক ধারণা প্রচলিত আছে। একটি ধারণা অনুযায়ী বিবর্তনের প্রথম অবস্থায় পৃথিবী যখন খুবই তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন সেই তাপে পৃথিবীর ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণে জলীয় বাষ্প উপরে উঠে গিয়ে এক বিরাট মেঘ তৈরি করে। এই মেঘে সমগ্র পৃথিবীর আকাশ ঢাকা পড়ে যায়—এমন কি, সূর্যের আলোও পৃথিবীতে পৌঁছুতে পারতো না।

তারপর একদিন ভূপৃষ্ঠের ঠাণ্ডা হবার পালা সুরু হলো। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ কিন্তু একসঙ্গে ঠাণ্ডা হয় নি। যে সব জায়গা আগে ঠাণ্ডা হলো, তারা উপরের বস্তুর চাপে নীচের দিকে বসে গেল। এরা ছিল ভারী শিলা দিয়ে তৈরি। নীচের দিকে বসে-যাওয়া জায়গাগুলি পৃথিবীর ভাবী মহাসাগরের খাতরূপে জলের অপেক্ষায় দিন কাটাতে লাগলো। যে জায়গাগুলির মাথা খানিকটা উপরে জেগে রইলো, তারা ছিল হাল্কা শিলা দিয়ে তৈরি। এরাই হয়ে উঠলো মহাদেশের ভূমি।

তপ্ত ভূপৃষ্ঠ যখন আরও শীতল হয়ে এলো, তখন সমগ্র পৃথিবীকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল যে মেঘের ঘনঘটা, তা থেকে সুরু হলো অঝোর ধারায় বৃষ্টি। দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর, বছরের পর বছর ক্রমে শতাব্দী গেল পেরিয়ে। অবিশ্রান্ত বর্ষণে জলে জলে ভরে উঠলো সাগরের শূন্য আধারগুলি।

যে ধারণাটির কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম, সেটি ছাড়াও সাগরের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কয়েকটি ধারণা রয়েছে, তবে এটির স্বপক্ষেই বেশীর ভাগ ভূবিদের কাছ থেকে সমর্থন পাওয়া যায়।

পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় পাঁচ-শ' কি ছ-শ' কোটি বছর আগে। ভূবিদ্‌দের অনুমান, পৃথিবীর সাগরগুলির সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চার-শ' কোটি বছর আগে।

পৃথিবীর মহাসাগর এবং সাগরগুলি মিলে প্রায় ১৪৩ লক্ষ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে, যাদের মোট জলের আয়তন হলো ৩২৩,৭২২,১৫০ ঘন মাইল। পৃথিবীর মোট আয়তনের এ হলো ১/৮০০ ভাগ।

পৃথিবীর মহাসাগরগুলি সংখ্যায় পাঁচটি—প্রশান্ত, আটলান্টিক, ভারত, আর্কটিক এবং অ্যান্টার্কটিক। মহাসাগরগুলির এলাকাকে আলাদাভাবে নির্দিষ্ট করা হলেও এরা সবাই মিলে একটি বিরাট মহাসাগরেরই অংশবিশেষ। আয়তনে ও গভীরতায় সর্ববৃহৎ হলো প্রশান্ত মহাসাগর—এর গড় গভীরতা প্রায় ২½ মাইল।

পৃথিবীর মহাসাগরগুলির কিছু অংশ আংশিকভাবে স্থলবেষ্টিত অবস্থায় থাকে—এদের আমরা বলি সমুদ্র, আবার কিছু জলভাগকে বলি উপসাগর।

মহীসোপান ও মহাদেশের ঢাল

সাগরের উপকূলেই মহাদেশের জমির শেষ নয়। সাগরের জলের ভিতর দিয়ে মহাদেশের জমি প্রায় সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে মহাসাগরের গভীর প্রদেশের দিকে নেমে গেছে। মহাদেশের এই অংশকে বলা হয় মহীসোপান। এর বেশীর ভাগ অংশেই জলের গভীরতা ৬০০ ফুটেরও কম।

মহীসোপানের গঠন কিছু কিছু জায়গায় সমতল, কিন্তু বেশীর ভাগ অংশেই এ হলো তরঙ্গায়িত, অসমতল ও ছোট-বড় নানা ফাটলে পূর্ণ।

ভারত মহাসাগরে গবেষণারত আমেরিকান জাহাজ পায়োনিয়ার তিন বছর আগে বঙ্গোপসাগরে গঙ্গা নদীর মোহনার কাছে বহু মাইল দীর্ঘ একটি ফাটলের সন্ধান পেয়েছে। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এই ফাটলটি বিস্তৃত বলে জানা গেছে।
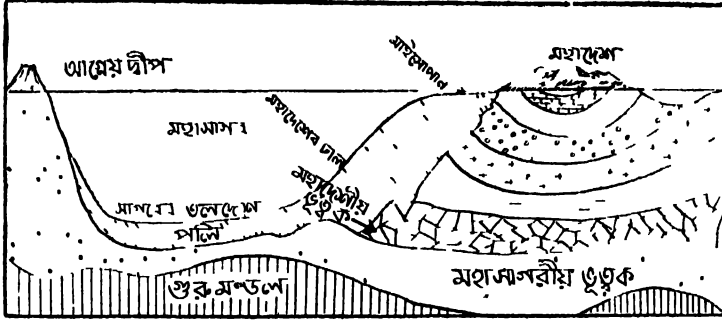
ছবিতে সাগরের মহীসোপান ও মহাদেশের ঢাল অংশ দেখানো হয়েছে।

পৃথিবীর মহাদেশের সব নদী ওদের পলির বোঝা প্রথমে মহীসোপানের উপর এনে ঢেলে দেয়। এসব পলির মধ্যে যে অজৈব পদার্থ ও অন্যান্য উপাদান থাকে, সেগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কালক্রমে চুনাপাথর জাতীয় শিলায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

ভূবিদেরা বিভিন্ন জায়গার মহীসোপানের শিলাস্তরে পেট্রোলিয়ামের সন্ধান পেয়েছেন। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে কাম্বে উপসাগরের মহীসোপানে পেট্রোলিয়াম রয়েছে বলে আমাদের ভূবিদ্‌দের ধারণা। এসম্পর্কে তাঁরা অনুসন্ধান-কার্য চালাচ্ছেন।

মহীসোপানে সাগরের গভীরতা প্রতি মাইলে ২০ ফুট করে বেড়ে চলে। এই গভীরতা বৃদ্ধির হার আরও বেড়ে ওঠে মহাদেশের ঢাল প্রদেশে—যেখানে এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রতি মাইলে ১৫০ থেকে ৩০০ ফুট। মহাদেশের ঢাল গিয়ে পৌঁছয় মহাসাগরের গভীর তলদেশে। এখানকার পলির প্রধান উপাদান হলো কাদা; এছাড়া বালি, পাথর, ঝিনুকও প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

সাগর-পৃষ্ঠের হাজার খানেক ফুট নীচে সূর্যের আলো ও তেজ আর পৌঁছয় না। ফলে মহাদেশের ঢাল অংশে কোন উদ্ভিদ জন্মায় না। এ এক অসীম অন্ধকারের রাজত্ব।

সাগরের তলদেশ

পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগরগুলির তলদেশের গড়পড়তা গভীরতা প্রায় ২½ মাইল। অনেক দিন পর্যন্ত সমুদ্রবিদ্‌দের ধারণা ছিল, সাগরের তলদেশ এক সমতল ক্ষেত্র। কিন্তু গভীরতা মাপবার যন্ত্র ফ্যাদোমিটারের সাহায্যে সাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতির এক নতুন

চেহারা আমাদের কাছে ধরা পড়েছে। দেখা গেল, সাগর-গর্ভেও রয়েছে বিরাট বিরাট পর্বতশ্রেণী। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উচ্চতার দৌড়ে এভারেষ্টকেও হার মানায়।

পৃথিবীর প্রায় সব মহাসাগরগুলির তলা দিয়েই ৪০,০০০ মাইল দীর্ঘ একটানা এক পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত রয়েছে। এর মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অংশটিই সবচেয়ে বড়। আইসল্যাণ্ড থেকে কুমেরু মহাদেশ পর্যন্ত এ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০,০০০ মাইল, প্রস্থে ৫০০ মাইল এবং উচ্চতায় ৬০০০ থেকে ১০,০০০ ফুট। কোথাও কোথাও এই পর্বত জলের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ক্যানেরিস, অ্যাজোর্‌স্‌ প্রভৃতি ছোট-বড় নানা দ্বীপ গড়ে তুলেছে। প্রশান্ত মহাসাগরে এই পর্বতটির আর এক অংশ হাওয়াই, জাপান, ফিলিপাইন্‌স্‌ প্রভৃতি দ্বীপকে সৃষ্টি করেছে।

বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মোহনা থেকে সাগরের তলদেশ দিয়ে যে ফাটলটি বিস্তৃত, তার পাশাপাশি ৬০০ মাইল দীর্ঘ ও ২৫ মাইল প্রশস্ত একটি উপত্যকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই উপত্যকাটির চারপাশে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতমালা, যার সর্বোচ্চ শৃঙ্গটি উপত্যকার তলদেশ থেকে ১২,০০০ ফুট উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মহাদেশের পর্বতগুলি যেমন প্রতিনিয়ত বাতাস ও বৃষ্টির জলে ক্ষয় পেয়ে চলেছে, সাগর-গর্ভের পর্বতগুলির ক্ষেত্রে তা ঘটে না। এসব পর্বতের আশেপাশে বিরাট গভীর ফাটল এবং গর্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। এই ফাটল ও গর্তগুলির মধ্যে শিলাস্তরের বিচ্যুতি ঘটে জোরালো ভূকম্পের সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় যে ভূমিকম্পগুলি ঘটে, সেগুলি তৈরির একটি বড় কারখানা হলো এরা।

সাগরের সবচেয়ে গভীর অংশের সন্ধান পাওয়া গেছে ফিলিপাইন্‌স্‌ দ্বীপপুঞ্জের ছয় মাইল পূর্বে ম্যারিয়ানাস ট্রেঞ্চ নামে একটি স্থানে। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত এই গর্তটির গভীরতা ৩৭,৮০০ ফুট বা প্রায় ৭ মাইল। গোটা এভারেষ্ট পাহাড়টিকে ঐ জায়গায় বসিয়ে দিলেও মাথার উপরে আরো প্রায় ৯০০০ ফুট গভীর জল থেকে যাবে।

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন নদী মহাদেশ থেকে বয়ে এনে যে পলির বোঝা মুক্ত করে দেয় সাগরের মহীসোপানে, তার অনেকটাই গিয়ে জমা হয় সাগরের তলদেশে। এই পলির একটি প্রধান উপাদান হলো অজস্র সামুদ্রিক প্রাণীর দেহাবশেষ। সাগর-গর্ভের এই পলির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে পৃথিবী ও তার প্রাণী-জগতের সমগ্র বিবর্তনের ইতিহাস। প্রকৃতি অতি সঙ্গোপনে মানুষের সন্ধানী দৃষ্টির আড়ালে সেই ইতিহাসের অধ্যায়গুলি রক্ষা করে চলেছে।

সাগরের গভীরে

সাগরের জলের গভীরতা মাপবার জন্যে আধুনিক পদ্ধতিটি হলো এই—সাগর-পৃষ্ঠে জাহাজের উপর ট্র্যান্সডিউসার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ-তরঙ্গের মত চাপযুক্ত তরঙ্গ তৈরি করে জলের মধ্য দিয়ে নীচের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লবণাক্ত জলে শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ
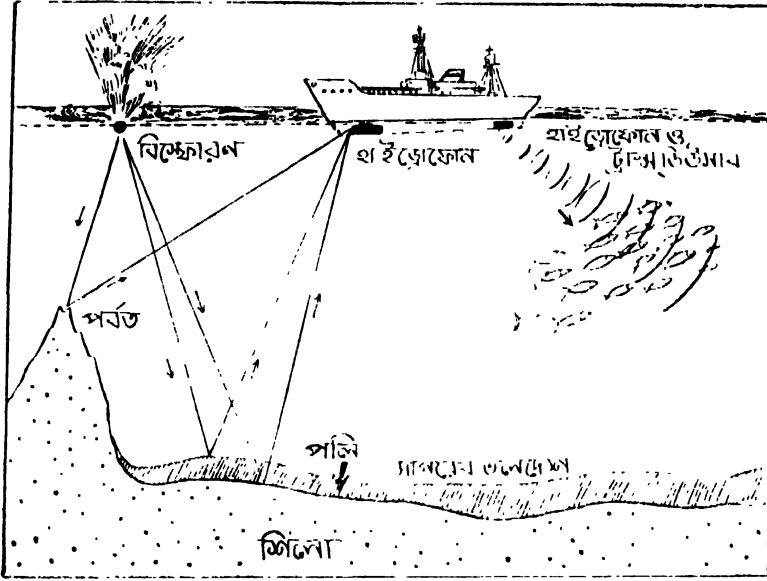
সাগর-পৃষ্ঠে বিস্ফোরণের পর যে শব্দ-তরঙ্গ তৈরি হলো, তা সাগরের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে। ফ্যাদোমিটার যন্ত্রে এই তরঙ্গের রেখাচিত্রের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সাগর-গর্ভের ভূ-প্রকৃতির ছবিটি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে।

জানা আছে। কাজেই শব্দ-তরঙ্গের উপর থেকে নীচে নামা এবং সাগর-গর্ভ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসবার সময়টুকু ফ্যাদোমিটার যন্ত্রে মাপজোকের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সাগরের গভীরতার মাপটি পাওয়া যাবে। পর্বত, ফাটল বা ট্রেঞ্চ—কোন্ ধরণের গঠন-প্রকৃতি রয়েছে সাগরের তলদেশে, সে কথাটুকুও একই সঙ্গে পেতে দেরী হয় না। এভাবে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে সাগর-গর্ভে মাছের ঝাঁকের অস্তিত্বও ধরা পড়ছে।

সমুদ্র-পৃষ্ঠের উপর বিস্ফোরণ ঘটালেও কম্পনশীল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সাগর-গর্ভের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে সেই তরঙ্গের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে জানা যায়—সাগরের তলদেশে পলির গভীরতা কতখানি, কি জাতীয় শিলাস্তর সেখানে রয়েছে এবং তা কতখানি পুরু।

সাগর-গর্ভে অভিযান

সাগর-গর্ভের রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞানীরা ক্রমেই তৎপর হয়ে উঠছেন। অক্সিজেন মুখোস ছাড়া মানুষ এপর্যন্ত সাগরের গভীরে ২০০ ফুট পর্যন্ত নামতে পেরেছে। অক্সিজেনের মুখোস নিয়ে নেমেছে ৩৫০ ফুট। বায়ুর চাপযুক্ত পোষাক ও অক্সিজেনের সাহায্যে জাহাজের দড়ির সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় নেমেছে ৫৪০ ফুট।
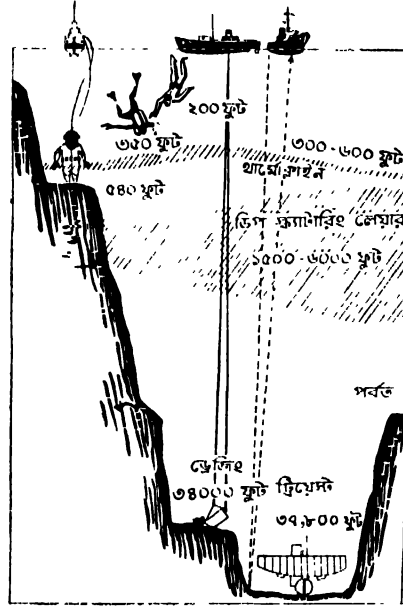
সাগর-গর্ভে অভিযানে নেমে বিজ্ঞানীরা কতদূর পর্যন্ত কিভাবে পাড়ি জমিয়েছেন, উপরের ছবিতে আমরা তা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি।

সাগরের উপরতলার জল সূর্যের তাপে তপ্ত হয়। কিন্তু সাগরের গভীরে ৩০০ থেকে ৬০০ ফুট এলাকার মধ্যে তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গিয়ে থার্মোক্লাইন নামে ঠাণ্ডা জলের একটি বেশ চওড়া স্তর তৈরি হয়ে বসে আছে। জলের এই অঞ্চলটি সাগরের উপরের অংশকে তার নীচের অংশ থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা করে রেখেছে।

সমুদ্রবিদেরা সাগর-গর্ভের বিভিন্ন জায়গায় ১৫০০ থেকে ৬০০০ ফুট অঞ্চলের মধ্যে 'ডিপ স্ক্যাটারিং লেয়ার' নামে আর একটি জলের স্তরের সন্ধান পেয়েছেন। এই জল-স্তরটির উচ্চ কম্পনশীল শব্দ-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করবার ক্ষমতা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা জাহাজ থেকে সাগরের প্রায় ৩৪০০০ ফুট গভীরে অবস্থিত পর্বতের শিলাদেহকে খুঁড়ে সেই উপাদানকে উপরে তুলে আনতে পেরেছেন। ১৯৬০ সালের ২৩শে জানুয়ারী পিকার্ড ও ওয়ালেস নামে দু-জন বিজ্ঞানী ট্রিয়েষ্ট নামে একটি বিশেষ ধরণের সমুদ্র-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে

চড়ে সাগরের সবচেয়ে গভীরতম অংশ মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে নেমেছিলেন। ট্রিয়েষ্টের গবেষণা-কক্ষের স্বচ্ছ দেয়ালের মধ্য দিয়ে সাগরের প্রাণী-জগতের এক বিচিত্র ছবি ঐ দু-জন বিজ্ঞানীর কাছে ধরা পড়েছিল। সাগরের একেবারে গভীরতম প্রদেশেও তাঁরা প্রাণের সন্ধান পেয়েছেন।

সাগরে অভিযান

মহাদেশের জমির সঙ্গে মহাসাগরের এক অন্তহীন সংগ্রাম চলেছে। সাগরের জল কোথাও মাটিকে গ্রাস করছে, আবার মহাদেশের জমি কোথাও সাগরের জলের উপর পা ফেলে এগিয়ে এসেছে। কয়েক বছর আগে আমাদের ভারতেরই দক্ষিণ প্রান্তে ধনুষ্কোটি নামে জায়গাটির অনেকখানি অংশ বঙ্গোপসাগরের জল গ্রাস করে নিয়েছিল, তোমরা বোধহয় সে খবরটা জান। জলের অতবড় বিশাল সাম্রাজ্যটা হাতে পেয়েও মহাসাগরের জমির ক্ষুধাটা যেন আর মিটতে চায় না।

সাগরের জলে তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরিমাণ নির্ণয় করতে গিয়ে একজন বিজ্ঞানী একটি আশ্চর্য তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন। আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে সাগরের জল নাকি সারা পৃথিবী জুড়ে গড়ে প্রায় ৫০ ফুট উঁচু হয়ে ফুলে উঠেছিল। ফলে সাগরের উপকূলস্থিত মানবসভ্যতার অধিকাংশ প্রধান কেন্দ্রই বন্যার জলে ভেসে যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে যে বিরাট বন্যার কথা লেখা রয়েছে, সম্ভবতঃ তা ঐ একই ঘটনাকে নির্দেশ করছে। হিমালয় পর্বতের ২০,০০০ ফুট উচ্চতায়ও সামুদ্রিক ঝিনুকের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। তাথেকে একথা অনুমান করা সঙ্গত হবে না যে, সাগরের জল একদিন হিমালয়ের ঐ উচ্চ প্রদেশে অভিযান চালিয়েছিল। আসলে ব্যাপারটা হলো—এক প্রাচীন সমুদ্রের তলায় শিলাময় দেহ গড়বার কাজ সম্পূর্ণ হবার পরেই হিমালয় আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

হিমবাহ-বিজ্ঞানীদের হিসেব অনুযায়ী জানা গেছে, পৃথিবীর সাগরগুলির সমগ্র জলরাশির শতকরা প্রায় দশভাগ সুমেরু ও কুমেরু মহাদেশের বিরাট বরফের রাজত্বের মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে। পৃথিবীর গড়পড়তা তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে (যা নাকি প্রতি ১০০ বছরে এক ডিগ্রী ফারেনহাইট করে বাড়ছে)। যদি ঐ বরফের স্তর গলে জল হয়ে বসে, তাহলে সাগর-পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা সারা পৃথিবী জুড়ে ২০০ ফুট বেড়ে উঠবে। ফলটা কি দাঁড়াবে, তা তোমরা সহজেই অনুমান করতে পার। আমাদের এই কলকাতা সহরশুদ্ধ পৃথিবীর আরও কতকগুলি বড় বড় শহর এবং অঞ্চল যে সাগরের তলায় তলিয়ে যাবে, তা ভাবতে গেলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই জাতীয় একটি দুর্ঘটনা যে আদৌ ঘটবে না, সে গ্যারান্টি বোধ হয় কোন বিজ্ঞানী দিতে রাজী হবেন না। প্রকৃতির সে

তাণ্ডবকে কিভাবে যুঝতে হবে, সে দায়িত্বভার আমরা না হয় আমাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যেই তুলে রেখে দিলাম।

সাগরের সম্পদ

আমাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খনিজ পদার্থের এক বিরাট বিপুল সম্ভার সাগরের জলে মিশ্রিত অবস্থায় রয়েছে। এই খনিজ সম্ভারের শতকরা ৮৫ ভাগ হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিনের মিশ্রণজাত সোডিয়াম ক্লোরাইড—যাকে লবণরূপে আমরা ব্যবহার করে থাকি। প্রতি ১০০০ ভাগ সাগরের জলে এই খনিজটির পরিমাণ হলো ৩৫ ভাগ বা শতকরা হিসেবে ৩½ ভাগ।

পৃথিবীর সাগরগুলির সৃষ্টির সময়ে তাদের জল কিন্তু এত লবণাক্ত ছিল না। যুগ যুগ ধরে বৃষ্টি ও বরফ-গলা জল মহাদেশের মাটি ও শিলার সঙ্গে মিশ্রিত নানা লবণজাতীয় পদার্থকে এনে জড়ো করেছে নদীতে। নদী সে বস্তুগুলিকে নিয়ে ঢেলে চলেছে সাগরে। দীর্ঘকাল ধরে এভাবে চলতে চলতে সাগরের জল আজ এত লবণাক্ত হয়ে উঠেছে। যত দিন যাবে, ততই সাগরের জলে এই লবণের মাত্রা আরও বেড়ে উঠবে। পৃথিবীর সাগরগুলি থেকে প্রতি বছর আমরা ২২ মিলিয়ন টন লবণ সংগ্রহ করে থাকি।

সাগরের জলে অন্য যে সব খনিজ পদার্থ রয়েছে, সেগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো—ম্যাগ্‌নেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ব্রোমিন, আয়োডিন, নিকেল, কোবাল্ট, তামা, দস্তা, সীসা, সোনা ও রূপা।

এক ঘন কিলোমিটার সাগরের জলে প্রায় তের লক্ষ টন ম্যাগ্‌নেসিয়াম রয়েছে। গোটা পৃথিবীর সমস্ত দেশের শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে এই খনিজটির বেশ কয়েক বছরের চাহিদাকে এই পরিমাণের দ্বারা মেটানো যেতে পারে। সাগরের জল থেকে ম্যাগ্‌-নেসিয়ামকে আলাদা করবার কাজটিও খুব কঠিন নয়।

কিন্তু বেশীর ভাগ খনিজের বেলায় তাদের সাগরের জল থেকে আলাদা করে নেবার কাজটি খুবই জটিল, যেহেতু তাদের শতকরা পরিমাণ হলো খুবই সামান্য। কিছু কিছু সামুদ্রিক প্রাণীর সন্ধান বিজ্ঞানীরা পেয়েছেন, যারা তাদের দেহের মধ্যে একটি বিশেষ মৌলিক পদার্থকে মজুত করে রাখে। সাগরের জলে মিশ্রিত অবস্থায় ঐ পদার্থটির শতকরা পরিমাণ এতই কম যে, অতিসূক্ষ্ম রাসায়নিক পদ্ধতির দ্বারাও ওর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এক বিচিত্র জৈববৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে রূপ দেবার কথা বিজ্ঞানীরা ভাবছেন—সাগরের অগভীর জলে নানা জাতের সামুদ্রিক প্রাণীর বসবাসের ব্যবস্থা করে ওদের দেহের খুপড়ি থেকে কোবাল্ট, সিজিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, ভ্যানেডিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য সব খনিজকে উদ্ধার করে চলা।

সাগরের জলে মিশ্রিত অবস্থায় যে সব গ্যাস রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রধান হলো নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। বায়ুমণ্ডলে যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে, সাগরের জলে ঐ গ্যাসটির পরিমাণ সে তুলনায় ১৮ থেকে ২৭ গুণ বেশী। উষ্ণ জলের তুলনায় ঠাণ্ডা জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেশী পরিমাণে থাকে। এই ব্যাপারটি অতীতে পৃথিবীর জলবায়ু গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বায়ুমণ্ডলে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস রয়েছে, তা তাপ শোষণ করে। সাগরের জলের স্বাভাবিক গড়পরতা তাপ যদি যথেষ্ট শীতল হতো, তাহলে সাগর বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নিত। ফলে পৃথিবীর গড়পরতা তাপমাত্রা কমে গিয়ে হয়তো আর একটি নতুন তুষার যুগেরই আবির্ভাব ঘটে বসতো।

প্রোটিন খাদ্যের এক অপর্যাপ্ত সঞ্চয় সাগর সযত্নে রক্ষা করে চলেছে। হাজার হাজার মাছ ধরবার জাহাজ এবং নৌকা পৃথিবীর সাগরগুলি থেকে প্রতি বছর ৬ কোটি টন মাছ ধরে থাকে এবং এর পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

প্রোটিন খাদ্যপ্রাণে সমৃদ্ধ একটি উদ্ভিদ হলো ক্লোরেলা—মানুষের খাদ্যবস্তু-রূপে যা বহুভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অগভীর সাগরের জলে ক্লোরেলা চাষের জন্যে আমাদের প্রয়োজন হবে ফস্‌ফরাস ও নাইট্রোজেনযুক্ত লবণাদি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড—জলের উর্বরা শক্তি বাড়াবার উপাদানরূপে এরা কাজে লাগবে। কৃত্রিমভাবে ক্লোরেলার চাষ করে দেখা গেছে, প্রতি হেক্টর পরিমিত জলে ঐ উদ্ভিজ্জটির প্রায় ৪৩ টনের মত ফলন সম্ভবপর হয়েছে। আমরা জানি, প্রতি হেক্টর জমিতে গমের সবচেয়ে বেশী যে ফলন হয়েছে, তা হলো ৬ টনের মত। গমে প্রোটিনের পরিমাণ হলো শতকরা ১২ ভাগ, যেখানে ক্লোরেলাতে এর পরিমাণ হলো শতকরা ৫০ ভাগ। ক্লোরেলার বৃদ্ধিও হয় দ্রুতবেগে। পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের সমস্যা মেটাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের ক্রমেই বেশী পরিমাণে সাগরের খাদ্যভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এ বিষয়ে জোর গবেষণার কাজ চলেছে।

প্রাণের বিচিত্র রূপ

সাগর এক বিপুল প্রাণের সম্ভারকে ধারণ করে রয়েছে। খানিকটা সাগরের জল সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলেই দেখবে, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ অতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও জীবকোষ ছড়িয়ে রয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র প্রাণী-জগতের শতকরা ৮০ ভাগ সদস্য আজও সাগরের জলে বাস করছে।

মহাকাশ থেকে যে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, তার প্রভাবে মানুষের বংশগতির ধারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু সাগরের গভীরতম প্রদেশে এই রশ্মিটির কারিকুরি বিশেষ নেই বললেই চলে। কাজেই সেখানকার প্রাণী-জগতের চেহারা যুগ যুগ ধরে প্রায় একই অবস্থায় রয়ে গেছে।

প্রায় ৩০ কোটি বছর আগে প্যালিওজোয়িক যুগের শেষের দিকে মৎস্য জাতীয় কোয়েলাকান্থ্ প্রাণীদের সৃষ্টি হয়েছিল। আজ থেকে প্রায় ছয় কোটি বছর আগেই এরা পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। কয়েক বছর আগে হঠাৎ এক দিন আফ্রিকার পূর্বপ্রদেশে গিনি উপসাগরে এই জাতীয় কয়েকটি প্রাণী ধরা পড়েছিল। জীববিজ্ঞানীদের সে কি পরম উল্লাস। তাঁরা সাগরের গভীরে অধুনালুপ্ত এ-ধরণের আরও কিছু প্রাণীর আবিষ্কারের আশা পোষণ করেন।

সারা দিনমান জুড়ে সাগরের রূপ পাল্টানোর অভিনয় চলতে থাকে। যেই রাত্রি ঘনিয়ে এলো, অমনি নানা বিচিত্র প্রাণীদেহের ঝিকিমিকিতে সাগর হয়ে ওঠে রূপকথার এক মায়াপুরী। সাগরের রূপের বৈচিত্র্যের যেন আর শেষ নেই!

শঙ্কর চক্রবর্তী

জানবার কথা

জীবন্ত বঁড়শী

রেমোরা নামে এক রকমের অদ্ভুত মাছ পৃথিবীর বহু জায়গায়ই পাওয়া যায়। এই মাছকে সাধারণতঃ চলিত কথায় 'জীবন্ত বঁড়শী' বলা হয়। কারণ, কোন কোন অঞ্চলের জেলেরা এই মাছের লেজের সঙ্গে লম্বা সূতা বেঁধে জলে ছেড়ে দেয়। ছোট-বড় যে কোন মাছ দেখতে পেলেই এরা ছুটে গিয়ে তার গায়ে লেগে যায়। সূতা টেনে জেলেরা সেই মাছ রেখে দিয়ে আবার তাদের জলে ছেড়ে দেয়। রেমোরার মাথার উপরের দিকে শক্ত প্লেটের মত এক প্রকার শোষক যন্ত্রের সাহায্যেই অপর মাছের গা আঁকড়ে ধরে থাকে।

বল তো দেখি !

১। দুজন রাজপুত জীবিকান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে রাজদরবারে এসে উপস্থিত হলো। রাজপুত দেখে রাজা তাদের দুজনকেই সৈনিকের পদে নিযুক্ত করলেন ; কিন্তু বয়স ও চেহারার গুণে খাওয়া-পরা বাদে একজনের বেতন নির্দিষ্ট করলেন দৈনিক ২$\frac{১}{৬}$ টাকা, আর অপর জনের ১$\frac{১}{২}$ টাকা। সৈন্যাবাসে প্রথম রাজপুত অল্প বেতনের জন্যে ক্ষুব্ধ ও কপর্দকহীন বন্ধুকে সান্তনা দিয়ে তার শেষ সম্বল দশটি টাকা দিয়ে দিল। তারপরে দুজনে স্থির করলো, উভয়ের পুঁজি যখন সমান হবে তখন তারা দেশে ফিরেযাবে।

এখন তাড়াতাড়ি বল তো, কতদিন চাকুরীর পরে তাদের উভয়ের পুঁজি সমান হবে, আর তারা দেশে যাবে ?

২। মনে কর, পৃথিবীর সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত ভূ-গোলককে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ভূ-কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে সোজা একটা গর্ত কাটা হলো। তুমি তখন সুমেরুতে
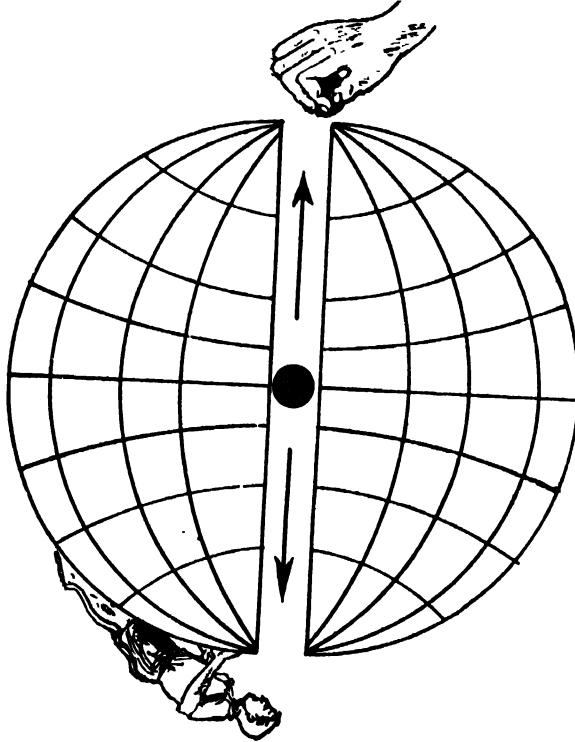
পৌঁছে একটা লোহার ভারী বল গড়িয়ে সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দিলে ; এখন বল তো বলটার কি দশা হবে ?—মাধ্যাকর্ষণের জন্যে বলটা ভূ-কেন্দ্রে পৌঁছে থেমে যাবে, না গর্তের পথে চলতে চলতে সেটা কুমেরু দিয়ে বেরিয়ে মহাশূন্যে অন্তর্হিত হবে ?

৩। বল তো, সবচেয়ে ছোট কোন্ সংখ্যার সঙ্গে ৫ যোগ করলে, অথবা তার থেকে ৭ বিয়োগ দিলে ঐ যোগফল ও বিয়োগফল এক-একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা হবে ?

৪। পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলপথের দুই প্রান্ত থেকে ট্রেন ভুলক্রমে একই লাইনে ছেড়েছে ; একটার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল, অপরটার ৩০ মাইল। ট্রেন দু'টা ছুটে এসে পরস্পর মুখামুখি ধাক্কা খেয়ে চুরমার হওয়ার কথা, কিন্তু তা হলো না। সেই মারাত্মক সংঘর্ষের মাত্র এক মিনিট আগে ভুলটা ধরা পড়লো, আর দু'টা ট্রেনই একসঙ্গে থেমে গেল। ট্রেন দুটার মধ্যে তখন কত মাইল ব্যবধান ছিল ? চট্ করে বল তো !

৫। পূজার ছুটিতে তিন বন্ধু বেড়াতে গেল নৈনিতাল। উঠলো গিয়ে একটা বড় হোটেলে। একটি ঘরে তিনটি সিট খালি আছে, ভাড়া প্রতি সিট দৈনিক ১০.০০ (দশ) টাকা। তিন বন্ধু ত্রিশ টাকা দিয়ে ঘরে চলে গেল। পরে ম্যানেজার ভাবলে, এদের কিছু কনসেসান দেওয়া উচিত—ঘর তো একখানা। বেয়ারার হাতে পাঁচটি টাকা দিয়ে ওদের তিনি ফেরৎ পাঠালেন। চতুর বেয়ারা দুটি টাকা নিজে পকেটস্থ করে তিন বন্ধুকে এক-এক টাকা করে তিনটি টাকা দিয়ে এলো।

এখন বেয়ারাটি হিসেব করে দেখলো, আগন্তুক তিনজন এক-এক টাকা ফেরৎ পেল দশ টাকা থেকে, কাজেই প্রত্যেকে নয় টাকা হিসেবে তারা মোট দিল ৩ × ৯.০০ = ২৭.০০ টাকা, আর আমি নিলাম দু-টাকা ; মোট হলো ২৯.০০ টাকা। তাহলে ওদের প্রথম দেওয়া ত্রিশ টাকার একটা টাকা কোথায় গেল ? সে ভেবে আর কূল পায় না, টাকাটার কি হলো ?

তোমরা একটু খুঁজে দেখ দেখি, টাকাটা পাও কিনা ? পেলে ওকে দিয়ে দিও—গরীব বেচারা !

৬। এক মিস্ত্রি পাথর কেটে-কেটে একটা গোলাকার বল তৈরি করেছে, এমন সময়ে একটি স্কুলের ছেলে সেখানে এসে দাঁড়ালো। মিস্ত্রি তাকে জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা খোকা, মনে হচ্ছে তুমি লেখাপড়া করছো। বল তো দেখি, এই বলটার মত একই মাপের আর ক'টা বল আমাকে তৈরি করতে হবে, যাতে এই বলটা কোন সমান জায়গায় রেখে তার চারদিকে সেই বলগুলি গায়ে গায়ে লাগিয়ে

এর চারদিকে সাজাতে পারবো? ছেলেটি চটপট প্রশ্নটার উত্তর সঠিক দিয়ে দিল। তারপরে সে আবার পাল্টা প্রশ্ন করলে মিস্ত্রিকে।

আচ্ছা—দাদা, আপনি বলুন তো, আপনার বলটার সমগ্র পৃষ্ঠতলের আয়তন যত বর্গ ফুট আছে, তার ঘনমান (ভলিউম) যদি তত ঘন-ফুট হয়, তবে বলটার ব্যাস কত ফুট হবে?

মিস্ত্রি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলো না। তোমরা বল দেখি, ছেলেটি উত্তর কি দিয়েছিল? আর তার প্রশ্নেরই বা কি উত্তর হবে?

৭। ছোট ছোট সমচতুষ্কোণ দাগ-কাটা কম্বলের (নীচের চিত্রের মত) একটা কাটা টুক্‌রা তোমাকে দেওয়া হলো। এটাকে এমনভাবে কেটে ও জুড়ে ফেলতে হবে, যাতে জোড়া-দেওয়া কম্বলটির আকার যেন একটি বর্গক্ষেত্র হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে, কম্বলের ছোট-ছোট সমচতুষ্কোণ খুপরীগুলির একটিও যেন কাটা না পড়ে; ঠিক দাগে-দাগে কাটতে হবে। দেখ দেখি পার কি না?
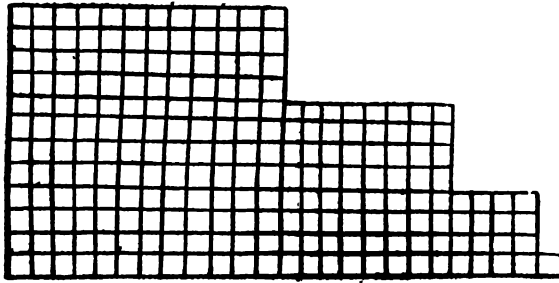
উত্তরগুলি বুঝে নাও

১। দৈনিক বেতন হলো যথাক্রমে $২\frac{১}{৬}$ ও $১\frac{১}{২}=\frac{১৩}{৬}$ ও $\frac{৩}{২}=\frac{১৩}{৬}$ ও $\frac{৯}{৬}$ টাকা; বেতনের প্রভেদ $\frac{১৩}{৬}-\frac{৯}{৬}=\frac{৪}{৬}$ অর্থাৎ $\frac{২}{৩}$ টাকা দৈনিক। বুঝা গেল, দ্বিতীয় রাজপুত প্রতিদিন বেতন হিসাবে প্রথমের চেয়ে $\frac{২}{৩}$ টাকা কম পায়, কিন্তু সে ১০·০০ টাকা আগেই পেয়ে গেছে। কাজেই $১০+\frac{২}{৩}=১৫$ দিনে (প্রাপ্ত ১০ টাকায়) তার কমতি বেতন শুধরে যাবে, আর ১৫ দিনে অর্থাৎ মোট ৩০ দিনে উভয়ের সঞ্চয় সমান হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী তারা দেশে ফিরে যাবে।

২। সুমেরু থেকে বলটা মাধ্যাকর্ষণের টানে গর্তের পথে চলতে চলতে ভূ-কেন্দ্রে পৌঁছালো, কিন্তু সেখানে বলটা শূন্যে থেমে থাকতে পারে না; তার গতিজনিত ভরবেগের দরুণ আরও কিছু নীচে (কুমেরুর দিকে) চলে যাবে। সেখান থেকে আবার মাধ্যাকর্ষণের উল্টো টানে ভূ-কেন্দ্রের দিকে চলতে থাকবে; আর পূর্বোক্ত কারণে কেন্দ্র ছাড়িয়ে খানিকটা সুমেরুর দিকে চলে যাবে। ভূ-কেন্দ্রের দু-দিকে বলটা এভাবে ক্রমাগত যাওয়া-আসা করবে ঘড়ির দোলকের মত। যেহেতু ঐ গর্তে বাইরের আর কোন শক্তি বা বল বলটার উপরে ক্রিয়াশীল নয়, কাজেই ভূ-কেন্দ্রের আকর্ষণ ও তার নিজের ভরবেগের প্যাঁচে পড়ে বলটা অনন্তকাল ঐরূপ যাওয়া-আসা করবে, থামবে না, বা কুমেরুর পথে বেরিয়ে যেতেও পারবে না। বলটার দুর্দশাটা বোঝ!

৩। সামান্য একটু ভেবে দেখলেই সংখ্যাটা বার করতে পারতে। সংখ্যাটা হলো ১১; ১১-এর সঙ্গে ৫ যোগ দিলে হয় ১৬, যা একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা (৪ × ৪)। আবার ১১ থেকে ৭ বাদ দিলে হয় ৪, তাও একটি পূর্ণ বর্গসংখ্যা (২ × ২)।

৪। দু-দিক থেকে ট্রেন দুটা মুখোমুখী আসছে। একটার গতিবেগ ঘণ্টায় ৬০ মাইল, অপরটার ৩০ মাইল; কাজেই ঘণ্টায় ৯০ মাইল হিসাবে ট্রেন দুটা পরস্পরের নিকটবর্তী হচ্ছে। ঘণ্টায় ৯০ মাইল, অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১½ মাইল। তাহলে সেই মারাত্মক সংঘাত ঘটবার ঠিক এক মিনিট আগে তাদের মধ্যে ১½ মাইল ব্যবধান থাকবে। ট্রেন দুটা কত দূর থেকে আসছে, কোথায় সংঘাতটা ঘটতো, এসব কথা আলোচ্য প্রশ্নে একেবারেই অবান্তর।

৫। টাকাটা কোথাও যায় নি। প্রশ্নটার মধ্যে হেঁয়ালি রয়েছে, উল্টা-পাল্টা জমা-খরচের জন্যে সমস্যা বলে মনে হচ্ছে। আগন্তুকদের প্রকৃত খরচ হলো ৩ × ৯ = ২৭ টাকা, ফেরৎ পেল ৩ টাকা; কাজেই তাদের ৩০ টাকা মিলে গেল। আবার ম্যানেজার ও তার বেয়ারা মিলে ২৫ + ২ = ২৭ টাকা পেয়েছে, যা আগন্তুকদের প্রকৃত ব্যয়ের সমান। আগন্তুকদের প্রথমকার দেওয়া ৩০ টাকা খরচ ধরে ত্রিমাত্রিক (আগন্তুক, ম্যানেজার ও বেয়ারা) হিসাব করলে জমা-খরচের হিসাব মিলতে পারে না।

৬। কোন সমতল জায়গায় একটা বল রেখে তার চারদিকে অনুরূপ আকারের

আর ছ'টা বল মাঝের বলটার ও পরস্পরের সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগিয়ে বসানো
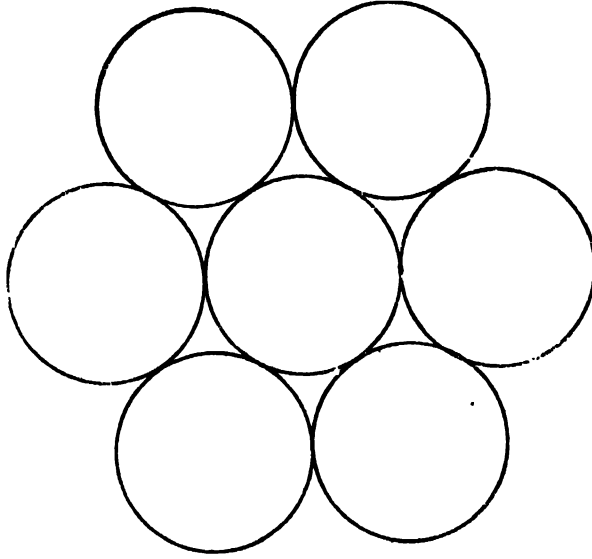
যেতে পারে। তোমরা নিজেরাই বসিয়ে দেখ। সাতটা মার্বেল বা গোল পয়সা নিয়েও পরীক্ষাটা করে দেখতে পার।

দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর দিতে হলে একটু অঙ্কের হিসেব চাই। আমরা জানি, কোন বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত হলো π, অর্থাৎ $\frac{২২}{৭}$; এই অনুপাতটি সঠিক সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় না, মোটামুটি এটা হলো ৩.১৪১৬। যাহোক, আমাদের প্রশ্নে এই অনুপাতের সঠিক সংখ্যা-মূল্যের প্রয়োজন নেই। আমরা জানি, কোন গোলকের তলদেশের আয়তন হলো $\pi\times$ ব্যাসের বর্গফল; আবার গোলকের ঘনমান (ভলিউম) হলো $\frac{\pi}{৬}\times$ ব্যাসের ঘনফল। কাজেই এখানে আমরা π-এর কথাটা হিসেব থেকে বাদ দিতে পারি। প্রশ্নটা বুঝে দেখ, দেখবে বলটার ব্যাস হবে তত ফুট যার বর্গফল হবে ঘনফলের এক ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ। সংখ্যাটা হলো ৬; কারণ ৬×৬=৬×৬×৬÷৬। অতএব বলটার ব্যাস ৬ ফুট।

৭। কম্বলখানায় সমচতুষ্কোণ খুপরী রয়েছে মোট ২২৫টি; কাটা অংশগুলির

খুপরী গুণে দেখ, ১২×১২+৮×৮+৪×৪+১=২২৫। কম্বলের টুক্‌রাটাকে কেটে
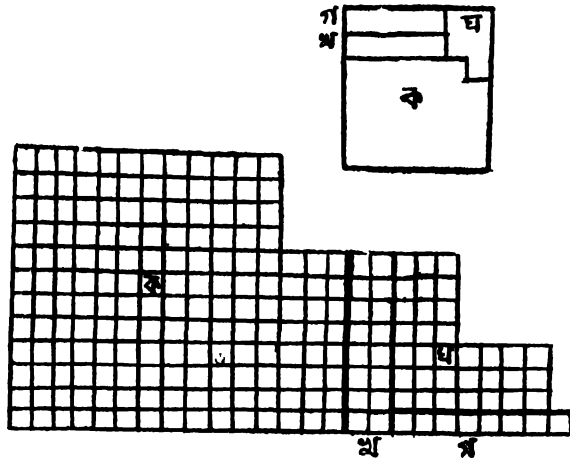
জুড়ে একটা বর্গক্ষেত্রের আকারে আনতে হলে সেই বর্গক্ষেত্রের এক-এক ধারে থাকবে ১৫টা খুপরী; কারণ ২২৫-এর বর্গমূল ১৫।

এখন তাহলে ছবিটার নীচের দিকের ১৫টি খুপরী রেখে কাটতে হবে উপর নীচে দুই খুপরীর একটা ফালি। কথায় না বলে ছবিটায় মোটা দাগ কেটে দেখানো হলো। ছবিটার মোটা দাগের ফালিগুলি কাটলে (ক, খ, গ, ঘ) ৪-টি ফালি পাওয়া যাবে। এখন উপরে প্রদত্ত নক্সা অনুযায়ী জুড়লেই দেখবে ১৫ খুপরীর বর্গায়তন কম্বল পাওয়া যাবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

প্রশ্ন ও উত্তর

১। প্রঃ মানুষের কালো রঙের প্রতি সহজাত কোন বিদ্বেষ আছে বলিয়া মনে হয় না—তাহা হইলে কালো রঙের জুতা, ছাতা, স্যুট প্রভৃতি কেহ ভালবাসিত না। অথচ মানুষ অন্য মানুষের গায়ের রং কাল দেখিতে ভালবাসে না কেন? ইহার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কি কেহ করিয়াছেন?

প্রমথেশপদ পাণ্ডা, দুর্গাপুর।

২। প্রঃ (ক) জেট বিমান, প্রোপেলারযুক্ত বিমান ও রকেটের মধ্যে পার্থক্য কি?

(খ) জেট বিমানের কি কোন শ্রেণী-বিভাগ আছে?

সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, বৈঁচিবেড়িয়া, ২৪ পরগণা।

৩। প্রঃ সময়ের সংজ্ঞা কি?

মানসকৃষ্ণ ঘোষমৌলিক, চন্দননগর

উঃ ১। কালোর প্রতি বিদ্বেষ মানুষের সহজাত নয় ও সব মানুষের থাকে না। এই বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। মনস্তত্ত্ববিদেরা এটাকে বলেন কুসংস্কার বা পক্ষপাতজনিত দোষ (Prejudice) বাড়ীতে বা বাড়ীর বাইরে যাঁদের সংস্পর্শে আমরা থাকি, তাঁরা জেনে বা না জেনে এই সংস্কার আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। সে জন্যেই কালো ভাল লাগা বা না লাগা বস্তুর উপর নির্ভরশীল। শুধু কালো নয়, সাদা বা অন্য কোন রঙের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যে সাদা-কালোর বিভেদ ও বিদ্বেষ আর্য-অনার্য শ্রেণী-বিভাগের সময় থেকে। এই বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায়, কুসংস্কার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া ও তার প্রচার ও প্রসার থেকে শুধু বিরত থাকা নয়—তাকে যে কোন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত করা ও ধ্বংস করা।

পশ্চিম রাষ্ট্রগুলিতে সাদা-কালো বিরোধিতার সমস্যা সমধিক—তাই সেখানকার মনস্তত্ত্ববিদেরা এসম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এসম্পর্কে দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় থেকে প্রচুর কাজ হয়েছে (দ্রষ্টব্য—Introduction to Psychology by Morgan and King)।

উঃ ২। (ক) যে কোন জিনিষকেই পৃথিবীর মাটি ছেড়ে উঠতে গেলে কাজ করতে হবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিরুদ্ধে! বিমান ও রকেটের ক্ষেত্রে এই কাজ করা হয় দুটি সূত্র অনুযায়ী—প্রথমটি বারনোলীর সূত্র (Bernoulli's principle) ও দ্বিতীয়টি নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র (Newton's 3rd law of motion)। বারনোলীর সূত্রানুযায়ী তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের গতি যেখানে বেশী সেখানে চাপ কম। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। বিমানের ডানার আকৃতিগত

বৈশিষ্ট্য এমন যে, ডানার উপর দিয়ে বাতাস খুব জোরে যেতে পারে, কিন্তু নীচের দিকে বাতাসের গতিবেগ খুব বাড়ে না। তাই ডানার উপরের দিকে বাতাসের চাপ কম থাকে, নীচের দিকে বেশী থাকে। এই চাপের পার্থক্য বিমানকে উড়তে সাহায্য করে। তাছাড়া রকেট ও বিমানের আকৃতি এমন ধরণের করা হয়, যাতে তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলবার সময় ন্যূনতম রোধ (বাতাসের) অনুভব করে (Streamline shape)।

প্রোপেলার বা পাখাযুক্ত বিমানের সামনে এক বা একাধিক পাখা খুব জোরে ঘোরে। এই পাখাগুলির গঠন এমন, এরা হাওয়া খুব জোরে পিছনের দিকে ঠেলে দেয়। ডানার উপর দিয়ে হাওয়া যায় খুব জোরে। কিন্তু নীচে দিয়ে অত জোরে যেতে পারে না—সৃষ্টি হয় চাপ-পার্থক্যের ও বিমান উপরে উপরে উঠতে থাকে। বিমানক্ষেত্রে বিমানগুলিকে ছুটিয়ে নিয়ে এই হাওয়ার গতিবেগ আরও বাড়ানো হয় উপরে ওঠবার উপযুক্ত চাপ-পার্থক্য পাবার জন্যে।

জেট বিমানে মুখের দিকে কয়েকটি গর্ত থাকে। এই গর্তের মধ্যে দিয়ে হাওয়া টেনে নেওয়া হয় ইঞ্জিনের মধ্যে। এই বাতাসকে চেপে বন্ধ করা হয় একটা খুব ছোট জায়গায়, সৃষ্টি হয় উচ্চচাপের। জ্বালানীর সাহায্যে এই বাতাসের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে চাপ আরও বেড়ে যায়। এই উচ্চচাপ ও উচ্চতাপের বায়ু নির্গমন পথ দিয়ে বিপুল বেগে বেরিয়ে আসবার সময় বিমানটিকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। উপরে ওঠবার বাকী কায়দা পাখাওলা বিমানের মতই—বারনোলীর সূত্রের সাহায্যে।

রকেটে পুরোপুরি ব্যবহার করা হয় নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের। রকেটের ইঞ্জিন জেটবিমানের মতই—তবে রকেটে গ্যাস ও জ্বালানী দুই-ই সঞ্চিত থাকে, তাই বাতাস-বিহীন জায়গায়ও রকেট চলতে পারে। জেট ইঞ্জিনে বাতাসের যে ব্যবহার, রকেটে সঞ্চিত গ্যাস বাতাসের পরিবর্তে সে জন্যে ব্যবহৃত হয়।

(খ) জেট বিমানের একটি ভাগ হয়, ইঞ্জিনের কর্মপ্রণালীর উপর নির্ভর করে —টার্বোজেট (Turbo-jet) ও র‍্যামজেট (Ramjet)। টার্বোজেটে নির্গত বায়ুর সাহায্যে একটি টার্বাইন চালানো হয়। টার্বাইনে এক ধরণের পাখা থাকে ও নির্গত বাতাস এই পাখাকে ঘোরাতে থাকে। এই শক্তির সাহায্যে আবার বাতাস শুষে নেওয়া ও তাকে চাপবার কাজও করা হয়। র‍্যামজেটের ইঞ্জিন ও রকেটের ইঞ্জিন হুবহু এক। এখানে জেট ইঞ্জিনটির ছুটে চলবার জন্যে যে বাতাস ইঞ্জিনের প্রকোষ্ঠে ঢোকে, তাকেই জ্বালানীর সাহায্যে উচ্চতাপ ও উচ্চচাপসমন্বিত করে নির্গমন পথ দিয়ে বের হতে দেওয়া হয়। র‍্যামজেটে কোন গতিশীল অংশ নেই। এই ধরণের শ্রেণী-বিভাগ ছাড়াও জেটবিমানের গতির উপর নির্ভর করে একটি শ্রেণী-বিভাগ হয়; সাবসোনিক (Subsonic)—যে বিমানের গতিবেগ বায়ুতে শব্দের গতিবেগের চেয়ে কম ও সুপারসোনিক (Supersonic)—যে বিমানের গতিবেগ শব্দের চেয়ে বেশী।

শুভেন্দুকুমার দত্ত

উঃ ৩। সময় শব্দটার সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত। 'আমার সময় নেই', 'এটা করতে আমার ক সময় লাগবে'— জাতীয় বলতে খুবই কাজেই সময় সম্বন্ধে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু সেই মৌলিক ধারণাকে এক কথায় প্রকাশ করা যায় না। সাধারণতঃ কোন বস্তু সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা ও অনুভূতি আছে, সময়ের ব্যাপারে তা সম্পূর্ণ পৃথক।

আমরা বলি যে সময় বয়ে যাচ্ছে। এই সময় প্রবাহের বিশেষত্ব এই যে, তা একমুখী, উল্টোদিকে বইবে না। যেমন নতুন জিনিষ পুরাতন হয়, পুরাতন নতুন হয় না। বুড়ো মানুষ কখনও শিশুতে ফিরে আসতে পারে না। এই একমুখী প্রবাহটা তাহলে সময়ের একটা বিশেষত্ব।

এবার সময় বা কাল সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা যাক। বহু বিস্তৃত অনন্ত ক্ষেত্র, জ্যোতির্মণ্ডলের সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র, যার মাঝে আছে, বিজ্ঞানের ভাষায়—তাকে আমরা দেশ বলে জানি। দেশের মধ্যে তিনটি সংখ্যার সাহায্যে যে কোন একটা স্থির বিন্দুর অবস্থান জানা যায়। কিন্তু স্থির বস্তু যদি কোন কারণে গতিশীল হয়, তবে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অঙ্কমান গ্রহণ করবে, অর্থাৎ উক্ত স্থানাঙ্কের সত্যতা কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। তাহলে গতিশীল অবস্থায় কোন বিশেষ বস্তুর বিশেষ সময়ে তার অবস্থান নির্দেশের জন্যে তার সেই বিশেষ সময়টির উল্লেখ প্রয়োজন। তাই স্থির অবস্থায় বিন্দুর স্থানাঙ্ক যদি (x, y, z) হয়, তবে গতিশীল অবস্থায় ঐ স্থানাঙ্ক হবে (x, y, z, t)। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, বস্তুর গতি থেকেই সময়ের সংজ্ঞার প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায়। সময়ের আরেকটি ধর্ম হচ্ছে এই যে, এটা দ্রষ্টা-নিরপেক্ষ নয়। কেন না, কাল পরিমাপে দ্রষ্টার অবস্থানের প্রয়োজন হয়।

এই সব থেকে তাই আইনস্টাইন দেশ ও কালের অস্তিত্বকে আলাদা করে দেখতে রাজী হলেন না। তিনি বললেন যে, দেশ ও কাল, একের সঙ্গে অন্যে অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা আছে। তাঁর আপেক্ষিকতা তত্ত্বে একে বলা হয়েছে দেশ-কালের নিরন্তরতা (Space-time-continuum) বা মিন্‌কাউস্কির চার মাত্রার বিশ্ব। দেশ-কালের নিরন্তরতা বলতে বুঝবো দেশ ও কালের একটা যুগ্ম রূপ। নদী বলতে আমরা যেমন সমুদ্রের দিকে তার গতিকে বুঝি না বা বিস্তীর্ণ জলরাশিকে বুঝি না। নদী বলতে বুঝি, বিস্তীর্ণ জলরাশির সমুদ্রের দিকে গতিশীল অবস্থাকে। আমাদের বিশ্ব দেশ-কালের নিরন্তরতার মাঝ দিয়ে ছুটে চলেছে এবং এই চতুর্মাত্রিক দেশ-কালের রঙ্গমঞ্চেই বিশ্বের অন্তর্ভুক্ত সব ঘটনা ঘটছে। সমস্ত ঘটনার অস্তিত্ব দেশের অন্তর্ভুক্তিতে এবং বৈশিষ্ট্য সময়ের মাপকাঠিতে। ঘটনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নিতে হবে সময়ের সূত্রে তাদের পরস্পরের সাহায্য নিয়ে।

শ্যামসুন্দর দে

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। সত্যেন্দ্রনাথ বসু
২২, ঈশ্বর মিল লেন,
কলিকাতা-৬

২। শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
"স্বস্তিক"
৫০/১, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা-২৯

৩। রমেশ দাশ
গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব এডুকেশন
বর্ধমান

৪। সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৫। শান্তিময় বসু
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৬। সত্যেশ চক্রবর্তী
প্রেসিডেন্সী কলেজ
কলিকাতা- ২

৭। শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৮। রবীন্দ্রনাথ রায়
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৯। জয়ন্ত বসু
সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১০। সুশীলরঞ্জন মৈত্র
ও
বীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
শারীরবৃত্ত বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
কলিকাতা-৯

১১। মহাদেব দত্ত
(গণিত বিভাগ)
আই. আই. টি বোম্বে, পোয়াই
বোম্বে-৭৬
ও
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড
কলিকাতা-২৯

১২। শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১৩। দিলীপ বসু
২০০-এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

১৪। শঙ্কর চক্রবর্তী
৬৪।বি, প্রতাপাদিত্য রোড
কলিকাতা-২৬

১৫। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

১৬। শুভেন্দুকুমার দত্ত
ও
শ্যামসুন্দর দে
ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স
অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স
বিজ্ঞান কলেজ,
৯২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বিংশতি বর্ষ | ডিসেম্বর, ১৯৬৭ | দ্বাদশ সংখ্যা

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

কিছুকাল আগেও অ্যাটম বা পরমাণুকে বস্তুর সূক্ষ্মাতিতম অবিভাজ্য অংশ বলে মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমানে পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন বলে তিনটি প্রধান ও পজিট্রন ও মেসন বলে আরও দুটি অপ্রধান সূক্ষ্মাতিতম অংশ আছে বলে জানা গেছে। ঋণাত্মক বৈদ্যুৎ-শক্তি-বিশিষ্ট ইলেকট্রনগুলি নিউক্লিয়াসের পরিধির বাইরে তাকে ঘিরে থাকে এবং একটি পরমাণু থেকে অন্যটিতে সহজেই স্থান পরিবর্তন করতে পারে এবং ঐ সঙ্গে তড়িৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তিবিশিষ্ট প্রোটন থাকে নিউ-ক্লিয়াসের ভিতরেই এবং তা ওজনে ইলেকট্রন থেকে আঠারো-শ' গুণ ভারী হলেও ধনাত্মক প্রোটন ও ঋণাত্মক ইলেকট্রনের বিপরীত তড়িৎ-শক্তি সমান সমান বলে ইলেকট্রন যখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখনই প্রোটনের সঙ্গে সংযোগের ফলে তড়িৎ-শক্তিহীন একটি নিউট্রনের সৃষ্টি হয়। নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত নিউট্রনের ওজন কিন্তু ঠিক প্রোটনেরই মত, অর্থাৎ প্রোটনের তুলনায় প্রায় ওজনহীন ইলেক-ট্রনের দ্বারা একে অন্যের তড়িৎ-শক্তি নাকচ হওয়াতে যে নিউট্রনের উদ্ভব হয়, তার ওজন তখন প্রোটনের অনুরূপই থাকে। নিউট্রন থেকে ইলেকট্রনের বহিষ্কার কিংবা তার সঙ্গে একটি পজিট্রনের অন্তর্ভুক্তির ফলে (যা কদাচিৎ ঘটতে পারে) আবার তা প্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে। ঋণাত্মক ইলেকট্রনের সমপরিমাণ ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তিযুক্ত পজিট্রনের ওজনও কিন্তু ইলেকট্রনেরই মত; সুতরাং তাকে ধনাত্মক ইলেকট্রন বলেও গণ্য করা যেতে পারে।

প্রোটনের ধনাত্মক তড়িৎশক্তির মূলে কিন্তু ঐ পজিট্রনেরই ধনাত্মক তড়িৎ-শক্তি; কারণ দেখা গেছে যে, ঐ নিজস্ব তড়িৎ-শক্তি বিচ্যুতির ফলে পজিট্রন না-ধনাত্মক-না-ঋণাত্মক নিউট্রনে পরিবর্তিত হয়। পজিট্রনের জীবন কিন্তু অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী (এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের একাংশের অধিক নয়), কারণ একে অন্যের প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের ফলে ইলেকট্রন ও পজিট্রনগুলির মধ্যে যে সংঘাত ঘটে তাতেই উভয়ের বিলুপ্তি ঘটে। ফলে তাদের আর কোন ভর (Mass) থাকে না, তার পরিবর্তে দুই কোয়াণ্টাম পরিমিত শক্তি গামা রশ্মিরূপে প্রতিভাত হয়। এককালে যখন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছিলেন 'ভরই শক্তি', তখন অনেকেই মেনে নিতে পারেন নি, কিন্তু আজ উপরিউক্ত তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঐ সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানী-ঋষির বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

তাছাড়া নিউক্লিয়াসের মধ্যে ইলেকট্রন ও প্রোটনের আকারের মাঝামাঝি আকারের মেসন নামক যে সূক্ষ্মাংশ থাকে, সেগুলি খুব সম্ভব নিউট্রন কিংবা প্রোটনের ভগ্নাংশমাত্র এবং তা মহাশূন্যে বর্তমান কস্‌মিক রশ্মির (Cosmic rays) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। মহাশূন্যে অবস্থিত অজ্ঞাত কোন মূল উপাদান থেকে তীব্র গতিবিশিষ্ট প্রোটনগুলি যখন বহু উর্ধ্বে অবস্থিত আবহস্তরে সংঘাতের সৃষ্টি করে, তখন তারা নানাবিধ নিউক্লিয়াসকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তারা খানখান হয়ে ভেঙে পড়ে। এসব ভগ্নাংশের কতকগুলিই মেসন-কণিকা। সেখান থেকে তারা পৃথিবীর দিকে ধাওয়া করে ব্যাপকভাবে কস্‌মিক রশ্মির সঙ্গে এবং উপাদান নির্বিশেষে গভীরভাবে তাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়—এমন কি, সুদৃঢ় পাথরে গড়া পাহাড় ভেদ করে তারা গভীর গুহাভ্যন্তরেও প্রবেশ করতে পারে। সে জন্যেই পৃথিবীর সর্বত্র কস্‌মিক রশ্মির অবাধ গতি।

অক্সিজেন পরমাণুর ওজনকে ১৬ ধরে সে অনুসারে যে কোন মৌলিক উপাদানের পরমাণুর যে ওজন হয়, তারই নাম পরমাণবিক ওজন (Atomic weight)। দেখা যায় যে, বহু মৌলিক উপাদানের (কয়েকটি ছাড়া) পরমাণুর ওজন তার নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত নিউট্রন ও প্রোটনের যোগফল বা ভর সংখ্যার (Mass number) সমান বা প্রায় কাছাকাছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে একটি মাত্র প্রোটন আছে অথচ কোন নিউট্রন নেই, তাই তার পারমাণবিক ওজন ১-এর কাছাকাছি। হিলিয়াম পরমাণুর মধ্যে থাকে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন এবং নাইট্রোজেন পরমাণুতে আছে সাতটি প্রোটন ও সাতটি নিউট্রন। সে জন্যে তাদের পারমাণবিক ওজন যথাক্রমে ৪ ও ১৪।

এভাবে যে সকল পরমাণুর মধ্যে সমসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকে, তাদের নিউক্লিয়াস ভঙ্গুর নয় বলে তাদের স্থায়ী (Stable) উপাদান বলা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় কিম্বা সাইক্লোট্রন বা অ্যাটমিক পাইলের (Cyclotrone or Atomic pile) দ্বারা নিউক্লিয়ার প্রতিক্রিয়ার ফলে যদি কোন নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার মধ্যে অসামঞ্জস্য ঘটে অর্থাৎ প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রনের সংখ্যাধিক্য ঘটে, তাহলেই নিউক্লিয়াসের ভঙ্গুরতা দেখা দেয় এবং ঐ অবস্থায় উপাদানকে তেজস্ক্রিয় উপাদান (Radioactive element) বলা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্বাভাবিক স্থায়ী (Stable) কার্বনের পরমাণুর মধ্যে আছে ছয়টি করে প্রোটন ও নিউট্রন; সুতরাং তাকে বলা হয় C^{12}, কিন্তু যখন ঐ নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছয়টি নিউট্রনের বদলে আটটি নিউট্রনসহ ছয়টি প্রোটন থাকে, তখন তা হয় সক্রিয় রশ্মিযুক্ত C^{14}।

খনিগর্ভে কিংবা মাটির নীচে নানাস্থানে এরকম তেজস্ক্রিয় মৌলিক উপাদান দেখতে পাওয়া যায়, যেমন—রেডিয়াম, থোরিয়াম, মেসো-থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম, পলোনিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা আজ একদিকে যেমন এসব অমূল্য উপাদানকে অ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি প্রস্তুতির কাজে লাগিয়ে পৃথিবী ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছেন, আবার অন্যদিকে বিদ্যুৎ-শক্তির সৃষ্টি, কৃষির উন্নতি, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি নানা প্রকার লোক-হিতকর কাজে প্রয়োগ করে পৃথিবীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিরও চেষ্টা করছেন।

আগে ধারণা ছিল যে, কোন মৌলিক উপাদানের নিজ অবস্থা থেকে অন্য মৌলিক উপাদানরূপে রূপান্তর সম্ভব নয়, কিন্তু আজ আর সে ধারণা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে যে ইলেকট্রনসমূহ, তাদের সংখ্যার দ্বারাই যে কোন উপাদানের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্ণীত হয়। সে জন্যে সাধারণ হাইড্রোজেন H-এর সঙ্গে H^2-এর (ডয়টেরিয়াম বা ভারী হাইড্রোজেন) রাসায়নিক প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নেই—কেন না, উভয়ের পরমাণুর মধ্যেই আছে সমসংখ্যক ইলেকট্রন। আবার হাইড্রোজেনের তৃতীয় অবস্থায় H^3 (ট্রাইটিয়াম) রূপে তার নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটি প্রোটনসহ আছে দুটি নিউট্রন। এরূপ ভঙ্গুর অবস্থায় নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত একটি নিউট্রন থেকে একটি ইলেকট্রন ছিটকে বেরিয়ে যাওয়াতে তা রূপান্তরিত হয় প্রোটনে। সুতরাং একটি নিউট্রনসহ দুটি প্রোটন দিয়ে তৈরি হয় হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। আবার
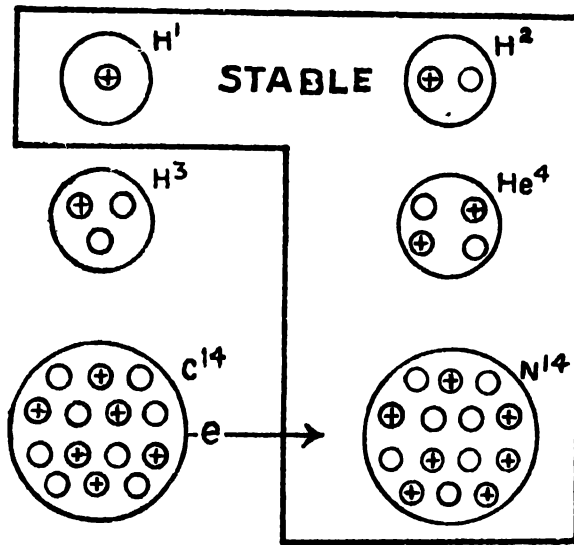
১নং চিত্র

স্থায়ী এবং অস্থায়ী (তেজস্ক্রিয়) পরমাণুর নিউক্লিয়াসের গঠন।

ঐভাবে সৃষ্ট প্রোটন নিউক্লিয়াসের পরিধি থেকে একটি ইলেকট্রনকে তৎক্ষণাৎ টেনে আনে এবং এভাবেই হাইড্রোজেনের রূপান্তর ঘটে স্থায়ী হিলিয়ামে (He^4)। একইভাবে তেজস্ক্রিয় (ভঙ্গুর) C^{14} নিউক্লিয়াস থেকে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যাওয়াতে একটি নিউট্রন তা হারিয়ে যখন প্রোটনে পরিবর্তিত হয়, তখন নিউক্লিয়াসের মধ্যে সাতটি করে প্রোটন ও নিউট্রনের উপস্থিতি-হেতু C^{14} তার রশ্মিসক্রিয়তা হারিয়ে স্থায়ী নাইট্রোজেন বা N^{14}-এ রূপান্তরিত হয়।

অস্থায়ী উপাদান নিউক্লিয়াস থেকে এভাবে ইলেকট্রনের বহিষ্কারের ফলে আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি নানা প্রকারের রশ্মি নির্গত হয়। প্রকার, ভেদ্যতা (Penetrating power) এবং ব্যাপকতা হিসেবে তাদের ক্রিয়াও বিভিন্ন।

অ্যাটম বা পরমাণু বুঝাতে সাধারণতঃ X_Z^W সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়। এখানে X হচ্ছে যে কোন মৌলিক পদার্থ, W তার পারমাণবিক ওজন এবং Z তার পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number) বা নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত প্রোটন ও তার বহিঃস্থ ইলেকট্রনের সংখ্যার সমষ্টি। আবার কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সমসংখ্যক নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত প্রোটন ও তৎবহিঃস্থ ইলেকট্রনযুক্ত অথচ নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রথমটির অপেক্ষা সংখ্যায় কম বা বেশী নিউট্রনযুক্ত অপর যে কোন পরমাণুই হলো তার আইসোটোপ (Isotope)। রাসায়নিক প্রকৃতি ইলেকট্রনের সংখ্যার (তথা পারমাণবিক সংখ্যা) উপর নির্ভরশীল বলে তাদের রাসায়নিক প্রকৃতি এক হলেও নিউট্রনের সংখ্যার ইতরবিশেষের জন্যে তাদের ভরেরও পার্থক্য ঘটে। প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রনের সংখ্যাধিক্যের ফলে আইসোটোপগুলিও অস্থায়ী বা তেজস্ক্রিয় (Radioactive) হয়। আবার নিউক্লিয়াসের মধ্যে সমসংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রনের উপস্থিতিতে তারাই আবার স্থায়ী আইসোটোপরূপে (Stable isotope) গণ্য হয়।

নানারকম কৃত্রিম উপায়ে স্বাভাবিক পরমাণু থেকে আইসোটোপ তৈরি করা সম্ভব। যে কোন স্বভাবজাত মৌলিক পদার্থের ভগ্নাংশীকরণ ও ঘনীভূত করণের ফলে স্থায়ী আইসোটোপ উৎপন্ন হতে পারে; যেমন—ভারী হাইড্রোজেনকে (H^2) জলে এবং ভারী নাইট্রোজেনকে (N^{15}) বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়, কিন্তু তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পাওয়া যায় নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর যন্ত্রের সাহায্যে, নিউট্রনের দ্বারা নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে (Bombardment) অথবা সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে একই ভাবে কণিকাগুলির গতিবেগের তীব্রতা বৃদ্ধি (Accelerate) করে। যেমন,

$$S_{16}^{32} + N_0^1 \longrightarrow P_{15}^{32} + H_1^1$$
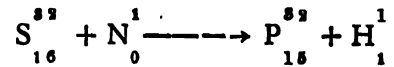
নিউট্রনের আঘাতের ফলে কিভাবে স্বাভাবিক সালফার (গন্ধক) থেকে একটি প্রোটন বহির্গত হওয়াতে তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস উৎপন্ন হয় উল্লিখিত সঙ্কেতে তাই দেখানো হয়েছে।

কিন্তু অস্থায়ী বলে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস থেকে যখন একটি ইলেকট্রন ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়, তখন আবার P^{32} পূর্বতন স্বাভাবিক সালফার (S^{32})-এ রূপান্তরিত হয়; যথা,

$$P_{15}^{32} \longrightarrow S_{16}^{32} + e_{-1}^{0}$$
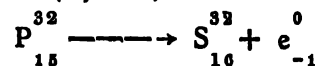
তেজস্ক্রিয় পরমাণু বা তার আইসোটোপ থেকে ইলেকট্রনের বহিষ্কারকালে তাথেকে বিটা রশ্মি নির্গত হয়। কোন কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে মাত্র কয়েক ইলেকট্রন ভোল্ট পরিমিত শক্তি নির্গত হলেও অপর কোন কোন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে সজোরে অত্যধিক পরিমাণে (এক লক্ষ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ পরিমিত) ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত শক্তির বহিষ্কার ঘটতে পারে। তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাস থেকে এভাবে নির্গত শক্তি প্রায় ৮৫০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্টের মত।

যে কোন শোষণক্ষম মাধ্যমে (যেমন দেহকলা) পরমাণু থেকে বিচ্ছুরিত ইলেকট্রনগুলি প্রতিহত হয় বলে উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন বিটা রশ্মির যখন কলাকোষে অনুপ্রবেশ ঘটে, তখন সেখানে আয়নীভবন (Ionisation) ঘটে এবং ঐ স্থানে কিছুদূর এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয়। স্বল্প শক্তিসম্পন্ন বিটা রশ্মি কলার মধ্যে কতকটা এগিয়ে যেতে পারলেও তীব্র শক্তিসম্পন্ন রশ্মি মাত্র এক সেন্টিমিটার বা ততোধিক গভীরতায় অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে। সে কারণেই উচ্চ শক্তিসম্পন্ন আলফা কণিকাগুলি মাত্র কয়েক মাইক্রন গভীরতায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয়—সুতরাং ত্বকের অঙ্কুর-স্তর (Germinating layer) পর্যন্ত অনুপ্রবেশের অক্ষমতার জন্যে দেহের পক্ষে খুবই কম ক্ষতিকর। কিন্তু আলফা রশ্মি উৎপাদক কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা আইসোটোপকে মুখে খেতে দিলে দেহের যে সকল কোষ তার সংস্পর্শে আসবে, তাদের সমূলে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

এভাবে বিচ্ছুরিত গামা রশ্মি নামে আর এক

Electron (Beta ray) ●(−) Proton ⊕ Neutron ○ Gamma ray Alpha ray

Absorbing medium
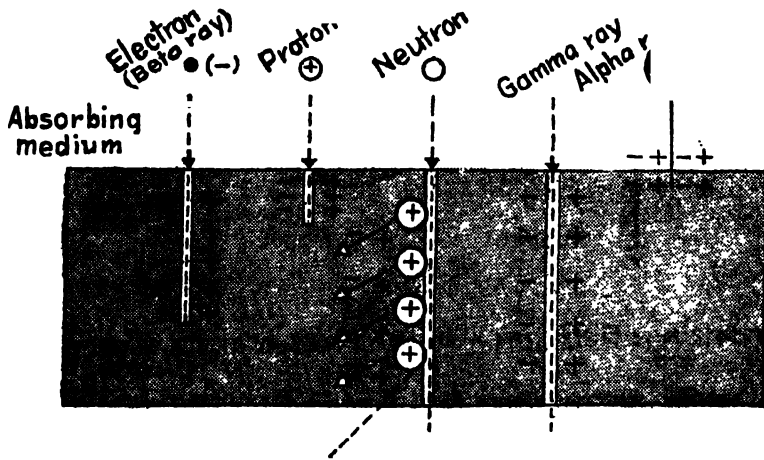
২নং চিত্র
বিভিন্ন প্রকারের তেজস্ক্রিয় রশ্মির দেহকলায় ভেদ্যতা

আবার কতকগুলি তেজস্ক্রিয় বৃহদাকারের পরমাণুর ধ্বংসের ফলে আলফা কণিকা অর্থাৎ দুটি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত দুটি করে প্রোটন ও নিউট্রনসহ হিলিয়াম নিউক্লিয়াস বহির্গত হয়। তাথেকে বিচ্ছুরিত আলফা রশ্মির দ্বারা কলার মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে আয়নীভবন ঘটে। আলফা কণিকাগুলি ইলেকট্রনের চেয়ে আকারে সাত হাজার গুণ বড় বলে কলার মধ্যে তাদের খুবই কম অনুপ্রবেশ ঘটে এবং ধনাত্মক দুটি তড়িতের উপস্থিতিতে তাদের গতিও একটি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কণিকা অপেক্ষা অর্ধেক হয়ে যায়। প্রকারের রশ্মি আছে, আসলে তা এক্স-রশ্মিই (X-ray)। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম থেকে তা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং এখনও তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে বিচ্ছুরিত গামা রশ্মি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তড়িৎ-চুম্বক রশ্মি নামে বহু স্থলে ব্যবহৃত হয়।

তাছাড়া নিউট্রন রশ্মি নামে আর এক প্রকারের রশ্মিও উৎপন্ন হয়। সাধারণতঃ স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে তার উদ্ভব না হলেও সাইক্লোট্রন বা অ্যাটমিক পাইলের সাহায্যে তার উৎপাদন সম্ভব। নিউক্লিয়াসের

নিউট্রনের প্রবেশের ফলে তার তেজস্ক্রিয়তা ঘটে, আবার তা থেকে আয়নীভবন সহায়ক বিভিন্ন প্রকারের বিচ্ছুরিত তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা গৌণভাবে কণাসমূহের মধ্যে আয়নীভবন সংঘটিত হয়।

যায়। সুতরাং ছোট ছোট নিউক্লিয়াসের দ্বারা নিউট্রন প্রতিহত হলেও বৃহদাকার নিউক্লিয়াসের দ্বারা সে রকম কিছু হয় না। সে কারণেই সাইক্লোট্রন বা অ্যাটমিক পাইলে যখন নিউট্রনের উদ্ভব হতে থাকে, তখন তার চারদিকে
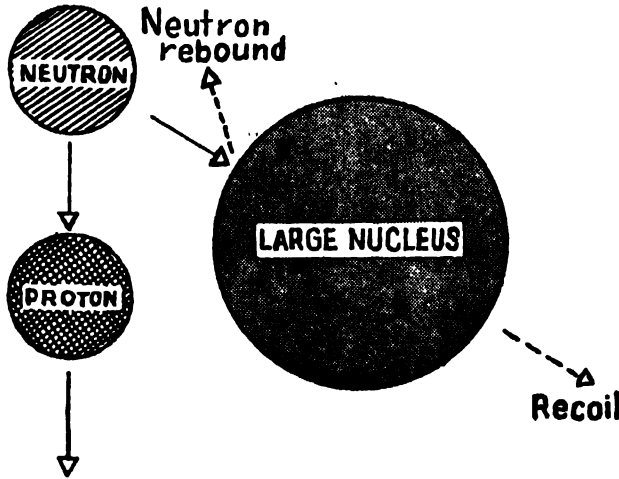
৩নং চিত্র
বৃহদাকার অপর নিউক্লিয়াসের সংঘাতের পর নিউট্রনের ব্যাঘাত ও পশ্চাদপসরণ।

বড় বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত সীসার বর্মাবরণের চেয়ে অসংখ্য ছোট ছোট হাইড্রোজেন আয়নযুক্ত জলের বর্মাবরণ অধিকতর কার্যক্ষম।

উপরিউক্ত যন্ত্রগুলির সাহায্যে কোন নিউ-ক্লিয়াস থেকে বহির্গত একটি নিউট্রন যখন অপর কোন বৃহদাকার নিউক্লিয়াসে আঘাত করে, তখন তা লাফিয়ে সরে না গিয়ে তার নিজের শক্তির কিয়দংশ প্রথমটিকে দিয়ে দেয় এবং তারপর নিজের অবশিষ্ট বেশীর ভাগ শক্তি নিয়ে কিছুটা পশ্চাৎ দিকে কিংবা তির্যকভাবে সরে

একটি নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসকে হিলিয়াম-নিউক্লিয়াসরূপ বোমার দ্বারা আঘাত করলে মুহূর্তের সংঘাতের ফলে যে একটি প্রোটনের বিমুক্তি ঘটে, তা আবহমণ্ডল থেকে একটি
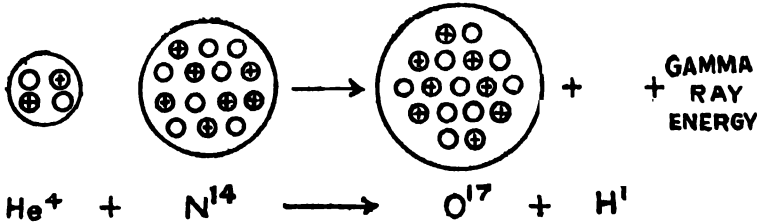
৪নং চিত্র
পারমাণবিক সক্রিয়তার ফলে গামা রশ্মির উৎপত্তি।

ইলেকট্রন টেনে নিয়ে হাইড্রোজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়, আর অবশিষ্ট অংশের পরিবর্তন ঘটে O^{17} (অক্সিজেন) পরমাণুতে। এরূপ অদল-বদলের সময়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভরের অবলুপ্তির ফলে কিছুটা গামা রশ্মিরূপ শক্তির উদ্ভব হয়।

বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন প্রকারের তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলি ধরা পড়ে, যেমন—সিন্টিলেশন কাউন্টার (Scintillation Counter) এবং গাইবার-মূলার কাউন্টার (Geiger-Müller Counter) যন্ত্রে যথাক্রমে বিটা ও গামা রশ্মির প্রকৃতি ও পরিমাণ জানা যায়।

ক্রমাগত রশ্মিগুলির বহিষ্কার ও বিচ্ছুরণের ফলে তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলির নিয়তই ক্ষয়বিকৃতি ঘটে। ক্যান্সার রোগের রশ্মি-চিকিৎসার জন্যে আজ যে রেডিয়াম ধাতু ব্যবহৃত হচ্ছে, দু-হাজার বছর পরে তার স্বাভাবিক রূপান্তর ঘটবে অতি সাধারণ ধাতু সীসাতে এবং তখন আর তার মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার লেশমাত্র থাকবে না। যে কোন স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পরমাণু বা কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পরমাণুর ঐভাবে কম-বেশী সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার বিলোপই তার স্বাভাবিক পরিণতি। সুতরাং তাদের সক্রিয় তেজস্ক্রিয়তার অর্ধেক এভাবে কত কালে নষ্ট হয়ে যায়, তারই উপর তার প্রয়োগের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এটুকু কালের নামই তেজস্ক্রিয় উপাদানের অর্ধেক জীবনকাল বা আয়ু (Half life)। পদার্থভেদে এই কালের আকাশ-পাতাল তারতম্য দেখা যায়। যেমন—রেডিয়ামের বেলায় তা হচ্ছে ১৬২২ বছর, তেজস্ক্রিয় কার্বন-এর (C^{14}) পক্ষে ৫১০০ বছর, ট্রাইটিয়ামের ১২·১ বছর, তেজস্ক্রিয় সোডিয়ামের (Na^{24})-১৪·৮ ঘণ্টা, তেজস্ক্রিয় ফস্‌ফরাসের ১৪ দিন, তেজস্ক্রিয় আয়োডিনের (I^{131})-৮ দিন এবং অন্য আইসোটোপের (I^{130}) মাত্র আধঘণ্টা।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে একদিকে যেমন রোগের চিকিৎসা, কৃষির উন্নতি প্রভৃতির সুবিধা হয়েছে আবার তেমনি তরু-লতা, জীব-জন্তু, পাথর, খনিজই নয়, মানবদেহ সম্বন্ধেও বহু অজ্ঞাত কার্যকারণ-সংযোগ এবং বিপাকজনিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ জানা সম্ভব হয়েছে। আগে যা ছিল ধারণামাত্র, একদিকে যেমন কোন কোন স্থলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে, আবার তেমনি অনেকগুলি ভ্রান্ত বলেও পরিত্যক্ত হয়েছে। দেহের বিপাক সংক্রান্ত অনুসন্ধান এবং গবেষণায় যাতে যে কোন পরমাণুর দেহে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে কি ভাবে কোথায় বারবার রূপান্তর ঘটে এবং পরিণামে কি ভাবে দেহ থেকে তা নির্গত হয়, তা জানবার জন্যে ঐ বিশেষ পরমাণুটির উপর তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের একটি পরিচিতিসূচক লেবেল এঁটে দেওয়া হয়, যাতে শরীরের মধ্যে যখন যে দিকে যাবে, তখনই তা রশ্মিধর যন্ত্রে ধরা পড়বে। এরূপ উদ্দেশ্যে প্রয়োগের জন্যে আইসোটোপটির যথোপযুক্ত অর্ধেক আয়ু এবং তাথেকে বিচ্ছুরিত কণিকারও যথোপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। যদি প্রথমটি অত্যন্ত কম হয়, তাহলে তার সক্রিয়তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে, আবার যদি তা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে দীর্ঘকাল ধরে তার সক্রিয়তা চলতে থাকলে দেহের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আবার তাথেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, তাহলে হয়তো বা সাধারণ যন্ত্রে তার উপস্থিতি ও পরিমাণ ধরাই যাবে না।

যে কোন স্বাভাবিক পরমাণু যে পথে দেহের মধ্যে চলাচল করে, প্রথমে অপরিবর্তিত ও পরে পরিবর্তিত অবস্থায় আইসোটোপের ছাপ মারা পরমাণুযুক্ত ঐ অণুটি প্রায়শঃ সেই পথেই যাতায়াত করে এবং ঐটুকু যৎসামান্য তেজস্ক্রিয়তা-যুক্ত পরমাণু দেহকোষের কোন ক্ষতিই করে না, এই হলো প্রচলিত ধারণা।

ঘি, মাখন প্রভৃতি যে সকল স্নেহপদার্থ আমরা খাই, সেগুলি সাধারণতঃ তিনটি মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বনের দ্বারা গঠিত একটি জৈব যৌগিক পদার্থ। খাবার আগে যদি কোন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তার নিজস্ব মৌলিক পদার্থের পরিবর্তে (যেমন হাইড্রোজেনের পরিবর্তে ট্রাইটিয়াম বা H^3, কিংবা কার্বনের পরিবর্তে C^{14} কিংবা অক্সিজেনের পরিবর্তে O^{17} বা O^{18}) সংযুক্ত করা হয়, তাহলে ঐ তেজস্ক্রিয় ছাপের সাহায্যে বুঝতে পারা যায় যে, আমাদের গৃহীত স্নেহপদার্থের পরিণামে রূপান্তর ঘটে নিম্নলিখিত ভাবে—

(১) কতকাংশ দেহের নানা অংশে চর্বি বা মেদের আকারে জমা হয়,

(২) কতকাংশ ফস্‌ফোলিপিডে রূপান্তরিত হয়,

(৩) সম্পৃক্ত ষ্টিয়ারিক অ্যাসিডের কতকটা অসম্পৃক্ত অলিক অ্যাসিডে এবং অপর অংশ থেকে দুটি কার্বন পরমাণু বিচ্যুত হয়ে আর একটি সম্পৃক্ত স্নেহ অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয় এবং

(৪) হ্রস্ব শৃঙ্খলযুক্ত (৪ অথবা ৬ কার্বন পরমাণু-গঠিত) স্নেহ অ্যাসিডগুলি সঞ্চিত না হয়ে ত্বরায় দগ্ধীভূত হয়।

ঠিক একই ভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড মেথিয়োনিনকে আইসোটোপ S^{35}-এর সাহায্যে চিহ্নিত করে শরীরে ঢুকিয়ে দেখা গেছে যে, তাথেকে প্রয়োজনমত অপর দুটি গন্ধকযুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড সিস্টিন ও সিস্টাইনের যে কোনটি সহজেই তৈরি হয়। সুতরাং সিস্টাইন একটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড (Essential amino acid), তা যে ভুল ধারণা
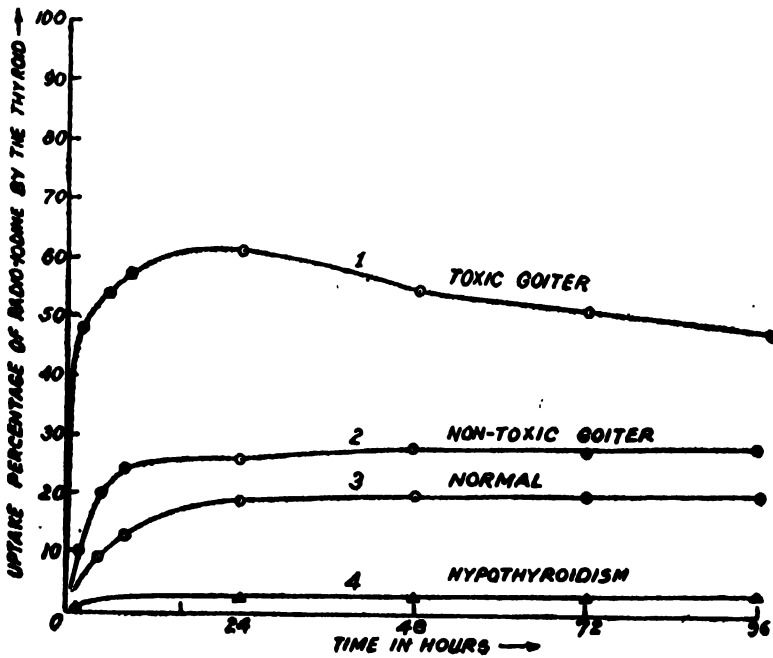
৫নং চিত্র

রেডিও আয়োডিনের সাহায্যে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের অবস্থা ও সক্রিয়তা নির্ণয়।

এবং তার পরিবর্তে মেথিয়োনিনই যে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড, তা প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা খাদ্যের সঙ্গে যেটুকু আয়োডিন খাই, রক্তের দ্বারা বাহিত হয়ে তার অধিকাংশই গলদেশস্থ থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে। সেই কারণে পটাসিয়াম আয়োডাইডের সঙ্গে রেডিয়োআয়োডিন (I^{131}) খেতে দিয়ে তার কতটা ২৪, ৪৮, ৭২ এবং ৯৬ ঘণ্টা পর পর থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে, তার লেখ দেখে ঐ গ্ল্যাণ্ড স্বাভাবিক, স্বল্পক্ষরণশীল (Hypothyroidism), গ্ল্যাণ্ডের অর্বুদ (Nontoxic goiter) কিংবা বিষাক্ত ক্ষরণশীল অর্বুদ (Toxic goiter)—তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। এসব স্থলে বিচ্ছুরিত গামা রশ্মিগুলির পরিমাণ নির্ণীত হয় গাইগার-মূলার কাউণ্টারের সাহায্যে।

আবার এরূপ একমাত্রা আইসোটোপের সাহায্যে শেষোক্ত রোগ প্রতিপন্ন হলে সপ্তাহে দু-বার করে পর পর কয়েকবার তিন মিলিকুরী পরিমিত I^{131} খেতে দিলে থাইরয়েডের স্বাভাবিক অবস্থা আবার ফিরে আসে। এই তেজস্ক্রিয় আয়োডিন থাইরয়েডের মধ্যে সঞ্চিত থেকে অত্যধিক সক্রিয় কোষগুলির উপর বাইরে থেকে গভীর এক্স-রশ্মির (Deep x-ray) দ্বারা যেমন হয় তেমনি ক্রিয়া হতে থাকে ও অস্বাভাবিক সক্রিয়তা ব্যাহত হয়।

যে সকল দেহাংশে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা সঞ্চিত হয়ে থাকে, যেমন I^{131} থাকে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের মধ্যে কিংবা P^{32} থাকে হাড়ের মধ্যে, তাদের মধ্যে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় রশ্মির সহজেই ফটোগ্রাফ নেওয়া চলে। একটি বিশেষ আধারের মধ্যে রৌপ্য-লবণের প্রলেপযুক্ত প্লেট রেখে তাকে ঐরূপ দেহাংশে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত বেঁধে রেখে দিলে ঐরূপ বর্তমান তেজস্ক্রিয় রশ্মির যে ছাপ তার উপর পড়ে, তাকে বিশেষ প্রথায় (যেমন ফটোগ্রাফাররা করেন) ধুয়ে নিয়ে ঐ নিগেটিভ থেকে তার যথাযথ আলোকচিত্র পাওয়া যায়। এরই নাম রেডিয়ো-অটোগ্রাফ (Radio-autograph)।

রোগ-প্রতিকার সম্পর্কে আয়ুর্বেদের ধারণা

শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল

সবলের কখনও কারো নিকট থেকে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। হীনবল সর্বদাই সবলের নিকট থেকে দূরে থাকতে চায়। যদি অবশ্য দৈবাৎ হীনবল সবলের প্রভাবের মধ্যে এসে পড়ে, সে ক্ষেত্রেও হীনবল সবলের চাপে পড়ে পর্যুদস্ত হয়। এসব অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যাপার। সুপ্রতিষ্ঠিত এই সব তথ্য প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকদের নিকট অপূর্ব তাৎপর্য নিয়ে নতুন আলোকে প্রতিভাত হয়েছিল, একথা মনে হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এরূপ বলবত্তাকেন্দ্রিক একটি তত্ত্ব সর্বপ্রকার রোগ-প্রতিকারের উপায় অবলম্বনের পথে তাঁদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও বুদ্ধি জুগিয়েছে। কীট-পতঙ্গ, ইট-কাঠ প্রভৃতি যাবতীয় চেতন ও অচেতন পদার্থ অপেক্ষা মানুষের দেহ ও মনে রোগ আক্রমণের আশঙ্কা বেশী। সে জন্যে 'শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্' বলে ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে একটি প্রবচন প্রচলিত আছে। শরীরের ক্ষেত্রে বিরাজমান যথোপযুক্ত পরিবেশে রোগের কারণসমূহ যে স্বচ্ছন্দে সঞ্চালিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে, সেই তথ্যটি তাঁদের জানা ছিল বলে তাঁরা সতর্ক প্রহরায় সর্বথা শরীরকে দুর্গের মত রক্ষা করবার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং শরীররূপ দুর্গকে যতটা সম্ভব বলীয়ান করাই আয়ুর্বেদের মতে রোগ-প্রতিকারের প্রথম ও মুখ্য স্বীকার্য।

রোগ ও চিকিৎসা

আয়ুর্বেদে রোগ বলতে সাধারণভাবে কি বোঝানো হয়েছে, তা জানা প্রয়োজন। রুজতীতি রোগঃ অর্থাৎ যা কিছু আমাদের যন্ত্রণা দেয়, তাকেই রোগ বলা হয়। শারীরিক বা মানসিক যে কোন প্রকার রুগ্ন দশায় পতিত হলে বিভিন্ন মাত্রা ও তীব্রতায় যন্ত্রণা বা বেদনা অনুভূত হবেই—যন্ত্রণা বা বেদনা ভিন্ন কোন রোগের কথা ভাবা যায় না। আয়ুর্বেদে সে জন্যে শরীর ও মনের যন্ত্রণা, বেদনার কারণকেই সাধারণভাবে রোগ বলা হয়।

যন্ত্রণা ও ক্লেশের কবলে যাতে না পড়তে হয় এবং কোন কারণে যন্ত্রণার কবলে পরলে তাথেকে যাতে অব্যাহতি পেতে পারা যায়, সে বিষয়ে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আদৌ যাতে তাদের কবলে না পড়তে হয়, সে জন্যে যে সব বিধি-ব্যবস্থা আছে সেগুলি প্রতিরোধকমূলক (Preventive) এবং কবলে পড়লে তাথেকে উদ্ধার পাবার যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়, সেগুলি প্রতিকারমূলক। এই দুটি প্রধান শ্রেণীতে রোগের প্রতিবিধান সম্পর্কে আয়ুর্বেদে পরিকল্পনা দেওয়া আছে।

রোগ-উৎপাদক কারণসমূহ অপসারণ করবার উদ্দেশ্যে এই সকল বিধি-ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বন করবার ব্যাপারকেই চিকিৎসা বলা হয়। অমর-কোষের মতে, ব্যবস্থা অবলম্বন করা অর্থে প্রচলিত 'কিৎ' ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন চিকিৎসা শব্দটির অর্থ রোগ-প্রতিকার। সুশ্রুতের মতানুসারে রোগজনক কারণ অপসারণের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা চিকিৎসা হিসাবে গণ্য। কিন্তু চরক কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করতেন। রোগোৎপত্তির কারণ অপসারিত হলেই রোগ সব সময়ে সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় না। বহুক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, রোগের কারণ দূরীভূত হলেও রোগের

প্রভাব সক্রিয় থেকে যায়। সুতরাং চরকের এই অভিমত অনুসারে রোগোৎপত্তির কারণসমূহ সমূলে উৎপাটন করা তো বটেই, অধিকন্তু সেই সঙ্গে রোগের প্রভাবকে নিঃশেষে বিনাশ করাকেই চিকিৎসা বলা হয়। বায়ু, পিত্ত এবং কফ নামক ত্রিদোষের বিকার ঘটলে রুগ্ন দশার কারণ-সমূহ বিরাজমান হতে লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং সকলের কর্তব্য, ত্রিদোষের বৈষম্য বা বিকার পরিহার করে চলা, ত্রিদোষের সমতা যাতে স্থায়ী ও স্বাভাবিক থাকে, তার চেষ্টা করা এবং বাঞ্ছনীয় সামঞ্জস্য বা সমতা বিঘ্নিত বা বিচলিত হলে তাকে সমভাবাপন্ন করা ও বিকারগত বৈষম্য দূর করে তাদের স্বাভাবিক বা সমতা ফিরিয়ে আনা। এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের ব্যাপারকেই ব্যাপক অর্থে চিকিৎসার মধ্যে পরিগণিত করা হয়।

প্রতিরোধকমূলক বিধি-ব্যবস্থা

যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বাস্থ্য অটুট রাখতে অভিলাষী হয়, আহার-বিহার অর্থাৎ খাদ্য, চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারের প্রতি তার সর্বদা সতর্ক থাকা ও যত্নশীল হওয়া একান্ত অপরিহার্য। শরীরকে মন্দির বা দুর্গরূপে কল্পনা করা হলেও সেটি কখনও একস্থানে স্থির নয় বরং সেটি সতত বর্ধনশীল, গতিশীল অবস্থায় আমৃত্যু বিরাজমান। যখন যেভাবে ও যেখানে চলাফেরা করা হয়, সেই পরিস্থিতি ও পরিবেশ শরীর ও মনের উপর অত্যন্ত নিবিড় ও ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই সকল বিবেচনা করে আয়ুর্বেদে দৈনন্দিন কৃত্যাদি, যথা—আহার-বিহার নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার নির্দেশ দেওয়া আছে। পালনীয় এইরূপ নির্দেশাবলী দিনচর্যা (Daily conduct) নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ দু-একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, প্রাতঃকালে মলমূত্রাদি ত্যাগ, দাঁত মাজা, তৈল মর্দন করে স্নান, চুলের প্রসাধন, ক্ষুধা উদ্রিক্ত করে যথানির্দিষ্ট সময়ে দুবার আহার (পূর্বের ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হলেই পরের আহার গ্রহণীয়), আহারের সময়ে যথারীতি উপবেশন ও যথাবিহিত আহার্য ও পানীয় গ্রহণ। বিশ্রাম ও ব্যায়াম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরিধান, দিবানিদ্রা (কেবল অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে না পড়লে) পরিহার, এবং যথাসময়ে রাত্রে নিদ্রা যাওয়া ও সূর্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্বে শয্যাত্যাগ। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর যৌন সম্পর্ক অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করবার নির্দেশ আছে এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট দিবসে ও প্রাতঃকালে যৌন-সংসর্গ নিষিদ্ধ করা আছে। যৌন-সংসর্গের পর দুগ্ধ পানের বিধিও লক্ষণীয়। ব্যায়াম, রাত্রি জাগরণ, পথশ্রম ও স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি কার্য অতিরিক্ত করা অনুচিত। সিংহ যেমন অতি বলশালী হাতীকে আক্রমণ করলে নিজেই বিনষ্ট হয়, কোন ব্যক্তি বলাতিরিক্ত ব্যায়াম, স্ত্রী-সংসর্গ প্রভৃতি কাজ করলে বিনষ্ট হয়। জন্মশাসনের জন্যে এইরূপ বিধি-নিষেধ কতদূর সহায়ক, বর্তমান পরিস্থিতিতে সে কথা চিন্তা করে দেখলে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের দূরদর্শিতায় অবাক হতে হয় বৈকি! সপ্তাহে একবার বমনকারক (Emetic) এবং মাসে একবার বিরেচক (Purgative) প্রতিষেধক গ্রহণ করা উচিত।

মনে সর্বদা প্রফুল্ল ভাব রাখা উচিত, তবেই মানসিক বিকার ঘটতে পারে না। সম্পদ ও বিপদকালে সমচিত্ত হওয়া উচিত, অর্থাৎ সম্পদে অনুরক্ত এবং বিপদে বিষণ্ণ হওয়া নিষিদ্ধ। একাকী সুখী হওয়া অনুচিত। বুদ্ধিমান লোক যেমন ব্যবহার করেন, সেই প্রকার ব্যবহার কর্তব্য। সকল জীবে দয়া, দান এবং কায়, বাক্য ও চিত্তের দমন, পরের প্রয়োজনে

স্বার্থবুদ্ধি অর্থাৎ পরের কাজ নিজের ভেবে সম্পাদন করা—এইগুলি শ্রেষ্ঠ সদাচার। সম্প্রতি আমার দিনরাত্রি কিভাবে অতিবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ আমার কাজ ভাল কি মন্দ হচ্ছে—এই বিষয় সর্বদা স্মরণ করলে মানুষ কখনও দুঃখ ভোগ করে না। অতি সংক্ষেপে এই কয়টি সদাচার 'দিনচর্যা' থেকে উল্লেখ করা হলো। যিনি এই সকল সদাচার পালন করেন, তিনি আয়ু, আরোগ্য, যশ, গৌরব ও ঐশ্বর্য লাভ করেন।

মাসে মাসে আবহাওয়া ও পরিবেশের পরিবর্তন ঋতুচক্রের মধ্যে প্রতিফলিত। ঋতুর প্রভাব শরীর ও মনের উপর যে নিবিড়, সে কথা বিবেচনা করে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে পালনীয় নির্দেশ আয়ুর্বেদে আছে। হেমন্ত (অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৫ নভেম্বর—১৫ জানুয়ারী) ও বর্ষা (শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৫ জুলাই—১৫ সেপ্টেম্বর) কালে বিশেষভাবে মেঘাচ্ছন্ন ও ঝঞ্ঝাসঙ্কুল দিবসে বায়ু স্বভাবতঃ প্রকুপিত (বর্ধিত) হয়; গ্রীষ্ম (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৫ মে—১৫ জুলাই) ও শরৎ (আশ্বিন-কার্তিক, ১৫ সেপ্টেম্বর—১৫ নভেম্বর) কালে পিত্ত স্বভাবতঃ প্রকুপিত হয় এবং শীত (মাঘ-ফাল্গুন, ১৫ জানুয়ারী—১৫ মার্চ) ও বসন্ত (চৈত্র-বৈশাখ, ১৫ মার্চ—১৫ মে) কালে কফ স্বভাবতঃ প্রকুপিত হয়। এই সকল অবস্থাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে পথ্যাদি গ্রহণ ও চাল-চলনের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট আছে। এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে কালান্তর ঘটবার সময় ঋতুসন্ধি। সন্ধিকাল পূর্ব ঋতুর শেষ এক সপ্তাহ ও পরবর্তী ঋতুর প্রথম এক সপ্তাহ। সন্ধিকালে ধীরে ধীরে পূর্ব ঋতু নির্দিষ্ট বিধি ত্যাজ্য এবং পরবর্তী ঋতু নির্দিষ্ট বিধি পালনীয়। কারণ হঠাৎ অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত পালন করলে রোগের কারণ ঘটতে পারে। অতএব সহসা অভ্যস্ত বর্জনীয় ও অনভ্যস্ত বিধি পালনীয় নয়। এই সকল বিধি-ব্যবস্থা আয়ুর্বেদে ঋতুচর্যা (Seasonal conduct) নামে পরিচিত। একটু ভাবলেই বুঝা যায় যে, চিন্তাশীল বিজ্ঞানীর মত আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণ সর্বদিক ব্যাপক ও গভীরভাবে বিবেচনা করে প্রকৃতি ও পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তনের সঙ্গে ক্রমিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে আহার-বিহার, চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে পালনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলার বিধান দিতেন।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র নামক সপ্ত-ধাতুতে গঠিত দেহের ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিনিয়তই ঘটছে। তা পূরণ করা একান্তভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি যাতে সপ্ত-ধাতুগুলি যথোপযুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থেকে দেহের অখণ্ডতা ও বলের কারণস্বরূপ হতে পারে, সেদিকে নজর রাখাও কর্তব্য। এই সকল উদ্দেশ্যে সপ্তধাতু পরিচর্যার উপায় হিসাবে যে সব বিধি-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট, তা পালন করলে বল ও সজীবতা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘায়ুর কারণ ঘটে। রসাদি ধাতু-সমূহের পোষণ ও পরিচর্যার (অয়নের) ব্যবস্থাকে সাধারণভাবে 'রসায়ন' বলা হয়ে থাকে। রসায়নের ফলে দেহে বাঞ্ছিত বলমাত্রা বজায় থাকে এবং রোগ আক্রমণের আশঙ্কা সুদূরপরাহত হয়। তাছাড়া দেহের লাবণ্য ও কান্তি সবিশেষ বর্ধিত হয়ে লোকের আদরণীয় ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখযোগ্য, বর্ষায় সৈন্ধব লবণ, শরৎকালে চিনি, হেমন্তে শুঁঠ, শীতে পিঁপুল, বসন্তে মধু এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়সহ হরিতকীচূর্ণ, হরীতকী রসায়ন (বা ঋতু হরিতকী নামে যা পরিচিত) নিয়মিত সেবন করলে জরা-ব্যাধির আক্রমণ ঘটে না। তাছাড়া দেহের পুষ্টি, বল ও কান্তি লাভ হয়ে থাকে।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা

রসাদি সপ্ত-ধাতুর ক্ষয়-ক্ষতিজনিত রোগে ক্ষতিগ্রস্ত রসাদি ধাতুর বদলে সরাসরি সেই সেই

ধাতুর যোগসাধন করবার রীতি ও পদ্ধতি আয়ুর্বেদে উল্লিখিত আছে। ক্ষয়রোগে আক্রান্ত রোগীর রক্তক্ষরণ বা রক্তবমন ঘটলে ছাগ, হরিণ, ও শশকের রক্তপান করবার ব্যবস্থা দিয়ে রক্তের পূরণ করা আয়ুর্বেদের একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঙ্গ। আধুনিক কালে প্রচলিত রক্তপ্রদান প্রণালীর সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। ক্ষয়রোগীর পক্ষে মাংস, অস্থি ও মজ্জা ধাতুসমূহের ক্ষয় রোধ করতে ছাগ-মাংস, ছাগ-অস্থি, (তরুণ অংশ, Cartiledge) ও ছাগ-মজ্জা (অস্থি-র অন্তর্গত সুষির অংশ) সেবনের বিধি তাৎপর্যপূর্ণ এবং দ্রুত রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। অস্থি-ক্ষয় রোধের জন্যে ছোট ছোট মাছ, যেমন—মৌরালা, পুঁটি ইত্যাদি কাঁটা সমেত চিবিয়ে খেলেও চলে।

ত্রিদোষের পরিপ্রেক্ষিতে রোগ নির্ণয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার প্রথম ও মূল কথা। এইভাবে রোগ নির্ণীত হলে জানা যাবে, রোগের কারণ বা দোষ, বৈষম্য কি বৈষম্যজনিত প্রভাবে উদ্ভূত রোগের লক্ষণসমূহ কিংবা উভয়ই দূর করতে হবে। তাছাড়া রোগ সহজে নিরাময়-যোগ্য, কৃচ্ছ্রসাধ্য বা কষ্টে নিরাময়যোগ্য অথবা অসাধ্য বা আদৌ নিরাময়যোগ্য নয়, এসব তথ্যও অবগত হওয়া যাবে। শেষোক্ত শ্রেণীর রোগের চিকিৎসা আদৌ গ্রহণ করা হয় না বা হলেও তাকে কেবলমাত্র যাপ্য বা সহনশীলতার সীমার বশে আনবার জন্যেই করা হয়ে থাকে।

রোগমাত্রেই বায়ু, পিত্ত ও কফের বিকারের ফলে ঘটে, পূর্বেই একথা বলা হয়েছে।* ফলে তাদের মধ্যে বিরাজমান সাম্য বিচলিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সমতা ফিরে না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত রোগীর বল ও সহনশীলতার মধ্যে উপবাস, দাস্ত ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়ে রোগের প্রতিকার করা হয়। প্রত্যেকটি রোগে আক্রান্ত রোগীর লক্ষণসমূহ অতি সহজ ও সরলভাবে আয়ুর্বেদে লিপিবদ্ধ আছে। এই সকল লক্ষণ অপসারিত হলেই বুঝতে হবে, ত্রিদোষের সমতা পুনরায় ফিরে আসবার পথে। এই পথে চালিত চিকিৎসার বিধি-ব্যবস্থাকে সাধারণতঃ সংশোধন বা রোগের অপসারণ বলা হয়। বমন (Use of emetic), বিরেচন (Purging), শিরো-বিরেচন (Errhine) আস্থাপন ও অনুবাসন বস্তি (Enema) নামক পাঁচটি উপায়ে সংশোধন কার্য করা হয়ে থাকে এবং একত্রে উপায়গুলি পঞ্চকর্ম নামে পরিচিত। সংশোধনই সাধারণতঃ চিকিৎসার প্রাথমিক ধাপ এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই উপায়ে আরোগ্যলাভ হয়ে থাকে। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সংশোধন চিকিৎসাতে আরোগ্যলাভ সম্পূর্ণ হয় না। সে জন্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগের কারণ ও রোগ সমূলে বিনাশের জন্যে প্রশমন-মূলক যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাকে সংশমন (Palliative) বলা হয়। চিকিৎসার এইরূপ উভয়বিধ পর্যায়েরই মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু বায়ু, পিত্ত, কফের বিকৃতি দূর করা ও তাদের সাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার তত্ত্ব

যত মতের চিকিৎসা সম্ভব বা প্রচলিত আছে, সেগুলির মৌলিক ভাবধারণার ইঙ্গিত আয়ুর্বেদে নিহিত দেখা যায়। তত্ত্বগতভাবে দুই প্রকার চিকিৎসার উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—বিপরীত চিকিৎসা এবং তদর্থকরী চিকিৎসা। বিপরীত চিকিৎসার মধ্যে অ্যালোপ্যাথি মতের এবং তদর্থকরী চিকিৎসার মধ্যে হোমিও-প্যাথি মতের ইসারা পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ধরণের চিকিৎসাকে পুনরায় বিশদভাবে তিন-তিনটি উপশ্রেণীভুক্ত করা হয়। বিপরীত চিকিৎসার

* 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসের ১১ সংখ্যাতে 'রোগোৎপাদন সম্পর্কে আয়ুর্বেদের ধারণা' শীর্ষক বর্তমান লেখকের প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য।

(১) 'হেতু বিপরীত' মতে, রোগের হেতু বা কারণের বিপরীত ধর্মী দ্রব্যাদি, যেমন—ঔষধ, পথ্য এবং বিহার (চালচলন) অভ্যাস করে কারণ দূর করবার চেষ্টা হয়; (২) তেমনি 'ব্যাধি বিপরীত' মতে, ব্যাধির (অর্থাৎ রোগের কারণজনিত প্রভাবের) বিপরীত ধর্ম সমন্বিত উপায়ের সাহায্যে ব্যাধি দূরীকরণের প্রচেষ্টা হয় এবং (৩) 'হেতু-ব্যাধি বিপরীত' মতে, রোগের হেতু (কারণ) ও ব্যাধি উভয়েরই বিপরীত ধর্ম সমন্বিত উপায় অবলম্বন করে উভয়কেই দূরীকরণের চেষ্টা হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার অর্থাৎ ব্যাধি উৎপন্ন করেই কারণসমূহ তিরোহিত হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার কারণ থেকেও যেতে পারে ও রোগের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে থাকে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রোগ বা ব্যাধির মীমাংসা করতে হয় এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে হেতু বা রোগের কারণ ও রোগ উভয়েরই মীমাংসা করতে হয়। দেহত্বকের সন্নিকটে যদি প্রদীপ-শিখা এমনভাবে থাকে, যাতে কেবলমাত্র দাহ বা পোড়া (Burn) উৎপন্ন হতে পারে, তবে পোড়া রোগের কারণ প্রদীপটি নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রোগের মীমাংসা করা চলে। কিন্তু পোড়া রোগটি যদি এতদূর অগ্রসর হয় যে, ফোস্কা ও ত্বকের আরও ক্ষতি করে, তবে সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র রোগের কারণ প্রদীপটিকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে গেলেই রোগের মীমাংসা করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রদীপও সরিয়ে নিতে হবে এবং দগ্ধস্থানের চিকিৎসাও করতে হবে, অর্থাৎ হেতু ও ব্যাধি উভয়েরই চিকিৎসা করতে হবে।

তদর্থকরী চিকিৎসাতেও অনুরূপভাবে তিনটি উপশ্রেণীভুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। (১) 'হেতু তদর্থকরী' মতে, রোগের হেতু বা কারণের সম ধর্ম সমন্বিত উপায়ে তা দূরীকরণের চেষ্টা করতে হয়; (২) 'ব্যাধি তদর্থকরী' মতে, রোগের কারণজনিত প্রভাব ব্যাধির সমধর্মী উপায় আশ্রয়ে দূর করবার প্রচেষ্টা হয় এবং (৩) 'হেতু ব্যাধি তদর্থকরী' মতে, হেতু ও ব্যাধি উভয়েরই সমধর্মবিশিষ্ট উপায় অবলম্বনে তাদের দূর করবার চেষ্টা করতে হয়।

চিকিৎসা-সাধনের পাদচতুষ্টয়

রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা, একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং রোগ নিরাময় যাতে আয়ত্তে আনা যেতে পারে, সেদিকেই সকল চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা কর্তব্য। সে জন্যে ভিষক (চিকিৎসক), ভেষজ (ঔষধ), পরিচারক (শুশ্রূষাকারক) এবং রোগী যদি সকলে মিলে-মিশে পরস্পরের সঙ্গে সুচারুরূপে সহযোগিতা করে, তখনই রোগ নিরাময় হতে পারে। চিকিৎসার এই চারটি পাদ বা অঙ্গ একত্রে পাদ-চতুষ্টয় নামে পরিচিত ও চিকিৎসার সিদ্ধি-লাভের চারটি স্তম্ভবিশেষ। প্রত্যেকটি পাদ বা অঙ্গের পর চারটি করে স্বতন্ত্র গুণ নির্দিষ্ট। সেগুলি এইরূপ:

ভেষজ চিকিৎসক—তাঁর এই চারটি গুণ অবশ্য থাকা চাই; যেমন—(১) আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যথেষ্ট ও যথাযথ প্রকৃত জ্ঞান; (২) অনেক চিকিৎসকের চিকিৎসা লক্ষ্য করা ও অনেক রোগীর চিকিৎসা দেখে বহুদর্শিতা অর্জন করা; (৩) চিকিৎসায় হাতে-কলমে কাজ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করা এবং (৪) আত্ম-পবিত্রতা বা শুচিতা ও আদর্শ চরিত্রবান হয়ে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হওয়া। এই চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও তাঁর কাণ্ডজ্ঞান, কল্পনাশক্তি, ধারণাশক্তি, তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি, কুশলতা এবং দ্রুততা থাকা আবশ্যক।

ভেষজ (ঔষধ)—যা কিছু প্রয়োগে রোগ ভয় দূরে যায় ('ভেষং রোগভয়ং জয়তীতি ভেষজম') তাকেই ভেষজ বলা হয়। ভেষজের

চারটি গুণ; যথা—(১) আধিক্য অর্থাৎ প্রয়োজন মাত্রই নির্দিষ্ট ভেষজ পাওয়া চাই এবং পূর্ণমাত্রায় ঔষধের জন্যে প্রচুর পরিমাণে লভ্য হওয়া চাই; (২) রোগ-প্রতিকারের যোগ্যতা বা ক্ষমতা; (৩) নানাবিধ (যথা, কল্ক অর্থাৎ শুষ্ক বা কাঁচা দ্রব্য বেটে সেবনযোগ্য, স্বরস অর্থাৎ কাঁচাদ্রব্য ছেঁচে, নিংড়ে রসাকারে সেবনযোগ্য—প্রভৃতি) ভাবে পরিকল্পিত হয়ে লভ্য হওয়া চাই এবং (৪) সম্পন্নতা অর্থাৎ প্রশস্ত বা যথানির্দিষ্ট দেশে ও যথাকালে জাত এবং কীটাদির দংশনমুক্ত হওয়া চাই।

পরিচারক—এই চারটি গুণবিশিষ্ট হওয়া তার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। (১) শুশ্রূষাকার্যে প্রযুক্ত উপচারসমূহের জ্ঞান, যথা—কি প্রকারে যূষ বা পেয়াদি (Drinks etc.) প্রস্তুত করতে হয়। কিভাবে রোগীকে বসাতে বা কিভাবে শোয়াতে হয়; (২) কি প্রকারে রোগীর মনের মত হওয়া যায়—ইত্যাকার বিশেষ বিশেষ জ্ঞান থাকা চাই; (৩) কার্যে দক্ষতা ও রোগীর প্রতি অনুরক্তি থাকা চাই এবং (৪) পবিত্রতা, দেহের ও মনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা আবশ্যক। তাছাড়া, সপ্তম শতাব্দীর আয়ুর্বেদ-প্রাজ্ঞ ভাগবতের মতে, তার আরও যোগ্যতা চাই; যেমন—ন্যায়-অন্যায় বোধ, বুদ্ধি, প্রতিভা ও কুশলী আচার-ব্যবহার। রোগীর প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ সর্বাগ্রে থাকা দরকার।

রোগী—রোগীর এই চারটি গুণ রোগ নিরাময়ের পক্ষে অপরিহার্য মনে করা হয়। (১) তার স্মৃতিশক্তি থাকা চাই, (২) নির্দেশকারীর অর্থাৎ চিকিৎসকের আদেশ ও ব্যবস্থা অনুসরণ করে চলা; (৩) অভীরুত্ব বা সাহস এবং (৪) রোগ ও তার লক্ষণাদি বর্ণনা করে জানাবার ক্ষমতা।

ভিষক, ভেষজ, পরিচারক ও রোগী—এই চারটি পাদ বা অঙ্গের যে ষোলটি প্রধান প্রধান গুণের কথা বলা হলো, সেগুলি বর্তমান থাকলেই চিকিৎসায় সফলতা লাভ হতে পারে। এই চারটি পাদের মধ্যে বিশেষভাবে জানেন (বিশেষজ্ঞ) ও অন্যান্য পাদ বা অঙ্গের মধ্যে যোগসাধন করে পরিচালনা করে থাকেন বলে ভিষক (ভেষজ প্রয়োগে রোগভয় দূর করেন বলেই ভিষক) বা চিকিৎসকই অগ্রগণ্য। অগ্রণীর গৌরবে গৌরবান্বিত বলে চিকিৎসকের দায়িত্ব যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাঁর আচরণবিধিও অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। মহামতি চরক চিকিৎসকের পালনীয় আচার-ব্যবহার বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তার মধ্য থেকে নীচের কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

"প্রত্যেক জীবের সুখ কামনা করবে। প্রতিদিন হৃদয়-ভরা দরদ দিয়ে ব্যাধিগ্রস্তকে আত্মজরূপে নিরাময়ের জন্যে চেষ্টা করবে। রোগীর নিকট থেকে নিজের প্রতিপালনের জন্যে অত্যধিক অর্থ চাইবে না। এমন কি, অপরের স্ত্রী স্পর্শের চিন্তাও করবে না বা অপরের ধনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা করবে না। পোষাক-পরিচ্ছদে অনাড়ম্বর ও প্রসন্নচিত্ত হবে। কোনরূপ পাপ (অন্যায়) কার্য করবে না বা পাপকার্যের সহায়ক হবে না। শান্ত, সরল ও উচিত কথা বলবে।"

চিকিৎসার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছে শাণিত অস্ত্ররূপ ভেষজ। ভেষজের রোগ প্রতিকারের যোগ্যতা বা ক্ষমতা বিশেষভাবে বিবেচ্য। আধুনিক মতে, এফিকেসি (Efficacy) বা পোটেন্সি (Potency) বলতে যা বোঝানো হয়, যোগ্যতা বা ক্ষমতা শব্দে সম্ভবতঃ তাই বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। যাহোক, রোগ-প্রতিকারের যোগ্যতা বা ক্ষমতা বিচারের ক্ষেত্রে উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ বা খনিজ যে সকল দ্রব্য ভেষজরূপে প্রয়োগ করা হয়, তাদের রস, গুণ,

বীর্য, বিপাক ও প্রভাব নামক পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের কথা আয়ুর্বেদে উল্লিখিত আছে।

রস—রসনেন্দ্রিয়ের (জিহ্বার) সাহায্যে আস্বাদন করে যে বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয়, তাকে বলা হয় রস। রস ছয় প্রকার—মধুর (Sweet), অম্ল (Acid), লবণ (Salt), তিক্ত (Bitter), কটু (Pungent) ও কষায় (Astringent)। এই পর্যায়ে অবস্থিত অগ্রে অগ্রবর্তী রস যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত বলবর্ধক; যথা—কষায় রস অপেক্ষা কটু রস, কটু রস অপেক্ষা তিক্ত রস অধিকতর বলবর্ধক। এই ক্রমে মধুর সর্বাপেক্ষা বলবর্ধক এবং কষায় রস সর্বাপেক্ষা কম বলকারক। আদ্য ত্রিবিধ রস, মধুর, অম্ল ও লবণ বায়ু নাশ করে: তিক্ত, কটু ও কষায় কফ নাশ করে এবং কষায়, তিক্ত ও মধুর পিত্ত নাশ করে।

গুণ—বিশ প্রকারের গুণ বর্তমান; যথা—গুরু, মন্দ, হিম, স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ্ণ, সান্দ্র (ঘন), মৃদু, স্থির, সূক্ষ্ম ও বিশদ—এই দশটি এবং এগুলির বিপরীত লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, খর, দ্রব, কঠিন, সর, স্থূল ও পিচ্ছিল—এই দশটি একত্রে মোট বিশটি। দ্রব্যের গুণে ভৌতিক ধর্মের (Physical properties) ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বীর্য—দ্রব্যের যে স্বভাবের দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয়, চরক সেই স্বভাবকে বীর্য বলেছেন। কাজ করবার বৈশিষ্ট্যই বীর্য, কেন না বীর্য ভিন্ন কোন কার্যই সম্ভব নয়। সূর্য (তাপ) বা চন্দ্রের (শীতলতার) কারণে বীর্যের উদ্ভব বলে বিশ্বাস। সে জন্যে বীর্য দু-প্রকার—উষ্ণ বীর্য ও শীত বীর্য। উষ্ণ বীর্য সম্পন্ন দ্রব্য তৃষ্ণা, অস্থিরতা, মধুর ও জ্বালাকর অনুভূতির কারণ ঘটায়, কাশি ও বায়ু প্রশমিত করে, কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি করে পরিপাকের সহায়ক হয়। শীত বীর্য দ্রব্যে রক্তের উন্নতি ঘটে এবং বলবৃদ্ধি করে প্রসন্নতা আনয়ন করে।

বিপাক—পাকাশয়ে গিয়ে পরিপাকের পর পরিবর্তনের ফলে ভেষজ যে পরিণতি লাভ করে, তাকে বলা হয় তার বিপাক। পাচক রসের সংস্পর্শে ভেষজদ্রব্য বিশ্লিষ্ট হয়ে বা ভেঙে গিয়ে পরিবর্তিত অবস্থায় যে ভেষজ-স্বভাব পায়, তাকে বিপাক বলা হয়। এ যেন কতকটা জট-পাকানো সুতাকে সঠিক, বিশেষ পাক (বিপাক) দিয়ে খুলে দেওয়া স্বাভাবিক সরল সুতার অবস্থা। মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল এবং কটু, তিক্ত ও কষায় রসের বিপাক কটু।

প্রভাব—প্রত্যেক ভেষজের একটি স্বতন্ত্র অন্তর্নিহিত বা গূঢ় স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এমন অনেক ভেষজ দেখা যায়, যাদের রস, গুণ, বীর্য ও বিপাক সমান, কিন্তু রোগ-প্রতিকারের বৈশিষ্ট্য পৃথক বা স্বতন্ত্র। এই পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য ভেষজের অন্তর্নিহিত বা গূঢ় স্বকীয়তার প্রকাশ এবং তাকেই বলা হয় ভেষজের নিজস্ব প্রভাব। ভেষজের প্রভাবজনিত রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা কোনরূপ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায় না (Empirical)। উদাহরণ-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—মধুস্রবা (Bassia latifolia) ও দ্রাক্ষা (Vitis vinifera)—উভয়েরই রস মধুর, গুণ গুরু, বীর্য শীত, বিপাক মধুর, কিন্তু প্রভাব বিভিন্ন; যেমন মধুস্রবা কোষ্ঠ-কাঠিন্যকারক (Costive) এবং দ্রাক্ষা বিরেচক (Laxative)।

রোগীর জন্যে যে আহার্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়, সাধারণভাবে তা পথ্য নামে পরিচিত। রুগ্ন ব্যক্তির বিকৃত ত্রিদোষের পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার পক্ষে হিতকর আহার্য দ্রব্যই পথ্য। শরীরস্থ রসাদি ধাতুর চলাচলের পথে অন্তরায় সৃষ্টি না করে বরং সেইরূপ চলাচলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়, এমন আহার্য দ্রব্যই পথ্য। কবিরাজশ্রেষ্ঠ গঙ্গাধরের মতে, এরূপ চলবার পথে যা হিতকর (পথ্যং পথিষু স্রোতঃসু

হিতম), তাকে পথ্য বলা হয়েছে। সুতরাং পথ্যের ব্যবস্থা দানের ক্ষেত্রেও আহার্য দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য, বিপাক ও প্রভাব—এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের বিষয় বিবেচনা করা উচিত—সে কথা আয়ুর্বেদের ভেষজ বিচারের উপরিউক্ত আলোকে সহজেই অনুমেয়।

মানসিক রোগ-প্রতিকার

মনের নানারূপ বিকার মানসিক রোগের মুখ্য লক্ষণ। সুতরাং নির্বিকার মনোভাব বজায় রাখার জন্যে উপায় ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা মানসিক রোগ প্রতিকারের মৌলিক হাতিয়ার। দেহের বল অটুট থাকলে মানুষ কর্মতৎপর থাকে, তা যেমন সহজেই বোধগম্য, তার মনের ক্রিয়া ও বল যে তেমনি সমুপস্থিত, সে কথাও প্রায় তর্কাতীত। দেহ সুস্থ থাকলে মনও চাঙ্গা ও বলীয়ান থাকে। বলবান যে ব্যক্তি মনে করে, শান্তি লাভই একমাত্র লক্ষ্য, তার মনও সতত সেদিকেই ধাবিত হয়। আর সব কিছুই সে ত্যাগ করে কিংবা সব কিছুকেই এমন ভাবে গ্রহণ করে, যাতে শান্তি লাভের স্থিরীকৃত লক্ষ্যের অভিমুখে সে অগ্রসর হতে পারে। সুতরাং আহার-বিহার, আচার-ব্যবহারের উদ্দেশ্য শান্তি লাভের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যেই সে বিষয়ে সে সর্বদা সচেতন থাকে এবং তার ফলে অবিচলিত ও অখণ্ড মনোবলের অধিকারী হয়। এইভাবে মনোবল অচঞ্চল ও কেন্দ্রীভূত হলেই যে কোনরূপ মনোবিকার দূর করা সম্ভব।

মনের তৎপরতা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের অধীন। মূলতঃ রজঃ গুণের প্রভাবে মন স্বতঃই আবেগভরে যে কোন রকম চরম অবস্থার দিকে প্রধাবিত হতে চায়; অপর পক্ষে তমঃ গুণের বশে নিশ্চেষ্টতা বা আলস্যভারে মন নিষ্ক্রিয় দশায় পতিত হতে চায়। অথচ সত্ত্ব গুণের প্রভাবে এই দুই প্রকার বিরুদ্ধ ও চরম সীমার মধ্যে মন শান্তভাব ধারণ করতে চায়; সত্ত্ব গুণ রজঃ ও তমঃ গুণের মধ্যে সমতা আনয়ন করে থাকে এবং দুটি বিরোধী শক্তি-প্রয়াসকে প্রশমিত করে মনের শান্তভাব (শান্তি লাভের প্রাথমিক সোপানস্বরূপ) ঘটায়। প্রশান্ত মনে তখন লক্ষ্য স্থির করা সম্ভব হয়। জীবনের উদ্দেশ্য কি, বিশ্বসংসারে নিজের ভূমিকা কি, আমি কে, কি আমার স্বরূপ—ইত্যাকার চিরন্তন প্রশ্নাবলী উদিত হয়ে থাকে। নিজেকে জানা (আত্মানং বিদ্ধি) বা আত্মোপলব্ধির তাগিদ মনের মধ্যে ধীরে ধীরে উদ্রিক্ত হয়। সেই জানবার সাধনায় একবার মগ্ন হয়ে গেলে নানাবিধ পরস্পর বিরোধী ভাব-প্রকাশক সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শীত-উষ্ণ, মান-অপমান, কাচ-হীরা ও সোনা-মাটি ইত্যাদির প্রভেদ তিরোহিত হতে থাকে—কোন ব্যাপারেই মন বিচলিত হয়ে বিকার প্রাপ্ত হয় না। নিজের ভিতর আপন স্বরূপ সন্ধান ও উপলব্ধির সাধনায় রত হয়ে মন নির্বিকার ভাব ধারণ করতে থাকে। সেইভাবেই শুধুমাত্র যে যাবতীয় মানসিক রোগের প্রতিকার সম্ভব তা নয়, বরং সেই ভাবেই স্বস্থ (আপনাতে আপনভাবে) অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং পরিপূর্ণ ও অটুট স্বাস্থ্যসমেত অমিত বলের অধিকারী হবার পথ সুগম হয়।

ধূমপানের অপকারিতা

প্রীতিসাধন বসু

১৫৬০ সালে পর্তুগালের তৎকালীন ফরাসী রাষ্ট্রদূত জিন নিকট-ই সর্বপ্রথম তামাক গাছের অনেক গুণের বিষয় আবিষ্কার করেন। তখন অবশ্য তামাক গাছকে একটি আগাছা বলেই গণ্য করা হতো। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এই আবিষ্কারের বিষয় বহুল প্রচার লাভ করে এবং তাঁর নাম অনুযায়ী গাছটির নাম দেওয়া হয় নিকোটিয়ানা (Nicotiana)। Nicotiana rustica-ই সর্বপ্রথম ইউরোপে পাইপ খাবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। পরে আরও আরামদায়ক ধোঁয়ার জন্যে Nicotiana tobacum-এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। অবশ্য এশিয়ার অনেক স্থানে এবং রাশিয়ায় N. rustica এখনও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তামাকের ধূমপান ভাল কি মন্দ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ বা মতভেদ আজকের নয়; ষোড়শ শতকের শেষ দিক থেকেই এই মতপার্থক্য চলে আসছে। তখন থেকেই ধূমপান অনেকের কাছেই নানা রোগের কারণ এবং ক্ষতিকর অভ্যাস বলে বিবেচিত হতো। অথচ উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের পূর্বে এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় নি। ধূমপান ক্ষতিকর— এই বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তামাকের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

ধূমপান ক্ষতিকর, কি ক্ষতিকর নয়—এই মতামতের পক্ষে বা বিপক্ষে বেশীর ভাগ প্রমাণই পরিসংখ্যানগত। ফরাসী ডাক্তার M. Bauisson ১৮৫৯ সালে সর্বপ্রথম এই ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তিনি দেখালেন— Montpellier হাসপাতালে মুখের ক্যান্সারে ভুগছে, এমন ৬৮ জন রোগীর মধ্যে ৬৬ জন পাইপ টানে; একজন তামাকপাতা চিবিয়ে খায় এবং শেষ একজন অন্যভাবে তামাক পাতা ব্যবহার করে। এদের ৪৫ জনের ঠোঁটে, ১১ জনের মুখে, ৭ জনের জিভে এবং ৫ জনের টন্‌সিলে ক্যান্সার হয়েছিল। Bauisson দেখলেন, সাধারণতঃ যারা ছোট পাইপ ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে ঠোঁটের ক্যান্সারই বেশী দেখা যায়, আর পাইপটা ঠোঁটের যেখানে ধরা হয়, নীচের ঠোঁটের ক্যান্সারটা সাধারণতঃ সেখানেই হয়।

পরে আরও অনেকে Bauisson-এর মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দেখান। ১৯৩৬ সালে দু-জন শল্যচিকিৎসক Ochsner এবং De Bakey দেখলেন, ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারে যারা ভোগে, তাদের প্রায় সকলেই সিগারেটের ধূমপান করে, তবে পরীক্ষার ফলে এই বিষয়টিকে সর্বপ্রথম প্রমাণ করা হয় ১৯৩১ সালে। আর্জেন্টিনার A. H. Roffo তামাক থেকে একটা চট্‌চটে নির্যাস (Tar) বের করে সেটা একটা খরগোসের গায়ে লাগিয়ে দেন। কিছুদিন পরে সেখানে ক্যান্সার দেখা গেল।

১৯১৪ সালের আগে পাইপ, চুরুট আর নস্য হিসাবেই তামাক ব্যবহার করা হতো, আর কিছু লোক তামাক পাতা চিবিয়ে খেতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে সিগারেটের ব্যবহার বাড়তে থাকে আর অন্যগুলির ব্যবহার সেই অনুপাতে কমতে থাকে। পাইপ এবং চুরুটের ধোঁয়া ভারী এবং ক্ষারধর্মী। না কেশে, মাথা না ঘুরে বা গা-বমি না করে খুব কম লোকই এই ধোঁয়া টেনে নিতে পারে। সিগারেটের

ধোঁয়া হাল্‌কা এবং টেনে নিতে কোন অসুবিধা হয় না।

সিগারেট বা চুরুট খাওয়া ক্ষতিকারক কিনা, সেটা নির্ভর করে ধোঁয়া কতটা টেনে নেওয়া হয়, তার উপর। তাই আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটি এই সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর নিয়েছিল। দেখা গেল, সিগারেটের ক্ষেত্রে ধোঁয়াটা একেবারেই ভিতরে টেনে নেয় না শতকরা ৭ জন, পাইপের ক্ষেত্রে ৫৩ জন এবং চুরুটের ক্ষেত্রে ৭১ জন। ধোঁয়াটা গভীরভাবে টেনে নেয় সিগারেটের ক্ষেত্রে শতকরা ২৪ জন, পাইপের ক্ষেত্রে ৩ জন, চুরুটের ক্ষেত্রে ১.৫ জন। তাছাড়া মেয়েরা সব সময়েই ছেলেদের চেয়ে কম সিগারেট খায় এবং ধোঁয়াটা ভিতরে কম টেনে নেয়।

ধূমপানের কুফলের কথা বলতে গিয়ে সর্বপ্রথম যে রোগটির কথা বলা যায়, সেটি হলো ক্যান্সার। এর পর হলো করোনারী থ্রম্বোসিস। গ্যাসট্রিক এবং ডিয়োডেনাল আলসারেও প্রতি বছর প্রচুর লোকের মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য ধূমপানকে এর অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এছাড়া ধূমপানের সঙ্গে কাশি, তাড়াতাড়ি নিঃশ্বাস নেওয়া, ওজন কমে যাওয়া ইত্যাদিরও যোগাযোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, সিগারেট খাওয়া চুরুট এবং পাইপের চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক।

গত পঞ্চাশ বছরে ছোঁয়াচে এবং ছোঁয়াচে নয়, এরূপ সব রকম রোগেই মৃত্যুর হার যথেষ্ট কমে গেছে। কিন্তু ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার এর সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার পুরুষদের ক্ষেত্রে বেড়েছে শতকরা ৬০০ ভাগ, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে বেড়েছে ১২৫ ভাগ। যত রকম ক্যান্সার দেখা যায়, তার মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারেই লোক মারা যায় সবচেয়ে বেশী। ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার বলতে Bronchogenic Carcinoma বোঝায়। এটা হয় ফুস্‌ফুসের সূক্ষ্ম বায়ুনালীর গায়ে। এথেকে তিন রকমের রোগ হয়—Epidarmoid Carcinoma, Undifferentiated Carcinoma এবং Adenocarcinoma।

১৯৪৭-৪৮ সালে যখন অনেক গবেষক ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার নিয়ে কাজ সুরু করেন, তখন সিগারেটের ধূমপানকে এর অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা হতো। এর অন্যান্য কারণের মধ্যে ছিল কারখানার বিষাক্ত গ্যাস ও ধূলিকণা। এই গ্যাসের মধ্যে ক্রোমেট, নিকেল ক্লোরাইড, শক্ত বা তরল জ্বালানীর ধোঁয়াকে হিসাবের মধ্যে ধরা হতো। ধূমপান ছাড়া আর সব কারণকে উপেক্ষা না করা গেলেও প্রথমটির উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়।

ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার সময় সর্বপ্রথম দেখা হয়—এই সব রোগীরা কি হারে ধূমপান করে। এক্ষেত্রে যা ফল পাওয়া গেল, তা ১৯৩৬ সালে Ochsner এবং De Bakey কর্তৃক প্রাপ্ত ফলের অনুরূপ। এদের কথা আগেই বলেছি। এছাড়া দেখা গেল Epidarmoid এবং undifferentiated Carcinoma-র রোগীরা সকলেই ধূমপায়ী। যারা ধূমপান করে না, তারা Adenocarcinoma রোগে ভুগছে—এথেকে মনে হলো এই রোগটির সঙ্গে বোধ হয় ধূমপানের কোন যোগাযোগ নেই।

ক্যান্সারের সঙ্গে ধূমপানের যোগাযোগ সম্বন্ধে আরও পরিসংখ্যানগত খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। ধূমপান করে এমন ১৮৮ হাজার লোকের উপর প্রায় চার বছর ধরে নজর রাখা হয়। এদের বয়স ৫০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ছিল। এই সময়ের মধ্যে এদের ১২ হাজার জন মারা যায় এবং তার মধ্যে আড়াই হাজার জনের মৃত্যুর কারণ ছিল ক্যান্সার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, যারা সিগারেট খেতো না,

তাদের চেয়ে যারা সিগারেট খেতো, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক বেশী। অবশ্য যারা চুরুট বা পাইপ খেতো, তাদের মধ্যে এই হার বেশী হলেও সিগারেটপায়ীদের মত অত বেশী নয়। আর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—যারা দিনে দু-প্যাকেট সিগারেট খেতো, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার, যারা ধূমপান করতো না, তাদের চেয়ে ঠিক দু-গুণ বেশী। যারা অন্ততঃ এক বছর আগে সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যেও মৃত্যুর হার বর্তমান ধূমপায়ীদের চেয়ে অনেক কম।

যারা ধূমপান করে না, তাদের ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারে মারা যেতে বিশেষ দেখা যায় না। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা অত্যন্ত ধূলা এবং ধোঁয়ার মধ্যে সব সময়ে থাকে, তাদের কথা বাদ দিচ্ছি। অথচ যারা সিগারেট খায়, তাদের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের হার, যারা ধূমপান করে না, তাদের চেয়ে দশ গুণেরও বেশী। যারা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ফুস্‌ফুসের ক্যান্সারের হার অনেক কম। শতকরা ৭৮ জন মারা যায় Bronchogenic Carcinoma রোগে এবং শতকরা ৭ জন মারা যায় Adenocarcinoma রোগে। শতকরা ২৭ জনের ক্যান্সার হয় মুখের কোথাও—যেখানে ধূমপানের সময় ধোঁয়া লাগে। তবে মুখের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সিগারেটের ধোঁয়ার চেয়ে চুরুট বা পাইপের ধোঁয়াতেই এই রোগ হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

এবার করোনারী থ্রম্বোসিসের কথা ধরা যাক। আমেরিকায় সবচেয়ে বেশী লোক মারা যায় করোনারী থ্রম্বোসিসে। ১৯৬০ সালে হিসাব করে দেখা গিয়েছিল, ঐ বছর মৃত্যুর শতকরা ২৯ ভাগের জন্মে দায়ী এই রোগ। এছাড়া ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে যত লোক মারা যায়, তার মধ্যে শতকরা ৩৫ জনের মৃত্যুর কারণ এই রোগ। ক্যান্সারের মত এই রোগেও মেয়েদের মৃত্যুর হার পুরুষদের চেয়ে কম। এতে ৪০ থেকে ৬০ বছর বয়স্কা মহিলা মারা যায় শতকরা ১৫ জন মাত্র। দেখা গেছে সিগারেটপায়ীদের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুর হার, যারা সিগারেট খায় না, তাদের চেয়ে শতকরা ৭০ ভাগ বেশী। এমন কি, দৈনিক কতগুলি সিগারেট খাওয়া হচ্ছে, তার হারের সঙ্গে এই মৃত্যুর হারও বেড়ে চলে। যারা সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে করোনারী থ্রম্বোসিসে মৃত্যুর হার অনেক কম।

করোনারী থ্রম্বোসিসের সঙ্গে ধূমপানের যোগাযোগ দেখবার জন্তে চার হাজার লোককে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাদের মাঝে মাঝেই পরীক্ষা করা হতো। দেখা গেল, প্রথমে রোগের কোন চিহ্ন না থাকলেও যারা ধূমপান করে, তাদের মধ্যে এই রোগের লক্ষণ দেখা দেবার হার অনেক বেশী।

এরপর তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে কি কি পদার্থ আছে, তাই নিয়ে খোঁজ-খবর করা হয়। দেখা গেল, অত্যন্ত অল্প পরিমাণে পাওয়া গেলেও এর ভিতর অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ আছে। এদের মধ্যে নিকোটিনের মত বিষ আছে, কোন কোনটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর (Irritating), কোনটা ক্যান্সার সৃষ্টি করে (Carcinogen), আবার কোনটা ক্যান্সার সৃষ্টির সহায়তা করে।

ধূমপান করলে ক্যান্সার, করোনারী থ্রম্বোসিস এবং আল্‌সার জাতীয় রোগ হতে পারে, এই কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ধূমপানের আধিক্যের সঙ্গে এই সব রোগ আক্রমণের সম্পর্ক যে পরিসংখ্যানের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে, সে কথাও কিছু আলোচনা করা হয়েছে। তামাকের ধোঁয়া কি কি বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমাদের দেহযন্ত্রকে বিকল করে ঐ সব রোগের আক্রমণ ঘটাতে পারে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা

করবো। এই সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান হয়েছে। প্রথমে ক্যান্সারের কথাই ধরা যাক। Ernest Wynder তামাকের ধোঁয়াকে ঠাণ্ডা করে জমিয়ে একটা আঠালো পদার্থ তৈরি করে খরগোসের গায়ে বেশ কিছুদিন ধরে মাখিয়ে দেখেছিলেন, সেখানে Epidermoid Carcinoma নামক ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। ১৯৩৯ সালে A. H. Roffo-র অনুরূপ পরীক্ষার কথা প্রথমেই বলেছি।

তিনি খরগোসকে সিগারেট খাইয়ে তাদের ফুস্‌ফুসে ক্যান্সার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দুটি কারণে সে চেষ্টা সফল হয় নি। খরগোসকে সিগারেট খাওয়ানো হয় নাক দিয়ে —মুখ দিয়ে নয়। ওদের নাকে এমন ব্যবস্থা আছে, যাতে কোন বিষাক্ত পদার্থ ওদের ফুস্‌ফুসে যেতে পারে না।

ইঁদুরকে সিগারেট খাওয়াবার জন্যে তাদের সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, যাতে নিঃশ্বাস নিলেই ধোঁয়া ফুস্‌ফুসে চলে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমেই কোন ইঁদুর এই অবস্থায় বাঁচে নি। তখন ধোঁয়ার পরিমাণ কমিয়ে দেখা গেল ইঁদুর বাঁচে বটে, কিন্তু তার ফুস্‌ফুসে যতটুকু ধোঁয়া যাচ্ছে, কেউ পাশে বসে সিগারেট খেলে যতটুকু ধোঁয়া আমাদের ফুস্‌ফুসে যায়, সেটাকে তার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এত কম ধোঁয়ায় ফুস্‌ফুসের ক্যান্সার হয় না।

ধূমপান করবার সময় ধোঁয়াটা সবচেয়ে আগে ঠোঁটে, জিভে আর মুখের ভিতরের চামড়ায় লাগে। Epidarmoid Carcinoma সৃষ্টি করে, এমন অনেক পদার্থ (Carcinogen) মুখের ভিতরের চামড়ার কোষের মধ্যে চলে যায়। খরগোস বা ইঁদুরের গায়ে Epidarmoid Carcinoma সৃষ্টি করতে যতটা ধোঁয়ার Tar-এর প্রয়োজন হয়, মানুষের জিভে বা ঠোঁটে ঐ রোগ দেখা দিতেও সেই পরিমাণ ধোঁয়ার দরকার হয়। শ্বাসনালীর ক্যান্সারও একইভাবে হয়। কেবল খাদ্যনালীর একটু পার্থক্য দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে ধোঁয়ার বদলে ধোঁয়ার Tar-ই দায়ী। ধূমপানের সময় ধোঁয়াটা শ্বাসনালী পেরিয়ে ফুস্‌ফুসের ভিতরকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বায়ুনালীর (Bronchial tubes) মধ্যে উপস্থিত হয়। এই নালীর ভিতরের আস্তরণের সবচেয়ে উপরের স্তরের কোষগুলির ছোট ছোট সিলিয়া বা লেজ থাকে, আর কোষগুলির উপর একটা তরল পদার্থ থাকে। এই সিলিয়াগুলি ফুস্‌ফুসকে পরিষ্কার রাখবার কাজ করে। ধোঁয়া বা ধূলার ছোট ছোট কণা ফুস্‌ফুসের এই নালীর মধ্যে চলে গেলে সেগুলি সেই তরল পদার্থটাতে আট্‌কে যায়। তখন সিলিয়াগুলি তাদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে ফুস্‌ফুসের বাইরে পাঠিয়ে দেয়। এই ভাবে তারা ফুস্‌ফুসকে পরিষ্কার রাখে। দেখা গেছে, তামাকের ধোঁয়ায় এদের কার্যক্ষমতা একেবারে নষ্ট না হলেও বহুলাংশে কমে যায়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ধোঁয়ার Tar বা অন্যান্য ক্ষতিকারক পদার্থ এই নালীর মধ্যে জমা হয়।

তামাকের ধোঁয়ায় ফুস্‌ফুসের সূক্ষ্ম বায়ুনালীগুলির ভিতরের দিকের পর্দায় মধ্যে তিন রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমতঃ এই পর্দার মধ্যের কোষের স্তরের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। সাধারণ অবস্থায় এই স্তরের সংখ্যা থাকে তিনটি। এই বৃদ্ধিকে বলে Hyperplasia। স্তরের এই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে ঐ নালীর মধ্যের পথটা ছোট হয়ে যায়। অবশ্য ধূমপান না করলেও এই স্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে, তবে তা সচরাচর হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, আগে যে সিলিয়াগুলির কথা বলেছি, সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে ফুস্‌ফুসকে পরিষ্কার রাখবার ব্যবস্থাটা আর চালু থাকে না। ফলে বিভিন্ন

ধরণের ক্ষতিকারক পদার্থ এই বায়ুনালীর মধ্যে জমা হয়।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে, বায়ু-নালীর ভিতরের পর্দার কোষগুলির কেন্দ্রকের (Nucleus) পরিবর্তন। ধূমপানের ফলে কেন্দ্রকগুলি ক্রমে স্বাভাবিক থেকে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ক্যান্সার-কোষের কেন্দ্রক সাধারণতঃ বড়, বাঁকাচোরা আকৃতির আর তাদের ক্রোমো-সোমের সংখ্যাও সাধারণের চেয়ে বেশী থাকে। দেখা গেছে, সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুনালীর ভিতরের পর্দার কোষ-গুলির কেন্দ্রকের ক্রমে ক্যান্সার-কোষের কেন্দ্রকের মত হবার হারও বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অস্বাভাবিক কেন্দ্রকযুক্ত কোষের ছোট ছোট পিণ্ডও (Lesions) দেখা দেয়। যারা সিগারেট খায় না, তাদের কিন্তু এই রকম পিণ্ড হয় না। তবে যারা সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে, দেখা গেছে—কয়েক বছর ধরে আস্তে আস্তে তাদের এই অস্বাভাবিক কেন্দ্রকযুক্ত কোষের সংখ্যাও আবার কমে আসে। এই পিণ্ড বা Lesions-এর সঙ্গে তামাকের ধোঁয়ার যোগাযোগ দেখাবার জন্যে একটা খুব ভাল পরীক্ষা করা হয়েছিল। একটা Y-এর মত কাচের সরু নলের মধ্য দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া পাঠিয়ে দেখা গেল, নলটা যেখানে দু-ভাগ হয়েছে, সেখানেই সবচেয়ে বেশী ধোঁয়ার Tar জমা হয়েছে। ঠিক তেমনি ফুস্‌ফুসের সূক্ষ্ম নালীগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যারা ধূমপান করে, তাদের এই নালীর দুভাগ হবার জায়গাতেই সবচেয়ে বেশী অস্বাভাবিক কোষের Lesions রয়েছে।

Bronchogenic Carcinoma রোগে যারা মারা গেছে, তাদের এই নালীর ভিতরের পর্দা পরীক্ষা করে এই রকম অস্বাভাবিক কোষ এবং Lesions পাওয়া যায়। অবশ্য সে ক্ষেত্রে ঐ কোষের স্তর ক্রমে ভিতরের দিকে চলে যায়। এথেকে মনে হয়, ঐ রোগের সুরুতে কিছু কোষের কেন্দ্রকের প্রথম পরিবর্তন হয়। পরে তারা বিভক্ত হয়ে ঐ ধরণের অনেক কোষের সৃষ্টি করে। তখন এই সব কোষের Lesions দেখা দিতে থাকে। তারপর এই কোষের স্তর ধীরে ধীরে নালীর গভীরে যেতে থাকে।

এখন ধূমপানের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে Bronchogenic Carcinoma হবার যোগা-যোগের সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, এমন হতে পারে যে, সিগারেটের ধোঁয়ায় এই অস্বাভাবিক কোষের সৃষ্টি হয়। আগেই বলেছি, কি পরিমাণে এবং কতদিন ধরে ধূমপান করা হচ্ছে, তার সঙ্গে এই কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির হারের বেশ যোগাযোগ দেখা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ধূমপান ছেড়ে দিলেই কেন আবার এই কোষের সংখ্যা কমতে থাকে, সেটা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, হতে পারে যে, তামাকের ধোঁয়ায় বায়ুনালীর আস্তরণের কোষের সিলিয়াগুলি নষ্ট হয়ে যাবার ফলে ফুস্‌ফুসকে পরিষ্কার রাখবার ব্যবস্থাটা নষ্ট হয়ে যায়। ফলে, তখন সেখানে অনেক ক্ষতিকারক পদার্থ জমা হতে থাকে। এর ফলে সেখানে ঐ সব পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ধূমপান ছেড়ে দিলে অস্বাভাবিক কোষের সংখ্যা কমে যাবার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

যারা ধূমপান করে না, তাদের অনেকের এই নালীর মধ্যেও অনেক সময় কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক কোষ দেখা যায়। এথেকে মনে হয়—এমন হতে পারে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় এই অস্বাভাবিক কোষগুলি সংখ্যায় বেশী বাড়তে পারে না, অথচ স্বাভাবিক কোষগুলি বেশ ভালভাবে বাঁচতে পারে। তামাকের ধোঁয়ার অস্বাভাবিক অবস্থায় এর ঠিক বিপরীত হয়। তখন স্বাভাবিক কোষগুলি বাঁচতে না

পারলেও অস্বাভাবিক কোষগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সুবিধাই হয়। এই কথা মেনে নিলে ধূমপান ছেড়ে দিলে অস্বাভাবাবিক কোষের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে যাবার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

ধূমপান করলে অন্যান্য যে সব রোগের সৃষ্টি হয়, তাদের ক্ষেত্রে কি হয় দেখা যাক। তবে তার আগে ফুস্‌ফুসের ভিতরের চেহারাটা চোখের সামনে থাকলে ভাল হয়। গলা থেকে শ্বাসনালীটা নীচের দিকে এসে দু-ভাগ হয়ে দু-টি ফুস্‌ফুসে গেছে। সেখানে তারা ক্রমাগত ভাগ হয়ে হয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালীতে পরিণত হয়েছে। এদের কথাই এতক্ষণ বলেছি। অতিসূক্ষ্ম নালীগুলি ছোট ছোট থলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এদের বলে Alveoli। ফুস্‌ফুসে যে শিরা বা ধমনীগুলি এসেছে, তারাও এমনি ভাগ হয়ে হয়ে সূক্ষ্ম রক্তনালীরূপে এই Alveoli-তে শেষ হয়েছে। নিঃশ্বাস নিলে বাতাস ক্রমে এই Alveoli-তে উপস্থিত হয়। এখানে রক্ত বাতাস থেকে অক্সিজেন নেয় আর তার কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দেয়। ধূমপান করবার সময় কিছু ধোঁয়াও Alveoli-র মধ্যে চলে যায়। সেখানে অক্সিজেনের সঙ্গে সেই তামাকের ধোঁয়ার নিকোটিন ইত্যাদি সব বিষাক্ত পদার্থগুলিও রক্তে চলে যায়।

ফুস্‌ফুসের অত্যন্ত সূক্ষ্ম নালীগুলির মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় বেশ শ্লেষ্মা থাকে। দেখা গেছে, ধূমপান করলে এই নালীগুলিতে আরও বেশী শ্লেষ্মা জমা হতে থাকে। আগেই বলেছি, ধূমপানে এই নালীগুলির Hyperplasia হয় অর্থাৎ এর পর্দার কোষের তিনটি স্তর থেকে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে নালীর মধ্যের পথটা আরও কমে যায়। ধূমপানে শ্লেষ্মা বেশী হওয়ায় এবং পথটা কমে যাওয়ায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া প্রভৃতি যে সব সংক্রামক রোগের বীজাণু ফুস্‌ফুসের মধ্যে চলে যায়, সেগুলি সব এই শ্লেষ্মায় আট্‌কে গিয়ে ফুস্‌ফুসের মধ্যে রয়ে যায়। এই জন্যে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে, যারা সিগারেট খায়, তাদের মধ্যে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর হার অনেক বেশী।

এছাড়া অনেক সময় নিঃশ্বাসের সময় কিছু হাওয়া শ্লেষ্মার সঙ্গে আট্‌কে গিয়ে বন্দী হয়ে পড়ে। সিগারেট খেলে গলা খুস্‌খুস করে কাশি হবেই। তখন এই বন্দী হাওয়ার উপর চাপ পড়ে। এই চাপের ফলে Alveoli-র পাত্‌লা চামড়া ফেটে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, যারা সিগারেট খায়, তাদের ফুস্‌ফুসে প্রচুর ফেটে-যাওয়া Alveoli দেখতে পাওয়া যায়। Alveoli ফেটে গেলে সেখানের শিরা ও ধমনী শুকিয়ে যায়। ফলে রক্তকে পরিস্রুত করবার কাজ আর সেখানে হতে পারে না। তখন বাকী Alveoli দিয়েই সমস্ত রক্তটাকে পরিস্রুত করতে হয়। এই জন্যে যারা সিগারেট খুব বেশী খায়, তাদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে দেখা যায়। এর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী কাজ করতে হয়। সুস্থ অবস্থায় অবশ্য এতে হৃৎপিণ্ডের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু হৃৎপিণ্ড যদি দুর্বল বা রোগাক্রান্ত থাকে, তাহলে এই চাপ সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

যে সব করোনারী ধমনীগুলি হৃৎপিণ্ডের পেশীতে রক্ত চলাচল করতে সাহায্য করে, অনেকের শরীরে সেই ধমনীগুলিতে কোলেষ্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে এই ধমনীগুলির ভিতরের পথটা ছোট হয়ে যায়। আগেই বলেছি, সিগারেট খাওয়ায় Alveoli ফেটে যাবার ফলে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। যে খায়, তার যদি ধমনীতে কোলেষ্টেরল জমা হবার প্রবণতা থাকে, সে ক্ষেত্রে তার হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলিতে প্রতি মিনিটে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডের

পেশীতে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের সরবরাহও কমে যায়, অথচ সিগারেট খাবার দরুণ অন্যান্য কারণে হৃৎপিণ্ডকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী কাজ করতে হয়। সুতরাং সেই ব্যক্তির পক্ষে করোনারী থ্রম্বোসিসের হাত থেকে রেহাই পাওয়া শক্ত। এই জন্যেই যারা সিগারেট খায়, স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে করোনারী থ্রম্বোসিসে মৃত্যুর হার অনেক বেশী। যে কারণের কথা বলা হলো, সে কারণে শুধু হৃৎপিণ্ডে কেন, সারা শরীরেই অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এটা সারা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

গ্যাসট্রিক এবং ডিয়োডেনাল আলসারের ক্ষেত্রে ধূমপান কিভাবে ক্ষতি করে, তা সঠিক জানা যায় নি। তবে মনে হয়, কাজটা একটু ঘোরানো পথে হয়। রক্ত চলাচলের উপর নিকোটিনের যে প্রভাব আছে, তার জন্যে এই ক্ষতি হতে পারে, আবার পাকস্থলীর আচ্ছাদন-পর্দার উপরেও তামাকের ধোঁয়ার প্রভাব থাকতে পারে।

সিগারেটের ধূমপানে অনেক সময় মূত্রাশয়ে ক্যান্সার হতে দেখা গেছে। এর কারণ হিসাবে বলা যায় যে, তামাকের ধোঁয়ায় যে সব ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থ (Carcinogen) থাকে, সেগুলিই এর জন্যে দায়ী। শরীরের এক অংশের উপর এই ধরণের পদার্থের প্রভাবে অনেক দূরের অন্য অংশেও ক্যান্সার হতে পারে। তবে এসম্বন্ধেও সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়।

সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে দেখা যাচ্ছে, সুস্থ দেহে বেশী দিন বাঁচতে হলে ধূমপান ছাড়তে হবে। যদি নেহাৎ তা না পারা যায় তাহলে অন্ততঃ সিগারেটের বদলে চুরুট বা পাইপ খেয়ে মারাত্মক রোগগুলির হাত এড়াতে পারা যায়। আর সে ক্ষেত্রেও তার সংখ্যা অনেক কমাতে হবে এবং ধোঁয়াটা গিলে ফেলা চলবে না। অবশ্য এইভাবে খেলে সিগারেটও খেতে পারা যায়। এছাড়া ফিল্টার ব্যবহার করে ধোঁয়ার Tar এবং নিকোটিনের পরিমাণ অনেক কমিয়ে ফেলা যায়। সাধারণতঃ একটা সিগারেটে ৩৫ মিলিগ্র্যাম Tar আর ২'৫ মিলিগ্র্যাম নিকোটিন পাওয়া যায়। ফিল্টার ব্যবহার করে Tar-এর পরিমাণ ৫'৭ এবং নিকোটিনের পরিমাণ ০'৪ মিলিগ্র্যামে নামিয়ে আনা যায়। তবে এমন ফিল্টার ব্যবহার করা উচিত, যাতে ধোঁয়ার সমস্ত ফেনলটুকু আটকে ফেলা যায়। কারণ, দেখা গেছে—এই ফেনল ফুসফুসের সূক্ষ্ম বায়ুনালীর সিলিয়াগুলির কাজ বন্ধ করে দেয়। এছাড়া ফেনলে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী পদার্থের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সিগারেটের ধোঁয়ায় কি কি আছে, দেখবার জন্যে এবং তাদের মধ্যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থগুলি দূর করবার জন্যে এখনও গবেষণা দরকার। তবে ততদিন ফিল্টার লাগানো সিগারেট খাওয়াই ভাল।

এই প্রবন্ধের জন্যে লেখক American Cancer Society-র Dr. E. C. Hammond, B. S., Sc. D.-এর কাছে ঋণী।

সঞ্চয়ন

আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ

আমেরিকার প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক মার্কটোয়েন একবার বলেছিলেন—সকলেই আবহাওয়ার কথা বলেন, কিন্তু কেউই কিছু করেন না। কথাটার পিছনে কিছুটা গুরুত্ব যে না ছিল, তা নয়। এক-শ' বছর আগে তিনি যখন ঐ কথাটি বলেছিলেন, তখন মহাসাগরে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে পৃথিবীর বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ঘটলে ঝড়ের খবর আগে থেকে দিয়ে মানুষকে আত্মরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। মানুষ বেলুন উড়িয়েই উর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতো, এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

গত এক-শ' বছরের মধ্যে সেই অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটেছে। আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণের যে সব মাধ্যম ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছে, কৃত্রিম উপগ্রহই তাদের মধ্যে প্রধান।

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমন্বিত এসব উপগ্রহ পৃথিবী পমিক্রমা করছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পৃথিবীতে প্রেরণ করে যাচ্ছে।

প্রথমে আমেরিকাই কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই সকল উপগ্রহের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই বর্তমানে আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিকভাবে পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা সম্ভব হচ্ছে। আমেরিকা এজন্যে কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। টাইরস ও এসা পরিকল্পনা এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। টেলিভিশন অ্যাণ্ড ইন্‌ফ্রারেড অবজারভেশন স্যাটেলাইট (টাইরস) নামে পরিকল্পনার উদ্যোক্তা আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা। মহাকাশ সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই প্রথম এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল।

উপগ্রহের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসা বা এনভিরনমেন্টাল সার্ভে স্যাটেলাইট নামে যে আর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সব উপগ্রহে থাকে অতি উন্নত ধরণের ক্যামেরা এবং অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। এই সব ক্যামেরা মেঘলোকের আলোকচিত্র গ্রহণ করে' পৃথিবীতে প্রেরণ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের প্রায় দেড়-শ'টি কেন্দ্রে মেঘলোকের এই সব ছবি প্রেরণ করা হয়, এছাড়াও ঐ উপগ্রহ বহু তথ্য সরবরাহ করে। এই সব তথ্যের ভিত্তিতে সঠিকভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে।

আমাদের সঙ্গে মহাকাশ-বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক রয়েছে, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীতে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল প্রথম টাইরসজাতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করে। তারপর থেকে ১৯৬৫ সালের ২রা জুলাই পর্যন্ত ঐ ধরণের ৯টি উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করা হয়। আর এসাজাতীয় উপগ্রহ ১৯৬৬ সালে ছাড়া হয়েছে তিনটি এবং ১৯৬৭ সালে দুটি।

আবহাওয়া সম্পর্কে এই সব তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ পৃথিবীর উপরিস্থিত মেঘলোকের দশ

লক্ষেরও বেশী ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। আবহ-বিজ্ঞানীরা এর আগে এই প্রকার তথ্যের সন্ধান পান নি।

ঝড়ের সঙ্কেত কৃত্রিম উপগ্রহ যেমন দিতে পারে, এমন আর কেউ পারে না। এই সব উপগ্রহের মাধ্যমে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা ঝড় আসবার খবর আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে ধন-প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। ক্যারেবিয়ান সাগরের ঘূর্ণিবাত্যা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের সামুদ্রিক ঝড় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানীরা ঐ সকল ঝড়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণে তার গতিপথ নির্ধারণ করে আগে থেকেই ঐ অঞ্চলবাসীদের সতর্ক করে দিয়ে হাজার হাজার ইস্তাহার বিলি করেছেন।

টাইরসজাতীয় উপগ্রহসমূহ মেঘলোক সম্পর্কে পৃথিবীতে যে সকল ছবি পাঠিয়েছে, ভূগোল, ভূবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে. সে সব বিশেষ কাজে লাগবে। এসম্পর্কে দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে, যেমন—নদী ও সমুদ্রে কি পরিমাণ বরফ রয়েছে আর মোট বরফাচ্ছাদিত স্থান কতটুকু আছে, তার ছবিও ঐ সকল উপগ্রহ পাঠিয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন্যা সম্পর্কে পূর্বাভাস জ্ঞাপনের পক্ষে এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় তথ্য। আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী উপগ্রহ মানুষের যে খুবই কাজে লাগতে পারে, তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। তবে এদের এখনও পুরাপুরি কাজে লাগানো হয় নি।

এখন তিন দিন আগে এবং কোন সময় পাঁচ দিন আগে পর্যন্ত আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা সম্ভব। ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থার কারিগরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরও উন্নতি হলে এক সপ্তাহ অথবা দু-সপ্তাহ পূর্বে পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা সম্ভব হতে পারে। এর ফলে চাষী, শিল্প-ব্যবসায়ী, বিমান কোম্পানী এবং বাড়ী-ঘর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রচুর লাভবান হবে।

আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্বাস নামে আর একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যে সব উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করা হবে, তাদের স্বয়ংক্রিয় ও উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির কার্যকারিতার পরীক্ষা এই উপগ্রহের সাহায্যে চালানো হবে

১৯৬৪ সালের ২৪শে অগাষ্ট জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা প্রথম নিম্বাস নামে উপগ্রহটিকে মহাকাশে প্রেরণ করেন। দিন ও রাত্রি উভয় সময়েই পৃথিবীর আলোকচিত্র গ্রহণ করে পৃথিবীতে প্রেরণ করবার জন্যে এটিকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় নিম্বাস উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬৬ সালের ১৫ই মে। পৃথিবীর তাপমাত্রা থেকে প্রমাণিত হয়, অর্থাৎ সূর্যের তাপ পৃথিবী কতখানি শোষণ করে এবং কতখানি আবহমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়, সে সম্পর্কে সমগ্র পৃথিবীর ভিত্তিতে প্রথম তথ্যাদি সংগৃহীত হয়। ঐ সময়েই ঝড়ের সৃষ্টি ও বিকাশ কিভাবে হয়, কিভাবে ঝড় থেমে যায়, তা জানবার ও বোঝবার জন্যে ঐ সকল তথ্য অপরিহার্য।

আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রথম পর্যায়ে ঐ সকল উপগ্রহ থেকে যে সব চিত্র পৃথিবীর বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়েছে, তাদের ডেভেলপ করা বা ফুটিয়ে তোলবার জন্যে জটিল ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হতো।

এই পরিকল্পনার অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে এই বিষয়টি ছিল একটি বড় রকমের কারিগরী ও আর্থিক সমস্যা। আমেরিকার জাতীয় বিমান ও মহাকাশ সংস্থা এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তারা

তার সমাধানেরও ব্যবস্থা করেছেন। অটোমেটিক পিকচার ট্র্যান্সমিশন নামে একটি সহজ পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এই ব্যবস্থায় রেডিও-ফটো যেভাবে পাঠানো হয়, সেভাবেই মহাকাশ থেকেও আলোকচিত্র পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। টেলিভিশনে ছবি যেভাবে পাঠানো হয়ে থাকে, আগেও সেভাবে পাঠানো হতো।

ভূতলস্থিত যে কোন স্থানের যে কোন কেন্দ্রে ঐ ছবি গ্রহণের সাজসরঞ্জাম থাকলে তাদের সাহায্যে ঐ সকল উপগ্রহ থেকে প্রেরিত ছবি গ্রহণ করতে পারে। ছবি গ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের মূল্য মাত্র পাঁচ হাজার ডলার। মহাকাশ-বিজ্ঞানের গবেষণার ফলাফল যাতে সকলেই পেতে পারে এবং পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চল ঐ সকল তথ্যের ভিত্তিতে যাতে আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানতে পারে, তারই উদ্দেশ্যে আমেরিকা সকল রাষ্ট্রকেই পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছে।

প্রোটিনের অভাব দূরীকরণের উদ্যোগ

বিশ্বব্যাপী আজ যে অন্নাভাব দেখা দিয়েছে, তা দূরীকরণে সম্প্রতি নতুন ধরণের এক প্রকার খাদ্য উদ্ভাবিত হয়েছে। এই খাদ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। যে সব মাছ আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে থাকি, সেই সব মাছ থেকেই এই নতুন খাদ্যবস্তুটি তৈরি হয়েছে। একে বলা হয় ফিস প্রোটিন কন্‌সেনট্রেট বা মাছ থেকে তৈরি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য। জিনিষটি খুবই সস্তা, সুস্বাদু এবং কোন রকম বীজাণু এর মধ্যে নেই।

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক বছরের পর বছর অপুষ্টিতে ভোগে। কারণ তারা কোন রকম জান্তব প্রোটিন খেতে পায় না। তারা যে খাদ্য গ্রহণ করে, তার সঙ্গে কয়েক চামচ এই জিনিষ মিশিয়ে খেলেই সেই অভাব পূরণ হতে পারে।

এই খাদ্য তৈরির জন্যে দশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি কারখানা নির্মাণের তোড়জোড় চলছে আমেরিকায়। ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি এই কারখানাটির উদ্বোধন করা হবে বলে আশা করা যায়। ঐ কারখানায় প্রতিদিন তিন হাজার টন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করা হবে। আমেরিকায় হেক ফিশ নামে এক জাতীয় মাছ পাওয়া যায়। বর্তমানে ঐ মাছ থেকেই এই খাদ্য উৎপাদন করা হবে।

পাঁচ বছর ধরে পর্যালোচনা ও পরীক্ষার পর ইউ. এস. ফুড অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এই খাদ্য মানুষের গ্রহণোপযোগী বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এই পুষ্টিকর দ্রব্য মানুষ পুরা খাদ্য হিসাবেই গ্রহণ করতে পারে। এর মধ্যে আছে শতকরা ৮০ ভাগ অতি উচ্চশ্রেণীর জান্তব প্রোটিন এবং বাকী ২০ ভাগের মধ্যে আছে—ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস, নানা প্রকার ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থ। তরলাকারে বা অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে এই পুষ্টিকর দ্রব্য গ্রহণ করা যেতে পারে। গুঁড়ার আকারেও ব্যবহার করা যায়।

এই জিনিষটি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, দুধে যে প্রকার প্রোটিন পাওয়া যায়, সেই প্রকার প্রোটিন এতে রয়েছে। ৫ পাউণ্ড মাংসে যে পরিমাণ প্রোটিন পাওয়া যায়, ঠিক সেই পরিমাণ প্রোটিন এক পাউণ্ড ফিশ প্রোটিন কনসেনট্রেটে পাওয়া যায়।

নানাদিক থেকে এই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, দূর দেশে প্রেরণ এবং দরিদ্র লোকের গ্রহণের পক্ষে

সুবিধাজনক। এর উৎপাদন খরচ এমনিই অনেক কম। প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করলে এই খরচ আরও কমে যাবে এবং দরিদ্র লোকেরা নামমাত্র মূল্যেই পাবে। তারপর এই খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের জন্যে হিমঘরের প্রয়োজন হয় না এবং ফেলে রাখলেও এর প্রোটিন-মূল্য নষ্ট হয় না। প্যাক করা সহজ এবং অতি অল্প খরচে দূরদেশে প্রেরণ করা যেতে পারে।

এই খাদ্য রুটি ও অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাতে মূল খাদ্যের স্বাদ আদৌ নষ্ট হয় না এবং এতে যে ফিশ প্রোটিন কনসেনট্রেট মেশানো হয়েছে, তা বোঝাই যায় না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভবিষ্যতে প্রোটিনের অভাব মেটাবার উদ্দেশ্যে শিশুদের খাদ্য থেকে নানা রকম খাদ্যের সঙ্গেই এই বস্তুটি মেশানো হবে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক শাকসব্জী ও ডাল খেয়ে বেঁচে আছে। তারা কোন রকম জান্তব প্রোটিনযুক্ত খাদ্য পায় না। এই খাদ্যের সাহায্যে সেই অভাব মেটানো যাবে। এই বস্তুটি অতি পুষ্টিকর, সুস্বাদ ও গন্ধহীন বলে পৃথিবীর সব দেশেই এটি চালু হবে বলে বিজ্ঞানী-দের ধারণা।

এই খাদ্যবস্তুর উন্নতিসাধন ও গবেষণার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার আগামী বছরের জন্যে ৪০ লক্ষ ডলার বরাদ্দ করেছেন। আমেরিকার পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের দুটি পরীক্ষামূলক কারখানার প্রতিটিতে ৫০ টন মাছ থেকে সাড়ে সাত টন প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করা হচ্ছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই খাদ্য কতখানি গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে একটি পরিকল্পনা রূপায়িত করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে মেরিল্যাণ্ডের কলেজ পার্কের ব্যুরো অব কমার্শিয়াল ফিশারিজ লেবরেটরীতে এবং তারই নিকটবর্তী বেলটসভিলের ছোট কারখানায় মানুষের গ্রহণযোগ্য এই খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই বিষয়ে আরও গবেষণা চালাতে হবে। অন্যান্য দেশেও এবিষয়ে গবেষণা হয়েছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরী সমস্যার জন্যে তারা এক্ষেত্রে বেশী দূর এগোতে পারে নি। যুক্তরাষ্ট্র এই সব সমস্যার সমাধান করেছে বলে তারাও উৎসাহিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এর উৎপাদন খরচ যাতে আরও হ্রাস পায় এবং নানা ধরণের মাছ থেকেই যাতে এই খাদ্য উৎপাদন করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে তারও ব্যবস্থা হবে।

পৃথিবীর আজ প্রায় দুই তৃতীয়াংশ লোক বুভুক্ষা ও দুর্ভিক্ষের ভয়ে আতঙ্কিত থাকে এবং অপুষ্টিতে যে কতলোক ভোগে, তার ইয়ত্তা নেই। মার্কিন বিজ্ঞানীদের ধারণা, সমুদ্রে যে অফুরন্ত খাদ্যসম্পদ রয়েছে, তা কাজে লাগাতে পারলে মানুষ এই ভয়ে কোনদিন আতঙ্কিত হবে না। তাঁদের হিসাব অনুসারে সমুদ্র-সম্পদের কোন রকম ক্ষতি না করে প্রতি বছর সমুদ্র থেকে ৫০০০০ কোটি পাউণ্ড মাছ সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে এই সম্পদের শতকরা ১৫ ভাগের বেশী কাজে লাগানো হয় না, বাকী ৮৫ ভাগই অপচিত হয়ে থাকে।

পাতার মাধ্যমে রাসায়নিক সার প্রয়োগে ধানের ফলন বাড়ানো যায়

ভারতীয় কৃষি-অনুসন্ধান সংস্থার গবেষণার ফলে দেখা গেছে—পাতার মাধ্যমে রাসায়নিক সার প্রয়োগে ধানের ফলন কার্যকরীভাবে বৃদ্ধি করা যায়।

ধোয়ানী এবং নাইট্রোজেন বিয়োগের মাধ্যমে ডাঙা জমির ধান চাষের অবস্থায় প্রয়োগ করা নাইট্রোজেনের অপচয় প্রায়ই ঘটে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, প্রয়োগ করা নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা বাড়াবার জন্যে পাতার উপর ইউরিয়ার দ্রবণ সিঞ্চন করে নাইট্রোজেন প্রয়োগ লাভজনক।

ভারতীয় কৃষি-গবেষণা সংস্থার মাটি প্রবেশ্য হবার দরুণ ধোয়ানীর জন্যে নাইট্রোজেনের অপচয় অত্যন্ত বেশী এবং এই কারণে পাতার উপর নাইট্রোজেন প্রয়োগের কার্যকারিতা দেখবার জন্যে ১৯৬৬ সালের খরিফ মরশুমে একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দুটি পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়—(১) পুরাপুরি মাটিতে এবং (২) অর্ধেক মাটিতে এবং বাকী অর্ধেক ৪ বারে পাতার উপর প্রয়োগ। মাটিতে প্রয়োগের সময় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের নাইট্রোজেন প্রয়োগের শতকরা ৭৫ ভাগই কাদানের ৩-৪ দিন আগে মাটিতে যথাস্থানে প্রয়োগ করা হয়। বাকী নাইট্রোজেন রোয়া বসাবার ৩০ দিন পরে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়। পাতার উপর নাইট্রোজেন প্রয়োগ ৮০ কি. গ্রা. নাইট্রোজেনের হিসাবের বেলায় ৫-৭ দিন অন্তর ৪টি সমান ভাগে প্রয়োগ করা হয় এবং অন্য দুটি হারে প্রয়োগের বেলায় ৬টি সমানভাগে প্রয়োগ করা হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রোয়া বসাবার ২৫ দিন পরে প্রয়োগ সুরু করা হয়। পাতার উপর প্রয়োগে ৩টি হারের গাঢ়তা শতকরা ২'২, ৩'৭ এবং ৪'৪ ভাগ রাখা হয়। পাতার উপর ইউরিয়া ধরে রাখবার জন্যে টীপল বি-৩০০ ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক প্রয়োগ হিসাবে সব জমিতেই সমহারে সিঙ্গল সুপারফস্ফেট হিসাবে হেক্টর প্রতি ৪০ কি.গ্রা. ফস্ফেট এবং পটাসিয়াম সালফেট হিসাবে ৪০ কি.গ্রা. পটাস দেওয়া হয়।

মাটিতে প্রয়োগের বেলায় ৪০ কি.গ্রা. প্রয়োগে নাইট্রোজেনহীন নিয়ন্ত্রিত জমির চেয়ে দানা এবং খড়ের উৎপাদন দর্শনীয়রূপে বেশী বলে প্রমাণিত হয় নি। মাটিতে নাইট্রোজেনের প্রয়োগ আরও বাড়াবার ফলে পূর্ববর্তী প্রয়োগের চেয়ে দানা এবং খড়ের ফলন দর্শনীয়রূপে বৃদ্ধি পায় এবং ২৪০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন পর্যন্ত একইরূপে বাড়ে।

নাইট্রেজেনের প্রয়োগ অর্ধেক মাটিতে এবং অর্ধেক পাতায়। ১৬০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগ মাটির মাধ্যমে সমপরিমাণ নাইট্রোজেন প্রয়োগের তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়। মাটিতে ৫০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন এবং পাতার মাধ্যমে ৪০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগের ফলে যে ফলন পাওয়া যায়, তা কেবলমাত্র মাটির মাধ্যমে ১৬০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগের সমতুল্য বলে দেখা যায়। একইরূপে মাটিতে ৮০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন এবং পাতায় ৮০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগের ফলে যে ফলন পাওয়া যায়, তার সঙ্গে কেবলমাত্র মাটিতেই ২৪০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগে যে ফলন হয়, তার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আবার সর্বোচ্চ পরিমাণ নাইট্রোজেনের প্রয়োগ অর্থাৎ হেক্টর প্রতি ২৪০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন ভাগাভাগি করে প্রয়োগ করায় কেবলমাত্র মাটিতে প্রয়োগের সঙ্গেই কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না।

প্রতি কি.গ্রা. নাইট্রোজেন দানা উৎপাদনের সর্বোচ্চ পরিমাণ দেখা যায় ৪০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন মাটিতে এবং ৪০ কি.গ্রা. নাইট্রোজেন পাতায় প্রয়োগে। শুধু তাই নয়, রাসায়নিক সারের জন্যে ব্যয় করা প্রতিটি টাকার সর্বোচ্চ লাভজনক ফলনও এই হারে প্রয়োগে পাওয়া যায়।

১নং তালিকা। হেক্টর প্রতি ধানের দানা এবং খড়ের ফলন কুইন্টালে

ক্টর প্রতি কি.গ্রা. নাইট্রোজেন	দানা	খড়
০	২৩·৬	২০·৮
৮০ মাটিতে	২৮·৯	২৫·৬
১৬০ মাটিতে	৪২·৯	৩৮·৩
২৪০ মাটিতে	৫৪·০	৫০·৩
৪০ মাটিতে+৪০ পাতায়	৪০·২	৩১·৯
৮০ মাটিতে+৮০ পাতায়	৫০·৯	৪৩·৩
১২০ মাটিতে+১২০ পাতায়	৫৪·৩	৪৬·১

২নং তালিকা। ধানের দানা উৎপাদনে মাটি এবং পাতায় প্রয়োগ করা নাইট্রোজেনের কার্যকারিতা এবং রাসায়নিক সারের জন্যে ব্যয় করা প্রতি টাকায় নীট আর্থিক লাভ।

ক্টর প্রতি কি.গ্রা. নাইট্রোজেন	দানা উৎপাদনের যোগ্যতা (প্রতি কি.গ্রা. নাইট্রোজেন প্রয়োগে কি.গ্রা. দানা)	রাসায়নিক সারের জন্যে ব্যয় করা প্রতি টাকায় নীট লাভ টাকায়
৮০ মাটিতে	৬·৬২	১·০০
১৬০ মাটিতে	১২·০৬	২·৮২
২৪০ মাটিতে	২০·৭৫	৩·০৮
৪০ মাটিতে + ৪০ পাতায়	২০·৭৫	৩·৮৮
৮০ মাটিতে + ৮০ পাতায়	১৭·০৬	৩·৩৩
১২০ মাটিতে + ১২০ পাতায়	১২·৭৯	২·৩৫

[ভারতীয় কৃষি-অনুসন্ধান পরিষদ]

বিকিরণ-বিষঘ্ন রাসায়নিক

সন্দীপকুমার বসু

জীবদেহের উপর আয়ননকারী (Ionizing) বিকিরণের বহুবিধ বিষক্রিয়া এখন সুবিদিত। অথচ শিল্পোদ্যোগে ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে আয়ননকারী বিকিরণের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকিরণের এই বর্ধিত প্রয়োগের ফলে আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্ভাব্যতাও বাড়ছে। সুতরাং মানবদেহের উপর বিকিরণের বিষক্রিয়া প্রতিরোধের উপায় নিরূপণ সম্প্রতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। সন্ধান চলছে, এমন কোন রাসায়নিক পদার্থের, যা সেবন করলে অত্যধিক মাত্রার বিকিরণও মৃত্যু বা স্বাস্থ্যহানি ঘটাতে পারবে না। গত দশ বছরে মানবেতর প্রাণিদেহে বহুসংখ্যক রাসায়নিক পদার্থের বিকিরণ-বিষঘ্নতা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর ফলে নিম্নতম হানিকর মাত্রার দ্বিগুণ পরিমাণ বিকিরণের বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম কয়েকটি রাসায়নিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবাঞ্ছনীয় নানা প্রতিক্রিয়ার জন্যে এগুলি অবশ্য মানবদেহে প্রয়োগ করা যায় না। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে মানবদেহে প্রযোজ্য বিকিরণ-বিষঘ্ন রাসায়নিক পদার্থও আবিষ্কৃত হবে।

জীবকোষে বিকিরণজনিত বিষক্রিয়া দু-ভাবে ঘটে। বিকিরণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের ফলে কোষের বিভিন্ন অণুর রাসায়নিক বিকৃতি ঘটতে পারে, অথবা বিকিরণের (Irradiation) ফলে জীবকোষের জল (শতকরা ৮০ ভাগ) বিয়োজিত হয়ে যে সব সক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি করে, সেগুলি কোষের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অণুগুলির ক্ষতিসাধন করতে পারে। জল বিকিরণজাত H● এবং OH●-মুক্ত মূলকগুলিই (Free radical) সর্বাধিক ক্ষতিকর। প্রচণ্ড রকমের সক্রিয়তাসম্পন্ন এই সব আণবিক ছিন্নাংশগুলিতে একটি করে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে—কোন কোন মুক্ত মূলকের ক্রিয়াশীলতা এত বেশী যে, শুধু পরম শূন্য তাপমাত্রার (-২৭৩° সে.) কাছাকাছিই সেগুলি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। জল থেকে উৎপন্ন এই মুক্ত মূলকগুলি পরস্পর বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ও জলে পরিণত হয় বা কোষের বৃহত্তর অণুগুলিকে আক্রমণ করে ব্যাপক ও দ্রুত ক্ষতিসাধন করে। মূলতঃ বিকিরণের এই পরোক্ষ ক্রিয়াই জীবকোষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

বিকিরণের মোট শক্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ মাত্র এই সব রাসায়নিক পরিবর্তনে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্টাংশ তাপে রূপান্তরিত হয়। দেখা গেছে, ১০০০ র‍্যাড (Rad) মাত্রার বিকিরণ থেকে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, তাতে একটি জীবকোষের তাপমাত্রা এক ডিগ্রীর এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র বাড়তে পারে। বিকিরণজনিত বিষক্রিয়ার তীব্রতা, প্রযুক্ত বিকিরণের প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। এক্স-রশ্মি, গামারশ্মি, এমন কি, দ্রুত নিউট্রনজনিত বিষক্রিয়া দূর করতে অধিকাংশ বিষঘ্ন রাসায়নিক যে পরিমাণে প্রয়োগ করতে হয়, একটি আলফা কণাজনিত বিষক্রিয়া প্রতিরোধে তার প্রায় হাজার গুণ বেশীর প্রয়োজন হয়।

বিকিরণ-প্রবৃত্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ অক্সিজেনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। বিকিরণের ফলে জল বিয়োজিত হয়ে H● ও

OH•-মুক্ত মূলক উৎপাদন করে। অক্সিজেনের সান্নিধ্যে H• এবং আণবিক অক্সিজেনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে তীব্র জারকধর্মী HO_2• বা পারক্সি (Peroxy) মূলক সৃষ্টি হয়। পারক্সি মূলকগুলি জৈব অণুগুলিকে জারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধ্বংস করে। অক্সিজেনবিহীন জলে বিকিরণ-ক্রিয়া ঘটালে উপরিউক্ত বিক্রিয়ার পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে জৈব অণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলাকারে অতিকায় অণুতে পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিথাইল অ্যালকোহলের অতি লঘু জলীয় দ্রবণে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে গামারশ্মি প্রয়োগ করলে প্রধানতঃ ফর্ম্যালডিহাইড, ফর্মিক অ্যাসিড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, বিভিন্ন পারক্সাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। অথচ অক্সিজেনবিহীন অবস্থায় অনুরূপ ক্ষেত্রে উপরিউক্ত জারিত পদার্থসমূহের উৎপাদন অনেক কমে যায় এবং প্রধানতঃ ইথিলিন গ্লাইকল উৎপন্ন হয়। অক্সিজেনের সান্নিধ্যে বিকিরিত দ্রবণে পলিমারাইজ্‌ড্ (Polymerized) অতিকায় অণুগুলির ক্ষুদ্রতর খণ্ডে ভেঙ্গে যাবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অক্সিজেন না থাকলে এই বিয়োজন অনেক কম হয় এবং অনেক সময় বিভিন্ন সরল শৃঙ্খল 'ক্রশ-লিঙ্কে'র (Cross-link) দ্বারা যুক্ত হয়ে পড়ে।

জীবদেহে বিকিরণজনিত বিষক্রিয়া অক্সিজেনের সান্নিধ্যে তীব্রতর হয়। ১৯১০ সালে প্রথম লক্ষ্য করা হয় যে, অক্সিজেন সরবরাহ কমালে দেহের কোন কোন কলার বিকিরণ-সহনশক্তি বৃদ্ধি পায়। দেখা গেছে যে, একখণ্ড কাঠ ত্বকের উপর জোর করে চেপে ধরলে এক্স-রশ্মি ত্বকের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। নিম্নোক্ত পরীক্ষায় অক্সিজেনের এই বিকিরণ-বিষক্রিয়াবর্ধক ধর্মটি প্রমাণিত হয়েছে। এই পরীক্ষায় ৯৫% নাইট্রোজেন ও ৫% অক্সিজেন সমন্বিত পরিবেশে একদল ইঁদুরের উপর ৮০০ র‍্যাড বিকিরণ প্রয়োগ করে দেখা গেছে, ত্রিশ দিন পরে তাদের একটিও মরে নি। কিন্তু সাধারণ বায়ুতে সমপরিমাণ বিকিরণ প্রয়োগে সবকয়টি ইঁদুরই মারা যায়। স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, যে সব রাসায়নিক পদার্থ দেহকলার অক্সিজেনের পরিমাণ কমাতে পারে, সেগুলির বিকিরণ-বিঘ্নতা থাকা সম্ভব। সায়ানাইড ও প্যারাঅ্যামিনোপ্রোপিয়োফেনোন সম্ভবতঃ এই কারণেই ইঁদুরের বিকিরণ-সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। নিম্ন তাপে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেহকলায় অক্সিজেন দ্রুত ব্যয়িত হয় এবং তাদের বিকিরণ-প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি পায়।

ট্রিপ্‌টোফেন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডটি জীবদেহের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। জীবকোষে এথেকে ৫-হাইড্রক্সিট্রিপ্‌ট্যামিন নামক একটি উৎকৃষ্ট বিকিরণ-বিঘ্ন পদার্থ প্রস্তুত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাণিদেহের মসৃণ পেশী সংকোচন ও কলায় অক্সিজেন মোক্ষণে এটির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যে সব রাসায়নিক পদার্থ ৫-হাইড্রক্সিট্রিপ্‌ট্যামিনের উপরিউক্ত কার্য সম্পাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, সেগুলি এর বিকিরণ-বিঘ্নতাও নষ্ট করে। হিস্টামিন, এপিনেফ্রিন প্রভৃতিও স্থানবিশেষে অক্সিজেন অভাব (Localized anoxia) সৃষ্টি করে' বিকিরণজনিত বিষক্রিয়া নিবারণ করে। উপরিউক্ত রাসায়নিক পদার্থসমূহ প্লীহায় অক্সিজেনের চাপ কমায়। লক্ষ্য করা গেছে, প্লীহায় অক্সিজেনের চাপের হ্রাস ঘটলে বিকিরণ-বিষক্রিয়া ব্যাহত হয়। প্লীহায় অক্সিজেনের চাপ স্বাভাবিকের মাত্র ১০% হলে বিকিরণ-সহনশক্তি চরম মানে পৌঁছায়।

জীবকোষে সালফাইড্রিল (Sulphydıyl) মূলক সমন্বিত কয়েকটি বেশ ফলপ্রদ বিকিরণ-বিঘ্ন পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিষ্টিন (Cysteine) নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড ও গ্লুটাথায়োন নামক সিষ্টিন সমন্বিত একটি ট্রিপেপ্টাইড (Tripeptide) এই শ্রেণীর বিকিরণ-বিঘ্ন পদার্থের মধ্যে মুখ্য। এক্স-রশ্মির বিষক্রিয়া

থেকে চোখ রক্ষার জন্তে এই যৌগ দুটি ব্যবহার করে বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গেছে। সালফার ও হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রত্যক্ষ যোজনের ফলে উৎপন্ন —SH বা সালফাইড্রিল মূলকটিই এই শ্রেণীর যৌগসমূহের বিকিরণ-বিষঘ্নতার মূলাধার। প্রাণীদেহে বহুসংখ্যক সালফার সমন্বিত পদার্থের বিকিরণ-বিষঘ্নতা পরীক্ষা করে বেশ কয়েকটি আশাপ্রদ রাসায়নিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে AET, MEG, সিস্টামিন (Cysteamine) ও অ্যামোনিয়াম ডাইথায়োকার্বামেট বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সালফার যৌগগুলি কিভাবে বিকিরণজনিত বিষক্রিয়া নিবারণ করে, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীমহলে এখনো মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অনেকের মতে এই শ্রেণীর যৌগগুলি প্রাণীদেহের বিভিন্ন বিকিরণ-সংবেদী কলায় (বিশেষতঃ অস্থিমজ্জায়) ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রোটিন বা অন্যান্য বিবিধ অণুর সঙ্গে রাসায়নিক বন্ধনে যুক্ত হয়। প্রোটিনে বিকিরণ-সংবেদী দুর্বল ডাইসালফাইড (—S—S—) যোজক এবং—SH মূলক থাকে। সালফার সমন্বিত বিকিরণ-বিষঘ্ন রাসায়নিক নতুন —S—S—যোজকের মাধ্যমে প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিকিরণের প্রত্যক্ষ সংঘাত বা জল বিয়োজনজাত বিবিধ সক্রিয় মূলকের ক্রিয়া থেকে উক্ত প্রোটিন অণুগুলিকে রক্ষা করে। অধিকাংশ সালফার যৌগই কিন্তু কলার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে রাসায়নিক যোজকের চেয়ে দুর্বলতর গ্রন্থিবদ্ধ সালফার যৌগগুলি বিকিরণজাত মুক্ত মূলকসমূহের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কলার বিকিরণ-সংবেদী কেন্দ্রগুলিকে রক্ষা করে।

সার্বিক বিকিরণ-বিষঘ্নতাসম্পন্ন এমন কোন রাসায়নিক এখনো আবিষ্কৃত হয় নি, যা সকল শ্রেণীর বিকিরণের বিষক্রিয়া থেকে দেহের সমস্ত কলাকে রক্ষা করতে পারে। সম্প্রতি বিকিরণ-বিষঘ্নী বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ প্রয়োগ করে বেশ আশাব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। নানাবিধ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার জন্তে আলোচিত বিকিরণ-বিষঘ্ন পদার্থগুলি এখনো মানবদেহে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই সব অসুবিধা দূর করা সম্ভব হবে। আজকের সভ্যতার অগ্রগমনে পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং বিকিরণজনিত বিষক্রিয়া নিবারণের উপায় নির্ধারিত হলে এযুগে মানুষের স্বাস্থ্যের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ দূর হবে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্র

রণন বন্দ্যোপাধ্যায়

অণুবীক্ষণ যন্ত্র যে শুধু জীববিদ্যা শিক্ষাতেই কাজে লাগে, তা নয়—বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাতেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যের দরকার হয়।

এই যন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। মধ্য যুগে সাধারণ লেন্স ব্যবহারের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। ঐ লেন্সগুলির ১০ থেকে ২০ গুণের বেশী বর্ধিতকরণের শক্তি ছিল না।

প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায় বহু জিনিষ আবিষ্কারের কথা শোনা যায়, কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ধারণা তাঁদের ছিল না। এমন কি, পাশ্চাত্য

সভ্যতার প্রথম দিকেও এই যন্ত্র সম্বন্ধে কোনও ধরণের উল্লেখ ইতিহাসে নেই।

১৬০০ শতাব্দীর কিছু পূর্বে ইউরোপে প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি হয়। অবশ্য একথা সত্য যে, তখনকার যন্ত্র ছিল খুবই সাধারণ। ১৬১০ সালে গ্যালিলিও একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন ও তার সাহায্যে বহু ক্ষুদ্র প্রাণীর দৈহিক গঠন পর্যবেক্ষণ করেন। গ্যালিলিওর পথ-প্রদর্শকের মধ্যে লেভেনহুক নামে একজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে লেভেনহুক খেয়ালের বশে ২৪৭টি অণুবীক্ষণ লেন্স তৈরি করেন। ঐ লেন্সগুলির সাহায্যে জলের ছোট ছোট কীটাণু দেখা সম্ভব হতো। লেভেনহুক ঐ কীটাণুগুলিকে Animalcula বলে অভিহিত করেছিলেন।

লেভেনহুকের প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে একটি ছোট নলের একদিকে একটি মাছ এবং অপর দিকে একটি ফ্রেমের উপর লেন্স রাখবার ব্যবস্থা ছিল। এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি মাছের শরীরের রক্ত চলাচল দেখতে পান।

লেভেনহুকের পরের দিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্র-গুলির ৪০ থেকে ২৭০ গুণ পর্যন্ত পরিবর্ধন-শক্তি ছিল। তিনি ঐ যন্ত্রগুলিতে একটির বদলে দুটি লেন্স ব্যবহার করেন।

১৬৬৫ সালে ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রবার্ট হুক মাইক্রোগ্রাফিয়া নামে একটি বই লেখেন। তিনি একটি যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে-ছিলেন এবং ঐ বইটিতে যন্ত্রটির বিবরণ প্রদান করেন।

রবার্ট হুকের যন্ত্রটি তখনকার দিনের অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা খুবই উন্নত ধরণের ছিল। এর দ্বারা তিনি খনিজ পদার্থ, বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। তাছাড়া তিনি গাছের ছাল পরীক্ষা করে যে বিবরণ দেন, তা সর্বত্র পরিচিত। ঐ পরীক্ষার উপর ভিত্তি করেই বর্তমান কোষ সম্পর্কিত মতবাদ (Cell theory) খাড়া করা হয়।

রবার্ট হুকের পূর্বে আর কারোর উদ্ভিদ-কোষ সম্বন্ধে কোনও ধারণা ছিল না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে হুক প্রথম কোষ বা সেল আবিষ্কার করেন।

লেভেনহুকের পরে বহু বৈজ্ঞানিক নানাভাবে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে চেষ্টা করেন। এই যন্ত্রের ক্রিয়াপদ্ধতি বর্ণনা করবার আগে—কিভাবে কোনও জিনিষকে বড় করে দেখা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার।

আলোক-রশ্মি কাচ বা জলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বেঁকে যায়। এই বাঁকা রশ্মিই যে কোনও জিনিষের ছায়াকে বড় করে।

বড় করে দেখবার জন্যে সবচেয়ে সহজ যন্ত্র হলো হাত লেন্স (Hand Lens)। ১৬০০ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকেরা আবিষ্কার করেন যে, একটি লেন্সের সাহায্যে কোনও জিনিষের ছায়াকে বড় করে আবার তাকে অন্য আর একটি লেন্স দিয়ে আরও বড় করে দেখা সম্ভব। একটি নলের দুই প্রান্তে দুটি বিভিন্ন শক্তির লেন্স বসিয়ে প্রথম যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা হয়।

এবার বিভিন্ন ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

আমেরিকার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কতক-গুলি বিশেষ ধরণের আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রগুলি সবই যৌগিক এবং বড় করে দেখবার জন্যে সেগুলিতে কয়েকটি করে লেন্স থাকে। দুই রকমের লেন্স এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয়। যেমন—আই-পিস, যার সাহায্যে কোনও বড় জিনিষকে দেখা যায় এবং অবজেকটিভ, যাতে বিভিন্ন শক্তির লেন্স থাকে। একটি ছোট আয়নার সাহায্যে আলো ধরা হয় এবং সেই আলো লেন্সের ভিতর

দিয়ে পর্যবেক্ষকের চোখে পড়ে। সংক্ষেপে এই হলো যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্রিয়া-পদ্ধতি। এই যন্ত্রের আর একটি নাম Standard Microscope। করা হয়। ঐ যন্ত্রের নাম Stereoscopic Dissecting Microscope। এর দ্বারা কোন অস্বচ্ছ জিনিষকেও পরীক্ষা করা সম্ভব।

ষ্টিরিওস্কোপিক ডিসেক্‌টিং মাইক্রোস্কোপ।
(বাউশ অ্যাণ্ড ল্যাম্ব-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

এর দ্বারা বিভিন্ন সেলের প্রতিকৃতি ১০০ থেকে ৪৩০ গুণ বড় করে দেখা যায়।

উচ্চ বিদ্যালয়ে সাধারণ যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া অন্য আর এক ধরণের যন্ত্রও ব্যবহার

সাধারণ যৌগিক যন্ত্রে খুব ছোট জিনিষ ছাড়া বড় কিছুকে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই যন্ত্রে একটু বড় জিনিষকেও দেখা যায়। খুব বড় করবার শক্তি না থাকলেও এর দ্বারা

কোনও কিছুকে ব্যবচ্ছেদ করা সহজ। এর বড় করবার শক্তি মাত্র ৪ থেকে ৬০ গুণের মধ্যে। একটির বদলে ২টি আই-পিস এতে ব্যবহার করা হয়। ফলে যে কোনও জিনিষের ছায়াকেই ত্রিমাত্রিক দেখায়। সাধারণ যৌগিক যন্ত্রের সঙ্গে এর আর একটি তফাৎ এই যে, অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহের গঠন পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই যন্ত্রে ২টি আই-পিস ও ১টি অবজেকটিভ থাকে। যেহেতু যৌগিক যন্ত্রে পরীক্ষাধীন পদার্থের ভিতর দিয়ে প্রেরিত আলোর সাহায্য নেওয়া হয়, সেহেতু খুব পাত্‌লা জিনিষ ছাড়া এই যন্ত্রে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়।
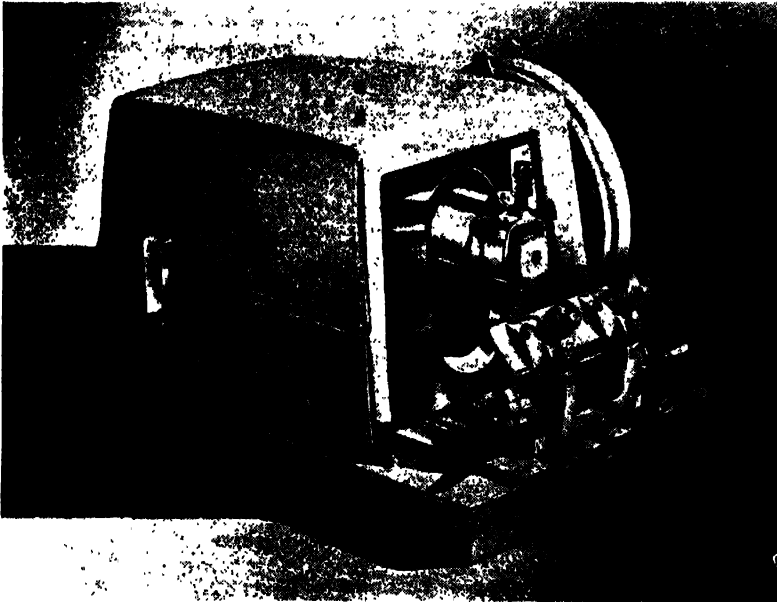
নাইফহোল্ডারসহ রোটারী মাইক্রোটোম।
[আমেরিকান অপ্টিক্যাল কোং, ইনস্ট্রুমেন্ট ডিভিসন
(বাফেলো)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

প্রতিফলিত আলোর সাহায্যে যে কোনও জিনিষের ছায়া এই যন্ত্রে ধরা যায়।

যে সব ছাত্র ডাক্তার হবার জন্যে কলেজে যান, তারা Bacteriological, Medical বা Research Microscope ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রগুলির সাধারণতঃ ১০০০ থেকে ১,৫০০ পর্যন্ত কোনও জিনিষকে বড় করে দেখাবার ক্ষমতা থাকে। এর দ্বারা ব্যাকটিরিয়া বা

১৮৭০--১৯০০ সালের মধ্যে সেলের গঠন পরীক্ষার জন্যে কি ভাবে তাকে কেটে ও রঞ্জিত করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্যে তৈরি করা হবে, সে সব বিদ্যা বৈজ্ঞানিকেরা আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এর দ্বারা সেলের ভিতরে কি আছে, তা বিশদভাবে জানা যায় নি।

১৯০০ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাইক্রোটোম যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার ফলে যে কোনও জিনিষকেই

খুব পাত্‌লা করে কাটা সম্ভব হলো। বর্তমানে বহু রকমের মাইক্রোটোম বাজারে দেখা যায়, কিন্তু যেগুলি সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো Rotary Microtome।

চাকৃতির ভিতর রেখে তাকে একটি হাতলের সঙ্গে লাগানো হয়। হাতলটিকে আবার চাকার সাহায্যে একটি ধারালো ছুরির গা ঘেঁষে ঘোরানো হয় এবং তার ফলে চাকৃতিটি খুব পাত্‌লা
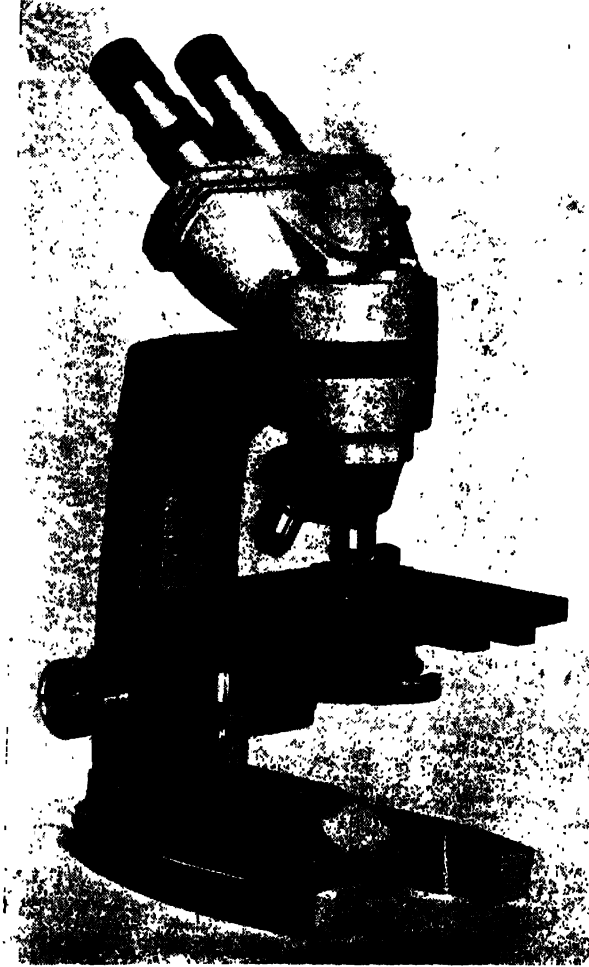
মাইক্রোষ্টার মাইক্রোস্কোপ।

[আমেরিকান অপ্টিক্যাল কোং, ইনস্ট্রুমেণ্ট ডিভিসন (বাফেলো)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

কোন জিনিষকে খুব পাত্‌লা করে কাটাকে বলা হয় সেকসন করা। মাইক্রোটোমে কাটা একটি ছোট অংশকে এক টুকরা প্যারাফিনের

টিস্যু কাগজের মত কাটা হয়ে যায়। ঐ কাটা অংশগুলিকে আঠালো পদার্থ মাখানো কাচের স্লাইডে বসিয়ে বেঞ্জিন বা জাইলিনের দ্বারা

প্যারাফিনমুক্ত করে পরিস্রুত জলে ধুয়ে নিতে হয়। এর পর সেগুলিকে কোনও একটি বিশেষ রঞ্জক পদার্থের সাহায্যে রঞ্জিত করা হয়। রং করবার ফলে পাত্‌লা টুক্‌রার ভিতরের কতকগুলি অংশকে ভাল করে দেখা যায়। এরপর কয়েক ফোঁটা গলানো প্লাষ্টিকের মত পদার্থের সাহায্যে জিনিষটিকে পাত্‌লা কাচের কভার স্লিপ দিয়ে ঢেকে নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় বসিয়ে পরীক্ষা করা হয়।

১৯৩৫ সালে নেদারল্যাণ্ডে Fritz Zernike আর এক ধরণের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যেটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের সব বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের নাম হলো Phase-contrast Microscope।

ক্যামেরাসহ মাইক্রোষ্টার মাইক্রোস্কোপ।
[আমেরিকান অপ্টিক্যাল কোং, ইনষ্ট্রুমেণ্ট ডিভিসন, (বাফেলো)-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত]

সাধারণ যৌগিক যন্ত্রে কোনও জীবিত সেল দেখা সম্ভব নয়। সেলের ভিতরের ক্রোমোসোম ও মাইটোকনড্রিয়া বেশ স্বচ্ছ এবং এদের গঠন পরীক্ষা করা খুবই শক্ত। Phase-contrast Microscope-এ জীবিত সেলের বিভিন্ন অংশ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। যখন এই যন্ত্রের সঙ্গে Time-Lapse - Motion Picture - Photography-র ব্যবস্থা একত্রে ব্যবহার করা হয়, তখন সেলের বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়া-পদ্ধতি বিশদভাবে দেখা যায়। কোনও জিনিষের ছায়াকে যত বড় করা যাবে, তত ভালভাবে তার ভিতরের গঠন দেখা যাবে, একথা যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও বাস্তবে ঠিক তা নয়।

আলো অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

আলোর কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম আছে। এই বিশেষত্ব থাকায় যৌগিক যন্ত্রের বড় করে দেখাবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

আলোর সাহায্যে কোনও জিনিষকে বড় করে দেখাবার সামর্থ্যের নাম হলো পরিবর্ধন ক্ষমতা। এর সঙ্গে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আর একটি গুণও খুব দরকারী। এর নাম হলো Resolving power, যার সাহায্যে খুব কাছাকাছি দুটি জিনিষের ছায়াকে আলাদাভাবে চোখে দেখা সম্ভব।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের Resolving power খুব বেশী নয়। বর্তমান যুগের সর্বাধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র হলো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। এই যন্ত্রে সাধারণ আলোর পরিবর্তে ইলেকট্রন ব্যবহার করা হয় এবং সেই কারণে এই যন্ত্রের Resolving power খুব বেশী।

একটি বড় সিলিণ্ডারের ভিতর থেকে যতটা সম্ভব হাওয়া বের করে নিয়ে তার ভিতরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে ফিলামেন্ট উত্তপ্ত করলে অনেক ইলেকট্রন পাওয়া যায়। অবশ্য এই ইলেকট্রনগুলিকে দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু একটি পর্দায় যদি স্বদীপক পদার্থ মাখানো থাকে, তবে ইলেকট্রনগুলি যখনই তাতে ধাক্কা খাবে, তখনই সেখানে একটি আলো দেখা যাবে এবং তার সাহায্যে কোনও জিনিষের ছায়াকে ধরা সম্ভব হবে। বৈদ্যুতিক চুম্বকের সাহায্যে ইলেকট্রন রশ্মিকে ফোকাস করা সম্ভব।

১৯৩০ সালে দু-জন জার্মান বৈজ্ঞানিক প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন। অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা পরে ঐ যন্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৯৫০ সালের ভিতর সেলের গঠন পরীক্ষার জন্যে এই যন্ত্র জীব-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগের ছবিতে সাধারণ আলো অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তফাৎ দেখানো হয়েছে। এই যন্ত্র যতই আধুনিক হোক, এর কতকগুলি দোষও আছে। যেমন, খুব পাতলা জিনিষ ছাড়া এতে পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। আর একটি দোষ এই যে, প্রত্যেক জিনিষকেই না শুকিয়ে সিলিণ্ডারের ভিতর রাখা যাবে না। বৈজ্ঞানিকেরা কি ভাবে এই যন্ত্রটি আরও উন্নত করা যায়, যে সম্বন্ধে মাথা ঘামাচ্ছেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

কোয়াসারের রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা

এখন যে ট্রান্সআটলান্টিক রেডিও-সংযোগ ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সেটি কার্যকরী হলে বিজ্ঞানীরা সুযোগ পাবেন, সুদূর বিস্তারী অভিকায় রেডিও-টেলিস্কোপ নিয়ে ভূমণ্ডল পরীক্ষা করে দেখবার।

এই সংযোগ ব্যবস্থার একদিকে থাকবে উত্তর-পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের জড্রেল ব্যাঙ্কের পরীক্ষা-কেন্দ্রের রেডিও-টেলিস্কোপটি, অন্যটি থাকবে ক্যানাডায় অথবা যুক্তরাষ্ট্রে।

যে সকল রেডিও-জ্যোতির্বিজ্ঞানী এই অবস্থায় কাজ করবেন, বিশেষভাবে তাঁরা চাইছেন কোয়াসার বা আকাশের রহস্যময় রেডিও-উৎস-সমূহের সঠিক পরিমাপ ও অবস্থান নির্ণয় করতে। ছুটি ভিন্ন ভিন্ন রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে এই সকল উৎস থেকে সংগৃহীত রেডিও ও শব্দের রেকর্ডিং এক সঙ্গে চালিয়ে দেখা যেতে পারে। এতে যে সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হবে, তা Interference বা পরস্পরের উপর ক্রিয়ার প্যাটার্ণ বুঝতে সাহায্য করবে। এথেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বুঝে নিতে পারবেন, একটি কোয়াসারের ব্যাস কতটা এবং মহাকাশের কোথায় তার অবস্থান।

সাধারণভাবে এই ছুটির বেস-লাইন যতই দীর্ঘ হবে, এই পদ্ধতিতে ততই সঠিকভাবে কাজ করা যাবে, অবশ্য ব্যবহৃত ফ্রিকোয়েন্সির উপর তা অনেকটা নির্ভর করবে।

বৃটেনে জড্রেল ব্যাঙ্কের একটি রেডিও-টেলিস্কোপ এবং পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের ম্যালভার্নের রয়েল রেডার এষ্টাব্লিসমেন্টের আর একটি রেডিও টেলিস্কোপ ব্যবহার করে এই ধরণের পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। ক্যানাডার অন্টারিওতে এবং বৃটিশ কলাম্বিয়ায় এই যন্ত্রাদি নিয়ে একটি ২,০০০ মাইল দীর্ঘ বেস-লাইন ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু বৃটেন ও উত্তর আমেরিকার মধ্যে পরিকল্পিত সংযোগ ব্যবস্থার বেস-লাইন হবে দীর্ঘতম এবং তা যতদূর সম্ভব নির্ভুলভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে।

আলুর রোগ সম্পর্কে গবেষণা

সিমলায় কেন্দ্রীয় আলু গবেষণা-সংস্থা আলুর একটি সাধারণ রোগ সম্পর্কে গবেষণা করছেন। এই রোগটির নাম "হেয়ারী স্প্রাউট" বা 'রোমশ উদ্গম'। গবেষকেরা এই রোগের কারণ অনুসন্ধান করছেন এবং কোন্ কোন্ জাতের আলুর এই রোগ প্রতিরোধক শক্তি আছে, তা পরীক্ষা করে দেখছেন। এক ধরণের ভাইরাস বিশেষ পরিবেশে এই রোগ জন্মাতে সাহায্য করে বলে অনুমান করা হয়। বিজ্ঞানীরা এ-সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

মহিষের দেহের ক্যান্সার সম্পর্কে গবেষণা

মহিষের দেহে ক্যান্সারের আক্রমণ রোধ করবার জন্যে ভারতীয় পশু-রোগ গবেষণা-সংস্থা গবেষণা করছেন। পশু-রোগ বিজ্ঞানীরা গবাদিপশু, বিশেষতঃ ভারতীয় মহিষের দেহে ক্যান্সার সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করবেন। এই গবেষণার ফলে যেসব তথ্য পাওয়া যাবে, তা মানুষের ক্যান্সার রোগ সম্পর্কিত গবেষণাতেও সহায়তা করতে পারে।

হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে জমাট রক্ত পরিষ্কারের নতুন পদ্ধতি

হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে এমন একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রে আবিষ্কৃত হয়েছে, যার ফলে বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা পেতে পারে। এই নতুন পদ্ধতিতে তীব্রবেগে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রবেশ করিয়ে দিয়ে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত রোগীর হৃৎপিণ্ডের ধমনীতে জমাট রক্ত পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। এতে হৃৎপিণ্ডের কোন ক্ষতি হয় না। বর্তমানে প্রচলিত অন্য যে কোন পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতি অনেক বেশী এবং দ্রুত কার্যকরী।

মহাকাশ থেকে সমগ্র পৃথিবীর রঙ্গীন আলোকচিত্র

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর তিনটি রঙ্গীন আলোকচিত্র প্রকাশ করেছে। এই ধরণের আলোকচিত্র এই প্রথম তোলা হলো। একটি কৃত্রিম উপগ্রহে রক্ষিত টেলিভিশন ক্যামেরায় এই আলোকচিত্র তোলা হয়েছে। মানুষের তৈরি উপগ্রহকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় কিনা—যাতে তার একটি দিক সর্বদাই পৃথিবীর দিকে মুখ করে থাকবে, তার পন্থা উদ্ভাবনের পরীক্ষা হিসাবেই এই আলোকচিত্রগুলি তোলা হয়েছে। দু-খানি আলোকচিত্রে সাহারা মরুভূমিসমেত উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা ও ইউরোপের কোন কোন অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। তৃতীয় আলোকচিত্রটিতে দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় সবটা, সেন্ট্রাল আমেরিকার এক বৃহৎ অংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দেখা যায়।

সৌরঝটিকা পরীক্ষা

সূর্য ও তার প্রচণ্ড তেজ বিকিরণ ঝটিকা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি একটি স্বয়ংক্রিয় মানমন্দির কক্ষপথে স্থাপন করেছে। ৫৯৯ পাউণ্ডের এই কৃত্রিম উপগ্রহটিতে নয়টি ইলেকট্রনিক যন্ত্র রয়েছে। প্রতি ১১ বছরে একবার সৌরঝটিকার প্রচণ্ডতা দেখা যায়। ১৯৬৯ সালে সৌরদেহে প্রচণ্ডতম ঝটিকা দেখা দেবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ঠিক ঐ সময়ে সূর্যকে পরীক্ষা করা হবে ঐ যন্ত্রগুলির সাহায্যে। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির নাম অরবিটিং সোলার অবজারভেটরী-৪ (ও. এস. ও-৪)। ও. এস. ও-১ উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ১৯৬২ সালে এবং সৌরদেহে ১৪০টি তেজশিখা লক্ষ্য করেছিল। ও. এস. ও-২ কক্ষপথে উপনীত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। ও. এস. ও-৩ এখনও কক্ষ-পরিক্রমা করছে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৬৭

২০শ বর্ষ, ঃ ১২শ সংখ্যা
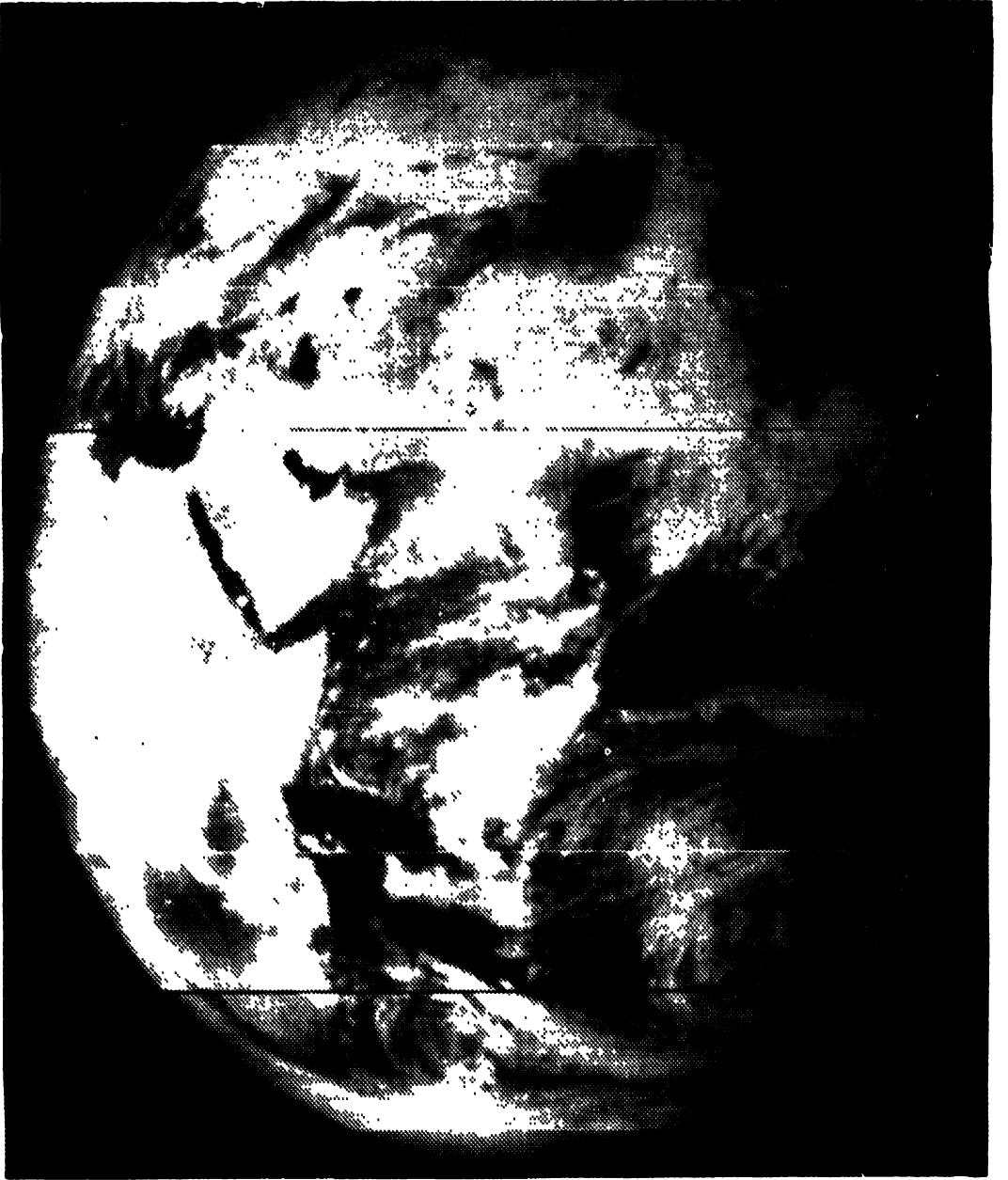
চাঁদ থেকে তোলা পৃথিবীর আলোকচিত্র— ৩৪৩,০০০ কিলোমিটারেরও উর্ধ্বে চাঁদের কাছাকাছি জায়গা থেকে লুনার অরবিটার-৫ নামক আমেরিকার স্পেসক্র্যাফট পৃথিবীর এই আলোকচিত্রটি তুলে পাঠিয়েছে। এই টেলিফটোর দৃশ্যে পৃথিবীর সূর্যালোকিত অংশের ৬ ভাগের ৫ ভাগ দেখা যাচ্ছে। স্থলভাগের মধ্যে ভূমধ্যসাগর থেকে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ, উপরে বাঁ-দিকে ইউরোপ, সুয়েজ খাল, আরব দেশ এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেখা যাচ্ছে। ছবিটি তোলা হয়েছে গত অগাষ্ট মাসের ৮ তারিখে। তিন দিন পরে ছবিটি ম্যাড্রিডের (স্পেন) নিকটবর্তী ট্র্যাকিং ষ্টেসনে পাঠান হয়।

করে দেখ

নেবু থেকে তড়িৎ-প্রবাহ উৎপাদন

এক টুক্‌রা তামার পাত এবং এক টুক্‌রা দস্তার পাত সংগ্রহ কর। অকেজো ড্রাই সেলের খোল থেকে এক টুক্‌রা দস্তার পাত কেটে নিলেই চলবে। তামা ও দস্তার পাতের এক প্রান্তে ছিদ্র করে দুটিতেই খানিকটা করে সরু তামার তার জুড়ে দাও। একটা পাতিনেবু টেবিলের উপর রেখে সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে জোর করে চাপ দিয়ে নরম করে নাও। এবার ছবির মত করে তামা ও দস্তার পাত দুটিকে নেবুটার গায়ে বেশ খানিকটা ঢুকিয়ে দাও। লক্ষ্য রাখবে, পাত দুটা যেন কোন রকমে
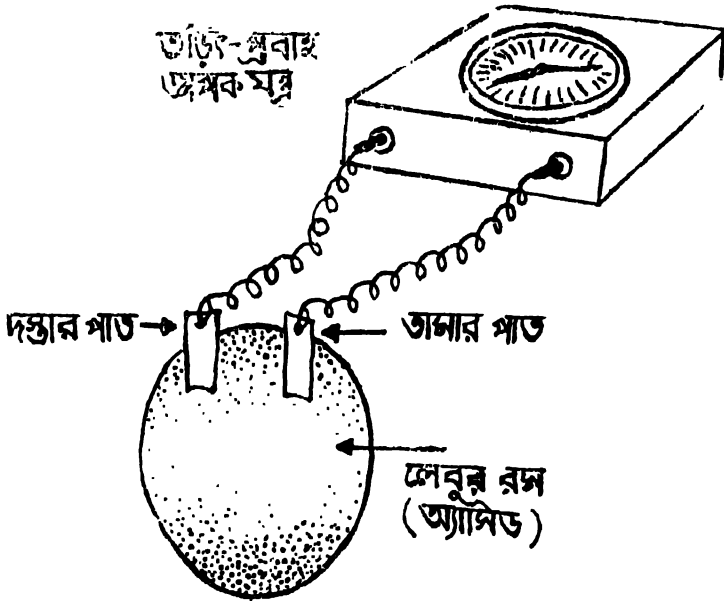
পরস্পরের গায়ে না লাগে। তামার পাত সংলগ্ন তারটা কোন একটা তড়িৎ-জ্ঞাপক যন্ত্রের এক প্রান্তে যোগ করে দাও। দস্তার পাত সংলগ্ন তারটা যন্ত্রের অপর প্রান্তে স্পর্শ করালেই দেখবে, তারের মধ্য দিয়ে খুব ক্ষীণ হলেও তড়িৎ-স্রোত প্রবাহিত হয়ে যন্ত্রের কাঁটা খানিকটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নেবুর রসটা অ্যাসিড—কাজেই তামা ও দস্তার পাতসহ নেবুটা ইলেকট্রিক সেলের মতই কাজ করে।

হিমশিলা

তোমরা নিশ্চয় জান, হিমশিলা বলতে বোঝায়—বরফের পাহাড়। উত্তর মেরুর সন্নিহিত বেফিন, মেলভেলি উপসাগরে এগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া এগুলিকে আলাস্কার কাছাকাছি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, বিশেষতঃ গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক অঞ্চলেও ভাসতে দেখা যায়।

উত্তর মেরুর কাছাকাছি গ্রানল্যাণ্ড নামে একটা দ্বীপ আছে। এটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ। এই দ্বীপই হিমশিলার জন্ম দেয়। গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপ খুব ঠাণ্ডা এবং বরফে আচ্ছাদিত থাকে। বছরের প্রায় সব সময়েই সেখানে তুষারপাত হয়। ঐ তুষার বরফে পরিণত হয়। এরকম ভাবে এক মাইল, দেড় মাইল লম্বা বরফের আচ্ছাদন গড়ে ওঠে। ঐ বরফের আচ্ছাদন খুব ধীরে ধীরে নীচের সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে। তাতে হিমনদী গড়ে ওঠে। কখন কখন একাধিক হিমনদীর ধারা পরস্পর মিশে গিয়ে বিরাট আকার ধারণ করে। খুব বেশী হলে হিমনদী এক ঘণ্টায় এক ফুট করে এগুতে পারে। ঐ হিমনদী থেকে হিমশিলা গড়ে ওঠে।

হিমশিলা দুই ভাবে সৃষ্টি হয়। সমুদ্রতীরে খুব খাড়া পাড় থাকলে হিমনদী আস্তে আস্তে পাড়ের ঢাল বেয়ে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে আসবার পর তার এক অংশ পাড় ছেড়ে সমুদ্রের উপর ঝুলতে থাকে। শেষে এমন এক সময় আসে, যখন ভার সইতে না পেরে সেই অংশটা সশব্দে ভেঙ্গে পড়ে। ভাঙ্গা অংশ সমুদ্রে পড়ে হিমশিলার সৃষ্টি করে এবং সেটা সমুদ্রের জলে ভাসতে থাকে।

সমুদ্রতীরের পাড় খাড়া না হয়ে যদি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে যায়, তবে হিমনদী ঢাল বেয়ে খুব ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলে এসে পড়ে এবং অবশেষে এক সময়ে আপনা থেকেই ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সাধারণতঃ অধিকাংশ হিমনদীই গ্রীনল্যাণ্ডের পশ্চিম তটরেখা দিয়ে সমুদ্রে নামে। ওখানে বেফিন উপসাগর রয়েছে।

এরকম ভাবে প্রতি বছর হাজার হাজার হিমশিলা গড়ে ওঠে। এসব হিমশিলার গঠন ও আয়তন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কখন কখন এগুলি ৮-১০ তলা বাড়ীর সমান উঁচু হয়, আবার কখন কখন হয় চ্যাপ্টা ধরণের হয়তো মাইলখানেক কিংবা তার চেয়েও লম্বা হয়ে থাকে। কখনও কখনও এক-একটা হিমশিলার ওজন ১০ থেকে ৫০ লক্ষ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভাসমান হিমশিলার বেশীর ভাগ অংশই জলের নীচে থাকে। জলের উপরে ভেসে যতখানি থাকে, জলের নীচে থাকে তার আট গুণ বেশী। সমুদ্রের জল নোনা, কিন্তু হিমশিলার বরফ গলিয়ে যে জল পাওয়া যায়, তাতে লবণ থাকে না। কাজেই হিমশিলা গলানো জল পান করা যেতে পারে।

সূর্যের কিরণ হিমশিলার গা থেকে ঠিক্‌রে পড়ে অতি মনোরম দৃশ্যের সৃষ্টি করে। বাতাসের সহায়তায় অথবা স্রোতের টানে হিমশিলা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ভেসে বেড়ায়। ভেসে বেড়াবার সময় ছোট ছোট অনেক হিমাশিলা পরস্পরের সঙ্গে মিলে গিয়ে অনেক বড় আকারের হিমশিলা গড়ে তুলতে পারে।

কখনও কখনও জাহাজ প্রভৃতি জলযান হিমশিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অতীতে এই রকমের দুর্ঘটনায় অনেক জীবনহানি ঘটেছে। তার মধ্যে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছিল টাইটানিক নামক জাহাজটিতে। হিমশিলার সঙ্গে ধাক্কা লাগায় বিশেষভাবে নির্মিত ঐ জাহাজের প্রায় দেড় হাজার লোক ডুবে গিয়ে প্রাণ হারায় এবং মাত্র ছয় শতের কিছু বেশী লোক রক্ষা পেয়েছিল। দুর্ঘটনা ঘটেছিল আটলান্টিক মহাসাগরে। জাহাজটা তখন ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকার দিকে পাড়ি দিচ্ছিলো। সেই প্রথম তার সমুদ্রযাত্রা। আর ভাগ্যের পরিহাসে সেই তার শেষ যাত্রা। ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল রাত ১০টা ৩০ মিনিটের সময় হিমশিলার সঙ্গে জাহাজটির ধাক্কা লাগে এবং রাত ২টা ৫ মিনিটের মধ্যেই সমুদ্রের জলে তলিয়ে যায়।

এক একটা হিমশিলা প্রায় দু-তিন বছর ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় এবং সেই সময়ের মধ্যে প্রায় হাজার দুই মাইল পরিভ্রমণ করে অবশেষে আটলান্টিক মহাসাগরের গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক অঞ্চলে আসে। তার ফলে ওখানে নৌ-যান চলাচলের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক অঞ্চল দিয়ে অনেক জাহাজ চলাচল করে এবং ওখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় বলে ঝাঁকে ঝাঁকে জেলেদের নৌকাও ওখানে এসে হাজির হয়। হিমশিলা সৃষ্টি হবার পর, বলতে গেলে বেফিন উপসাগর থেকেই সেগুলি নির্দিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করে।

বেফিন উপসাগরে উত্তরমুখী পশ্চিম গ্রীনল্যাণ্ড স্রোতের কবলে পড়ে এবং বাতাসের সহায়তায় উত্তর দিকে চালিত হয়। এই সময়ে কিছু হিমশিলা হয়তো পথচ্যুত হয়ে তীরে আটকা পড়ে এবং তার যাত্রাপথ সেখানেই থেমে যায়।

অগাষ্ট মাসের মাঝামাঝি তাপমাত্রা কমতে সুরু করে। উত্তর সাগরের জলের উপরিতল রাতের ঠাণ্ডায় জমে যেতে সুরু করে, কিন্তু দিনের আলোয় তা ফের গলে যায়। এভাবে সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগ আসে। আরো বেশী শীত পড়ে। উপসাগরের জল বরফে পরিণত হবার ফলে হিমশিলা খুব আস্তে আস্তে চলে। শেষে সেপ্টেম্বরের শেষে আরো শীত পড়লে সমুদ্রের জল বরফে পরিণত হয় এবং হিমশিলা তার মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়ে।

হিমশিলা প্রথম শীত গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে অবস্থিত মেলভেলি উপসাগরে কাটায়। তারপর শীত কাটে। আসে বসন্ত। আবহাওয়া উষ্ণতর হয়ে ওঠে। উপসাগরের বরফ গলতে সুরু করে। জুন মাস নাগাদ আবার হিমশিলা যাত্রা করবার উপযোগী

পরিবেশ ফিরে পায়, স্রোতের টানে তখন হিমশিলা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলে—বেফিন দ্বীপের দিকে তাদের যাত্রা সুরু হয়।

সেখানে তারা লেব্রাডর স্রোতের কবলে পড়ে। লেব্রাডর স্রোত সুমেরুস্থিত সাগর থেকে আসে। এই স্রোত হিমশিলাকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায়। কিছু হিমশিলা বায়ুপ্রবাহে পথচ্যুত হয়। তবে বেশীর ভাগই দক্ষিণ দিকে চলতে থাকে। এর মধ্যে গ্রীষ্মকাল চলে যায়। ধীরে ধীরে আবার শীত আসে। বেফিন উপসাগরে আবার বরফ জমতে সুরু করে। ফলে হিমশিলা আবার বন্দীদশা প্রাপ্ত হয়। এই সময় হিমশিলা বেফিন দ্বীপের কেপ ডেয়ারের কাছাকাছি থাকে। এর মধ্যে একটি বছর কেটে যায়। তারপর ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস নাগাদ সমুদ্রের বরফ গলবার সঙ্গে সঙ্গে হিমশিলা আবার চলতে সুরু করে। সেগুলি ফের লেব্রাডর স্রোতে দক্ষিণে চলে। চলতে চলতে লেব্রেডর-এর তীর এবং নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের তীর ছাড়িয়ে এগিয়ে চলতে থাকে। এপ্রিল মাসে সেগুলি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছায়। সেখানে লেব্রাডর স্রোত তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা যায় পূর্বে, একটা যায় পশ্চিমে আর মাঝামাঝি থাকে আরেকটা ধারা—সেটা যায় দক্ষিণ-পশ্চিমে। এখানে জলের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটে। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা জলের লেব্রাডর স্রোত এসে এখানে অপেক্ষাকৃত গরম উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে মেশে। তার ফলে জলের সম্মিলিত যে তাপমাত্রা গড়ে ওঠে, তা হিমশিলা পূর্বে যে জলের সংস্পর্শে ছিল, তার চেয়ে উষ্ণতর; কাজেই হিমশিলার বরফ গলতে সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে তা আরো দক্ষিণে এগিয়ে যায়। ফলে জলের উষ্ণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হিমশিলা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি গলে যায়। সাধারণতঃ গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কের কাছাকাছি অঞ্চলে হিমশিলা গলে গলে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যেতে থাকে। প্রতি দু'ঘণ্টায় এরা প্রায় এক ফুট করে কমতে থাকে এবং সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যেই তারা তাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রঃ ১। জেটের পশ্চাদ্ভাগ থেকে সাদা গ্যাস বের হয় কেন?

শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার
বৈঁচিবেড়িয়া, ২৪ পরগণা

প্রঃ ২। জন্মের পর শিশুরা ২ মাস পর্যন্ত দেখতে পায় না কেন?

প্রঃ ৩। Symbiosis কাকে বলে? এর উপকারিতা কি?

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মাহাতো

প্রঃ ৪। ফুলের রঙের জন্য দায়ী কে? ফুলের কোষস্থিত প্লাস্টিড না অন্য কিছু?

শ্রীবঙ্কুবিহারী রায়, কলিকাতা

উঃ ১। জেট ইঞ্জিনের মধ্যে বাতাসকে জ্বালানীর সাহায্যে জ্বালিয়ে দিলে যে উচ্চতাপের সৃষ্টি হয়, তার ফলে তৈরি হয় নানা রাসায়নিক যৌগের বাষ্প ও জলীয় বাষ্প। এই বাষ্প নির্গমন পথ দিয়ে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং তার ফলে তরলীভবন ও কিছু পরিমাণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেলাসের সৃষ্টি হয়। আলো এই নির্গত গ্যাসে বিচ্ছুরিত হয় এবং আমরা জেটের পিছনে সাদা রঙের লেজ দেখতে পাই।

উঃ ২। শিশুরা জন্মের পর থেকেই দেখতে পায়—তাদের যে আলো-আঁধারের অনুভূতি আছে, তা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। আমাদের দৃষ্টিশক্তির বহিরঙ্গ চোখ ও ভিতরের অঙ্গ মস্তিষ্ক। এদের যে কোন রকমের অপরিপূর্ণতা থাকলেই দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক থাকে না। শিশু সামগ্রিক পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মায় না। শিশুদের চোখের পেশাগুলির কর্মক্ষমতা কম থাকবার ফলে, রেটিনাতে প্রতিচ্ছবি পড়ে বটে, কিন্তু তা সুস্পষ্ট নয়। তাছাড়া মস্তিষ্কের অপরিপূর্ণতার ফলে দেখতে পেলেও তারা চিনতে পারে না।

উঃ ৩। প্রকৃতির রাজ্যে সহযোগিতা ও সহাবস্থানের উদাহরণ অন্যোন্যজীবিতা অর্থাৎ Symbiosis। দুটি বিভিন্ন জীব বেঁচে থাকবার তাগিদে এক সঙ্গে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হিসাবে বসবাস করে। বাইরে থেকে সাধারণভাবে দেখে বোঝা যায় না দুটি জীবের সহাবস্থান। অন্যোন্যজীবিতা তিন রকমের হতে পারে:

(ক) উদ্ভিদে উদ্ভিদে সহাবস্থান—উদাহরণ লাইকেন (Lichen)। শ্যাওলা ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ একই সঙ্গে থাকে লাইকেনে। শ্যাওলার সবুজ ক্লোরোফিল

আলোর সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে এবং ছত্রাক সেই খাদ্যের পরিবর্তে শ্যাওলাকে নিজের মধ্যে আশ্রয় দেয়।

(খ) উদ্ভিদ ও প্রাণীর সহাবস্থান—উদাহরণ মটর, কলাই, ছোলা ইত্যাদি শিম্বি গোত্রীয় উদ্ভিদ। এদের মূলে এক প্রকার জীবাণু অর্বুদ তৈরি করে। জীবাণুগুলি বাতাসের নাইট্রোজেন থেকে খাদ্য তৈরি করে। উদ্ভিদ এই খাদ্যের পরিবর্তে জীবাণুদের আশ্রয় ও কার্বোহাইড্রেট খাদ্য দেয়।

(গ) প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর সহাবস্থান—উদাহরণ উইপোকা। উইপোকা কাঠ খায়, কিন্তু হজম করতে পারে না। এদের খাদ্যনালীর গায়ে এক ধরণের জীবাণু থাকে, যারা এই কাঠ হজম করতে উইপোকাকে সাহায্য করে।

উঃ ৪। সূর্যের আলোতে নানা রঙের আলো না থাকলে আমরা কোন কিছুরই রং দেখতে পেতাম না। ফুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। তবে কোন্ ফুল কি রঙের দেখাবে, তা নির্ভর করে ফুলের পাপড়ির কোষস্থিত প্লাস্টিডের উপর। প্লাস্টিড হয় দুই রকমের—বর্ণহীন লিউকোপ্লাস্ট ও রঙীন ক্রোমোপ্লাস্ট। ক্রোমোপ্লাস্টের মধ্যে থাকে রঞ্জক পদার্থ। সবুজ রঙের ক্লোরোফিলযুক্ত ক্রোমোপ্লাস্টকে বলা হয় ক্লোরোপ্লাস্ট—যার জন্যে পাতার রং হয় সবুজ। রঞ্জক পদার্থ অধিকাংশই আলোক-সংশ্লেষক। ক্রোমোপ্লাস্টের রঙের প্রধান রঞ্জক পদার্থ ক্যারোটিন (কমলা রং) ও কিছুটা য্যান্থোফিল (হলদে রং—Xanthophyll)। এছাড়াও থাকে অ্যান্থোস্যাপোনিন (লাল, বেগুনী, নীল) ও অ্যান্থোযান্থিন (হলদে রং, তবে অধিকাংশ সময়েই খুব হাল্কা রঙের হয়)।

শুভেন্দু দত্ত

বিবিধ

১৯৬৭ সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হানস আলব্রেকট বেথেকে পদার্থ-বিজ্ঞানে ১৯৬৭ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

জার্মেনীর অধ্যাপক আইজেন, লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউটের জর্জ পোর্টার ও কেম্বি্জের অধ্যাপক নারিশকে যুক্তভাবে ১৯৬৭ সালের রসায়ন-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সুইডেনের র‍্যাগনার গানিট, রকফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যালডেন কীফার হার্টলাইন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ ওয়াল্ড যুক্তভাবে ভেষজবিদ্যায় ১৯৬৭ সালের নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

সার জন কক্রফ্‌ট্‌

সার জন কক্রফ্‌ট্‌ গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ৭০ বছর বয়সে কেম্বি্জে তাঁর নিজের বাসভবনে পরলোক গমন করেছেন। তিনি ছিলেন বৃটেনের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একজন পথিকৃৎ। ১৯৫৯ সাল থেকে তিনি কেম্বি্জের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি-বিদ্যার নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চার্চিল কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

জন ডগ্‌লাস কক্রফ্‌ট্‌ ১৮৯৭ সালের ২৭শে মে ইয়র্কশায়ার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সীমান্তবর্তী একটি ছোট শহর টডমরডেনে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশব থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। স্কুলে তিনি সব বিষয়েই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। স্কুলের পড়া শেষ করবার পর গণিত ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্যে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই সময় তিনি রয়েল ফিল্ড-আর্টিলারিতে যোগদান করেন।

যুদ্ধের পর ম্যাঞ্চেষ্টর থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং-এ স্নাতক হন। ১৯২২ সালে তিনি দুটি বৃত্তি লাভ করে কেম্বি্জের সেন্ট জন্স কলেজে যোগদান করেন। এখানে তিনি ১৯২৪ সালে গণিতে সর্বোচ্চ সম্মান ট্রাইপস লাভ করেন। লর্ড রাদারফোর্ডের সময়ে কেভেণ্ডিস লেবরেটরিতে কাজ আরম্ভ করেন।

তিনি সেন্ট জন্স কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯২৮ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি পরে ১১ বছর ধরে কেম্বি্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার লেকচারার হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯৩৯ সালে ন্যাচারাল ফিলোসফির অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৯৩২ সালে জন কক্রফ্‌টের নাম বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ বছর তিনি পারমাণবিক পদার্থবিদ্যায় এক বড় রকমের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন—তিনি ও তাঁর সহকর্মী ডক্টর ওয়ালটন কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু বিদারণ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি কেম্বি্জে রয়েল সোসাইটির মন্‌ড্‌ লেবরেটরির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং পরের বছর রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি শিক্ষার ক্ষেত্র ছেড়ে বিভিন্ন সরকারী পদে যোগদান করেছিলেন।

১৯৪৪ সালে ক্যানাডার ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের অ্যাটমিক রিসার্চ এষ্টাব্লিশমেন্টের পরিচালন ভার গ্রহণের জন্যে তিনি ক্যানাডায় যান এবং চক রিভারে ক্যানাডীয় গবেষণাগারের ডিরেক্টর হন। এই গবেষণাগারটিই ক্রমশঃ

বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

যুদ্ধের পরে প্রকাশ পায়, ক্যানাডায় পরমাণু-শক্তির উন্নয়ন সম্পর্কে কাজ করা ছাড়াও তিনি রেডার সম্পর্কে যথেষ্ট কাজ করেছিলেন। এই কাজ যুদ্ধের সময় কনভয় ইত্যাদি রক্ষার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে সহায়ক হয়।

১৯৪৬ সালে তিনি বৃটেনে ফিরে আসেন হারওয়েলের পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পর্কে কাজ করবার জন্যে। তিনি এই কেন্দ্রের প্রথম ডিরেক্টর হন। ১৯৫৪ সালে ইউনাইটেড কিংডম অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি স্থাপিত হলে তিনি তার প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষক সদস্য নিযুক্ত হন।

সার জন কক্রফ্‌ট্‌ ১৯৪৮ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৫১ সালে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (অধ্যাপক ওয়ালটনের সঙ্গে একত্রে)। ১৯৫৭ সালে তিনি অর্ডার অব মেরিট খেতাব লাভ করেন। এছাড়া তিনি দেশে-বিদেশে আরও অনেক সম্মান লাভ করেন। ১৯৬১ সালে তিনি মাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে শান্তির জন্যে পরমাণু-শক্তি পুরস্কার পান।

সার জন যুদ্ধের পর বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। ভারত সহ কমনওয়েলথের অধিকাংশ দেশেই তিনি ঘুরে গেছেন। ১৯৬১ তিনি অষ্ট্রেলিয়ার ন্যাশন্যাল ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন।

১৯২৫ সালে তিনি বিবাহ করেন তাঁর চার কন্যা ও এক পুত্র বিদ্যমান।

আর্থ্রাইটিস বা গেঁটে বাতের চিকিৎসা

আর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা ফলপ্রদ করবার ব্যাপারে বৃটেনের মেডিক্যাল বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল অনেক উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলে জানা গেছে। আর্থ্রাইটিস হলো গেঁটে বাত—শরীরের গাঁটে গাঁটে এই বাত খুবই যন্ত্রণাদায়ক, অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সে তা মানুষের চলৎ-শক্তি পর্যন্ত কেড়ে নেয়। গবেষণার এই ফল উৎসাহব্যঞ্জক হওয়ায় এই সম্পর্কে তাড়াতাড়ি একটা কিছু আবিষ্কার করবার জন্যে বিভিন্ন গবেষণা-পরিকল্পনার কাজকর্মের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বৃটেনে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হতে চলেছে।

আর্থ্রাইটিস অ্যাণ্ড রিউম্যাটিজম কাউন্সিল-এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর উইলিয়াম কোপম্যান লণ্ডনে বলেন: অন্ধকারের মধ্যে আমরা যেন একটু আলোর রেখা দেখতে পেয়েছি। আমরা এই ব্যাপারে শীঘ্রই বড় রকমের একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারবো।

তিনি বলেন—বৃটিশ চিকিৎসকগণ বিশ্বাস করেন যে, ব্যাক্টিরিয়াই গাঁটে গাঁটে বাত সৃষ্টি করে, যার ফলে শরীরের ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। গাঁটের ব্যথায় মানুষ অসহ্য কষ্ট ভোগ করে।

এডিনবরার একদল চিকিৎসক—ডক্টর জন ডাথির নেতৃত্বে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁরা মনে করেন অস্থি গ্রন্থির ফাঁকে ঝিল্লীর মধ্যে এই জীবাণু তাঁরা দেখতে পেয়েছেন, যা তাঁদের কাজকর্ম অনেকটা সহজ করতে সাহায্য করবে। এই সব জীবাণু যদি রোগের কারণ হয়, তাহলে আশা করা যেতে পারে, জীবাণু নিশ্চিহ্ন করবার উপায়ও শীঘ্রই বের করা যাবে।

বার্মিংহামের একদল গবেষক পরীক্ষা করে দেখছেন, "রিউম্যাটিয়েড ফ্যাক্টর" এক রকমের অস্বাভাবিক প্রোটিন, যা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালের চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে দেখছেন, এই বাত অস্থি-গ্রন্থির লাইনিং-এ কি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে।

জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন, গবেষণা-কর্মগুলির

সমন্বয় সম্ভব হলে রোগ নিরাময়ের নিশ্চিত উপায় বের করবার জন্যে আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না।

রানওয়ে ছাড়াই বিমান আকাশে উড়বে

বিমানের প্রথম যুগ থেকেই মানুষ বিমানের সোজাসুজি আকাশে ওঠা বা মাটিতে নামার কথা ভেবে এসেছে।

রানওয়ে ছাড়া ওঠা-নামা করতে পারে হেলিকপ্টার। মাথার উপরে বসানো ঘূর্ণায়মান পাখার সাহায্যে হেলিকপ্টার সোজা উঠে যায়। কিন্তু যদিও ৩০ বছর হলো হেলিকপ্টার উড়ছে, তবু তার গতিবেগের আজও বিশেষ উন্নতি হয় নি।

তাই বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারেরা নতুন পথের সন্ধান করছিলেন। একটি পথ হতে পারে—জেট ইঞ্জিনের ব্যবহার।

এই জেট ইঞ্জিনগুলি সাধারণ বিমানে ব্যবহৃত ইঞ্জিনেরই অনুরূপ। সাধারণ বিমানে ব্যবহৃত জেট ইঞ্জিন সামনের বাতাস টেনে নেয় এবং পিছন দিক দিয়ে এমন জোরের সঙ্গে ছেড়ে দেয় যে, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিমান সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং তারপর পাখার উপর ভর করে উপরে ওঠে।

নতুন ধরণের বিমানে জেট ইঞ্জিনগুলি বিমানকে সামনের দিকে না ঠেলে উপরের দিকে ঠেলবে। এই নতুন ধরণের জেট ইঞ্জিনের উদ্ভাবন করেছেন বিখ্যাত বৃটিশ ফার্ম রোলস্রয়েস।

১৩ বছর আগে দুটি রোলস্রয়েস ইঞ্জিন থ্রাষ্ট বেডষ্টেড নামে একটি অদ্ভূত দর্শন বিমানকে সোজাসুজি উপরে তুলেছিল, যার কোন পাখা ছিল না।

তারপর থেকে রোলস্রয়েস বিমান সোজাসুজি উপরে ওঠবার ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি সাধন করেছে।

আর একটি প্রখ্যাত বৃটিশ ফার্ম এই নতুন রীতিতে ওড়বার জন্যে একটি বিমান নির্মাণ করেন। এতে বিমানটিকে উপরে তোলবার জন্যে চারটি এবং সামনের দিকে চালাবার জন্যে একটি রোলস্রয়েস ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়।

আগেকার জেট ইঞ্জিনগুলি ধাতুনির্মিত হওয়ায় খুব ভারী হতো। নতুন বিমানে ইঞ্জিনকে নিজের ও বিমানের ভার উপরে তুলতে হবে, তাই রোলস্রয়েস দেখছেন, কি করে আরও শক্তিশালী ও হাল্কা ইঞ্জিন তৈরি করা যায়।

এরূপ একটি হাল্কা উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে। এই নতুন উপাদান শুধু হাল্কাই নয়, এটি কম সময়ে তৈরি করা যায় এবং দামেও সস্তা। কাচ ও প্লাষ্টিকে তৈরি এই উপাদান শুধু লিফ্‌ট্‌-জেট ইঞ্জিন নয়, সকল ইঞ্জিনেরই উপযোগী।

লিফ্‌ট্‌-জেট (সোজা উপরে ওঠে) ইঞ্জিনের জন্যে নতুন, সস্তা ও হাল্কা উপাদান আবিষ্কারে উৎসাহ দেন বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মেনীর সরকারগুলি। ফ্রান্স, জার্মেনী ও ইটালির বিমানে ব্যবহারের জন্যে রোলস্রয়েস লিফ্‌ট্‌-জেট ইঞ্জিনের একটি নতুন ধরণের ইঞ্জিন নির্মাণ করছেন, যেটি থ্রাষ্ট বেডষ্টেডের চেয়ে প্রায় সাত গুণ শক্তিশালী হবে।

ভ্রম সংশোধন—জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১০ম-১১শ সংখ্যা (শারদীয়), ১৯৬৭, পৃষ্ঠা ৬১৯, খ—মিউওনিয়াম চিত্রে 'μ^- মিউমেসনের' পরিবর্তে 'e^- ইলেকট্রন' পড়তে হবে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ঊনবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন—১৯৬৭

বিজ্ঞান কলেজ
শারীরবৃত্ত বিভাগের বক্তৃতা কক্ষ

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭
শনিবার, অপরাহ্ণ ৩-৩০টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের এই ঊনবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৯ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অনুপস্থিতিতে পরিষদের অন্যতম সহঃ সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া অধিবেশনের কার্যাদি পরিচালনা করেন। অধিবেশনের নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য আরম্ভ করিয়া কর্মসচিব মহাশয়কে পরিষদের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিতে আহ্বান করেন।

১। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীজয়ন্ত বসু মহাশয় সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানাইয়া আলোচ্য বছরের বার্ষিক বিবরণী সম্পর্কে বলেন যে, গত ৫ই মে '৬৭ তারিখে পরিষদের ঊনবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানের সভায় উক্ত বর্ষের কাজকর্ম ও পরিষদের বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহাকেই মোটামুটিভাবে আলোচ্য বৎসরের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তথাপি এই সাধারণ অধিবেশনের রীতি অনুসারে তিনি পরিষদের বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টায় শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আলোচ্য বৎসরে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দান করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আদর্শানুযায়ী মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশ, জনপ্রিয় পুস্তকাবলীর প্রকাশন, বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দান, বিজ্ঞান পুস্তকের পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যাদি সম্পর্কে আলোচ্য বৎসরের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেন। পরিষদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার অগ্রগতি ও সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্যাদি জানাইয়া তিনি বর্তমান বর্ষেই উক্ত গৃহ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ করেন। এভাবে পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দানের পরে কর্মসচিব মহাশয় সভ্যগণের শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করিয়া তাঁহার বিবরণী শেষ করেন।

২। হিসাব বিবরণী ও ব্যয় বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব পরীক্ষক (অডিটর) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রদত্ত পরিষদের ১৯৬৬-৬৭ সালের বিভিন্ন হিসাবের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও বার্ষিক উদ্বৃত্ত পত্র (ব্যালান্স সিট) কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র মহাশয় অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপিত করেন। পরিষদের নিয়মতান্ত্রিক

বিধান অনুসারে বিভিন্ন তহবিলের এই সকল পরিক্ষীত হিসাব-বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র মুদ্রিতাকারে সভ্যগণের জ্ঞাতার্থে ও বিবেচনার জন্য ইতি-পূর্বেই তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উক্ত হিসাব-বিবরণীগুলি যথোচিত আলোচনা ও বিবেচনার পর উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতি-ক্রমে অনুমোদিত হয় এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৬৬-৬৭ সালের উক্ত উদ্বৃত্তপত্র ও হিসাব-বিবরণীগুলি সভায় যথোচিত ভাবে গৃহীত হয়।

অতঃপর পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের ব্যয়-বরাদ্দ পত্রগুলি কোষাধ্যক্ষ মহাশয় সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথানিয়মে এই বরাদ্দ পত্রগুলিও সভ্যগণের বিবেচনায় জন্য মুদ্রিতাকারে পূর্বেই প্রেরিত হইয়াছিল। অতএব যথোচিত আলোচনার পর উপস্থিত সভ্যগণ চলতি বৎসরে আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন তহবিলের উক্ত বরাদ্দ পত্রগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এবং তাহা সভায় যথোচিতভাবে গৃহীত হয়।

৩। কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরা সমিতি গঠন

বর্তমান ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য পরিষদের নূতন কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে মনোনয়নের জন্য পরিষদের গঠনতন্ত্রের বিধান অনুসারে সাধারণ সভ্যগণের নিকট যে মনোনয়ন পত্রগুলি প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে সভ্যগণের প্রস্তাবিত নামগুলি ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক সুপারিশসমূহের সমবায়ে গঠিত কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সাধারণ সভ্যের চূড়ান্ত নামের তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করেন। অবশ্য উল্লিখিত নামের তালিকা সভ্যগণের বিবেচনার জন্য সভার বিজ্ঞপ্তি পত্রের সঙ্গেই মুদ্রিতাকারে প্রেরিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় উপস্থিত সভ্যগণ উক্ত তালিকা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করেন এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর বিভিন্ন পদে ও কার্যকরী সমিতির সদস্যরূপে তালিকায় উক্ত উল্লিখিত নিম্নলিখিত সদস্যগণ নির্বাচিত হইলেন বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়:

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—সভাপতি
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—সহঃ সভাপতি
শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল ,, ,,
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ,, ,,
শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু ,, ,,
শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় ,, ,,
শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর ,, ,,
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ ,, ,, (সংশোধিত নিয়ম অনুসারে)
শ্রীজয়ন্ত বসু — কর্মসচিব
শ্রীশুভেন্দু দত্ত — সহযোগী কর্মসচিব
শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ,, ,,
শ্রীসুশীলরঞ্জন মৈত্র — কোষাধ্যক্ষ

সাধারণ সদস্য

শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী
শ্রীদিলীপ বসু
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
শ্রীশ্যামসুন্দর দে
শ্রীমৃন্ময় সামন্ত
শ্রীঅরুণ পুরকাইত
শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণকুমার সেন
শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী
শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী
শ্রীপারুল চক্রবর্তী
শ্রীআশুতোষ গুহঠাকুরতা
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত

৪। সারস্বত সঙ্ঘ গঠন

সারস্বত সঙ্ঘের পূর্বতন সঙ্ঘ-সচিব শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় এই বৎসর আর সঙ্ঘ-সচিবের দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় কর্মসচিব মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায় মহাশয় সঙ্ঘ-সচিবের পদে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। এই নবনির্বাচিত সঙ্ঘ-সচিব যথাসময়ে নিয়মতন্ত্রের বিধান অনুসারে নতুন সারস্বত সঙ্ঘ গঠন করিবেন।

৫। নিয়মাবলী সংশোধন-প্রস্তাব অনুমোদন

পরিষদের সহঃ সভাপতির পদ সম্পর্কে রেজেষ্টীকৃত নিয়মাবলীর ১১ (ক) নং ধারার সংশোধন সম্পর্কে গত ১৯৬৬ সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত নিম্নলিখিত ৫নং প্রস্তাবটি এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়:

পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীতে ছয় জনের স্থলে দশ জন সহঃ সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব পরিষদের রেজিষ্টার্ড নিয়মাবলীর এতৎ-সংক্রান্ত ১১ (ক) নং ধারার সংশ্লিষ্ট অংশটি পরিবর্তন করা হউক।

পরিষদের নিয়মাবলীর সংস্কার সম্বন্ধীয় ৩৮নং ধারার বিধান অনুসারে ১৯৬৬ সালের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত উক্ত প্রস্তাবটি বর্তমান ১৯৬৭ সালের এই বার্ষিক অধিবেশনে সর্ব-সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হওয়ায় নিয়মাবলীর এই সংশোধন বা সংস্কার অতঃপর পরিষদের পক্ষে কার্যকরী হইল বলিয়া সভায় গৃহীত হয় এবং পরি-ষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীতে অতঃপর অনধিক দশ জন সহঃ সভাপতি গ্রহণ করা যাইবে বলিয়া স্থির হয়। অবশ্য নিয়মানুসারে এই নিয়মাবলীর সংস্কার প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সমিতি-রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিতভাবে জানাইতে হইবে বলিয়া যে বিধান আছে, তাহা যথাসময়ে পালিত হইবে।

সংশোধিত এই নিয়মানুসারে পরিষদের পূর্বতন কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সর্বসম্মতিক্রমে অন্যতম সহঃ সভাপতির পদে নির্বাচিত হন।

৬। হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য পরবর্তী আর্থিক বৎসরের হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, গত কয়েক বৎসর যাবৎ হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী গুহ-ঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং পরিষদের হিসাবপত্র দক্ষতার সঙ্গে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং পরিষদের আর্থিক অবস্থার যথোচিত বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব উক্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠান আগামী ১৯৬৭-৬৮ সালের জন্য পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক পদে সভায় সর্বসম্মতি-ক্রমে নির্বাচিত হইলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার শ্রীপ্রভাসকুমার সরকার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, মহাশয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরি-ষদের হিসাব পরীক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন বলিয়া সভায় স্থির হয়।

৭। অনুমোদক মণ্ডলী নির্বাচন

পরিষদের নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন :

১। শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী
২। শ্রীমণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
৩। শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৪। শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

নিয়মানুসারে অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদের কর্মসচিব সহ উপরিউক্ত পাঁচজন নির্বাচিত সদস্যের অনুমোদনের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। সভাপতির ভাষণ

বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভায় বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি সভ্যগণের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন। সর্বশেষে শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় পরিষদের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর সদস্যগণকে ও উপস্থিত অন্যান্য সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
অধিবেশনের সভাপতি

জয়ন্ত বসু
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদক মণ্ডলীর স্বাক্ষর :—

১। শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী
২। পরিমলকান্তি ঘোষ
৩। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৪। মণীন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়
৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

এই সংখ্যার লেখকগণের নাম ও ঠিকানা

১। রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫।৪, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯

২। শ্রীমাধবেন্দ্রনাথ পাল
M. I. G. Housing Estate
Block-F, Flat-7
37, Belgachia Road
Calcutta-37

৩। প্রীতিসাধন বসু
বসু বিজ্ঞান মন্দির
৯৩।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৯

৪। সন্দীপকুমার বসু
(Dept. of Biochemist
Science College.
35, Ballygunj Circular Road
Calcutta-19

৫। রণন বন্দ্যোপাধ্যায়
U S.A.

৬। শ্রীপ্রণবকুমার কুণ্ডু
২২৩, মিত্রপাড়া রোড
নৈহাটি, ২৪ পরগণা

৭। শুভেন্দু দত্ত
Institute of Radio Physics
& Electronics
Science College
92, Achara Prafulla Ch. Road
Calcutta-9

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত